

মৌজাক

ছেলেমেয়েদের সচিত্র মাসিকপত্র

120

শ্রীমুখীরচন্দ্র সরকার সম্পাদিত

১৭.

[৩৯ বর্ষ, ১৩৬৫]

বর্ণানুক্রমিক সূচী

লেখার নাম	লেখক	পৃষ্ঠাসংখ্যা	লেখার নাম	লেখক	পৃষ্ঠাসংখ্যা
অভয় যন্ত্রের সহিষ্য	শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়	২২১	এঁকে চেন কি		৫২৪
আগুন পাড়ার মাঠ	শ্রীহরমিহ্মকুমার রায়	১৪২	এমন কিছু থাকতে পারো ?		৭৫
আচার্য বহুনাথ		১০৮	এলিফ্যান্টা গুহা	শ্রীউত্তরা দেন	৫২৭
আজব শহর	শ্রীগোপাল ভোমিক	৩৬৭	কল্যাণমারী	শ্রীরামদাস মুখোপাধ্যায়	২২
আজি এই শরতে	শ্রীরমেন চৌধুরী	৪২২	কম্পোষ্ট সার		২৩
আমার গ্রাম	শ্রীঅপূর্বকুমার ভট্টাচার্য	১৮২	কস্তুরী যুগ	মেঘাচার্য ২৮, ৭৬, ১৩৭, ১৮৩,	
আমাদের কথা		৬২৬		২৩৩, ২৮৭, ৪০১, ৪৪৫, ৪০৩, ৪৪২, ৬০৫	
আরও হৃৎ আরও সৌরভগণ			কাঁকড়া	শ্রীনবকুমার ভট্টাচার্য	২২৬
	শ্রীপুলকেন দে সরকার	৪৬	কাকাতুয়া	শ্রীবিনুপ্রদাস বহু	৪৮৬
ইন্দোচীনের চিঠি	শ্রীঅজিতকুমার ভারগ	১২৫	কাগজের আবিষ্কার	দিগ্গজ শর্মা	৫৫
উচিত ভাব	শ্রীকণিষ্ঠা বিদ্যাম	১৪৭	কানহেরি গুহা	শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ধর	৬৫৪
উল্লী দর্শনে	শ্রীকালীদাস গঙ্গোপাধ্যায়	২৭	কায় ঠাট্টা	চিহ্নভাষ্য	৪২২
এই সংসার যন্ত্র নয়			কালো চোখো মেয়ে	শ্রীগোপা দত্ত	৫৬৩
	শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	৫৫৬	কালো বিড়াল	"মুদ্রাক্ষর"	৫১২
একটি গাঁওতালী উপকণ্ঠ	শ্রীরাণা বহু	১৫৫	কান্নার পেয়ারা	শ্রীবীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	১১২
একতা	শ্রীহৃদীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য	১৩২	কাহিনী	শ্রীমুনীলকুমার বহু	৬১৪
একতারার গান	শ্রীঅচ্যুত চট্টোপাধ্যায়	২৩২	কি খাই	শ্রীপদ্মিনী বার	১৮৬
একলাই কামা	শ্রীউমা রায়	৪৮৫	কুমুদ	শ্রীজগদীশ হাটগুরু	২৭৭

লেখক নাম	লেখক	পৃষ্ঠা	লেখক নাম	লেখক	পৃষ্ঠা
রুতজতা	ঐহুর্গাধাণ মুখোপাধ্যায়	৬০১	ছড়া	ঐশ্বরিয়ল রায়	৪২৮
কোণী বিচার	বন্দে আলী মিঞা	৪৩৫	ছড়া	ঐবীক চট্টোপাধ্যায়	৩২৭
ক্যালেন্ডারের পাতা নিয়ে মজার খেলা		২৫০	ছড়ার সুরে পড়ো	ঐবিশ্বনাথ বে	২৩৬
কৌক কৌকি পালা	অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৩২৭	ছাতা ও জুতা	ঐবাণীকুমার	২৬৯
কুহু ঘটে তুচ্ছ নয়	বিজ্ঞানপ্রিয়	১২২	ছাপাখানার কথা	দিগ্‌গজ শর্মা	১৫৩
খেলাধুলার খবর	মেঠুর্ডে	৩১, ১০২, ১৫৭, ২০০, ২৬০, ৩০৮, ৩৭৬, ৪২৫, ৪৮২, ৫২৫, ৫৭২, ৬১৭	ছি-ছি-ছি	পরিমল রায়	১১৮
খোকন বাবু	ঐরঞ্জনকুমার সেন	৩৫২	ছোটদের জ্ঞান মাসিক	এ. সি. সরকার	৫৩
গভিই ষৌবন	ঐঅমরেন্দ্রনাথ দত্ত	৪১২	ছোট্ট একটি ঘড়ি	ঐগণীকুমার নাগ	৫০৮
গরমের ছুটি	ঐবিলল দত্ত	৬৫	জগদীশচন্দ্র	ঐযোগেশচন্দ্র বাগল	৪৬৮
গল্প নয়	ঐসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়	৪২৩	জন্মদিন	ঐশিউলি গুপ্ত	২৪৫
গৌক খেজুরে ভাই			জাগছে গাখার চেতন	ঐকলাপী চক্রবর্তী	৫৭৮
	ঐরাভকুমার মুখোপাধ্যায়	৫১৬	জান কি ?		১৬১
গ্যাস-বেলুন	'নিরঙ্কুশ'	৩৪২	জ্যোতের ছড়া	ঐপ্রভাকর মাসি	৮০
গ্রাহক গ্রাহিকা সংখ্যা	সম্পাদক	৫৩৫	জোনাকি	ঐসত্যেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়	৫৬৬
গ্রাহক-গ্রাহিকাদের লেখা		৫৭ ২০২, ২৬২, ৩১১, ২৪৭, ৫২৮, ৬২০	জোয়ার ভাটার ইন্দ্রজাল		
ঘড়ির কাটা	ঐহুশীল রায়	৩৩৮		নবীগোপাল চক্রবর্তী	
ঘরের ভিতর বাগান	ঐপশুপতি ভট্টাচার্য	৩৩২	টিপলু বাবু	ঐপ্রেমেন্দ্র মিত্র	
চাতক	ঐনির্মলকুমার চক্রবর্তী	৫৭০	টিয়া	ঐহুশীলকুমার গুপ্ত	
চাঁদ আমাদের কে ?	ঐপুলকেশ দে সরকার	১৭৮	টেস্ট ব্যাচে দেবা বোলার		
চাঁদ বাবে ভেঙ্গে		৩২৮		ঐবিনয় মুখোপাধ্যায়	৫২৭
চিঠি	ঐকামাকীপ্রদাস চট্টোপাধ্যায়	৩২, ৭৩, ৪৪৩	টোপাকুল	ঐনীমেশ গঙ্গোপাধ্যায়	৪৮৫
চিন্তাধরম	ঐঅমিতাভ দ্বিগাঠী	৫৬২	ট্রয়ের সন্ধানে	বিজ্ঞানপ্রিয়	৪৫২
চির ঐধাওয়ের বাজো.	বিজ্ঞানপ্রিয়	২৩	ডুগুঙ বা দিহু-গু	ঐহিতেন্দ্রমোহন বসু	২৫১
চাঁৎকার	ঐমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়	৪৫২	তাজমহলের রত্নালকার	ঐহেমেন্দ্রকুমার রায়	৩৭২
			তাদের হাইজাম্প	ঐ এ. সি. সরকার	৪২৭
			তিনতাই ও ভাইনী	ঐনীহার ঘোষ	১৪২
			তিকুপতি বালকী	ঐরামশ মুখোপাধ্যায়	৪০৬

লেখার নাম	লেখক	পৃষ্ঠা	লেখার নাম	লেখক	পৃষ্ঠা
তুলনী বাও	ডাঃ শতীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত	৬১৫	পূজার গল্প	ঐনরেজুনাথ মিত্র	৬৮২
তুমি আমার বন্ধবে কি মা ?	ঐত্বপূর্বক তট্টাচার্য		প্রজ্ঞাপতির মাঝ	ঐবীরেন্দ্রকুমার তট্টাচার্য	১৩১
ভোররাও এমনি হতে পারো	ঐনরেজুনাথ সিংহ		প্রতীকা	ঐশার্ণ ও দিগ্ধার্ণ দত্ত	৫৪৭
দক্ষিণ যেক ও উত্তর যেক	সত্যানী		প্রব্র	ঐমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়	৬১৬
দাড়ি-মেঘ	সত্যাবান		প্রাইম	ঐঅতদী চৌধুরী	২৫৬
দানবীর	ঐবিমলকুমার ঘোষ		প্রাচীনদের প্রতি	ঐমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়	১১৩
দুনিয়াকে যে হাস্যক্ছে আজও	ঐগণেশকুমার মিত্র	৩৪৩	প্রার্থনা	ঐইলা সরকার	৫৬৬
দুয়োরাণীর ছেলে	ঐবীর চট্টোপাধ্যায়	২১৩	প্রেমেন্দ্র মিত্র	ঐভবানী মুখোপাধ্যায়	১৩
ধাঁধার পাতা	৫২, ১৫২, ২০৭, ২৬৪, ৩১১, ৩৭২, ৪২৩ ৪৭২, ৫৮১, ৬২৩		ফুল ফুটলো	ঐহিমালয়নির্ভর সিংহ	৩০৭
নতুন পড়া	ঐরণকিৎকুমার সেন	১০৫	ফুলের মাঝে নিতু	নিরঞ্জন	৫০২
নতুন বই	৬২, ১১৪, ১৬২, ২০৬, ৩১৪, ৩৭৮, ৪০১, ৫৩৩, ৬২৫		বচনে নহ	ঐপরিমল রায়	৩৮৮
নববর্ষ উৎসবে জাপান	ঐস্বধাংশু তট্টাচার্য	১৩৪	বড়-মা	ঐঅসমগ মুখোপাধ্যায়	৩৪২
নববর্ষের গান	কটিক বন্দ্যোপাধ্যায়	৫৪	বহু	ঐস্বশান্ত চক্রবর্তী	৫৪৩
পটল ভোলায় আগে	ঐপতিভগাবন বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৪৮	বর্গদিনের ছোটপাখী	ঐস্বগতা কর	৪২৩
পরিচয়	ঐনগেন্দ্রকুমার মিত্রবজ্রদার	১৭২	বহুতলী	ঐবিমল দত্ত	৪৮
পর্বত ও মুখিক	ঐহেমেন্দ্রকুমার রায়	২	বায়কোপে কার্টুন-চিত্র	দিগ্গজ্ঞ শর্মা	৫২১
পাখিরা	ঐসুনীল-বহু	২৪	বিজ্ঞানের কথা	বিজ্ঞানী	৫১৮
পারস্তের সভ্যতা	ঐবিমলপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	৩৬৪	বিরোধী কিশোর	ঐপ্রভাকর ঘাষি	৪৫৮
পাসিদুদের কাহিনী	ঐরতনাকান্ত রায়	৫১১	বিগিনচক্স	ঐঅশোক গুহ	৪৭৪
শিশু বাবু	ঐবিজা সরকার	৫২৫	বিঘ্ন-সঙ্কট	ঐঅবনীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	১৩৬
পুজোর বাড়ি	ঐঅনিলেন্দ্র চৌধুরী	৪০৫	বিক্রি পড়ে	ঐবিক্রপ্রসাদ বহু	১৬৫
			বীরেশ্বর বিবেকানন্দ	ঐঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	৩, ৬৭, ১১২, ১৬৭, ২১৫, ২৭১, ৩২১, ৩৬৩, ৪৩৭, ৪৮৭, ৫৩৭, ৫৮৭
			বুড়ী বাঙার	ঐগোপাল ভৌমিক	৬২
			বুদ্ধি ও উগমিত্ত বুদ্ধি	ঐঅসমগ মুখোপাধ্যায়	৪২
			বুদ্ধির খেলা	ঐননীগোপাল চক্রবর্তী	১১১ ৪১৩

লেখক নাম	লেখক	পৃষ্ঠা	লেখক নাম	লেখক	পৃষ্ঠা
বুলবুলি	ঐবীরেন্দ্রকুমার ঘোষ	২৩০	রূপদক্ষ রূপলাল	বগন বড়ো	৪২
বৃকাক্ষরের পুনর্জন্ম	বিজ্ঞানপ্রিয়	৮১	রেডিও-একটি ইংলিশ		
বেজার বেতুল	ঐগরিতোবকুমার চন্দ্র	২৪৪	ঐশিত্তিপাবন বন্দ্যোপাধ্যায়		১৫২
বেদ	ঐমহা বিদ্য	৪৪২	বোগ পালাল কিল চড়ে	ঐপরিমল রায়	১৪
বেলা শেষে	ঐঅমরনাথ বসু	৪৪৬	লক্ষ্যভেদ	ঐপরিমলকুমার চন্দ্র	২৪
বৈশাখী ভাবনা	ঐগোপাল ভৌমিক	১৬	শটকাট	ঐশিবরাম চক্রবর্তী	৪৪৩
বোকার চেয়ে বোকা	ঐমিলাভ গঙ্গোপাধ্যায়	৩৩৪	শারদীয়া	ঐদীনেশ গঙ্গোপাধ্যায়	৩১২
বোয়াই	ঐবীরেন্দ্রলাল ধর	২৩১	শালিক শালিক	ঐপলাশ মিত্র	২৮২
ব্যর্থ-প্রয়াস	ঐঅশোকা দাশগুপ্তা	৪৬৭	শিকার আর্শ	ঐঅরুণকুমার দে	৪১৭
ভক্ত-হৃদয়ী	পারিলেয়ক ঐরেখা চট্টোপাধ্যায়	২২১	শিয়াল বাজা	ঐমোহিনীমোহন গাঙ্গুলী	৪১৬
ভবিষ্যৎ-বাণী	ঐইন্দিরা দেবী	৪৬৬	শিশুক	ঐহিতেন্দ্রমোহন বসু	১৮১
ভাষার গল্প	ঐহৃদীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য	৪১৪	শীতমিহি	ঐবিশেষরঞ্জন দত্ত	৪৭৮
ভেঙা	ঐপ্রেমেন্দ্র মিত্র		সত্যি ছড়া	বিমানচাঁপ মল্লিক	২৪৪
ভৌমল	ঐমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়	৩১১	সদাশিবের অয়িকাত		
মধুচক্র	মধুদি ৬৩, ১১৪, ১৬৩, ২১১, ২৬৬, ৩১৭, ৪২৪, ৪৮৩		ঐশরদিব্দ বন্দ্যোপাধ্যায়	৮২, ১২৪, ১৭৩	
মহাপুরুষ মহাশয়	মুদাখং অহোদা খাতুন	৪১৭	সদাশিবের আদিকাত	"	
মাকড়সার কীষ্টি	ঐমৌরীন্দ্রমোহন মুখোঃ	১৮৭	সত্তর ব্রহ্ম	ঐঅপূর্বরতন ভাট্টা	৮৪
মাটি চাণা ইতিহাসের অধ্যায়	বিজ্ঞানপ্রিয়	২২৭	মাগর পারের চিঠি	ঐদেবীপ্রদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	৪০২
মাধুরীসের মাহুলী	বগন বড়ো	৬৬০	সামান্ত তুল	ঐনরেন্দ্র দেব	৩৩৪
মুক্তি	ঐপ্রবোধকুমার সান্নাল	৩২৮	সাহেবের হোটেল	ঐপুণ্ড বসু	৪১১
মেকি টাঘ	ঐহুশীল রায়	৩৩	সেয়ানে সেয়ানে	ঐশচীন্দ্রনাথ অধিকারী	৬১১
মেঘ	ঐহৃদীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য	২৩১	স্বাদুর কাজ	ঐকমল বন্দ্যোপাধ্যায়	১০৬
মোচাক	ঐআনুতোষ সান্নাল	৪২	স্বভিরেখা	ঐঅবনীনাথ রায়	৪৪১
মৌ-চোর	ঐবেবতীকৃষ্ণ ঘোষ	১১৩	হ-জ-ব-র-ল	ঐআনুতোষ সান্নাল	৪৪০
মৃগা ও জানী	ঐমৌরীন্দ্রমোহন মুখোঃ	৩৭১	হাওতা	ঐহুশীলকুমার গুপ্ত	৩৪৩
মাতের বৃষ্টি	ঐমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়	২২৬	হিতোপদেশ	"-এর উপদেশ	৪৬৪
			হৌদল	ঐঅরুণাশঙ্কর রায়	৩২৪



৩৯ বর্ষ]

বৈশাখ-১৩৬৫

[১ম সংখ্যা

ভেড়া

শ্রেয়স্বর মিত্র

চ্যাঙ, ব্যাঙের বিয়ে হবে
মশাল আলো জোনাকি।

গল্পা ফড়িং বরকর্তা
কাঁকির আছে ছো নাকি।



বর আসবে রাত দুপুরে •
মানাই ধরে ঝিঁঝি।
শুবারে পোকা আলনা দেয়
কি ছাই হিজিবিজি।

ঘটক ছিল মাকড়শাটা,
হয় বোকা নয় পাঞ্জি।
জাল পাততে বেঁহুশ হয়ে
দেখেনি আর পাঞ্জি।

বিয়ের লগ্ন পার হয়ে যায়,
নেইক বরের দেখা,
পুরুত মশা বলে আমার
কিসের এত ঠেকা।

হোক বা না হোক বিয়ে সাদি
বিদায় আমার চাই,
ভালোয় ভালোয় না দাও যদি
হল ফুটিয়ে যাই।

এমন সময় ঘটক এসে
আট্ পা ছেড়ে পড়ে,
—সর্দি হয়ে ব্যাঙ্ বাবাজি
ভুগছে দারুণ জ্বরে!



বিয়ের সভায় সবাই চোঁচায়
কঙ্কা ও বরপক্ষ।
চ্যাঙ্ কনে সেই ফাঁকে সাবাড়
করলে যা যা ভক্ষ্য।

লুচি মেঠাই খেল সব-ই
ভেজাল একটি টিন ছি,
সবাই বলে ছি, ছি, ছি, ছি।
কি মেয়ে মা দিঙ্গি!

চ্যাঙের সাথে ব্যাঙের বিয়ে
সেই যে গেছে ভেঙে,
গরজ করে ঘটক কেউ আর
চায় না কাছে ঘেঁষতে।





(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

৫৮

দেখতে-দেখতে পাচশো টাকা চাঁদা উঠে গেল। স্বামীজির ভক্তদের আনন্দ আর ধরে না। এবার বিদেশে গিয়ে হিন্দুধর্মের উদার পতাকা উড়িয়ে দিয়ে এস।

কিন্তু এ কি আমি শুধু নিজের খেয়াল মেটাবার জন্তে চলেছি? না কি ঈশ্বরের কোনো নির্দেশ আছে প্রচুর? জিন্সামায় ছলতে লাগল স্বামীজি।

মা গো, তোর কি ইচ্ছে তাই বল। তুইই তো কর্ত্রী, কারয়িত্রী, করণ-গুণময়ী, কর্মহেতুস্বরূপা। তোর হাতে আমি তো কলের পুতুলমাত্র। রল তোর কি ইচ্ছে? যাব, না, যাব না?

যাব। চাঁদা সংগ্রহ করছিল তাদের ডাকল স্বামীজি। বললে, 'যা টাকা যোগাড় হয়েছে তা গরিবদের মধ্যে বিলিয়ে দাও।'

'সে কি কথা?' সবাই অবাক মানল। 'যাবেন না বিদেশে?'

'মার কি অভিলাষ তা না জানবার আগে ঝাঁপ দেব না অন্ধকারে।' বললে স্বামীজি।

কে মা? যিনি জগজ্জননী মহামায়া তিনি?

হ্যাঁ, তিনিই তো। তিনিই তো মর্ত্যের ঘরে সারদামণি। ত্রীরামকৃষ্ণের অভেদস্বরূপিনী।

‘দাদা, জ্যাস্ত দুর্গাপূজা দেখাব, তবে আমার নাম।’ শিবানন্দকে চিঠি লিখছেন বিবেকানন্দ ‘মায়ের কথা মনে পড়লে সময়-সময় বলি, কো রামঃ ? দাদা, ঐ যে বলছি এখানেই আমার গৌড়ামি। রামকৃষ্ণ পরমহংস ঈশ্বর ছিলেন কি মাহুঘ ছিলেন— যা হয় বল দাদা, কিন্তু যার মায়ের উপর ভক্তি নেই তাকে দিক্কার দিও।’

শ্রীশ্রীমাকে চিঠি লিখল স্বামীজি। মাগো, বিদেশে যেতে চাই, তুমি কি বলো ?

শ্রীশ্রীমা বলছেন আপন মনে : ‘নরেন বলেছিল, মা, আমার আজকাল সব উড়ে যাচ্ছে। সব দেখছি উড়ে যায়। আমি বললুম, দেখো, আমাকে কিন্তু উড়িয়ে দিও না। নরেন বললে, মা, তোমাকে উড়িয়ে দিলে থাকি কোথায় ? যে জ্ঞানে গুরুপাদপদ্ম উড়িয়ে দেয় সে তো অজ্ঞান। গুরুপাদপদ্ম উড়িয়ে দিলে জ্ঞান দাঁড়ায় কোথায় ? আমি বললুম, জ্ঞান হলে ? নরেন বললে, জ্ঞান হলে ঈশ্বর-টিশ্বর সব উড়ে যায়। মা, মা—শেষে দেখে, মা আমার জগৎ জুড়ে। সব তখন এক হয়ে দাঁড়ায়। এই তো সোজা কথা।’

‘মাতৃভাবই সাধনার শেষ কথা।’ বলেছেন ঠাকুর।

‘জগতে মায়ের স্থান সকলের উপরে।’ বলছেন বিবেকানন্দ, ‘এই অবস্থায়ই মাহুঘ আয়ত্ত করতে পারে চরম নিঃস্বার্থপরতা। শুধু আয়ত্ত করতেই পারে না, পারে প্রকাশ করতে।’

নরেন দক্ষিণেশ্বরে এলে ঠাকুর বলতেন শ্রীমাকে, নরেন আজ এখানে থাকবে, শ্রীমা তখন নরেনের জন্তে ময়দা ঠাসতে বসতেন আর চড়িয়ে দিতেন ছোলার ডাল। মোটা-মোটা কুটি আর ছোলার ডালই যে নরেনের পছন্দ এ কে না জানে।

‘মা, আমার জ্বর করে দাও।’ মঠে যেবার প্রথম দুর্গাপূজা হয়, লোকে লোকারণ্য, হাজার কাজের ঝুঁকি, হঠাৎ নরেন এসে বললে মাকে।

সঙ্গে-সঙ্গেই হাড় কাঁপিয়ে জ্বর এল নরেনের।

‘ওমা, এ কি হল ?’ শ্রীমা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। ‘এখন কি হবে ?’

‘কোনো ভয় নেই মা।’ বললে নরেন। ‘আমি সেখাে জ্বর নিলুম। ছেলেগুলো প্রাণপণ করে খাটছে, তবু কোথায় কি কুটি হবে আর আমি রেগে যাব,

বকব, চাইকি দুটো খাণ্ডাই বা দিয়ে বসব। তখন ওদেরও কষ্ট, আমারও কষ্ট। তাই ভাবলুম, কাজ কি, থাকি কিছুক্ষণ অরে বেহুঁ'স হয়ে।'

কাজকর্ম চুকে আসতেই মা বললেন, 'ও নরেন, এখন তা হলে ওঠ।'

'হ্যাঁ মা, এবার উঠি।' নরেন পাশ ফিরল।

'কই, উঠলেনা?'

'এই উঠে বসলুম।' সুস্থ হয়ে যেমন-তেমন উঠে বসল নরেন।

সেবার পূজার সঙ্কল্প মায়ের নামে হয়েছিল। নরেন বললে, 'আমরা তো কপনিধারী, আমাদের নামে হবেনা।' মায়ের হাত দিয়ে পঁচিশ টাকা প্রণামী দেওয়ায় ভদ্রধারককে। ছোদ্দশ টাকা খরচ করলে।

'সব সময়ে জপধ্যান করতে পারে কজন?' বলছেন শ্রীমা, 'মনটাকে বসিয়ে আলগা না দিয়ে কাজ করা টের ভালো। মন আলগা পেলেই যত গোল বাধায়। নরেন আমার ঐ সব দেখেই তো নিষ্কামকর্মের পন্থন করলে।'

নিষ্কাম কর্মযোগে ফলনাশের ভয় নেই যোহেতু ফলকামনাই নেই। - কাম্য-কর্মেই বিঘ্ন। নিষ্কামকর্ম বিঘ্নহীন। স্বল্পমপ্যস্ত ধর্মশ্র আয়তে মহতো ভয়াৎ। এর অল্প আচরণও সংসাররূপ মহৎ ভয় থেকে ত্রাণ করে। নিষ্কামকর্মে অখণ্ড চিন্তাশুদ্ধি। কর্তৃত্ববুদ্ধির নাশেই চিন্তাশুদ্ধি। কর্তৃত্ববুদ্ধিই বন্ধন। চিন্তাশুদ্ধিতেই চিরন্তন প্রসন্নতা। তাই ব্রাহ্মী স্থিতি।

'নরেন হল ঠাকুরের হাতের যন্ত্র।' বলছেন শ্রীমা, 'তিনি তাকে দিয়ে তাঁর কাজ করাবেন বলেই তাকে দিয়ে লেখাচ্ছেন, বলাচ্ছেন। নরেন যা লিখে যা বলছে, খুব সত্যি, কালে সব হবে।'

বেলুড়ে গঙ্গাতীরে নীলাশ্বর মুখুন্ডের বাড়িতে আছেন তখন শ্রীমা। পূর্ণিমার রাত। নদীর ঘাটে বসে অনিমেঘে তাকিয়ে আছেন জলের দিকে। হঠাৎ দেখতে পেলেন পিছনী থেকে কে এসে ঘাটের সিঁড়ি বেয়ে নামছে দ্রুত পায়ে। সর্বান্ত শিউরে উঠল শ্রীমার। একি? এ যে ঠাকুর।

গঙ্গায় নেমে গেলেন, ডুবে গেলেন, মিশে গেলেন শ্রীরামকৃষ্ণ।

আরো আছে বিশ্বয়। দেখতে পেলেন পাড়ে বহু লোকের জনতা হয়েছে। আর তাদের মধ্যে নরেন।

নরেন কি করছে? হু হাতে করে গঙ্গাজল নিয়ে সেই জনতার মধ্যে ছিটিয়ে দিচ্ছে। আর মুখে মন্ত্র বলছে ত্রীরামকৃষ্ণ। যার গায়েই সেই মন্ত্রপূত জল পড়ছে সেই পাচ্ছে সত্ত্ব মুক্তি।

ঠাকুরের দেহভ্যাগের পর কামারপুকুরে আছেন তখন ত্রীমা, মনে একটু বা ক্রোড, এখানে গঙ্গা নেই। নাই থাক, হেঁটেই চলে যাবেন কলকাতা, এমনি ভাবছেন মনে-মনে, হঠাৎ দেখতে পেলেন সামনের রাস্তা দিয়ে ঠাকুর চলেছেন। একা নয়, তাঁর পিছু-পিছু নরেন আর রাখাল আর বাবুরাম।

এ কি। রাস্তা কই? এ যে নদী! ঠাকুরের পাদপদ্ম থেকে অনর্গল জলশ্রোত বেরুচ্ছে, সে শ্রোত ঢেউ তুলে সবগে ছুটছে সামনে। পথঘাটের চিহ্ন নেই, শুধু জলতরঙ্গ।

‘দেখছি, ইনিই সব। এঁর পাদপদ্ম থেকেই গঙ্গা।’ উল্লাসে কথা কয়ে উঠলেন। রঘুবীরের ঘরের কাছ থেকে মুঠো মুঠো জ্বাকুল ছিঁড়ে এনে গঙ্গায় দিতে লাগলেন পুষ্পাঞ্জলি।

যেখানেই ত্রীরামকৃষ্ণ সেখানেই গঙ্গা, সেখানেই বারাণসী।

যখন আশার শেষ আলোটিও নিবে যাচ্ছে, ঠাকুর চলেছেন মহাযাত্রায়, ত্রীমা কাঁদতে লাগলেন। চোখ মেলে তাকালেন ঠাকুর। বললেন, ‘তোমার ভাবনা কি? তোমার নরেনই তো আছে। আমার যেমন করেছে তোমারও তেমনি করবে।’

মা যখন যাচ্ছেন রামেশ্বর, তখন রামনাদের রাজ্য লিখছেন তার কর্মচারীদের, ‘আমার গুরুর গুরু পরমগুরু যাচ্ছেন, ব্যবস্থার যেন এতটুকুও ত্রুটি না হয়।

রামেশ্বর তখন রামনাদের অধীন। রামনাদের রাজ্যের গুরু বিবেকানন্দ। আর বিবেকানন্দের গুরু ত্রীমা।

‘যার ঠাকুরকে বিশ্বাস নেই, মায়ের উপর ভক্তি নেই,’ ব্রহ্মানন্দকে লিখছে স্বামীজি : ‘তার ঘোড়ার ডিমও হবে না, শাদা বাঙলায় বললুম, মনে রেখো।’

মাত্রাজ থেকে হায়দ্রাবাদে এল স্বামীজি। হায়দ্রাবাদের নবাব খুরশিদ জা স্বামীজির ঈশ্বরব্যাখ্যায় মুগ্ধ হয়ে গেল। বললে, 'আমি আপনাকে এক হাজার টাকা দিচ্ছি আপনার বিদেশ যাত্রার সাহায্যে।

স্বামীজি হাসল। বললে, 'এখনো সময় হয়নি। এখনো পাইনি মার ছকুম।' গণ্যমান্ত কত লোকের সঙ্গে দেখা হচ্ছে রোজ, কত রাজা-রাজড়া, কত উচ্চ দাঁড়ের সরকারী কর্মচারী, কিন্তু এমন লোক তো কখনো দেখিনি। সে এক অদ্ভুত যোগী, অলৌকিক তার মনের ক্ষমতা। মন যা বলে তাই সে করে তুলতে পারে। ওঁ ডালে ফুল ফুটুক, ফুল ফুটে ওঠে। এ ভারি বস্তুটা নড়ে উঠুক, জিনিস অমনি নড়ে ওঠে। বৃষ্টি পড়ুক, অমনি বৃষ্টি পড়ে।

কিন্তু জ্বর ছাড়ুক বললেই জ্বর ছাড়ে কই? স্বামীজি যখন এল যোগীর কাছে, দেখল যোগী তীব্র জ্বরে শুয়ে আছে বিছানায়। নিজের জ্বর নামাতে পারেনা কেমন তোমার মনোবল?

তাবখানা এমনি, তোমার জন্তে বসে আছি।

স্বামীজি বলল তার শয্যাপাশে। যোগী স্বামীজির একখানা হাত টেনে নিয়ে রাখল নিজের মাথার উপর। ধীরে ধীরে তপ্ত জ্বর নেমে গেল শীতল হয়ে। কতদিনের রোগী উঠে বসল বিছানায়।

আমার মনের চেয়েও তোমার স্পর্শের শক্তি বেশি। আমি কী ছাই পারি, তুমি পারো লোহাকে কাঞ্চন করতে।

হায়দ্রাবাদেও টাকা তোলবার হিড়িক পড়ে গেল। চাঁদার দরকার কি, বেগম বাজারের মতিলাল শেঠ একাই দিয়ে দেবে সব টাকা।

স্বামীজি হাসল। বললে, ধনীর টাকা নেব না। যদি বিদেশে যাই ভারতের দরিদ্র সাধারণ মানুষের জন্তেই যাব। সুতরাং পাথের যদি তারা জুটিয়ে দেয় তবেই যাওয়া সম্ভব হবে। কিন্তু সর্বাত্মে মায়ের আদেশ।'

স্বপ্ন দেখলেন শ্রীম। দেখলেন উত্তাল সমুদ্র, তার ঢেউয়ের উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন ঠাকুর আর তাঁর পিছনে নরেন।

১ মায়ের সমস্ত ভয়-ভাবনা দূর হয়ে গেল। তুফুনি চিঠির উত্তর দিলেন স্বামীজির।
লিখলেন, মনে-প্রাণে আশীর্বাদ করছি, নির্ভয়ে চলে যাও বিদেশে।

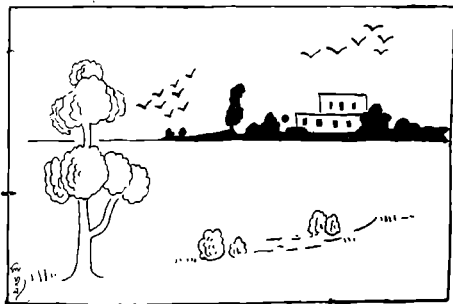
কি আশ্চর্য, অল্পরূপ স্বপ্ন দেখল স্বামীজি। টেউয়ের উপর দাঁড়িয়ে ঠাকুর
তাকে ডাকছেন। সেই ডাকে সেও চলেছে ঠাকুরের পিছে-পিছে।

ঘুম ভাঙবার পর দেখল মার চিঠি এসেছে।

মহাবীর যেমন রামনাম করে লাফ দিয়েছিল, আমিও তেমনি মা ও ঠাকুরের
নাম করে লাফ দিলাম।

আমি মায়ের ছেলে, আমাকে আর পায় কে।

(ক্রমশঃ)



দিনের শেষে

শিল্পী: শ্রীশঙ্কর চক্রবর্তী (আঁক)

পর্বত ও মূষিক

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

কেউ কেউ বলে, ভূতের গল্প ভালো নয়। কেন? ভূতের গল্পে নাকি থাকে ভূতের ভয় এবং ভয় ব্যাপারটা ভীতু ক'রে তোলে তোমাকে-আমাকে।

তাহলে বলি দাদা, মাহুঘের ভয় কি খালি একটা? রাত হলেই অন্ধকারের ভয়, শীত পড়লেই শনি-কাশির ভয়, বনভ্রমণে মারী ভয়, জলপথে ডুবে ঘাবার, খলপথে গাড়ী চাপা পড়বার ও মৃতপথে বিমান বিকল হবার ভয় এবং চূপ করে বাড়ীর ভিতরে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকলেও হঠাৎ বজ্রপাত বা ভূমিকম্পের ভয়। এ-সবার উপরেও আছে অগুপ্তি ভয়, সঠিক কর্তব্য নাথিক করা অসম্ভব। কোন্ দিক সামলাবে? ভয় আছে মাহুঘের হৃদয়ের পরতে পরতে গাঁথা, তাকে এড়াবার চেষ্টা বুধ। মারা পড়বার ভয়ে নৈমিত্তিক কি হচ্ছে ঘর না?

ভয়কে দমন করে সাহস। ঘর সাহস নেই, ভূতের গল্প না শুনেও সে হবে পয়লা, মৃত্যুর ভীতু।

কি বলছ? আমার আসল বক্তব্য কি? আরে ভায়া, ভূতের গল্পের বিরুদ্ধে তোমাদের নজিরগুলো শুনতে শুনতে অনেক দিন আগেকার একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল। ঘটনাটা ঘটেছিল আমার জীবনেই। আমি ভূত মানি না, কিন্তু সেই তর্যাবৎ ঘটনার আমার সমস্ত সাহস উপে গিয়েছিল।

ঘটনাটা শুনতে চাও? বেশ, শোনো তবে—

বাহারো বংশর আগেকার কথা, অর্থাৎ আমার বয়স তখন আঠারো।

প্রেমলাল জাতে ছিল স্বর্ণবণিক কি গন্ধবানক, ঠিক আমার মনে নেই। সে আমাদের পাড়ার কাছেই থাকত। তার সঙ্গে কিছুদিন পর্বত আমার বেশ সহরম-বহরম ছিল, কিন্তু তারপর সে কোথায় হারিয়ে গেল এবং এখনো ইহলোকে টিকে আছে কিনা, এদব খবর আমার জানা নেই।

যখন এই প্রেমলালের বিয়ে হয়ে গেল সাতেরো বছর বয়সে তখন আমরা কেউই অবাক হলুম না। সে সময়ে কেনন কোন জাতের ছেলেরে খুব অল্প বয়সেই বিবাহ হয়ে যেত। হেয়ার স্কুলে এক স্বর্ণবণিকদের ছেলে আমার সহপাঠী ছিল, সে যখন পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ে, তখনই এক সন্তানের পিতা!

কিন্তু ও-সর কথা থাক। প্রেমলালের অকালবিবাহের কথাটাও এখানে উপলক্ষ মাত্র, তন্মু উল্লেখ করবার কারণ, সেই হজ্রেই পূর্বোক্ত তর্যাবৎ ঘটনাটার উৎপত্তি।

প্রেমলালের বিবাহের জের শহরেই মিটল না, উৎসবটা ভালো করে সমিয়ে তোলাবার জন্যে তার বাবা ও মা ছেলে আর নতুন বউ নিয়ে কিছু দিনের জন্যে যেনে বসে গেলেন।

প্রেমলাল আমাকেও নিয়ন্ত্রণ করে বললে, "চলুন, দিন-তিনেক পাড়ারগারে ঘুরে আসি, মন লাগবে না!" আমিও রাজী হয়ে পেশুর।

প্রেমলালদের বেশ কলকাতার কাছেই। ছোট গ্রাম, এতদিন পরে তার নাম আমার মনে পড়ছে না।

সেখানে গিয়ে আমি পড়লুম কিন্তু বিশেষ। বসে সব অচেনা লোকের ভিড় এবং বিরক্তিকর শব্দ! তার উপরে সেকালে গ্রামা মুখড়াকার চোটে প্রথম দিনেই প্রাণ আমার আইচাই করতে লাগল। রাত্রে ঘুমের দশা প্রায় রক্তা হবার ব্যাপার।

প্রেমলাল চালাক ছেলে, সকালে দেখা হতেই বললে, "ভাই, তোমার মুখ দেখেই পেটের কথা বুঝতে পারছি। তোমার কষ্ট হচ্ছে, নয়? তা ভূই এক কান্ন কবু। মুখেরের বাগানবাড়ীতে থাকবি?"

— "সে আমার কোথায়?"

— "গায়ের পেয়ে, মাঠের ধারে। ভূই কবি মাছুব, তোমার ভালো লাগবে।" (তখন থেকেই আমি গম্ভীর-গম্ভীর হাতবন্ধ হুক করেছি এবং ছোট ছোট মানিকপত্রে আমার দুই-একটি সেগা বেরিয়ে গিয়েছে।)

আমি ইতস্ততঃ করে বললুম, "কিন্তু মুখেরের তো আমি চিনি না!"

প্রেমলাল বললে, "ভাড়া এখানে নেই। বাগানখানা আমাদেরই হিম্মত আছে।"

সত্যসত্যই বাগানখানার পারিপার্শ্বিক দৃশ্য আমার ভালো লাগল। পশ্চিমে ও দক্ষিণে ধুধু মাঠ। পূর্বদিকে গ্রাম এবং উত্তর দিকে কলাইবাড়ি ক্ষেতের কোলে একটি কিস্মিলে ঝিল। ঘেরীপাহের বেড়া দিয়ে ঘেরা বাগানের ভিতরে নানান ফলফুলের গাছ ও কাণায় কাণায় মল-ভরা পুকুর এবং একখানি ছোট একতলা বাড়ী। আর এক প্রান্তে মালীর জন্যে আর একখানা মেটে ঘর। চারিদিক নির্জন ও নিরিবিধি। গ্রাম্য হাটগোল থেকে মুক্তি পেয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম।

সন্ধ্যার পর খাবারখাবার এল বিয়ে বাড়ী থেকে এবং একখানি দক্ষিণেখোলা ঘরে তক্তাপোষের উপরে বিছানো হ'ল আমার বিছানা। কিন্তু সকাল সকাল শুয়ে পড়তে ইচ্ছা হ'ল না। প্রতিপদের চাঁদের আলোতে তেপান্তরের মাঠ হয়ে উঠেছিল বগলোকের মত, আমার শহরে দৃষ্টিকে তা আকৃষ্ট করে রাখলে অনেকক্ষণ ধরে। গানের পাবীরাও কানে করছিল মধুরুটি।

ঘরের কোলে বারান্দায় বসে এই সব দেখতে দেখতে ও ভাবতে ভাবতে যেন একটু তন্দ্রার আবেশ এসেছিল, কিন্তু চট্টকা ভেঙে গেল শেরালদের হুকাওয়া চাঁৎকারে! চাঁদ তখন বাড়ীর ছাদের

আড়ালে সরে গিয়েছে দেখে তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে দরজায় বিল দিয়ে শুয়ে পড়লুম। জানলা দিয়ে আসছিল মগনে বাতাসের মেঠো উজ্জ্বল। ঘুমিয়ে পড়তে মেরি লাগল না।

আমার ঘুম বরাবরই লজাগ। কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলুম জানিনা, আচম্বিতে অজানা কারণে ঘুম গেল ছুটে। বিছানার উঠে বসে কারপটা অস্থাবন ভরবার চেষ্টা করলুম।

ঝাঁঝ। হাতে ঝিঝিপোকাতুলো খালি ঝিঝি করছে। পানের পাখীদের জলসা বন্ধ হয়েছে। বাতাসও আর গাছে গাছে সবুজ পাতার বীণা বাজাচ্ছে না।

কিন্তু একটা শব্দ—সম্বেহজনক শব্দ শোনা যায়। থু থু থু থু থু থু! বারান্দার উপরে কে পাথচাঁচি করছে!

অবাক হয়ে ভাবতে লাগলুম। চোর-টোর নয়, চোর পায়ের শব্দে গৃহস্থকে জাগায় না। কোন জন্তুর পায়ের শব্দ ব'লেও মনে হয় না। কিন্তু আজ-পাড়াগাঁয়ে এই নিশ্চিন্তিতে মেঠো বাড়ীর বারান্দায় বেড়াবার শব্দ হ'ল কার?

আবার শব্দ—থু থু থু থু থু থু! তারপর খানিকক্ষণ সব চুপচাপ!

একবার উঠে দেখতে হ'ল তো। তখনও কুতের কথা একবারও আমার মনে জাগে নি। ছেলেবেলা থেকেই কুতের গল্প পড়তে ভালোবাসি, কিন্তু কুতের ভয় আমার ছিল না।

জানলা দিয়ে উকি মারলুম। চাঁদ দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু ধূঁ মাঠ জ্যোৎস্নার ব্যবধ করছে। মাথা-তাকা বারান্দায় রয়েছে আলোমাথা ছায়া কিংবা ছায়ামাথা আলো—সব দেখা যায় কিন্তু স্পষ্ট বোঝা যায় না।

আচম্কা আমার বুকটা ধড়াস্ ক'রে উঠল! সেই আবছায়ায় আমার দিকে পিছন ফিরে দ্বির হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে বেন কাগি জমিয়ে তৈরি একটা অতি-শীর্ণ ককালসার নারীমূর্তি! এটুকু আন্দাজ করা গেল, তার দেহের উপরার্ধ নয় এবং মাথার জটপাকানো চুলগুলো সর্পশিশুদের মত কাঁধের উপরে খুলছে!

মতাই আমার গারে জাগল রোমাঞ্চ! যে সব মিলিথ-প্রতিনিয়ী কথা শোনা যায়, এ কি তাদেরই কেউ? তবু ভয়ে ভয়ে গলা তুলে জিজ্ঞাসা করলুম, “কে? কে শুনানে?”

তৎক্ষণাৎ এমন বিদ্যুৎবেগে সেই প্রান্তরস্থির মূর্তিটা ফিরে দাঁড়াল যে আমি সচমকে শিঁছু হঠে জানলার কাছ থেকে সরে এলুম।

মূর্তিটা আবার মুহূর্তকাল দ্বিরভাবে দাঁড়িয়ে রইল। লক্ষ্য করলুম যে আমার দিকেই তাকিয়ে আছে। মনে হ'ল, অন্ধকারের ভিতর থেকে ছুটো স্মৃতি চক্ষু খেন জল-জল ক'রে জলছে! যদিও আমি বহুবার ঘরের মধ্যে আছি, তবু নিজেকে কি অসহায়ই বোধ হ'তে লাগল! বাইরে যে-



“তৎক্ষণাৎ এমন বিদ্রোহবশে সেই প্রস্তরখির মূর্তিটা ভিঙে
পাঁড়াল যে আনি সন্মতক পিছু ধেঁটে জানলার
কাছ থেকে সরে এগুম।”

মালীর কথায় সমস্ত রহস্য পরিষ্কার হয়ে গেল। পর্বতের মূখিক প্রসব!

এই গীরেরই এক বাগ্মী জ্ঞাতের পাগলী ঘুরে বেড়ায় হাটে-বাটে-ঘাটে এবং রাজ্যে হাঝে হাঝে
বাগানের বেড় শেরিরে বারান্দায় উঠে শুয়ে থাকে।

গল্পটি শুনে তোমরা! হয়তো! বলবে, “বন্ধুরন্তে লক্ষ্যক্রিয়া!” কিন্তু এ গল্পের ‘মর্যাল’ হচ্ছে, কৃত

—নেই বললেই তর যায় না! আমার অবস্থার পড়লে তোমরা কি করতে, সেইটে একবার

—ভেবে দেখ।



প্রেমেন্দ্র মিত্র

প্রেমেন্দ্র মিত্র

শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায়



কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র সর্বজনপ্রিয়। এই বছর আকাদেমী পুরস্কার আর রবীন্দ্র-পুরস্কার দুই-ই তাঁর 'দাগর থেকে ফেরা' কাব্যগ্রন্থকে উপলব্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এতে সবাই খুশী হয়েছেন। যোগ্য ব্যক্তির গলায় বিজয়মালা এসে পড়েছে।

প্রেমেন্দ্র মিত্র বর্তমান কালের বাংলা-সাহিত্যে বীণের স্থান সর্বোচ্চ শিখরে তাঁদের অন্ততম। দীর্ঘ দিন অক্লান্ত সাহিত্যসাধনায় তিনি বাংলা-সাহিত্যকে পুষ্ট করেছেন তাই এই সম্মাননা, এই স্বীকৃতি।

এই লেখকের পরিচয় দিতে গিয়ে একমুহুর্ত লিখেছেন—

"যারা স্থির-মৌন, পরাভূত মধ্যাহ্নের আভা বীণের আকৃতি-প্রকৃতিতে অটুট থাকে, বারোঘণ্টে কৃত্রিম কৃষ্ণকেশেও বীণের স্তম্ভতার রেখাপাত হয় না, তাঁরা নিঃসন্দেহে ভাগ্যবান। নবীন ও প্রবীণের বন্ধু, অজ্ঞাতশত্রু প্রেমেন্দ্র মিত্র সেই ভাগ্যবানদেরই অন্ততম। নাতিদীর্ঘ, নাতিদুর্লব এই রাহুঘটির নিরহংকার মনের গভীরে কোথাও আত্মসম্মানের আবিলভা নেই। ছোট-বড় নিবিশেষে প্রত্যেক সাহিত্যসেবী তাঁর প্রিয়জন, প্রাণের পাশ।"

এই কয়েকটি কথাই মধোই প্রেমেন্দ্র মিত্রের আকৃতি ও প্রকৃতির নিখুঁত রেখাচিত্র ফুটে উঠেছে। সত্যিই রাহুঘটি এই বকম; যারা তাঁর কাছেই লোক তাঁরা এটা ভালোভাবেই জানেন। আর সত্যিই তিনি অজ্ঞাতশত্রু, তাঁর কোনো শত্রু নেই।

যদিও গল্প ও উপন্যাস লেখক হিসাবে প্রেমেন্দ্র মিত্রের খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা বড়ো কম নয়, তবু একথা বলা যায় রাহুঘটির মধো কবিতাই প্রবল। অতি অল্প বয়স থেকেই তাঁর মধো এই স্তম্ভ দেখা যায়। ছোটবেলা থেকে নানা রেশে ঘুরেছেন তিনি, জয়গ্রহণ করেছেন কাশ্মীরে ১৯০৪ সালে, লেখাপড়া শিখেছেন কলকাতায় আর ঢাকায়। স্বীকার কর্তব্য অসংখ্য গল্পের সম্পাদনা;

বই তো পড়া টাই পড়া কি ?

বই তো কাটি ছড়া।

বই পড়া সব মিছেই যদি

না হল টাই পড়া।

টাই পড়া আর পড়তে কোথায় ?

কল্মষ হবে শোনে।

বই-এর মাঝে লুক্কির থাকে

টাই সে কোনো কোনো।

আর পাশে টাই লকাল বেলা

বই থেকে মুখ তুলে,

হঠাৎ যদি বাইরে চলে

হলো ওই ছলে।

থেকে হুক করে ঘুলের শিক্ষকতা এবং ওয়ূবের বিজ্ঞানও লিখেছেন। ছাত্রাছাত্রীর পরিচালক ও প্রবোধক হিসাবেও তাঁর ব্যাতি কিছু কম নয়। কিন্তু এসব কিছুই পিছনে রয়েছে তাঁর কবি-মন। সেই 'চকল, হুঁবের পিরাগী' মন তাঁকে বার বার এক বসন্ত থেকে অন্য বসন্তে নিয়ে চলেছে; সেই অশান্ত মন বলছে— "হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোনও থানে।"

কিন্তু এই নাটিক-মন নিয়ে কবি বহু অনাবিষ্কৃত অংশ আবিষ্কার করেছেন। তাঁর গল্পে-উপন্যাসে আছে অজানা রাজ্যের বিশ্ব—পরিচিতির বিচিত্র প্রকাশ।

প্রেমেন্দ্র মিত্র ছোটগল্পে সন্তোষ লিখেছেন প্রচুর। তাঁর 'ঘনামার গল্প' এক বিশ্বকর প্রকাশ। সম্ভ্রান্তি এ বইখানিও ভারত সরকারের পুরস্কার পেয়েছে। কিন্তু ছোটগল্পে সন্তোষ কিছুই না লিখে, তিনি যদি শুধু মাত্র "পরীরা আর আসে না কেন?" এবং "ব্রহ্মনশন ক্রমো মেয়ে ছিলেন" এই দুটি গল্প লিখেই বলে থাকতেন, তা'হলেও তিনি সাহিত্যিক অমরতলাত করতেন। বাংলাদেশের শিশু-সাহিত্যে এই জাতীয় গল্প আর কেউ লিখেছেন বলে জানা নেই। "ব্রহ্মশাল" নামক শিশু-মাসিকের সম্পাদক হিসাবেও প্রেমেন্দ্র মিত্র অনেক মূল্যবান রচনা লিখেছেন, এবং অনেক সাহিত্যিককে নতুন চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ করেছেন। প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছড়াও অপূর্ব। তাঁর বিখ্যাত ছড়া "বই টাই"-এর কিছুটা স্বাদ উপরে দেয়া অংশ থেকে তোমরা অহতভ করতে পারবে।

বাংলা শিশু-সাহিত্যে Science fiction-এর তিনিই সর্বপ্রথম লেখক। তাঁর "ব্রহ্মনশনের বীণ" নাম থেকে অন্ততঃ বোলো-সন্তের বছর আগেকার রচনা। তাঁর ছোটগল্পের স্তম্ভ দেখা গল্পগুলি বড়োদের কাছেও সমান প্রিয়।

আমাদের যেনে শুধু সাহিত্যকে অবলম্বন করে চলে না, তাই সাহিত্যিককে সাহিত্যকাৰ্য ছাড়া অন্য কর্মও করতে হয়, কলে অনেক

মূল্যবান সময় বৃথা নষ্ট হয়। প্রেমেন্দ্র মিত্রের জীবনের অনেকখানি সময় নানা বিচিত্র কাজে এই ভাবে ব্যয়িত হয়েছে, তাই তাঁর রচনার

প্রেমেন্দ্র মিত্রের • ছোটগল্পের বই •

ঘনামার গল্প

পাঁচ পুরাণ

ভয়ভয়

কড়ের কালো ঘেঁষ

পাতালে পাঁচ বছর

পৃথিবী ছাড়িয়ে

মহানগরের বীণ

ড্রাগনের নিশাস

কবীর কবীর (ছড়া)

জুজুয়ের বীণ

জোনাকীরা (ছড়া)

প্রেমেন্দ্র মিত্রের সেরা গল্প

পড়তে বজা (ছড়া)

আজগুবি জানোয়ার

সাগর রহস্য

* শেষের ছাণ্ডালি বুঝেব বহর
সঙ্গে একত্রে লেখা।

পরিমাণ অনেক কম, কিন্তু পরিমাণে কম হলেও বৈচিত্র্য অনেক বেশী। দ্বন্দ্ববাহিনীক অভিযাত্রীও নতো তিনি পথের সন্ধান ঘুরছেন আরও। আজও বহু অনাবিষ্কৃত অগম্য তাকে আবিষ্কার করতে হবে, নতুন পথ রচনা করতে হবে উত্তরকালের অনাগত কবি ও সাহিত্যিকের জন্য।

যেদিন প্রেমেন্দ্র মিত্র “কল্লোল” পত্রিকা গোপীর সঙ্গে যোগদান করেছিলেন, সেদিনও তাঁর কৈশোর অভিক্রান্ত হয়নি। “কল্লোলের” দিনগুলি তাঁর সাহিত্যকে স্ফূর্ত করছে, নতুন মানসিকতার উদ্ভূত করেছে। “কল্লোল” যুগের ধারা কৃতী সাহিত্যিক প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁদেরই অন্তর্ভুক্ত। “কল্লোল” অনেক নতুন কাজ করেছিল; নতুন ধারার কবিতা ও গল্প লেখা “কল্লোলের” লেখকদের ছিল বৈশিষ্ট্য; এ ছাড়া তাঁরাই উজ্জ্বল হয়ে বাংলা-সাহিত্যের সঙ্গে বিশ্ব-সাহিত্যের সংযোগ স্থাপন করেছিলেন। বলা, হামহুন, পোকী, বোরার, হাউপটম্যান, ইবসেন, বার্নার্ড শ প্রভৃতি বিখ্যাত বিদেশী লেখকদের রচনা এরাই বাংলাভাষায় রূপান্তরিত করে এদেশের পাঠিত্য-পাঠকের কাছে পরিচিত করেছিলেন, এবং পড়তে আগ্রহ বাড়িয়েছিলেন। প্রেমেন্দ্র মিত্র অর্ধ বার্নার্ড শ-র অনেকগুলি নাটক বাংলায় অনুবাদ করেছেন।

তাঁর বড়দের কবিতার মাধুর্য ও রস আরো একটু বয়স বাড়লে “মৌচাকের” চাহক-গ্রাহিকা তোমরা নিশ্চয়ই উপভোগ করতে পারবে। “মৌচাকের” গত অগ্রহায়ণ সংখ্যার শিবরাম চক্রবর্তী লিখেছেন—“বাংলা-সাহিত্যে গদ্য-কবিতার প্রথম প্রবর্তন করেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। তাঁর গদ্য তোমরা পড়েছ, কিন্তু কবিতা হয়ত পড়োনি। ইনি আমাদের দেশের একজন শ্রেষ্ঠ কবি, রবীন্দ্রনাথ যেমন আধুনিক কাব্যযুগের সূচনা, প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতায় তেমনি অতি আধুনিক যুগের আরম্ভ।” কথাটি ঠিক। কবিতার বন্ধনমুক্তি ঘটেছে প্রেমেন্দ্র মিত্রের হাতে। মিলের বালাই না থাকলেও ছন্দের এতটুকু কটা নেই, এ আর এক বিষয়।

আকৃতি ও প্রকৃতিতে রাহুণটির মধ্যে যেমন পরিণত বয়সের ছাপ নেই, তাঁর রচনার তেমনই এখনও পরিণত বয়সের ক্লাস্তিকর অবশ্যের চিহ্ন নেই। নিত্য নূতন ধারা প্রবর্তনে তিনি ব্যস্ত, এই তাঁর বৈশিষ্ট্য।

রোগ পালাল কিল-চড়ে

পরিমল রায়

ব্যস্ত হয়ে ছেলে নিয়ে চেয়ে গেল শিলচরে,

রোগটা কোথায় বাবে সেয়ে,

উণ্টে দেটা গেল বেড়ে

শেষকালে সে রোগ পালাল কিল-চড়ে।

বৈশাখী ভাবনা

ত্রিগোপাল ভৌমিক

বছরে প্রথম মাস নাম বৈশাখ
কাজে বড় না হলেও আছে হাঁকডাক ।
স্মরণ না ক'রে তাকে আছে কি উপায়
গরমে যখন প্রাণ করে যায় যায় ।
পাড়াগাঁয়ে যারা থাকে তারা হয়তো বা
আম জাম কাঁঠালের কথা ভেবে বোবা
হয়ে গিয়ে বৈশাখে করে আহ্বান—
কালবোশেখীর ঝড়ে খোঁজে নবপ্রাণ ।
কলকাতা নগরীতে ক'রে বসবাস
আমরা নীরবে শুধু করি হাঁসফাঁস ।
চৈত্রেয় শুরুতেই যে গরম আসে
বৈশাখে তাই মন ভ'রে তোলে ত্রাসে !
গাছ-লতা-ঘাসহীন মহানগরীতে
আগুন ছড়ায় গাড়ি ট্রাক ও লরীতে ।
আম জাম কাঁঠালের কথা ভুলে তাই
দিন রাত হাই তুলি, করি আইচাই ।
সাম্বনা তবু এই বৈশাখ এলে
ধারাসারে বাটির আশ্বাস মেলে ;
আর এক বছরের থুলে যায় দ্বার
কল্পনা সীমাহীন ক্ষীণে কারবার ।
ময়দানে জমে ওঠে ফুটবল খেলা
হইচই ক'রে কাটে বৈকাল বেলা ।
রাস্তিরে দরদর গায়ে ঝরে ঘাম ।
স্বপ্নেই টুপটাপ পড়ে আম জাম ।



টিপলু বাবু

দুধ সাধনান ! টিপলু বাবুর হাতে এখন কলমু।
কি না পারেন লিখতে ক'রে টাঙা এক পুরম।
কাটতে পারেন মিষ্টি চুড়া নবীর মত নুরম,
বোঁচাও লিখতে পারেন এমন সাম্মাও নেই মলম !

—প্রোমোদ্র মিত্র



(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

৩

ঘোড়সোয়ারের দল সদাশিবের গাছের পাশ দিয়ে যখন যাচ্ছে তখন একজন সোয়ার হাত তুলে বলল,—‘দাঁড়াও !’

সকলে দাঁড়াল। সোয়ার বলল,—‘নদীর কাছে শুটা কী জানোয়ার ?’

আর একজন বলে উঠল,—‘জয় শুবানী ! ঘোড়া ! এখানে ঘোড়া এল কোথেকে ?’

আর একজন বলল,—‘ঘোড়া ! কোথেকে এল জানবার দরকার নেই। ধবে নিয়ে এসে ঘোড়াটাকে। আমাদের দরকার !’

দু’জন সোয়ার ঘোড়া থেকে নেমে নদীর দিকে গেল।

সদাশিব গাছের ওপর থেকে সব দেখতে পাচ্ছিল। এরা যে মারাঠা হিন্দু তা এদের কথা শুনেই বোঝা যায়। হয়তো যে ডাকাতের দল বিজাপুরীদের ধাক্কা লুট করেছে এরা তারা। কিন্তু—এরা যদি সদাশিবের ঘোড়া নিয়ে চলে যায় তাহলে তো তারি বিপদ ! সদাশিব তাহলে শিবাঙ্গীর কাছে যাবে কি করে !

সদাশিব গাছের ওপর আর স্থির থাকতে পারল না। হোক ডাকাতের দল, তাই বলে তার ঘোড়া নিয়ে যাবে। সে গাছ থেকে নেমে এল।

ঘোড় সোয়ারের দল হঠাৎ গাছ থেকে একটা লোক নেমে আসছে দেখে অবাক হয়ে গেল—
‘আরে ! এ আবার কে ?’

একজন বলয় বাগিয়ে বলল,—‘কে যে তুই?’

সদাশিব মোটেই ভয় পেলনা, বলল,—‘আমি তোমাদের সর্দারের সঙ্গে কথা বলতে চাই।’

সোমারেরা সর্দারকে দেখিয়ে দিল; সদাশিব সর্দারের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। সর্দারের বয়স বেশী নয়, বড় জোড় কুড়ি একুশ। সর্দার ঘোড়ার পিঠে বসে আছে, দুই হাতে একজন আহত লোককে সামনে ধরে আছে। সর্দার কোলের লোকটিকে বলছে,—‘বেশা, তোমার কষ্ট হচ্ছে না?’

আহত ব্যক্তি বলছে,—‘কিছু কষ্ট হচ্ছে না। তুমি আমাকে ঘোড়ার পিঠে বসিয়ে দাও, আমি ঠিক যেতে পারব।’

এই সময় ছ’জন সোমার সদাশিবের ঘোড়াটাকে এনে সর্দারের সামনে হাজির করল। তারা ঘোড়ার হামল-নড়ি খুলে যুগে লাগাম লাগিয়েছে। সর্দার চোখ তুলল। প্রথমেই সদাশিবের ওপর তার নজর পড়ল। সর্দার বলল,—‘তুমি কে?’

‘আমার নাম সদাশিব। তোমরা আমার ঘোড়া ধরেছ কেন?’

সর্দার বলল,—‘ঘোড়ার মালিক তুমি? তোমার বাড়ী কোথায়?’

‘আমার বাড়ী ভোজরপুরে।’

‘ভোজরপুরে। সে তো এখান থেকে অনেক দূর। তুমি গ্রাম থেকে এত দূরে এলে কি করে?’

‘অমি শিবাজির সঙ্গে সেবা করতে যাচ্ছি।’

সর্দার কিছুক্ষণ সন্নিগ্ধভাবে সদাশিবের পানে চেয়ে রইল—‘তাই নাকি? শিবাজীর সঙ্গে তোমার কি দরকার?’

‘আমি শিবাজীর অধীনে যুদ্ধ করব।’

সর্দার এবার হাসল, বলল,—‘তা বেশ। আমরাও শিবাজীর দলের লোক। তুমি আমাদের সঙ্গেই এস না।’

‘যেতে পারি। কিন্তু আমার ঘোড়া?’

‘তোমার ঘোড়াটা আমাদের একটু দরকার আছে। সেখতে পাছ আমাদের দলের একজন জখম হয়েছে, ওর ঘোড়াটা মরে গেছে। তাই ওকে কোলে করে নিয়ে যাচ্ছি। তোমার ঘোড়াটা পেলে ওকে তার পিঠে বসিয়ে দেব। কেমন, দেবে তোমার ঘোড়া। গড়ে পৌঁছে তুমি তোমার ঘোড়া আবার কেবল পাবে।’

সর্দারের কথা বলবার ভঙ্গী এত মিষ্টি যে ‘না’ বলা যায় না। সদাশিব রাজি হ’ল, বলল,—‘কিন্তু আমি যাব কি করে?’

সর্দার বলল,—‘তোমাকে আমি নিজের ঘোড়ার তুলে নেব। আমার ঘোড়াটা মজবুৎ আছে, ছ’ঘনের ভার বইতে পারবে।’

তখন কয়েকজন শোরায় ধরাধরি করে আহত লোকটিকে সর্দারের ঘোড়া থেকে নামিয়ে সদাশিবের ঘোড়ার পিঠে বসিয়ে দিল। সদাশিব সর্দারের পিছনে ঘোড়ার পিঠে বসল। ঘোড়া-সোয়ারের দল আবার আশ্বে আশ্বে চলতে আরম্ভ করল।

চলতে চলতে সদাশিব লক্ষ্য করল, সর্দার ছাড়া অন্য সব সোয়ারের ঘোড়ার দু’পাশ থেকে লম্বা লম্বা ছালা ঝুলছে, যেখানেই বোঝা বায় ছালার ভিতর ভারী মাল আছে। সদাশিবের মনে আর সন্দেহ হইল না যে এরাই বিজাপুরীদের খাজনা লুট করেছে। সঙ্গে একজন আহত লোক রয়েছে; সবই হিলে যাচ্ছে।

সোয়ারের দল আবছায়া জ্যোৎস্নায় উপত্যকার ভিতর দিয়ে লম্বালম্বি চলল। সদাশিব দেখল এরা শাহাড়ের পিঠ বেয়ে বেশী উঠছে না; এক উপত্যকা থেকে অন্য উপত্যকায় বাবার গুপ্তপথ কোথায় আছে এরা সব অন্ধিদৃষ্টি জানে। সেই সব পোজা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে।

চলতে চলতে সর্দারের সঙ্গে সদাশিবের দু’চারটে কথা হল। সর্দার প্রশ্ন করল,—‘তুমি গ্রাম থেকে চলে এলে কেন?’

সদাশিব দরলভাবে বলল,—‘স্বামা তাড়িয়ে দিয়েছে।’ তারপর গ্রামের অবস্থা বর্ণনা করল।

তখন সর্দার বলল,—‘মারাঠা দেশে সর্বত্র এই অবস্থা। মোগলদের তাড়াতে না পারলে দেশের অবস্থা কিরবে না।’

সদাশিব প্রশ্ন করল,—‘তোমরা এত রাত্রে কোথায় গিয়েছিলে?’

সর্দার বলল,—‘তুমি যখন শিবাজীর দলে যোগ দিতে যাচ্ছ তখন তোমাকে বলতে দোষ নেই। আমরা বিজাপুরীদের খাজনা লুটতে গিয়েছিলাম।’

কিছুক্ষণ কোনও কথা হল না। সদাশিবের কোমরে যে লুটের মোহর বাঁধা আছে তা সে বলল না। সর্দারকে বলে কি হবে? বলতে হয় একেবারে শিবাজীকে বলবে।

সদাশিব এবার প্রশ্ন করল,—‘তোমরা এখন কোথায় যাচ্ছ?’

সর্দার বলল,—‘আমরা তোরগী দুর্গে যাচ্ছি।’

‘কিন্তু শিবাজী তো পুণায় থাকেন!’

‘এখন তোরগী দুর্গে আছেন।’

‘তোরগী দুর্গ কি শিবাজীর?’

‘কিছুদিন আগে বিজাপুরীদের ছিল, এখন শিবাজীর।’

‘শিবাজী ভাবি বীর—না?’

‘শিবাজীর দলে সবাই বীর। তুমি শিবাজীর দলে যোগ দিতে যাচ্ছ, তোমাকেও বীর হতে হবে।’

সদাশিব হারাঠা ছেলে, তার শরীরে ভল্ল-ভল্ল নেই; সে সহজভাবে বলল,—‘হব।’

ওরা যখন ভোগী দুর্গে গিয়ে পৌঁছল তখন পূর্বের আকাশ লাল হয়ে উঠেছে। উঁচু টিলার ওপর দুর্গ, লোহার দরজা। দু’জন সোঁদার বল্লমের কুঁদো দিয়ে দরজায় ঘা মিল—‘হর হর মহাদেও!’ অমনি দরজা খুলে গেল। সকলে দুর্গে প্রবেশ করল।

প্রথমেই আহত লোকটাকে ঘোড়া থেকে নামিয়ে সর্গার এবং আরও কয়েকজন দুর্গের লোক ঘরের ভিতরে নিয়ে গেল। দুর্গের অন্তর ঘিরে ঘরের সারি; মাহুঘ খাঁকার ঘর, রাজাঘর, আন্তাবল সব আছে। সোঁদারেরা ঘোড়া থেকে নেমে ঘোড়ার রাশ ধরে আন্তাবলে নিয়ে গেল। সদাশিব একলা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল। দুর্গে আরও অনেক লোক আছে, হুঁচার জন স্ত্রীলোকও আছে। সকলেই কাজে ব্যস্ত, কেউ হুঁচা থেকে জল তুলছে, কেউ কাঠ কাটছে, কেউ তলোয়ারে শানদাঁছে, কেউ ঘোড়া দলাইয়লাই করছে; যেহেতু এক জায়গায় বসে জাঁতা ঘুরিখে জোয়ার-বাল্লির পিষছে। সকলেই কাজ করছে।

যে সোঁদারেরা ভাঁকাতি করতে গিয়েছিল তারা এবার আন্তাবল থেকে বেরিয়ে এল। প্রত্যেকের কাঁখে ছুটি করে ছালা। তারা ছালাগুলিকে অঙ্গনের মাঝখানে জমা করল। তারপর একজন বয়স্ক কর্মচারী ঘর থেকে বেরিয়ে এগেল। ইনি বোধহয় শিবাজীর খাজাঞ্চি। বড় বড় পাকা গৌর, পাকা গালপাট্টা; মাথায় নাক তোলা পাগড়ী-চুপী। ইনি এগে ছালা উজাড় করে পাথরের মেঝের ওপর টাকা ঢাললেন। শুপাকার রূপার টাকা। সকালে টাকাকে হোন বলত; এক হোন চার টাকার সমান।

খাজাঞ্চি গুণে গুণে হোন দু’ভাগ করলেন। সকলে ঘিরে দেখতে লাগল আর নিজেরের মধ্যে রক-তামাসা করতে লাগল। সদাশিব একটু দূরে দাঁড়িয়ে দেখল।

টাকা দু’ভাগ করে খাজাঞ্চি প্রথমে এক ভাগ ধামার ভরে ভোঁশাধানায় রেখে এলো। ওটা শিবাজীর অংশ। তারপর বাকি দ্বারা সঙ্গে ছিল তাদের ভাগ বাটোয়ারা হুক হল। চল্লিশ জন জোয়ারন লুট করতে গিয়েছিল, টাকা সমান চল্লিশ ভাগ হল। প্রত্যেকের ভাগে পড়ল একশো আশী হোন। সবাই নিজের নিজের ভাগ নিয়ে চলে গেল।

সদাশিব চমৎকৃত হয়ে দেখছিল।
কী সম্ভার এদের জীবন! দলে যোগ
সেবার জন্তে তার প্রাণটা ছুটুকুট করে
লাগল।

এই সময় একজন বলমণারী রক্ষী
এসে বলল,—‘তোমার নাম সদাশিব?
এসো, শিবাজী তোমার সঙ্গে দেখা
করবেন।’

সদাশিব সঙ্গে সবে চলল। না
জানি শিবাজী কেমন লোক! তিনি কি
আমাকে নেবেন? যদি বলেন, তোমার
বয়স কম, তুমি যুদ্ধ করতে পারবে না?’

একটি বড় ঘড়; পাথরের মেঝে,
পাথরের দেয়ান; সব সজ্জা দুটি জানালা
দিয়ে দুর্গের বাইরে দেখা যায়। শিবাজী
ঘরের মাঝখানে ঠাঁড়িয়ে আছেন। হেসে বলেন,—‘এদ সদাশিব।’

সদাশিব হাঁ করে চেয়ে রইল। যে সর্দারের সঙ্গে সে এক ঘোড়ায় চড়ে এসেছে, সেই
শিবাজী! এত কম বয়স! এই বয়সে সমস্ত সেনা সাড়া জাগিয়ে তুলেছে! সে অবাক হয়ে বলল,—
‘তুমি শিবাজী?’

শিবাজী বললেন,—‘তুমি ভারি আশ্চর্য হয়ে গেছ দেখছি।—হাঁ, আমিই শিবাজী।’

সদাশিব বলল,—‘তুমি নিজে গিয়েছিলে লুট করতে?’

‘হাঁ। নিজের কাছ আমি নিজেই করি।’

‘তুমি, একজন আহত লোককে কোলে করে আনছিলে।’

‘ও আমার বাল্যবন্ধু বেসাজি কক। ও যদি জখম না হোত তাহলে ছুটো গাড়ীই লুট করতে
পারতাম। কিন্তু সে থাক। ‘তোমার বয়স কত?’

সদাশিব বলল,—‘সত্তেরো কি আঠারো।’

শিবাজী বললেন,—‘বেশ, যুদ্ধ করবার বয়স হয়েছে। কিন্তু তোমার হাতিকার কৈ?
হাতিকার না হলে কি দিয়ে যুদ্ধ করবে?’



সদাশিব হাঁ করে চেয়ে বইল—‘হাতিয়ার !’

শিবাজী বললেন,—‘হাঁ। তলোয়ার বলয় সাজোয়া—এ সব না হলে কি যুদ্ধ করা যায় ?’

সদাশিব নিরাশকণ্ঠে বলল,—‘এ সব তো আমার কিছু নেই।’

শিবাজী বললেন,—‘বারা আমার গলে যুদ্ধ করতে আসে তারা নিজের ঘোড়া আর হাতিয়ার নিয়ে আসে। এখনও সৈন্যদের ঘোড়া আর হাতিয়ার দেবার ক্ষমতা আমার হয়নি, যখন হবে তখন দেব। তোমার ঘোড়া আছে কিন্তু হাতিয়ার নেই। এ অবস্থায় কী করা যেতে পারে ?’

হঠাৎ সদাশিবের মনে পড়ে গেল। এতক্ষণ তার মনেই ছিলনা যে তার কোমরে থলির মধ্যে সোনার টাকা আছে। সে লাফিয়ে উঠে বলল—‘আমার টাকা আছে, সোনার টাকা।’ এই বলে কোমর থেকে থলি খুলে শিবাজীর পায়ের কাছে সব মোহর ঢেলে দিয়ে বলল,—‘রাও, এই নাও তোমার ভেট। আমাকে তোমার গলে ভতি করে নাও।’

এবার শিবাজী অবাক হয়ে চেয়ে বইলেন। শেষে বললেন,—‘এত মোহর তুমি কোথায় পেলে ?’

‘সদাশিব তখন মোহর পাওয়ার ইতিহাস বলল। শুনে শিবাজী খুশী হয়ে তার পিঠ চাপড়ে দিলেন, বললেন,—‘সাবান ! আমরা লুটেছি রপোর টাকা আর তুমি লুটেছ সোনার মোহর। তোমার বুদ্ধিও আছে দেখছি। তোমার মতন লোক আমি চাই। সব মোহর আমাকে দিতে হবে না। তবে আমার এখন টাকার দরকার, তাই তোমার টাকা আমার তোলাখানায় জমা রাখলাম। যখন চাইবে তখনই ফেরৎ পাবে। উপস্থিত একটি মোহর তুমি নিজের কাছে রাখো, এক মোহরে তোমার সমস্ত হাতিয়ার হবে।—তুমি তলোয়ার খেলা জানো ?’

সদাশিবের বুক আবার দমে গেল। সে বলল, না।’

শিবাজী বললেন,—‘সে ভয়ে ভাবনা নেই। আমার নাপিত জীব মহালা মহাদাঈ সেশের দেয়া তলোয়ারবাজ, সে তোমাকে তলোয়ার খেলা শেখাবে। একমাসের মধ্যে তুমি শিখে যাবে।’

সদাশিব উদ্গ্রাহব হয়ে বললে,—‘আমি কবে তোমার সঙ্গে লড়াই করতে বেরব রাও ?’

শিবাজী তার আগ্রহ দেখে হাসলেন। তার কাঁধে হাত রেখে বললেন,—‘তার এখনও দেরি আছে। সামনে বর্ষা এসে পড়ল। বর্ষার সময় কোনও কাজ হয় না। এই কয় মাসে তুমিও তৈরি হয়ে যাবে। তারপর দশহরার দিন বেরব। কি বল ?’

‘হাঁ রাও।’

শিবাজী তখন বাঁকাবিকে ডেকে মোহরগুলো নিয়ে যেতে বললেন। আর তলোয়ারবাজ জীব মহালাকে ডেকে বললেন,—‘জীবা, তোমার একজন সাক্ষরও এসেছে। ওকে ভাল করে জ্ঞানার খেলা শেখাও।’

চির আশারের রাজ্য

বিজ্ঞানপ্রিয়

চারটি ছেলে তাদের পোষা কুকুরকে সঙ্গে নিয়ে রোজ সেখানে বেড়ায় ; ১২৪০ খ্রীষ্টাব্দের কথা । সেদিনও বেড়াচ্ছে তারা মাঠে । হঠাৎ দেখলে কুকুরটা নেই । চীৎকার করে ডাকলো তার নাম ধরে, শিশু দিয়ে ডাকলো—কোনো সাড়া নাই কুকুরের । চীৎকার করে ডাকতে ডাকতে চলে গেল তার খোঁজে । অনেক চেষ্টার পর মিললো তার সম্মান শাতালপুরীতে । একটা ঝোপের পাশ দিয়ে ছুটে বাবার সময় কুকুরটা একটা গর্তে পড়ে গিয়েছিল । আসলে সেটা গর্ত নয়, একটা গুহার প্রবেশ-পথ । ছেলের একজনের সঙ্গে ছিল টর্চ । জেলে দেখলো বিরাট গহ্বর—বিবিধ পথ রয়েছে ভিতরে বাবার । আলো ফেলে চারদিক ভাল করে দেখে এগোতে লাগলো তারা । অবাক হয়ে গেল গুহার ভিতরের দেওয়ালে, ছাদে ঝাঁক সব জীবজন্তুর ছবি দেখে ; মাহুকের মূর্তি ঝাঁক দেখে । অবাক হয়ে দেখতে লাগলো কত রকমের ছবি, কতকাল আগেকার ! তারা কিন্তু তখন জানে না যে তাদের কুকুরকে খুঁজে বার করতে গিয়ে প্রাচীনকালের মাহুকের একটা আদি বাসস্থান আবিষ্কার করে ফেলেছে—ফ্রান্সের Lascaux অঞ্চলের বিখ্যাত গুহা ।

খবরটা ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানীরা ছুটলেন গুহা দেখতে । গুহাও এখন একটা বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিষয় । ধারা গুহার বিষয় বৈজ্ঞানিক জ্ঞান অন্বেষণ করে বেড়ান, তাদের বলা হয় গুহা-বিজ্ঞানী, ইংরাজিতে বলে স্পেলিয়লজিষ্ট (Speleologist) । আর ধারা মথ হিদাবে গুহার অভিযান চালান তাদের বলা যেতে পারে গুহাভিযাত্রী, ইংরাজিতে বলে স্পেলান্কার (Spelunker) বা কেভার (Caver) । গুহা বা গহ্বরের প্রতি বিজ্ঞানীদের এতটাই টান কেন জানি ? মাহুকের আদিম যুগের অনাবিকৃত ইতিহাসের এক একটা অধ্যায় হ'লো এক একটা প্রাচীন গুহা । পণ্ডিতেরা যখন প্রাচীন ভাষায় লেখা পুঁথির পাঠ উদ্ধার করেন, বিজ্ঞানীরাও তেমন—গুহার ভিতরকার দেওয়ালে ঝাঁক ছবি আর অস্ত্র জিনিষের টুকরো-টাকরা দেখে উদ্ধার করেন আদিম যুগের ইতিহাস । ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা ও এশিয়ায় এই রকমের প্রাচীন গুহা অনেক জায়গায় আবিষ্কৃত হয়েছে । তার ফলে সেই আদিম যুগের অনেক কথা আমরা জানতে পেরেছি । গুহার ভিতরকার জিনিষগুলো যেন অনেককালের অনেক কথা বুক করে বসে আছে বৈজ্ঞানিকদের প্রতীক্ষায় ।

গুহা বললেই সাধারণতঃ আমাদের মনে হয় পাহাড়ের গায়ে গর্তের কথা,—অগস্তা, ইলোরার কথা । কিন্তু গুহা বা গহ্বর সৃষ্টি হয়েছে আপনা হতে । অগস্তা ইলোরার গুহা তৈরী করেছে

মাহুবে। আর, যে গুহার কথা আমি বসুছি তা তৈরী করেছে প্রকৃতি। মাটির তলায় আপনা থেকে গ'ড়ে-ঠা ঠাকা জায়গাকে গুহা বলা হয়। তা ছোটও হ'তে পারে, বড়ও হ'তে পারে; এক কামরাও হ'তে পারে, পাশাপাশি লাগাও অনেক কামরাও হতে পারে। আপনা হ'তে তৈরী হয় এই সব গুহা, আর বহু যুগ সময় লাগে তৈরী হতে। এই সব গুহাকে গুহা-বিজ্ঞানীরা পাঁচ শ্রেণীতে ভাগ করেছেন।

প্রথম হলো বায়ু-গুহা। যে-সব পাহাড় অকলে অবিরাম চলে বায়ুপ্রবাহ প্রবল বেগে, সেই খানে এই গুহার সৃষ্টি হয়। পাহাড়ের যে অংশটা অপেক্ষাকৃত নরম পাথরের, সেখানে ঝাঁকর-বালির ঘর্ষণে সৃষ্টি হয় ছোট গর্তের, তারপর সেই গর্ত ক্রমশঃ গভীর হ'তে থাকে, বড়ও হ'তে থাকে। সেখানে যখন হবে শিথী কাগজের মত কিছু দিয়ে হাল্কা হয়েচে দেওয়াল—এত বয়স হয় এই গুহা। দ্বিতীয় হচ্ছে—তরঙ্গ-গুহা। সমুদ্রের তীরে পাহাড়ের দ্বারা অবিস্রাভ ঢেউয়ের আঘাতে সৃষ্টি হয় বিরাট গহ্বর—একে সাগর-গুহাও বলা চলে। সমুদ্রের জলের তলাতেও অদ্ভুত গুহার খবর পাওয়া যায় ডুবুরীদের কাছ থেকে। তৃতীয় হলো লাভা-গুহা। আগ্নেয়গিরি থেকে লাভাব্যোত চলতে চলতে তার উপরের অংশটা ধাক্কা কঠিন হয়ে। উপরটা কঠিন হ'লেও ভিতরের অংশ তখনও তরল; সেটা যখন বেঘিরে যায়, থাকে তখন ঝাঁপা নলের আকার ধারণ করে বাইরের আবরণটা। একে বলে লাভা-গুহা। চতুর্থ হলো—বরফ-গুহা। যেক অকলে, স্পেন দেশে হাইজারল্যান্ডের আল্পস পর্বতে বরফ-গুহার সন্ধান মেলে। পঞ্চম শ্রেণীর গুহা হচ্ছে—চূনাপাথরের-গুহা (Limestone cave); আর, এই শ্রেণীর গুহাই বেশী দেখা যায়। পৃথিবীর অনেক জায়গায় রয়েছে চূনাপাথরের গুহা আর পাহাড়। এই পাথর যে-কোনো কারণে যখন ফাটে একেবারে চৌচির হ'য়ে ফাটে। সেই ফাটলে জল টুঁকে ভিতরে যেতে থাকে পাতাল অভিমুখে। হাবার পথে, সেই জল কোনো কোনো জায়গায় কার্বন ডায়ক্সাইড গ্যাসের সঙ্গে মিশে পরিণত হয় এসিডে। তখন, সে জল যত চলতে থাকে, পাথরও গলতে থাকে তত তাড়াতাড়ি; তাকে পথ ক'রে দেয় নিচের দিকে। এই ভাবে চূনাপাথরকে ক্ষয় করতে করতে যখন কোনো ভিন্নজাতের পাথরের, যে পাথর এই কার্বন অলে গলে না, বা মাটির অথবা মাটির তলাকার জলের স্তরে গিয়ে পৌঁছায়, তখন সেই এসিড ছড়িয়ে পড়ে তার চারদিক ক্ষয় ক'রে ক'রে। এই হলো পাতালপুরীর প্রকোষ্ঠ তৈরীর মোটামুটি পদ্ধতি। জল চুইয়ে চুইয়ে মাটির তলায় এই ভাবে গহ্বর তৈরী হতে হাজার হাজার বছর লাগে। বতদিন জল চৌহাতে থাকে, ততদিন গুহাটা থাকে জীবন্ত, তার ভিতরটা বদলাতে থাকে নানা রকমে। আর, জলের গতিবিধি যখন থাকে না, তখন গুহাটাকে বলা হয় মৃত। কারণ, তখন তার দেওয়াল বা ছাদ থ'লে পড়া ছাড়া আর কোনো পরিবর্তন তাতে দেখা যায় না।

সন্ধ্যা চূনাপাথরের গুহাই দেখতে পাওয়া যায় বেশী। তার কোনোটার ভিতরে নদী বাঁহে চলেছে; কোনোটাঘ রয়েছে জলাশয়; রীতিমত বড় হ্রদও দেখা যায় কোনো কোনো গুহার। কোনো গুহার সেবা বাবে ভিতরের ছাদ থেকে, দেওয়াল থেকে, মেঝেতে জল চুইয়ে পড়ে পড়ে ঠাণ্ডা নরম চটচটে আন্তরণের সৃষ্টি করেছে। আবার কোনো গুহার এই চুইয়ে-পড়া জলের ফোঁটার গড়ে উঠেছে অসুত আকারের জিনিস। যটের কুরির মত চূনাপাথরের খুরি, ভিতর ছাদ থেকে নেমেছে যেঝের দিকে; আবার যেঝে থেকে উঠেছে মাথা উঁচু করে ছাদের দিকে। কত রকমের যে গড়ন তাদের—কেউ কারও মত নয়; এত অসুত, এত বিচিত্র গড়নের; তা ঠিক করে বোঝানো যায় না—ছবি না দেখালে তার। জল যখন চূনাপাথরের পথে নেমে আসে, তখন জলের লম্বে বিশেষ বায়ু ক্যালসিয়াম কার্বোনেট। গুহার ভিতরকার বাতাসের হোয়ায় তার জলীয় অংশ উবে গিয়ে চূনের অংশটা থেকে যায়। এই ভাবে ক্রমাগত বাষ্পীভবনের ফলে পাথরের কুরির সৃষ্টি হয়। ভিতরকার ছাদ থেকে পাথরের কুরির মত বা নেমে আসে, তাকে ইংরেজিতে বলে স্ট্যালাকটাইট্ (Stalactite) আর মেঝে থেকে বাউপরের দিকে গুঠে, তাকে বলে স্ট্যালাগমাইট্ (Stalagmite)।

কোনো কোনো গুহার সেবা যায় পাথরের এই কুরি মাঝখানে মিলে গিয়ে শুভের মত সৃষ্টি হয়েছে—আমাদের দেশের প্রাচীন মন্দিরের দালানে যেমন কাককর্ষ-করা স্তম্ভ দেখা যায়, কতকটা সেই ধরনের বলতে পারো। বাতাসের চলাচল যেখানে নাই তেমন সব গুহার বড় বড় ফুলের মত নানা আকারের জিনিস দেখা যায়, সেগুলোকে বলে জিপসাম ফুল (Gypsum flowers)—জিপসাম পদার্থবহুল গুহাতেই এই ফুল হয়। কোনো কোনো গুহার পাওয়া যায় মুক্তার মত বস্তু; বালির ছোট্ট দানার চারদিকে চূনের পর্দা পড়ে সৃষ্টি হয় এই গুহা-মুক্তার।

গুহার ভিতরের আয়তন কোনোটার খুব বেশী, কোনোটার খুব কম। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের কার্লসবাড গুহাটা লম্বায় প্রায় পঁচিশ মাইল; অনেক প্রকোষ্ঠ আছে এই গুহার, দেগুলোর এক-একটার আয়তন প্রায় চল্লিশ লক্ষ বর্গফুট আর উচ্চতা প্রায় তিনশ' ফুট। বাহির থেকে বোঝা যায় না কত বড় হবে গুহার ভিতরটা। গুহার ভিতরটাও যেমন কোনোটারই কারও মত নয়, প্রবেশ-পথও তেমনি—এক ধরনের কেউ নয়। বড় গুহার প্রবেশ-পথ হয়ত খুব ছোট, আবার ছোট গুহার হয়ত খুব বড়। তরঙ্গ-গুহায় প্রবেশ করতে হয় নৌকায় করে। কোনো তরঙ্গ-গুহায় ভাটার সময় ছাড়া প্রবেশ করা যায় না। স্কটল্যান্ডে হুন্সর হুন্সর তরঙ্গ-গুহা আছে। ঐ যে কার্লসবাড গুহার কথা বললুম—পৃথিবীতে এ পর্যন্ত যে সব বড় বড় গুহা আবিষ্কার করা হয়েছে তার মধ্যে এটা একটা। এর প্রবেশ-পথ দেখে কেউ ধারণা করতে পারেনি যে সেটা বিশাল পাতালপুখীর সিংহদ্বার। একদিন এক রাখাল মাঠের মাঝ দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে যেতে যেতে দেখতে পেলেন দুই বাটি থেকে ধোঁয়ায় হুওলী উঠছে।

কৌতূহল হলো—এগিরে গিরে দেখলে ঘোঁরা নয় বাহুড়ের বাক বাশা ছেড়ে বেকছে আহাবের সম্বন্ধে; ঐ গুহারই মুখ সেই গর্তটা।

গুহার ভিতরটা তোমাদের হয়ত ভয়ঙ্কর মনে হচ্ছে, কিন্তু তা নয়। ভয়ঙ্কর নয়—অদ্ভুত—বিশ্ময়কর। ভিতরের বাতাস খুব বিশুদ্ধ—ধূলা-বালির সংস্পর্শ নেই তাতে। কোনো গুহার বাতাসের প্রবাহ থাকে; কোনোটার বাতাস বন্ধ। ভিতরকার তাপমাত্রাও সব গুহার সমান নয়। মাটির উপর সারা বছরের গড় তাপমাত্রা যা, ভিতরে সারা বছর তাপমাত্রা থাকে প্রায় সেই রকম। কাছেই গুহার বাইরে যখন গরম, তখন ভিতরটা বোধ হবে ঠাণ্ডা; আর বাইরে যখন শীত, তখন ভিতরে গেলে বেশ গরম। গুহাগুলোকে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত (air conditioned) বলা যেতে পারে। গুহার ভিতরে শীতগ্রীষ্ম নাই, ঝড়বুড়ি নাই, শব্দ নাই, দিন নাই, রাত নাই—সময়ের চলাচলও নাই—প্রত্যেক মুহূর্তটা একই রকমের—সময় বেন অন্ধকারে পথ হারিয়ে ধাঁড়িয়ে রয়েছে এখানে—আলোকবিহীন অন্ধকার গুহার। গুহার ভিতরকার অন্ধকার হলো সত্যিকারের আলোহীন অবস্থা। রাত্রির অন্ধকারে সোণ বুললে যেমন আশ্রয় মনে হবে, তার দশগুণ অন্ধকার গুহার ভিতরে। এই গুরু অন্ধকারে অত্যন্ত ক্ষীণ শব্দও শোনা যায় বেশ স্পষ্ট—চুঁইয়ে-গড়া ছোট ছোট জলের ফোঁটার শব্দ—গুহাবাসী কীটপতঙ্গের শব্দ; বেশ বোকা যায় বাতাসের গতিবিধি, তা যতই নরম হোক। গুহার ভিতরে গিয়ে পড়ালে বিরাট বিশ্ব জাগে মনে—আলোকময় পৃথিবীর মাটির ওপর ঘন অন্ধকারে নিঃশেষে অতি মধুর গতিতে চলেছে গুহার কাজ—তার বৃদ্ধি, তার পরিবর্তন, তার তান্মা-গড়া। আর, এই পিচ-কালো আঁধারেও জীবনবাশন করছে বিজেত সব শ্রেণী—সামুক, সালামাওর (গিরগিটি জাতীয় জীব), মাছ আর কত রকমের কীটপতঙ্গ। গুহাবাসী জীবকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। এক শ্রেণী হচ্ছে বাসের জন্য থেকে মুক্তা পর্যন্ত গুহার ভিতরেই কাটে; আর এক শ্রেণী হলো, যারা কেবল দিন বা রাত্রির কিছু সময় গুহার ভিতরে কাটায়। যেমন, ভালুক, শেয়াল, ভোঁদড়, হায়ানা, এক জাতের ইঁদুর, বাহুড় প্রভৃতি; এরা কেবল ঘুরেবার সময়টুকু কাটায় গুহার ভিতরে। আবার ঐ যে সামুক, সালামাওর আর ভিন্ন ভিন্ন জাতের বাগ, মাছ, কীটপতঙ্গ কত রকমারি, এরা কখনই গুহার বাইরে যায় না। নিউজিল্যান্ডের কোনো কোনো গুহার বৈশিষ্ট্য জাতীয় কীট দেখা যায় এবং তাদের গা থেকে বেরায় আলোর রশ্মি। দেওয়ালের গায়ে, ভিতরের ছাদে ঐ কীটের আলোতে গুহার ভিতরটার এমন আলো হয় যে তাতে বই পড়াও চলে। কিন্তু মুশ্কেল হলো ঐ যে লজ্জাবতী লতা যেমন ছুঁলেই মুগড়ে যায়, তেমনই এদের আলোও যায় নিবে একটু ভয় পেলেই, বেন হুইচ টিপে আলো নিষিদ্ধে যেওয়া হলো। এই আলোহীন রাজ্যে নানা রকমের জাওয়া জাতীয় উদ্ভিদও জন্মায়—তারাত অদ্ভুত—তারাত বিচিত্র।

আদিম যুগের মানুষকে শুধা আকর্ষণ করেছে তার আশ্রয়স্থল হ'য়ে। রোম-বুট্রি-কড়, হিংস্র জীবের আক্রমণ এড়াবার ক্ষমতা মানুষ হযতো পাতালপুরীর এই গুপ্তগৃহের সন্ধান পেয়েছে কোনো রকমে। গুহাই তাকে দিয়েছে প্রথম আশ্রয়স্থল, গুহাই হযতো তার মনে প্রথমে এনে দিয়েছে গৃহ-নির্মাণের প্রেরণা বা বুদ্ধি; আর ঐ গুহাই হযতো হয়েছে তার গৃহের আদর্শ বা মডেল। গুহাবাসী মানবকে ইংরাজিতে বলে ট্রোগ্লোডাইট (Trogglodite) গুহামানব। ফ্রান্সে লই (Loir) নদী উপত্যকায় এখনও গুহাবাসী মানুষ দেখা যায়—রীতিমত একটা গুহা-নগর গড়ে উঠেছে দেখানে। অবশ্য বাণীন্দ্রারা আধুনিক যুগের সভ্যতার সব সুযোগ গ্রহণ করেছে এখন। শ্রেনে বেগে, এশিয়ার বহু জায়গায় এখনও গুহাবাসী দেখা যায়—এরা কিন্তু আদিকালের গুহামানব নয়। প্রাগৈতিহাসিক যুগে মানুষ বাস করতো এমন অনেক গুহাকে বাহুঘরের মত দর্শনীয় স্থান হিসাবে স্বরক্ষিত করা হয়েছে। মানবজাতির ক্রমবিকাশের ইতিহাসের অনেক মাল-মদলা ছুগিয়েছে এই সব গুহা—বহু বিচিত্র জীব-কীট-পতঙ্গ ও উদ্ভিদের সন্ধান দিয়েছে—নতুন নতুন পদার্থের ও বহু বৈজ্ঞানিক তথ্যের সন্ধান দিয়েছে এই গুহা। তাই মানুষ স্বয়ংই এই গুহাকে জ্ঞানের বিঘর করে নিয়েছে, উৎপত্তি হয়েছে গুহা-বিজ্ঞানের।

উল্লী-দর্শনে

শ্রীকালীপদ গল্পোপাখ্যান

উদ্যম—উদ্যম

উল্লিত উল্লী

কোন শাঁওতালী মেয়ে

তোব চেয়ে হুতী ?

পাহাড়ের মেয়ে তুই

পাহাড়ী-মেয়ে

অংলী ঝাংলখানি

গায়ে ঝড়ায়ে,—

ক্রততালে ছুটে যাস

কত রঙ্গে—

পুলক নাচিছে তোরা

সারা অঙ্গে !

হুই খিকে দুখারায়

করে হুত—

তীরে মোরা চেয়ে থাকি

বোহে দুত ।

কোন চর-সটা হ'তে

কোন ভগ্নীরথ

টানিয়া আনিল তোরে

এই শিলাপথ ?

কোন সে সগরবংশ

করিতে উদ্যম

ছুটিয়া চলিৎ তুই

নিতি-অনিবার !

ভগ্নীরথ শখরব

আশ্রিও কি বাজে

কেনারিত তোরা ওই

বাঝি রাশি মাঝে ?

শতাব্দীর ভগ্ন রাশি

হবে কি উদ্ধার

তোরা পৃথকারা শ্মশর্

এ যুগে আবার ?



হৃদয়ী মৃগ

[উপন্যাস]

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

মেবাচার্ঘ

—ওঠ, ওঠ, পিনাকী—পুরী এসে গিয়েছে।

বাহুরের চীৎকারের ঘুম ভাঙে পিনাকীর। উঃ, কতক্ষণ ঘুমিয়েছে সে! কত কি দেখবার ছিল, ইশ, ভুবনেশ্বর চলে গেল, খণ্ডগিরি, খবলগিরি।...

মালপত্র নিয়ে বহু কবিরাজ ঘোড়ার গাড়ীতে ওঠেন, ছাত্র নবকৃষ্ণ গাড়োয়ানের পাশে উঠে বসে। শহরের মধ্য দিয়ে গাড়ী চলে, ঘন ঘন চাবুকের আঘাতে কিন্তু দুর্বল অথবা খানিকক্ষণ জোরে ছুটতে থাকে, আবার কিনিয়ে পড়ে। ভাড়া গাড়ীর ফাঁক দিয়ে পিনাকী দেখে ঘোড়াটা বড় ছোট, নিতান্ত দুর্বল। দাদুর ঘোড়াটা এর থেকে অনেক উঁচু লম্বা, ছোলা খায়; এরা বোধ হয় ছোলা দেয় না খেতে, তাই এত রোগা।...

ঐ দেখা যাচ্ছে জগন্নাথের মন্দির।... প্রকাণ্ড বগুমূর্তি, হুহুমানের মূর্তি, ঐরাবত—উপরে খড়ের চাল দিয়ে ঢেকেছে কেন? মাটির হলে গলে যেতে পারে। তাই কি? তেলে-ভাজা ডাঙাছে উড়ে বেগুনিগুয়ালা—গয়ন গয়ন বেগুনি খেতে লোভ লাগে পিনাকীর।...কি ধুলো! বড় ধুলো—কত লোক—ওরা বোধ হয় সমুদ্রে স্নান করতে চলেছে।

—সমুদ্র কোথায় দাঁড়? বহু কবিরাজ কি বেন ডাবছিলেন, উত্তর দেন না। পিনাকী প্রশ্ন করে, এইবার বহু কবিরাজ উত্তর দেন—দেখবে, দেখবে, সবই দেখতে পাবে।...

পথ আর ফুরায় না দেন, কিন্তু আপত্তি নেই পিনাকীর। দুই চোখ মেলে সে দেখছে। দুটো চোখ দিয়ে কেন দু'ধারে একদিকে দেখা চলে না! এধারের দৃষ্ট দেখতে গিয়ে ওধারের জিনিষ লক্ষ্যের বাইরে চলে যায়। পিনাকী একবার এদিক, একবার ওদিক, ঘনঘন চোখ ফেরায়।...

শহর বৃষ্টি শেষ হয়ে এল। সামনে দেখা যাচ্ছে ধূ ধূ বালির বিস্তার, শুধু বালি, বালির পর বালি। মাঝে ভালগাছ, আর ফলী-মনদার ফোপ। ঘোড়ার গাড়ী আর চলবে না বালির উপর শহরপুর—শহরপুরে যেতে হবে এখন। শহরপুরে দাহুর বাগানবাড়ী—কি হুম্বর আকাশ!—অদ্বুত রহস্যময় মনে হয় সব কিছু পিনাকীর কাছে। শহরপুর—দেবাদিমেষ শহরের নগর—তাইনা বাহরুদা?

—দূর! শহরপুর একটা নগর নাকি! একটা গ্রাম, গ্রামেও লোক নেই বেটী। দাহুর বাগানবাড়ীতে কয়েক ঘর উড়ে মালী থাকে, আর লশ-বার ঘর জেলে নদীর ধারে কুঁড়ে বেধে মাঝে মাঝে আসে, আবার চলে যায়। আসল গ্রাম হচ্ছে বগুপুর।

—বগুপুর! শিবের বাড়ি—ঐ যে দেখলাম মূর্তি পথে আগতে, ওখানেও মূর্তি আছে বৃষ্টি?

—দূর তা কেন—বগুপুর মানে বগুপুর, একটা গাঁয়ের নাম।...

যদু কবিরাজের গলা শোনা যায় এইবার।—নেমে এস সব—গরুর গাড়ীতে উঠতে হবে।

দাহুর বাগান থেকে ঘনশ্রাম গোমস্তা গাড়ী নিয়ে স্বয়ং উপস্থিত। ছাত্র নবকৃষ্ণ ব্রিষ্ বিদ্যায় মেয়। পিনাকী, বাহুর, দাহু, ঘনশ্রাম গরুরগাড়ীতে আটপাট হয়ে বসে। গাড়ী চলে ক্যাচর ক্যাচর। চাকার তেল দেখনি নিশ্চয়, এত শব্দ হচ্ছে তাই। পিনাকী টেঁচিয়ে বলে, গাড়োয়ান—চাকার তেল দাও।

মোক্তামুখে ঘনশ্রাম মাথানেড়ে হাসে, দাদাবাবু ঠিক-অ বলিলেনো, ব্রাহ্মের-অ কার্য হৈলবি—হইল।

বদ্ধকাল। বাম গাড়োয়ান কিছুই শোনো না, সবল নখরসেহ বলদ দুইটির লেজের উপর তড়ান। করে—গরু তাড়াবার লাঠিটাও ভাঙ।

—দাহু, তোমার লোকগুলো কাছে ফাঁকি দেয়।

পিনাকীর দিকে চোখ ঘুরিয়ে যদু কবিরাজ বলেন, কেন—কি করে বুঝলে?

যে গাড়োয়ান গাড়ীর চাকার তেল দেয় না, পাচন ঠিক রাখে না, সে আবার গাড়োয়ান কিসে, আর যে গোমস্তা কালা রোগা কাল না-জানা লোক রাখে, সে যে মাইনে থেকে ভাগ বসায়—এত তথ্য পিনাকী না জানলেও—বহু হামেই শুনেছে সে, দাহু চাষবাসে লোকজন খাটাতে জানেন না। হাজারীরা কত অল্প খরচে কি হুম্বর চাষ করে। বাহরের মুখে শুনেছে দাহু গাড়ী গাড়ী মাটি কেটে, বালির মধ্যে গর্ত করে, সেই মাটি ফেলে নারকোল গাছ, আমগাছ পুঁতেছেন। বালির মধ্যে কি কেউ পুতুর খোঁড়ে? অনেক টাকা, হাজার হাজার টাকা—দ্বিধিমা বলে, যে টাকা খরচ করেছেন দাহু পুতুর বালির উপর, সেই টাকার কলকাতার ভাল বাড়ী হয়ে যেত। যদিও দ্বিধিমার মতের সঙ্গে পিনাকীর মতের মিল নেই, দ্বিধিমা দাহুর সাংসারিক বৃত্তির উপর একটুও শ্রদ্ধা পোষণ কই না—তবু পিনাকী

ভাবে, সব চেয়ে ভাল হোত পিনাকীদের দেশের ভূমি কিনে যদি দাড়া চাষবাস করত তাহলে। হাজারের বাপকে কৃষাণ বাপলেই সোনা ফলতো। হাজারের বাপ রাকী না হয় বাস মাইনেতে থাকতে, ছহরাম আছে। ছহরাম তো আজকাল নৌকো বেয়ে বেড়ায়, কখনো কাঠ কাটে—নিজের ভূমি নেই যে চাষ করবে।

পিনাকী স্বপ্ন দেখে মনে—বড় হয়ে দাড়ুর মতন লাড়ীওয়াল কবিরাজ হয়েছে পে...না, কবিরাজ হবে না পে—ইংরিজি শিখে ডাক্তার হবে—ডাক্তার নীলরতন সরকারের মতন বড় ডাক্তার—বিলেত ফেরত ডাক্তার—বাবা কি মত দেবেন?—বিলেত গেলে কি দোষ? পে যদি বিলেত যেতে পারে, নিশ্চয় ভালভাবে পাশ করবে—খুব মন দিয়ে পড়বে কিনা—সেই ক্বিরে বোসেদের খড়ের মাঠটা—ঐ যে হিজল বনের ধারে—বলা মিঞার বাড়ীর উত্তরে...কি হুম্মর জায়গাটা, একবারে নদীর উপর! ভালগাছের ডোড়া বানিয়ে কপিকল করলেই হোল—নদী থেকে জল তুলে তরকারীর ক্ষেতে দেওয়া চলবে অনায়াসে—কশি আর আলুর চাষে অনেক জল লাগে—বাড়ীতে বাবা চাষ করেছিলেন, সব দেখে নিয়েছে পিনাকী। খড়ের মাঠে কিন্তু বড় সাপ—যদি কামড়ে দেয়? কামড়াবে কি ক'রে, পিনাকী তো আর আগেই খড়ের মাঠে ঢুকছে না। যেই খড় শুকিয়ে আসবে অমনি লাগিয়ে দেবে আগুন—চড় চড় করে আগুন বেয়ে চলবে—একদিনেই সব শাক—ভারী পার্বালো মাটি খড়ের জমি লক্ষণ ঠাকুরের কাছে শুনেছে পিনাকী। কি দেওয়া যায়? মানকচু হোতে পারে খুব ভাল—কিন্তু মানকচু ভালবাসে না পিনাকী। তার চেয়ে আখ দেওয়া ভাল, খেতে ভারী মিষ্টি, আখ থেকে শুদ্ধ করে বিক্রী করা বাবে হাটে—গুড়, অনেক গুড়, কলদী ভত্তি করে...। গুড়ের ব্যবসা করবে, আবার ডাক্তারীও করবে।

—এই জুতো পরে নে, এসে গিয়েছি আমরা, উঃ, কি যোদ্ধুর!

বাড়রের ধাক্কা পিনাকীর কৃষি-স্বপ্ন স্তেজে যায়। বিচুলি পাভা পুর গাড়ীর ছই-এর মধ্যে অনেক বিনিময়—জুতো ছোড়া খুঁজে পায় না পিনাকী। অমন হুম্মর নতুন জুতো ছোড়া—বাঃ, পড়ে গিয়েছে গাড়ীর ঠাক দিয়ে। পিনাকীর চোখে জল আগে। বহু কবিরাজ সাহসনা দেন, শহর থেকে জুতো আর এক ছোড়া কিনে আনলেই হবে, ভূমি কেঁদো না দাড়া।

নতুন জুতোর লোকসানটা সহজে তুলতে পারে না পিনাকী। অনেক চেষ্টার পর চোখের জল মুছে নেমে যায় উঠনে, বালি পায়ে। কি গরম উঠনটা! পায়ে বেন কোঁক পাড়ে বাজে, মৌড়ে উঠে গিয়ে দাড়ায় খোলার চালের কুটারের বারান্দায়।

একি বর! হাসান করেনি দাড়া, নিজেই পিনাকীর মনটা গমে যায়। এতদিন শুনে এসেছে হিন্দিয়ার মুখে, দাড়া, হাজার হাজার টাকা খরচ করেছেন পুষ্টির সব মোটাতে। কিন্তু একি বাড়ী।

এ যে ভাষের সেশের বাড়ীর মতন বাড়ির দেওয়াল, কেবল চালে খড়ের বদলে খোলা। রান্নাঘর তালপাতা দিয়ে ছাওয়া।

বাহরের বাবা, পিনাকীর মেসোমশায় এগিয়ে আসেন। দাঁত উচু, ক্রীমবর্ণ, গভীরমুখ, কৃশদেহ। ঈষৎ হ্রাস দেহটি ঢেকে রাখেন সব সময় একটা ডোরা কাটা চাদরে। গ্রীষ্মের মধ্যেও তাঁর গানের উপর চাদর চড়ানো। পিনাকী লক্ষ্য করে সারা দিনের মধ্যে মেসোমশায়ের চাদর গা থেকে সরে নি।

—মেসোমশাই কি স্থান করেন না? পিনাকী মাগীমাকে একা পেয়ে জিগোস করে। মাগীমা হেসে বলেন—বোঁগা মাহুদ, ডবল নিউমোনিয়া হয়েছিল কিনা, তাই স্থান করতে স্তব্ধ পায়।

কিন্তু মেসোমশায় লোক ভাল, কেমন তাকে সঙ্গে নিয়ে অনেক জায়গা দেখিয়ে আনলেন, কত হরিণ আর বাঘের গল্প বললেন, স্বচক্ষে দেখেছেন কিনা—কতবার মরতে মরতে বেঁচে গিয়েছেন—নীলগাই-এর হাত থেকে। মেসোমশায় খুব ভাল হরিণের মাংস রান্না করতে জানেন, মাগীমাও অমন রান্না জানেন না—রাতে বাহরের সঙ্গে এক খাটে শুয়ে পিনাকী মনে মনে ভাবে। মেসোমশায়ের বিভিন্ন অভিজ্ঞতার মূহু পিনাকী বাহরের কাছে তার বাবার প্রশংসা করে।

বাহরের মেজাজ ভাল ছিল না। পুরীতে আসতে না আসতেই বাবার শাসন শুরু হয়ে গিয়েছে। গাছ থেকে আম পাড়তে গিয়ে পড়ে গিয়েছিল বিকেল—কোথায় ব্যথা লেগেছে হেলের, বাবা গায়ে হাত বুলিয়ে দেবেন, উলটে ঠাই ঠাই করে চড়।...হঃ, মনে মনে অভিমানে গর্জায় বাহুয। পিনাকীর কথার উত্তর দেয় না।

অঙ্ককার রাহি, সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। তারা দু'জন এক ঘরে। নতুন ভায়গার, পিনাকীর গা ছমছম করে। বালির অঞ্চল হলে কি হবে, দাড়ুর আমবাগানে গাছপালা নেহাৎ কম বড় হয় নি! বোধ হয় বস পেয়েছে, এক গাড়ী মাটির দাম নগদ দশ টাকা, কি সর্বনাশ, গাড়ী গাড়ী মাটি নগদ টাকার কিনে এনে দাঁহু বামিয়েছে বাগান—আম, আমকল, আম, হরিভকী, দারচিনি, লবঙ্গ, এলাচ, গোলাপ আম, নারকেল গাছ, কত রকম আবার গাছ লাগিয়েছে দাঁহু, ওনে ওঠা কঠিন। পিনাকী সারা দুপুর শু বিকেল ঘুরেও শেষ দেখতে পারে নি। উত্তর বালির বুক চাব—মস্তুর মধ্যে উদ্ভান—বাহুরদা, জানিও ওয়েদিস্ মানে কি? ঘুমিয়ে পড়লি এর মধ্যেই?—বলে পিনাকী।

বড় বড় মশা, ঘরের জানালা নেই, উপরে চালের নীচের ঠাক দিয়ে বসতুঁহু বাতাল আসে তা গায়ে লাগে না। শুমোট গ্রন্থে ছোট মশারীর মধ্যে দু'জনে পাশাপাশি শুয়ে। শব্দবিলাসী পিনাকীর চেয়ে ঘুম নেই, তবু সে ঘুমোবার চেষ্টা করে চোখ বুজে। অনেকক্ষণ চুপচাপ থাকার পর পিনাকীর মনে হয়, বাহুর ঘেন উঠে বসেছে। পিনাকীর দিকে তাকিয়ে দেখে নিল পিনাকী জেগে আছে কিনা, খাট থেকে নেমে গেল পা টিপে টিপে।...

মশারীর ঠাঁক দিয়ে পরিষ্কার দেখা যায়—বাহুরা হারিকেন লঠনটা আরও একটু বাড়িয়ে দিয়ে ঘরের কোণায় একটা খুড়ির মধ্যে কি যেন হাতড়াক্কে। ছোট্ট চাকু থাকে সব সময় বাহুরের টাঁকে, ঘুমোবার সময়ও চাকু ছেড়ে শোয় না বাহুর। শুড়ীপাড়ার গুণা ছেলেরের কাছে শিক্ষা পেয়েছে বাহুর—কালীভক্ত হলে সব সময় অশ্রুধারণ করা উচিত। চাকুও অশ্রু—চোর যদি আসে রাতে, চাকুটা দিয়ে হারো খোঁচা, চোরের দফা শেষ!...লতা আমন্তলো ঠিক কুমড়োর মতো ঝেঁপতে—লতা আমের ঝাঁটি এক দিকে, আর আর এক দিকে—লতা আম হাটির উপর লতিয়ে যায়, ফলটা বালি দিয়ে ঢেকে রাখলেই হোল—গরম বালিতে ভাড়াভাড়ি গেলে ওঠে। কি মিষ্টি! ভাবতেও পিনাকীর জিবে জল আসে।...

মশারী উঠিয়ে পিনাকী বলে—বাহুরা, একলা বাস নে, আমাকেও একটু দে—বড় ক্খি পেয়েছে।

বাহুর ততক্ষণে পুরো একটি অমৃতভাণ্ড বা পণিতা, অর্থাৎ পেঁপেকে—শেষ করে হাত চাটছে, বলে—আর পেঁপে নেই রে, তুই বরং লতা আমটা খা, আমি অনেক খেয়েছি। আমকে যা সময় বাহুর এমন হুম দিয়েছিল, কিছুই বেতে পারি নি; তাই তাবলাম, বালি পেটে ঘুম হয় না কিনা তাই—নে তুইও খেয়ে নে—ফুটি খাবি—ফুটিও আছে।

পিনাকী লতা আমের খণ্ড বিশেষ শেষ করতে করতে বলে—ফুটি খেতে গেলে আবার গুড় লাগবে, থাক্!...

(ক্রমশঃ)



‘চাকু’-এর রূপ হুগলেশারী—ভারতের হুগলী উপর শীতলের একটি পরিবারের চিত্র। বালি ক্খি পিঁয়

মেকি চাঁদ

শ্রীমুখীল রায়

আজ ক'দিন ধরে হাককে তেতলার ছাঁক থেকে নামানো বাঁছে না। ঐখানে দাঁড়িয়ে সে এক-দুটে আকাশের দিকে চেয়ে থাকে। কেন, তার হয়েছে কি—এসব কোনো প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে না সে।

দুপুর বেলা সে নিজেই নেমে আসে। নাওয়া-খাওয়া সেরেই আবার গিরে সে ওঠে ছানে। একটা অঘটন না ঘটলে ছাড়বে না বৃষ্টি ছেলেটা।

মোড়লার বারান্দা থেকে কাঠের সিঁড়ি তেতলার ছাঁকের সঙ্গে কাত ক'বে দাঁড় করানো। সিঁড়ি ঠিক না, ওটাকে বলা চল—কাঠের যই। বিশেষ গোক্ত জিনিস না, তবে আর রোপে ওর কোন্‌ জায়গা যে বরষ হয়ে আছে কে জানে। অত বার ওটা বেয়ে ওঠা-নামা করতে করতে কখন যে কি কাণ্ড হয়ে যাবে তার ঠিক নেই।

হাকর দাড় অপর্যবাহু খুব বড়ো মাছ, খুব রোগা, আর খুব রাগী। তাঁর এক মেয়ের এই এক ছেলে, তাই মাঁড়িটার উপর তাঁর খুব টান। তা না হলে অপর্যবাহুর কড়া মেজাজ এতদিনে হাককে কাবু করে দিতে পারত।

হাকর মা এসে তার বাবাকে বলল, তুমি কি ওকে কিছু বলবে না, বাবা। তোমার চোখের সামনে দিয়ে ওই সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে ও উঠবে, আর তুমি তাই সহ করবে?

মেয়ের মুখের দিকে চোখ তুলে তাকাতে ইচ্ছে করে না অপর্যবাহুর। পারতপক্ষে তিনি তাকানও না। হঠাৎ কখনো চোখ পড়লেই তাঁর নিজের ভাগ্যের উপরেই ভীষণ রাগ হয় তাঁর। মেজাজ বাঁচ্ছেতাই-রকম খারাপ হয়ে যায় : এই একটি মাত্র ছেলেকে কোলে নিয়ে তাঁর মেয়ে মানসী বিধবা-বেশে এসে দাঁড়িয়েছিল তাঁর সামনে। সে অনেক বছর আগের ঘটনা। সেদিন অপর্যবাহু তাঁর বৃক্কর মধ্যে প্রচণ্ড একটা ঘা খেয়েছিলেন; সেই থেকে তাঁর আন্তর হয়ে আছে। মেয়ের মুখের দিকে তাকিতে তাঁর ভরসা হয় না।

পুক কাঁচের চশমার ভিত্তর দিয়ে পাতল একটা বইয়ের ছোট ছোট অক্ষরের উপর চোখ ব্লাভে-ব্লাভে অপর্যবাহু বললেন, চিন্তা কোরো না মানসী। চিন্তায় কোনো লাভ নেই।

—কিন্তু ওকে একটা ধমকও দেবেনা, বাবা?

তার বাবাকে ধমক দেওয়ার মত কঠিন গলায় মানসী বলে উঠল ঐ কথা।

কিন্তু অপূর্ববাবু যেন নিবিচার। তাঁর এই মূর্তি দেখলে আশ্চর্যই লাগে। সামান্য কারণে যে-হাছবন্ধকে অধিমূর্তি হয়ে উঠতে দেখেছে মানসীরা, সেই হাছবের চোখের সামনে একটা বাচ্চা ছেলে এমন বোয়াদশি করে চলেছে, তবুও হাছবটার মেজাজ একটুও ভেঙে উঠছে না ?

মানসী আবার বলল, ওকে কিছু বলবে, কি, বলবে না তাই আমাকে বলো বাবা। কী আছে ঐ স্কাটা ছানে, কিসের স্ক্রল তার এই সাহস, কেন ওর ঐ পলকা সিঁড়ি বেয়ে ওঠা-নামা ?

হাতের বইটা উপড় করে রেখে অপূর্ববাবু স্থির হয়ে বসলেন। চোখ তুলে তাকাবার আগেই চোখের চশমা খুলে হাতে নিলেন। মানসীর দিকে এবার চোখ তুলে তাকালেন তিনি। দাদা খান কাপড় প'রে একটা আবছা মূর্তি তাঁর চোখের সামনে ঠাঁড়িয়ে। চোখের দৃষ্টি তাঁর সীম হয়েছিল, চশমা খুলে নিলে তাই সব স্পষ্ট দেখা যায় না। তাঁর মনের চেহারা স্পষ্টভাবে দেখারও তাঁর ইচ্ছে নয়।

মনের মূণের দিকে ঘোলাটে দৃষ্টি মেলে তিনি বললেন, ও নিশ্চয় কিছু খুঁজছে মানসী।

মানসী বলল, তা খুঁজুক, কিন্তু আমিও যে ওকে খুঁজে পেতে চাই, বাবা। অমন ভাবে ঐ সিঁড়ি বেয়ে ওঠা-নামা করলে—

বাধা দিলেন অপূর্ববাবু, বললেন, বুকেছি। আমি ওকে থমক দিয়ে দেব।

— কিন্তু দিনের পর দিন কেটে যায়, অপূর্ববাবু বুকি তুলে যান থমক দিতে। তাঁর ঘরের চারটি দেওয়াল যেন দেওয়াল নয়, বইয়ের প্রাচীর। তারই মাঝখানে বসে তিনি কী যে গবেষণা করেন, কী যে লেখেন, কী যে পড়েন—কে তাঁর হিসাব নেবে ?

তাঁর কোনো কাজের খোঁজ নিতে গেলে অপূর্ববাবু অধিশর্মা হয়ে উঠবেন—সকলের এই ভয়। মানসীরও ভয়, মানসীর মায়েরও। এই জন্তে এই বৃদ্ধ হাছবটিকে চুপচাপ একা থাকতে দিয়ে সকলে অন্য ঘরে নিজস্বের আবহাওয়া রাখে।

— হাক হাক হাক। নেমে আর, বেলা হ'ল, বিসে পায়নি ?

অপূর্ববাবুর কানে ঐ শব্দ যেতেই তিনি দেওয়ালে ঘড়ির দিকে তাকালেন। এগারোটো। ইচ্ছে হ'ল একবার উঠে গিয়ে তিনিও মানসীর ঐ ডাকের সঙ্গে একবার ডাক দেন হাককে। কিন্তু কেমন যেন ভয় হ'ল তাঁর, নিষ্পেক্ষেই বিশ্বাস করেন না তিনি। হয়তো পে-ডাকে সড়া দেবে না হাক। আবার হয়তো ডাকবেন, অরনি মেজাজটা যাবে বিগড়ে।* তারপর তাঁর হাতে হাছবাবুর কী যে নির্ধাভন হবে কে জানে। তার চেয়ে চুপ করে থাকাই ভালো। নিজের চড়া গলার স্বর জনলেই সর্বাঙ্গ তেতে ওঠে অপূর্ববাবু, পাশে-পাশে তাই উঠতে থাকে গলা। মেজাজও গরম হয়ে ওঠে সেই সঙ্গে।

মানসী ডাকছে হারকে। কিন্তু
নে-ডাকে কান নেই হারকর। পরনে হারক
প্যাণ্ট, গায়ে হারক শার্ট। প্যাণ্টের ছই
পকেটে দুই হাত ঢালিয়ে দিয়ে সে ছায়ে
মাঝখানে চূপচাপ দাঁড়িয়ে দার। আকাশে
চোখ বুলছে। তারি ভালো লাগছে
তার। নীল আকাশটার কিনার খুঁজছে
বুঝি, কোন্‌খানে ওই আকাশের শেষ তাই
বুঝি জানতে চায় সে।

ডেকে ডেকে লাড়া না পেয়ে মানসী
ঘরের মধ্যে চলে গেছে। এর কিছু পরেই
কখন হারক নীচে নেমে এসেছে কেউ
জানে না।

দাঁড়র ঘরে এসে উকি দিল সে,
দেখল মাথা নীচু করে দাঁড় কি-যেন
পড়ছে।

পাশে এসে দাঁড়িয়ে হারক ডাকল,
দাঁড়!

চমকে উঠলেন অপূর্ববাবু, বললেন, কি, কি খবর হারবাবু। তোমার মা ডাকছিলেন স্নমতে
পাওনি।

—স্নমতে পেয়েছি। জান দাঁড়, তারি বিরক্ত করে মা। ছাদে উঠে দাঁড়িয়ে থাকলে কী
হয় বল!

অপূর্ববাবু হারকর গিঠের উপর একটা হাত দিয়ে বললেন, ঐ সিঁড়িটা বড় খারাপ।

—ভবে, রেখেছ কেন ওটা? ডেঙে কেলসেই হয়?

অপূর্ববাবু হাসলেন, বললেন, তা হয় বটে। কিন্তু তোমার ছাদে বাগরার দরকার কি?

এ-কথার উত্তর দিলনা হারক, একটু চূপ করে থেকে বলল, দাঁড়, একটা ম্যাশ এঁকে দাও
আমাকে।

—কিসের ম্যাশ রে?



—“কিন্তু তোমার ছাদে বাগরার দরকার কি?”

—আকাশের।

হুসে নাতির এই মত আশ্বাসে আশ্বস্ত হয়ে গেলেন অপূর্ববাবু, বললেন, কী করে আঁকব ?
হাক বলল, পেন্সিল দিয়ে।

—পেন্সিল দিয়ে বৃষ্টি আঁকা যায় ?

—যায় না ? তাহলে কলম দিয়ে আঁকো।

অপূর্ববাবু বোঝাতে লাগলেন তাকে, এ ম্যাপ আঁকা যায় না, এর শেষ নেই কোনো, এর সীমাও নেই, এ একটা বিরাট ঝাঁক। আরনা ?

হাক আপত্তি জানিয়ে উঠল, বলল, তবে যে সেদিন তুমি খবরের কাগজ পড়ে-পড়ে বললে—
ঐ আকাশ দিয়ে একটা হুসে চাঁদ বানা হয়েছে চাঁদের দেশে। ম্যাপ যদি এঁকে না নিয়ে থাকে
তাহলে রাস্তা ঠিক করল কি করে। জান দাদু, আমি সমস্ত আকাশটা খুঁজে খুঁজে দেখলাম, সেই
হুসে চাঁদটা দেখতে পেলাম না। তোমার খবর বোধ হয় ঠিক না দাদু।

অপূর্ববাবু হাকর মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে হাসতে লাগলেন, বললেন বেলা হয়েছে ; ঐ দেখো,
সাড়ে এগারোটাই। এবার ধৈর্য-দৈর্যে নাও।

কিন্তু এ-কথায় কান দিল না হাক, কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, কত মিথ্যে কথা যে
—সবকালে বেরয় তার ঠিক নেই। এত মিথ্যে কথা কাগজে কেন ছাপে দাদু ?

অপূর্ববাবু ইচ্ছে হ'ল যে তিনি বলেন, হ্যাঁ, খবরটা সত্যি মিথ্যে। তা'তে যদি তাঁর নাতির
ছামে ওঠা বন্ধ হয়, তাতে যদি তাঁর মেয়ের উদ্বেগ আর অশান্তি কমে। কিন্তু এমন মিথ্যে কথা বলতে
তাঁর ইচ্ছে হ'ল না। রাগী মানুষেরা চট করে মিথ্যে কথা বলতে পারে না। তিনি বললেন, খবরটা
সত্যি। কিন্তু সবই কি আমরা খালি চোখে দেখতে পাই হাকবাবু ? আমাদের চোখের দৃষ্টি আর
কতদূর যেতে পারে, বলা।

এ-কথাও উড়িয়ে দিল হাক, বলল, হ্যাঁ। সকলের চোখ তোমার চোখের মত কিনা। আমি
তো দেখতে পাই দাদা আকাশটাই।

হাসলেন অপূর্ববাবু, হাকর এ-কথার কোনো প্রতিবাদ করলেন না। প্রতিবাদ ক'রে ক'রে
এ-ছেলেকে সব কথা যে বোঝানো বাবে না তা তিনি বুঝেছেন।

হাক বলে, অত অগুস্তি তারা আকাশের ওই কত উঁচুতে-উঁচুতে উঠে গেছে, কই, সে-খবর তো
বের হয়নি কোনো কাগজে। কাগজে যখন বের হয়নি, তবে বৃষ্টি তারা কখনো ওঠেনি, তবে বৃষ্টি
ওইসব আলো সবই মিথ্যে, আর তোমার এই খবরটাই সত্যি, দাদু।

দাদুর সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে অনেক তর্ক করছে হাক। হুসে চাঁদ যদি উঠে থাকে তবে সে

তাকে খুঁজে বের করবেই, না করে ছাড়বে না—দাহুর কাছে বসে বসে সে তার এই প্রতিজ্ঞা জানাতে লাগল। এদিকে বেলাও বাড়তে লাগল ক্রমশঃ।

ছেলের কোনো খবর না পেয়ে মানসী এবার বিশেষ ব্যস্ত হয়েছে, ডেকে সাড়া পাচ্ছিল, তাই সাহস করে সে এবার সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠবার মতো তৈরি হ'ল।

মানসী সিঁড়ি বেয়ে দু-খাপ উঠেছে এমন সময় হাক বের হ'ল দাহুর ঘর থেকে। তার মাকে ওভাবে উঠতে দেখে সে বাধা দিয়ে উঠল, চীৎকার করে বলে উঠল, উঠোনা উঠোনা মা। ওটা বেজায় নড়ে।

মানসী কিরে চেরে বলল, কখন নেমেছিল তুই হতছাড়া। আমাকে পাগল করবি? কি আছে ছাদে আমি দেখব।

সিঁড়ির গারের কাছে এসে দাহুর পাশে দাঁড়িয়ে হাক বলল, দেখতে পাবে না, মা। দাছ বলেছে খালি চোখে দেখা যায় না।

—কি। কি দেখা যায় না?

সিঁড়ি থেকে নেমে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল মানসী।

হাক বলল, ছোট চাঁদ। ক'দিন ধরে কত খুঁজলাম মা। কিছুতে পাচ্ছিলে।

—তবে আর উঠবি নে বল। আর খুঁজবি নে?

কোনো উত্তর দিল না হাক। মার ধমক খেতে-খেতে সে স্নানাহার করতে গেল।

কিন্তু দুপুরবেলা আবার উধাও হ'ল সে। আবার তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ডেকে ডেকে সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না তার।

এবার ব্যস্ত হলেন অপূর্ববাবুও। খালি চোখে তিনি তাঁর ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর কাছে সমস্ত ছানিয়া কেমন কাপলা বলে ঠেকছে। তাঁর চশমাটি খুঁজে পাচ্ছেন না তিনি।

খালি চোখে নাকি দেখা যায় না, হাক তাই দাহুর চশমাটি নিয়ে এবার উঠেছে ছাদে। না, একটা অঘটন ঘটাতেই ছেলেটা। ওই মোটা চশমা চোখে এঁটে তার কাছেও ছানিয়া কাপলা হয়ে গিয়েছে নিশ্চয়। ওই ভাবে যদি সে সিঁড়ি বেয়ে নামতে চেষ্টা করে তাহলে সর্বনাশ নির্ণায়।

মানসীর বাধা টেলে ফেলে অপূর্ববাবু সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগলেন। জোর করে বেশি বাধা দিতে ভরসা পেল না মানসী। বাবার মেজাজ সে চেনে। শুধু বলতে লাগল, সাবধানে বাবা, সাবধানে।

খুব সন্তর্পণেই উঠছেন অপূর্ববাবু, সিঁড়ির খাপগুলোও ভালো দেখতে পাচ্ছেন না।

আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে আছে মানসী। ওই জ্ঞাড়া ছাদে বাবা যদি তাঁর ছেলেকে মেজাজ হারিয়ে প্রহার শুরু করেন তাহলে কি যে হবে, কি যে হবে—ভাবতে পারেনা মানসী।

হুই চোখে কাপড় চাপা দিয়ে সে অনড় ঠাঁড়িয়ে রইল একটা সর্বনাশের সংবাদের জন্তেই যেন।

কিন্তু আশ্চর্য, সিঁড়িতে শব্দ শুনে সে চেয়ে দেখল নেমে আসছে হারু, চোখে চশমা দিয়ে অপূর্ববাবু উঁকি দিয়ে দেখছেন।

ওরা দু'জনে নীচে এসে নামতেই মানসী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল, অপূর্ববাবু হেসে বললেন, ধরে নিয়ে এলাম তোমার স্নুদে টাসকে। চোখে চশমা নেই, কিছু দেখতে পাই নে। খালি চোখে কি দেখা যায় সব ?

হুঃখেন্ড হাসি পেল মানসীর। তার বাবার মেজাজের এই পরিবর্তন দেখে আশ্চর্যই বোধ হ'ল মানসীর। কোনো রকম অঘটন ঘটেনি দেখে মানসী হারুকে বলল, দাড়কে আজ ছাদে ওঠালি ? এমন দস্তি কেন হলি হারু ?

হারু রুবে ঠাঁড়িয়ে বলল, আমি একাই দস্তি বুঝি ? কেন, দাড়ও যে উঠল ?

—ওঁকে বারণ করে নাও।

—করবই তো !

কিন্তু বারণ করল না হারু। দাড়র সঙ্গে তাঁর ঘরে চলে গেল।

বিকেলের মিকে হঠাৎ সকলে ছুটে এল সিঁড়ির কাছে। কোথা থেকে একটা ভারি কাটারি

—ঘোঁগাড় করে হারু কাটতে আরম্ভ করেছে সিঁড়িটা।

—এ কি হারু, এ কি ?

কোনো উত্তর না দিয়ে সে কোণের পর কোণ দিয়ে চলেছে। অনেকটা কেটেও কলেছে এর মধ্যে।

—এ কি হারু, এ কি ?

কাটারি বাগিয়ে ধরে হারু নোজা হয়ে ঠাঁড়িয়ে বলল, দাড়র ছাদে বাগ্গার রাখা বন্ধ করছি। কত বারণ করলাম তখনতেই চায় না।

রঙের প্রভাব

সম্প্রতি বিশেষজ্ঞরা সাধারণ আলোর বহলে লাল, নীল, সবুজ বা হলদে আলো সযত্নে গবেষণা করে বলেছেন যে, নীল রঙে মাছদের ভাড়ান যায়; মানসিক অবদানগ্রস্ত রোগীদের ঘরে লাল রঙের জিনিসপত্র বেশী করে রাখলে তাদের মনের অবস্থা পরিবর্তিত হয়। কিন্তু হলদে রঙ নাকি অসুস্থতা বাড়ায়। বিশেষ করে গতিশীল অবস্থায় হলদে রঙের দিকে চেয়ে থাকলে হস্তশক্তি কমে যায় ব'লে, এরোগীদের ভিতর হলদে রঙ বখানসব এড়িয়ে চলা হয়।

ভিডি

ত্রীকায়াকীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

প্রিয়পুত্র, বা,

মনেছিলাম আচার নিয়ে ব্যাড়া করা শুভ হয় না। সে-কথা না মেনে গত ২রা ডিসেম্বর আচার নিয়ে দমদমে গেনে উঠেছিলাম। মঝোতে পৌছবার কথা ৪ঠা ডিসেম্বর। তার বমলে পৌছলাম ১৩ই ডিসেম্বর। খারাপ আবহাওয়ার জন্য দিল্লীতে সাত দিন আর কাবুলে তিন দিন আটকা পড়তে হয়েছিলো। শেষের দিকে মনে হচ্ছিলো এর চেয়ে বৃষ্টি হেঁটে এলেই তাড়াতাড়ি পৌছতাম! নাক-কান হচ্ছে, আর আচার নয়।

হয়রানির এক শেষ। দিল্লীতে রোজই শুনি কাল ভোর পাঁচটায় গেনে ছাড়বে। রাত দু'টোয় উঠে জিনিষপত্র বেঁধে এয়ারোড্রোমে বাই। সেখানে নানা কর্ম ভর্তি করি, বাক্স-প্যাটরা খুলে কার্গুম্‌স্‌ অক্সিসারদের দেখাই। তারপর শুনি: খারাপ আবহাওয়া, গেনে ছাড়বে না। মুখ হুন করে আবার হোটলে কিরি।

শেষে একদিন সত্যি-সত্যিই গেনে ছাড়লো। দিল্লীর এক বন্ধু তুলে দিতে রোজই আশেভেন। সেদিনও এসেছিলেন। তিনি বিদায় দেবার সময় বলেছিলেন গেনে উড়ে আকাশে মিলিয়ে না গেলে বাড়ি যাবেন না। প্রথমে হোলোও ঠিক তাই। গেনে বানিকট্টা মৌড়ে বিধা মুখে কিরে এলো। শুনলাম কী যেন ইঞ্জিনের গোলমাল হয়েছে। সারতে সময় লাগবে। আমরা তো হাল ছেড়ে দিলাম। কিন্তু বাই হোক বানিক পরে সত্যিই গেনে ছাড়লো। অমৃতসর ছুঁয়ে হুগুরে আমরা কাবুলে পৌছলাম।

সেদিনে কাবুলে চমৎকার আবহাওয়া। বকবকে নীল আকাশ, চারিদিকে বরফ-ঢাকা রূপলী পাহাড় কলমল করছে। এয়ারোড্রমে দেখলাম এয়ারোক্রোট কোম্পানির কশী গেনে দাঁড়িয়ে। ভাবলাম, বাক। আমকেই তা হলে মতো ব্যাড়া।

কিন্তু হায়, এয়ারোক্রোট কোম্পানির কশী ভজলোক ভাড়া-ভাড়া ইংরিজিতে জানালেন যে, আমাদের আসার খবর তিনি জানতেন না। তাই এ গেনে জায়গা দিতে পারবেন না। পরের বার যখন গেনে আসবে তখন জার্সা পাবো। আমাদের চোখের সামনে দিয়ে কাবুলের কাঁচা এয়ারোড্রোমের জল-কাশা ছিটকে, বানিক ছুটে; পাবার মতো শাশা কশী গেনে বরফের পাহাড়গুলোর উপর দিয়ে নীল আকাশে মিলিয়ে গেলো। আমাদের পেট হুঁই-হুঁই করছে, মুখ শুকনো। আমরা হোটলে গেলাম।

কাবুলের চারিদিক বড় হন্দর, শহরটা তত নোংরা। মাহুঘরা দে-রকম হন্দর দে-রকম গরীব। কান্দাহীরে কথা মনে পড়ে যায়। শহরে উড়োজাহাজ কোম্পানির আপিস। তারা

বললো ১৫ই ডিসেম্বরের আগে কোনো আশাই নেই, তাও সেদিন যদি আবহাওয়া ভালো থাকে। হায় আচার! এ যে হেঁটে কাঁটা ওপরে কাঁটা! কাবুল বেড়াবার কোনো উপায় নেই, দেখার কোনো ভাবনা নেই, বন্ধুবান্ধব আত্মীয়-স্বজন নেই, সবচেয়ে বড় কথা পকেটে পয়সাও নেই। আর দলে আমরা চারজন। আর তোমার নাতনীটিকে ভো চেনো!

কলকাতা খাবার সম্বন্ধে যে হোটেলের ছিলাম তার নাম কাবুল হোটেল। সেটার বাড়িটা খারাপ, কিন্তু তা হলেও সেটা শহরের মধ্যে এয়ারোপ্লেন কোম্পানির আপিসের পাশে। খাবারও বেশ ভালো। কিন্তু এখন সেটা ভাঙি। হোটেলের কর্তৃপক্ষ বললেন, তাঁরা একটা নতুন ড্রাক খুলেছেন। সেখানে আমাদের যেতে হবে। গেলাম। বাড়িটা নতুন, বেশ ভালো। হুঁ চারজন লোক আছে। কিন্তু শহরের অনেক বাইরে। খাবারও সেখানে রাখা হয় না। খাবার আসে শহরের কাবুল হোটেল থেকে। সেখানে পৌছতে পৌছতে বিকেল চারটে। সেখানকার খানদামালা না বোঝে হিম্মি, না বোঝে ইংরিজি, দুয়েকটা ভাঙা-জাঙা কথা ছাড়া। আমাদের ঘরের খানদামালাকে অনেক করে বোঝালাম : গরম পানি, হট ওয়াটার।

তার নাম হামিদ-মামুন। কর্ণা রঙ, হাসি-হাসি মুখ, ছেড়া পোশাক, ছেলেমানুষ।

এক মুখ হেসে সে বললো : No Sir!

বললাম : চা, Tea?

সে বললো : No Sir!

বললাম, সরল বাংলা বললাম : কিসে পেয়েছে, খাবার। তারপর আবার ইম্মিতে বোঝালাম।

হেসে সে বললো : No Sir! Night! Eight.

হারি আচার!

কাবুলে তখন বেশ ঠাণ্ডা। বরক গড়বো-পড়বো। রাত্রে কাবুল হোটেল থেকে যে খাবার এলো তার ছপটা বরফের সরবতের মতো, মাংসের চপ রেক্সিয়ারেটার থেকে যেন বার করা, ভাতগুলো কড়কড়ে। সবাইকার চোখে প্রায় জল এসে গেছে।

তোমার পুত্রবধূকে বললাম : আচার দিয়ে খাবে নাকি?

সে এমন কটমর্ট করো তাকালো যে আমি খাবি খেয়ে কনকনে ছপটা চকচক করে গিলে ফেললাম।

খাবার ঘরেই, আমাদের টেবিলের পাশে আমাদের মন প্রফুল্ল করার জন্য হামিদ মামুন একটা হাত কোমরে আর একটা হাত মাথার ব্রহ্ম তালুতে রেখে ঘুরে ঘুরে নাচছে আর গান গাইছে!

কাবুলে দিন তিনেক ছিলাম। আমি কখনো জ্বলে থাকিনি, কিন্তু জ্বলখানার অভিজ্ঞতা

হোলো। এর মধ্যে হামিদ-মামুদের সঙ্গে বেশ ভাব জমলো। তাঁর নানা সম্পত্তি আমাদের দেখালো : কয়েকটা ছেঁড়া কনী বই, লেনিনের একটি ব্যাজ, আর কয়েকটা কনী কোপেক। জানালো তারস্বর্গকে সে খুব ভালোবাসে, বোখাইতে যাবে, কিন্তু অভিনয় করবে—তারপর বোখাইয়ের এক অভিনেতার নাম করলো, যার নাম কনী দেশে শুনতে-শুনতে পাগল হয়ে গেছি।

এগারই ডিসেম্বর রাতে কারুলে খুব বরফ পড়লো। সবকিছুই শাদা। আকাশ গাঢ় নীল। আর বিকেলের দিকে খবর পেলাম কাল একটা স্পেঞ্জাল গ্লেন আসবে। তাতে আমাদের ভাষণ হবে। এতো খুশি বোধ হয় জীষনে হইনি।

পরের দিন খুব ভোরে গাড়ি এলো আমাদের এয়ারোড্রোমে নিয়ে যেতে। হামিদ-মামুদ বিদায় সেবার সময় এক মুখ হেসে বললো : You go, I go, hotel finish !

(আগামীবারে শেষ)

তিয়া

শ্রীম্মীলকুমার গুপ্ত

টিয়া, আমার টিয়া।

তোর বেদনা, বন্দীদশার

দুঃখে ভরে হিয়া।

সারা দিনই লোহার খাঁচায়

দাঁড়ের ওপর এক।

আঙড়াতে হয় বাঁধা বুলি

পেলেই লোকের দেখা।

একটুখানি ছোলার দানা,

স্নেহের বিনিময়ে

কত জ্বলুম, কড়া শাসন,

আটকে থাকি ভয়ে।

সবাই বলে পড়তে বসে

নামতা শতকিয়া ;

টিয়া, আমার টিয়া।

চার দেয়ালে বন্দী জীবন

সবার শাসন থেকে

চল ছ'জনে পালাই দূরে

জগৎ নিতে দেখে।

তোর খাঁচাটা উচুতে খুব,

ছুঁতেই সারা হই,

চুপি চুপি বলি তোকে—

গড়েছি এক মই।

এবার তোকে মুক্তি দেব

পালাব ছই জনে

নীল গিরি, শ্রাম মাঠে, হাটে

অজানা পথ বনে।

পাব কত আলোর পুতুল,

কুসুম মরমিয়া ;

টিয়া, আমার টিয়া।

রূপদক্ষ রূপলাল

[অগমবুড়ো].....

সন্ধ্যা, ভেবে দেখতে গেলে রূপলালের উপর যে কাজের ভার পড়েছে—সেইটেই সব চাইতে শক্ত।

কিছুদিন আগেও গোটা গ্রামটা বেন কিয়িয়ে ছিল। এখন ছেলের পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে—ওরা বেন সব বন্ধা-ছাড়া ঘোড়া। সবাই মিলে ঠিক করেছে—গ্রামের ছুটিতে কর্ণাধীন অভিনয় করবে।

মহোলাসে বহলা শুরু হয়ে গেছে। বাড়ী থেকে কারো পড়ার ভাড়া নেই। তাই সকাল, দুপুর, সন্ধ্যা আর রাতে ক্রমাগত অমিত্রাক্ষর-ছন্দ মুখস্থ করছে সবাই। এই পড়াটা যদি পরীক্ষার আগে হ'ত—তাহলে ওদের প্রমোশন কেউ আটকাতে পারত না।

কিন্তু সব চাইতে দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার পড়েছে রূপলালের ওপর। রূপলাল চমৎকারভাবে শাস্ত্রিয়ে দিতে পারে ছেলের। তাই বাহাগানে, ঘিয়েটারে, নৌকোবাচের রাধাকৃষ্ণের নাচে, গাঙ্গনেব সঙ সাক্সানোর কাজে রূপলালের ডাক পড়ে সকলের আগে। ভারী পরিকার হাত রূপলালের। সাধু বলো, মহোদী বলো, ডাকাত বলো, জল্লাদ বলো, মুনি বলো আর মুচি বলো—এমন অভুতভাবে শাস্ত্রিয়ে দেবে রূপলাল যে সেখে আর আসল মাহুয়টিকে চেনা বাবে না! অন্ন বয়েসেই রূপলাল সারা গায়ের চোখে একেবারে রূপদক্ষের আসন অধিকার করে বসেছে।

এই রূপলাল তার নিয়েছে—‘কর্ণাধীন’ নাটকে ছেলের এমনভাবে শাস্ত্রিয়ে দেবে যে,—কল্কাতার নাটক দেখেছে যারা—তারাও একেবারে ‘ধ’ বনে বাবে! কাউকে সাক্সাবে শিতামহ ভীষ্ম, কাউকে জ্ঞোণাচার্ঘ, আবার কাউকে অশ্ব ধৃতরাষ্ট্র।

সাদা চুল আর সাদা গৌণ দাড়ির বাড়াবাড়িটাই বেন বেশী।

পল্লী অকলে ত' আর ‘ক্লেপ্ হেরা’ পাওয়া যায় না—তাই গায়ের জেড়া খরে তার সাদা সাদা লোম—কাঁচি দিয়ে ছেঁতে নিতে হবে।

এ যাপারেরও রূপলাল এতটুকু শেহপা নয়। পকেটে কাঁচি লুকিয়ে নিয়ে সারাদিন মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়াচ্ছে রূপলাল, কোথায় কোন্‌ স্থযোগে ভেড়ার লোম কেটে নেয়া যায়।

কিন্তু তাতেও কি বিপদ কম? ভেড়ার মালিকরাও ভারী সজাগ হয়ে আছে। কি করে

তারা টের পেয়েছে, এবারকার নাটকে প্রচুর গৌণ-দাড়ি আর বাবরি চুলের দরকার। ভেড়াগুলোয় পিঠ নাকি একেবারে ছেলোদের দৌরাখ্যো দাখ্য হয়ে যাবে!

ওরাও রাখালদের বলে দিয়েছে, বেশি রে, খুব সাবধান! ভানপিটে ছোড়ার গল—কি থিয়েটার জুড়ে দিয়েছে! ভেড়ার লোম কেটে একেবারে নয়-ছয় করে ফেলবে। ভেড়াগুলো যাঁতে ছেড়ে দিয়ে গাঁছতলার পড়ে-পড়ে শুধু ঘুঘু নে যেন!

ফলে হয়েছে কি—রাখালরাও খুব হাঁসিয়ার হয়েছে। বেচারী রূপলালের পকেটের কাঁচি পকেটেই থেকে যাচ্ছে; না হচ্ছে জোপাচারের পাকা গৌণ, না হচ্ছে পিতামহ ভীষ্মের বাবরি চুল!

এরকম অসহযোগিতা চললে নাটক করা সত্যি শক্ত হয়ে উঠবে।

তাহলে কি রূপদক্ষ রূপলাল কোনো দক্ষতাই দেখাতে পারবে না!

সে তার হাতের কাঁচি শক্ত করে বাগিয়ে ধরে। তার চাপা ঠোঁটে একটা শক্ত সম্বন্ধ।

নিম্নের বেলা যদি না ঘোটে ত'—রাতের আধারেই ভেড়ার লোম বোঁগাড় করতে হবে।

রূপলাল এ ব্যাপারে একটা পরিকল্পনাও ঠিক করে ফেলেছে। জুতনাথ ভাগীরথীর বাড়ীর ভেড়াগুলো যেমন বড় তেমনি সামান্য খোকা-খোকা লোমে ভর্তি। কোন ঘরে ভেড়াগুলোকে রাখা হয়—রূপলাল ভালো করে খোঁজখবর নিয়ে রেখেছে।

গভীর রাত্রে কেউ ঘনম কোথাও ভেঁগে নেই—রূপলাল কাউকে কিছু না জানিয়ে,—পকেটে একটি কাঁচি নিয়ে রওনা হ'ল জুতনাথ ভাগীরথীর বাড়ির দিকে। বাইরের দিকে এককোণে একটি টালির ঘর। রূপলাল জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। ওই ত'—সামান্য সব ভেড়াগুলো যেনেতে শুয়ে ঝিমুচ্ছে। জানালার শিক ছুটি বৃত্তি করে সে সাঁকের আধারে আসল্গা করে রেখে গিয়েছিল। সেই দুটি শরীফে অভ্যস্ত সহজেই সে অন্ধকারে ঘরের ভেতর ঢুক পড়ল। তারপর কাঁচি বাগিয়ে নিয়ে সেই ভেড়ার পিঠের লোম কেটে নিয়ে যাবে—অমনি দেটা নড়ে উঠল, তারপর মাহুকের ভাবায় চাঁৎকার করে উঠল—চোর—চোর—চোর!

রূপলাল এই আচম্কা আক্রমণের লগ্নে আমোদ ভৈরী ছিল না। প্রথমটা সে ভারী হকচকিয়ে গেল, তারপর সেই ভাড়া জানালা টপকে একেবারে চৌ-চৌ মৌড়!

রূপলাল বত মৌড়োয় সেই লোকটাও তার পেছনে পেছনে চোর চোর বলে ততো ছোটে!

অন্ধকার রাত।

ঠিক মতো পথের হদিশ পাওয়া যায় না! ফণীমনসার খোপে কাপড় ছিঁড়ে, লাউ মাচায় থাক্য থেয়ে, পান্না-ভর্তি ভোবায় কাঁশিয়ে, রূপদক্ষ রূপলাল কোনোদিক দিয়ে নিজের জীবনটাকে হাতে করে ঘরে ফিরে যায়!

শিল্পীজীবনে যে এত স্মৃতি--সে কথা আগে জানা যায় নি !

কিন্তু রূপলালের সাধনাকৌশল ও সাবাস দিতে হয় ! নিমীথ রাত্রে যদি কার্ণোকার করা না যায় তাহলে দিন দুপুরেই মৃন্মিল আসান করতে হবে ।

রূপলাল এইবার সত্যি মরিয়া হয়ে উঠেছে । যে সব রাখাল ভেড়াগুলি মাঠে নিয়ে যায়—তার কি হোজই চোখ মেলে তাকিয়ে থাকবে ? একদিনও তাদের চোখের পাতার ঘুম নেমে আসবে না ?

কি হৃদয়ের নিঃস্বপ্ন দুপুর--রত্নর ঘন একেবারে ক'ণ-ক'ণ করছে । কোন্ বটগাছের পাতার আড়ালে লুকিয়ে ছুটি ঘুঘু উদাস-করা ডাক ভেঁকে চলছে ! কিরকিরে মিঠে হাওয়া স্বড়স্বড়ি গিছে গায়ে, গাছের ছায়ায় গামছা পেতে ঘুমিয়ে পড়বার মন্তে । রাখাল ছেলেরা এক-এক সময় কেমন পাগল-করা বাঁশের বাঁশী বাজায় । সেই বাঁশীর সুরে ত' আপনা থেকেই ঘুমপাড়ানি মাসী-পিসীরা চিলের মতো ডানা মেলে উড়ে আসে !

কখন ওরা ঘুমিয়ে পড়ে—সেই আশায় রূপলাল—এ-মাঠ ও-মাঠ ঘুরে বেড়ায় । কখনো গাছের ডালে বসে ওত পেতে থাকে । আবার কখনো বা ঝোপের আড়াল থেকে উকি মেরে মেখে রাখাল ছেলের দল কি করছে ।

না, ঘুম ওদের চোখ থেকে ছুটি নিয়ে ঘেন পালিয়েই গেছে ! কখনো ওরা গাছের ডালে দোলনা বেঁধে দোল খাচ্ছে, কখনো বা কৌচড় থেকে মুড়ি খেব করে চিবুচ্ছে, আবার তার ধানিক বাসেই বটগাছের ছায়ায় ড্যাংগুলি খেলতে লেগে গেছে !

এইসব কাণ্ড দেখে রূপলাল ভারী মৃন্মিলে পড়ে পেল ।

ওদিকে খিষেটারের দিনও এগিয়ে আসছে--কিন্তু কোথায় শ্রোণাচার্ণের সাদা গৌর ?... পিতামহ ভায়ের শেত স্তম্ভ কেশরাশি, আর কোথায় মহামতি বিদুরের দীর্ঘ শ্মশ্রু ?

রূপলাল ভাবে আর ঘামে, ঘামে আর বিরক্ত হয় । রূপলালের মনে দিনে নেই শান্তি, আর রাত্তিরে নেই চোখে ঘুম !

অবশেষে একদিন নিঃস্বপ্ন দুপুরে সে যখন গাছের ছায়ায় ছায়ায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল—এমন সময় একটা ঝোপের আড়ালে এসে রূপলাল থমকে দাঁড়ালো ।

প্রথমটা ও ঘেন নিজের চোখ দুটোকেই ভালো করে বিবাস করতে পারে নি !

ভাগুরীদের বাড়ির দিঘি মোটামোটা একটি নদর তেড়া ! ওর লোমগুলো দিয়ে বা চরংকার সাদা দাড়ি আর বাঘির তৈরি করা যাবে ।

ছেলেদের জিবে জল আসে যজ্ঞবাড়ির আরোহণে,—আর রূপলালের রসনা সিক্ত হ'ল পুকটু ভেড়ার কঁোকড়ানো সামা লোম দেখে।

হ্যাঁ, এইবার সে বিয়েটারে নিজের ক্যারামতি দেখাতে কার্পণ্য করবে না!

এক-পা দু-পা করে এগিয়ে যায় রূপলাল। ওর পা ছুটিতে বন-হরিণীর চকলতা!

হঠাৎ কোথায়ও কিছু নেই দু'খার থেকে দুটি বলিষ্ঠ হাত ওর ছুটি কাঁধ চেপে ধরে। সেই সঙ্গে শোনা যায় ভরাট গলার আওয়াজ—আমরা অনেকদিন থেকে তাকে তাকে আছি! হঁ-হঁ—আজ একবারে হাতে-নাতে ধরা পড়েছ বাছাখন!

রূপলালের কাছে কিন্তু সব হৈয়ালি বলে মনে হয়। পেছন ফিরে দেখে—দুই ঘাঁবুরেল মূর্তি! ইয়া পৌব—ইয়া গালগাটা!

ওরা ম্লোর মতো দাঁত বের করে হাসতে থাকে। রূপলাল মরিচা হয়ে প্রশ্ন করে, ব্যাপারটা কি? তোমরা দু'জনে দু'দিক থেকে এসে আমার কাঁধে চেপে বসলে কেন? মতলবটা কি তোমাদের?

লোক দুটো বদ্বিশ পাঁচ দাঁত বিকশিত করে আরো জোরে জোরে হাসির মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। একজন ফোড়ন কাটে, হঁ হঁ! ডাঙবে, তবু ছোঁড়া মচকাবে না!...

রূপলাল তখনো অন্ধকারে আছে। শুধু বলে, আমি কিন্তু কিছু বুঝতে পারছি নে!

তখন যে লোকটা বেশী বগা—সে বললে, আর নুকিরে লাভ কি চাঁদ? আমরা পুলিশের লোক। এই অঞ্চলে ডেড়া চুরি হচ্ছে অনেক আগে থেকেই খবর পেয়েছি। আজ তাকে তাকে হিলাম।

আর একজন রসিকতা করে টিপনো কাটলে, আজ সঙ্গে সঙ্গে বামাল-হুঙ্ক ধরে কেলেছি। এখন স্ত্রীমান্ন সোজা চলো খানায়—

রূপদক্ষ রূপলাল অনেক প্রতিবাদ করলে এবং প্ররুত ঘটনাটা বোকাবার চেষ্টা করলে। কিন্তু সেই ঘাঁবুরেল লোক দুটো ওর কোনো কথাতেই কান দিল না।

ছেলেদের বিয়েটারের কি গতি হ'ল তোমরা জিজ্ঞেস করছ?

বিয়েটার আর হবে কি করে?

রূপদক্ষ রূপলাল যে এখন হাঁহতে দিন কাটাচ্ছে। ত্রোণাচার্যের পাকা গোঁফ, পিতামহ জীঘের শব্দ বেশ, আর বিছরের শুভ্র দাঁড় এখন কে সরবরাহ করবে? তোমরা আগে সেই প্রশ্নের সমাধান করো!

স্থির বলেই মনে হয়। মাসের পর মাস কখনো কোন ঘরের সাহায্যে ওদের ব্যক্তিগত চলাচল থালা পড়ে। ২০০০ বছর আগে গ্রীক স্কোতিবিদ টলেমি যে তারকারাঞ্জির বর্ণনা দিয়েছিলেন, আজও আমরা তাদের সে-অবস্থায় দেখি। কেবল চাঁদ, গ্রহ কয়টি আর ঘাসের “বর্ণ্যমান ডায়া” বলা হয়, এরা আমাদের বেশ কাছে আছে বলেই, রাতের পর রাত এদের চলাচল চোখে পড়ে।

আমাদের অতি-পরিচিত মিসি গুরে; দেখতে অনেকটা বিরাট এক গরুর গাড়ীর চাকার মতো। ১,০০,০০০ আলো-বর্ষ এর ব্যাস। কিন্তু এই একটি নয়। দূরে, বহুদূরে, এত দূরে যে, দেখানকার আলো আসতে, আমাদের কাছে আসতে লক্ষ লক্ষ বছর লেগে যায়, দেখানে আছে আরও গ্যালাক্সি। এই স্থান বহু নয়, এখানে উল্লুস্ত স্থানেও কিছু বস্তু আছে; যদি বস্তু হ’ত তবে আমাদের সব চাইতে শক্তিশালী দূরবীক্ষণ দিয়ে ওর দশ কোটির ছবি তোলা যেত। এ কথাটা মনে রাখা দরকার যে, আমরা ব্রহ্মাণ্ডের মাত্র একটি ক্ষুদ্রাংশ দেখতে পারি। তাহলেই আমরা উপলব্ধি করতে পারব, আমাদের এই সৌরজগৎ কত নগণ্য—আর চাঁদ তার কতটুকু! তা ছাড়া, এই অজ্ঞাত সীমাহীন স্থানে আরও আরও অনেক সৌরজগৎ আছে।

আর একটি কথা। আমরা যে-পরিমাণে সৌরজগৎকে সাম্মিথ্যেছি, তাতে চাঁদে পৌঁছোতে এক সপ্তাহেরও কম সময় লাগবে, নব্বত সময়ের মধ্যে পুটোয়ও পৌঁছানো যাবে। কিন্তু তারকারাঞ্জির দূরত্ব অভাবনীয় অপরিমেয়; আলোর গতিতে (সেকেন্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল) যদি আমরা কখনো ছুটে পারি—আজকে অসম্ভব: বা অবিদ্যমান—তবু সেই তারকার রাজ্যে পৌঁছোতে বহু বছর লেগে যাবে। গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে যাতায়াত যদি বা সম্ভব, তারকা থেকে তারকার যাতায়াত দ্বিবাধুপ মাত্র।

ওরা সব নাগালের বাইরে—সেই অপরিমেয় দূরবর্তী স্থানে বহু বর্ষ বহু তারার কথা মনোহারী সন্বেহ নেই, কিন্তু আমাদের খুবই কাছে নিত্যকার পরমাখ্যায় চাঁদের দিকে তাকিয়ে যে খতি পাই এমন আর কিছুতে নয়।

চরিত্র গঠন

জাতিকে বড় হতে হলে তার চরিত্রবল থাকা চাই। চরিত্রহীনতাই সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দেয়, সমস্ত উন্নতির মূল শিথিল করে তোলে। মিথ্যা, ধান্দাবাদী, জাল-জুরাচি বা শঠতা প্রবঞ্চনার দ্বারা কখনও কখনও সাময়িক ভাবে আর্থসিদ্ধির হবিধা দেখা দিলেও, তার দ্বারা মাহুষ কখনও বড় হতে পারে না, জীবনে স্থায়ী উন্নতি করতে পারে না—এবং তার মহত্বেরও বিকাশ হয় না।

স ম া থ া ন

ভাবছে মাসী, ভাবছে পিসি
ঠাকমাও সেই সাথে
দিদি এবং মামীরাও
হাতটি দিয়ে মাথে ।
কালকে খোকার হাতেখড়ি
ভাবনাতো সেই নিয়ে,
খড়ি, শেলেট্ পাতা অল
হবেই বা কী দিয়ে ।
এ যুগেতে, কালি তো চাই
করছে ভালো কারা,
ভাবছে সবাই ঘামিয়ে মাথা
মা-তো ভেবেই সারা ।
বাবা শুনে হেসে যে কন
ভাবছো কেন সবে
খোকনবাবুর হাতেখড়ি
'মূলেধা'তেই হবে ।



আগি হলে ওদের
মটাপট কাণ্ড
করে দিতাম

চালিখাতের রাজা!
তুই কেবল চাল
দিতে জানিস!



বগুং আচ্ছা!
কবার্টি খেলা
কাকে বলে
দেখাচ্ছি!

সামাল ভাইরা! আমাদের নলীর
তৈরী স্যামো আসছেন।



আর ছেড়ে দে!
দেখো এক চড়ে
ওই মশার দফা
রফা করি!



খেলায় পরে



কতবার তাকে বলেছি
না ভুলু যে গায়ে জল
করতে হলে রোজ
তাকে দুধ আর
'ডালডা'য় রাঁধা
খাবার খেতে হবে!

'ডালডা' কমপুতির
অনেক গুণ।
'ডালডা' আপনাকে
বল দেবে আর আপনার
শরীর কমপুতি করে
তুলবে।

'ডালডা'য় রাঁধা
খাবার খেয়ে সজি
সঞ্চয় করুন।



পৃথিবীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

এইচ. জি. ওয়েলস্

বিখ্যাত পুস্তকের পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ

(মূল গ্রন্থের কুড়িটি মানচিত্র-সহ)

অনুবাদক—সুনীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

মনোজ ভট্টাচার্য ছ-টাকা

এইমাত্র বেহোলা

এইচ. জি. ওয়েলসের

দি ফুড অব্ দি গডস্ ২'০০

অনুবাদক—সুনীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের পটভূমিকায়

অপূর্ব উপস্থাপন

দি ফার্স্ট মেন ইন দি মুন ২'০০

দি ওয়ার অব্ দি ওয়ার্লডস ২'০০

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

চার যুগ ২'০০

পলবুড়োর স্বকমারি গল্প ১'২৫

স্ববীন্দ্রলাল রায়ের

অভিশপ্ত ১'০০

স্বকুমার দে সরকারের

মহুরকণী বন ২'০০

দুই খুনী ২'০০

হাল্কা হাসির গল্প ৩'৫০

পরিবহিত দ্বিতীয় সংস্করণ

সম্পাদক অমিয়কুমার চক্রবর্তী

আজব দেশে অমলা ১'৫০

হেমেন্দ্রকুমার রায়

অ্যালিস ইন ওয়াণ্ডারল্যান্ড

অবলম্বনে। ৪র্থ সংস্করণ

ল্যাক লওনের

হোয়াইট ক্যাড ২'০০

আলেকজান্ডার ডুমার

কবিক্যাম প্রাদাস ১'৫০

ল্যাক টিউলিপ ১'৫০

হোমারের

ইলিাড ১'০০ অডিসি ১'২৫

নার্ভটসের

ডন কুইকস্মোট ১'০০

জরাসন্ধর ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প ২'০০

এই সিরিজে ইতিপূর্বে বেরিয়েছে

থ্রেমেল্স • অচিন্ত্য • শিবরাম • বিকুতি

বন্দ্যো • তারাসন্ধর • শরদিসু •

শৈলজানন্দ • সৌরীন্দ্র • লীলা মজুমদার •

নারায়ণ • স্ববীন্দ্রলাল রায় • মণিলাল

গঙ্গো • মোহনলাল • কামাক্ষী •

মনোরঞ্জন • সুরকুমার দে সরকার •

আশাপূর্ণা • বৃদ্ধদেব

প্রতি বই ছ-টাকা

বিদেশী গল্পগুচ্ছ ৩'৫০

সম্পাদক অমিয়কুমার চক্রবর্তী

টলস্টয়, আনাভোল ফ্রাঁস, পো, ও. হেনরি,

স্টিভেনসন ইত্যাদির একটা করে গল্প নিয়ে

তেরোটা গল্পের পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ।

বুদ্ধি ও উপস্থিত-বুদ্ধি

শ্রীঅসমজ মুখোপাধ্যায়

বুদ্ধি ও উপস্থিত-বুদ্ধি এক জিনিষ নয়। দুটিতে অনেক প্রভেদ। বুদ্ধি অনেকেরই থাকতে পারে, কিন্তু উপস্থিত-বুদ্ধি কম লোকেরই থাকে। উপস্থিত-বুদ্ধিকে ভালো কথায় বলা হয়—প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব। এ জিনিষ স্থল কলেজে পড়ে বা চেষ্টা করে আয়ত্ত করা যায় না, যার হয়, তার এমনিতেই হয়। এটা তার জন্মগত অধিকার। অনেক সময় অনেকের উপস্থিত-বুদ্ধি আমাদের চমক লাগিয়ে দেয়। অপরপক্ষে সাধারণ বুদ্ধিও বিলম্বে কোনও কাজে লাগে না, তা বুঝা হ'য়ে যায়। তাই একটা প্রবাদ আছে—‘চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ি’। অর্থাৎ চোর চুরি করে যদি পালিয়ে যায়, তখন আর বুদ্ধির চালনা করে কোন ফল বা লাভ হয় না। এইজন্য উপস্থিত-বুদ্ধির কার্যকারিতা ও মূল্য খুবই বেশী। উপস্থিত-বুদ্ধি সম্বন্ধে দু'একটা ঘটনা বলা যাক। তোমাদের মধ্যে অনেকেই হয়ত এই সব কাহিনীর সঙ্গে পরিচিত আছ; আবার অনেকের হয়ত পরিচয় নেই।

বাংলার মে-জুনের দিন। এখনকার মত তখন স্থল-কলেজ ছিল না; ছিল শুধু—প্রত্যেক জেলায় দু'চারটে করে ‘টোল’। এই সব টোলেই তখনকার মিনের ছাত্রেরা ব্যাকরণ, কাব্য, সাহিত্য, পুৰাণ, দর্শন, বেদ, বেদান্ত ইত্যাদি অধ্যয়ন করে কৃতবিদ্য হোত। ছাত্ররা টোলেই বাস করতো এবং টোলের অধ্যাপক, তাঁদের সবাইকে বিভ্রাদানের সঙ্গে অধ্যানও করতেন। এর পরিবর্তে ছাত্ররা তাঁকে ধান-চাল, দাঁল-কলাই ইত্যাদি নিম্ন নিম্ন ক্ষেত্রজ ফসল দিয়া সাহায্য করত।

একদিন এমনি কোন-এক টোলে, গুরুশ্রমশ্রী তাবাক খাবেন বলে একটি ছাত্রকে পাশের বাড়ি থেকে আগুন আনতে বললেন। তখনকার দিনে এখনকার মত ‘পাথুরে কল্লার’ চাল ছিল না; প্রত্যেক গৃহস্থ ঘরে তখন কাঠের জ্বালে রান্না হোত। তখন সকাল বেলা; গৃহকর্ত্তী উনানে কাঠ জালিয়ে রান্না করছিলেন। ছেলেটি দেখানে গিয়ে কিছু আগুন চাইলে, তিনি উনান থেকে লোহার হাতা কোরে বহুদেখও জলন্ত কাঠ বার কোরে এনে বললেন—“পাত্র এমোছো? কিসে নেবে?” ছেলেটি কোনও পাত্র আনে নি, অথচ পণ্ডিতমশায়ের তামাক খাবার জন্ত আগুন নিয়ে যেতেই হবে। পুনরাব্র ফিরে গিয়ে একটা পাত্র আনা—তা'তে অনেকটা সময় বাবে। তখন তার মাথায় একটা বুদ্ধি যোগালো। সে উঠানের একপাশে তৃপীকৃত ধূলা-বালি এক আঁচলা নিয়ে, গৃহকর্ত্তীকে বললে—“মা, আমার এই আঁচলার ওপর ঐ জলন্ত ‘করলাখওগুলো দিন।” গৃহকর্ত্তী তাই দিলেন এবং ছেলেটির এই উপস্থিত-বুদ্ধির সন্তোষ মনে মনে তার প্রশংসা করলেন।

ছাত্রটির এই উপস্থিতি-বৃদ্ধি যদি না থাকতো, তাহলে সে টোলে ঘিরে গিয়ে, কোনও পাঞ্জের সম্মান করতো এবং তাই নিয়ে আবার এগে আগুন নিয়ে বেত। তাতে অনেকটা সময় ব্যা নষ্ট হতো। তাকে এইভাবে আগুন নিয়ে আসতে দেখে, অধ্যাপক শশাংক তার বৃদ্ধির তারিক করলেন।

আর একটা ঘটনার কথা বলি। এ ঘটনার কথা অনেক পাঠ্যপুস্তকেই আছে এবং অনেকেরই হৃদয় জ্বল।

দেশ—জাপান। সমুদ্রের ঠিক ওপরেই একটি ছোট পল্লী ছিল। পল্লীতে প্রায় চারশো লোকের বাস। সকলেই চাষী। সমুদ্রতীরবর্তী এই পল্লীর পাশেই খামিকটা উঁচু হালকুমি, যা সমুদ্র-পৃষ্ঠ ও ঐ পল্লী থেকে অনেকটা উঁচু। সেই উঁচু ভূমিখণ্ডে পল্লীর মোড়লের গৃহ; সেখানে তিনি পুরুষাবৃত্তে ছেলেপুলে নান্দিত-নান্দিত নিয়ে বাস করেন। তাঁর নাম—হামাগুচি। হামাগুচি তখন অশীতিপর বৃদ্ধ হোয়ে পড়েছেন। ছেলেবেলায় তিনি তাঁর ঠাকুরদাদার মুখে শুনেছিলেন যে, কখনো-কখনো সমুদ্র ক্ষেপে ওঠে এবং সমস্ত নিম্নভূমি ভাঙিয়ে নিয়ে যায়। তাঁর ঠাকুরদাদার আমলে সমুদ্র একবার এইরকম ক্ষেপে উঠেছিল, এবং যে নিম্নভূমিতে এখন চারশো লোক নিবসিত হোয়ে মনের সুখে বাস করছে, তা ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। বাড়ি, ঘর-দোর, বাগান-বাগিচা, চাষের ক্ষেত, বাহন, গৃহপালিত পশু ইত্যাদি সেই প্রাণের হাত থেকে কিছুই - এবং কেহই রক্ষা পায় নি। বহুকালের কথা সে। তারপর আবার নতুন করে এখানে পল্লী গড়ে উঠেছে।

একদিন পল্লীবাসীদের মধ্যে কি-একটা উৎসব চলেছে। সকলেই সেই উৎসবে মত্ত; শুধু বৃদ্ধ হামাগুচি নিম্নভূমিতে নেমে সেই উৎসবে যোগ দিতে পারেন নি। তখন অপরাহ্নকাল। তিনি বারান্দায় একখানা আরাম-কেন্দারায় বোসে, নীচে পল্লীবাসীদের আনন্দ-উৎসব দেখছিলেন। হঠাৎ একটুখানি ভূমিকম্প হোয়ে গেল। জাপানে প্রায়ই ভূমিকম্প হয়। ভূমিকম্প হতেই হামাগুচি দ্বিরদ্বিগতে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে বইলেন। তিনি লক্ষ্য করলেন, সমুদ্রের তল তীরের সীমারেখা থেকে ক্রমেই নেমে যাচ্ছে। তাঁর ঠাকুরা তাঁকে বলেছিলেন ভূমিকম্পের পরই সমুদ্রতলের এইরূপ অবস্থা হোলে, জানাবে যে, সমুদ্র ভীষণভাবে ফুলে উঠে, তীরবর্তী সমস্ত স্থান ভাঙিয়ে নিয়ে যাবে; তা থেকে কেউই রক্ষা পাবে না। হামাগুচি এখন সমুদ্রের সেইরূপ অবস্থা দেখে,—মনে মনে ভীত ও চকল হোয়ে পড়লেন। আর কিছুক্ষণ পরেই সমুদ্র ক্ষেপে উঠে, নীচের পল্লী ও পল্লীবাসীদের নিশ্চিহ্ন কোরে গেবে। কি করা যায়? সমুদ্রও আর নেই। একটু পরেই সমস্ত পল্লীস্থলু এই চারশো লোক, ও তাঁদের বাড়ী-ঘর, গবাদি পশু সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হবে। নিশ্চিত-বিপদের

আশ্চর্য কৃষ্ণের মন চকল হোরে উঠলো। এ অবস্থায় কি করা যায়? হঠাৎ ভগবান সহায় হোলেন। তাঁর মাধ্যম তখনই একটা বুদ্ধি এলো। তাঁর কয়েকটা শত্রুর গোলা ছিল। তিনি শস্ত্র-ভরা তাঁর সেই সব গোলাতে আগুন ধরিয়ে দিলেন। সঙ্গে-সঙ্গে বিরাট অগ্নিশিখা গগনমণ্ডলে পরিব্যাপ্ত হোয়ে পড়লো। নৌচেকার উৎসব-মস্ত চারশো লোক এই ব্যাপার দেখে প্রাণশয় নিকিতে ছুটতে ছুটতে, ওপরে উঠে এলো। একটু পরেই হামাগুচি বা অহুমান করেছিলেন, সেই ভীষণ ব্যাপার ঘটলো। হঠাৎ সমুদ্র ভীষণ গর্জনে ফুলে উঠে, সমস্ত পন্নীকে ভাসিয়ে, ডুবিয়ে, নিশ্চিহ্ন কোরে দিলে।

হামাগুচির এই সমরোচিত বুদ্ধিই হোল—প্রত্যাংপরমতিষ বা উপস্থিত-বুদ্ধি।

আর একটি উপস্থিত-বুদ্ধির কাহিনী বলি। এটি ইউরোপের ঘটনা।

এক নাম-করা চিত্র-শিল্পী। খুব সুন্দর একখানা ছবি একেছেন। বার-বার ছবিখানার দিকে চেয়ে দেখছেন। বোলা ছান; আলসে নেই। ভৃত্যকে বললেন—“ছবিখানা তুই খাড়া কোরে ধরে রাখ, একটু ভক্তাত থেকে আমি দেখি। ভৃত্য সেখানা দাঁড়-করানো অবস্থায় ধরে রইলো। চিত্রকর হুঁচোর পা ভক্তাত থেকে সেবতে লাগলেন। মনে মনে তারি আনন্দ চিত্রকরের। আরো হুঁচোর পা পেছিয়ে গিয়ে দেখলেন; কী সুন্দর! চিত্রকর তন্ময় হোয়ে গেলেন; আরো হুঁএক পা পিছু হঠে দেখতে লাগলেন,—আরো এক-পা...আরো...। হঠাৎ ভৃত্য সেইখানে রক্ষিত রংয়ের বাট থেকে এক থাবলা রং নিয়ে ছবিখানার ওপর মাথিয়ে দিয়ে, একেবারে সেখানা নষ্ট কোরে দিলে। সঙ্গে-সঙ্গেই চিত্রকর অশ্রুপর্ণা হোয়ে ছুটে এলেন ও ভৃত্যকে অমবরত কিল, চড়, ছুঁই মারতে লাগলেন। ভৃত্য বলতে লাগলো—“মার খেতে যেতে যদি আমি মরেও যাই, তাতেও আমার সুখ; কারণ জ্ঞান আমার প্রভুকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে আমি বাঁচাতে পেরেছি।” চিত্রকর তখন ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন। আলসে-বিহীন খোলা হাসে যদি তিনি আর এক-পা পিছু হঠতেন, তাহলেই তিনি নৌচেকার পাখরের খাদের মধ্যে পড়ে যেতেন। সেক্ষণ ঘটলে তিনি কিছুতেই বাঁচতেন না। ভৃত্য সে সময় যদি চীৎকার কোরে তাঁকে সাবধান কোরে দিত, তাতে কোনও ফলই হোত না, তার আগেই তিনি পড়ে যেতেন। স্বতরাং ভৃত্য যা করেছে, তা ছাড়া আর উপায় ছিল না। ছবিখানা নষ্ট হওয়ার্তে সামান্য কিছু অর্থ হ্রাস নষ্ট হোল, কিন্তু একটা অমূল্য প্রাণ রক্ষা হোল এবং ভৃত্যটির উপস্থিত-বুদ্ধি বা প্রত্যাংপরমতিষের জন্মই হোল।

উপস্থিত-বুদ্ধি সম্বন্ধে অনেক ঘটনা অনেক কাহিনী স্মরণে পাওয়া যায়। উপস্থিত-বুদ্ধির একটি ঘটনার কথা, তোমরা পড়ে থাকবে। বাংলা ‘কথামালা’তেও আছে। দুই বন্ধু একসা বন-পথ দিয়ে যেতে যেতে অদূরে এক বিরাট আকার ভাঙ্গুক দেখতে পায়। প্রাণ

বাঁচাবার জন্য এক-বন্ধু নিকটস্থ একটা গাছে চড়ে, ভাল-পাতার মধ্যে আত্মগোপন করে রইলো। অপর বন্ধু গাছে চড়তে জানতো না। ছুটে পালাবার চেষ্টা করলে, বিপদকে আরো ভেঁকে আনা হবে। হঠাৎ তার মাথায় এক বৃদ্ধি এলো; সে মড়ার মত চিং বোরে সেখানে পড়ে রইল। সে জানতো যে, ভালুকরা বরা মাহুষ স্পর্শ করে না। ঠিকই তাই। কিছুক্ষণ পরেই সেই ভীষণ দর্শন ভালুক ঐ লোকটার কাছে এলো; তার আপাদমস্তক স্তূক-স্তূক দেখতে লাগলো এবং শেষ পর্যন্ত তাকে মৃতজ্ঞান কোরে, গভীর জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে গেল।

একেই বলে প্রত্যাশপন্নমতিত্ব। মাহুষকে ভগবানের এটা মন্ত দান। এ ভিনিস পুঁথিপত্রর পড়ে আশস্ত করা যায় না; বার হয়, তার হয়; বার হয় না, তার হয় না। তবে চেষ্টা ও অহুসিলনের ঘাটা কিছুটা হৃদয় লাভ করতেও পারা যায়।

মৌচাক

শ্রীআশুতোষ সান্যাল

আমি শিশুদের সাথী !
উজ্জল করেছে ওরা যে আমার
কতো কালো অমারান্তি।

ওরা হৃদম, ওরা হৃবীর,
যাহা পায় ভেঙ্গে করে চুরমার ;
ঐ চাঁদমুখে উঠিছে বলকি ,
কতো যে চাঁদের ভাতি।

কচিমুখে কলহাসি—
ফুটে আছে যেন রজনীভোরের
গন্ধরীজের রাশি।

ঐ অবাধ্য, ছরস্কন্দল
কবির স্বপন করিবে সফল ;—
ওদেরি মুখের পানে চেয়ে আছে
আমার স্বদেশবাসী।

ঐ যে অবোধ শিশু,—
ওর মাঝখানে দেবিবারে পাই
শ্রীরামকৃষ্ণ, যিশু।

ওরা জীবনের অক্ষুট কলিকা,
হোক ছোটো—তবু আশুনের শিখা,
সংসার-পাঁকে পঙ্কজ ওরা,—
নহে আর কোনো কিছু।

ছোটদের জন্য ম্যাজিক

যাতুরত্নাকর এ. সি. সরকার



সেবার লগুনের এক কিশোর
মজলিশে একটি চাক-পনেরো বছরের
ছেলেকে দেখাতে দেখেছিলাম একটি
খুবই মজার তারের ম্যাজিক।
তার সহজ অনাড়ম্বর প্রদর্শনভঙ্গীর
শুনে এই সামান্য খেলাটিও এত
বেশী চমকপ্রদ হয়ে উঠেছিল যে,
বয়স্ক দর্শকেরাও হয়ে গিয়েছিলেন
বিশ্বরে নির্বাক।

লগুনের রাসেল স্কয়ার
অঞ্চলের একটি বড় বাড়ীর হলঘরে
সেদিন হচ্ছিল এই মজলিশ। আমি

সেদিন সেখানে উপস্থিত ছিলাম বিশিষ্ট অতিথি হিসাবে। অল্প কিছুদিন আগেই এই প্রতিষ্ঠানের
একটি অহুষ্ঠানে আমাকে দেখাতে হয়েছিল আমার কয়েকটি খেলা। যে ছেলেটির কথা বললাম,
তাকে একদিক দিয়ে ধরতে গেলে আমার শিগ্গাও বলতে পারো। কারণ, অনেকগুলো ম্যাজিক সে
নিবেছিল আমার কাছ থেকে।

প্রথমে ছেলেটি এক প্যাকেট তাস আর একটি কেন্ট হাট দর্শকদের হাতে দিল পরীক্ষা করে
সেবার লগু। পরীক্ষা করা হয়ে গেলে একটি কামাল দিয়ে আচ্ছা করে বেঁধে দেয়া হ'ল ছেলেটির চোখ।
এর পরে ভরনৈক দর্শক প্যাকেট থেকে বোছে নিলেন তাঁর ইচ্ছে মতন একটি তাস। এই তাসটি সবাই
সেবে সেবার পরে প্যাকেটের অবশিষ্ট তাসগুলি টুপির মধ্যে রেখে ছেলেটির হাতে ফেরত দেয়া হ'ল
টুপিটা। সবাই দেখে সেবার পরে নির্বাচিত তাসটি ছেলেটির হাতে ফেরত দেয়া হ'ল, (তার চোখ
বাঁধা থাকায় তার পক্ষে এ তাস দেখা মোটেই সম্ভব হ'ল না) সে তৎক্ষণাত্ টুপির মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে
দিল তাসটি। একজন দর্শক এসে টুপির মধ্যে সবগুলো তাসকে আচ্ছা করে মিলিয়ে দিলেন।

এইবার স্বক হ'ল আসল ম্যাজিক। ছেলেটি নিজের মাথার উপরে একটি হাত রেখে কিছুক্ষণ
মনঃসংযোগ করে টুপির মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে হাতড়ে বেব করলো নির্বাচিত তাস। সবাইকার
হাততালিতে মুখর হয়ে উঠলো চারিদিক।

জান কি কেমন করে এ খেলা সেখানে যায় ? জান না ? কিন্তু খুঁই সহজ । যখন নির্বাচিত ভাসটি ছেলেটির হাতে নেওয়া হ'ল, তখনই কোশলে সে ঐ ভাসের একটি কোণ ভাঁজ করে ছুঁড়ে দিয়েছিল । নিপুণভাবে এই কারখানিটি সে করেছিল বলেই কেউ ধরতে পারেনি তা । টুপির ভেতরে হাত ঢুকিয়ে হাতড়িয়ে হাতড়িয়ে সে এই কোণভাঙা ভাসটাই বের করে এনেছিল । বুঝলে এখন ব্যাপারটা ?

নববর্ষের গান

কল্কি বন্দ্যোপাধ্যায়

এসো এসো নবীন বরষ—

নীল গগনের সোনার ভোরে,—

এসো সবুজ বন-আড়িনা

পাখীর গানে মুগ্ধ ক'রে ।

ফুলের গন্ধে মিষ্টি হাওয়ায়—

দোলনা দোলার নবীন সাথী

খোঁকার খেলাঘরে এসে

দাঁও গো নতুন আসন পাতি ।

এসো খুকুখ মালা গাঁথায়

আলো-ছায়ার সকাল বেলা ।

সোনার বাঁশী বাজিয়ে এসো

চাঁপার তলে খেলতে খেলা ।

এসো হরিৎ-ইন্ডুলেতে—

বিকেল বেলায় গল্প বলার ।

টুকরো আলোর সীক-জোৎস্নায়,

এসো মিষ্টি বজুলতলায়,—

কুহুহ দল এসো আঁজি

নতুন জ্বর নিয়ে সাথে ।

সাঁঝের বেলা নতুন তারা

ওই হেসেছে গগন পাতে ।

মউল-ঝরা ওপার গাঁয়ে

সাঁওতালোয় বাজায় হাদল ।

সে পথ দিয়ে এসো তুমি

মউল বগের ঝরিয়ে বাদল ।

নতুন পরশ নিয়ে সাবী

মোদের লবে নতুন ক'রে ।

ঝিমিয়ে পড়া প্রাণগুলিরে

আঁশুন আলোয় আবার ভরে ।

এসো এসো নবীন বরষ

গহিছি তোমার বরণ-পীতি ।

আঁকাশ-বাতাস জ্বলন ভ'রে

ছড়িয়ে দিও তোমার প্রীতি ॥



সবজ্যান্ডার আসব ...

কাগজের আবিষ্কার

দ্বিগুঞ্জ শর্মা



সব চাইতে মজা এই—আমরা যে এত বই পড়ি, কত কি কাগজে লেখি। এমন কি যে সব ছবি কাগজে ছাপা দেখি, তার প্রায় বৌরভাগ কাগজই আসে বিশেষ থেকে। আর সেই কাগজ আসা যদি কোন কারণে বন্ধ হয়, তাহলে আমাদের দেশে বই ছাপানোও একেবারে অচল!

অথচ এমন অবস্থা, একদিন আমাদের কাগজের বোলাভেও ছিল। তবে উরত ধরনের কাগজ কি করে হয়? আজও কেন আমরা তা তৈরী করা শিখিনা, এ কথাটা কেউ ভাবি না! তাই কাগজ হচ্ছে আমাদের আর একটি সমস্যা।

আবার দেখ, যে বিনিমতি সর্বপ্রথম আবিষ্কার হ'ল চীনে, তা চালু হয়ে গেল ইউরোপে। ১৪৫৬ সালে প্রথম বাইবেল পুস্তক ছাপানো হয় এই কাগজ দিয়ে। যদিও ১৭৪৬ সালে, হঠাৎ একদিন স্বাক্ষার বলে এক ধর্মবিশ্বাসের নজরে পড়ে—গাছের ছালে বোলতার জিহবের লালা মেশানো মণ্ডে বোলতার সব তৈরী করছে, তাদের বাসার পরদায় ঢাকা সেই কাগজের মত আবরণ। তবুও প্রায় ন'শো বছর আগে, ইউরোপে এক ধরনের কাগজ আবিষ্কার করেছিল এক মিশরীয়। অর্থাৎ সে কাগজ নীল-বাগড়া বা প্যাপাইরাস থেকে তৈরী হয়েছিল বলে—কাগজের বিলেতী নাম হয়ে গেল পেপার।

চীনেরাই সর্বপ্রথমে কাগজ আবিষ্কার করে। মধ্য-এশিয়ার পথ দিয়ে চীনের সংস্পর্শে আসায় ৮ম শতকে আরবরাও এই বিজ্ঞা আয়ত্ত করে এবং ১০৪ অব্দে বোগদাদে প্রথম কাগজের কারখানা।



স্থাপিত হয়। ক্রমে স্পেনের মরসের দ্বারা ইউরোপে কাগজ ১২শ শতকের কাছাকাছি সময় প্রচারিত হয়।

কিন্তু যে উপাধানে আজকের কাগজ তৈরী হয়, সে জিনিষ তৈরী করেছিল খৃষ্টাব্দের দু'শো বছর আগে, চীনদেশের এক রাজকর্মচারী। নাম তার সাইলোন। তারপর বহুকাল কেটে গেল, চীনের বিখ্যাত প্রাচীরের একটি কেয়ার লুকানো স্থান থেকে পাওয়া গেল, সেই সাইলোনের আবৃত্তি কিছু কাগজের বাণ্ডিল, একটি দিঘের কি'তে ও কিছু কাঠের ফলকে চীনে ভাবায় লিখিত কাগজ তৈরীর জন্ম-ইতিহাস।

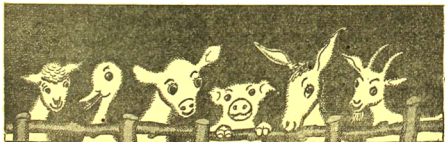
এছাড়া প্রথম ছাপানো কাগজের নোট বা লম্বায় এক ফুটেরও বেশী, তা ছাপা হয়েছিলো চীনে ৬০০ খৃষ্টাব্দে। আজও তার একখানা নোট অবিকৃত অবস্থায় আছে ইংলণ্ডের কেমব্রিজ মিউজিয়ামে।



তারপর বহুকাল পরে ইউরোপে প্রথম ব্যাক নোট চালু হয় ১৬৪২ সালে। তবুও সব চাইতে আশ্চর্য লাগে, যখন সেই চীনে নোট লম্বায় কাগজকাঠি আকারে রঙে ভ্রাণনের ছবি ও চীন সাম্রাজ্যের ম্যাপ দিয়ে ছাপা হতো—তখন আমাদের দেশে হয়তো তুলট কাগজের আর তালপাতার পুঁথি নিয়েই খুঁই থাকতো, কিন্তু ইংলণ্ডের লোক গভীর অজ্ঞতা নিয়ে বনে বনে ঘুরতো।

আমাদের দেশে মুদলমানরাই সর্বপ্রথম কাগজ আনে। তার আগে ভূর্জপত্র, তালপত্র লেখার জন্য ব্যবহার হ'ত। মুদলমান আমলে প্রায় প্রত্যেক শহরে কাগজ মণ্ডী বা পল্লী ছিল। এখনো প্রাচীন প্রথায় হাতে তৈরি কাগজ অনেক কাগজপাওয়া যায়। এক সময় বিক্রমপুর, মুন্সিগাঁও, জয়পুর, মথুরা, হগলী প্রভৃতি স্থানগুলি এজন্য বিখ্যাত ছিল।

তবুতবর্বে প্রথম কাগজের কল খোলা হয় দক্ষিণ-ভারতে ১৮ শতকে। ১৯ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে কলিতে (হাওড়া) কাগজের কল স্থাপিত হয়। এখন ভারতের বহু স্থানে কাগজের কল স্থাপিত হয়েছে এবং 'নিউজ প্রিন্ট', অর্থাৎ খবরের কাগজ ছাপার জন্য বিশেষ শ্রেণীর যে কাগজ বিশেষে ছাড়া তৈরি হ'ত না, তাও এদেশে তৈরি হতে আরম্ভ হয়েছে।





গ্রন্থক গ্রাহিকদের লেখা

রবি-কবি

জনম তোমার হ'ল পঁচিশে বৈশাখে,
শিষ্ট শিকী গায় গান নবপত্র শাখে।
প্রণাম তোমায় কবি ভারত-রবি,
(আমি) ঘরে ঘরে পূজো হর তোমার ছবি।

শ্রীমদতি সুধোশাখ্যায়

—

গান্ধীজী

“পরিজ্ঞাপায় সাধুনাথ
বিনাশায় চ দুষ্কৃতায়
ধর্ম সংস্থাপনার্থায়
সন্ততামি যুগে যুগে।”

বনই পৃথিবীতে পাপ দেখা দেয়, ধর্মের
বিপত্তি আসে, তখনই আভির্ভাব হয় কোন
মহাপুরুষের। ঈর নির্দেশিত পথে দেশ আবার
হয় গ্রামীমুক্ত। এই রকমই ভারত বখন ছিল
বিশেষ শাসনে ধর্ষিত, ভারতের ধর্ম, সংস্কৃতি
হ'তে চলেছিল বিপন্ন, তখন বিধাতার আশীর্বাদের
মতই জয়গ্রহণ করলেন মহাত্মা গান্ধী। ঈর
আদর্শে অহিংসার পথে সত্য ও অহিংসার পথে
দেশ ফিরে গেল স্বাধীনতা। দেশবাসীকে তিনি
অভয়ময়ী বীক্ষিত করেছিলেন। তিনি ছিলেন
শতা ও প্রেমের প্রতীক।

গান্ধীজী ছিলেন প্রকৃত সাহসী। তাই
জীবনের কোন অবস্থাতেই বিচলিত হননি তিনি।
শমত নোয়াখালী বখন হিন্দু-মুসলমানের গৃহযুদ্ধে
রত, তখন শান্তির দূত গান্ধীজী ঘুরে বেড়িয়েছেন
গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। বন্ধু স্বাপনের উদ্দেশ্যে।
সঙ্গে ছিল কবিগুরুর অভয়ময়—

‘যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে,
তবে একলা চলোরে।’

মাহুব হিসাবেও তিনি ছিলেন আদর্শ। তিনি
বলেছিলেন—‘আমার জীবনই আমার বাণী’।
অতি বড় আদর্শনিষ্ঠ মানব না হ'লে নিজের
জীবন সম্বন্ধে এমন কথা কেউ বলতে পারে না।

যেশের কাকের মত অনেকবার তাঁকে করতে
হয়েছিল কারাবরণ। কিন্তু তাতে পেছপা হননি



বাজার থেকে
শিল্পী : শ্রীশরীর রায়চৌধুরী



পল্লী-কুটীর

শিল্পী : প্রীতীতি ঘোষ (পরিচেরী)

তিনি। তাইত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁকে উদ্দেশ্য করে লিখেছিলেন—

“তুঁরি তো আমাদের মত সোজা মাছব নও,
তুঁনি দেশের ভক্ত সব দিয়েছ, তাইত দেশের খেয়া-
তরী তোমাকে বইতে পারে না, সীতার দিয়া
তোমাকে পদ্মাপার হইতে হয়, তাইত দেশের
রাজপথ তোমার কাছে কঙ্ক, দুর্গম পাহাড় পর্বত
তোমাকে ভিলাইয়া চলিতে হয়। কোন বিদ্যুত
অতীতে তোমারই ভক্ত প্রথম পৃথল রচিত
হইয়াছিল, কারাগার তো শুধু তোমাকে মনে
করিয়াই নিষিদ্ধ হইয়াছিল। সেইতো তোমার
সৌরব! তোমাকে অবহেলা করে সাধ্য কার!
এই যে বিপুল সৈন্তভার সে তো কেবল তোমারই
ভক্ত। দুঃখের দুঃসহ গুরুভার বইতে পার বলিয়াই
তো ভগবান এতো বোঝা তোমারই স্বস্তি অর্পণ

করিয়াছেন। মুক্তিপথের অগ্রদূত। পরাধীন দেশের
হে রাজধিক্রোহী, তোমাকে শতকোটি নমস্কার।”

গান্ধাজী শুধু আমাদেরই পৃষ্ঠা মন। সমগ্র
পৃথিবীই তাঁকে চিনেছে। তিনি আত্ম আর
আমাদের মাকে নেই। কিন্তু তাঁর আদর্শ আছে।
তাঁর সমস্ত আকাঙ্ক্ষা এখনও চরিতার্থ হয়নি।
এখনও ভারত সঙ্কম হয়নি তাঁর নির্দেশমত পথ
অবলম্বন করতে। আমাদের কর্তব্য তাঁর আদর্শ
গ্রহণ করে তাঁর ইঙ্গিত ভারত গঠন করা।

তাই সবশেষে বলি—“তোমার পতাকা বারে
দাও তারে বহিবারে দাও শক্তি।”

— শ্রীশিবকুল চক্রবর্তী



‘ভালকে চল’

শিল্পী : স্বতাব্যন্ত দত্ত



প্রাথমিক পাঠ্য

নৃত্যের খেলা

শ্রীমতী গোপাল চক্রবর্তী

অদৃশ্য কালি



(১) ইংরাজ আরলের কথা। তখন চারদিকে বন্দেহাতরম ধানি, চরকা আর ধরপাকড়।

গ্রামের একটি প্রাইমারী স্কুল। হেডমাষ্টার মশাইয়ের নামে একখানি চিঠি এল। খামের চিঠি। বড় একখানি কাগজে মাত্র দু'চার লাইন লেখা! মাষ্টারমশায় তাড়া-তাড়ি বাদ্যার গিয়ে জামা ইট্রি করার তান করে চিঠিখানার উপর দু'একবার ইট্রিটা টেনে নিলেন, আর অমনি সেই চিঠির সাম। অংশের উপর অক্ষর ছুটে উঠল: পুলিশের গোয়েন্দা যাচ্ছে—সাবধান!

বলতে পার কি উপায়ে এই সব চিঠি লেখা হ'ত?

উত্তর পরের পাতায় পাবে।

অসম্ভব নয়

(২) সামান্য একগাছি খড় বোতল বা শিশির ভিতর চালিয়ে দিয়ে, সেই বোতল বা শিশিটাকে উপরে তুলতে পার?

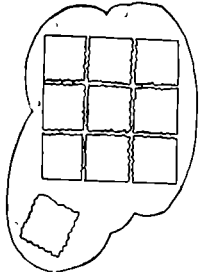
উত্তর আছে পরের পাতায়।



মনের কথা

(৩) কোন্ ফুল তুমি বেশি পছন্দ কর ?

একখানি কাগজকে সমান নয় ভাগে ভাগ করে বকুসের মতো সেওয়া হ'ল। বলা হ'ল, ওর একখানি কাগজের টুকরোর বহুটি সবচেয়ে বেশি যে ফুল পছন্দ করে সেই ফুলটির নাম লিখবে। তারপর অবশিষ্ট আর আটখানি টুকরোর অন্ত্রান্ত ফুলের নাম লিখবে আর আর বহুতর। লিখবার সময় কোন নামই তুমি দেখবে না—অথচ কাগজগুলি সংগ্রহ করে তুমি বলে দেবে কোন্ ফুলকে সবচেয়ে বেশি পছন্দ করা হয়েছে! এটা কি করে করা সম্ভব? নীচের উত্তর পড়ে দেখ।



উত্তর

(১) একটা পরিষ্কার সোজাটে পাতিলেবুর রস নিড়ে রাখ। তারপর একটা নতুন নিবন্ধ কলম দিয়ে ঐ লেবুর রসের সাহায্যে সাদা কাগজে বা লিখবে তা দেখা যাবে না, কিন্তু পরম সাগলে ওটা পরিষ্কার ছুটে উঠবে। পুলিশের চোখে ধুলো দেবার মত আগেকার দিনে সম্মানবাহীরা এইভাবে চিঠিপত্র লিখত।

(২) একটা আত, শক্ত খড় নাও। খড়টি কিন্তু ভাঙাচুরা বা খাতলানো হ'লে চলাবে না। খড়গাছিকে বাঁকাও। তারপর বোতলের মধ্যে খড়টা পুরে দিয়ে (ছবি দেখ) খড়টির প্রান্ত ধরে ফুলসেই বোতলটাও সেই সঙ্গে উঠে আসবে।

(৩) ডাকঘরের ষ্ট্যাম্প যে ভাবে চারদিকে ছিদ্রবৃত্ত কাগজের সঙ্গে আটকানো থাকে, কতকটা ঐ ভাবে একখণ্ড কাগজকে কেটে নাও। (ছবি দেখ) তারপর দর্শকদের সম্মুখে কাগজখানিকে নয় ভাগে ছিঁড়ে নাও। মাঝখানের অংশটা প্রথম ব্যক্তিকে দিয়ে বল,—তোমার বেশি পছন্দ যে ফুল তার নাম লেখ। তারপর অপর অংশগুলি আর আর হারা থাকবে তাদের দিয়ে নাও। এইবার সব টুকরোগুলি একসঙ্গে করে ঐ মাঝখানের টুকরোটি বের ক'রে বলে নাও, তার সব চেয়ে বেশি পছন্দ কোন্ ফুল।

এটা সম্ভব হবে এই মত্রে, একমাত্র মাঝখানের টুকরোটিতে চারদিকে খাঁজকাটা থাকে; অন্তঃগুলির থাকবে দুই দিকে বা তিন দিকে। কাজেই প্রথমে বাকি বেশি পছন্দ করা ফুলের নাম লিখবার মত্রে ঐ মাঝখানের টুকরোটি বেওয়া হয়েছিল—কাগজের পাশে খাঁজ কাটার এ কৌশল সে বা আর কেউ সহসা ধরতে পারবে না।

খেলোয়াড়দের খবর

মেরুড়ে

এশিয়া-ক্রীড়ায় অর্থ সংগ্রহ

এবার যে মাসে আগামে কুড়ীয় এশিয়া ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ভারতীয় দলের যোগদানের জন্য খেলোয়াড়রা নানা প্রতিষ্ঠান থেকে অর্থ সংগ্রহের জন্য আবেদন জানান হয়। আমাদের প্রধান মন্ত্রীও এ সম্বন্ধে অনঙ্গাধারণের কাছে আবেদন করেছিলেন এবং বাংলার রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মলা নাইডুও অহরূপ আবেদন জানান দলের কাছে। দলের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে থেকেও এর জন্য সাহায্য কিছু কিছু টাকা তোলার ব্যবস্থা হয়। তাছাড়া ১ই এপ্রিল থেকে ১৪ই এপ্রিল পর্যন্ত দারা ভারতে 'পতাকা পল্টা' পালন করে টাকা তোলারও ব্যবস্থা হয়েছিল। ধারা সাহায্য দেন, তাঁদের কাগজের তৈরি একটি করে ছোট পতাকা দেওয়া হয়।

এশিয়ান গেমস্-এ ভলিবল দল

এবার টোকিওর এশিয়ান গেমস্-এ যোগদানের জন্য ভারতীয় ভলিবল দলের একটি ও শক্তিশালী দল নির্বাচনের ব্যবস্থা হচ্ছে। এই দলে যে সকল খেলোয়াড় নির্বাচিত হবেন, তাঁদের উপযুক্ত শিক্ষা দেবার জন্য ভারতীয় ভলিবল ফেডারেশনের সহঃ সভাপতি শ্রীমতীপ্রদাস ত্রিপাঠি কোচ হিসাবে সকলকে শিক্ষা দেবেন বলে স্থির হয়েছে।

এশিয়ান গেমস্-এ ইন্দোনেশিয়া দল

ইন্দোনেশিয়া থেকে এশিয়া ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ৩০ জনের একটি প্রতিনিধি দল যাবে বলে স্থির হয়েছে। ইন্দোনেশিয়ার এই দলের মধ্যে কুটবল, বাস্কেটবল ও শুষ্কটীর পোলো দল, স্টেডবল, সীতার, লক্ষ্যবিদ ও ভারোত্তোলকগণ থাকবেন। এই দলের নেতৃত্ব করবেন শিক্ষা-মন্ত্রণালয়ের নোয়েরো মার্টোডিগুরো।

কেম্বিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের নৌকাবাচ

বিলাতে কেম্বিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক নৌকাবাচ একটি বিশিষ্ট প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতায় পুরাতন প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে অক্সফোর্ড-এর সঙ্গে কেম্বিজের প্রতিযোগিতায় উদ্ভেজনা গুঠে সবচেয়ে চরমে। এবার ১০৪তম এই বার্ষিক প্রতিযোগিতায় কেম্বিজ বিশ্ববিদ্যালয় দল অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় দলকে সাড়ে তিন লেংখে (১৮মি, ১৪ সে:) পরাজিত করে। এবার নিয়ে কেম্বিজ দল চারবার উপস্থিতি জয়লাভ করল।

লেকে নৌকাবাচ প্রতিযোগিতা

প্রাচ্যের অপেশাদার নৌযান সংঘ পরিচালিত অষ্টাদশ বার্ষিক নৌকাবাচ প্রতিযোগিতা কলিকাতার চাকুরিয়া লেকে সম্প্রতি সমাপ্ত হয়েছে। উইলিংডন ইকি (ফোরস) প্রতিযোগিতায় ক্যালকাটা রোয়িং ক্লাব আড়াই লেংখে লেক ক্লাবকে পরাজিত করে। এবার নিয়ে ক্লাবটি উপস্থিতি তিন বছর এই বিভাগে জয়লাভের গৌরব অর্জন করল। কিন্তু লেক ক্লাব উইলিংডন ইকি লেভের গৌরব অর্জন করতে না পারলেও, হৃগলী কাণ লাভ করে দলগত চ্যাম্পিয়ানসিপে।

ডেভিস কাপ টেনিস প্রতিযোগিতা

মন্টিকার্নোতে এবার যে ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতা হবে, তাতে ভারতকে প্রথম খেলায় মনাকোর বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে। এবার ভারতের প্রথম নম্বর টেনিস খেলোয়াড় আর কৃষ্ণাণ এই প্রতিযোগিতায় যোগ দেবার জন্য যেতে পারবেন না। কেবলমাত্র নরেশকুমার, আখতার আলি ও প্রেমজিতলাল (ভারতের জাতীয় জুনিয়র চ্যাম্পিয়ান) এই খেলায় যোগদান করবেন।



নতুন বই



(সমালোচনার জন্য দু'খানি বই পাঠাবেন)

আরব্য উপন্যাসের গল্প—শ্রীমদৌরীশ্র-মোহন মুখোপাধ্যায়। কে, পাখুরী এ্যাও কোং প্রাঃ লিঃ, ৮বি লালবাগার স্ট্রীট, কলিকাতা ১। মূল্য ৩০।

আরব্য উপন্যাসের গল্প অনেক লিখেছেন, কিন্তু ছোটদের উপযোগী এমন হুম্বর ক'বে প্রবীণ সাহিত্যিক দৌরীশ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের মত আর কেউ লিখেছেন বলে মনে হয় না। সেই জন্যই এই বই সম্বন্ধে রাজসেখর বহু লিখেছেন—“শ্রীমুখ দৌরীশ্রমোহন মুখোপাধ্যায় যে আরব্য উপন্যাসের গল্প লিখেছেন তা নতুন রকমের। ইনি মূল আখ্যান বজায় রেখেছেন কিন্তু মামুলী প্রথার অহুবাধ করেন নি, তাঁর নিজস্ব রসাল ভাবার বাংলা রূপকথার ছাঁদে গল্পগুলিকে নবকলেবর দিয়েছেন। লেখার গুণে এই বিশেষ আখ্যান-মালা একবারে অসমী রূপ পেয়েছে অথচ তাদের জন্মস্থান আরব পারস্যের বৈশিষ্ট্য হারায়নি। ছেলেমেয়েরা এই বই নিয়ে কাড়াকাড়ি করবে সম্ভব নেই।” একাংশ বইখানির জন্ত বণ্ণেই ব্যয় করে—উৎকৃষ্ট কাগজ, উচ্চদেয় ছাপা ও প্রচুর ছবি দিয়েছেন। প্রচ্ছদপটটিও মনোরম।

বোরোবুত্বরের ডাক—ইন্দিরা দেবী। এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানী, ২০ হারিসন রোড, কলিকাতা ৭। মূল্য ২০।

ইতিহাস, এ্যাডভেঞ্চার ও ভ্রমণ সব কিছু মিশিয়ে এই আকর্ষণীয় উপন্যাসটি রচনা করেছেন ইন্দিরা দেবী। এই কাহিনীর প্রধান নায়ক

সৌম্য। এর সঙ্গে আছেন তার শিক্ষক নির্মলবাবু আর অধ্যাপক রায়। আর একটু জিনিষ আছে এর সঙ্গে, তা হচ্ছে নির্মলবাবুর ঠাকুরদার একখানি ডায়েরী। এই ডায়েরীখানি নির্মলবাবু সৌম্যকে দিয়ে দেন এবং তার মধ্যে থেকেই আবিষ্কৃত হয়, জয়রামসু-এর সঙ্গে ঠাকুরদার দেখা ও বোরোবুত্বরে হুম্বীর কাহিনী। অদ্যাত্ত সেই কাহিনী হুম্বী বা ব্যক্ত করেছিলেন ঠাকুরদার কাছে, সৌম্য ঠাকুরদার সেই ডায়েরী পড়ে সে সম্বন্ধে কতকটা হয়ে বোরোবুত্বর ঘাড়া করে এবং নানা অস্ত্রায়েব মধ্যে দিয়ে বাহিনী ফল লাভ ক'রে সশেষ করে আসে। এই বই পড়ে আনন্দলাভের সঙ্গে অনেক কিছু জ্ঞানলাভ করবে ছেলেমেয়েরা।

সব চেয়ে বা বড়—শ্রীমতী প্রতিভা বহু। ইতিহাস অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোম্পানী প্রাঃ লিঃ, ২০ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭। মূল্য ১০।

প্রতিভা বহু বড়দের জন্ত লিখে যথেষ্ট নাম করেছেন। ছোটদের লেখাতেও তাঁর হাত যে পাকা ছটি গল্পের এই বইখানিই তার পরিচয়। ‘সব চেয়ে বা বড়’ গল্পটির নামেই বইয়ের নামকরণ হয়েছে। বাকী, ‘ভাই-বোন’, ‘ছাই বোন’, ‘কড়োপিসির ছোট ছেলে’, ‘প্রতিবেশী’, ‘পটলি’ নামের প্রত্যেকটি গল্পই ছোট ষাড়া তাদের মনকে স্পর্শ করবে। ছাপা, কাগজ উচ্চদেয় এবং উপরের রঙিন প্রচ্ছদপটটি ভারী হুম্বর। ভিতরেও কয়েকখানি ছবি আছে।



শুভকামনা জানাই।

১৩৬৪ সাল শেষ হয়ে গেল—হুজ হলো নতুন বছর। জোমাদের জীবনে নতুন বছর স্বপ্ন, শান্তি আর সাফল্য আহুক। বাত্মপথ থেকে বাধ্যবির দূর হোক, কর্মক্ষমতা বেড়ে উঠুক—নববর্ষের আশীর্বাদ নতুন স্বর্বাণোকের মতো অন্নান মকলের দ্বাতি এনে দিক জোমাদের কাছে, মেহে, মনে। আজকের দিনে তাই বলি :

কালকে ছিল বর্ষপেষের চৈত্র-রাত্রি রান,
আজকে নব প্রভাত এলো নতুন দিনের গান।
ভুলিয়া যেও আগের দিনে ব্যর্থতা আর কঁাধা
নতুন হুরে হোক না জোমার বীণারই তার বাঁধা।

কিন্তু আজকে জোমাদের ক্ষত্রে লিখতে বলে মনে মনে ভাবছি সত্যিই কি আমরা ব্যর্থতা আর রানিমাকে নতুন বছরের শুভক্ষণে ছেড়ে আসতে পেরেছি ? বোধহয় না। জীবনের সর্বত্রই যেন বেবতে পারছি বিশৃঙ্খলা আর উজ্জ্বলার সমারোহ। জীবনের সর্বত্রই ঐ দুর্বোপ। কিন্তু এর ফল কি হবে তা আমরা কেউ ভাবছি কি ? জীবনের অন্ত সনিকের কথা ছেড়ে দিয়ে ছাত্র সমাজের কথাই ধরি। কি উজ্জ্বল হয়ে যাচ্ছে সবাই। ভারতবর্ষের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে এই উজ্জ্বলার শিখা ছড়িয়ে পড়েছে। ছাত্রাবস্থার সবচেয়ে মূল্যবান ব্রত হচ্ছে, “ছাত্রানাং অধ্যয়নং তপঃ”, কিন্তু ছাত্রসমাজ তা আজ নিবারণ ভাবে অস্বীকার করছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের অধিবেশন চলা কালে একমল অতি উৎসাহী দুবকের দল অমধিকারভাবে সেই অধিবেশনে প্রবেশ করে সেই অধিবেশন পণ করে দিয়েছে। এ ঐশ্বর্য্য সম্প্রা কি করে যে তাদের মনে দেখা দিল তা বোঝার ক্ষমতা নেই !

বোর্ড অফ সেক্রেটারী এডুকেশনের পরিচালনার স্থল-ফাইনাল পরীকার সময় ইতিহাসের দিন যে অভ্যাব ব্যবহার উত্তর কোলকাতায় সংঘটিত হয়েছে, তাও অভ্যন্তরীণ দমনবিহারক ঘটনা। কোন্ অধিকারে এই বর্বরোচিত আক্রমণ করবার কথা তারা ভাবতে পেরেছে ! শান্তিপ্রিয়, নিরীহ ছেলেদের পরীক্ষা পণ করে দিয়ে যে ক্ষতি করা হয়েছে, তার উপযুক্ত শান্তিমূলক বিচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যদি হয়, তবেই বোধ করি উজ্জ্বল ভাব কিছুটা বোধ করা যাবে। অবশ্য

এই দৃষ্টত কাছে যারা সক্রিয়ভাবে যোগদান করেছিল, তাদের সংখ্যা নিতান্তই মুহূর্তেই এবং যতদূর জানা গেছে তারা নিরমিত ছাত্রও নয়।—এইটুকুই আমাদের সান্না কিস্ত সমাধান নয়।

আরও দুঃখজনক ঘটনা হলো স্থলের অস্থায়ী ছাত্রেরা “রাশ প্রমোদন” নিতে হবে বলে স্থল-কর্তৃপক্ষের উপর হামলা করেছে। এ ঘটনা কাগজে যে পড়েছে সেই লক্ষিত হয়েছে। আমরা সবকিছু শালীনতা, সভ্যতা, ভাষাতা বিনর্জন দিয়ে, জলাঞ্জলি দিয়ে বা-খুশী তাই করে বেড়াবো—কারুর আদেশ, উপদেশ, নির্দেশ মানবো না এ ধরনের চিন্তা কেন যে ক্রমাগত আমাদের হৃদয় মনকে অহুস করে তুলছে, তা বুঝে উঠতে পারছি না।

আজকের দিনে আর বেশী করে এ কথা আলোচনা করে মনকে ভরাকৃত করে তুলতে চাইনা—কেবল এইটুকু আজকের এই স্তব্ধ মনে রাখা দরকার—সেশকে মনু করে গড়ে তোলার সহ্য দায়িত্ব আমাদের উপর আমাদেরই অলক্ষে এসে পড়েছে—সেই কর্তব্য পালন করার ক্ষেত্রে আমাদের কঠিন সাধনা করতে হবে। সেইক্ষেত্রে শৃঙ্খলা দরকার, সংঘের প্রয়োজন, ভিত্তিকালী হতে হবে—তবেই আমরা আমাদের এই সর্বস্বার্থে দেশকে প্রগতির পথে কল্যাণময়ী করে তুলতে পারবো। আশাকরি আজকের এই স্তব্ধদিনে এ কথাটি গভীরভাবে উপলব্ধি করতে চেষ্টা করবে তোমরা।

এবারে তোমাদের বিত্তর চিঠি জমে গেছে, কিন্তু তাই সব চিঠির জবাব দেওয়া গেল না। বৌরিকা মৈত্র (কোলকাতা)—স্থল-ফাইনাল পরীক্ষায় গোলমাল হওয়ার ‘ইতিহাস’ পরীক্ষা দিতে পারনি, কিন্তু তার ক্ষেত্রে তো তাই ভূমি দায়ী নও—সেখানে কষ্ট পেওনা। পলা পঙ্কজবৌ (পূণা)—তোমার চিঠি পেলাম, কিন্তু কোন ছবি পাইনি। রণবীর মজুমদার (লখনউ)—পরীক্ষায় প্রথম হয়েছে মেনে আননিত হলাম। “লেখনী-বহু”র কাজ আগাততঃ বহু আছে। নেলা ও বুলবুল মৈত্র (গোয়াগান)। সীরা চক্রবর্তী (পাটনা)। চিন্তা, পুতুল, শিউলি সরকার (কোলকাতা)। মালা চক্রবর্তী (হাওড়া)। গোপা পাল (কোলকাতা)। চন্দ্রা, রত্না বন্দ্যোপাধ্যায় (কোলকাতা)। শুভাশীষ ও স্নেহাশীষ (বরানসী)। তোমাদের চিঠি পেয়েছি।

হ্যাঁ, ভালো কথা, গত মাসে জলসংসার মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে পণ্ডিত রবিন্দ্রর স্তরের নাম চাপা হয়েছে—কিন্তু মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হলেন ডাঃ কৈলাসনাথ কাটজ, বিনি এক সময়ে পশ্চিম বাংলার রাজ্যপাল ছিলেন।

আজ এইখানেই শেষ করলাম। শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা জেনো।

* —তোমাদের মধুদি

ঔদ্যোতক সরকার কর্তৃক ১৪ বক্স চারুকোয়া স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত

ও তৎকর্তৃক প্রভু প্রেস, ৩০ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত

মূল্য : চল্লিশ নয়া পয়সা



সংগতি স্বর্গত ভারতের বিখ্যাত মনীষী অ্যাচার্জ যদুনাথ সরকার পাঁচশত টাকা সহ একটি স্বদত্ত আখার শিশু-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ অবদানের জন্ত ১৩৬৪ সালের “মৌচাক পুরস্কার” হিসাবে প্রবীণ সাহিত্যিক, ত্রিভুজেশ্বর কুমার রাউকে প্রদান করেছেন। পিছনে পাড়িয়ে আছেন পুরস্কার নির্ধারণ কমিটির অন্ততম সদস্য শ্রীবিষ্ণু মুখোপাধ্যায়। এই পুরস্কার নববর্ষের প্রথম দিকে দক্ষিণ কলিকাতায় একটি সাহিত্য সভায় বহু সাহিত্যিকের উপস্থিতিতে প্রদান করা হয়।



৩৯ বর্ষ]

জ্যৈষ্ঠ-১৩৬৫

[২য় সংখ্যা

গরমের ছুটি

শ্রীবিমল দত্ত

১

গরমের ছুটি এল মরমের প্রান্তে,
এতখানি খুশি হ'ব পারিনিক' জানতে।
হুপূরের ডাপ্‌রায়,
গালে যেন চাপ্‌ড়ায়,
লু যেন রে দাব্‌ড়ায়
পথে কার বাপ যায়।
কি করে যে যাই, ভাবি, কচি ডাব আনতে।
গরমের ছুটি এল মরমের প্রান্তে।

২

পাখ্-পাখালিরা সব নিখুঁত স্তক,
হুপূরের হাওয়া ছোট্টে শাই শাই শব্দ,
ঠক্ ঠক্ ঠোক্‌রায়
গাছ, কাঠ-ঠোক্‌রায়
গাছে পাখি ঘুম যায়
নিশ্চেষ্ট তন্দ্রায়,
পুকুরের পাড়ে ঘোরে বেঁজী, সে-ও জল
কাঠবেড়ালীরা ধায় গাছে গাছে লুক।

পাতা কাঁপে ঝিরিঝিরি বাঁশবন ছলছে,
আকাশ একটা যেন পরকলা ঝলছে।

নূর নভে চিল উড়ে,
ডানা ছুটে জুড়ে জুড়ে
নেমে আসে ঘুরে ঘুরে,
মন ভরে সুরে সুরে—

গরমের ছুটি যেন সেই সুরে ছলছে।
মনটা হারিয়ে যায়, নাহি পায় কূল যে।

মাঝ রাতে বাতাসের আনমনা আগমন
জুড়ায় শরীর আর, জুড়ায় যে রে জীবন ;

পাকা কাঁঠালের বাস
সুরভিত নিঃশ্বাস,
জোনাকী যে রাশ রাশ
ঘুচায় আধার-ব্রাস

ঝিম্ ঝিম্ ঝিম্ ঝিম্ ডাকে, ভীমরুল গুল্লন,
কি এক মধুর সুরে মাতায় সারাটি মন।

৬

আম পাকে, জাম পাকে, পাকিয়াছে
জামরুল ;

উঠানে ছুধের হাসি হাসে শাদা বেল ফুল,
রাত্রের জ্যোস্নায়
জ্বলে রঙ রোশনাই ;
গ্রীষ্মের দোষ নাই,
আর কোন রোষ নাই—

সন্ধ্যায় ভূলে যাই গ্রীষ্মের 'হোমরুল'—
পথ ভোলা হাওয়া পেলে দিলখুশ্ বিল্কুল।

মনের উধাও ছুটি নির্বেষ আকাশে,
ডানা-মেলা আকাশ আরামের বাতাসে,

চোখ ভরে তুলি ছবি,
মন হয়ে ওঠে কবি,
আকাশে উজল রবি
আগুনে যেন রে হবি

দীপ্ দীপ্ দীপ্তির শিখা ওঠে আকাশে
গরমের ছুটি, আহা সেুই আলো-

মাথা-সে।



(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

৫২

অভিন্নচক্রে দেখ। সমস্তবুদ্ধি অবলম্বন করো। যে সর্বভূতে আমাকে ভজনা করে সে যে অবস্থাতেই থাকুক আমাতেই অবস্থিত থাকে। গীতায় অর্জুনকে বলছেন শ্রীকৃষ্ণ।

ভাগবতেও সেই কথা। বলছেন শ্রীকৃষ্ণ। আমি সর্বভূতে ভূতাত্মস্বরূপে অবস্থিত। তবু আমাকে অবজ্ঞা করে মানুষকে অবজ্ঞা করে যে শুধু প্রতিমার পূজা করে তার আরথনা বিড়ম্বনামাত্র। তার ভজনা ভাষে বৃতাহতি। কিন্তু আমি সর্বমানুষে আছি জেনে যে সমান মৈত্রীর দৃষ্টিতে সকলকে দেখে, দান-মান দিয়ে অর্চনা করে আমি তারই পূজা গ্রহণ করি।

জীবে প্রেম হলেই ভগবানে ভক্তি।

কিন্তু জীবে প্রেম অসম্ভব যতক্ষণ স্বার্থ প্রভাপাশ্বিত। স্বার্থত্যাগ ছাড়া জীবে প্রেম নেই। জীবে শ্রীতি ছাড়া ভক্তি নেই ঈশ্বরে।

তাই ভালোবাসাই ভগবান।

কিন্তু ভালো তুমি বাসবে কি করে যতক্ষণ তোমার আমিৎ-মমৎ থাকে। সুতরাং স্বার্থের উচ্ছেদই সমস্তবুদ্ধির ভিত্তি।

তাই কেউই পর নয়, সকলেই পরম। সমস্ত বিশ্বই বিষ্ণুর বিস্তার। পুত্রকে পুত্রের জন্তে ভালোবাসিনা আত্মার জন্তে ভালোবাসি। 'বন্ধুকে বন্ধুর জন্তে ভালো-

বাসিনা, আত্মার জন্তে ভালোবাসি। নিজেকে ভালোবাসি বলেই অত্মকে ভালোবাসি।
তাই আপনও যা পরও তাই। সবই সেই একের পূর্ণতা। খণ্ডও যে সমগ্রও সে।

হিরণ্যকশিপু জিগগেস করল প্রহ্লাদকে, 'শত্রুর সঙ্গে রাজার কি রকম
ব্যবহার করা উচিত।'

প্রহ্লাদ বললে, 'শত্রু? শত্রু কে? সকলই বিষ্ণুময়। শত্রুমিত্রের ভেদ কোথায়?'

হে অর্জুন, সুখই হোক আর দুঃখই হোক যে আত্মসাদৃশ্যে সর্বত্র সমদর্শী সেই
যোগীই সর্বশ্রেষ্ঠ।

তাই স্বামীজি যে আমেরিকা যাচ্ছে বিদেশে যাচ্ছে না, যিনি চরাচর নিখিলে
প্রাণরূপে প্রকাশমান সেই আরেক প্রাণলোকে। বিশ্ববিধাতার থেকে পরিচয়পত্র
নিয়ে দাঁড়াবে সমুদয় মানুষের সামনে। এষো দেবো বিশ্বকর্মা মহাত্মা সদা জনানাং
হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ। যে মহান আত্মা বিশ্বকর্মা জনগণের হৃদয়ে সমাসীন তিনি আমার
হৃদয়েও জাগ্রত, উদবোধিত। তাই সেই অধিকারে এসেছি তোমাদের কাছে। যে
নিখিলেশ্বরকে জেনেছে সেই সকলকে অবাধে আহ্বান করবার অধিকারী।

যাবার সব ঠিকঠাক, খেতড়ির রাজার প্রাইভেট সেক্রেটারি এসে উপস্থিত।

কবে ছুঁবছর আগে খেতড়ির রাজাকে আশীর্বাদ করেছিল স্বামীজি, তোমার
ছেলে হবে, তাই এখন ফলেছে নাকি সেই আশীর্বাদ। সন্দেহ কি, স্বামীজির
জন্তেই নিঃসন্তানের পুত্রলাভ ঘটেছে, সুতরাং সেই শিশুর জন্মোৎসবে যাওয়া চাই
স্বামীজির। মহারাজা অনেক করে বলে দিয়েছেন।

'কিন্তু, অসম্ভব, একত্রিশে যে আমি রওনা হচ্ছি আমেরিকা'। প্রতিবাদ করল
স্বামীজি।

জগমোহনলাল, রাজার সেক্রেটারি, ছাড়বার পাত্র নয়। বললে আপনি না
গেলে উৎসব ন্মান হয়ে যাবে রাজা মনঃক্লম্ হবেন।'

'বলেন কি, আমার গোছগাছ এখনো বাকি।'

'তা হোক, সব ব্যবস্থা করে দেবেন মহারাজা। অন্তত একদিনের জন্তেও চলুন।'

সেই আন্তরিকতার আভিষ্য এড়াতে পারলনা স্বামীজি। বললে, 'চলো,
কিন্তু একদিন।'

সে কি বিপুল সংবর্ধনা। সমস্ত নগর আলোকে-আনন্দে ইস্তপুরী হয়ে উঠেছে। নৃত্যগীতবাহা উদ্বেলিত চারদিকে। কিসের উৎসব আজ? মহারাজের পুত্র হয়েছে তার জন্তে? না, মহারাজের গুরুজি এসেছেন তার জন্তে?

প্রাসাদের সিংহদ্বারে দাঁড়াল এসে গাড়ি। প্রহরীরা খাপের থেকে তলোয়ার তুলে অভিবাধন করলে একযোগে। রাজা কোথায়? খবর পেয়ে রাজা ছুটে এসে স্বামীজির পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ল। স্বামীজি তুলল তার হাত ধরে।

রাজসভাগৃহে নিয়ে যাওয়া হল স্বামীজিকে। চারদিকে অতিথি-অমাত্যদের ভিড়। সবাই উঠে নতশিরে প্রণাম করল। সালঙ্কার সিংহাসনে বসানো হল স্বামীজিকে। একে-একে সকলের সঙ্গে পরিচয় করে দিল রাজা।

সবচেয়ে বড় পরিচয় ইনি বেদান্তকেশরী ইনিই পুরুষোত্তম। যেমন সর্বসংকল্প-সন্ন্যাসী তেমন নিয়তকর্মী। সম্প্রতি চলেছেন পশ্চিমে। ভারতবর্ষের সনাতন হিন্দুধর্মের প্রচারে।

যুদ্ধ ও যোগ এই ভারতবর্ষের সার কথা। যুদ্ধও করো ও যোগীও হও—এই গীতার মর্মবাণী। যিনি সর্বলোকমহেশ্বর সর্বভূতের স্নহদ তিনি আবার সমস্ত বিষয়-কর্মের ভোক্তা। স্তূতরাং জীবমুক্ত হয়ে কর্ম করো। সেই কর্মই জ্ঞানীর কর্ম। তার জ্ঞান হলেই ঈশ্বরে অনন্তা ভক্তি।

শিশু রাজকুমারকে আনা হল। তার মাথায় হাত রেখে স্বস্তিবাচন উচ্চারণ করল স্বামীজী।

এবার তবে যেতে হয় বসে।

‘সেখানে কি?’

‘সেখান থেকেই আমার জাহাজ ছাড়বে।’

‘চলুন আপনাকে জয়পুর পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসি।’ রাজা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

‘কেন, জয়পুর কেন?’

‘জয়পুরই আমার রাজ্যের শেষসীমা।’ বললেন রাজা। ‘অতিথিকে বিদায় দিতে হলে রাজ্যের শেষসীমা পর্যন্ত যাওয়া উচিত।’

রাজাকে নিরস্ত করা গেলনা। দেশের ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাঁড়াই এমন আমার

সাধ্য কি, আপনি যান সমুদ্রপারে, কিন্তু ঈশ্বর জানেন আপনাকে ছেড়ে দিতে বুক বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। রাজার ছুই চোখ ছলছল করে উঠল।

স্বয়ং জয়পুর পর্যন্ত পৌঁছে দিলেন। জগমোহনলালকে বললেন একেবারে বসে গিয়ে তুলে দিয়ে এসে জাহাজে। এই নাও টাকা, যা লাগে যত লাগে। সব বন্দোবস্ত পাকা করে দিয়ে এস।

রাতে আবু রোড স্টেশনে নেমে পড়ল স্বামীজি। নিবিড় পর্বতপুঞ্জের মধ্যে যেন কোন গুণ্গহনের স্তনতে পেল সম্ভাষণ।

একটি রেলকর্মচারীর সঙ্গে আলাপ ছিল, রাতে তার ওখানে গিয়ে উঠল। কোথায় রাজার বিলাসপুরী আর কোথায় এক রেলকেরানির কোয়ার্টার। উপল ও উৎপল দুইই স্বামীজির কাছে এক।

পরদিন সকালে ছুই পদব্রজী সন্ন্যাসীকে দেখতে পেল পথে। কত সাধু চলেছে তীর্থভ্রমণে তার ঠিক কি।

সন্ন্যাসীরা তাকান পিছন করে। এ কে গৈরিকের দীপ্তশিখা। হাতে তেজোদ্ভূত লাঠি। চলেছে উদাসীনের মত, আবৃত্তি করছে সংস্কৃত শ্লোক। সে শ্লোকের তাৎপর্য হচ্ছে অহঙ্কার আর অলঙ্কার, গৌরব আর প্রতিষ্ঠা—সমস্তই ভস্মমুষ্টি। কি হবে আমার স্বর্ণে রোপো, কাঠে-লোষ্ট্রে, বসনে-ভূষণে, করণে-উপকরণে? স্তূপীভূত জড়ের জঞ্জালে? বেতড়ির রাজপ্রাসাদ আমাকে কি দেবে, পাশ্চাত্য ভূখণ্ডই বা আমাকে কি দেবে, যে জিনিস ধুলো হয়ে যাবে তার ধুলো ঝেড়ে দিন কাটাতে আমি প্রস্তুত নই। আমি প্রতিষ্ঠা চাইনা, সম্মান চাইনা, সিংহাসন চাইনা, সমস্ত-বটনাপুঞ্জের মধ্যে যিনি মূলশক্তি তাঁকে চাই।

আরে, একি রাখাল যে। আর তুমি হরি?

স্বামী ব্রহ্মানন্দ আর স্বামী তুরীয়ানন্দ।

ছুইজনকেই প্রণাম করল স্বামীজি। বললে, ‘জানিস রাজা, আমেরিকা যাচ্ছি।’

উৎসাহে ফেটে পড়ছে। নিজের বৃকের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলছে, ‘দেখহিস কি? এই এঁরই জন্তে এ সব হচ্ছে।’

‘দেখবি আরো কত হবে।’ বললে রাধালরাজা।

‘নেচে যাবে, নেচে যাবে—চারদিকে শুধু ঠাকুরের নাম আর ঠাকুরের প্রেম।’

‘আমাদের জাতের কোনো ভরসা নেই। কোনো একটা স্বাধীন চিন্তা কার মাথায় আসেনা।’ আমেরিকা থেকে চিঠি লিখেছেন বিবেকানন্দ : ‘সেই ছেঁড়া কাঁথা সকলে পড়ে টানাটানি—রামকৃষ্ণ পরমহংস এমন ছিলেন ভেমন ছিলেন; আর আবাতে গল্পি—গল্পির আর সীমাসীমাস্ত নেই। হরে হরে, বলি একটা কিছু করে দেখাও যে তোমরা কিছু অসাধারণ—খালি পাগলামি। আজ ঘণ্টা হল, কাল তার উপর ভেঁপু হল, পরশু তার উপর চামর হল, আজ খাট হল কাল খাটের ঠ্যাঙে রূপো বাঁধানো হল—আর লোকে খিচুড়ি খেলে তার লোকের কাছে আবাতে গল্প ছ’হাজার মারা হল—একেই ইংরেজিতে ইমবেসিলিটি বলে। ঘণ্টা ডাইনে বাজাবে না বাঁয়ে, চন্দনের টিপ মাথায় কি কোথায় পরা যায়—পিঙ্গিম হুবার ঘুরবে না চারবার—ঐ নিয়ে যাদের মাথা ঘামতে চায়, তাদেরই নাম হতভাগা, আর ঐ বুদ্ধিতেই আমরা লক্ষ্মীছাড়া জুতোধেকো—আর এরা ত্রিভুবনবিজয়ী। কুড়েমিতে আর বৈরাগ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ।’

তুরীয়ানন্দ স্বামীকে কাছে টেনে নিল স্বামীজি। বললে, ‘হরি ভাই, তোমাদের ধর্ম কি জিনিস আমাকে বলতে পারো?’ আমি তো চারদিকে কেবল দুঃখই দেখতে পাচ্ছি, অপার অনপনয় দুঃখ।’ বলতে-বলতে স্বামীজির বিশাল চক্ষু থেকে বড়-বড় জলের ফোঁটা পড়তে লাগল। নিজের বৃকের উপর হাত রেখে বললে, ‘সমগ্র মানুষের দুঃখ যেন এই বৃকের মধ্যে এসে বাসা নিয়েছে। হৃদয় তাই বিস্তীর্ণ হয়েছে, দূরতম দীনতম মানুষের দুঃখও যেন আমারই দুঃখ। কে বোঝে আমার এই দুঃখের কথা? কেউ না কেউ না।’ শিশুর মত কাঁদতে লাগল স্বামীজি।

একটি বাঙালি ভক্তলোকের সঙ্গে গল্প হচ্ছে ট্রেনের কামরায়। এমন সময় শ্বেতাঙ্গ এক টিকিট কলেকটর উঠে টিকিট দেখতে চাইল। ভক্তলোক বললে, টিকিট নেই। তবে এই কামরাতে বসে আছো কোন অধিকারে? ভক্তলোক বললে, গাড়ি স্টেশনে থেমে আছে, আমি তাই উঠে বসেছি। গাড়ি না ছাড়া পর্যন্ত আমি যাত্রী নই।

‘নেমে যান বলছি।’

‘কোন আইনে?’

এই নিয়ে শুরু হল তর্ক। ক্রমে বিতণ্ডা, প্রায় হাতাহাতির কাছাকাছি।

স্বামীজি এস মধ্যস্থতা করতে। বললে, আমাকে দেখে আমার সঙ্গে কথা কইতে উঠেছে। গাড়ি ছাড়বার ঘণ্টা দিলেই নেমে যাবে।

‘তুমি কাহে বাত করতে হো?’ খেতাব টিকিট-কলেক্টর হুমকে উঠল।

‘তুমি বলছ কাকে?’ পালটা গর্জন করে উঠল স্বামীজি। ‘ভজ্ঞতা শেখনি? আপ্ বলতে জানানো?’

স্বামীজির ক্রুদ্ধ মূর্তি দেখে কুঁকড়ে গেল সাহেব। ভেবেছিল সামান্য ভেকধারী কিন্তু এ যে দেখছি কেশরফোলানো সিংহ।

সাহেব বললে, ‘আমি হিন্দি ভালো জানিনা কিনা! কিন্তু ঐ লোকটা—’ এবার ইংরাজিতে বলল সাহেব।

‘ঐ লোকটা?’ স্বামীজি আবার ধমকে উঠল। ‘ইংরিজিও ভালো জানানো দেখছি। লোক না বলে ভজ্ঞলোকে বলতে পারো না?’

গুটিগুটি নেমে গেল সাহেব।

জগমোহনকে বললে স্বামীজি, ‘অপ্রতিবাদে নেবনা কখনো অপমান। আত্ম-মর্যাদাকে সব সময়েই অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে। পরাধীনতার নাগপাশ এমনি করেই মোচন হবে।’

গাড়ি ছেড়ে দিল। জানলা দিয়ে মুখ বের করে গুনগুন করে আয়ত্তি করতে লাগল স্বামীজি: ‘রামং চিন্তয় চিন্তবর্বর চিরং চিন্তাশতৈঃ কিং ফলং।’ রে বর্বরচিন্ত, সর্বদা রামকে চিন্তা কর, অশ্রু শত শত চিন্তাতে কি ফল? মুখ, সর্বদা রামনাম করো, বহু অনর্থক কথায় কি ফল? কর্ণ, রামচন্দ্রচরিত্র শ্রবণ করো, গীতবান্ধ শুনে কি হবে? চক্ষু, সকল জিনিস রামময় দেখ, রাম ছাড়া আর সব কিছু ত্যাগ করো। চক্ষুঃ রামময় নিরীক্ষ সকলং রামাং পরং তজ্জ্যতাম।

(ক্রমশঃ)

জিভি

ত্রিকামাকীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

এয়ারোড্রোমে গেলাম। দেখলাম প্রেন দাঁড়িয়ে। আমাদের মালপত্র তোলা হোলো। পাসপোর্ট অফিসারের কাছে গেলাম পাসপোর্ট নিতে। সময় নেই। প্রেনের প্রপেলারগুলো ঘুরছে। কাবুলি অফিসার। এক মুখ হেসে ভাঙা-ভাঙা ইংরিজিতে বললেন : You cannot go today, Sir !

আচারের কথা মনে পড়লো। আমার চোখ বড় বড়। বললাম : কেন ?

তিনি বললেন কাবুলি ভিন্সায় শহরের পুলিশ আপিসের শিলমোহর পড়েনি।

বললাম : সেটা তো আমার দোষ নয়, পাসপোর্ট তো আপনাদের কাছেই ছিলো। আমার ভিন্সিপত্র যে প্রেনে উঠে গেছে।

তিনি মাথা নাড়িয়ে বললেন : তিনি অসহায়।

আমি বললাম : আমি তাঁর চেয়েও অসহায়। লম্বা টাকাকড়িও বিশেষ কিছু নেই, দলে আমরা চারজন। একটি ছোটো ঘরে। পথে দাঁকণ হারাবান হয়েছি। যদি কোনো রকমে...

টাকাকড়ির স্বপ্ন একটা উপায় তাঁর মাথায় এলো। বললেন : এক শ আঙ্গানি আছে ? সোভাগ্যক্রমে ছিলো। বললাম : এই নিম্ন।

হেসে মোটটা পকেটে রেখে একটা ছেঁড়া খাতায় আমাদের চারটে পাসপোর্ট থেকে নানা তথ্য তিনি খুব ধীরে-ধীরে লিখতে শুরু করলেন।

বাইরে প্রেনটা গুরুগুরু করছে। আমার বুকটাও করছে আরো বেশী গুরুগুরু। এমন সময় আমার স্ত্রী ঘরের মধ্যে এগে জানালেন : প্রেন ছাড়লো বলে।

আমি কাকুতি-মিনতি করে সেই আঙ্গানি ভত্সলোককে বললাম : প্রেন ছাড়ে, ভাড়াভাড়ি।

এমন সময় আর এক আঙ্গানি ভত্সলোক ঘরে ঢুকলেন। কোথায় গেলো আমাদের পাসপোর্ট, কোথায় গেলো লেখা ! ছুই আঙ্গানিতে কোলাকুলি আর মুখ-চুষন শুরু হোলো !

আমি বললাম : থাক পড়ে পাসপোর্ট। আমরা প্রেনে উঠলাম। বস্তার আঙ্গানি এমন্যাসিতে আমি কমপ্রেন করবো। নখর-টনর আমার কাছে আছে।

সে ভত্সলোক হেসে বললেন : দাবড়াবেন না, প্রেনে উঠুন, পাসপোর্ট প্রেনে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

আমরা হাঁপাতে-হাঁপাতে হৌচট খেতে-খেতে গেনে উঠলাম। আর আশ্চর্য, বাস্তবিকই ওঠার মিনিট পাঁচেকের মধ্যে পাশপোর্টগুলোও এলো। আর প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে আমরা উড়লাম।

মিনিট দশেকের মধ্যেই গেনে সাঁ-সাঁ করে বরফের চূড়োগুলোর ওপর উঠে পড়লো। গেনে উঠবে পর্যন্ত হাজার ফিট। এয়ার-হোস্টেস্ আমাদের মুখে অক্সিজেনের চোঙা পরিবেশ দিলেন। কার্বলের পাশপোর্ট আশিস থেকেই মিনিটটার আমার দরকার ছিলো!

নাড়ে এগাবটার আমরা নামলাম তারসেজে, রাশিয়ার সীমান্ত দেশে।

কার্বলে দারুণ পর্দা। পথে-ঘাটে কোনো মেয়ের মুখ দেখা যায় না। বোরখার নীচে শুধু দেখা যায় নানা ধরনের পা—খালি-পা, ছেঁড়া জুতো-পরা পা, হিল উঁচু ফ্যানাসদার জুতো-পরা পা। আমাদের সহযাত্রীণী কয়েকটি বোরখা-পরা মেয়ে ছিলেন। তারসেজে খাবার ঘরে টেবিলে বসে আমার চঠাৎ অবাক লাগলো : কৈ, কোনো বোরখা-পরা মেয়েকে দেখছি না তো? উঁয়া গেলেন কোথায়?

ছই মহিলা আমাদের পাশের টেবিলে বসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে ধীর কম বয়সে ওয়েস্ট্রিসকে ভেঁকে তিনি ভাঙা-ভাঙা রুশীতে বললেন : পাপিরসি, ওচেন খারাপো! (রুশী ভাষায় : খুব ভালো সিগারেট চাই)।

আমার স্ত্রী বললেন—বোরখা-পরা মেয়েদের উনি একজন। তাঁর চুল বব্, করা, ঠোঁটে টকটকে লাল লিপস্টিক; নোখে রঙ, হিল-উঁচু জুতো, পরনে বাহারি স্বাট, ব্লাউজ, ওভারকোট।

পরে তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছিলো। তিনি মা'কে নিয়ে মস্কোতে চলেছেন চিকিৎসার জন্য।

দেড়টার সময় আমরা তারসেজে পৌঁছলাম। দেখান থেকে আশা করেছিলাম জেট-গেনে পাবো। কিন্তু শুনলাম খবর আগে থেকে আগেনি বলে আমাদের আগামী কাল ভোরের সাধারণ গেনে ধরতে হবে। রাতে থাকতে হবে ভালকেন্ডেই। সাধারণ গেনে ভালকেন্ড থেকে মস্কো লাগে ১২ ঘণ্টা, জেট-গেনে তিন-ঘণ্টার কিছু বেশী! আবার আচারের কথা মনে পড়লো। হির করলাম মস্কোতে পৌঁছেই এক দিনে পেটাকে শেষ করবো।

পরের দিন অফিসার থাকতে-থাকতে এয়ারোড্রোমে পৌঁছলাম। গরম চা আর কুটি, মাখন, ফ্রাংসের চপ, চিজ খেয়ে গেনে উঠলাম। রাজি ন'টার পৌঁছলাম পরিচিত মস্কোতে। পথে দু'তিন জায়গার গেনে খেয়েছিলো।

মস্কো তখন শাদার শাদা। এয়ারোড্রোম থেকে আমাদের মস্কোর ওপরের স্ক্যাটের বহু সময় সেনকে টেলিফোন করলাম। তাঁর মেয়ে ফোন ধরেছিলো। আমরা এসেছি শুনে সে তো আহ্লাদে আঁটখানা।

রাত দশটার বাড়িতে এসে ট্যান্সি পাড়ার সড়ক দ্বে আমাদের পাড়ার কলী ছেলেমেয়েদের ডিঙি জমে গেলো। আমরা আসছি তারা খবর পেয়েছিলো। তাই তারা ছিলো জেগে। উঠানের বরফের ওপর খেলা করতে-করতে অপেক্ষা করছিলো। ট্যান্সি থেকে নামতেই আমাদের গাড়ির ধরে তাদের সে কী নাচ! মনে মনে ভাবলাম এরা মাহুৎকে আপনার করে নিতে জানে বটে!

আমরা ফিরতে এখনকার সবাই যে কী রকম খুশি কী বলবো। লিকটের বড়ির চোখে মল। যে-সোকান থেকে জিনিদপত্র কিনি সেখানকার বড়োর সে কী আনন্দ! আমরা কেমন আছি, শেখের খবর কী রকম, কোনো কষ্ট হয়েছিলো কিনা—কত রাশি-রাশি প্রশ্ন!

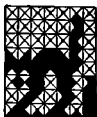
পরের দিন আশিমে যেতে ভারতীয় বন্ধুদের সঙ্গে দেখা। তারা শুধু প্রশ্ন করলো: চাটাকি, আচার এনেছো?

বললাম: এনেছিলাম, কিন্তু খেয়ে ফেলেছি।

জানি কিছুদিন তারা আমাদের দেখলে গভীর হয়ে থাকবে।*

* ১৯শে জানুয়ারি, ১৯১৮, নতুন যের্ডিও থেকে এই চিঠির সাংগঠন পড়া হয়েছিলো।

এমন কিছু আঁকতে পারো?



পাশে এটা কিসের ছবি? নিশ্চয়ই বলতে পারবে—ম্যাও, বেরাল বা পুবি এই ডিমটের মধ্যে জুড়ি যে কোন একটার নাম বলবে। ঠ্যা, তাই। যে যে-ভাবেই ডাকো, শুকুটা ঐ একই—মাহুৎকি বাঘের মাসী, বিভাল-তপসী। কিন্তু বুঝতে কষ্ট না হলেও, আঁকাটা একটু অদ্ভুত লাগছে না? এটি সহজ পদ্ধতিতে আঁকা। এ ধরনের ঘর কেটে নানা জিনিস আঁকা যায়। একটি মোটা কাগজের উপর এই ধরনের ঘর কেটে তোমরা কিছু আঁকতে পারো কিনা চেষ্টা করে দেখ। পারলে আমাদের কাছে পাঠাও। ভাল হলে 'মৌচাক' ছাপা হবে। একটি কোন ছবিকে কার্বন পেপারে ট্রেন্স করে নিয়ে, পরে তার উপর ঘর কেটে, কালি দিয়ে ঘরগুলি ভর্তি করে দেবে। কোন কোন ঘরগুলি ভর্তি করলে অল্পে ছবিটিকে বোকা যাবে তা নির্ভর করছে তোমাদের উপর।



হৃদয়ী শূন্য

[উপভাস]

মেঘাচার্য

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

নীল জল, সমুদ্র নীল—পৃথিবীর সমস্ত ময়লা জল এসে পড়েছে সমুদ্রের মধ্যে। মহাসেবের কণ্ঠ নীল—বিশ পান করে, এই নীল সমুদ্র মখন ক'রে দেবতার পেরেছিলেন অমৃত, আর অহরেরা বাহুকীর নিঃশ্বাস-বিশে সঞ্চারিত হোল। উঠে:প্রবা ঘোড়া উঠলো, লক্ষী উঠলেন। তোর হলে সূর্যের কিরণ বখন ছড়িয়ে পড়বে সমুদ্রের ঢেউ-এর উপর, তখন বিশ্বালী দ্বারা অর্থাৎ পরম ডক্ত বৈষ্ণবেরা দেখতে পান সূরে যেখানে নীল জল নীল আকাশের সঙ্গে এক হয়ে গিয়েছে, সেইখানে লাল পদ্ম ভাসছে। সেই পদ্মের উপর বসে আছেন অন্নং নারায়ণ, তাঁর পাশে লক্ষী দেবী। হাঁসের উপর গায়ত্রী দেবীকেও দেখা যায়।

যেকোনো মাসীর মুখের দিকে চেয়ে পিনাকী হাঁ ক'রে শোনে। স্বর্গদ্বারে স্বর্ষির-ফেরত বেড়াতে এসেছেন লাখনা দেবী। মেসোমণির আগে আগে চলেছেন, ঘনজাহের হাতে জগদ্ধাতের প্রসাদ। বাহুর লাকাতো লাকাতো চলেছে। মাসীমার পাশাপাশি বালির উপর দিয়ে চলেছে পিনাকী। সমুদ্রের ঢেউ-এর ছিটেফোঁটা এসে লাগছে পিনাকীর পায়ের পাতায়। সমুদ্রের জলের কাছে বালির উপর দিয়ে চলতে গেলে খালি পায়ে চলাই সুবিধে; তাই নতুন কেনা জুতোছোড়া হাতে ক'রে নিয়ে চলেছে পিনাকী।

—হান করবি ?—নে, কাপড় ছেড়ে গামছাটা পর—ঘনজাহ, তুমি বরং প্রাণাম আমার হাতে দাও, ওদের শুকটু হান করিয়ে আনো।...

সমুদ্রে স্থান।...বহুদিনকার স্বপ্ন আজ সফল হোতে চলেছে। কি বিরীট ডেউ! কি পূর্ণন! শুধু ডেউ পড়ছে ডেউ, আবার পেছু টানে কিরে বাজে। আবার ডেউ উঠবে, আবার ডাকবে। পিনাকীর বড় ভয় করে। এক সমুদ্রের রূপ! নীলগলধর শ্রামহুন্দরের মতন হুন্দর, কিন্তু এত নির্ধর কেন সমুদ্র? ডেউ-এর সঙ্গে ভাল রাখতে না পেরে পিনাকী পড়ে যায়। মুহূর্তের মধ্যে মনে হয় কে যেন কর্তৃ চোপে ধরেছে, বাহুর আলিঙ্গনের মতন হাড়গোড় দুমড়ে মুচড়ে শেষ করে দিল বুঝি!...আর রক্ষা নেই, এই বুঝি মাগর তাকে টেনে নিয়ে চলেছে অতল সলিলগহ্বরে—যেখানে থাকে নাগিনীকন্তারা—অর্ধ-মানবী অর্ধ-শাপিনী...হাডর, ভিবি—অইচতন্ত্রায় পিনাকীকে টেনে তোলে ঘনভায়। বাহুর এর আগে পুরীতে এসেছে কয়েকবার, মানের কোশল জানে।...ঘনঘন নিঃশ্বাস ফেলে পিনাকী। লজ্জায় ভরে চোপ বুজ থাকে কয়েক সেকেন্ড। চোপ খুলে যেখে দোস্তামুখে ঘনভায় মিটিমিটি হাসছে।—দাদাবাবু, সমুদ্র জানো কউদলো করি...

কোশল শিখার ইচ্ছা আর পিনাকীর নেই। উপরের দিকে তাকাতেই পিনাকীর চোখে পড়ে সামনে হোটেলের দরজার কাছে পাড়িয়ে একটি সাত-আট বছর বয়েনের মেয়ে। ফ্রক-পরা মেয়েটা একদৃষ্টিতে চেয়ে আছে সমুদ্রের দিকে। কি দেখছে?...একটু বুয়ে পাড়িয়ে একজন শ্রামবর্ণা বিধবা মহিলা মালীমার সঙ্গে গল্প জুড়ে দিয়েছেন। মালীমার পরিচিত কেউ হবে হয়তো; কিন্তু মেয়েটি!...মেয়েটিকে কি পূর্বে কোথাও দেখেছে পিনাকী? আশ্চর্য! চেনা চেনা মুখ, অথচ ঠিক স্মরণ হচ্ছে না। ওর ঠোঁটে বিজ্ঞপের হাসি কেন?

অকস্মাৎ বিদ্যায় বলকের ছায় পিনাকীর মনে পড়ে যায়, তাইতো—বেলার মাসভূতো বোন শিবানী—এতক্ষণ চিনতে পারি নি। পুরীতে জ্বলো কি করে? বোম্বয় বেড়াতে এসেছে হোটেল—হ্যাঁ, হ্যাঁ, এইবার মনে পড়েছে—বেলা বলেছিল বটে—শিবানীর কাকাবাবুর হোটেল আছে পুরীতে, স্বর্গধারে। এই হোটেলটাই তাহলে শিবানীর কাকাবাবুর?...

মেয়েটা ভারী ইয়ে—কায় সঙ্গে কথা বলতে চায় না—কেউ যদি কথা বলতে আসে, এমন গভীরভাবে তাকিয়ে থাকবে যেন, ওর মত বড়লোকের মেয়ে আর কেউ নেই। নীলিমার বাবার তো কত টাকা—শিবানীর তার সিকিও নেই। কৈ, নীলিমার তো ঐ মেয়েটার মতন চাল নেই...পিনাকী নিজে ডান হাতের বুড়ো আঙুলটার দিকে চেয়ে দেখে। স্বভিহ সিহরণ আগে—উঃ, দাঁতে কি ওর ধার!...কামড়ে দিয়েছিল আঙুলটা এমন জ্বোরে।...

ঘনভায়ের নির্দেশমত এবার স্থান করে পিনাকী। সত্যি তো ডেউ-এর সামনে মাথা নীচু করাই বুদ্ধিমানের কাজ। ডাসিয়ে নিয়ে যায় বটে, কিন্তু আছড়ে কেলে না।...লাভা পায়ে বালির ছাপ লেগে গিয়েছে, ঠোঁটে সমুদ্রের লোনা জলের স্পর্শ। থু থু—এত হুন্দর সমুদ্র, কিন্তু এমন

বিবাদ ওর জল। জুগোলে পড়েছে শিনাকী, এই জল বাপ হয়ে আকাশে ওঠে, লবণ ভারী বলে উঠতে পারে না, থেকে যায় সমুদ্রের মধ্যেই। বাষ্পরূপে সমুদ্র শেষ হয়ে ভেসে চলে পুরী থেকে কলকাতায়। কলকাতার পর ভাষের দেশে—তাই কি? শুধু ভাষের দেশ নয়, আরো কত দেশ পার হয়ে সমুদ্র উড়ে চলে হিমালয়ের দেশে। হিমালয়ের বরফ গলে নেমে আসে ভাগীরথী গঙ্গা, পদ্মা, সিদ্ধি, ব্রহ্মপুত্র।...

ব্রহ্মপুত্র! কি অদ্ভুত নাম! নদও কি ব্রহ্মার পুত্র? বাবার হত অকম্বাসীও বলে—ব্রহ্মা মানে ষাট থেকে আর বৃহৎ নেই। ব্রহ্মা। ব্রহ্মা!...জিজে গায়ছা নিঙ্ড়িয়ে গা মুছতে মুছতে শিনাকী একবার আড়চোখে চেয়ে দেখে চারিদিক। শিবানী আর সমুদ্রের দিকে চেয়ে নেই, পশ্চিম দিকে মুখ করে কি দেখছে কে জানে? শিনাকীর স্বরণ হয় সেবার বাজারের দোকানীরা মিলে ব্রহ্মপুজো করলো...শিনাকীর বাবা সর্বেশ্বর চক্রবর্তীই বিধান দিয়েছিলেন।—পাটের শুদামে আগুন লেগে বাজার বায় বায়, অনেক কষ্টে আগুন নিবিয়েছে দোকানীরা, স্থলের ছেলেরা সাহায্য করেছিল খুঁ—নদীর ঘাট থেকে লাইন করে ঝাড়িয়ে বালতি, বাট, গাদ্দু, হাড়ি, কলসী বা পাওয়া গিয়েছিল তখন—সন্মানে হাতে হাতে চললো জল; কিন্তু আগুনের ভেজ কি, বহুক্ষণ নদর থেকেও নাকি আগুনের আঁজ দেখতে পেরেছিল লোকেরা। যা হয়েছে হয়েছে, আর হাতে আগুন না লাগে—নিয়মিত বৎসর বৎসর ব্রহ্মপুজো করা দরকার, তাহলে আর আগুনের ভয় থাকে না।

শিনাকী নিজ কানে শুনেছে দোকানীরা যা ব্রহ্মা বলে প্রণাম করছে প্রতিবার সামনে। অক্ষয় শোনার পরিভাষা ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিল—শিব শুধু বাবা, ব্রহ্মা বাবাও বটেন, মাও বটেন—বা মনে কণো তাই তিনি—যা বলে ভাকাই হুবিধে—মাই ভাড়াভাড়ি মাড়া মেন কিনা। শিবানী কিছুতেই স্বীকার কববে না, কেবল তর্ক!—ব্রহ্মা যা হতেই পারেন না।—কেন তর্ক, শিনাকী শিবানীর চুল ধরে শাসিয়েছিল, গালে একটা চড়ও বসিয়ে দিয়েছিল—নিশ্চয় লেগেছে একটু—কিন্তু তাই বলে আঙুল কামড়ে দেবে ঠাঁত দিয়ে? কেঁসে উঠলেই তো শিনাকী ছেড়ে দিত। হাজার হোক, শিনাকী তো শিবানীর চেয়ে বয়েসে বড়।

—এই শিনাকী, কি তাবছিন? ঈগুনির নে, চটপট প্যাঁট পরে নে—জামা পরবার দরকার নেই—হাতে নে, হাতে নে—চল চল—যা ভাকছে। বাহুর পেছা, জামা কাঁধে নিয়ে, জিজে গায়ছা ছুটো ঘনজামের দিকে ছুড়ে দেয়। শিনাকী বাহুরের শিখন শিখন উপরে উঠে যায়। সামনেই দোতালার হোটেলের গেট খোলা। নতুন চুনকাম করা বাড়ী, দোতালার সামনের দিকে একটুখানি খোলা বারান্দা, তার ছ'দিকে দুটো কামরা। উপরের খোলা বারান্দার কখন উঠে গেল শিবানী?

গম্ভীরভাবে কি এত ভাবছে যেহেটা? সমুদ্রের দিকে চেয়ে আছে নাকি? না, তাদের দিকে চেয়ে? ঠিক বুঝতে পারে না পিনাকী। ভারী চালাক শিবানী—হয়তো চোখ ফিরিয়ে নিয়েছে যেই পিনাকী চোখ উঠিয়েছে।

—জানিস পিনাকী, ঐ মেরেটার নাম শিবানী।

নীরদকর্ষে পিনাকী শুধু বলে—হঁ।

—ওর কাকার নাম হরিহর ঘোষ—দীঘলঘাটার বন্ধু। ওই দেখ—ঐ যে রোগা, ফর্সা, চ্যাঙাপনা ভল্লোলক ঝাড়িয়ে কথা বলছেন—কুয়েটার পাশে—বাবার সঙ্গে—বুকিলি—এই হোটেল ওর। গোটা বাড়ীটাই এবছর কিনে নিয়েছেন।

ঘনভার পিছনে পিছনে আগতে বলে—পোলোক বাবুর-অ সম্পত্তি মৃত্যু হল। সেই কারণ-অ সম্পত্তি বিক্রী করি দল। তা খুব-অ শস্তা দর-অ হল, পাঁচ হাজার-অ তত্বারে দিতলা প-কা বাড়ী কোয়াড়ে মিলিবে না। হরিহরবাবু ভাগ্যান-অ অছি।

—উপরের ঘরে ঢুকতেই পিনাকীর কানে যায় হেমলিনী দত্ত বলেছেন মাসীবাকে—কি যে ময় নিয়েছে তোমার দাদা, কিছুই বুঝতে পারি না। বস্তুর বা সম্পত্তি রেখে গিয়েছেন তাতে ঠাকুরপোর অংশে অন্ততঃ বিশ-পচিশ হাজার টাকা নগদ, ভবিষ্যৎও দেশে কম নয়—অন্যায়নে বিয়ে করা চলতো।

—কেন, কি বলেন উনি?

বলবেন আবার কি, দেশোদ্ধার না করে বিয়ে করা চলে না। পরাধীন দেশে জীতদাসের সংখ্যা বাড়িয়ে লাভ কি?...পলার স্বয়ং মীচু ক'রে আরো কত কথা বলে চলেন হেমলিনী দত্ত। পিনাকী সবটা শুনে পায় না, অর্থও বুঝতে পারে না। রহস্যময় হরিহর ঘোষের প্রতি তার মন ছুঁতে থাকে। জীতদাস! জীতদাস কে?...

শিবানীর কাকাবাবু কি অনেক লেখাপড়া শিখেছেন? উনি হোটেল করেছেন; হোটেল বার করে তারা খুব বড়লোক। ভারতবর্ষে সবাই আমবা পরাধীন। পরাধীন দেশে বিয়ে করতে কি দোষ? বিয়ে—বিয়ে মানে কি? পিনাকী চিন্তা করে মনে মনে। সেই যে বাটুলদার বিয়ে হোল—টোপার মাখায় দিয়ে নৌকো থেকে নামলো বাটুলদা। পিছন পিছন গাঁটছাড়া বাধা বোধ। পিনাকীর বেশ মনে পড়ে বরষাজী হিসেবে গিয়েছিল সে। বাটুলদার বিয়েতে পাশের গ্রামে নৌকো ক'রে। তার বাবাই তো সিন্ধুপ সময় ঠিক ক'রে দিলেন। বাবার সময় কি আনন্দ, হাসি, গান!...নগেন বেহালা গান গেয়েছিল—‘আনন্দেগি সাগর থেকে এসেছে আজ বান, ঝড় ধরে আজ বদলে সবাই, টানরে সবাই টান।’ গানের পর গান, গান আর গানে নান—বরষাজীদের নিয়ে বদানো

হোল মস্ত বারান্দাওয়ালা টিনের ঘরে। কি ঠাণ্ডা!...বাজি ছুটোর পর লর। পিনাকীর ভাগ্যে আর বিয়ে দেখা হয় নি। কস্তাপক্ষের লোকেরা বরখাদীদের দত্ত করেকটা কখন ও লেপ দিয়েছিল, তারি একটার মধ্যে ঢুকে পড়েছিল সে। ছানা চিনি খাবার পর ঘুম চোখ ভরে আগছিল তার।

—এই যে পিনাকী, এসেছিল—খাবি এখন? ক্রিধে পেয়েছে—না?

মাসীমার কণ্ঠস্বরে পিনাকীর চমক ভাঙে। বাহুর কখন এগিয়ে গিয়ে শিবানীর সঙ্গে পল্ল ছুড়ে দিয়েছে। বাহুরের সঙ্গে তো বেশ হেসে হেসে কথা বলছে মেয়েটা! আশ্চর্য!...সিঁড়ির উপর পারের নন্দ শোনা যায়, মোলোমণায়, শিবানীর কাকাবাবু, আরও করেকজন বোড়ার উপরে উঠে আসেন। পিনাকী হলঘরের সামনে কাঁকা বারান্দায় মস্তখড় পিড়লের টবে রাখা চেনা চেনা অথচ চেনা নয় গাছটি লক্ষ্য করে জিগ্যাস করে—কি গাছ ওটা মাসীমা?...

হেমনদিনী সেবী বৃহৎ হেসে মাসীমার পরিবর্তে উত্তর দেন—ওটা তেতুল গাছ! মাটি কম, তাই আর বাড়তে পারে নি। শিবানী এখনো আশা রাখে ওতে একদিন তেতুল ধরবে। শিবানীর পীড়ানীড়িতে ঠাকুরশো বীচি লাগিয়েছিল টবে গত বছর। আশ্চর্য! বীচি থেকে গাছ হয়েছে, এখন পর্যন্ত বেঁচেও আছে। (ক্রমশঃ)

জ্যৈষ্ঠের ছড়া

শ্রীকৃতাকর নারি

জ্যৈষ্ঠ এলো জ্যৈষ্ঠ এলো শিলাইনদীর চরে
কাঁকা রোদের ঝাপসা আলো কিরছে
দিগন্তরে।
চিক্ চিক্ চিক্ করছে বালু মরীচিকার মতো,
হেঁড়ে গলায় একটা কাক-এ ডাকছে

অবিরত।

গা এলিয়ে বটের ছায়ে কিমোয় গাভীগুলি,
রাখাল-বেগু মন-উদাসী সুর দিয়েছে তুলি।
বন বন বন ঘুণি ওড়ে হঠাৎ থেকে থেকে,
আঁৎকে উঠে মিষ্টি মেয়ে মিষ্টি তাহা দেখে।
আম-কাঁঠালের কোয়ার ভিতর জমছে রসের
ধারা,
ধুব করে ঝায় হিমেল করা তালের শাঁস

এ কারা?

ঐ যে হোথা শীতলপাটি বিছিয়ে বারান্দায়,
ঘামে নেয়ে এপাশ ওপাশ করছে ঠাকুরমায়।
কুস্কুড়িদের চুলকুনিতে কাঁদছে সোনামণি,
গরমি হাওয়ায় এইখানে তার আসছে

প্রতিধ্বনি।

ময়লা ছেঁড়া গেঞ্জি গায়ে পাখা টানে ছেলে,
উলসে উঠে চোখ ছুটি তার একটু ছুটি পেলে
ইস্ কি গরম বিচ্ছিরি তাই, প্রাণটা রাখা
দায়,
এমন দিনে বাঁজগণিতের সূত্র গেলা যায়?
তাইতো রে তাই চুপি চুপি স্তারকে কাঁকি
দিয়ে,

জ্যৈষ্ঠ-দিনের ছড়া লিখি আঁকের খাতা

দিয়ে।

কিশোর-সাহিত্যের অমর গ্রন্থ

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
মাকড়ার পুঁথি ৩০
'বনকুল'
রজনী ২৮
বিকৃতিভূষণ মুখোপাধ্যায়
হেসে যাও ২৮
পোহর চিঠি ১১০
বিমল মিত্র
টুক-কাল-মিষ্টি ২৮
প্রতিভা বহু
শব চেয়ে যা বড় ১৫০
বৃক্ষসেব বহু
রাসা থেকে কালী ১১০
অ-ক-ব
বামথোলা ছড়া ১০
পঞ্চপতি ভট্টাচার্য
সুদূর দেশের তপস্বী ২৮
সীতা দেবী ও শাক্তা দেবী
হিন্দুস্থানী উপকথা ৩০
লীলা মজুমদার
হলদে পাবীর গালক ২৮
স্বপন বৃন্দা
স্বপন বৃন্দার হাজার গল্প ১১০
শিবরাম চক্রবর্তী
নিখরচায় জলধোপ ১১০
রবীন্দ্র মৈত্র
মায়া বাঁশী ১১০

প্রত্যেকখানি এই ছবিতে ছাপায় অনবদ্য
নানা রঙের ছবিতে ভরা নিম্ন ও কিশোর-সাহিত্যে আর একখানি বিশ্বকর প্রকাশ ভারত সংকলনের পুস্তকসমগ্র

প্রোমেন্ড মিত্রের বনাদার গল্প ২১০

**দন্তমঞ্জুরে
নবপরিচয়**

**সুবিখ্যাত বীজবাহক
ডেন্টনিক**

ক্রোমোফিল সহযোগে
আধিকৃত শক্তিশালী



নির্বল মুখগন্ধর
দৃঢ় দন্ত ও ঘাটী
দগ্ধহীন প্রকাশ

ক্রোমোফিল
ডেন্টনিক দন্ত
নগ্নে সহজলভ্য
ইইং

বেপল কেমিক্যাল
কলিকাতা, বোম্বাই, কানপুর

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাঃ লিঃ

২৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭





হবেই তো! যা রোগা
তুই! আমায় দ্যাখ।
রোজ দুধ আর
'ডালডা'য় রাঁধা
খাবার খাই আমি।
সেইজন্মে তোর
থেকে আমার গায়ে
জোর বেশি।

'ডালডা'য় রাঁধা
খাবার বল এবং
শক্তি দেয় আর
হজমও হয় সহজে।
'ডালডা'য় শরীরকে
সুস্থ রাখার পক্ষে

অপরিহার্য
দুটি ভিটামিন
'এ' এবং 'ডি'
যোগ করা হয়।





বিজ্ঞাপনের সত্যমন্ত

কি প্রয়োজন বিশ্বাসেতে ?

স্বল্পব্যয়ে, আপত্তি ছেড়ে, যাচাই করা চলে,
'খিনের' মধ্যে; গুলে, স্বাদে সবার সেরা 'কালে'
অভিজ্ঞাত বলত ওখন, শুধু 'খিনই' নয়,
সবরকমের "কালে বিস্কুটেই" সেরার পরিচয়।



বুকাহুরের পুনর্জন্ম

বিজ্ঞানশ্রিয়

যোধহর বুকাহুরই হবে।

কঠোর তপস্বী আরম্ভ করলো মহাদেবের। দিন নাই, রাত নাই, আহার-নিদ্রা নাই, চলছে তার সাধনা। ভক্তের কষ্ট কি কেউ সহ করতে পারে! আর উনি হলেন আন্ততঃ্য মদাশিব ভোলানাথ—যিনি সামান্য মল বেগপাতাতেই খুশী, তিনি কি থাকতে পারেন! ভক্তের আরাধনায় তুষ্ট হ'য়ে তাকে দেখা দিয়ে বললেন—“কি বর চাও বৎস?”

ভক্ত বললে, “প্রভু, আমার এই বর দিন যে, আমি যার মাথার উপর হাত রাখবো সে যেন তখনই ভগ্ন হ'য়ে যায়।”

আমנם বিস্তার মহাদেব বললেন—“ভাষান্ত।” তারপরই আংকে উঠলেন আতকে, যখন বিভিন্নে বুরেলন ব্যাপারটা।

ভক্ত তাঁকে প্রণাম ক'রে মতমাহ হ'য়ে বিনয়-গদগদ কণ্ঠে বললে, “বর তো দিলেন ঠাকুর, দেটা ঠিক কিমা পরখ করবো কি ক'রে? আপনার মাথায় হাত রেবেই দেখি।” এই কথা বলে ভক্ত উঠে পাড়াতেই দৌড়োতে শুরু করলেন মহাদেব—ব্যাটা বলে কি! ভক্তও ছাড়বার পাত্র নয়, দেও শিছু নিল। দেও বস জোরে দৌড়োয়—“প্রভু পাড়ান, প্রভু পাড়ান” বলে, মহাদেব তার চেয়েও বেশী জোরে দৌড়োতে থাকেন। তার বর তো বিধ্যা হবে না—মাথায় হাত রাখলেই ভগ্ন! ত্রিভুবন তোলপাড়। মহাদেব ছুটেছেন প্রাণ নিয়ে, আর শিছনে তাঁর ভক্তও ছুটেছে হাত বাড়িয়ে। সে কি কাণ্ড! নারদ এনে মহাদেবকে উদ্ধার না করলে তিনি নিজেই যেতেন ভগ্ন হ'য়ে।

আমাদেরও এখন হয়েছে সেই দশা—মহাদেবের মত। আমরা ছুটছি প্রাণ বাঁচাবার জন্যে, আর আমাদের শিছনে তেড়ে আসছে হাত বাড়িয়ে আমাদেরই বর-পাওয়া বুকাহুরের স্বাক—ভেজক্রিয় পরমাণু।

এটম্ বা আণবিক বোমার কথা বলছি; যার বিস্ফোরণে গত মহাযুদ্ধ শেষ হয়েছিল জাপানের নাগাসাকি অর হিরোসিমা শহর ধ্বংস ক'রে। এখন তার চেয়েও শক্তিশালী আণবিক বোমা তৈরী হয়েছে এবং তার পরীক্ষা চলছে ১৯৪৪ খ্রষ্টাব্দের ১লা মার্চ থেকে। এর পরীক্ষা চালানোই আতকের বিষয়—আসল কাঙ্ক্ষের কথা পরে। তোমাদের হৃদয় মনে হ'তে পারে—কোন লোকালয়ের উপর ফেলা নয়, বহুদূরে ঝাঁক জারগায় দেখা হ'চ্ছে বোমাটা উৎরালো কেমন, এতে ভয় কিসের! তাতে তো কিছু ধ্বংসও হচ্ছে না, কেউ মরছেও না, এত আতঙ্ক কেন! ভয়ানক আতঙ্ক আছে, দুই পাজার কামানের পরীক্ষার ডয়ের কিছু নাই; তার গোলা ছোড়া হ'লো, সেটা

কোনো ঝাঁক। জায়গায় গিয়ে পড়লো, ফাটলো, বাগ্ন খণ্ডম্। সেটা আর দানা পেয়ে আমাদের ঘাড়ে এসে পড়বে না। কিন্তু আণবিক বোমার বিস্ফোরণের ব্যাপারই আলাদা। লোকালয় থেকে বহুদূরে শূন্য স্থানে বিস্ফোরণ ঘটানো হ'লো, তাতে মরলোও না কেউ, ক্ষয়ও হলো না কিছু সত্যি কথা, কিন্তু তার ঞের রয়ে গেল—আজ নয়, কাল নয়, ছ' মণ দিনের মধ্যেও নয়, কিছুকাল পরে, আমরা হয়ত সে বিস্ফোরণের কথা ভুলেই গেছি, তখন তার ভেতী দেখাবে; তখন তা বোধ করবার উপায় থাকবে না আমাদের হাতে। কেন, তাই বলছি।

মোটামুটি দু'রকমের আণবিক বোমা আছে—ইউরেনিয়াম বোমা আর হাইড্রোজেন বোমা। ইউরেনিয়াম বোমার শক্তি জোগায় ইউরেনিয়াম কণিকার বিস্ফোরণে; আর হাইড্রোজেন বোমাতে হাইড্রোজেন হিলিয়ামে রূপান্তরিত হ'য়ে বিস্ফুরিত হয়। সূর্যের পৃষ্ঠ থেকে যে শক্তিরায় আলো আর উদ্ভাপরূপে তেজবিকিরণ হয় অবিরাম, সেই পদ্ধতিতে কাজ হয় হাইড্রোজেন বোমায়। থিরোসিমায যে বোমা ফেলা হয়েছিল তার চেয়ে ছ'বার গুণ শক্তিশালী আধুনিক হাইড্রোজেন বোমা। আবার, কোবল্ট বোমা এর চেয়েও বহুগুণ মারণ শক্তিশর।

আণবিক বোমার পরীক্ষাতেও ডর কেন জান ? এর বিস্ফোরণে অতি সূক্ষ্ম তেজস্ক্রিয় পদার্থের সৃষ্টি হয়; বাসের সংখ্যার কোনো হিসাব করা যায় না। তেজস্ক্রিয় পদার্থ বলতে কি বোঝায় তোমরা হয়ত এমন তা ঠিক বুঝতে পারবে না; বড় হ'য়ে পদার্থ আর রসায়ন বিজ্ঞান এখন পড়বে তখন পরিচয় পাবে এসের, ভাল ক'রে। এখন এইটুকু মনে রাখো, এইসব পদার্থ থেকে অতি সূক্ষ্ম এমন একটা শক্তি িস্ফুরিত হয়, যাকে ঠিক মত ব্যবহার করতে না পারলে খুব ক্ষতি করে আমাদের। এ-কথা নিশ্চয় বুঝতে পারছো, ক্ষতি করবার মত শক্তিময়ন না হ'লে বোমার উপাদান হিগাবে দে-সব ব্যবহার করা হবে কেন ? আণবিক বোমার বিস্ফোরণে অসংখ্য তেজস্ক্রিয় পদার্থকণা ছড়িয়ে পড়ে বায়ুমণ্ডলে। এই কণাগুলোর মধ্যে কতক খুব তাড়াতাড়ি নিশ্বেদ হ'য়ে যায়, কতকগুলো হয় খুব দীর্ঘে দীর্ঘে, আর কতকগুলো বিনষ্ট হতে দীর্ঘকাল সময় লাগে। এসের মধ্যে যেগুলো খুব শক্তিশালী তাদের জীবন মায় মণ সেকেন্ড স্থায়ী; কিন্তু ঐ অল্প সময়ইে ত্রিতুবন জাহি জাহি করে—এই সময়ের মধ্যেই একটা এলাকার সমস্ত অধিবাসীকে মেরে ফেলতে পারে। এই ক্ষণজীবীদের পর যারা থাকে তাদের তেজ কম হলেও রীতিমত মারাত্মক তারা। তাদের আত্ম ঘটাখানেক থেকে লক্ষ লক্ষ বছর পর্যন্ত। এ পর্যন্ত যে সব তেজস্ক্রিয় পদার্থের পরিচয় পাওয়া গেছে, তা থেকে জানা যায় যে, এমন এক জাতের পদার্থ আছে যা কুড়ি কোটি বছর সক্রিয় থাকে; অর্থাৎ বেঁচে থেকে তার কাজ ক'রে যেতে পারে।

বিস্ফোরণের মলে বায়ুমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়ে তেজস্ক্রিয় পদার্থকণা মেঘের আকারে। এসের

যেগুলো অপেক্ষাকৃত ভারী, সেগুলো ভাড়াভাড়ি মাটিতে পড়ে। যেগুলো হাল্কা, সেগুলো পড়ে তুষার বা বারিঘাতের সঙ্গে। এ পর্যন্ত যত হাইড্রোজেন বোমার পরীক্ষা হয়েছে, তার ফলে বায়ুমণ্ডলে বেশিরমাণ তেজস্ক্রিয় কণিকা ভেদে বেড়াচ্ছে, তারা যে কতদিনে নিঃশেষে মাটিতে পড়বে কেউই তা ঠিক ক'রে বলতে পারেন না; কেউ কেউ বলেন ত্রিশ-চল্লিশ বছরও লাগতে পারে।

মূলি, তুষার বা বারিঘাতের সঙ্গে তেজস্ক্রিয় পদার্থ নেমে আসে মাটির উপর, জলের উপর; মাটিকে করে তেজস্ক্রিয়, জলকে ক'রে তেজস্ক্রিয়। সেই মাটিতে বা ফলে—ভূগ, তরুলতা, শাকসব্জি, শস্ত, ফলমূল সবই হয় তেজস্ক্রিয়; সেই সব ভূগভোম্বী প্রাণীরাও হয় তেজস্ক্রিয়, তাদের দুধ, তাদের মাংসও হয় তেজস্ক্রিয়। সেই জলাশয়ের মাছ, জলচর পক্ষী প্রভৃতিও হয় তেজস্ক্রিয়। সেই সকল শাকসব্জি ফল শস্ত দুধ মাছ মাংস ভিন্ন প্রভৃতি খাওয়ার ভিতর দিয়ে আমাদের দেহের মধ্যে প্রবেশ করে তেজস্ক্রিয় পদার্থ। প্রভৃতির বৃকে আমরা যে বিষ চড়াচ্ছি আণবিক বিস্ফোরণ ঘটিয়ে, প্রকৃতি আমাদের সেই বিষই পরিবেশন করছে—শাকসব্জি শস্ত ফল মূল দুধ মাছ মাংস ভিন্ন আর জলের ভিতর দিয়ে। তার কোনো দোষ নেই, সে আমাদের কাছ থেকে যা পায় তাই কিরিয়ে দেয়।

তেজস্ক্রিয় পদার্থ আমাদের দেহের ভিতর প্রবেশ করে জমায়েৎ হয় হাড়ের চিন্তিতে (সেহৃৎয়ের স্মৃতি উপাদানে), যকৃতে এবং প্রীহাতে। এই সব জায়গায় স্মৃতি অহুত্বিত্মীল যকৃৎগলি আক্রান্ত হয় তেজস্ক্রিয় বিকিরণে। যে রাসায়নিক শক্তির বলে দেহের ভিতরকার স্মৃতি কোষগলি কাজ ক'রে থাকে, তাদের সেই শক্তি যায় নষ্ট হ'য়ে, কোষগলি যায় ম'রে, সেহে সৃষ্টি হয় রোগের। রক্তের ভিতরকার বেত ও লোহিত কণিকার স্মৃতি অবস্থানেই সেহে থাকে প্রাণশক্তি। তেজস্ক্রিয় পদার্থের তেজ বিজুরণে রক্তকণিকা উৎপাদনে ব্যাঘাত ঘটে; তার ফলে রক্তের মানবিকর মারাত্মক রোগ হয়, যার ওষু নেই,—যাতে মৃত্যু অনিবার্য। বিকিনি ধীণে হাইড্রোজেন বোমা বিস্ফোরণের পর দেখান থেকে ২০ মাইল দূর আগানী জেলসের নৌকার উপর পড়ে তেজস্ক্রিয় ডম্বরাপি। জেলেরা সকলেই আক্রান্ত হয়েছিল উৎকট রক্ত-দূষিত ব্যাধিতে। তাদের দেহে অবিরাম রক্ত-সঞ্চারণের ফলে বহু চেষ্টায় একজন ছাড়া বন্ধিও তাদের সকলকে বাঁচানো সম্ভব হয়েছিল, কিন্তু দেশভুক্ত সকলে আক্রান্ত হলে বাঁচাবে কে রক্ত দিয়ে? তেজস্ক্রিয় বিকিরণে কেবল যে বর্তমান বাসীজাদেরই ক্ষতি হবে তা নয়, ভবিষ্যৎ বংশধরদেরও দ্বাস্থ্যহীন, অনাহীন এবং মেহ ও মনে পশু হবার সম্ভাবনা। অতি সামান্য পরিমাণ তেজস্ক্রিয় পদার্থ আমাদের দেহের ভিতরে গিয়ে বাসা বাঁধলেই মৃত্যু—দীর্ঘকাল অবিরাম তেজ বিজুরণে রক্তে মারাত্মক ব্যাধির সৃষ্টি করতে পারে। বিশেষজ্ঞেরা বলছেন এ পর্যন্ত আণবিক বোমার বিস্ফোরণে বায়ুমণ্ডলে যে পরিমাণ তেজস্ক্রিয় পদার্থ ছড়িয়ে আছে, তাতেই আশংকার শেষ নেই—এরপর আরও বিস্ফোরণ ঘটালে পৃথিবী থেকে মানব জাতিকে নিশ্চিহ্ন করবারই পথ পরিষ্কার করা

হবে। তাই মানব শ্রেমিক মনোবীরা একবাক্যে বলছেন—বন্ধ করো, বন্ধ করো আণবিক বিফোরণ, নইলে লুপ্ত হ'য়ে যাবে মানব জাতি, ধ্বংস হ'য়ে যাবে মানব সভ্যতার সৌধ; এই হুমকির পরীতল হবে মরুময় স্থান।

বিজ্ঞানের সাধনার আমরা যে জিনিষ সৃষ্টি করেছি, তার অমোঘ শক্তি বিশ্ব প্রকৃতির উপরও প্রভাব বিস্তার করছে এটা অব্যাক্তই গর্বের কথা—কিন্তু তার উত্তাবহ পরিণাম সম্বন্ধে সচেতন না হ'লে দুর্ভাগ্যের চরম হবে। আমাদের সৃষ্ট বিজ্ঞান আমাদেরই অজ্ঞান ক'রে না ফেলে। এখন বিজ্ঞানের হাত থেকে রেহাই পাবার বিজ্ঞানের সাধনা করতে হবে।

আঙুনকে আমরা যেমন ধ্বংসের কাজে লাগাতে পারি, সৃষ্টির কাজেও লাগাতে পারি; তেজস্ক্রিয় পদার্থও অগ্নিধর্মী। তীব্র ক্ষমতা আছে এদের—সৃষ্টিরও, ধ্বংসেরও। যে কাজে লাগাবো তাই করবে। তেজস্ক্রিয় পদার্থের ভেতরে সাহায্যে কত মঙ্গলজনক কাজ করা যায়, তারও পরীক্ষা করেছেন বিজ্ঞানীরা। এদের সাহায্যে চুখারোগ্য ব্যাধিকে দূর করা যায়, এদের সাহায্যে বৈজ্ঞানিক শক্তি উৎপাদন ক'রে কলকারখানা চালানো যেতে পারে—রেল, শীমার, বিমান চালানো যেতে পারে। এদের শক্তির সাহায্যে অতি সূক্ষ্ম থেকে অতি দুল কাজও সম্পাদন করা যেতে পারে—সে সন্ধানও বেধেছে পেরেছেন বিজ্ঞানীরা। কাজেই তেজস্ক্রিয় পদার্থ নিছক শত্রু নয় আমাদের। শত্রুও নয় বন্ধুও নয়, তাদের আমরা বা করবো তাই। এরাই আমাদের বর-পাওয়া বৃকাস্বর সব। এখন আমাদের শিছু নিয়েছে আমাদের মাথার হাত বুলিয়ে দেবার জন্তে—ঐ আণবিক বিফোরণের ফলে।

মহাদেব এখন পাগলের মত ঘুরে বেড়াচ্ছেন স্বর্ণ-মর্ত্য-পাতাল প্রাপ্তবক্ষার জন্তে, সকলেই চিন্তিত—কোথাও আলস্য নাই নিরাপদ—কি ক'রে রক্ষা পাওয়া যায় এই বিপদ থেকে! সেই সময় বোধ হয় মহাবি নরাসই বৃকাস্বরের শিছু খাওয়া ক'রে তাকে বললেন, “তুমি কি পাগল হয়েছো? মহাদেবের কথায় আবার কেউ বিবাদ করে। তোমার যে বর দিয়েছেন সেটা মোটেই সত্যি নয়। আমি বা বলছি বিবাস না হয়, তুমি তো নিজের মাথার হাত রেখেই দেখতে পারো যে।” বৃকাস্বর তাঁর কথায়ত সেই পরখ করলো নিজের মাথার হাত রেখে, আমনি গেল ভ্রম হ'য়ে। রেহাই পেলেন মহাদেব, শান্ত ও নিশ্চিন্ত হলেন দেবদেবীরা, নিরাপদ হলো ত্রিত্বব্রু সেই দুঃস্বপ্ন দাপাদাপি থেকে। বৃকি সেই বৃকাস্বরই পুনর্জন্ম লাভ করেছে আণবিক বোমার বিফোরণে এবং রক্তবীজের মত অগণিত হ'য়ে হাত বাড়িয়ে তাকা করছে আমাদেরই। তাকে ধ্বংস করতে হবে তার মারণশক্তিকে সম্পূর্ণরূপে মঙ্গলময় সৃষ্টির কাজে লাগিয়ে—তাকে করতে হবে সেবক, ঘাতক নয়।

সমুদ্র হ্রদ

শ্রীঅপূর্বরতন ভাষ্কর

আদিম যুগ থেকেই পাহাড় খুঁড়ে, হ্রদের খনি থেকে হ্রদ বার করা হয়। নাম তার সৈন্দব। রং লাল। শক্ত। মেখেতে বড় বড় চিশের মত। শুঁড়িয়ে নিতে হয় ঢেলাগুলি ব্যবহার করবার আগে। পৃথিবীর মধ্যে সব চাইতে বড় হ্রদের খনি আছে খেওড়াতে, পাঞ্জাবের শিও-দাসন-খান থেকে পাঁচ মাইল দূরে। পাঞ্জাবেই আছে আরও কয়েকটি বড় হ্রদের খনি। আছে গুনজাইলের কাছে ওয়ার্চাতে আর সিদ্ধু নদের দক্ষিণ পারে কালাবাগে। মাদ্রাজার আমল থেকেই কালাবাগের হ্রদের খনি থেকে হ্রদ তৈরী হয়। কালাবাগের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে দিকে দিকে। কত অসংখ্য লোক মেখেতে আসেন কালাবাগ। আসেন দেশ-বিদেশ থেকে। গড়ে ওঠে এক হুম্মর শহর কালাবাগে। হ্রদ দিয়ে তৈরী হয় সেই শহরের বাড়ী, বানান হয় রাস্তা কঠিন হ্রদের বুকের উপর দিয়ে। কোহাটেও আছে কয়েকটি হ্রদের খনি। অম্বহীন হ্রদ বুকে নিয়ে আছে এই খনিগুলি,—শেষ হবে না শত লক্ষ বছরের ব্যবহারেও। সবগুলি খনিই এখন পাকিস্তানের এলাকায়। আবিষ্কার হয়েছে একটি হ্রদের খনি মণ্ডিতে, কুলুভ্যালিতে। এই একটি মাত্র খনিই আছে ভারতের সীমানার মধ্যে। কিন্তু খণ্ডরার উপযুক্ত নয় এই খনির হ্রদ। আছেও অল্প পরিমাণে।

সমুদ্রের জল থেকেও হ্রদ তৈরী হয়। তার নাম করকচ। তৈরী হয় বিভিন্ন আর বিভিন্ন উপায়ে। বাঙ্গলার, তৈরী হয় সমুদ্রের জল থেকে। সমুদ্রের জল ভরা হয় বড় বড় কড়াতে! আঙনে কোটান হয় সেই জল। অদৃশ্য হয় জল, বাষ্পের আকারে। অবশিষ্ট থাকে হ্রদ। জাল বেওয়া নোনাটাটি থেকেও হ্রদ বানান হয়—বাঙ্গালা, উড়িষ্যা, কটক আর বালাসোর জেলার। বানায় ভাগলপুরে, বিহারীরাও।

হ্রদ তৈরী হয় মাদ্রাজার আমল থেকে মাদ্রাজেও। তৈরী হয় নোনাটাটি জাল দিয়ে। হয় তাঞ্জোরে, মন্সলিপটমে আর নেলোরে। আছে শারা দক্ষিণ ভারতে অনেকগুলি হ্রদ তৈরীর কারখানাও। আছে গঙ্গাসে, বিশাখাপত্তনমে, পূর্ব গোদাবরীতে আর কৃষ্ণাতে। আছে গুনটুরে, নেলোরে, ডিমেলপেটে আর দক্ষিণ আরকোটে। আছে তাঞ্জোরে রামনাদে আর তিরুন্নাঙ্গ জ্যালিতে। সমুদ্রের আর খাড়ির জল নিয়ে আসা হয় কারখানার ভিতরে, তৈরী করা হয় হ্রদ সূর্যের উত্তাপে।

হ্রদ তৈরী হয় বোম্বাইতেও। হয় আদিম যুগ থেকে। হয় সমুদ্রের ধারে সূর্যের উত্তাপে। বোম্বাইতেও আছে অনেকগুলি হ্রদ তৈরীর কারখানা। আর আছে বারাগোদায়, গুজরাটে, কাথিওরাডে ও শৌরাস্ট্রের ধারাধা-ধারায়। বানান হয় হ্রদ মাটির নীচে—নোনা জল থেকে।

হুন্ তৈরী হয় সিকুসেশে, করাচীতে সমুদ্রের জল থেকে। আদামের বোরাটে, মদিয়াতে আর মণিপুরে হয় হুনের জলে ততি কুয়া থেকে। জাল দেওয়া হয় কুয়ার জল, বাস্পে পরিণত হয় জল। অবশিষ্ট থাকে হুন্।

কিছু সমুদ্রে নয়, রাজপুতানার মরুভূমিতেই আছে সব চাইতে বড় রকমের করকস হুনের জমাগেহ। আছে সমুদ্রের ত্রুদে। আল তার কথাই তোমাদের বলবো। চারিমিকে ধুধু করে মরুভূমি। মধ্যে নীল সরোবর, লম্বা ২২ মাইল ও চওড়াতে ৬ মাইল। খোগ হয় তাতে চারিটি নদী—মেলা, রূপনগর, বাড়িমান আর থাঙেল। বাড়ে নদীর বুক, বাড়ে ত্রুদের জলও। ছড়িয়ে পড়ে ৬০ মাইল পরিধি নিয়ে।

একটি মজার গল্প শোনা যায় এই ত্রুদের সৃষ্টি সম্বন্ধে। ৫৫১ খ্রীষ্টাব্দ। শাকস্তরী সেনী ছিলেন চৌহান রাজপুতদের গৃহদেবতা। এই বংশেরই পুণ্ড্ররাজ ছিলেন দিল্লীর সম্রাট। তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ তাঁর বিরুদ্ধের কাহিনী। শুনেছ রাণী সম্ভুজার কথাও। শাকস্তরী সেনী থাকতেন এক মন্দিরে, এক পাহাড়ের চূড়ায়। এক লাধুও সেই পাহাড়ের গুহার বাস করতেন। নিরুক্ত থাকতেন কঠোর ধ্যানে। এক বিজগতি জমলে দেবা ছিল ঐ পাহাড়টি। তার আশপাশের জায়গাও ছিল অরুপ। চৌহানদের ছিল একটি কামধেহু। পাওয়া যেত না তাকে সকাল-সন্ধ্যায়। যেত অদৃশ হ'য়ে। যখন কিরে আসতো, থাকতো না তাঁর বাঁটে এক ঠোঁটাও দুধ। আসতো শূন্য বাঁট নিয়ে। ক্রমে এই বরষা আসে রাজার কানে। তিনি দেখুর অহমরণ করেন; বান ঘোড়ার চ'ড়ে। দেখু যায় আগে আগে, রাজা বান পিছে পিছে। আসেন তাঁরা পাহাড়ের সাহস্রদেশে। পাহাড়ে উঠতে থাকে দেখুটি। রাজাও ঘোড়া থেকে নেমে তার অহগমন করেন। দেখু এসে পৌছায় পাহাড়ের চূড়ায়, এক সমান জায়গায়। তার বাঁট থেকে দুধ ঝ'রে পড়ে সহস্র ধারায়। সিক্ত হয় পাহাড়ের চূড়া। নিঃশেষিত হয় দুধ পকুর বাঁটে, সে চলে যায়। যায় পাহাড় আর জলল পেরিয়ে। পৌছায় বাড়ীতে। কিছুক্ষণ অবাক হ'য়ে থাকেন রাজা। তারপর, খুঁজতে থাকেন পাহাড়। দেখেন ধ্যানে বসে আছেন এক বোঙ্গী, এক গুহার মধ্যে। দুখে ভেসে বাচ্ছে তাঁর সর্বাঙ্গ। অপেক্ষা করেন, বসন্তকণ না ধ্যান ভাঙে বোঙ্গীর। ব'সে থাকেন হাত কোড় করে। অবশেষে ধ্যান ভাঙে বোঙ্গীর। চোখ চেয়ে দেখেন, রাজা বসে আছেন সমুখে। বলেন, “দুধ পেয়ে আমি সমুদ্র। খুশী হয়েছেন দেখী শাকস্তরীও। তাঁর বরে সমস্ত জললটি পরিণত হবে এক সমতল ভূমিতে। মাটির নীচে থাকবে সূর্য্যবান ধাতু।”

রাজা বলেন, “কি হবে আমার সূর্য্যবান ধাতু নিয়ে—সৃষ্টি হবে দিব্যদের, হবে বুদ্ধবিগ্রহ। অন্তহিত হবে শান্তি।”

বোম্বী বলেন, “তবে পরিণত হবে এই উপত্যকা এক সরোবরে। জন্মাবে সেখানে হুন। শেষ হবে না কখনও সেই হুনের। হবে অস্ত্রহীন।” ঘুম থেকে উঠে সকলে দেখে নেই অঙ্গল। নেই একটি গাছও। প্রসারিত হ’য়ে আছে এক সরোবর, বিরাট, সীমাহীন। জল তার নোনা।

বিফল হয় না রাজার আদত। স্বক হয় মারাধারি। স্বক হয় অধিকার নিয়ে বৃদ্ধ—রাজপুত্র রাজাদের মধ্যে। অংশ নেয় মারাঠা আর উদয়পুর। সস্তর এক বিরাট বৃদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়। শেষে হ্রদ আসে মূল্যের অধিকারে। অধিকারে আসে সম্রাট আকবরের। তিনিই প্রথমে উপলব্ধি করেন তার গুরুত্ব। হ্রদের হুন থেকে আয় হয় বছরে আড়াই লক্ষ টাকা। পৌছায় পনের লক্ষে ঔরঙ্গজেবের আমলে। অশ্রমিত হয় মূল্যের ক্ষমতা, সস্তর আসে বোধপুরের দখলে। শোনা যায়, বিয়ে হয় জয়পুরের রাজকুমারের সাথে বোধপুরের রাজকুমারীর। বাবারে থাকে না হুন। শোনে হুন সঙ্গে আনেন নি, তাই এই অবস্থা। এ বছর এসে পৌছায় বোধপুরে। রাজা লিখে সেন অর্ধেক সস্তর জয়পুরকে। কস্তার বিয়ের যৌতুক হিসেবে দিয়ে সেন। সেই থেকে সস্তরে স্থাপিত হয় সামলারি।

আসে ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দ। ইংরাজ ইজারা নেয় সস্তর হ্রদ জয়পুর আর বোধপুর নরবারের কাছে থেকে। দিতে হয় মুনাকা, শেষ রয়ালটিও।

আছে নানামুনিব নানা মত, এই হ্রদের জল সম্বন্ধে। কেউ বলেন, একটি হুনের খনি আছে এই হ্রদের নীচে। ডাঃ বোরেলিং অস্বীকার করেন, এই হ্রদের নীচে অনেকগুলি হুনের করণা আছে। যেমন আছে ভরতপুরে। স্তার টমাল হলও, এক প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক। তিনি বলেন, এই নোনা জল আসে আরাবলি পর্বতের গহ্বর থেকে। সেখানে আছে খনিজ শিলা, তাতে হুন আছে, ক্ষার আছে এবং সোডিয়াম সালফেটও আছে। সেগুলি জমা হয় এসে এই হ্রদের নীচে, আসে মাটির নীচে দিয়ে। হ্রদের বৃকে স্থগি করে পলিমাটির। সেই পলিমাটি থেকেই নোনা হয় হ্রদের জল। নোনা হয় বর্ষার জলও, জমে যখন এসে হ্রদের বৃকে। তাই বর্ষার উপর নির্ভর করে হুনের পরিমাণও। দেখা যায়—হ্রদের বৃকে ফেড় ফিট গভীর আলকাতারার মত কালো কাশা, আর তার নীচে দলদলে বালি।

১৯৩৬ সালে আমরা দেখতে বাই এই সস্তর হ্রদ। বাই দিল্লী থেকে। সঙ্গে বান আমার গৃহিণী। স্তোর পাঁচটাঘ গাড়ী পৌছায় জুলেরাতে। সেখান থেকে গাড়ী বদল ক’রে যেতে হবে ছ’বাইল দূরে সস্তরে। গাড়ী ছাড়বে বেলা দশটায়। দেখি পাড়িয়ে আছে আমাদের নিয়ে বাওস্তার সস্ত একখানি বাস। তা পান ক’রে উঠে পড়ি বাসে। কোন দিকে কোন রাস্তা নাই; বাস চলতে থাকে বন্ধ-ভূমির মধ্য দিয়ে। বার মঘরগতিতে। শেষে বাসার কাছে এসে বাস আটকে যায়। সমাধিস্থ হয় ঢাকা বালির নীচে, হ’য়ে যায় অদৃশ্য। যেতে হয় পায়ে হেঁটে।

সকালে উঠে, দেখতে বাই হ্রদ, দেখি কেমন ক'রে তৈরী হয় ছুন। বর্ষায় ড'রে বায় হ্রদের বুক। জল হয়—হুনে ছুন। নিয়ে আগা হয় সেই জল এক প্রকাণ্ড পুকুরে, পরিধি তার পাঁচ কোয়ার মাইল। পরিচিত গুণাভ্যাসগ্ণ জ্যাম্ নামে। বানান সারি সারি অগভীর চৌবাচ্চা, এক একটি ১০০ ফিট লম্বা, ৭৫ ফিট চওড়া আর মেড় ফিট গভীর। বর্ষা শেষ হয়, পাশ্চ-করে নিয়ে আগা হয় ভ্যানের জল এই সব চৌবাচ্চায় বা "প্যানে"। আছে অনেকগুলি ক'রে প্যান এক এক সারিতে। সারির নাম রাখা হয় "কেয়ার"। মেন লাইন কেয়ারে আছে ২০টি প্যান। সিগনামি কেয়ারে আছে ৬৮টি প্যান। ঝাপোণে ২৪টি। গুধাতে ১২টি আর নিউ কেয়ারে ১০টি। স্বর্ষের উত্তাপে এই সব প্যানের জলে, অক্টোবর থেকে নভেম্বরী মাসে, তৈরী হয় অসংখ্য ছুনের ফ্রিটাল। ৪২ তার ছুনের মত সাদা; আকার, মন্দিরের চূড়ার মত। সাদার সাদা হ'য়ে বায় চারিদিক। বাড়তি জল গড়িয়ে আসে প্যানের বাইরে, স্থিতি হয় এক কালো সড়োবর। মাহুয পাগল হয়ে বায় তার দুর্গন্ধে। এই কান্ডেই মেলে ২৭ ভাগ সোডিয়াম সালফেট, মেলে সোনা। আবিষ্কার করেন এক বাঙালী-বৈজ্ঞানিক, তাঁর নাম কে, এম, সাদা। এর স্বস্তি তিনি প্রকৃতও হন।

সিগনামিতেই আছে একটি প্রকাণ্ড শান-বাঁধান পুকুর। এই পুকুরেই একদিন জলকলি করতে আসেন মৈত্য়রাজ বৃষপর্বের মেয়ে শমিঠা, সঙ্গে দাসী নিয়ে। আসেন মৈত্য়রাজ স্ত্রের মেয়ে দেবধানীও। কাপড় ছেড়ে রাখেন ঘাটের উপর। কোড়ো হাওয়ার হারিয়ে যায় কাপড়। তুল ক'রে শমিঠা পড়েন দেবধানীর কাপড়। রাগ করেন দেবধানী—শূন্য হ'য়ে ত্রাস্তগীর কাপড় পরবার জন্ত। রাগ করেন শমিঠাও। ফেলে দেন দেবধানীকে একটি কুয়ার ভিতর। নহুনের ছেলে ঘণাতি। চন্দ্রবংশের রাজা। শিকারে বেরোন। ভেটায় জল খুঁজতে এসে আবিষ্কার করেন সেই কুয়া। দেখেন, কুয়ার ভিতরে এক পরমা রূপবতী কস্তা। হাত ধ'রে তোলেন সেই কস্তাকে। পরে শিতা স্ত্রু এসে নিয়ে যান ডাকে। সেই থেকে দেবধানী বা সিগনামি হ'য়ে আছে একটি ভীর্ণ। ঐতি বৈশাখী পুণিমায় এখানে একটি মেলা বলে। সারা রাজস্থান থেকে বাড়ীরা আসে।

যে মাস থেকেই শুরু হয় ছুন তোলায় কাজ। প্যানের বুক থেকে নিয়ে বাওয়া হয় গাধাতে। গাধা করা হয় "টিপিং টাবে" ক'রে। এক একটি গাধার ৮৮ লক্ষ কিউবিক ফিট ছুন থাকে। গাধা করা হয়—সেটুল টোরে, সস্তরে। হয় সিগনামিতে আর ঝাপোণে। হয় গুধাতেও। এই সব গাধার উপর কোন আচ্ছাদন থাকে না। ছুন এই সব গাধাতে প্রায় এক বছর ধ'রে শুকায়। বিক্রি হয় বছরের শেষে। চালান যায় দেশে-বিদেশে,—যায় রেলগাড়ীতে করে, ওয়াগনে ভরতি হ'য়ে।



সদাশিবের তত্ত্বি বাক্ত শ্রমহিন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

তোর্গা দুর্গে সদাশিবের বর্ধাকালটা তারি আনন্দে কাটল। সে ভীষ মহালায় কাছে তলোয়ার খেলা দেখে, দুর্গের কাজকর্ম করে। শিবাজী বা জিহাবাই তাকে স্নেহ করেন, নিজে হাতে পানীয় তৈরি করে তাকে খেতে দেন। দুর্গে তার সমবয়স্ক ছোদ্দান অনেক আছে। তাদের সঙ্গে সদাশিবের ভাব হয়েছে। এ ঘর একটা প্রকাণ্ড পরিবার; সকলে সকলের আপনার ঘন। সকলে সকলের অন্ত্রে প্রাণ দিতে প্রস্তুত, সকলে দুঃখে বাবার অন্ত্রে উদ্গ্রীব। এখন বর্ধার এই তিন হাস কাটলে হয়।

মহাবাট্ট দেশে বৃষ্টি বেশী হয়না। বর্ধাকালে পশ্চিম সমুদ্র থেকে মেঘ এসে মহাদ্রিতে আটকে যায়, মহাবাট্ট দেশে ঢুকতে পারেনা। যে ছুঁচরটে মেঘ কোনও রকমে ঢুকে পড়ে তাতে অল্প বৃষ্টি হয়। কিন্তু পাহাড়ী নদীগুলোতে তখন জলের তোড় বেড়ে যায়; তখন সৈন্ত-সিপাহী নিয়ে ঘুরে বেড়ানোর বড় অসুবিধা। তাই বর্ধাকালে কেউ যুদ্ধ করতে বেরোর না; দুর্গের মধ্যে কিছা তাঁবু কেলে তিনটে হাস কাটিয়ে দেয়।

সদাশিব দুর্গের চূড়া থেকে যখন বাইরের দিকে তাকায় তখন সেখানে পাহাড় চারিদিকের পাহাড় আর উপত্যকার গায়ে সমুদ্র রঙ ধরেছে। কোথাও পাহাড়ের পা দিয়ে করণা করে পড়ছে। পাহাড় পেরিয়ে সদাশিবের দৃষ্টি নিজের গ্রামের দিকে চলে যায়। ওই শুদিকে তার গ্রাম! গ্রামে কত আছে। কি করছে সে এখন?

ক্রমে বর্ষা শেষ হয়ে এল। নদীর জল নেমে যাচ্ছে। সকলের মনে উৎসাহ। মশহরার দিন হচ্ছে যুদ্ধযাত্রার দিন। সেদিন সকলে সকলকে তিলক পরায়, কাঞ্চন গাছের পাত্তা পরম্পরকে দিয়ে ইষ্ট কামনা করে, তারপর 'হর হর মহাদেও' বলে যুদ্ধ করতে বেরোয়। সেই মশহরার দিন আর বেশী দূর নয়, মাত্র পাঁচ দিন।

সেদিন দুপুর বেলা আকাশের মেঘ হাঁকা হয়ে গিয়েছিল, ধোঁয়া ধোঁয়া মেঘের ঠাঁকে হিহু রোক্ত বেরিয়ে পড়েছিল। দুর্গের ছাদের ওপর জিজ্ঞাবাহী আর শিবাজী পাশা খেলতে বসেছিলেন। বাক্সি বেখে খেলা হচ্ছে। মা বলেছেন—‘শিক্সা, তুই যদি আমাকে হারাতে পারিস্ আমি তোকে দুধি-হালুয়া খাওয়াব, আর যদি হেরে বাস্ আমাকে নতুন দুর্গ গড়ে দিবি। দুর্গের নাম রাখব রায়গড়।’

শিবাজী বলেছেন—‘বেশ, চলে এস। দুধি-হালুয়া আমি খুব ভালবাসি।’

খেলা আরম্ভ হয়েছে। শিবাজীর দুই বন্ধু তানাজী হালদার আর বেদাজী কক পাশে বসে খেলা দেখছেন। সদাশিবও ছাদে আছে। সে তার প্রিয় তলোয়ারটি নিয়ে ছাদে এসেছে। তলোয়ারটি তার চক্কর মগি, একদণ্ডের তরে চোখের আড়াল করেনা। সে মাঝে মাঝে এসে পাশা খেলা দেখছে, তারপর উঠে গিয়ে ছাদের আলসের পাশে পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কখনও সন্তর্পণে তলোয়ারটি ঝাপ থেকে বার করে দু’শাক ঘুরিয়ে নিচ্ছে। অল্প সময়ের মধ্যে সে খুব ভাল তলোয়ার খেলা শিখেছে। তার মন আর বৈধ মানছে না। কবে সে সত্যিকারের যুদ্ধে তলোয়ার চালাবে?

ওদিকে খেলা চলছে, এদিকে সদাশিব আলসের পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে; হঠাৎ সে দেখতে পেল দূরে একজন সওয়ার ঘোড়া ছুটিয়ে দুর্গের দিকে আসছে। সদাশিব একদৃষ্টে চেয়ে রইল। কালো রঙের ঘোড়া, সওয়ারের গায়ে লোহার সীজোয়া রোক্ত লেগে ঝলমল করে উঠছে। তারবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে সওয়ার আসছে।

সদাশিব হাঁক দিয়ে বলল,—‘শিক্সারাগ! একজন সীজোয়া-পরা ঘোড় সওয়ার আসছে!’

শিবাজী পাশার দান ফেলতে ব্যস্তছিলেন, এক লাফে এসে আলসের কাছে গাঁড়ালেন; তাঁর দুই বন্ধু ছুটে এলেন। সদাশিব-আঙুল দেখাল—‘ঐ যে!’

শিবাজী চোখের ওপর হাত আড়াল করে কিছুক্ষণ জুয়ারোহীকে দেখলেন। এখনও অব্যাহারী অনেক দূরে, তার মুখ-চোখ দেখা যাচ্ছে না। তারপর শিবাজী তানাজীর দিকে ফিরে বললেন,—‘রত্নাজী মনে হচ্ছে, না রে তানা?’

তানাজী সওয়ারের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন,—‘হঁ’। রত্নাজী ছাড়া আর কে হতে পারে? ঐ যে হাত নাড়ছে, আমাদের দেখতে পেরেছে। রত্নাজীই বটে।’

দুর্গচূড়া থেকে এঁরাও হাত নাড়লো। শিবাজী বললেন,—‘তানা, তুই যা, রত্নাজীকে এখানে নিয়ে আয়। নিশ্চয় অন্নবী খবর আছে।’

তানাজী ছাশ থেকে নেমে গেলেন। বেলাজী বাইরের সিকে তাকিয়ে থেকে বললেন,—‘হুন্দর ঘোড়াটা। রত্নাজী এমন ঘোড়া পেল কোথায়?’

শিবাজী হেসে বললেন,—‘নিশ্চয় চুরি করেছে।’

জিহ্মাবাসি ডেকে বললেন,—‘কি দেখছিস রে শিবা।’

শিবাজী মা’র কাছে ফিরে গিয়ে বললেন,—‘মা রত্নাজী আসছে। বোধহয় শুকতর খবর আছে।’

মা উঠে বললেন,—‘আমি তবে বাই, রত্নাজীর জন্তে খাবার তৈরি করি গিয়ে। তোরা এখানেই থকেবি তো?’

‘হ্যাঁ মা।’

জিহ্মাবাসি নেমে গেলেন। শিবাজী আর বেলাজী সেইখানে বসলেন। সদাশিব পিছনে বসল। সে আত্তে আত্তে বলল,—‘শিবারাও, রত্নাজী কে?’

শিবাজী অদমাগু পাশাখেলার ঘুঁটিগুলি কৌটার তুলে রাখতে রাখতে বললেন,—‘রত্নাজী আমার গুপ্তচর। সে পদাতি দৈমিক সঙ্গে বিজাপুরী ফৌজের সঙ্গে আছে।’

ব্যাপার বুকে সদাশিব চমকিত হয়ে রইল। শুধু ভলোয়ার ঘোড়ানো নয়, দেশ উদ্ধার করতে হলে আরও অনেক কাজ করতে হয়।

কিছুক্ষণ পরে রত্নাজীকে নিয়ে তানাজী এলেন। শিবাজী উঠে রত্নাজীকে আলিঙ্গন করলেন। রত্নাজীর বদন আন্দাজ ত্রিশ বছর; মজবুত চোঁদারা, মুখে দাড়িগোঁক আছে। বেলাজী তাকে আলিঙ্গন করে বললেন,—‘রত্না, এমন ঘোড়া কোথায় পেল?’

রত্নাজী হেসে উঠল, বলল,—‘সেনাপতি লিঙ্গাকং খাঁর ঘোড়া। সেনাপতির অনেকগুলো ভাল ঘোড়া আছে। আমার ওপর ছকুয় হয়েছিল ঘোড়াগুলোকে সকাল দিকল টহল দেওয়াবার। তা আমি আজ সকালবেলা সব চেয়ে ভাল ঘোড়াটার গিঠে চড়ে চলে এলাম।’

মকলে হাসলো। তারপর শিবাজী গম্ভীর হয়ে বললেন,—‘এবার আসল খবর বল।’

রত্নাজী বলল; আসল খবর ভাল নয়। বিজাপুরের সাত হাজার ফৌজ তোরগা দুর্গ অবরোধ করতে আসছে। ওরা খবর পেয়েছে তুমি বর্ধার দময় তের্গো দুর্গে আছ, তাই বর্ধা শেষ হবার আগেই বেরিয়েছে। ওদের হংলব তোমাকে দুর্গ থেকে বেরতে দেবেনা, দুর্গ ঘেরাও করে কামান দিয়ে দুর্গ চুরমার করে দেবে। ওদের সঙ্গে কুড়িটা কামান আর একশো পিগে বাকর আছে।’

খবর শুনে তিন বন্ধু দালে হাত দিয়ে বসলেন। অনেকক্ষণ পরে শিবাজী মুখ তুলে বললেন,—
'ওরা এখন কতদূরে?'

রত্নাজী বলল,—দকালবেলা পনরো কোশ দূরে ছিল। সঙ্গে কামান আছে তাই আগে আস্তে আসছে; আমার বিবাস কাল দুপুর বেলা এসে পৌঁছবে।—পনরো দিন আগে আমরা বেরিয়েছি, কিন্তু কোথায় বাজি তা জানতাম না; কেবল সেনাপতি লিয়াকৎ খাঁ আর তার চার পাঁচজন পার্শ্ব জানত। কাল রাতে সেনাপতির তাঁবুতে মজলিস বসেছিল, দুর্গা আর শিরাজি চলছিল। আমি কানাতের বাইরে পাহারায় ছিলাম। ওদের কথা শুনে জানতে পারলাম তোরগী দুর্গে তোমাকে ঘেরাও করতে আসছে। ব্যাস, আজ সকালে কেউ জেগে ওঠবার আগেই বেরিয়ে পড়লাম।'

শিবাজী আবার চিন্তাময় হয়ে পড়লেন। সন্ধানিব ভাবতে লাগল—কি সর্বনাশ, সাত হাজার ফৌজ! সঙ্গে কামান। কি করে শিলায়াও রক্ষা পাবেন? কি করে দুর্গ রক্ষা পাবে? হে মা ডবানী, আমাকে বুদ্ধি দাও, যেন শিবাজী মহারাজকে রক্ষা করতে পারি।

অনেকক্ষণ পরে শিবাজী কথা কইলেন। বন্ধুদের দিকে চেয়ে বললেন,—'তোমরা কি বল? এখন উপায় কি?'

তানাজী বললেন,—'তুমি বল। তুমি যা বলবে তাই হবে।'

শিবাজী তখন বলতে আরম্ভ করলেন,—'তোর্গী দুর্গে এখন মাত্র আড়াইশো বোঁদা আছে। আড়াইশো লোক নিয়ে সাত হাজারের বিরুদ্ধে দৃঢ় করা যায় না। ওদের সঙ্গে কামান আছে, আমাদের একটা বন্দুক পর্যন্ত নেই। এ অবস্থায় উপায় কি? দু'টো রাস্তা আছে। এক, দুর্গ ছেড়ে পালানো। তাতে গ্রাণ বাঁচবে বটে, কিন্তু দুর্গ ওদের দখলে চলে যাবে। দ্বিতীয় রাস্তা, দুর্গের তোঁর বন্ধ করে বসে থাকা। কিন্তু ওদের সঙ্গে কুড়িটা কামান আছে। তোর্গী ছোট দুর্গ, ওরা কামান লেগে দুর্গ ধুলো করে উড়িয়ে দেবে।'

শিবাজী চুপ করলেন। সকলে তাঁর মুখের পানে চেয়ে রইল। শেষে বোদাজী বললেন,—
'এ ছাড়া অন্য রাস্তা নেই?'

শিবাজী প্রশ্ন করলেন,—'এ দু'টো রাস্তার একটাও তোমাঘের পছন্দ নয়?'

সকলে এক সঙ্গে মাথা নাড়লেন,—'না।'

শিবাজী তখন একটু হেসে বললেন,—'আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে। এখন আমাদের একমাত্র ভরসা—বাকদের শিপে।'

সবাই অবাক। 'বাকদের শিপে।'

'হাঁ। ওদের সঙ্গে একশো শিপে বাকদ আছে। সেই বাকদই এখন আমাদের ভরসা।'

তানাজী বললেন,—‘বারুণ আমাদের ভরসা ! কি বলছ তুমি কিছু বুঝতে পারছি না।’

‘বুঝিয়ে বলছি শোনো।’ এই বলে শিবাজী ক্রতকণ্ঠে তাঁর মূল্যব প্রকাশ করে বললেন। শুনে সকলের চোখ উৎসাহে জ্বলজ্বল করে উঠল। তানাজী নিজের উকতে প্রচণ্ড চড় বেয়ে বললেন,—‘আমি যাব।’

বেসাজী বললেন,—‘তোমার যে প্রকাণ্ড চেহারা, তাকে মানাবে না। আমি যাব।’

রত্নাজী ককণ স্বরে বলল,—‘আমাকে যে দেখলেই চিনে ফেলবে। নইলে আমি যেতাম।’

শিবাজী বললেন,—‘তোমাদের কাউকে দিয়ে হবেনা।’

তনাজী বললেন,—‘তবে কি তুমি যাবে নাকি ? না, সে হবেনা। তোমাকে আমরা যেতে দেব না। শেষকালে যদি—’

শিবাজী বললেন,—‘না, আমি যাবনা। যাবে সদাশিব।’

সদাশিব শিবাজীর শিহনে বসে শুনছিল, সে চমকে উঠল। শিবাজী তাকে সামনে টেনে এনে বললেন,—‘সদাশিব দেখতে ছোটখাটো, এখনও ভাল করে গৌল বেবোর নি ; তাছাড়া গুর বৃদ্ধি আছে। এ কাজ যদি কেউ পারে তো সদাশিব।’

আনন্দে সদাশিবের বুক বেতে উঠল। সে বলল,—‘রাজা, কি করতে হবে আমাকে শিখিয়ে দাও।’

শিবাজী তখন সদাশিবকে শেখাতে আরম্ভ করলেন।

(ক্রমশঃ)

• কম্পোষ্ট সার •

কম্পোষ্ট সার হ’ল এক প্রকার উদ্ভিজ্জ সার, অর্থাৎ গাছের খাত্ত। গ্রাম বা শহরের বহু আবর্জনা থেকে এই সার তৈরী করা হয়। আগাছা, তরকারির আনাশ প্রভৃতির খোঁসা, ছাই ও কুচুরি পানা ইত্যাদি নোংরা জিনিস এক জায়গায় জুপাকার করে, বেশ ভাল ভাবে ফুটখানেক উঁচু করে বিছিয়ে রেখে, তাতে গোবর, চোনা, হাড়ের গুড়ো প্রভৃতি মিশিয়ে দিতে হয়। তারপর তার উপর আবার একটুট ঊঁচু ঐ রকম স্তর বিছিয়ে দিতে হয়। এই ভাবে চার-পাঁচটা স্তর চাপিয়ে মাল দুই রেখে দিলেই ওগুলো পচে গিয়ে ভাল সার হয়। ছায়াদুক্ত ঊঁচু জায়গা বা জল ঢোকেনা এমন গর্তের মধ্যে এই কম্পোষ্ট সার তৈরী করতে হয়। এই সার যে-কোন গাছের গোড়ায় দিলে বা মাটির সঙ্গে মিশিয়ে কোন গাছ লাগালে, সে গাছ অত্যন্ত সতেজ হবে এবং তাতে ফল ও ফুল দেবে প্রচুর।

॥ পাখিরা ॥

— শ্রীমন্নীল বসু

পাখিরা বেশ আছে

কখনো গাছে গাছে

কখনো সুরে সুরে



দূপুরে ঘুরে ঘুরে উড়ছে দূরে দূরে

আসছে কাছে কাছে ।

বাড়ির কার্নিশে

হলুদ পাখাগুলি রোদের ছবি মাখা,

ছাদের আলিসায়

গোলাপী ঠোট ছুঁটি

ছুঁটিতে মিলেমিশে

ধরেছে খড়কুটি

উড়ছে হাওয়ায় ।

বাঁধবে বাসাখানি, কাঁপছে ঝাউ-শাখা ।

ওদের ব্যথা নেই মনের কথাতেই ক'রছে কিচিমিচি

খেলার মানে নেই, বিকেল বেলাতেও খেলছে মিহিমিচি



নাড়িয়ে নীল জল

রূপোর ঢেউ-বল

গড়িয়ে নদী থেকে পালায় এঁকেবেঁকে, জলের স্বরলিপি

পাখার হাওয়া লেগে টুকুরো কুঁচি কুঁচি জলছে ঝিকিঝিকি ।

পাখিরা বেশ আছে ; সু-গোল বুক তার

ভোরের গান বলে, রোদের আলো হার



পালকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে

কখনো ছিঁড়ে যায়, মাঠের ঘাসের ছুঁয়ে ।

রূপালি চাঁদ ঢালে জোছনা কোয়ারার

সারাটি রাত ভরে

আব্‌ছা জল-ধোঁয়া, পাখিরা বারেবার

কোয়ারা যায় বলে ।

প্রাণের সাধ নিয়ে

আলোয় কাঁপ দিয়ে



ডেকে ওঠে

রাঙা ঠোটে ॥

লক্ষ্যভেদ

শ্রীপরিতোষকুমার চন্দ্র

১২২০ সালের একটি ঘটনা। তখন আমি সরকারী কাজে উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি শহরে থাকতুম। আমি যে বাড়ীটাতে থাকতুম সেটা একটা লম্বা ব্যারাকের মতো বাড়ী। গায়ে গায়ে লাগা পাশাপাশি তিনটে ছোট বাড়ী, তারই মাঝখানটাতে আমি থাকতুম। এই বাড়ীগুলির মেঝে ও দেয়াল পাকা হলেও, ছাদ ছিল করোগেটেড টিনের, পোচালা। এই টিনের চালাদুটোর কোড়ার ঠিক নীচেই লম্বালম্বি ভাবে একটা বাঁশ ছিল, আর সেই বাঁশটা থেকে হাত দুয়েক নীচে আর একটা লম্বা বাঁশ—একপাশের দেয়াল থেকে অন্য পাশের দেয়াল পর্যন্ত লম্বাভাবে লাগানো ছিল, বার থেকে ওপরের মটকার বাঁশ পর্যন্ত ছোট ছোট বাঁশের ঠেকো দেওয়া ছিল।

আমার বাড়ীর পূর্বদিকের বাড়ীটাতে থাকতেন জলপাইগুড়ির ডেপুটি কমিশনারের আমিসের একজন কর্মচারী। ঘটনার কিছুদিন আগে তিনি দেশ থেকে তার স্ত্রীকে এনেছেন। তত্রলোকটিকে সরকারী কাজে প্রায়ই মক্কেলে যেতে হতো। তাই তাঁর অস্থায়ীত্বকালে তাঁর স্ত্রীকে দেখানো করবার জন্য তত্রলোকটি তেরো চৌদ্দ বছর বয়সের একটি ভাগনেকেও সঙ্গে এনেছিলেন।

ঘটনার আগের দিন সকালে তত্রলোকটি তিন চার দিনের জন্য মক্কেলে গেছেন। অবশ্য যাবার সময় আমাকে বলে গেছেন : চন্দ্রবাবু, আপনার বৌদিকে দেখবেন। বিশেষ করে ভাগনে বাবাজীর গুণের নজর রাখবেন,—বাড়ী ছেড়ে কোথাও যেন না যায়।

সেই দিনই মন্ডার দিক থেকে স্বর্ক বোলো বৃষ্টি। উঃ, সে কি ভলের তোড়! স্থিতি বেন ভাগিরে নিয়ে যাবে। তার সঙ্গে আমার ঝোড়ো হাওয়া, সৌ-সৌ। ও-বাড়ীর ভাগনে বাবাজীকে ভেঁকে সকাল সকাল খাওয়াশাওয়া চুকিয়ে দরজা জানালা ভালো করে বন্ধ করে শুয়ে পড়তে বলে আমিও সকাল সকাল লম্বা-আলম্বা নিশুম।

ভোরের দিকে আচমকা ঘুমটা ভেঙে গেলো,—কে বেন ডাকছে। তাড়াতাড়ি উঠে দরজা খুলে বেরিয়ে এলাম। এবারে স্পষ্ট শুনলাম ও-বাড়ী থেকে ভাগনে বাবাজী প্রাণপণে চৈচাচ্ছে,—‘মাঝাবাবু, শীগগির আহুন। মাঝাবাবু ঘরে মত বড় সাপ!’ বারান্দার কোণ থেকে আমার বেড়ায়ার ছড়িটা হাতে নিয়ে, একছুটে ওঘের বাড়ীতে গিয়ে হাজির হলাম। ছেকেটির মাঝী যে ঘরে শুয়েছিলেন, সেই ঘরের বারান্দার দিকের দরজাটা তখন বন্ধ। ভাগনে বাবাজীর ঘরের ভেতর নিয়ে দুই ঘরের মাঝের দরজায় চৌকাঠে পা দিয়েই একেবারে পাখর বনে গেলুম। ঘরের আড়ালে দুই চালার জোড়ের মুখে যে লম্বা বাঁশটা আছে, সেটাকে ঠেকো দিয়ে রাখার জন্য নীচের দিকে আর একটা যে লম্বা বাঁশের কথা আগে বলেছি, সেই বাঁশটাতে স্ত্রীজের সামান্য একটু অংশ ছড়িয়ে

শরীরের প্রায় সবটা স্থূলিয়ে যমের প্রতিনিধি চার হাত লম্বা ইয়া মোটা একটা গোথরো সাপ দুলছে। আমাকে দেখেই সেটা গল্লরাসে লাগলো এবং দুলতে দুলতে একবার শরীরটাকে গনিকৈ আর পরক্ষণেই কণা তুলে বতটা পারে আমার দিকে ঝাখাটা এগিয়ে দিতে লাগলো। ভাবটা যেন,— ‘আয়না একবার নাগাদের মধ্যে, একটা ছোবল দিয়ে দেখি।’ দোহুল্যমান সাপটার ঠিক নীচেই বিছানার ওপর তত্ৰহিলাটি নিচল হয়ে পড়ে আছেন, মনে হোলো যেন অজ্ঞান হোয়ে গেছেন। তাই রক্ষে, নইলে জ্ঞান থাকলে পাগিয়ে আসবার চেষ্টার নড়াচড়া করতেনই, আর তাতে উত্তেজিত হয়ে সাপটা স্রাক্ষের পাক খুলে লাফিয়ে পড়ে তাঁকে নিচরুই কামড়ে দিতো।

খুব সতর্কপণে আস্তে আস্তে কিছু হটে সেখান থেকে সরে এলুম, যাতে কোনো রকমে চরকে গিয়ে বা ভয় পেয়ে সাপটা লাফিয়ে না পড়ে। তারপর ভাগনে বাবাজীকে বাবাআর ডেকে নিয়ে এসে সমস্ত ঘটনাটা জ্ঞানলুম।

রাত্রে এক একটা ঘরে এক একজন থাকার ভয় থেকে মুক্তি পাবার আশায়, পরস্পরকে সাহস দেবার স্বস্ত্র দুই ঘরের মাঝের দরজা খুলে রেখে সেও তার মামী দুজনে দু’ঘরে গুয়েছিল। ভোবের দিকে মামীর বিকট চীৎকারে তার ঘুম ভেঙ্গে যায়। তড়াক করে লাফিয়ে উঠে খোলা দরজার কাছে গিয়ে দেখে, স্বস্ত্র বড় একটা সাপ ওপরের বাঁশে স্রাক্ষ আটকে খুলছে, আর তার মামী বিছানায় পড়ে আছে। ভাক দিয়ে কোনো সাড়া না পেয়ে তার মনে হয় মামী স্বস্ত্র পেয়ে অজ্ঞান হয়ে গেছেন। সাপটা তাঁকে কামড়াইনি বলেই মনে হয়, কারণ তা হোলে মামী চূপচাপ পড়ে না থেকে দিবার জালায় ছট্‌ফট করতেন।

পরে অবস্ত্র তত্ৰহিলায় মুখে গুনেছিলুম যে, ভোরে ঘুম ভাঙবার পর বিছানা ভেড়ে ওঠবার আগে বিছানায় চিত হয়ে শুয়েই প্রতিনিধির অত্যাশ মতো ঠাকুর প্রণাম করার উদ্দেশ্যে হাত ছুটো জোড় করে বেই কপালে ঠেকিয়েছেন, অমনি ফৌল শব্দের সঙ্গে সঙ্গে সড়াং করে মোটা হাড়ির মতো কি যেন একটা তার মুখের সামনে খুলে পড়লো। কপাল থেকে জোড় করা হাত সরিয়ে ‘সেটা কি’ তা দেখেই চীৎকার এবং সঙ্গে সঙ্গেই অজ্ঞান।

যা যেখানুম তাতে তত্ৰহিলাটিকে উদ্ধার করা আবার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই ভাগনে বাবাজীকে সদর দরজার পাহারা রেখে আমি একছুটে বাড়ীওয়ার্ল্যার বাড়ীতে গিয়ে হাজির হলুম। তাঁর বাড়ী খুব কাছেই। তাঁকে সব কথা বলে ঘটনাখলে ডেকে আনলুম। তাঁর আদেশে তাঁর চাকর পাড়ায় আর পাঁচজন ভত্ৰলোককে ডেকে আনলো। আর আনলো একটা লম্বা বর্ণী। তারপর বসে গেলো পরামর্শ সভা—কি করে তত্ৰহিলাটিকে যমের হাত থেকে বাঁচানো যায়। নানা কবে নানা রকম উপদেশ দেন, কিন্তু কোনোটাই গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় না। একজন বললেন :

গুলি করে সাপটাকে হারা হোক। অন্য একজন সেটা খণ্ডন করলেন, বললেন : গুলি যদি মিস করে তবে মহিলাটিকে কেউই বাঁচাতে পারবে না। অন্য আর একজন উপদেশ দিলেন : কুলস্ত শাপের মাঝ বরাবর টেনে লাঠি হারা হোক, তাতে কোমর ভেঙ্গে সাপটা একেবারে অক্ষম হোয়ে যাবে। আর একজন এ পরামর্শও বাতিল করে জানালেন : তাতে সাপ একেবারে মরবে না, মাঝখান থেকে লাঠির ধায়ে মহিলাটির ওপর পড়ে যাবে এবং সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে কামড়াবে। এবার অন্য একজন বললেন : সাপটাকে না খুঁচিয়ে খুব সাবধানে মহিলাটির পা ধরে হঠাৎ একটানে সরিয়ে আনা হোক। এ পরামর্শও খণ্ডিত হোলো ; কারণ অপরজন বললেন : এতে সাপটা হঠাৎ চমকে যাবে এবং লাফ দিয়ে নীচে পড়ে মহিলাটিকে কামড়ে দেবে। এমনকি যে এটা করতে যাবে তাকেও কামড়াতে পারে। এই ভাবে যে যা বলেন অন্তর্যজন তা বাতিল করে দেন, ফলে উদ্ধার কাজ এগিয়ে না।

বাড়ীওয়ালার চাকরটি বর্ষা হাতে এক পাশে চূপ করে দাঁড়িয়ে আমাদের আলোচনা শুনছিলো। লোকটা লোতে সাঁওতাল। ছেলেবেলা থেকেই বাংলা দেশে আছে, তাই ভাষা বেশ বোঝে এবং বলতেও পারে, তবে কেমন যেন একটা টান থাকে।

সে এবারে এগিয়ে এসে গলাধাঁকারি দিয়ে তার মনিষকে উদ্দেশ করে বললো : বড়বাবু, সাপ হারা কামটা হামাকে দিন। বড়বাবু অবাক হয়ে তাঁকে হিচাল্লা করলেন : তুই কি করে সাপটা হারাবি সেটাই আগে বল, তারপর দেখা যাবে। লোকটি বললো : কেন ? বর্ষা দিয়ে সাপটাকে বাঁশের সাথে গাঁথি ফেলবো। তখন উদ্ধার লড়াচড়া বন্ধ হয়ে যাবেক।

ওর কথা শুনে আমরা সবাই শিউরে উঠলাম। প্রায় এক সঙ্গেই সবাই বলে উঠলাম : বলিস্ কি রে ! বড়বাবু পরিস্থিতিটা তাকে বুঝিয়ে বলবার জন্য বললেন : দেখিদনি কি যে সাপের স্ত্রাজের মিকের খুব সামান্য একটু অংশ বাঁশের গায়ে জড়ানো আছে। সাপের দেহের সেই অংশটুকু ছ'আঙুলের বেশী চওড়া হবে না। তুই বলছিল তুই দেইখানেই বর্ষা মেয়ে বাঁশের সঙ্গে গেঁথে ফেলবি ?

ধব ধবে সাধা ছ'পাতি দাঁত বের করে লোকটি বললো : হিঁগো, নিচুর গাঁথি ফেলাবো।

বড়বাবু বললেন : যদি না পারিস ? যদি বর্ষা ফসকে যায় তবে সাপটা নীচে লাফিয়ে পড়বে আর বৌমাকে কামড় দেবেই ! সেটা ভেবে দেখেছিস্ ?

একথা শুনে লোকটা মুখখান্না বড়দুব সম্ভব গম্ভীর করে বললো : যদি বর্ষা ফসকাই যায় তবে সাপটা নীচে লাফাই পড়বার আগেই আমি সিটাকে সরাই নিবো। যদি কাটে তবে সিটা হামাকেই কাটবেক।

আবার একবার সবাই শিউরে উঠলাম, 'যাটা বলে কি ?' বড়বাবু ধমকে উঠলেন : কি বা-তা বকছিল ? এ কি কখনও সম্ভব ? মাঝখান থেকে তুইও সরবি আর বৌমাকেও হারবি !

লোকটা এবারে বুক চিত্তিরে ঠাড়িয়ে গর্জন করে উঠলো। বললো : না, বৌমা মরবেক নি। মরি তো হামি একাই মরবো। তারপর জোড়হাত করে বললো : এবার সবাই চলি ঘান। আর মেরি করা ঠিক নয়, সাপ লাঠাই পড়তে পারে। তখন কিন্তু হামাকে দোষ দিলে চলবেক নি।

তার দুচিন্তায় ভাব দেখে শেষ পর্যন্ত আমরা সবাই সেখান থেকে সরে গেলুম। আমরা সরে যেতেই লোকটা বর্শাটা বাগিরে ধরে দরজার কাছে স্তব্ধপন্থে এগিয়ে গেল এবং বাঁ পা এগিয়ে ও ডান পা পিছিয়ে মাথাটা একটু পেছনে হেলিয়ে দাঁড়ালো। তারপর বর্শাসম্মত ভান হাতটা পেছনের দিকে ঠেলেই হঠাৎ বর্শাটাকে ছুঁড়ে দিলো। অবাক কাও! লোকটা বা বলেছিল তাই করলো। স্ত্রী ছুঁড়ে বর্শার ফলাটা বাঁশের গায়ে গেঁথে গেছে। তারপরই হুহু হোলো সাপের খেলা! আহত সাপটা একবার তার সমস্ত শরীরটা বাঁশের গায়ে জড়িয়ে ফেলে, আবার পরমুহুর্তেই শরীরটাকে লম্বা করে সুনিখে গজরাতে গজরাতে লোকটার নাগাল পাবার জন্য চেষ্টা করে, কিন্তু বর্শায় গাঁথা স্রাজের জন্ত তা পারে না।

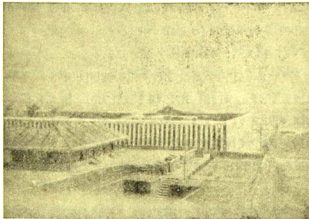
সাপটাকে এই ভাবে নিফল আক্রোশ করতে দেখে লোকটা হাততালি দিয়ে হেসে উঠলো। তারপর তার মনিবের দিকে ফিরে বললো : রডবাধু, ইবার বন্ধুকে দেই সাপটাকে হারি ফেলান।

সত্যই এখন নিরাপদে বন্ধুকে মারা যেতে পারে বুকে, বড়বাবু তাঁর বাড়ী গেলেন এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বন্ধুকে নিয়ে ফিরে এলেন। তারপর বন্ধুকে একটা ছুটরাগুলি ভরে দোলায়মান সাপটার মাথার কাছ বরাবর সেটা এগিয়ে ধরলেন। বন্ধুকের নলটা নাগালের মধ্যে পেরে সাপটা বাগের চোটে বেই সেটা কামড়ে ধরেছে অমনি বড়বাবু ঘোড়া টিপে দিলেন। ‘হুজুন’ একটা আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গেই সাপের মাথাটা উড়ে গেলো, আর সাপটা শরীরটাকে হুঁকড়ে বারকতক পাক দিয়েই ঠিক দড়ির মতো লম্বা হোয়ে কুলে পড়লো।

পরে বাড়ীওয়ালার ভ্রাতৃলোকের বাড়ীর মেয়েরা এসে মুছিতা মহিলাটির সেবা করে তাঁর জ্ঞান কিরিয়ে এনেছিলেন এ কথা বোধহয় না বললেও চলে, কিন্তু একটা কথা না বললে ঐটি থেকে যাবে। ভাগিনে বাবাজীর মামা মকমল থেকে ফিরে এসে যখন শুনেছিলেন কি অদ্ভুত ভাবে সাঁওতালী লোকটি তাঁর স্ত্রীকে যথের হাত থেকে বাঁচিয়েছিল, তখন তাকে ভেবে বুক জড়িয়ে ধরেছিলেন। নগ্ন কিছু টাকা বকশিশও দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সে তা নেয়নি। হাসতে হাসতে বলেছিল : ই কাজের লেগে টাকা লিখক নি। •

কন্যাকুমারী

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়



কতাহারীর মণির

ছেলেবেলায় যখনই
ভারতের মানচিত্র খুলে
বসেছি—উত্তর-দক্ষিণ
দু'টি অংশে দৃষ্টি পড়েছে
সর্বাগ্রে। উত্তরে পাহাড়
আর দক্ষিণে সমুদ্র বলে
নয়। মানচিত্রে পাহাড়,
সমুদ্র আর সমতল ভূমির
সৌন্দর্য সমানই। দৃষ্টি
আকৃষ্ট হয়েছে মানচিত্রের
অভূত আকৃতির অঙ্গ—যা
স্বর্গ-বিশ্বের আকার

নিখেও উপরের বিরাট ভারটি অনায়াসে বহন করেছে। কেমন অভূত আকৃতি নয় কি ?
আদিমস্তম্ভহীন স্তম্ভীয় ভলথি থেকে হঠাৎ জেগে উঠে ক্রমশঃ প্রসারিত হতে হতে বিরাট এক মহামেশ
জয়লাভ করেছে। মনে হয়েছে—ওই স্বন্দর স্বল-বিন্দু থেকেই বুঝি ভাল করে দেখে নেওয়া যায়
দেশটা কেমন। উত্তরে হিমালয় চিত্তাকর্ষক, কিন্তু সীমার বাধনে শুকে আরও করা কঠিন।
পাহাড়ের উপর বতাই উঠতে থাকবে—পাহাড় ততই বেড়ে চলবে। 'এই শেষ হল' বলে স্বস্তির
নিঃশ্বাস ফেলে বাজা শেষ করা চলবে না। হিমালয় মনকে ভুলিয়ে দেয়—ভবু ওর মধ্যে ভারতবর্ষকে
যেন সম্পূর্ণরূপে পাওয়া যায় না।

ভারতবর্ষের স্বল-অবয়বকে প্রত্যক্ষ করতে হলে নিরাবরণ একটি প্রাঙ্গণ বেছে নিতে হবে।
দে প্রাঙ্গণ স্বলভাগে হলে চলবে না। কারণ স্বলভাগে এক ঘেশ থেকে অন্তঃস্থ প্রান্তরেণা টানা
থাকলেও, বিচ্ছিন্ন ভূমি-খুঁটিটা ধরা যায় না। স্বতরাং প্রাঙ্গণ ভলম্বর হলে—স্বলভাগকে পৃথক করে
স্পষ্টরূপে সামনে ধরে নিতে পারবে। ছেলেবেলায় মনে হতো—ওখানে কি বাওয়া যায় না—ওই স্বন্দর
স্বল-বিন্দুতে ?

বয়স বাড়লেও ওই স্বর্গ-বিশ্বের মোহ মন থেকে মুছে যায় নি। অনেকের মূখে শুনেছি শব্দ
নাকি ছুঁই। পাহাড়-পর্বতের বাধার অস্ত্র নয়,—ওদেশের আহাৰ্য্য নাকি বাড়ালী রন্ধনার অমূল্য নয়।

বাগদার অহুবিহার কথাই বার বার শুনেতে হয়—যেন শুধুমাত্র বাগদার বিলাস নিয়েই আরহা জয়গ্রহণ করেছে! এই সব রটনা কিন্তু অলৌকিক। পথের আবাহ্য নিয়মমত গ্রহণ করলে আর হুনিহার অভাব না ঘটলে দেশভ্রমণের আনন্দ পুরোমাত্রাতেই বজায় থাকে। ঘরের আরাম পথে মেলে না সত্যি, কিন্তু পথচলার আনন্দ ঘরের আরামকেও নষ্টাং করে দেয়। মোটকথা, দীর্ঘ বা দ্রুত কিংবা দুর্গম কোন পথই কষ্টকর নয়; কষ্ট মনে,—কল্পনায়।

...তবে বাঙ্গালীর পক্ষে দক্ষিণ দূর দেশই—তার উপর আছে ভাবার বাধা। কলকাতা থেকে মাত্রাঙ্ক হাজার মাইলের কিছু উপরে। উড়িষ্যা আর অল্প দু'হুটো রাজ্য পার হয়ে তামিলনাড় (মাত্রাঙ্ক) মেল টেনে দু'রাত্রি কাটাতে হয়। মাত্রাঙ্ক থেকে আরও পাঁচশো মাইল পার হয়ে দক্ষিণের শেষ প্রান্ত কস্তাকুমারী। দু'টি পথ দিয়ে ওখানে পৌছানো যায়। একটি হ'ল ভিনেভেলি পর্যন্ত ট্রেন, তারপর বাস বা মোটর। অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ পথটি জিবাক্সাম ঘুরে। জিবাক্সাম থেকে কস্তাকুমারী ৫২ মাইল।

কস্তাকুমারীর পথে বহু দ্রষ্টব্য স্থান আছে। মাত্রাঙ্কের কাছেই রয়েছে কাকীপুরম, মহাবলিপুরম। মাঝখানে পক্ষীতীর্থ। তারপর চিদম্বরমে নটরাজ মন্দির, তাকোরে বৃহদীশ্বর শিব ও নন্দীকেশ্বর কৃষ্ণ, ত্রিচিনাপল্লীতে গণেশমন্দির। শ্রীরঙ্গমে শ্রীরঙ্গনাথ, মাদুরায় মীনাকী দেউল। এগুলি দেখে ভারতের শেষ স্থল-বিন্দুতে পৌছলে মনে হবে—এখান থেকে ভারতবর্ষের আরম্ভ, না শেষ? মানচিত্রের আকৃতি থেকে এটিকে ভারতবর্ষের পাদদেশ বলে কল্পনা করে নেওয়া স্বাভাবিক। তিন সমুদ্রের মিলন-স্থলিতে পা রেখে ঠাঁড়িয়েছে এই অস্তরীপ। ভোরবেলায় পূর্ব দিকে মুখ করে দাঁড়ালে অকোণসাগরে দেখবে সূর্যোদয়ের শোভা, আবার অপরাত্রে পশ্চিম দিগন্তে আরব-সমুদ্রের কোলে সূর্যাস্তের বর্ণবিলাস। মাঝখানের ভারত-সমুদ্র অগাধ্য তরঙ্গ-পুষ্প দিয়ে পূর্ণাক্ষরিক বন্দনা করছে। দেবীর চরণ কমলেই পড়ছে পুষ্পাঞ্জলি।

কাতিকের শেষভাগে আমরা দক্ষিণ-তীর্থ পথে যাত্রা করেছি। বাংলার শীতের প্রস্তাপ হুক হয়েছে—দক্ষিণে যেমেছে বর্ষা। কাতিক যেন পিছু হটে আবাড়-জীবনের রক্তো পৌছেচে! ছায়া-ছায়া দিনমান, মাঠে মাঠে সবুজের প্রাণবন্ত্য। মাত্রাঙ্কে বর্ষা-কৃত্ত বছরে দু'বার আসে। কাতিক আসে এই দ্বিতীয় বার এসেছে! জল থইথই মাঠে মেয়ে-পুরুষ মিলে দিনরাত কাঙ্গ করছে। কোন মাঠে হল চালনা, কোথাও বীজবপন, কোথাও বা গুছি গুছি ধান-চারা রোয়ার মহোৎসব। যে মাঠ সবুজ বস্তায় একুল-গুঁল হারা—সেখানে বোনা-রোয়ার পরিভ্রম আপাতত শেষ হয়েছে।

ট্রেনের কামরার বসে বসে এদব দেখছি। দেখছি নয়নজুলিতে জমেছে লাল জল। লাল মাটির

দেশ তো। রাহুরা দেখা শেষ করে সন্ধ্যার ট্রেনে চেপেছি—কাল সকালে পৌছব জিবাশ্রামে। জিবাশ্রাম কেরালার রাজধানী। রাজ নাই, রাজ্য আছে। দে রাজ্যের রাজ্যশালও আছেন। প্রধান হস্তী আছেন—সদস্ত্রবল আছেন বিধান পরিষদের। তাঁরা যুক্তি-পরামর্শ বাত-প্রতিবাদ করে রাজ্য চালনার নিয়ম তৈরী করেন, সমস্যাগুলি সমাধান করে দেন। এর নাম গণতন্ত্রী প্রথা। এসেছে রাজ্য বন্ধ ছিলেন—তিনিও নিজের নামে রাজ্যশাসন করতেম না, বিষ্ণু পদ্মনাভের নামে রাজ্যচালনা করতেন। বিষ্ণু পদ্মনাভ হলেন কেরালার কুলদেবতা। এই রাজ্যের প্রভারা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে—ঐরাবতীতেই রাজ্যের ত্রিযুক্তি হয়েছে, তাঁরা কুশলে আছে। প্রকান্ত যুক্তি ত্রিগুণনাভের অনন্তস্থায়ী গুণ আছেন,—তিনিটি দুয়ার দিয়ে শায়িত মেহের তিন অংশ দেখা নিয়ম। মন্দিরে প্রবেশ করতে হয় নগ্নপদে—নগ্নপায়ে। এসেছে দেবদর্শনের এই প্রথা। ঘানবাহনে ট্যাক্সিওই প্রাণান্ত। টেশনে পৌছলে ট্যাক্সিচালকরা এসে ছেকে ধরবে শহর দেখবার জন্ত—কস্তাকুমারীর বাজী হবার জন্ত। কস্তাকুমারী বাতায়াতের ভাড়া হাঁকবে পচিশ থেকে ত্রিশ। দরদস্তর করলে ভাড়া কমবে। কিন্তু এত দূর দেশে এমন হ্রস্ব জায়গায় মাত্র দু'চার ঘণ্টা কাটিয়ে আগার কোন মানে হয় না। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এবং রাজিটাও যদি না কাটল এমন বেশে—তবে বেশ দেগেছি বলে বন্ধুবান্ধবের কাছে গল্প করে কি লাভ! ভারতবর্ষে এমন কোন জায়গা আছে—যেখান থেকে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত দেখার সৌভাগ্য লাভ করা যায়? ভারতবর্ষের অনেক বেশ আছে সমুদ্রতীরে, কিন্তু কোনখান থেকেই মনে হবে না স্থলভাগ শেষ হয়েছে এইখানে।

বাইহোক, কস্তাকুমারীতে রাজিবাণ করতে হলে বাতায়াতের ট্যাক্সি না নেওয়াই ভাল। টেশনের সামনেই রয়েছে কেরালা সরকার পরিচালিত বাস, ট্রেনের মত বাধা সময়ে বহবার বাতায়াত করে নাগের কইল—দেখান থেকে কস্তাকুমারী। নাগের কইল এমিকের মধ্যে বড় শহর। এখানে ডিনেভেলি আর জিবাশ্রামের বাসগুলি একত্রিত হয়। কোন কোন বাস সোজা কস্তাকুমারী যায়। বেস্টরভাগ বাসই এখানে বদল করতে হয়—অনেকটা বড় জংশন টেশনের মত। বাস বদল করতে কোন অসুবিধা নাই। সাথে বত মোটরট থাকুক না কেন—বাসের মাধ্যম বিনা হাণ্ডলে তা ভুলে দেওয়া চলে। জিবাশ্রাম থেকে নাগের কইলের দূরত্ব ৪২ মাইল। নাগের কইল থেকে কস্তাকুমারী মাত্র বারো মাইল।* মাত্র পথে শুচিস্রমের বিখ্যাত দেব মেউল।

পাঁচ বাঁধানো, চেউ খেলানো মনোরম পথ। দু'ধারে নারিকেল বন; আম, কাঁঠাল ও কাজু বাদামের গাছও প্রচুর। অক্টোবরে আমগাছগুলি রঙিন আর কাঁচা আমে ভর্তি, কাঁঠাল গাছও ফল ডারে ঝট্‌ঝট্‌ী হয়েছে। পথের দু'পাশের জমির মাঝখান দিয়ে চলেছে সড়ক খাল। এ-বাড়ি ও-বাড়ির আনাচ-কানাচ ছুঁয়ে মাঠকে শস্তস্তান্নল করে এঁকে-বঁেকে চলেছে দূর-দূরান্তরে। শোনা

যায় এমনি ধারা খালের জালে কেরালার প্রতিটি গ্রাম আর মাঠ বাঁধা পড়েছে। এর কল্যাণে গৃহস্থের অন্ধনে যেমন ফণলের প্রাচুর্য—তেমন কবির ভাষায় : ‘মাঠে মাঠে ধান ধরে নাকো আর।’ এ ছাড়া ডাইনে-বামে পাহাড়ের সংখ্যা কম নয়—এক কথায়, প্রকৃতি এখানে বিচিত্ররূপিনী। কন্যাকুমারীর আট মাইল আগে শুচিশ্রমের মন্দির। এই মন্দিরে স্বাধীনভাবে রয়েছেন শিব—তার সঙ্গে কন্যাকুমারীর পৌরাণিক কাহিনী এক হয়ে আছে। এই মন্দিরের শিল্প-ঐশ্বর্যও চেয়ে দেখবার মত।

যাত্রীদের থাকবার ব্যবস্থা এখানে ভাল। বঙ্গোপসাগরের দিকে চমৎকার একটি সরকারী ছত্রম আছে—তার নামনে আছে রেট হাউস। এ ছাড়াও বাড়ী বা ঘর ভাড়া পাওয়া যায়। ছত্রমে অনেকগুলি ঘর আছে—বিদ্যুৎ-আলোর ব্যবস্থা আছে। ছত্রমের প্রবেশ পথে—সবকারী জলের কল। এ জল শুধু পানের জন্ত—আনের জন্ত তো সমুদ্র রয়েছেই।

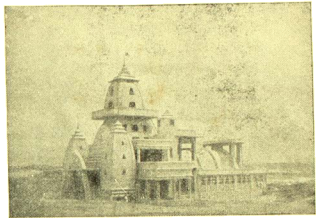
আহার্যত্রয় এখানে কমই মেলে, কিন্তু বীদের রান্না করার অসুবিধা—তারা অন্যায়সে হোটেল হোটেল খেতে পারেন। আদিব নিরামিষ ছ’রকমের হোটেলই আছে। এ ছাড়া কলা, ডাঘ বা নারিকেল, মুদাখি লেবু পাওয়া যায়। দক্ষিণ দেশের প্রতিটি স্টেশনে প্যাকেট-মোড়। দইভাত বিক্রয় হয়—ইডলি ভোগা খাওয়ার বীদের রুচি নাই—তারা অন্যায়সে টাটকা দইভাত কিনে খেতে পারেন। তাতেও রুচি না থাকে—পাঁউরটি বিক্টি মিলবে। মিডাসই নিউ থাওয়া অভ্যাস বীদের—তারা সঙ্গে কিছু চিনি বা মিছরি নিতে পারেন। এদিকে একটিমাত্র অসুবিধা—সিগাড়া কচুরি সম্বন্ধে বঙ্গোপসাগর নোকাই নাই। মাত্রাঙ্গ আর মাদ্রাস এ ধরনের নোকাই দু’একটি চোখে পড়েছে, আর কোথাও দেখিনি।

কন্যাকুমারী ছোট ভারগা—মাত্র সাত হাজার লোকের বাস। এর মধ্যে নাকি পাঁচ হাজার খৃষ্টান। কেরালার প্রান্তে হলেও দেশটি ভারিলানদের অস্তত্বুক্ত।

কুমারী মাতার মন্দিরটি অন্যতমের। গোপুরমের চমক নাই—নির্মাণের চমৎকারিত্বও নাই। চারিদিকে উঁচু পাটাল-ঘেরা একটি আবাসগৃহ। তারই মধ্যে পূর্বমুখী কুমারীমূর্তি ; প্রমদাননা প্রাণ-প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ। পূর্বের দরজা খুললেই সমুদ্রের সিঁড়ি বাঁধানো ঘাট, কিন্তু বৎসরে একটি দিন—বিশেষ একটি পর্ব-উপলক্ষ্যে ওই দরজা খোল হয়। যাত্রীরা প্রবেশ করেন উত্তর দরজা দিয়ে। নথ-গায়ে দেখী দর্শনের নিয়ম। পূত্রার প্রধান উপকরণ হল গোলাপ জল। সেই জলে স্নান করেন দেবী।

উত্তর থেকে প্রাচীর ঘুরে দক্ষিণে এসে সাধারণের স্নানের ঘাট পড়বে। এই ঘাট সমুদ্রের দিকে পাথর দিয়ে ঘেরা। ভারত সমুদ্রের দ্রুত তেঁউগুলি পাষণ-প্রাচীরে আছাড় খেয়ে ভেঙ্গে যাচ্ছে, আর হুতবল জলের বেগটা খানিক দোলা দিয়ে ফুলে উঠছে ঘাটের বাঁধানো চত্বরে। এই স্নানের ঘাটে নেমে সমুদ্রকে স্তম করার কিছু নাই।

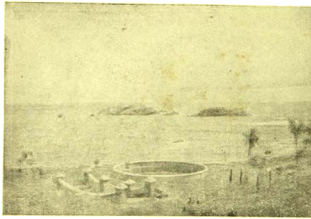
ঘাটের ডান দিকে
আরও সাগর—অপরাজে
স্বর্গাতের শোভা দেখতে
ভিড় জমে এদিকে। আবার
কস্তাকুমারীর সব চেয়ে
হৃদয় সৌখিন রয়েছে এই-
দিকে। বছর থেকে সেখানে
এটিকে দেব-মন্দির বলে ভুল
হবে। দেবমন্দিরই এটি।
ভারতবর্ষের স্বাধীনতা
ফিরিয়ে আনার জন্য যে
মহান্ মাছুষটি সর্বস্ব পণ



গাঙ্গী-মন্দির

করেছিলেন—ঔরই চিত্তাভ্রমের উপর সৌখিন তৈরী হয়েছে ১২৫৬ সালে অক্টোবর মাসে। গাঙ্গী-
মন্দিরের উপর থেকে শহরটিকে হৃদয় দেখায়।

এ ছাড়া আরও একজন মহামানবের পুণ্যশ্রুতি জাগিয়ে রেখেছে—সমুদ্র-মধ্যস্থিত দ্বীপ শিলা।
একদা স্বামী বিবেকানন্দ এনেছিলেন এই পুণ্যভূমিতে। তাঁতের সমুদ্র পার হয়ে ওই শ্রুতিশিলায়
আরোহণ করে ধ্যানমগ্ন হয়েছিলেন। তিন দিন নাকি কেটেছিল সেইভাবে। যে দৃষ্টি কোটির মধ্যে
গুটিকোণে মেলে না—সেই দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করেছিলেন ভারতবর্ষের প্রাণসত্যকে। আশ্ব স্বামীজীর
নামেই ওই শ্রুতিশিলা পরিচিত—‘বিবেকানন্দ রক’। এ ছাড়া তাঁর গুণমুগ্ধ ও অহুহাঙ্গীর দল একটি
পাঠাগার স্থাপন করেছেন—বিবেকানন্দ লাইব্রেরী ও ব্রী রীডিং রুম। এই পাঠাগারে ইংরেজি,
বাংলা, তামিল প্রভৃতি ভাষায় স্বামীজীর রচনাবলী শ্রীরামকৃষ্ণ দশদেব দ্বাবতীয় গ্রন্থের সংগ্রহ রয়েছে।
পাঠাগারে যে মন্তব্য বইখানি আছে তার পাভা উন্টালে দেখা যাবে বাংলা ও অন্যান্য গ্রন্থের বহু
মনোবী কি গভীর ভাবেই না স্বামীজীর প্রতি প্রজ্ঞা নিবেদন করেছেন। কতিপয় মাত্রাজী যুগের
উৎসাহে পাঠাগারটি ভালভাবেই চলছে। এরা স্বামীজীর শ্রুতিমন্দির নির্মাণের জন্য অর্থদান গ্রহণ
করছেন। এখানকার প্রভাতি আকাশের অপকরণ স্বর্গোদয় দেখে ধীরে মুগ্ধ হবেন—উনবিংশ শতকের
শেষভাগে বাংলার আকাশে একদা যে অকর্ণোদয় হয়েছিল, সে কথা কি সেই সঙ্গে তাঁদের মনে পড়বে
না? সেই পৌরবসয় স্বর্গোদয়ের কথা মাত্রাজী বন্ধুরা একাগ্র নির্ভর সঙ্গে ঘাঙ্গীর কাছে বলে থাকেন।
হুতরাং এখানে আগার আগে স্বামী বিবেকানন্দের জীবনীগ্রন্থটি পড়ে নেওয়া ভাল।



কস্তাকুমারী নামটি
কেন হল এবার সেই প্রশ্নে
আসা থাক। কাহিনীটা
অবশ্য পুরাণের।

পুরাণে বর্ণিত আছে—
ভরত রাজা ছিলেন আসমুদ্র
হিমালয় বিস্তৃত এই পুণ্য-
ভূমির অধিপতি। তাঁরই
নামে এই ভূখণ্ড ভারতবর্ষ
নামে খ্যাত। ভরত রাজার
ছিল আটপুত্র ও কুমারী
নামে এক কস্তা। রাজা তাঁর

বিশাল সাম্রাজ্যকে নয় ভাগে ভাগ করে দিয়েছিলেন এদের মধ্যে। কুমারীর অংশে পড়েছিল
দক্ষিণ দেশের এই অংশটি এবং তাঁরই নামানুসারে এই ভূমির নামকরণ হয় কস্তাকুমারী।

হল পুরাণে আছে এক অশুর বধের কাহিনী—পরশক্তিকে ঘাব ভক্ত কুমারীমূর্তিতে অবতীর্ণ
হতে হয়েছিল। বনাসুর ব্রহ্মার বরে অজেয় হয়ে স্বর্গে আর মর্ত্যে অত্যাচার আরম্ভ করেছিল।
এক মাত্র কুমারী মেয়ে ছাড়া আর কেউ তাকে বধ করতে পারবে না—এই ছিল ব্রহ্মার বর। দেবী
অপরূপ কুমারী মূর্তিতে আবিস্কৃত হয়েছিলেন এই মেয়ে। কিন্তু পরমপুরুষ শিবের সঙ্গে তাঁর
বিবাহ সম্বন্ধ অগ্রসর হওয়াতে দেবতার চিন্তিত হয়ে পড়লেন। বিবাহ হয়ে গেলে দেবী তো
অশুর বধ করতে পারবেন না—তাঁর মর্ত্যে আসার উদ্দেশ্যও বিফল হয়ে যাবে। স্তব্ররাস দেবতাদের
প্রতিজ্ঞ হয়ে নারদ এলেন এই বিবাহ শুনতে। কথা ছিল যাত্রি প্রভাত হয়ে যদি লগ্ন উত্তীর্ণ
হয়ে যায় তো এই বিবাহ আর হবে না। শিব অবশ্য যথাকালে যাত্রা করলেন, কিন্তু কস্তাকুমারীর
মাত্র আট মাইল দূরে এগে তাঁর গতিভঙ্গ হল। নারদ কৌশল করে প্রভাত ঘোষণা করতেই শিব
স্বাগৃহ্মতি লাভ করলেন। শুচিক্রমের মেঘদেউলে স্বাগৃহ্মতিতে রয়ে গেলেন তিনি। এইভাবে
দেবীও রইলেন কুমারী। আশান্তলে দেবী অতঃপর কঠোর তপস্তায় নিমগ্ন হলেন। অশুরের
অহুচরিতা দেবীর তপস্তারত অলোকসামান্য রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে অশুররাজকে সংবাদ দিলে। বনাসুরও
সে রূপ দেখে দেবীর পানিপ্রার্থনা করল। দেবী এক মর্ত্যে সম্মত হলেন। অশুররাজ যদি মুগ্ধ তাকে
পরাস্ত করতে পারে—তাহলে তাঁরই পলায় দেবী বরমালা অর্পণ করবেন। ভীষণ মুগ্ধ বাৎস দু'জনে।

সেই যুদ্ধে নিহত হল বনাহর। দেবী ফিরে গেলেন তাঁর তপস্তার স্থানে। সেই স্থানটিতেই নাকি কুমারী মাতার দেউল উঠেছে। হিন্দুর মধ্যে দিনে-রাত্রে জ্বলছে শত শত প্রদীপ। তাঁরই আলোর উজ্জ্বলিত অপূর্ণ কুমারী-মূর্তি, হাতে অশমালা—পায়ের তলায় সিংহ-প্রতীক—কণ্ঠে কুম্ভম আভরণ। এমন জীবন্ত মূর্তি ভারতবর্ষের আর কোন হিন্দুরে নাই।

ছোট্ট জায়গা কণ্ঠাকুমারী, কিন্তু দীপ্তবর্ণে অতুলনীয়। এই পূণ্যভূমিতে পুরোপুরি একটি দিন আর একটি রাত্রি না কাটিয়ে গেলে জীবনের অমূল্য লক্ষ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছি বলে মনে হবে।

নতুন পড়া

শ্রীরঞ্জকুমার সেন

নতুন পড়া পড়বে এবার

খোকন সোনা,

মনে যে তার হাজার রঙিন

স্বপন বোনা।

বয়স নেহাৎ কম হ'লো কি,

এই তো পাঁচ,

মনের বনে যায় মাতিয়ে

ফিঙের নাচ।

পড়বে খোকন হাজার রকম

হাজার পড়া,

এই ছুনিয়া এক নিমেঘে

পড়বে ধরা।

হাতের জোরে যেমন ক'রে

লাট্টু ঘোরে,

পড়বে খোকন তেমনি ক'রে

অনেক জোরে।

শুধুই কি আর পাঠ্যকেতাব

হাজারখানা,

পড়বে খোকন দেশ-বিদেশের

খবর নানা।

কোথায় চলে সাগর দিয়ে

জাহাজ কত,

কারখানাতে কোথায় খাটে

শ্রমিক শত।

কোথায় চলে টাটু-ঘোড়া

টগ্‌বগিয়ে,

ইঞ্জিনেতে উঠ লো ধোঁয়া

বগ্‌বগিয়ে :

এসব খোকন বলেই দেবে

চক্ষু বুজে,

তোমরা যত বিপ্তেবাগীশ

মরবে খুঁজে।

শেব করেছে খোকন এবার

নামতা পড়া,

সব হিসেবের ফাঁকি সবার

পড়বে ধরা।

খোকন জানে কোথায় থাকে

ঘণ্টা বুড়ি,

চন্টনিয়ে দেবেই ধ'রে

জাহাজ চুরি।

তোমরা যত বুড়ো খোকন

কর্তাভজা,

খালকাটা সব আস্ত কুমীর

দেখ্বে মজা ॥

স্বাস্থ্যের কাজ

শ্রীকমল বন্দ্যোপাধ্যায়

টেলিফোন এক্সচেঞ্জে তারের বে গোলকধাঁধা দেখা যায়, তার চেয়ে ঢের বেশী জটিল হচ্ছে আমাদের স্বাস্থ্যমণ্ডলী। টেলিফোন এক্সচেঞ্জে ঘণ্টায় হাজার হাজার বার আদ্যে, আর মাস্তবের শরীরের ভিতরের এই স্বাস্থ্যের লক্ষ-কোটি কোষের সাহায্যে রাতদিন লক্ষ কোটি সংবাদ মগজে পৌঁছাচ্ছে। এই সমস্ত স্বাস্থ্যকোষের পরস্পরের মধ্যে সংযোগ আছে, এবং সে সংযোগব্যবস্থা এত নিপুণ যে, লক্ষ-কোটি স্বাস্থ্যকোষ পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে পারে না। পকেটস্মিয়ারের যে কাজ আমাদের শরীরে চলছে, সে কাজ চালাচ্ছে স্বাস্থ্যমণ্ডলীর এই লক্ষ লক্ষ আণবিক কোষ। রিঠাইটা মিষ্টি কতখানি, গানের স্বরটা ভালো লাগছে কিনা, সিঁচুরে যেবে সন্ধ্যার ছবিখানি পছন্দসই কিনা, গরম লোহা গায়ে ধরলে কি হবে, এই ধরনের সব ব্যাপার স্বাস্থ্যকোষগুলো প্রথমে ধরছে এবং সঙ্গে সঙ্গে মগজে রিপোর্ট করছে। স্বাস্থ্যমণ্ডলী যেভাবে স্বাস্থ্যের শরীরে কাজ করে যাচ্ছে, তার সঙ্গে স্বাস্থ্যের উদ্ভাবিত কোনো যন্ত্রের তুলনাই চলে না।

জিব দিয়ে আমরা আশ্বাসন গ্রহণ করি। কি ভাবে কাজটা হচ্ছে? জিবে মোট ৩০০০ আশ্বাসন নেওয়ার উপযুক্ত ছোট ছোট কুঁড়ির মত আছে। সেগুলো স্বাস্থ্য সাহায্যে মগজের সঙ্গে যুক্ত। বিজ্ঞানীরা বলেন, মুখে খাবার দিলে সেই খাবারগুলো যখন এই সব আশ্বাসন-কুঁড়ির সংস্পর্শে আসে, তখন একটা বৈজ্ঞানিক চেতনা সোজা মগজে আঘাত করে। মগজ তখন বুঝিয়ে দেয় লবণ কম হয়েছে কিনা, জিনিষটা টক না তেতো এবং খাবারটা খেতে চমৎকার কিনা?

ভেমনি হৃৎকানের মধ্যে আছে শোনার উপযোগী এক লাখ ছোট ছোট কোষ। সেগুলোর সঙ্গে স্বাস্থ্য আছে এবং কোনও শব্দ কানে গেলে একটা বিজ্ঞানতত্ত্বের সৃষ্টি হয়। অতি সামান্য শব্দ কানের মধ্যে জোরালো হয়ে উঠে। কানের স্বাস্থ্যের সঙ্গে মগজের নিকট সম্বন্ধ থাকায়, আমরা সব শব্দ শোনা মাত্র বুঝতে পারি।

স্বাস্থ্যের দুই চোখে আলো ধরার অতি ক্ষুদ্র কোষ আছে তের কোটি এবং এই আলো থেকে মগজে ছাপ থাকে। অধিক্তি চোখ দিয়ে আমরা সব কিছুই দেখে থাকি, কিন্তু স্বাস্থ্য দিয়ে সব স্ববর সঙ্গে সঙ্গে মগজে পৌঁছায় বলে চোখে দেখা জিনিস সম্বন্ধে সব বুঝতে পারি। কখনো হঠাৎ মাথা ঘাড়া লাগলো আর আমরা চোখে সব্বেষের ফুল দেখলাম। চোখে যেখলাম একটা আলোর বলকা, কারদটা তার আর কিছু নয়; মাথায় ধাক্কা লাগার ফলে চোখের স্বাস্থ্যে যে বৈজ্ঞানিক আঘাত লাগলো, মগজ সেটাকে আলোর চমকানি বলেই ধরে নিল।

গায়ের চামড়াতেও আছে ধরবার অনেক ছোট ছোট কোষ। এই কোষগুলোর কোনোটা ঠাণ্ডা

ধরে, কোনটা আবার উত্তাপ ধরে। গায়ের চামড়াতে উত্তাপ ধরার পাত্র আছে ০০০০০, আর ঠাণ্ডা ধরার পাত্র আছে আড়াই লাখ। কাজেই ঠাণ্ডা ধরাটা সহজ হয়। আর চামড়ার আছে স্পর্শ বোঝার অতি ছোট ছোট দশ লাখ আয়না। হাত উপর হাত পড়লেই স্পর্শের ব্যাপারটা বোঝা যায়। ঠাণ্ডা হলে স্নান করলে কাঁপুনি লাগে কেন? তার কারণ এই সব ঠাণ্ডা ধরার পাত্রগুলো ঠাণ্ডামলের খবর দিয়ে মগজকে কাঁপিয়ে দেয়। ফলে শরীরে কাঁপুনি ধরে, চামড়ার মধ্যে ছোট শিরগুলো দিয়ে রক্ত আনাগোনা বেড়ে যায়, যেন শরীরটা গরম হয়। তেমনি খুব গরম লাগলে ঘাম ঝরে। তার কারণ উত্তাপ ধরার স্নায়ু মগজকে জানিয়ে দেয় গরমের কথা এবং তখনি ঘাম ঝরিয়ে শরীর ঠাণ্ডা করার ব্যবস্থা হয়ে যায়। আর তার অন্তে হাতুঘের শরীরে ত্রিশ লক্ষ ঘাম ঝরানোর গ্রন্থী আছে।

কিন্তু অনেক সময় মগজ ঠিকমত স্নায়ুর খবর ধরতে পারে না। একটা গরম হুঁচ গায়ে ঠেকলে বিশেষ কিছু বুঝতে পারা যায় না, কিন্তু একটা গরম লোহা দিয়ে গায়ে হ্যাঁকা দিলে বেশ ভালই বুঝতে পারা যায়। তেমনি আত্মল দিয়ে মল বা দুধ কতটা গরম ঠিক বুঝতে পারা শক্ত। তাছাড়া ঘুমের সময় মগজ ঠাণ্ডা নেবে যায়, স্নায়ুও অবশ থাকে। তাই শয়ন সেথে ভয় পেয়ে চীৎকার করলেও মুখ দিয়ে কথা বেরোয় না, পালাতে চাইলেও পা উঠে না।

হাতুঘের শরীরের অন্তান্ত কোষের মত স্নায়ু কোষগুলি নয়। হাত কাটলে সে কাটা আপনা আপনি কিছুদিন বাবে মেয়ে যায়, কারণ শরীরের অন্তান্ত সব কোষের জন্ম ও বৃদ্ধি আছে, কিন্তু স্নায়ুকোষের জন্ম ও বৃদ্ধি নেই। জন্মের সময় হাতুঘ যতগুলো স্নায়ুকোষ নিয়ে জন্মায়, চিরজীবন ততগুলি থাকে। যদি কোনও রকমে একটা স্নায়ুকোষ নষ্ট হয়ে যায়, সেটাকে আর ঠিক করার কোনও উপায় নেই। তবে নষ্ট হওয়া স্নায়ুকোষের পাশ দিয়ে স্নায়ুর নতুন শাখা যেলতে পারে। হাতুঘের চুল, হাতের ও পায়ের নখ যে বাড়ে, তার কারণ ওই সব অঙ্গের কোষ বৃদ্ধি চলছে।

স্নায়ুকোষগুলি দেখতে কেমন? পণ্ডিতেরা বলেন স্নায়ুকোষ দেখতে ব্যাঙাচির মত। মস্ত কোষের মত মাথাটার শিঁড়নে একটা লম্বা লেজুড়। স্নায়ুকোষের এই মাথাটাই প্রধান এবং স্নায়ুকোষের এই অংশটি বলালো ঘাঘ না। কিন্তু স্নায়ুকোষের লেজুড়টা কাটা গেলেও আবার গজাতে পারে। স্নায়ুকোষের মাথাগুলো থাকে হয় মগজে না হয় বেরনগে, আর লম্বা লেজগুলো হচ্ছে স্নায়ুরন্ধুর এক একটা অংশ। এই লেজ খুঁই ছোট কিংবা তিন ফুট পর্যন্ত লম্বা হতে পারে এবং এক সঙ্গে হাজার হাজার স্নায়ুর লেজুড় জড়ানো থাকতে পারে। মগজ ও বেরনগ থেকে স্নায়ুগুলি সমস্ত দেহের অন্ত-প্রান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে থাকে। স্নায়ুর মধ্যে দিয়ে সব খবর মগজে যায় এবং তার গতি ঘটাও ঘূণো মাইলেরও বেশী। আমাদের স্নায়ুকোষ সমস্ত আরও অনেক কিছু জানবার আছে।

আচার্য বদুনাথ

ভারতের বিখ্যাত ঐতিহাসিক ও মনোবী আচার্য বদুনাথ সরকার ৮৮ বৎসর বয়সে ১৯শে মে ১৯৮৮ সালে কলকাতায় পরলোক গমন করেছেন। বাল্যকাল থেকেই ইতিহাসের প্রতি তাঁর অসাধারণ অহুরাগ ছিলো। এই অহুরাগ তাঁর জীবনের শেষ পর্যন্ত জাগরুক ছিলো, সেইজন্যই তিনি এতবড় ঐতিহাসিক হতে পেরেছিলেন।

তিনি এক জাগোয়া লিখেছেন—“ইতিহাস ছিলো আমার শিতার প্রিয় পাঠ্য। তিনি আমার বালকচিত্তে ইতিহাসের নেশা জাগিয়ে দেন। আমাকে প্রথমে Plutarch-এর লেখা প্রাচীন গ্রীক ও রোমান মহাপুরুষদের জীবনী পড়ান। সেই থেকে এবং পরে ইউরোপীয় ইতিহাস পড়ে আমার মনে চোখ খুলে গেল; আমার তরুণ হৃদয়ে অধিত হোলো কি করলে জাতি বড় হয়, কি করলে ব্যক্তিগত জীবনকে সভ্যসভ্যই সার্থক করা যায়।” এই জীবনময়্রেই বদুনাথ দীক্ষিত হয়ে উঠেছিলেন।

রাজসাহী জেলায় ১৮৭০ সালের ১০ই ডিসেম্বর আচার্য বদুনাথের জন্ম হয়। শিক্ষা-জীবনে তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। বিন্দু পরীক্ষার ইংরেজী ইতিহাসে অনার্স পান এবং এম-এ পরীক্ষার ইংরাজী সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৮৯৭ সালে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজ কলকাতায় ভর্তি লাভ করেন।

১৮৯৮ সাল থেকে ১৯২৬ সাল পর্যন্ত তিনি বিভিন্ন কলেজে অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত ছিলেন এবং সেই থেকেই মৃত্যুর শেষ দিন পর্যন্ত নানাবিধ ঐতিহাসিক গবেষণার কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। স্বাধীনকাল পরিশ্রম, যত্ন ও অহুশীলন করে আচার্য বদুনাথ ভারতের ইতিহাসের সভ্য দেশবাসীর কাছে উদ্ঘাটিত করেছিলেন। বিদেশী শাসনের কালে দেশে প্রচলিত ইতিহাস বিকৃত হয়ে গিয়েছিলো, আচার্য বদুনাথ আমাদের ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ করে, সাক্ষরে, সংশোধন করে, আলোচনা করে, পাণ্ডিত্যপূর্ণ এমন কয়েকটি ইতিহাস রচনা করে গেছেন, যা পৃথিবীর ইতিহাসের সাহিত্যে অমূল্য বলে গৃহীত হয়েছে।

নানাবিধ সম্মান তিনি সরকারের কাছ থেকে এবং দেশবাসীর কাছ থেকে পেয়েছিলেন।—যেমন পার্লামেন্ট ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি, লিট্‌ উপাধি; ইংরেজ গভর্নমেন্টের কাছ থেকে সি-আই-ই ও নাইট উপাধি এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি ইত্যাদি।—

আজকের দিনে আমরা শুধু মূল্যবান অন্তরে তাঁকে স্মরণ কোরবো। তাঁর সাধনার ধারা দেশ-বাসীকে পথের নির্দেশ দিক, তাঁর কর্ম-মুগ্ধ জীবন জাতির শিক্ষা হলে ধার্যক।

মেরুড়ে

হকি লীগ চ্যাম্পিয়ন : মোহনবাগান

গত ২২শে এপ্রিল হকি চ্যাম্পিয়নশিপের খেলার মোহনবাগান মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবকে ১-০ হারিয়ে দিয়ে ছ-বার অপরাজিত অবস্থায় লীগ স্নেহের গৌরব এবং হকি লীগের ইতিহাসে নতুন রেকর্ড স্থাপন করল। বেলা শেষ হবার দু-মিনিট আগে পেয়ারা সিং এই খেলার জয় নির্দেশক গোল করেন।

বাইটন কাপ বিজয়ী : মোহনবাগান

গত চারবারের অপরাজিত হকি লীগ চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগান চাই যে ক্যালকাটা। মাঠে কিরকির কিরকি ইন্ডিয়ানিং কোরকে এক গোলে হারিয়ে দিয়ে 'হকি ডাবল' (লীগ ও বাইটন কাপ) লাভের কুতিস্থ অর্জন করেছে। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, তিনবার বাইটন ফাইনাল খেলে মোহনবাগান ক্লাব বিজয়ীবার 'বি-মুকুট' লাভ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছে। মোহনবাগান প্রথম 'বি-মুকুট' লাভ করেছিল ১৯৫২ সালে শেষ পর্যায়ের খেলার হিন্দুস্থান এয়ারক্রাফ্টকে হারিয়ে দিয়ে।

খেলার বিজয়ীমুখে মুনাস্বামী ফাউল করলে মোহনবাগান সর্ট কর্ণার পায়। এই সর্ট কর্ণার থেকে কিরকি দলের বেলোয়াড়রা সর্ট মেবার আগে বাসবার ছুটে আগতে থাকলে আশ্চর্য্যের খেলাটি বুলির নির্দেশ দেন এবং এই বুলিতে গুরু শেশমুখকে কাটিয়ে গোল করেন (১-০)।

খেলার শেষে বি. এইচ. এ-র সভাপতি আর শুভের শৌর্যোহিত্যে শ্রীমতী শুভা পুরস্কার বিতরণ করেন। এই দিন খেলার মাঠে বিরাট দর্শক সমাবেশ হয়। গত ২২ বছরের ভিতর

মাঠে এত বেশী দর্শক সমাগয় হয়েছে বলে মনে পড়ে না।

মোহনবাগান ক্লাব কীভাবে বাইটন কাপ পেল

মোহনবাগান (৬) : জামালপুর (০) ; মোহন-বাগান (৩য়াকুভার) : লালবাগ (৩য়াকুভার) ; মোহনবাগান (৪) : রাজস্থান (৩) ; মোহনবাগান (২) : মহ : স্পোর্টিং (১) ; মোহনবাগান (১) : কিরকি কোর অব ইন্ডিয়ানিং (০)।

বি-মুকুট আর কোম কোম দল পেয়েছে

বি. ই. কলেজ—একবার, ১৯০৪ খ্রি :।
কাস্টমস—আটবার—১৯০২, ১৯১০, ১৯১২, ১৯২৬, ১৯৩০, ১৯৩১, ১৯৩২ ও ১৯৩৮ খ্রি :।
রঞ্জাল—তিনবার—১৯১৫, ১৯১৭ ও ১৯৩৪ খ্রি :।
পোর্ট কমিশনার—দু-বার—১৯৪৬ ও ১৯৭৮ খ্রি :।
মোহনবাগান—দু-বার—১৯৫২ ও ১৯৫৮ খ্রিষ্টাব্দে।

গত পাঁচ বছরের কাইনাল খেলার ফলাফল

১৯৫৩—টাটা নাগপুর ইউনাইটেডকে ২ : ১ গোলে হারিয়ে দেয়। ১৯৫৪—টাটা ওয়েস্টার্ন রেলওয়েকে ১-০ গোলে পরাজিত করে। ১৯৫৫—উত্তর প্রদেশ ও ওয়েস্টার্ন রেল দলের খেলা ০-০ ও ০-০ গোলে অসমাপ্ত থাকে। ১৯৫৬ সান্তিসেগ হকিট মোহনবাগানকে ৩-১ গোলে হারিয়ে দেয়। ১৯৫৭ ইষ্টবেঙ্গল মহামেডান স্পোর্টিংকে ১-০ গোলে হারিয়ে দেয়।

দক্ষিণ কলকাতা ফুল হক লীগ

আই. এম. এস. এ. দক্ষিণ কলকাতা পরিচালিত আন্তঃ ফুল হক প্রতিযোগিতায় জগৎবন্ধু ফুল দল চ্যাম্পিয়নশীপ লাভ করেছে। লোক ময়দানে উভয় দলের ভেতর সর্বশেষ খেলাটি গোলমুক্তভাবে শেষ হলে লীগ চ্যাম্পিয়নশীপের কয়সালা হয়ে যায়। এর আগের তিন বছর জগৎবন্ধু এই লীগ প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়নশীপ লাভ করেছিল। এবারের লীগের খেলার জগৎবন্ধু ফুল মাত্র একটি পয়েন্ট নষ্ট করেছে।

ইউ. এন. চ্যাটার্জি শিল্ড

৭ই মে মহামেডান স্পোর্টিং মাঠে আই. এল. এস. এ. কলকাতা পরিচালিত আন্তঃ ফুল হক ইউ. এন. চ্যাটার্জি স্মৃতি শিল্ড ফাইনালে ছেয়ার ফুল, খালসা ফুলকে ২-০ গোলে হারিয়ে দেয়। বিজয়ী দলের পক্ষে দুটি গোল করেন কে. রায়।

ফুল ছাত্রদের ক্রিকেট শিক্ষণ

কেন্দ্রীয় শিক্ষণ মন্ত্রণালয়ের অন্তর্ভুক্ত নিখিল-ভারত ক্রীড়া পরিষদের উদ্যোগে ভারতের দিল্লী (উত্তরাঞ্চল), থানাকান্দা (পশ্চিমাঞ্চল), হায়দরাবাদ (মধ্যাঞ্চল), নাগপুর (মধ্যাঞ্চল) এবং কলকাতা (পূর্বাঞ্চল) পাঁচটি বিভিন্ন কেন্দ্রে সাতেরো বছরের কম বয়স্ক ফুল ছাত্রদের ভক্ত আগামী ৫ মে থেকে ১ জুন পর্যন্ত ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের পরিচালনার উল্লিখিত কেন্দ্রগুলিতে শিক্ষণ শিবির খোলা হবে। এই পাঁচটি কেন্দ্রের ব্যয় বাবদ ক্রীড়া পরিষদ ছেচমিশ হাজার টাকা বরাদ্দ করেছেন। মোট ব্যয়ের পঁচিশ শতাংশ ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড বহন করবেন।

টোকিওতে আসন্ন এশিয়া ক্রীড়া

টোকিওতে তৃতীয় এশিয়া ক্রীড়া আগামী ২৪ মে থেকে ১ জুন পর্যন্ত অচলিত হবে। সোমবার ৫ মে চিত্রকলা প্রদর্শনীর উদ্বোধনের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত পক্ষে এশিয়া ক্রীড়ার উদ্বোধন-পর্ব শুরু হয়ে গিয়েছে।

এই সঙ্গে এশিয়া ক্রীড়ার আনুমানিক সংক্ষিপ্ত ক্রীড়াসূচী দেওয়া হ'ল—২৪ মে—উদ্বোধন অনুষ্ঠান। ২৫ মে—১ জুন—ফুটবল প্রতিযোগিতা। ২৫—৩০ মে—হকি প্রতিযোগিতা। ২৫—৩১ মে—ভলিবল প্রতিযোগিতা। ২৫—৩১ মে—বাইস্কেল স্পিডিং। ২৫—৩১ মে—টেনিস। ২৫—২৮ মে—এথেলেটিক্স। ২৫ মে—১ জুন—বাস্কেটবল। ২৫—২৭ মে—হুস্তি প্রতিযোগিতা। ২৫—২৮ মে—সাইক্লিং প্রতিযোগিতা। ২৫—২৮ মে—ভারোত্তোলন। ২৮—৩১ মে—সাঁতার ও ডাইভিং। ২৫—৩১ মে—টেবল টেনিস। উল্লিখিত প্রতিযোগিতা ছাড়া প্রদর্শনী 'জুজো' (জুজিৎসু) এবং ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা হবে।

এশিয়া ক্রীড়ার তৃতীয় ক্রীড়াবিদগণকে স্বর্ণ-পদক, রৌপ্যপদক, ব্রোঞ্জপদক এবং ডিমোয়া দেওয়া হবে। প্রত্যেক বিভাগে প্রথম স্থানধিকারী প্রতিযোগীকে স্বর্ণপদক ও ডিমোয়া, দ্বিতীয় স্থানধিকারীকে রৌপ্যপদক ও ডিমোয়া, তৃতীয় স্থানধিকারীকে ব্রোঞ্জপদক ও ডিমোয়া দেওয়া হবে। চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠস্থান অধিকারী প্রতিযোগীদের কেবলমাত্র ডিমোয়া দেওয়া হবে।

লীল পদ্ধতিতে হকি প্রতিযোগিতার খেলা হবে। ভারত, পাকিস্তান, মালয়, জাপান, সিঙ্গাপুর এবং কোরিয়া এই চটি দেশ হকি প্রতিযোগিতায় আংশ গ্রহণ করবে। প্রত্যেক দলকে পাঁচটি করে ম্যাচ খেলতে হবে।

বুদ্ধির খেলা

শ্রীননীগোপাল চক্রবর্তী

শৃঙ্খল মোচন

(১) হুঁশুও করলেও আলাদা হয় না!

একটা কাগজের আঁট আছে। এর মাঝখান দিয়ে বরাবর কাঁচি চালালে ত' আলাদা ছুটো আঁট হবে?—তা না হ'য়ে মাঝখান দিয়ে কাঁচি চালালে যেখা বাবে যে, ছুটো আঁট! শেকলের মত হ'য়ে গেছে!

এটা কি ক'রে সম্ভব? পাণের ছবি দেখ এবং পরের পাতায় লেখা উত্তর দেখ।

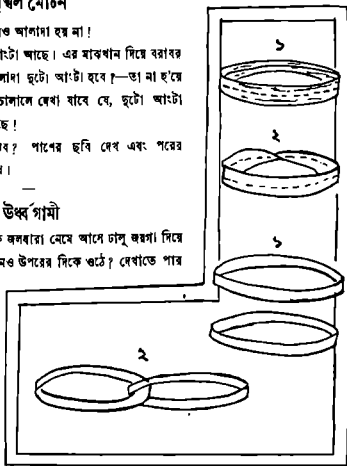
উদ্ধৃগামী

(২) পাহাড় থেকে জলধারা নেমে আসে ঢালু জঙ্গল দিয়ে নীচের দিকে। জল কখনও উপরের দিকে ওঠে? যেখানে পার—জল উপরের দিকে উঠবে কি ক'রে?

ডিমে তা

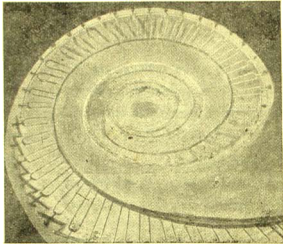
(৩) মুরগী, হাস ডিম পাড়ে এবং পাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দেই ডি ম শু লি কে

ফোটাবার জন্ত, অর্থাৎ তা থেকে বাচ্চা বার করার জন্ত তার উপর বসে থাকে। এই বসে থাকাকে তা দেওয়া বলে। এর জন্তে প্রায় 108° ডিগ্রি তাপের প্রয়োজন হয় এবং তা তাদের গা থেকে পাওয়া যায়। মুরগীরা এক সঙ্গে ৫৬টি ডিমে তা দিতে পারে। কিন্তু একটি ডিম থেকে এইভাবে তা দিয়ে বাচ্চা ফোটাতে কতদিন লাগে জান কি? যদি না জানো উত্তর দেখে নাও।



জিনিষটা কি ?

(৩) পাশের ছবিটার দিকে ভাল করে তাকাও। দেখ, কিছু বুঝতে পারছ কিনা। কিছু বুঝতে না পারলে, নীচের উত্তর দেখবে। কিন্তু ব্যাপারটা এমন শরু নয়, যে উত্তর না দেখলে বলতে পারবে না। আরি তোমাদের শুধু এইটুকু বলতে পারি যে, এটি একটি জিনিষের কায়দা করে ফটো তোলা। কিন্তু জিনিষটি কি এবার তোমরা বলা।



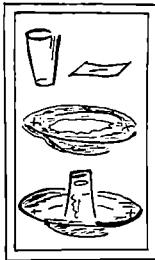
• উত্তর •

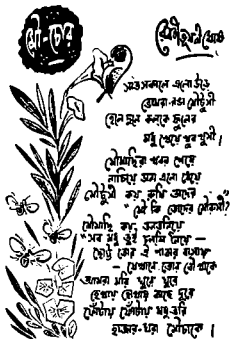
(১) কাগজের আংটাটিতে যদি প্যাচ বা পাক না থাকে, তা হ'লে কাচি নিয়ে বরাবর কাটলে (প্রথম চিত্র) আংটা দুটো আলাদা হ'রে বাবে; কিন্তু ঐ আংটে যদি একটা প্যাচ বা পাক থাকে, (দ্বিতীয় চিত্র) তা হ'লে কাচি নিয়ে বরাবর কাটলেও শুটা আলাদা হবে না—শেকলের মত আংটা হ'রে প্রথম আংটাটির সঙ্গে দ্বিতীয় আংটাটি আটকে বাবে।

(২) একখানি রেকাবি (বা প্লেট), একটা গেলাস, কিছুটা জল এবং খানিকটা কাগজ নাও। রেকাবিতে জলটা ঢেলে দাও। এইবার কাগজ খানিতে আগুন ধরিয়ে গেলাসের মধ্যে ঝেলে দাও। তারপর তাড়াতাড়ি করে গেলাসটিকে রেকাবির জলের মধ্যে উণ্ড করে রাখ। আগুনের শিখা ঐ

গেলাসের ভিতরের অগ্নিভেনটিকে নষ্ট করার ঐ লক্ষ্যস্থান রেকাবির জলকে উপরের দিকে টেনে নেবে।

(৩) ২১ মিন। (৪) বিলতে একটি অফিস-বাড়ীর ঘোরাল একটি শিঁড়ির বিচিত্র ফটো-চিত্র।





দূর থেকে কাকনজ্ঞা
 দিলো : ইহলতা দিত্ত

প্রাচীনদের প্রতি

শ্রীমদ্বন্দন চট্টোপাধ্যায়

তোমরা বাহাই ভাবিয়া গিয়াছ
 অনেক দিবস আগে,
 সেগুলিই ঘুরে আমাদের প্রাণে
 পুনঃ ভাব হয়ে জাগে !

তাহাই যে-যার ভাবায় আনিয়া
 মোরা আজ নাম কিনি ;
 এমনই এ যুগ, মানিতে ভুলেছি—
 পুজোর কাছে ঋণী।



কেউ কাকর চেয়ে বড় নয়, সমান-সমান
 কটা : ইহলতা দিত্ত



নতুন বই



(সবালোচনার জন্য ছ'খানি বই পাঠাবেন)

**এ্যাড্‌ভেঞ্চার—শ্রীমদৌরমোহন মুখো-
পাধ্যায়।** এম, এল, বে এণ্ড কোং, ১৩১,
কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা ১২। মূল্য ১/-

প্রাচীন সাহিত্যিক দৌরমোহনের লেখনী
যে এখনো অব্যাহত গতিতে লিখে চলেছে, তা
প্রায় প্রতি মাসেই তাঁর একখানি ক'রে নতুন
বইয়ের প্রকাশ থেকে উপলব্ধি করা যায়।
অনুবাস ও ঐতিহাসিক অসংখ্য গল্প উপভাস
লিখেছেন দৌরমোহন। তাঁর লেখা 'এ্যাড-
ভেঞ্চার'-এর কাহিনী সত্যিই যে বিজ্ঞানসম্মত,
বহুতর অন্বেষণমূলক একখানি কিশোর
উপভাস তাতে আর সন্দেহ নেই। পীর-
পাহাড়ের কালীবাড়ি ও কালীবাড়িতে লোক
উধাও হওয়ার ঘটনা এবং সন্ধ্যাসীরা কাহিনীর
মধ্যে একবার ডুব দিলে আর ওঠা যায় না,
একবারে তলিয়ে যেতে হয় বিন্দুতে।

—

**সমাজ সেবায় স্মরণীয় ষাঁঠা—শ্রীমতী-
হুমায়ুন নাগ।** নলেজ হোম ৫২, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট,
কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১/-

ভারতীয় মনোবীক্ষণের মধ্যে নানাভাবে ধারা
সমাজ ও শিক্ষার জাতিকে উদ্ভূত করেছেন,
উন্নত জীবনধারণার আদর্শ তুলে ধরেছেন জাতির
সম্মুখে, তাঁদের কয়েকজনের সংক্ষিপ্ত জীবন-
কাহিনী ও কর্মধারা সহর ভাষায় হৃদয় করে
বলেছেন গ্রন্থকার এই বইয়ের মধ্যে। সর্বদমেত
১৪ জন ভারতবাসিত মনোবী ও ছ'জন মহীয়সী
মহিলা আছেন এর মধ্যে। এই মহিলাদের একজন

হচ্ছেন রাণী রাসমণি ও অপরজন রাণী ভবানী।
প্রত্যেকেরই একখানি ক'রে ছবি আছে বইয়ের
মধ্যে।

—

পলাশীর প্রাস্তরে—হরিন্দাস মজুমদার।
পরমতী লাইব্রেরী, ৩২, আপার সার্কেলার রোড,
কলিকাতা ২। মূল্য ১০/-

বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার শেষ স্বাধীন
নবাব সিরাজদ্দৌলার জীবনের শেষ বদনিকাপাত
হয় পলাশীর মাঠে। ইংরেজ কায়দা আসন
পেতে বসে এসেছে। নানা যুদ্ধ, বিশ্বাসঘাতক-
তার কাহিনী জড়িয়ে আছে এই ইতিহাসের
মধ্যে। লেখক ছোটদের উপযোগী করে, অত্যন্ত
সাবলীল ভাষায়, বিভিন্ন কয়েকটি পরিচ্ছেদের
মধ্যে মূর্ণিমাধারের ইতিহাস থেকে আরম্ভ করে,
সিরাজের হত্যা পর্যন্ত কাহিনীগুলি বর্ণনা করে-
ছেন। চিত্রগুলি ঘটনাকে প্রাণলব্ধ করতে যথেষ্ট
সাহায্য করেছে।

—

নর-খাদকের পাণ্ডায়—জুল ভার্দ। শ্রীবিদ্য
চট্টোপাধ্যায় অনূদিত। বরেন্দ্র লাইব্রেরী, ২০৪
কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ১০/-

ধরাসী লেখক জুল ভার্দ বিশ্ববিখ্যাত। তাঁর
লেখা ছোট বড় সবাইকে মিলিত করে, অভিভূত
করে। 'এ্যাড্‌ভেঞ্চার মি ক্যানিবলস্' তাঁর একখানি
রোমাঞ্চকর বড় বই। অনুবাদক মূল গ্রন্থের
কিছু অংশ বর্জন করেও কাহিনীর আকর্ষণটি যে
ক্ষুণ্ণ হতে দেখেনি এটি তাঁর গুণগন্যই পরিচায়ক।
বইখানি শ'ড়ে ছোটরা আনন্দ পাবে।

—



কোলকাতা শহরে কল্যাণ মহামারীরূপে দেখা দিয়েছে, এ খবর তোমাদের অজানা নেই। প্রতি বছরই এই কটা মাস আমাদের খুব সাবধানে থাকতে হয়, গরমের সঙ্গে আরও নানা রকম উপদ্রব আমাদের ব্যতিব্যস্ত কোরে তোলে।...কিন্তু এবার অত্যন্ত ব্যয়ের তুলনায় বেশী গরম শুধু পড়েছে যে তাই নয়, উপরন্তু কল্যাণ উপদ্রবও ভয়াবহরূপে দেখা দিয়েছে। পৌর প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে এই কল্যাণ হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যে যে ব্যবস্থা করা হয়েছে তা অনেকের মতে পর্যাপ্ত নয়। কিন্তু এ তো সমালোচনার কথা। সম্মতি কাগজে দেখলাম, কোলকাতা ও বৃহত্তর কোলকাতা বা পৌর প্রতিষ্ঠানের আওতার মধ্যে পড়ে, তার মধ্যে মাত্র শতকরা ৩৬ জন লোককে কল্যাণ-প্রতিবেদক টাকা দেওয়া হয়েছে। খুবই দুঃখের কথা। প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে যে আরও ব্যাপক ভাবে টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা করার দরকার ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, কিন্তু দেখ কি শুধু এক পক্ষের। আমরা তো মনে হয়, তা নয়। আমরাও আমাদের নাগরিক দায়িত্ব পালনে যথেষ্ট গড়িমসি করছি। নগরবাসী হিসেবে আমাদেরও এ বিষয়ে আরো বেশী তৎপর হওয়া দরকার। আমাদের নিজস্বের উদ্যোগী হয়ে এই কল্যাণ প্রতিবেদক টাকা দেওয়ার জন্যে প্রতিবেদী তথা পরীবাশীকে সচেতন করা দরকার। আমাদের উচিত তাঁদের বুঝিয়ে দেওয়া যে, তাঁদের সামান্য ক্রটি-বিচ্যুতি বা অসাবধানতা শুধু তাঁদের বা তাঁদের পরিবারের পাঁচজনের দুঃখের কারণ হবে তাই নয়, এই দুঃখজনক অবস্থা ক্রমশঃ বহুমানের মধ্যে বিস্তৃতিলাভ করবে। সামান্য সচেতনতা, কিছুটা ঐচ্ছিক্যবোধ আমাদের নাগরিক ও সামাজিক জীবনকে সম্ভাব্য বিপর্যয় থেকে বাঁচাতে যথেষ্ট সাহায্য করবে। অতএব সেমন্তে আমরা নিজেরা সচেত হবো না কেন? নিছক কোন প্রতিষ্ঠান বিশেষের দীর্ঘস্থায়ীতায় সমালোচনা করে, মূল্যায়ন সময়কে অপ্রয়োজনীয় করে তুলে, কোন বাস্তব প্রয়োজনকে হেঁচাতে পারবো না।

প্রায় সব স্থল-কলেজেরই ঐশ্ব্যবকাশের ছুটি হয়ে গেছে বা যাচ্ছে, তাই বলছি এই দারুণ পরমে উন্মুক্ত বাস্তব থেকে আটকা কোন জিনিস কিনে খাবার লোভ আমরা যেন সংবরণ করতে পারি। টাকা না-দেওয়া যেমন'মারাত্মক অপরাধ, তেমনিই অপরাধ হলো এই সমস্ত আটকা খাবার থাওয়া। এ সম্বন্ধে ভূমি-আমি সকলেই যেন অভ্যস্ত সচেতন থাকি।

বিশ শতাব্দীর যুগনা থেকে আজ পর্যন্ত যে ক'জন মহিলা-সাহিত্যিক বাংলা সাহিত্যকে একনিষ্ঠভাবে দেখা করে তার স্বাধা বৃত্তি করেছেন, তাঁদের মধ্যে সহিত্য-সম্রাজ্ঞী জীবন্তা অহরুপা সেরা অন্ততমা পুরোধা। অহরুপা সেরা স্বর্গীয় কুসুম মুখোপাধ্যায়ের পোতী ছিলেন, সেই জন্তু, তাঁর

সাহিত্যাদেবার পেছনে ছিল বাংলার ও বাঙ্গালীর নিত্য সংস্কৃতি ও জীবনধারা। তাঁর সাহিত্যাদেবা ও বঙ্গেশপ্রেম, চারপরাশ্রয়তা, ধার্মিক ও সামাজিক শিক্ষা প্রণালীর ধারা ও কর্তব্যের প্রতি : অবিচলিত নিষ্ঠার উৎসঙ্গ ছিলেন ভূদেব মুখোপাধ্যায়। সেই অল্পই আমরা বলতে পারি যে, তিনিই স্বার্থ ভূদেব-শিক্ষা। গত ৬ই বৈশাখ পরিণত বরষে তাঁর মরলোক থেকে বিদায় গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে আমরা হারালাম এমন এক মহিলা-সাহিত্যিক, যার কৃতিত্বে আমরা গবিত।... তাঁর নব্বয় দেহ চিরশাস্তি লাভ করুক এই হোক আজ আমাদের অন্তরের গভীর প্রার্থনা।

আর একজন মনীষী পরম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে সম্প্রতি আমরা হারিয়েছি। তিনি কেবলমাত্র বাংলার নয়, সারা ভারতেরই ছিলেন গৌরব। এই মহান্ পুরুষ, সর্বজাতির শিক্ষক ঐতিহাসিক আচার্য বহুনাথ সরকার আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। তিতবে তার সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলা আছে তোমরা পড়ে।

এবারে তোমাদের চিঠির জবাব দিই।

স্বপন, কৃষ্ণা ও চন্দ্রা গঙ্গোপাধ্যায় (সোনারপুর)—তোমরা গরমের ছুটিতে কোথায় বাবে জিগেস করছ। আমার মনে হয় গরমের ছুটিতে কোথাও না গিয়ে বরং পুজোর ছুটিতে বেগ—কারণ এবার থেকে বার্ষিক পরীক্ষা তো পিছিয়ে গেছে। ডোরা গঙ্গোপাধ্যায় (চিত্তরঞ্জন)—তোমার স্বপ্নের হাতের লেখা চিঠি পেলাম, কিন্তু হু' একটি মারাত্মক বানান ভুল করেছ—দেটা হওয়া উচিত হয়নি। খনা ও ভ্রামল দেব (শিলং)—গরমের ছুটিতে তোমাদের ওখানে যেতে বলেছ, তা আমার মনে রইলো। সীমা মুখোপাধ্যায় (বালসহ)—শ্রীযুক্ত হুমায়ুন কবীর শিক্ষায়ত্নী কিনা জিগেস করছ। তিনি ভারত সরকারের শিক্ষাঙ্গণেরেই বৈজ্ঞানিক ও গবেষণামূলক ও বিশ্বরাষ্ট্রসংস্থার পক্ষ থেকে যে সকল শিক্ষাঙ্গণক্রান্ত ব্যবস্থা করা হবে, সেই সকল বিষয়ের এংং সংস্কৃতির ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রমন্ত্রী। আর অদ্যন্ত শিক্ষাঙ্গণক্রান্ত ব্যবস্থার দায়িত্ব রাষ্ট্রমন্ত্রী ডাঃ শ্রীমানীকে দেওয়া হয়েছে। সহস্রাংগ চৌধুরী (দমদম)—তোমার চিঠিতে যে সকল প্রশ্ন করেছ তা বিভাগের উপযোগী নয়। ইয়া, অশোককুমার সেন ভারত সরকারের পূর্ব স্বর্গাসাম্পন্ন আইনমন্ত্রী। এই স্বর্গাসাম্পন্ন তাঁকে সম্প্রতি উন্নীত করা হয়েছে। সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, স্বজাতা ও রূপা ভৌমিক, নীপক রায় (কোলকাতা), পণ্ডিতপাবন গঙ্গোপাধ্যায় (সোনারপুর), ইন্দুনাথ হাঙ্গরা (হাওড়া) ও লক্ষ্মণ সেন (পাটনা)—তোমাদের সকলের চিঠিই পেয়েছি। আজ এইখানেই শেষ করি।

প্রীতি ও শুভেচ্ছা ভেনো। ইতি—

ডোমাদের মঞ্জুদি

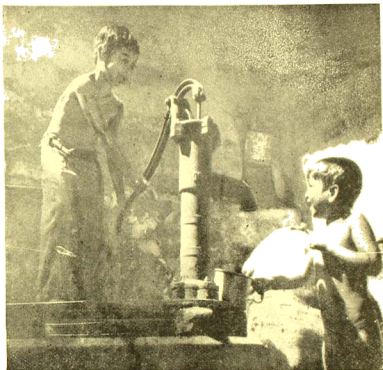
শ্রীমদীৱেন্দ্র সরকার কর্তৃক ১৪ বর্ষ চাট্টোজো স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত

ও ডংকর্তৃক প্রবু প্রেস, ৩০ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত

মূল্য : চল্লিশ নয়া পয়সা

7563
012/20

মৌচাক—আম্বাট, ১৩৩৭



ভল! ভল! ভল!!

কটো : শ্রীমতী বসু বাগচী



৩৯ বর্ষ]

আষাঢ়--১৩৬৫

[৩য় সংখ্যা

কাশীর পেয়ারা

শ্রীদীনেশ গঙ্গোপাধ্যায়

আহা কি জিনিষ ভাই, কাশীর পেয়ারা ।
যেমন মিষ্টি খেতে, তেমনি চেহারা !
কি নখর, কি রসালো, কি মধুর রঙ !
নরম মিষ্টি শাঁস তুলোর মতন ।

মালীর পাষণ প্রাণ, সে কি জানে হয়
শিশুদের লোভী-মন কত যে আশায়
চেয়ে চেয়ে এ গুলিরে চোখ দিয়ে গিলে !
কি এমন খতি হতো ছ'একটা দিলে ?

গাছগুলো আলো ক'রে কুলে কুলে আছে :
একটি পাইনা চেয়ে মালীটার কাছে ।

পাকাগুলো না-ই দিলে, ডাঙ্গাগুলো চাই
ক্লাসের আড়ালে বসে চুপি চুপি খাই :

বাড়ী নিয়ে যাই কিছু জমা করি ছাতে,
 শুয়ে শুয়ে মজা করে খেতে হবে রাতে
 ঘুমেও স্বপ্ন দেখি সে ডাঁসা পেয়ারা
 অহা কি মিষ্টি আর কি বাসা চেহারা ।

ফস্ করে দেয় জেলে আলোটা বেয়াড়া
 দেখবে ইঁদুর নয়, কানীর পেয়ারা

কুট্ কুট্ কুট্ কুট্ স্বপ্নে চিবাই
 ঘুমেই জাবর কাটি মুখে কিছু নাই :

রসিয়ে খাচ্ছি যেন চিবিয়ে চিবিয়ে

শুয়ে প'ড়ে আলগোছে আলোটি নিবিয়ে : স্বপ্নেই গাছে উঠি সাবধানে ভারি,
 ছুঁই সে রসালো ফল, হাতে নাড়িচাড়ি ;

হঠাৎ শব্দে কেউ ভাবে যদি রাতে
 বালিশ কাটছে বৃষ্টি ইঁদুরের দাতে

এদিক ওদিক চেয়ে টুপ ক'রে যেই
 একটি নিয়েছি ছিঁড়ে আর কথা নেই,

মালী আসে তেড়ে আর হাতের পেয়ারা

হাত থেকে পড়ে যায় দেখে সে চেহারা ।

ছি-ছি-ছি

পরিমল রায়

ছি-ছি-ছি আরে এ কি ?

বেড়াল দেখে ভয় পেয়ে কি

এক্কেবারে উঠলে গিয়ে ছাতে ?

মেক্স হামার টুপি ওটা—

তারই ওপর লাকিয়ে ওটা

লন্দীছাড়া নাগাল না পায় যাতে ।

চেহারা যে হয় না মালুম

পুঁথি বলে, “হালুম হালুম

যেই নেমেছ' আঁচড়ে দেব নাকে,”

মীস্থ ভয়ে আঁকড়ে টুপি

সেজেছে আঙ্গ বহুরূপী

প্রাণের ভয়ে ডাকছে বৃষ্টি মা'কে ।

বীরেশ্বর বিবেকানন্দ

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

৬০

বসেতে আলাসিন্ধা পেরুমাল এসে হাজির।

‘এ কি, কোথেকে?’ এগিয়ে গেল স্বামীজি।

‘সটান মাদ্রাজ থেকে।’

‘কি মতলব?’

‘অতি সামান্য।’ হাসিতে বিস্তৃত হল আলাসিন্ধা : ‘আপনাকে জাহাজে তুলে দিতে এসেছি।’

‘একা জগমোহনই যথেষ্ট ছিল—যথেষ্টেরও বেশি।’ স্বামীজি বললে সসম্মুখে : ‘জানো রাজপুতানার ও তাজিমি সর্দার। তাজিমি সর্দারদের মান জানানো? ওরা সভায়-দরবারে গিয়ে দাঁড়ালে স্বয়ং রাজাকেও উঠতে হয় আসন ছেড়ে। তারপর, জানো তো, খেতড়ির রাজার প্রাইভেট সেক্রেটারি। কিন্তু একবিন্দু জাঁক নেই শরীরে। বৃষ্টির জলের মতই অনাড়ম্বর। এমন তার সেবা আর পরিচর্যা যে লজ্জা হয় নিজের কাছে।’

বিদেশে যেতে এ লাগবে ও লাগবে কত জিনিস যে কিনে দিচ্ছে জগমোহন তার ইয়ত্তা নেই। এখন বলছে আলখাল্লা আর পাগড়ি সিন্ধের হওয়া চাই। তা যেমন-তেমন সিন্ধ নয়, একেবারে দামী প্রথম শ্রেণীর। তুমিও যেমন। সন্ন্যাসীর আবার ণ্ডাচুড়া কি—স্বামীজি আপত্তি করল—খানিকটা মোটা গেরুয়া কাপড় হলেই

যথেষ্ট। তা কি হয়। 'রাজার মত সাজাব তোমাকে।' বললে জগমোহন : 'তুমি তো নিজের পক্ষে যাচ্ছনা, তুমি যাচ্ছ ভারতবর্ষের হয়ে। ভারতের জাগ্রতাত্মা হয়ে। তুমি তো দীন দরিদ্র সম্রাসী নও, তুমি জ্যোতিষাৎ রবিরংশুমান, পূর্বদিগন্ত থেকে তোমার নবীন উদয়, সেই বেশেই সাজবে তুমি।'

কিন্তু কি নাম নিই। আগে ছিল সচ্চিদানন্দ, বিবিদিষানন্দ, এখন মহারাজের কথায় বিবেকানন্দ।

মাজাজে বালাজী রাও-এর ছেলেটি মারা গেছে, খবর পেয়ে মুষড়ে পড়ল স্বামীজি। ডাক্তার নাঞ্জু রাওকে সে সম্পর্কে লিখে : প্রভুই দিয়ে থাকেন, প্রভুই নিয়ে থাকেন, সুভরাং প্রভুরই জয় হোক। আমরা শুধু জানি কিছুই নষ্ট হয়না, সবই নিটুট থাকে, নিখুঁত থাকে। যাই আশুক না তাঁর কাছে থেকে শাস্ত মনে নিতে হবে মাথা পেতে। সেনাপতি যদি সৈন্যকে কামানের মুখে যেতে বলে, সৈন্যের তাতে নালিশ করবার কিছু নেই। বালাজীকে বোলো আমরা নির্বিবাদে মেনে নিয়েছি সে সেনাপতিত্ব।

বালাজীকেই লিখল সরাসরি : 'ভাই, দিনরাত তাঁর কাছে প্রার্থনা করো, আর বোলো, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।

কোন প্রশ্নে আমাদের নেই অধিকার।

কাজ করো, করে মরো, এই হোক সার।

ভাই, শোকার্তরাই ধন্ত, তারাই সান্ত্বনা পাবে। তারাই সমীপবর্তী হবে প্রভুর সিংহাসনের। দৃঢ়তা ও নির্ভরের সঙ্গে বোলো, ও ঐক্যপূর্ণমন্ত্ৰ। প্রভু তোমার হৃদয়ে শান্তি দিন এই দিবারাত্র সচ্চিদানন্দের প্রার্থনা।'

'এ জগতের সব কিছুই মূলতঃ সং।' বিহারীদাস দেশাইকে লিখে স্বামীজি : উপরের ডেউ যে চেহারারই হোক, তার গভীরতম দেশে শান্ত এক শান্তির ক্ষেত্র বিরাজমান। যতক্ষণ সেইখানে পৌঁছুতে না পারছি ততক্ষণই অশান্তি, বিকোভ-বিক্ষেপ। একবার সেই শাস্তিমণ্ডলে পৌঁছুতে পারলে ঝড়ার তর্জনগর্জন কিছুই করতে পারেনা। পাষণ্ড ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত যে গৃহ তার গায়ে একটা রেখাও পড়েনা।'

বিহারীদাসও শোক পেয়েছে। তাই লিখে স্বামীজি : ‘যে আঘাত আপনি পেয়েছেন তা আপনাকে বিরাট সত্তারই কাছাকাছি নিয়ে যাক, যিনি এলোক ও এলোক উভয় লোকেরই একমাত্র প্রেমাম্পদ। আর তাহলেই আপনি বুঝতে পারবেন, তিনিই সর্বত্র, সর্বকালে সর্বভূতান্তরাশ্রয়রূপেই তাঁর অধিষ্ঠান।

ওরিয়েন্ট কোম্পানির জাহাজ “পেনিনসুলার”—এ ফার্ট ক্লাশের টিকিট কাটা হয়েছে। আলাসিন্দা আর জগমোহন স্বামীজিকে তুলে দিতে এল। সব ব্যবস্থা নিখুঁত। খেতড়ির মহারাজা কোথাও এতটুকু কঁাক রাখেননি।

১৮৯৩ সালের একত্রিশে মে স্বামীজির জাহাজ ছাড়ল।

কত পুরোনো কথা মনে পড়ছে এখন। বেশি করে মনে পড়ছে বরানগর মঠের কথা, গুরুভায়েদের কথা—কে কোথায় আছে নাজানি। কোন বনে-পর্বতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। যেখানেই যাক আর থাক অস্তুহীন রহস্য যে ঈশ্বর তাকে পাবারই তাদের অনির্বাণ অন্বেষণ।

শুধু মেঝেতে বা একটা ছেঁড়া চ্যাটাইয়ে সবাই পড়ে আছে। মৃষ্টিভিক্ষা করে চাল নিয়ে এসেছে তাই স্নেহ করে একটা কাপড়ে ঢেলে সবাই খাচ্ছে। কি দারুণ কৃচ্ছ্র! রাতে উন্নয়ন ছেলে একটা কেরোসিনের বাতের উপর বসে রুটি সেকা, হাঁড়ি মাজা, পুকুর থেকে জল আনা। কিন্তু দারুণ দুঃখচরিত্রের সবেও পরম্পরের প্রতি কি ভালোবাসা। কি অপার্থিব আকর্ষণ।

কাক থেকে একবিন্দু সাহায্য নেবনা এই তখন পণ সকলের। অনিকেত ও স্থিরমতি হয়ে থাকব। সাধু ও সাপ পরের গর্তে বাস করে, নিজেদের জন্তে কোনো গৃহ নেই, আশ্রয় নেই, আসক্তি নেই। আমরাও তেমনি নিরাসী, নির্ভয়, অরশু।

রাখালের বাপ হারান ঘোষ এসেছে সেবার মঠে। গুপ্ত মহারাজ, মানে সদানন্দ স্বামী তাঁকে খুব সম্মান করে বসাল। বললে, ‘আপনার ছেলে তো সাধু হয়েছেন, আপনি কেন হননা?’

‘ওরে বাবা’, ভয়ে আঁতকে উঠলেন হারান। ‘বললেন, ‘আমি সাধু হব কি। আমি বোর বিভবশালী, আরাম-বিরামের ডিপো। আমাকে ভেল মাথিয়ে দেবে কে?’

আমাকে তোমাক সঙ্গে দেবে কে ? কে দেবে আমার গা টিপে ? তারপর তোমাদের মত এসব কচু ঘেঁচু খেতে পারব ? বাবা, পালাই, চোখের উপর তোমাদের এই কষ্ট দেখতেও বুক ফেটে যায় ।’ তাড়াতাড়ি রওনা হলেন হারান ঘোষ ।

সবাই বললে, ‘দাঁড়ান, একটা গাড়ি ডাকিয়ে দি ।’

‘দরকার নেই, পায়ে হেঁটেই চলে যাব । ছেলের হালচালটা একটু দেখতে এসেছিলাম, এসে হালে আর পানি পাচ্ছি না । তোমরা এত কঠোর সাধনা করছ আর আমি সামান্য পথ পায়ে হেঁটে যেতে পারব না ?’

তখন বরানগর বাজার থেকে গরানহাটার চৌমাথার গাড়ি ভাড়া এক আনা, আর যদি গাড়ির ছাদে বসে যাও, তা হলে তিন পয়সা ।

একদিন অমনি কোচবাস্ত্রে চড়ে যাচ্ছে নরেন । খালি পা, ময়লা কাপড়, কৌচা খুলে গায়ে জড়ানো, চম্চড়াড়ার মত দেখতে, কিন্তু দিব্য দীপ্তিতে স্নান করা । বাগবাজারের পোলের কাছে গিরিশ ঘোষের ভাই অভূলের সঙ্গে দেখা ।

নরেনের পোশাক দেখে চমকে উঠল অভূল । ‘এ কি, কি হল ?’

নরেন বললে, ‘আমার মা মারা গেছে ।’

‘বলো কি ? কবে ? কি অসুখ করেছিল ?’

‘আমার মা নয়, আমার মারা মরে গেছে ।’ নরেন হেসে উঠল : ‘নিষ্টেভাগ্য পশি বিচরতাং কো বিধিঃ কো নিবেধঃ ?’ যে মায়ার বন্ধন কাটিয়ে ফেলতে পেরেছে তার পথইবা কি, বিপথই বা কি । কি তার নিয়ম কি বা তার বারণ ?

সে কি কথা । এই সেদিনের ডেঁপো ইয়ার, দিবি বড় লোকের ছেলে, উকিল হতে যাচ্ছিল, হঠাৎ তার এই ভীত বৈরাগ্য ? এত ভীত যে দিবা দিক হ’ল নেই । খালি পায়ে খালি গায়ে গাড়ির কোচবাস্ত্রে চড়ে চলেছে । হুজনেই তো যেতুম ঠাকুরের কাছে । হঠাৎ ওর এই অবস্থা আর আমি কিনা সামান্য এক হাইকোর্টের উকিল । কিন্তু কি করব, তিনি যেমন করান তেমনি করি । নরেনকে দিয়ে নরেনের কাজ, আমাকে দিয়ে আমার । আমি তো আর নরেন নই !

শরীরে আর সজ্জা হচ্ছেনা বৈরাগ্য, বহন করা যাচ্ছেনা আর কষ্টের গন্ধমাদন । অনেকেই মুখ স্নান হয়ে উঠেছে । তার উপর বাড়ি থেকে আসছে নানান সুরের

অনুন্নয়ন। নানান আরামের প্রলোভন। কেউ-কেউ ভাবলে ফিরে যাই, তুচ্ছ পরিমিত জীবনেই নিজের আয়তন খুঁজি। এখানে নিরবয়ব নিশ্চিহ্ন অন্ধকার ছাড়া আর কী প্রাপ্তি, কী ভবিষ্যৎ? প্রাণহীন, প্রতিঘনিহীন স্তব্ধতার সমুদ্রই কি ঈশ্বর? কী হচ্ছে শিবরাত্রি এই দুঃসহ কষ্টের বোঝা টেনে, অনাহারে অনিদ্রায় নিরুত্থান আসনে বসে জপধ্যান করে? দ্বার কি কখনো খোলে? খোলে তো তার কত দেরি?

শশী বললে, 'নরেন, আর তো পারিনা সহিতে। এ তুমি কোথায় সকলকে নিয়ে এলে, কোন শোকাবহ মৃত্যুর গহ্বরে?'

নরেনের মুখ মেঘাক্রান্ত আকাশের মত গভীর। বললে, 'শশী, একখানা বইবেল দে।'

শশী বাইবেল এনে দিল।

বাইবেলটা খুলেই সহসা এক জায়গায় আঙুল রাখলে নরেন। বললে, 'পড়, কি আছে এখানটায়?'

শশী পড়ল। 'লাঙলে একবার হাত দিয়ে আর পিছন ফিরে তাকানো চলবেনা। ল্যাঙলে হাত দিয়েও যে পিছন ফিরে তাকায় তার ফসল হয়না।'

'কী বলতেন ঠাকুর?' লাফিয়ে উঠল নরেন। 'বলতেন, যে খানদানী চাষা শত অজ্ঞা হলেও সে চাষ ছাড়েনা। এক ক্ষেপ বৃষ্টি হয়নি বলেই তোর চাষবাস বন্ধ করে দিয়ে দোকানপাট করবি? এক ডুবে রক্ত না পেলেই কি বলবি সমুদ্রে রক্ত নেই?'

সেই বজ্রভরা আশার মধ্যে সবাই উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল।

'কি হয় এক জন্ম যদি এমন দরজায় করাঘাত করতে-করতেই কেটে যায়, দেয়ালে মাথা কুটতে-কুটতে? কত জন্ম গিয়েছে এর আগে, না হয় আরো একটা গেল। সংকল্পের ধনেই আমরা বিস্তবান, আরেকটা জন্মের অপব্যয়ে কি এমন এসে যাবে আমাদের? ডুব যখন দিয়েইছি তখন দেখেই যাইনা কোথায় সেই তল-অতল রসাতল!'

অভয়মস্ত্রের, আশ্বাসমস্ত্রের প্রতিমূর্তি নরেনের দিকে সবাই তাকিয়ে রইল একদৃষ্টে।

‘নে, পড় পড় আবার এ জায়গাটা।’ বাইবেলের আরেক পৃষ্ঠা খুলে ধরল নরেন। ‘সমস্ত জগৎ যদি লুপ্ত হয়েও যায় তবু আমি আমার পথ ছাড়বনা। সমস্ত পরাকৃত মানুষ যদি তার আশ্বস্ত্রের বিবরে গিয়েও আশ্রয় নেয়, আমি একা সন্ন্যাসী হয়ে থাকব।’

‘তোমার সঙ্গে সঙ্গে আমরাও।’ সবাই বলে উঠল একবাক্যে।

‘কি, কৃষ্টি হয়নি সত্ত্বেও আরেকবার চাষ করবি,’ হাসল নরেন, ‘না দোকান দিবি?’

‘দ্বিতীয়বার চাষ করব।’

‘সহস্রবার চাষ করব। পাথর বিদীর্ণ করে ফোঁটাব তৃণাকুর।’

ডেকে দাঁড়িয়ে স্বামীজি তাকাল তটভূমির দিকে, তার ভারতবর্ষের তটভূমি। তার মহিমময় ভারতবর্ষ, তার পরাধীন পরপদপীড়িত ভারতবর্ষ। একদিকে সে কত ধনী আবার আরেকদিকে সে কত দুঃস্থ কত দুর্গত। একদিকে সে কত উজ্জ্বল, আরেকদিকে সে কত নির্জীব। মাথায় তার সোনার মুকুট পায়ে তার দাসঘের শৃঙ্খল। ভারতবর্ষ ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারছেন না স্বামীজি। ভারতবর্ষের প্রতিষ্ঠাই তার একমাত্র স্বপ্ন।

আমি কি পারব? প্রভু কি আমাকে এ সাধনের যোগ্য করে তুলবেন?

(ক্রমশঃ)

কলিকাতার ময়দানে ষ্ট্যাচু.

কলিকাতার ময়দান অকলে এখনও ইংরেজ লর্ডদের অঙ্কন ষ্ট্যাচু ছড়িয়ে আছে বীরত্ব ও ধর্মাত্মার নিদর্শন হিসাবে এখানে-ওখানে। এই স্মৃতিস্তম্ভের মধ্যে কতকগুলির নাম হচ্ছে—লর্ড ক্যানিং, লর্ড হার্ডিঞ্জ, লর্ড লরেল, লর্ড অক্লামণ্ড, লর্ড বেপীরার অব ম্যাগডালা, লর্ড রবার্টস, লর্ড ক্রালডাউন, লর্ড ক্রিচনার, লর্ড মিচেল, লর্ড রিপন, লর্ড ডাকবিন, লর্ড মেয়ো, লর্ড কারমুন প্রভৃতি।



সদাশিবের অস্ত্রিকাণ্ড অনুদ্বিতীয় বহুশ্লোকপার্শ্বায়

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

পরদিন ভোরবেলা, তখনও সূর্যোদয় হয়নি, দুর্গের লোহকাট একটু ফাঁক হল। ভিতর থেকে বেরিয়ে এল সদাশিব আর একপাল ছাগল। কাট আবার বন্ধ হয়ে গেল।

সদাশিবের গায়ে ছেঁড়া ময়লা জামা-কাপড়। তার ডান হাতে পাঁচনবাড়ি; পাঁচনবাড়ির মুঠ লোহা দিয়ে ঝাঁকানো। বাঁ হাতে মারকেল ছোবড়ার লম্বা দড়ি গোল করে পাকানো। সে একবার শিহন ফিরে দুর্গবারের পানে তাকালো, তারপর ছাগলের শিহন পিছন চলল।

দুর্গে গোটা কুড়ি ছাগল থাকে, কারণ মা জিহাবান্নে ছাগলের দুধ খান। একটা ছোট ছেলে রোজ ছাগলগুলোকে চরাতে নিয়ে যায়। কিন্তু আজ সে আসেনি, তার বদলে সদাশিব ছাগল চরাতে বেরিয়েছে।

ছাগলগুলো লাফাতে লাফাতে ম্যা ম্যা করে ডাকতে ডাকতে চলল। দুর্গের কাছে-গিঠে ঘাস বা খোপকাড় নেই; পাথর ছড়ানো মাটি। তারপর ক্রমে ঘাস গন্ধাতে শুরু করেছে; সমতলে নেমে এলে শুধু খোপকাড় নয় ছুঁচাচটে বড় গাছও দেখা যায়। বর্ষার জলে সব সবুজ হয়ে উঠেছে। ছাগলগুলো সেই জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে চরতে লাগল।

সূর্য উঠল। আজ আকাশে বৈশি বৈশি নেই। সদাশিব ছাগলের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে, আর তার চোখ দুটো চারদিকে ঘুরছে। যেদিক থেকে কাল দুপুরবেলা রহাভী ঘোড়ার চড়ে এগেছিল, সেই দিকে

তার চোখ বার বার যাচ্ছে, কিন্তু সেদিকে এখনও মাহুঘের শাড়াশখ নেই। পেছনে দুর্গের কালো মূর্তি আকাশের গায়ে মাথা তুলেছে। সব ঘিরে শুয়ে আছে উচু-নীচু পাহাড়ের সারি। নিভৃত সকাল।

ক্রমে বেলা বাড়তে লাগল। ছাগলেরা কোপকাড় খেতে খেতে এগিয়ে চলেছে, সদাশিব তাদের পিছনে আছে। দু'একটা ছাগল যখন এদিক এদিক ছিটকে পড়ছে, তখন তাদের তাড়িয়ে দলে ফিরিয়ে আনছে। সদাশিব গায়ের ছেলে, ছাগল চরানো তার কাছে নতুন নয়। ছাগল চরাতে চরাতে সে বেশ পানিকটা দূরে চলে এল।

মাঝে মাঝে রোত্র স্ট্রেট বেরুচ্ছে আবার মেঘের আড়ালে ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে; পাহাড়ের গায়ে মেঘের ছায়া ওঠা-নামা করছে। মাটিতে অদৃশ্য পাথরের টুকরো পড়ে রয়েছে, তার মধ্যে চক্‌মকি পাথর আছে; শেগুলো দর্বেই আলো লেগে ঝক্‌মক করে উঠছে। সদাশিব এক টুকরো হাড়ির মত চক্‌মকি পাথর হাতে তুলে নিয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখল, তার মূখে একটু হাসি স্ট্রেট উঠল। সে হাড়িটা কোমরে গুঁজে নিয়ে আবার ছাগলের পিছনে চলল।

দুর্ঘ মাথার ওপর উঠেছে। সদাশিব ছাগলের পাল নিয়ে দুর্গ থেকে প্রায় ক্রোশখানেক দূরে এসে পড়েছে, এমন সময় পাহাড়ের দিক থেকে আগোঁচাল জুনে সে কান খাড়া করল। আগোঁচাল নয়, আগুৱাভের প্রতিক্রিয়া। গ্রীষ্মকালে শুকনো ঘাসের ওপর দিয়ে যখন দুপুর বেলার গরম হাওয়া বয়ে বাচ, তখন যে-রকম শব্দ হয় সেই রকম শব্দ। বিজাপুরের সাত হাজার কোষ আগছে। এখনও তাদের চোখে দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু তারা আসছে।

আরও খানিকক্ষণ পরে তাদের দেখা গেল। ঐ দূরে পাহাড়ের একটা কাঁক থেকে পিল্পিল্প করে বেরুচ্ছে! আগে আগে আসছে বোড়, সপ্তাহের দল, তার পিছনে পদাতিক; তার পরে কুড়িটা গরুর গাড়ীর ওপর কুড়িটা কামান। প্রত্যেক গরুর গাড়ী টানছে আট মশটা বলন; তারপর আরও অগুনতি গরুর গাড়ীতে তাঁবু বসন আরও কত কি।

এক দলে এত মাহুঘ সদাশিব জীবনে কখনও দেখেনি। সে চোখ গোল করে তাকিয়ে রইল, তার বুক দুধদুধ করে উঠল। সে মনে মনে মা জুবানীর নাম স্মরণ করল, তারপর ছাগলগুলোকে একটা কোণের মধ্যে জড়ো করে চুপটি করে বসে রইল।

* * *

বেলা তিন প্রহরে বিজাপুরী নৈস্ত তোর্ণী দুর্গের সামনে থানা দিয়ে বসল। দুর্গের কাছে পেলনা, কারণ দুর্গে যদি বন্দুক থাকে তার পাল্লার বাইরে থাকাই ভাল; দুর্গ-দ্বার থেকে তিনশো গজ দূরে চক্রাকারে ঘিরে বসল। অদৃশ্য তাঁবু দেখতে দেখতে খাড়া হল; তাদের মাঝখানে সেনাপতির

প্রকাণ্ড শিথির। চারদিকে লোক লম্বর হকুম-বরদার খানসামা শিল্পিল করিতে লাগল। কড়-কড়, কড়, কড়, শব্দে নাকাড়া বেধে উঠল। ছাউনির শিছন দিকে বাহুচিখানা, সেখানে সাত হাজার সিপাহীর রাহা চড়ল।

সেনাপতির শিথিরের সামনে দিওয়ান পাতা হয়েচে; পুরু গালিচার ওপর বড় বড় তাকিয়া। লিহাকৎ খাঁ তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসে গড়গড়া টানছেন। তিনি বয়স্ক ব্যক্তি, ঝাঁহু সেনাপতি। গড়গড়া টানতে টানতে তিনি দুর্গের দিকে তাকিয়ে আছেন। দু'জন পার্শ্ব হাঁটু মুড়ে তাঁর সামনে বসে আছে। সেনাপতি ক্লান্ত, মাঝে মাঝে দু'একটা কথা বলছেন।

সেনাপতি লিহাকৎ খাঁ দুর্গের দিক থেকে চোখ নামিয়ে বললেন, 'পাহাড়ী ইদুর খাচার দর্য পড়েছে, পালাতে পারেনি।'

একজন পার্শ্ব বললেন,—'পালাবার সময় পায়নি। পালালে কিম্বার দরজা খোলা থাকত।'

সেনাপতি বললেন,—'ও থেকে কিছু বলা যায় না। শিবাজী তখনক ধূর্ত, দু'জন লোককে কিম্বার রেখে বাকি সকলকে নিয়ে পালাতে পারত। কিন্তু পালায় নি; দুর্গেই আছে। আমি চরের মুখে থবর পেয়েছি।'

অন্য পার্শ্ব জিজ্ঞাসা করলেন,—'আর দেই বেইমান ঘোড়া-চোরটা?'

সেনাপতির মুখ লাগ হয়ে উঠল, তিনি বললেন,—'সে হারামের কুস্তাটা শিবাজীর গুলচরই বটে, কাল দুপুববেলা কিম্বার এসেছে। শিবাজী থবর আগেই পেয়েছে, কিন্তু লুটের মাল নিয়ে পালাবার সময় পায়নি। এখন আর হবে কোথায়? সবাইকে একসঙ্গে ভোপের মুখে উড়িয়ে দেব।'

এই সময় একজন জেয়ান ফৌজদার এসে সেলাম করে দাঁড়াল। বলল,—'হজরৎ, বারুদের পিশে ছাউনির শিছন দিকে কানাং ঢাকা দিয়ে রাখা হয়েছে। কামানগুলো এখনও গরুর গাড়ী থেকে নামানো হয়নি। এখন কি করতে হবে হকুম করুন।'

সেনাপতি পশ্চিম আকাশের দিকে তাকালেন; সূর্য্যোদয়ের বৈশিষ্ট্যের নেই। তিনি বললেন,—'আজ সন্ধ্যা হয়ে এল। কামান গরুর গাড়ী থেকে নামাবার দরকার নেই। কাল সকালে দুর্গের সামনে কামান বসাব। আজ আর কোনও কাজ নেই, তোমরা আরাহম করো গিয়ে। রায়ে যেন পাহারা পুরানকর থাকে।'

'জো হকুম।' ফৌজদার সেলাম করে চলে গেল।

সেনাপতি কিছুক্ষণ বসে গড়গড়া টানলেন; তারপর হঠাৎ পানের দিক থেকে মিহি গলার ম্যা ম্যা শব্দ শুনে চম্কে উঠলেন। তার সঙ্গে সিপাহীসেব হাসির হুন্স। শব্দটা তাঁর দিকেই এগিয়ে আসছে। তিনি চোখ পাকিয়ে তাকালেন। কী ব্যাপার!

অন্নকণ পরেই দেখা গেল, দুই সারি তাঁবু মাঝখানে দিয়ে এক পাল ছাগল আসছে, তাদের পিছনে একজন সিপাহী একটা ছোট ছেলেকে কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে আসছে। তাদের আশেপাশে একদল সিপাহী হাসতে হাসতে আগছে। ঠাবুতে ছাগলের পাল! বজা মেঘবার জন্তে সিপাহীরা দখে চলেছে।



এত দারুন নিয়ে তুই এই জঙ্গলের ভিতর লুকিয়ে বসে কি করছিস ?—চল! আমাদের সঙ্গে

বে-সিপাহী দমাশিবেব কোমরে ছাগল-দড়ি বেঁধে নিয়ে আসছিল, সে সেনাপতির সামনে এসে দেলাম করে দাঁড়াল। সেনাপতি বললেন,—‘কাণ্ডটা কি? এ ছেলোটো কে? এত ছাগল কোথেকে এল?’

সিপাহী বলল,—‘হুজুরং, এই ছেলেটা ছাগলগুলোকে নিয়ে ছাউনির পশ্চিমদিকের জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে ছিল। যা যা শব্দ শুনে আমি গিয়ে ওকে ধরেছি।’

‘সাবাস!’ সেনাপতি তাঁর বড় বড় চোখ সদাশিবের দিকে ফিরিয়ে যেটা গলায় বললেন,—‘তুই কে রে?’

সদাশিব ভী়া করে কঁপে ফেলল।

যে সব সেপাহী মজা দেখতে এসেছিল তারা হো হো করে হেসে উঠেই আবার চুপ করল। সেনাপতির সামনে হানলে গোতাকি হয়।

সেনাপতি দেখলেন ছেলেটার বয়স চৌদ্দ পনেরোর বেশী নয়। তাঁর সামনে এসে খুব ভয় পেয়েছে। তিনি গলার আগুয়াজ একটু মরম করে বললেন,—‘ভয় নেই। তুই ছাগল কোথায় গেলি?’

সদাশিবের কাঁচা একটু কমল। সে বলল,—‘দুর্গের ছাগল। আমি চরাই।’

সেনাপতি তখন তাকে ভেরা আয়ত্ত করলেন,—‘তুই দুর্গে থাকিস?’

সদাশিব বলল,—‘হ্যাঁ।’

‘শিবাজী দুর্গে আছে?’

‘হ্যাঁ, আছে।’

‘আর কে আছে?’

‘আরও দু’শো তিনশো লোক আছে।’

‘কাল বাইরে থেকে দুর্গে কোনও লোক এসেছিল?’

‘আমি জানিনা। আমি ভোর বেলা ছাগল চরাতে বেরই। সম্ভাব্যে দুর্গে ফিরে যাই।’

‘আজ ফিরে যাস নি কেন?’

‘ফিরে যাচ্ছিলাম এমন সময় তোমরা এসে পড়লে। আমি ভয়ে কোঁপের মধ্যে লুকিয়ে রইলাম।’

সদাশিবের আকার-প্রকার দেখে সেনাপতি লিয়াকত খার বিশ্বাস হল যে সে সত্যি কথা বলছে; তাঁর সামনে বিধো কথা বলবে এত বুদ্ধি তার নেই। তিনি তখন সিপাহীকে বললেন,—‘ওর কোমরের দড়ি খুলে দাও।’

দড়ি খোলা হলে সদাশিব দড়ি আর লাঠি হাতে মাটিতে বসে আবার কামতে শুরু করল। সেনাপতি বললেন,—‘অবার কি হল?’

সদাশিব বলল,—‘আমি দুর্গে ফিরে যাব।’

‘দুর্গে কিরে খাবি কি কবে ? দুর্গের দোর বে বন্ধ !’

‘আমার ঘে বজ্র ক্ষিমে পেড়েছে ।’

সিপাহীরা হেসে উঠল। সেনাপতিও একটু হাসলেন। বললেন,—এটাকে নিয়ে যা, কিছু খেতে দে। আর ছাগলগুলোকে বাবুচিখানায় পাঠিয়ে দে ।’

* * *

ঘে-সিপাহী সদাশিবকে ধরে এনেছিল সে তাকে বাবুচিখানার দিকে নিয়ে চলল।

যেতে জিজ্ঞাসা করল,—‘কি খাবি ?’

সদাশিব বলল,—‘বাজ্রির কটি আর চিকের চাটুনি ।’

বাজ্রির কটি আর তেতুলের চাটুনি ! সিপাহী হেসে উঠল। বলল,—‘কোফ্তা কাবাব খাবি না ?’

সদাশিব বলল,—‘সে কাকে বলে ?’

‘গোস্ত ! গোস্ত ! খাসনি কখনো ?’

‘না, শু খেলে জাত যায়। শু আমি খাবনা ।’

বিজাপুরী কোঁজে অনেক হিন্দু দৈন্তও ছিল ; তাদের আলাদা রান্নার ব্যবস্থা। সিপাহী সদাশিবকে দেইখানে নিয়ে গেল। খোলা জায়গায় উহুন জালিয়ে রান্না চড়েছে, অনেক টিকিয়ারী পাচক রান্না করছে। সিপাহী একজনকে ডেকে বলল,—‘সেনাপতির হকুম। এই ছেলটাকে খেতে দাও ।’

পাচক জিজ্ঞাসা করল,—‘এ কে ?’

সিপাহী বলল,—‘অত খোঁজে তোমার দরকার কি ? যা বলছি কর ।’ বলে সিপাহী চলে গেল।

সদাশিব একা। ছাগলগুলোকে অস্ত্র সিপাহীরা কান ধরে মুসলমানদের বাবুচিখানায় নিয়ে গেছে। সদাশিবের মনে একটু দুঃখ হল, কিন্তু কি করবে ? সে দড়িটা কোমরে জড়িয়ে নিল, লাঠিটা পাশে রেখে মাটিতে বসে এদিক ওদিক দেখতে লাগল। এটা ছাউনির পিছন দিক। কিছু দূরে ছুই দারি গরুর গাড়ীর ওপর মোটা মোটা কানান চাপানো রয়েছে, যেন তাল গাছের শুঁড়ি। ছুই দারির মাঝখানে দর গলির মত জায়গায় কানাং ঢাকা কুপোর মত জিনিস রয়েছে। দু’জন দাড়িওয়ালা চৌকিয়ার বল্লম কাঁধে গরুর গাড়ীর দারির দু’পাশে পাহারা দিচ্ছে। সদাশিব আশ্চর্য করল, কানাং ঢাকা জিনিসগুলি বাকসের পিণে। পাছে বৃষ্টি হয়, বাকস ভিলে যায়, তাই কানাং ঢাকা রয়েছে।

কিছুক্ষণ পরে পাচক সদাশিবকে খাবার এনে দিল। জোড়ারের মোটা মোটা কটি, তুরের ডাল, আর ডেলাকুচোর ভাজি, তাই সঙ্গে দি। সদাশিব পেট ভরে খেল।

তখনও রাত্রি ছয় মি, কিন্তু অন্ধকার ঘনিষে এসেছে। সদাশিব খাওয়া শেষ করে উঠে ছাউনির এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াতে লাগল। চারিদিকে লোক লম্বর হামাল পিয়ালি নিজেই নিজের কাজে ব্যস্ত। সদাশিবকে কেউ গ্রাহ্য করল না।

ক্রমে রাত্রি হল, চারিদিকে মশাল জ্বলে উঠল। প্রত্যেক তাঁবুতে ভারে ভারে খাবার বাছে, দিপাহীরা খেতে বসেছে। এই ফাঁকে সদাশিব রাত্রির মত একটা আস্তানা খুঁজতে বেরল।

যেখানে কাহানের গরুর গাড়ী দাখানো ছিল সেখান থেকে বিন-পচিশ গজ ঘুরে গান্ধী ফাল্গু তাঁবু আর কান্ধা পড়ে ছিল। সদাশিব তারই মধ্যে গিয়ে গুটিহটি পাকিয়ে শুয়ে রইল। আকাশে পঞ্চমীর চাঁদ পাতলা মেঘের ফাঁকে ফাঁকে দেখা বাছে। ওদিকে গরুর গাড়ির দু'শাশে দু'জন চৌকিদার টংল দিচ্ছে। সদাশিব পাচনবাড়িটা জড়িয়ে নিচে চোখ বুজে শুয়ে রইল। (ক্রমশঃ)

প্রজাপতির সাজ

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য

১
প্রজাপতির অঙ্গ জুড়ে'
রঙের বাহার চমৎকার ;
চন্মনিষে বাছে উড়ে,—
চোখ ধাঁধানো ঝলক্ তা'র।

২
বহুরা তার পরম মেছে
দেয় সাজিয়ে বোজ ভোরে ;
নইলে শু'রোপোকার মেছে
ইন্দ্রধনুর রঙ-ঝরে ?

৩
জাঁক-রানি বোব ঘাগুরা পরায়,
মুন্ডো-জরির পাড় তা'তে ;
কাঁচশোকারা গয়না বোগায়,
বেগুনি ক্ষিতে দেয় মাখে।

৪
অর্ণাপরী চুমুকি গাখে
ওড়না মাঝে পাছারি ;
পরায় কালো আখির পাতে
অঙ্গ-কাঞ্চল দিঙ-নারী।

৫
কমলা বধূব কোটো আনি'
মোমাছি ছোপ দেয় বুক ;
পদ্মকুঁড়ির পাপড়ি ছানি'
ভোমরা মাখায় তা'র মুখে।

৬
হলুদ বেটে টিপ পরালো
শিউলি-বোটার বুলবুলি ;
যেই ময়ুর নাচ দেখালো,
উড়লো রূপের ডেউ তুলি'!

॥ একতা ॥

শ্রীশুধীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

*

একদিন দুইটি বালক পথের ধারে খেলা করিতেছিল। এমন সময় তাহারা একটি ঘুড়ি কাটিয়া বাইতে দেখিল। ঘুড়ির লগ্না হুতা লুটাইয়া লুটাইয়া বাইতেছে। তাহাদের একজন উহা ধরিয়া ফেলিল। তখন আর একজন উহা কাড়িয়া ধইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহাদের কাড়াকাড়িতে শব্দ পৰ্বন্ত ঘুড়ি ও হুতা ছিঁড়িয়া টুকরা টুকরা হইয়া গেল।

তোমরা বালক দুটিকে নিশ্চয়ই বোকা বলিবে। একজন ঘুড়ি ও একজন হুতা, এই ভাবে তাহারা যদি ভাগাভাগি করিয়া লইত, কি সুন্দর হইত বল দেখি। তা না, আমি সব লইব, অর্থাৎ কিছুই পাইব না!

সংসারে থাকিতে গেলে সকলের সঙ্গে মিলিয়া-মিশিয়া থাকিতে হয়। সকলকে ভাগ দিয়া ভোগ করিতে হয়। পৃথিবীতে অস্ত্রের সাহায্য ছাড়া তুমি কি কখন বাঁচিতে পার? যেমনি তোমার যে তাইটি গুলিয়াছে, সে কত অসহায় ভাবিয়া দেখ। অস্ত্র সকলের সাহায্য পাইলে তবেই সে বাঁচিবে ও বড় হইয়া উঠিবে। তাহা হইলে বড় হইয়া সে অস্ত্রকে কেন সাহায্য করিবে না?

অস্ত্রের স্ব-স্ববিধার প্রতি অন্ধ হইয়া শুধু নিজের স্বপ্নের প্রতি দৃষ্টি দিতে নাই। পৃথিবীতে শুধু যে এক আছে তাহা নহে,—দুই, তিন, চার হইতে দশ পর্যন্ত ইহারা সকলেই আছে ও থাকিবে ইহাদের সকলেরই প্রয়োজন আছে। এখন একের সাধ্য যদি এমন পাগলামি চাপে যে পৃথিবীতে সে শুধু একাই থাকিবে, দুই দশ পর্যন্ত ইহারা সকলেই মুছিয়া যাক, তাহা হইলে শুধু এককে দিয়া আমরা কি করিব? এক ঘড়া মোহর পাইলে শুধু এক দিয়া গোপা চলিবে না! কিন্তু তাহারা দশ তাই যদি উপস্থিত থাকে তাহা হইলে মহত্ব, কোটি, অবুঁদ—সবই আমরা গুণিতে পারিব। হুতারং এককে যদি বাঁচিতে হয়, তবে দশ পর্যন্ত সকলকে আপনায় করিয়া লইয়া তবেই বাঁচিতে হইবে। বহুকে এক করাই একতা। সকলের প্রতি সকলের মমতাবোধকেই একতা বলে। দেখ, একটি কাঠের টুকরা পৃথিবীর কতটুকু উপকার করিতে পারে। উহা দিয়া বড় জোর একবেলা ভাত রাঁধা চলে। কিন্তু কাঠের টুকরার সহিত লোহার ফল যুক্ত করিয়া যে লাঙ্গল প্রস্তুত হয়, তাহা পৃথিবীকে ধন্যন্তে পূর্ণ করিয়া দেয়।

একতার শক্তি অসীম! বাহারা একতাবদ্ধ হইয়া বাস করে, কেহ তাহাদিগকে সহজে পরাস্ত করিতে পারে না। একতার বলই হানুয আজ শ্রেষ্ঠ জীব। বহু সহস্র বৎসর পূর্বে পৃথিবী ছিল অরণ্য ও জনাকুলমিতে পরিপূর্ণ। নৈতা দানবের মত অতিকাঁর ও হিংস প্রাণীরা তখন ধরনী জুড়িয়া বাস করিত। তাহাদের তুলনায় হানুয তখন ছিল সংখ্যার অল্প, দুর্বল ও অত্যন্ত অসহায়। তাহারা

ফল-ফুল খাইয়া জীবন ধারণ করিত ও তাহারই অধেবণে বিচ্ছিন্নভাবে বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইত। এই অবস্থার তাহাদের অনেককেই হিংস্র জন্তুর হাতে গ্রাস হারাইতে হইয়াছিল।

মাহুষ তখন আশ্চর্যকার জন্তু দলবদ্ধ হইতে লাগিল এবং হিংস্র জন্তু বেশিলাই পাছের ডাল দিয়া বা পাহাড়ের উপর হইতে বড় বড় পাখর ফেলিয়া সকলে মিলিয়া তাহাকে বধ করিত। এইভাবে দলবদ্ধ মাহুষ হিংস্রপরাগে জীবজন্তু ধ্বংস করিয়া ও জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া পৃথিবীর বহু অংশ বাসের উপযুক্ত করিয়া তুলিল। সেই আদিম যুগের মাহুষ যদি তখন একতাবদ্ধ হইয়া কবিয়া না পাড়াইত, তবে ধরাপৃষ্ঠ হইতে মানবজাতিকে সূপ্ত হইতে হইত। দলবদ্ধ হইয়া বিচরণ করিলে ইচ্ছামত কাজ করা যাইবে না, বা অন্তকে খান্তের ভাগ দিতে হইবে—এই সব ভাবিয়া আদিম মানবেরা যদি ব্যক্তি-কেন্দ্রিক বা পরিবার-কেন্দ্রিক হইয়াই বাস করিতে চেষ্টা করিত, তাহা হইলে এই পৃথিবী আগের মতই অজলাকর্ণ থাকিয়া যাইত। বহুকে এক করিয়া লইয়া তাহারা যে সমাজ গড়িল মানব-সভ্যতায় তাহার দ্বান অসীম। সমাজ ও সংগঠনের বলেই মাহুষ আজ এতবড় সভ্যতা গড়িয়াছে। কিন্তু এখন যদি আমরা পরম্পরের সহিত দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ লইয়াই থাকি, তাহা হইলে পৃথিবী আবার অরণ্যে পরিণত হইবে।

প্রকৃতির সর্বত্র যে আন্দর্ধ একতা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা তাবিলে অস্বাভাবিক হইতে হয়। বাতাসে অক্সিজেন ও কার্বন নামে দুইটি পদার্থ আছে। এই দুই পদার্থের জগতই বাতাস আমাদের এত প্রয়োজনীয়। মাহুষ ও পশু অক্সিজেন ছাড়া বাঁচিতে পারে না, এবং জীবনধারণের জন্তু গাছপালার চাই কার্বন। ইহারা কি ভাবে বাতাস হইতে যার যেটি প্রয়োজন সংগ্রহ করে, জান কি? মাহুষ ও পশু নিঃশ্বাসের সঙ্গে যে-বাতাস গ্রহণ করে, তাহা হইতে শুধু অক্সিজেনটুকু রাখিয়া কার্বন-সম্মেত বাতাস আবার তাহার বাহির করিয়া দেয়। গাছপালাও তাহাদের শাটার দ্বারা যের-বাতাস গ্রহণ করে, তাহা হইতে শুধু কার্বন রাখিয়া অক্সিজেনটুকু বাতাসের সঙ্গে ফেরত দিয়া দেয়। প্রকৃতির রাজ্যে এই একতা ও শৃঙ্খলা আছে বলিয়াই জীব বাঁচিয়া আছে। কিন্তু মাহুষ যদি প্রয়োজন নাই, তবু বাতাসের সমস্ত কার্বন পুঁজি করিয়া রাখে, তবে গাছপালা বাঁচিবে না। তাহাতে মাহুষেরই তো ক্ষতি হইবে! আবার গাছপালা যদি মাহুষের নিকট হইতে পুঁজি করিবার অভ্যাস শিখিয়া লইয়া বাতাস হইতে অক্সিজেন ধরা, করিয়া রাখিতে চায়, তাহাতে তাহার কোন লাভ নাই, কিন্তু অক্সিজেনের অভাবে মাহুষ ও পশুর প্রাণান্ত হইবে।

জীবজগৎ যেভাবে একতাবদ্ধ হইয়া অক্সিজেন ও কার্বন নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া লয়, উহাই আদর্শ একতা। মাহুষ যেদিন প্রকৃতির নিকট হইতে এই একতা শিক্ষা করিবে, সেদিন তাহার স্ব-শান্তির সীমা থাকিবে না এবং পরম্পরে হারানারি-কাটাকাটি করিয়াও মরিবে না।

॥ নববর্ষ-উৎসবে জাপান ॥

— শ্রীসূর্য্যংক ভট্টাচার্য —

‘অমিসোকা’ বলতে জাপানী বছরের শেষ দিনকে বুঝায়। নতুন বছরের প্রথম দিনের মতোই ‘অমিসোকা’ দিনটিও জাপানীদের কাছে উৎসবের ও অনন্দের। নববর্ষের ‘অ-সো-গাত-হু’ জাপানের জাতীয় উৎসব।

নববর্ষের ভোরে জাপানীরা কাছাকাছি নদী, পুকুর বা কূয়োতে ‘উগাকামিছু’র স্তম্ভে ভিড় করে। ‘উগাকামিছু’ বলতে বছরের প্রথম জল বুঝায়। জাপানীদের বিশ্বাস বছরের প্রথম জলের মধ্যে সারা বছর তাদের স্বাস্থ্য বজায় রাখার শক্তি রয়েছে। তাই তারা খুব ভোরে উঠে স্নান করে ভালো করে। তারপর পরিবারের সকলের সঙ্গে এবং পাড়াপড়ানীদের সঙ্গে করে শুভেচ্ছা বিনিময়। এর পর পরিবারের সকলে একত্র হয়ে উপাসনা করে। উপদ্রব্য পর সকাল বেলায় খাওয়া-পাওয়া করে সবাই পরে নতুন পোশাক। জাপানীদের পোশাকের নাম ‘কিমোনো’। ‘কিমোনো’র রকমারি রঙের বাহার সত্যিই দেখবার মতো! নতুন পোশাক পরে সবাই গোল হয়ে বসে। অবশ্য উৎসবের নিয়ম মতো বড়োরা বাগানে গিয়ে হাততালি দিয়ে জানায় নববর্ষের নবীন স্বর্ধকে অভিবাদন।

নববর্ষ-উৎসব উপলক্ষে জাপানীদের ভোজের বিশেষত্ব লক্ষ্য করার মতো। ভোজের প্রথম উপকরণ হচ্ছে পেয়ালি ভরা ‘টমো’ এবং মিষ্টি গন্ধদ্রব্য কটি। খাওয়া শুরু করবে প্রথম ব্যসে প্রবীণরা, তারপর একে একে ব্যসে ছোট বারা, তারা। তারপর আসে একের পর এক স্বাভাবিক বালক প্রকৃতি। প্রথমে আসে ‘জনি’। ‘জনি’ হচ্ছে একধরনের খোল এবং ‘জনি’ ছাড়া নববর্ষের ভোজ অসম্ভব। ভোজের প্রধান জিনিস হচ্ছে ‘মচি’, অর্থাৎ ভাতের কেক। চৌকো করে কাটা আর বিভিন্ন সজির সঙ্গে সেদ্ধ করা এই কেক।

‘মচি’ পূর্তা আর প্রানুর্ধের প্রতীক। জাপানীদের ধারণা ‘মচি’ শরীরকে বেশ গরম রাখে। নববর্ষ উৎসবের অন্তিম খন্ডের মধ্যে রয়েছে কালো বীন, বাদাম, শুকনো সামুদ্রিক উদ্ভিদ আর রকমারি চন্দ্রমল্লিকা গাছের পাতার ‘সেলাড্’। কালো বীন খুব সম্ভবত স্বাস্থ্যের প্রতীক। বাদাম জলকে নিশ্চিত করে। আর স্বপ্ন-শান্তির প্রতীক হচ্ছে ‘কমবু’, অর্থাৎ শুকনো সামুদ্রিক উদ্ভিদ। রকমারি চন্দ্রমল্লিকা গাছের পাতার সেলাডের হলুদ রঙ, খাওয়ার টেবিলকে রঙীন করে তোলে। তাছাড়া খাদ্য হিসেবেও এর কলর আছে। জাপানীরা স্বপ্নের উপাসক। তাই নববর্ষ ভোজের আসরকে রঙে রঙীন করে তুলতে তাদের চেষ্টার শেষ নেই।

এই স্তোত্রের আগে বা পরে পরিবারের সবাই একত্র হয়ে জাপানীরা কোন কাঠাকাছি মন্দির বা কোন পবিত্র স্থানে গিয়ে সারা বছরের ক্ষেত্র দৈবত্বের শুভেচ্ছা প্রার্থনা করে। জাপানী ভাষায় একে বলে 'হাত হু-বোদি'—অর্থ হচ্ছে প্রথম তীর্থযাত্রা।

উৎসবের আর একটি অঙ্গ হচ্ছে বাড়ীতে বাড়ীতে ঘুরে বেড়িয়ে শুভেচ্ছা জানানো। প্রত্যেকের সঙ্গে থাকে হৃদয় ছাপানো কার্ড। শুভেচ্ছা বিনিময়ের সঙ্গে এই কার্ড বিনিময়েরও রীতি রয়েছে। ব্যবসায়ী ও দোকানদারেরা কার্ডের বসলে সঙ্গে নিয়ে চলে নিজস্বের নাম ছাপানো এক বোকা তোললে। যে বছর চলে গেলে, সে বছরে পৃষ্ঠপোষকতার ক্ষেত্রে এক রকমের তোললে গিয়ে করা হয় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ।

'শিশিমেই' হচ্ছে নববর্ষ উপলক্ষ্যে এক ধরনের নাচ। যারা নাচে তারা সবাই মুখোশ পরে। 'শিশি' শব্দটির অর্থ হচ্ছে লাল মুখওয়ালা সিংহ। ঢোল ও বাঁশীর সঙ্গে তাদের মুখোশ-নাচ এবং কমিক নাচ খুব আনন্দের হয়।

নববর্ষে ঘুড়ি উড়ানোও ছেলের আর এক আনন্দের ব্যাপার। ঘুড়িগুলোও বিভিন্ন ধরনের এবং স্বাক্ষর স্বাক্ষর ছবি আঁকা। জাপানীরা এইসব ঘুড়িকে বলে 'তেকো-এজি'। সন্ধ্যার সময় 'কাতুতা-তুরি' খেলার আসর বসে। এ খেলা হলো কবিতা লেখা তাস খেলা। খেলা হয় মাত্র দু'শটি তাস নিয়ে। জাপানীরা এইসব তাসকে বলে 'হেফুনি ইগুহ',—এর অর্থ হচ্ছে একশ জন কবির একশটি কবিতা। একশটি 'ওয়ারাক'র সম্বলন এগুলো। 'ওয়ারাক' হচ্ছে নাম-করা কবির একত্রিত স্নেহ-এর (স্নেহল হচ্ছে একবারে উচ্চারণ করা যায় এমন শব্দ বা শব্দাংশ) কবিতা। প্রত্যেক কবিতাকে দু'ভাগে ভাগ করে লেখা হয়। শেষের দু'লাইন থাকে একটি তাসে আর বাকী লাইনগুলো থাকে অন্য তাসে। এই তাস খেলার মূল কথা হলো সব কবিতা-গুলোকে পূর্ণ করার জন্য দু'লাইন কবিতা লেখা তাসটি খোঁজা। মিল হলোই হুঁড়ে ফেলা হয় তাসটি। তাই প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বেশ জমজমাট থাকে খেলা।

এই উপলক্ষ্যে রাতের মশাল-মিছিলও আর একটি মেধার মতো জিনিস। নববর্ষ-উৎসব উপলক্ষ্যে সব জায়গায়ই এই মশাল-মিছিল হয়ে থাকে। টোকিও এবং অন্যান্য বড় বড় শহরে বিশেষ আড়ম্বরের সঙ্গে উদ্‌যাপিত হয় এই মশাল-শোভাযাত্রা। প্রত্যেক মশালযাত্রীই পরে থাকে প্রাচীনকালের জাপানী পোশাক।

এমনি করেই জাপানের দিকে দিকে বছরের প্রথম দিনটি কাটে মহা সধারোহে, আনন্দ-উৎসবের মধ্যে।

বিষয়-সঙ্কট

শ্রীঅবনীভূষণ চট্টোপাধ্যায়

পরীক্ষা তো দুয়ারে ছায়া হানি,
যাখান্দু লিখিবো কী ছাই ? কিছুই যে নেই জানি

কোন সে রাজা গাচ লাগালো পানিপথের ধারে ?
হলুদিঘাটে ভুল্লো যে কে ? চিনি নে হায়, তারে ।
মার্কোশোলো তেমন খেলা ? নামটি জানি শুধু ।
মুশোলিনী কার দ্রুহিতা ? কা'দের কুলবধু ?
এ্যাল্ভেত্রার অলন্তরা ভোঁরা ভোঁরা ধাগে ?
কোন সেনে লোক ছ'মাস ঘুমোয়, ছ'মাস ধরে' জাগে ?
আজব সাগর পারে কি দেই আজব বেশটি আছে,—
রাতে বেধার আলো জলে পাঁচপাদপ গাছে ?
সংবত্বেলের খনি আছে কছোনদীর কূলে ?
শিবেছিলাম সবই, এখন সেরেফ্ গেছি ভুলে' ।
দুর্ধ কেন দিনের বেলায় আলো জালায় মিছে ?
রাত্রি হ'লে যায় সে চলে কোন সাগরের নীচে ?
লমাও আর গদাগুকেই বিগ্ধ বলে নাকি ?
উটের গিঠে উঠলে পাখ: হয় ব্রুজি উটপাখী ?
কিখা ওরা ঘোড়ার মতো ভিন্নও পেড়ে থাকে,—
ভিন্ন ঘুটে যে বাচ্চা বেবোয় উটপাখী কর তাকে ?
মেশো পটে শিঞার সাথে মানী ডনের বিয়ে,
লিস্বনে, না বুদ্ধাবনে ? কেনেছি ঘুলিয়ে ।
বেবাক্ ঠাকী যগজ্জ, হায়, ইজুর যারে ডন,
হোল না ভাই, হোল না বে এবার প্রয়োজন ।
সারা বছর ঘুরে গেল, ঢের করেছি হেলা,
অনেক ঠাকি দিয়েছি ভাই, এসব তারই ঠালা ।
সময় গেলে শুধরে' নিতাম, বুদ্ধি ছিল ঘটে,
আর দেরি নেই, কী করি এই বিষয় নকটে ?

মিছে এখন পু'খিপস্তর ঘাঁটা,
কালীর কাছে শিরি মানি, পীরের কাছে পাঠা ।



হৃদয়ী খুশ

[উপন্যাস]

মেঘাচার্য

(পৃষ্ঠ-প্রকাশিতের পর)

হেমলিনী মস্তের বয়স প্রায় পঞ্চত্রিশ হবে। মোহারা গড়ন, স্নায়বর্ণা, দীর্ঘাঙ্গিনী। তাঁর মনে কি ক'রে এত ফসাঁ হোল, বেশ হৃদয়ী দেখতে কিন্তু।

মেঘোমালীর প্রণের উত্তরে মেঘোমালীর বলেন—হবে না কেন, যোগেশবাবু খুব ফসাঁ, দেখতেও খুব সুপুরুষ ছিলেন।...

শিনাকী শিবানীর উপর আরও চটে গিয়েছে। একঘণ্টার উপর ওরা ছিঁহরিহরবাবুর হোটেল কাটিয়ে এল—শিবানীর শিনাকীর সঙ্গে একটি কথাও বলে নি। এমনকি বেলার সম্পর্কে যে বেশ থাকতে তার দেখা হয়েছে কোনদিন তাও তার ব্যবহার থেকে বোঝা কঠিন। যেন শিনাকী সম্পূর্ণ অপরিচিত একটি ভিন্ন দেশের ছেলে, তার ভাষা শিবানী বোঝে না, বুঝতেও চায় না। বাহুর শিনাকীকে ডেকেছে, কিন্তু শিনাকীও চেয়ার ছেড়ে ওঠে নি। মনে মনে গর্জন করেছে শুধু—কথা বললো নাভো, ভারী হয়ে গেছে!

আবার গরুর গাড়ী চলে শব্বরপুরের দিকে। বালির উপর চাকা বনে যায়। ক্যাচর ক্যাচর শব্দ। মেঘোমালী ও হোসেনশাইদের কথাবার্তার শিনাকীর কান বাড়া হয়ে ওঠে।

—যোগেশবাবু কোন কলেজের প্রফেসর ছিলেন?

—কলকাতার কোন কলেজে যেন কাজ করতেন। ছেলেরা দেবতার মতো ভক্তি করতো যোগেশবাবুকে শুনেছি। শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে নাকি বোপ ছিল যোগেশবাবুর। পুলিশে ধরে নিয়ে যায় কলেজ থেকে একদিন। হাজতেই মাথা বান। খুব ভেজস্বী পুরুষ ছিলেন, লোকে বলে সাহেব জেলায় স্তম্ভি ক'রে মেরেছে যোগেশবাবুকে। সঠিক ধবর কেউ জানে না।

বেসোমশায়ের কণ্ঠস্বর নীচু হোতে আরও নীচু হয়। পিনাকীর কানে আসে তিস্তিমানি কথা—সব একদলে; কি জানি শিবস্বরূপিলার ওপাশে জ্বলে মাঝে মাঝে গুলি ছোড়ার শব্দ পাই। ঘনস্ত্রাম নাকি হরিদ্র আর দীননাথকে গত মাশে বেখেছে জ্বল থেকে বেরিয়ে আসতে।

—তাহলে হোটেলের ব্যবসা শুধু পুলিশকে ধোঁকা দেবার জন্তে?

—তাইতো মনে হয়।

—আবার কিছ্ বড় ভয় করে দাদার জন্তে—

কথাবার্তা বন্ধ হয়ে যায় হঠাৎ। উলটো দিক থেকে একটি বিচুলি বোঝাই গরুর গাড়ী আসছিল। সন্ধ্যা পথ, হু'পানে বালির সাহায্য উঠু হয়ে গিয়েছে। থাকা থায় গাড়ী চাকায় চাকায়। মাথায় মাথাঘ ঠোকাঠুকি পিনাকী কপালে আঘাত পায়, বাহুর চীৎকার ক'রে কৈদে ওঠে।---

—ইশ্! গাড়ীটার সর্বনাশ হয়ে গেল, ধুরোর ধিল ভেঙে গিয়েছে।

—চাকা বিশেষ যত্ন হয় নি কিছ্।

—নামো, নামো, সব নামো।

অতিক্রমে জামা, জুতো, কাপড়চোপড়, গামছা নিয়ে পিনাকী, বাহুর, বোসোমশায়, মাগীমা নেবে আসেন পিছন দিক থেকে।

ঘনস্ত্রাম সামনের দিকে বসেছিল। সেই আগে নেমে গিয়েছে চাকা পরীক্ষা করতে। বিচুলির গাড়োয়ান,—খালি গা, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, গলায় তুলসীর মালা, প্রোট উৎকলবাদী—ফ্যাল ফ্যাল ক'রে তাকিয়ে থাকে। সহকারী দ্বিগুণে ক্রমক বালক, পরনে ময়লা গামছা—গাড়ীর পিছনে পিছনে বিড়ি টানতে টানতে আসছিল। বিড়িটার শেষ টান দিয়ে ফেলে দেয় বালির মধ্যে। এগিয়ে আসে ঘটনাস্থলে। কোলা ঠোট ঝিষ দিয়ে চেটে বিয়লকণ্ঠে চোখ বুজে বলে—চকা ভাঙি গলা।

নিমেষের মধ্যে অধাককাও ঘটে যায়। ঘনস্ত্রাম ছেলেটার কান ধরে হিড়হিড় ক'রে টানতে টানতে নিয়ে আসে বেসোমশায়ের কাছে। শুক হয় উড়িয়া ভাবায় গালিবর্ষণ। পুরো তিন মিনিট ঘনস্ত্রামের মুখ-নিঃসৃত বিশেষগুলি নিবিবাসে হজম ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে ঘাড় হেঁট করে; বালির উপর পা দিয়ে ঝাঁচড় কাটে শুধু। দুই গাড়ীর বলস্বল্প সম্পূর্ণ উদাসীন, বেন কিছুই ঘটেনি, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রোমরম করে চলেছে। হু'পানের বোনের ছায়ায় বলস্বল্পের চোখের দৃষ্টি শান্ত, স্নিহ, কোমল বলে মনে হয় পিনাকীর কাছে।

ঘনস্ত্রামের মনের জালা শেষ হয় না সহজে। বড় কালা রাম, বিচুলির গাড়োয়ান—বগুপুরের মাগুনী, সহকারী বালক ভৃত্য ভোলানাথ—সবাই দাহুর প্রজা। বেসোমশায়ের আসপে খানিকটা নর তার গাড়ীর ছই থেকে খুলে ধুরোর গর্তটা কোন রকমে বন্ধ করে ঘনস্ত্রাম। গাড়ীতে চড়ে আর

বাওয়া চলে না। হেঁটেই যেতে হবে। পথ আর বেশী নেই। ঐ সামনে কোণটা পার হলোই দাড়র বাগানবাড়ী দেখা যাচ্ছে। পিনাকী, বাহুর হেঁটে চলে। মেনোমশাইও হেঁটে চলেন। মাসীয়ার পায়ে চটি, চটি পায়ে গরম বালির উপর হেঁটে চলা মূশকিল।

—মাসীয়া, তুমি গাড়ীতে বসে যাও। একজনের ভারে কিছু হবে না। এই গাড়োয়ান!
—পিনাকী চীৎকার করে। কাল রাত্তিরে শুনে পায় না, গাড়ী হারিয়ে যায়। বিচুলি গাড়ীর ধুয়ো লোহার, জগম হয় নি। ঘনশ্রাম শেষবার মনের ঝাল মিটিয়ে গালাগালি করে—সঁড়া, কিম্বিতি গাড়ী ভড়াইছে, চক্ষু বন্ধ করি—সঁড়ারো...

মেনোমশায় হেসে বলেন—ঘনশ্রাম, মাগুনী তোমার সখসী না?

শোকাবহিত দম্পতিটি বের করে ঘনশ্রাম হাণে। সলজ্জভকীতে মুখ ফিরিয়ে নেয়, কোন উত্তর দেয় না।

আর তিন মিন পরে পিনাকী ফিরে বাবে কলকাতা। দেশ থেকে চিঠি এসেছে। মা শিখেছে : মার চিঠির মতো বেলাও চিঠি দিয়েছে। বেলা কি ক'রে টের পেল পিনাকীর পুরীতে এসেছে। ঘনশ্রাম বোঝ চিঠি নিয়ে আসে পোস্ট-অফিস থেকে বিকেলবেলা। দাদু, কুমার বাহাদুরের চিকিৎসার ব্যাপারে আটকে গিয়ে আজ ক'দিন শহরেই আছেন।

ঘনশ্রামের হাত থেকে খামটা নিয়ে ছিঁড়ে ফেলে পিনাকী। তার নামে লেখা গাম। কেয়ার অব লিখে দিয়েছেন বাবা। বাবার ইংরেজী অক্ষরগুলো তো মন্দ নয়—বাবা কেন ইংরেজী শিখলেন না? শুধু সংস্কৃত, দীক্ষামা বলে, আজকাল সংস্কৃতে পাণ্ডিত্য থাকলেই চলে না। ইংরেজী ছনিয়ার মালিক, ইংরিজি ভাষা সারা ছনিয়ার চলে—সেই ভাষা শিখব না, শিখলে সমাজন্যের হানি হবে, এ ধারণা নিয়ে বসে থাকলে সারা জীবন মরিজ হয়ে থাকতে হবে, উন্নতি হবে না।

উন্নতি, উন্নতি মানে কি? কৈ দাদু তো ইংরেজি জানেন না, বড় জোর নামটা মই করতে পারেন ইংরেজিতে। দাদু কি করে এত টাকা আয় করেন? বাবা বলেন, ব্রাহ্মণের পক্ষে একমাত্র কাজ ব্রহ্মলাভ; ব্যবসা যদিবা চলে, চাকুরী করা ব্রাহ্মণের পক্ষে একেবারেই অস্বাভাবিক—মহদাঃসিদ্ধান্তে লেখা আছে, চাকরি করার অর্থ কুহুরের বৃত্তি অবলম্বন।

বাবার চোলে যে সব ছাত্র পড়ে—পড়ে কৈ? বেকীরজাগ সময় তো বেশি নশ্তি নেয়, ফুল তোলে, ঠাকুর পূজা করে, বাজারে যায়। কলমের আমগাছটার পিছনে গর্ত, গর্তের ওপারে আস-শেওড়া আর বেতের ঝোপ। বাবার প্রধান ছাত্র অনাথবন্ধুবা তরু যেথিয়েছিল—পিনাকী বরদার ওদিকে যেও না, ওখানে পেয়ী থাকে, বাড়ি মটকে দেবে। প্রথম প্রথম ভয়ে পিনাকী গর্ত পার হয়নি।

ঠাকুরমাকে জিগোস করছিল,—ঠাকুরমাও বলেছিল—আমশেওড়ার ভালে পেত্নী থাকে মতি কথ। আরও অনেকরই মুখে একই কথা শুনে পিনাকী সন্ত্রস্ত হয়েছিল। কিন্তু পেত্নীর ভয় ভেঙে গেল, যেদিন জানতে পারলো বাবার চাকেরা গর্তের ওপারে আমশেওড়ার আড়ালে লুকিয়ে লুকিয়ে তামাক খায়। ওরাও ঘরন ওগামনে বেতে পারে, তখন সেই বা কেন ভয় করবে ?

আগে সন্ধ্যা হলোই পিনাকী মায়ের আঁচল ধরে টানাটানি করতে লাগে। মা বিরক্ত হয়ে বলতেন—ও কি, আঁচল ছাড়, বুড়ো খাড়ী ছেলে—চারিপাশে লোক, তবুও ভয়। গভীর রাতে খড়মড় করে উঠে বসতো পিনাকী। মা ঘুমিয়ে আছে, জানালা খোলা—ঐ বৃষ্টি হাত বাড়িয়ে পেত্নী তাকে ধরল, মায়ের বুকের মধ্যে মুখ লুকিয়ে পিনাকী রাম নাম গণ করতো। ব্রহ্মঠাকুর বলতেন, রাহ নাঁহ জপ করলে ভূত-পেত্নী স্পর্শ করতে নাহস করবে না। মায়ের ঘুম ভেঙে যেত, গলা ওড়িয়ে মা বলতো কি বে, ভয় পেয়েছিল ? জানালার নিকে তাকিয়ে গে উত্তর দিত—হ।

পুরাতে আগার পর পিনাকীর লাহন বেড়ে গিয়েছে। বাড়িবেলার আর পেত্নীর ভয় করে না তার। এখন শুধু হয় স্বত্বকাটা, হামমো ভুতকে। ব্রহ্মদত্যিকে ভয় করার কারণ নেই—ব্রাহ্মণের ছেলেকে ব্রহ্মদত্তি তো কিছু বলবে না।

ভোর হোতে না হোতেই পিনাকীর ঘুম ভেঙে গিয়েছে আজ। পাশেই শুয়ে অকাতরে ঘুমিয়ে আছে বাহুর। বাহুরকে ঠেলে তোলো পিনাকী। এই বাহুরমা,—ওঠ, ওঠ, শিবধরপালা যাবি না ?

বাহুরের সঙ্গে ঠিক ছিল—বোর হোতে-না-হোতেই তারা দু'জনে উঠে পড়বে, অভিবান করবে শিবধরপালার জগলে। ছোট্ট একটি নদী পার হতে হবে। জেলেশের নৌকো আছে। নৌকো একটা খুলে নিলেই চলবে। না হয় দুটো পরমা বেবে বামের ভাই মদ্যকে। নদীর ধারে টোঙা বেঁধে আজকাল মহা ভয়ে থাকে, রাত থাকতে উঠে জাল কেলে মাছ ধরে। ভোর বেলায় ঝাঁকা মাঝায় শহরে মাছ চালান নিয়ে যায়। যদি সেবে ফেলে মরা, না হয় দুটো পরমাই থরত করবে তারা। কৌচার খুটে পরমা বাঁধা আছে পিনাকীর, শোবার আগেই বেঁধে রেখেছে।

—মোসামশায় যদি জানতে পারেন, তাহলে খুব বকাবকি করবেন কিন্তু। কতক্ষণ লাগবে যেতে-আসতে ?

পিতার ক্রোধের সন্তাবনা মনে করিয়ে দেওয়ার বাহুরের উৎসাহ নিবে আসে খানিকটা। মাথা চুলকে সে বলে—তা ঘণ্টা দুইতো লাগবেই।

—তাহলে থাক। ঘনজামকে সঙ্গে নিয়েই যাওয়া ভাল, তাহলে আর মোসামশায় আপত্তি করবেন না।

কয়েক মুহূর্তের ক্ষণ হু'লনে পাশাপাশি দাড়িয়ে থাকে। চারিদিকে শুধু বালি আর বালি, মাঝে মাঝে ফসী-ঘনঘনর জঙ্গল। অনেক ভাল গাছ ইতস্ততঃ ছড়িয়ে আছে—অস্তান্ত গাছপালা বেশীরভাগ দাহুর লাগানো।

স্বর্ধ উঠবার আর দেরি নেই।

বাহুর বলে—ভই ভাখ, পূব দিকের আকাশের রঙ লাল হয়ে উঠেছে। এগুনি লাক দিহে উঠে পড়বে স্বর্ধ। এই সময় স্বর্গদ্বারে থাকতে পারলে খুব ভাল হোত। দেখা যেত, সাতঘোড়ার রথ হাঁকিয়ে স্বর্ধ চলেছে—এক একটা ঘোড়ার এক এক রঙ।

শিনাকী বাহুরের কথা মুগ্ধচিত্তে শুনছিল, ব্যগ্রকণ্ঠে বলে—তুই সেপেছিস ?

—দমুদু'য়ের মলের ভিতর থেকে লাক্‌দিয়ে উঠতে দেখেছি, কিন্তু সাত ঘোড়ার রথ দেখতে পাই নি—স্বা বলে, অনেকদিন ধরে স্বর্ধের স্তব পাঠ করবার পর তবুই নাকি দেখতে পায় লোকে—কোটর মধ্যে একজন।

—দাহুর নাকি স্বর্গদ্বারে পাকা বাড়ী আছে ?

—আছেই তো !

—তা দেখানে উঠগাম না কেন ?

—এ ঘনশ্রামটাই যত নঠের মূল। কোথা থেকে ভাড়াটে এনে জুটিয়েছিল, চোব শুধু কি—ঘুম বেয়ে থাইদিসের রুগী ঢুকিয়েছে ঘনশ্রাম।

—থাইদিস !

শিনাকীর চোখে ভীতি, বিস্ময় ও উৎকর্ষার সমাবেশ। অনেকের কাছে শুনেছে—একবার থাইদিস হোলে আর সহজ সাংরে না, তিলে তিলে মৃত্যুবরণ করতে হয়। গ্যাললিং থাইদিস হোলে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই শেষ। গ্যাললিং—গ্যাললিং: মানে ঘোড়মোড়, রেসের ঘোড়ার মতো দৌড়তে দৌড়তে মৃত্যু এসে উপস্থিত হয়। পুরীতে বেশীরভাগ লোক যারা স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে আসে, তারা থাইদিসের রুগী—চোব পাকিয়ে বলে যায় বাহুর।

তাহলে কি হবে ভাই ? দাহুর বাড়ীটাই নষ্ট হোয়ে গেল ?

বাহুর বিজ্ঞের মতন মাথা নেড়ে বলে—দুব, তা কেন, চুনকাম ক'রে ফিনাইদ দিয়ে ধুয়ে নিলেই হোল। কিন্তু হোলে কি হবে, বার বড় ভয়—ও বাড়ীতে আর কিছুতে মা ঢুকবে না।

—আমার আর এবার সমস্তের উপর স্বর্ধ ওঠার দৃষ্ট দেখা হোল না ! আবার কবে আসব—কে জানে ! শিনাকী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে।

তিন ভাই ডাইনী



* নীহার ঘোষ

কোন এক গ্রামে তিন ভাই একসঙ্গে বাস করতো। কিন্তু তাদের অবস্থা বড়ই খারাপ ছিল। সংসার ধন চলে না এমন এক সময়ে তাদের মধ্যে বড়ভাই বাড়ী ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লো ভাগ্যবশত।

চলতে চলতে অনেক দূরে এসে পড়লো সে। তারপর কান্ধিতে আর তার পা চলতেই চায় না। ঠিক মজার সময় সে এসে পৌঁছলো একটা ভাঙা

বড়ীর সামনে। দরজায় কড়া নাড়তে এক খুৎসিত-দর্শন বৃদ্ধি এসে দরজা খুলে দিয়ে তাকিয়ে রইলো বড় ভাইয়ের মুখের দিকে। বৃদ্ধিটা ভাইনী। বড় ভাই বললে ভাইনীর, আশ রাজের মতো একটু আশ্রয় পাওয়া যাবে ?

ভেতরে এসো। বলে ভাইনী তাকে ওপরে ঘাওঁচার সিঁড়ি দেখিয়ে দিল। ওপরে উঠে এসে বড় ভাই দেখলো মেঝেতে একটা মাহুর পড়ে আছে। সেটা ভালো করে বিছিয়ে নিয়ে সে শুয়ে পড়লো। পথ হেঁটে পরিশ্রান্ত হয়েছিলো বলে—শুতে-না-শুতেই ঘুমিয়ে পড়লো। কতকক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলো তার মনে নেই ; হঠাৎ মাকরাডে টুং টাং শব্দে তার ঘুম ভেঙে গেল। তাকিয়ে দেখলো একপাশে মেঝেতে একটা জায়গায় গর্ত মতো, সেখান দিয়ে আলো আসছে। আশে আশে গিয়ে সে সেই গর্ত দিয়ে দেখতে পেল, নীচে ভাইনী বৃদ্ধি একটা থলিতে সোনার মোহর ভরছে। পাশে হারিকেনটা অলছে। সব মোহরগুলো ভরা হ'য়ে গেলে ভাইনী বৃদ্ধি থলিটা বেঁধে দেওয়ালে একটা তাকের ওপর রেখে দিল। তারপর এসে আলোটা কমিয়ে দিয়ে তার বিছানায় শুয়ে পড়লো। বড় ভাই ওপর থেকে সব দেখতে পাচ্ছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ভাইনী বৃদ্ধির নাক ডাকার আওয়াজ পাওয়া গেল।

বড় ভাই আশে আশে নীচে নামলো। ঘরের দরজাটা ভেজানো ছিলো, আশে ঠেলা দিতেই খুলে গেল সেটা। ঘরে ঢুক তাক থেকে থলিটা নিয়ে সে বেরিয়ে পড়লো রাস্তায়। তারপর আরম্ভ করলো ছুটতে। ছুটতে ছুটতে সে একটা কুঁড়ে ঘরের কাছে এসে পৌঁছলো। সেখানে আসতে ঘরটা তাকে বলল,—ভেতরে বড় মরলা জমেছে, একটু পরিষ্কার ক'রে দেবে ?

না। উত্তর দিল বড় ভাই, আমার দাঁড়াবার সময় নেই। সে আবার ছুটতে আরম্ভ করলো।

সকাল হ'য়ে গেছে। সূর্য ক্রমশঃ ওপরের দিকে উঠছে। বড় ভাই ছুটতে ছুটতে একটা মাঠের কাছে এসে পৌঁছলো।

তাকে সেখা মাঠ বললে, ভাই, আমার আশপাশে বড় ঝোপ মতো হয়ে গেছে, একটু পরিষ্কার করে দেবে ?

না, পারবো না। বলে সে আবার ছুটতে শুরু করলো। কিন্তু পারলো না। খানিকটা গিয়েই তার মনে হলো থলিটা বেন ষিঙা ভারী হ'য়ে গেছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সে একটা কুয়ার কাছে এসে পৌছলো। বড় ভাই ছুটতে ছুটতে পিপাসার্ত হয়েছিলো, তাই সে জলপান করতে এগিয়ে এলো। কুয়া বললে, আমার গায়ে শ্রাওলা জমেছে, একটু পরিষ্কার করে দেবে ?

তখনই জবাব দিল বড়ভাই, না, আমার একটুও সময় নেই। এই কথা বলেই আবার চলতে শুরু করলো সে।

দুপুর বেলা সে এসে পৌছলো একটা বটগাছের নীচে। সেই গাছের তলায় ছায়ায় বসে সে বিশ্রাম করতে লাগলো।

এদিকে সকাল বেলায় ভাইনী বড়ি ঘুষ থেকে উঠে দেখলো ছেলেটা তো নেই-ই, এদিকত তার দোনার থলিটাও নেই। তখন সে বেরিয়ে পড়লো তার খোঁজে। যেতে যেতে ভাইনী গিয়ে পৌছলো সেই কুঁড়ে ঘরের কাছে। তাকে জিজ্ঞেস করলো—

থলি কাঁখে একটি ছেলে,
আমার বড় টাকাকড়ি,
নিরে গেছে করে চুরি,
পাবো তারে কোথায় গেলে ?

ঘর তাকে বললে—মাঠের দিকে গেছে চলে।

ভাইনী তখন আবার মাঠের দিকে চললো। দেখানে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো—

থলি কাঁখে একটি ছেলে,
আমার বড় টাকাকড়ি,
নিরে গেছে করে চুরি,
পাবো তারে কোথায় গেলে ?

মাঠ তাকে বললো—

মাঠ পেরিয়ে কুয়ার ধারে,
গেলে সেখায় মিলতে পারে।

ডাইনৌ কুমার কাছে এসে জিজ্ঞেস করলো—

খলি কাঁখে একটি ছেলে,
আমার বত টাকাকড়ি,
নিরে গেছে করে চুরি,
পাবে। তারে কোথায় গেলে ?

সে কথা শুনে কুমার জবাব দিল—

বটগাছটি আছে ঘেথায়,
পাবে তারে গেলে সেথায় ।

ডাইনৌ বুড়ি ভাড়াভাড়ি বটগাছের দিকে চললো। সেখানে গিয়ে দেখতে গেলো, বড়তাই মাথায় খলিটি নিয়ে পরম স্থখে নিশ্রা দিচ্ছে। ডাইনৌ এক মুঠো ধুলো ময় পড়ে ছুঁড়ে মারলো বড়তাইয়ের দিকে। চোখের নিমিষে উঠাও হ'য়ে গেল বড়তাই। পড়ে রইল শুণু সোনা ততি খলিটা। সেটা কাঁখে নিয়ে বুড়ি ফিরে চললো বাড়ীর দিকে।

কিছুদিন পর মেজডাই দেখলো এভাবে আর থাকা যায় না। এত কষ্ট করে বেঁচে থাকার কোন মানে হয় না। সেও বেরিয়ে পড়লো সব ছেড়ে দিয়ে, যদি ভাগ্য ফেরাতে পারে কোন রকমে।

হাটতে হাটতে সন্ধ্যার সময় মেজডাই গিয়ে পৌঁছালো সেই ডাইনৌ বুড়ির বাড়ীর সামনে। কড়া নাড়তে বুড়ি বেরিয়ে এলো।

আজ রাত্রে মতো একটু আশ্রয় পাওয়া যাবে ? জিজ্ঞেস করলো মেজডাই।

ভেতরে এসো। বঁলে বুড়ি তাকে ওপরে ষাওয়ার সিঁড়ি বেধিয়ে দিল, এবং মেজডাই ওপরে গিয়ে একটা মাদুর পড়ে থকাত্তে দেখে, সেটা পেতে নিয়ে শুয়ে পড়লো। সারাদিন হাটার অস্ত্র পরিশ্রান্ত হ'য়ে গিয়েছিল ছেলেটি, তাই শুতে-না-শুতেই ঘুমিয়ে পড়লো। মাঝরাতে কিপের টুং টাং আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল তার। তারপর সেই গর্ভ দিয়ে আলো আসতে দেখে তাকিয়ে দেখলো মেজডাই, বুড়ি একটা খলিতে সোনার মোহর ভরছে।

বুড়ি ঘুমিয়ে পড়তে যখন সে তার নাক ডাকার আওয়াজ শুনতে পেলো, তখন নীচে নেমে খলিটা নিয়ে দিল চম্পট।

ছুটতে ছুটতে সেই কুঁড়ে ঘরের কাছে আসতে, ঘর বললে, ভেতরটা বড্ড নোংরা হয়ে আছে, পরিষ্কার করে দেবে ?

—না, আমার সময় নেই। বঁলেই আবার ছুটলো মেজডাই।

—আমার আশপাশের ঝোপগুলো পরিষ্কার করে দেবে ? তাকেও বললো মাঠ ।

—না আমার ঠাণ্ডাবার সময় নেই । অব্যব দিল মেজভাই ।

—ভাই, আমার গায়ের ঝাঙলাগুলো পরিষ্কার করে দেবে ? বললো কুয়া ।

—বাছে কাজের সময় নেই আমার । ব'লে দেও তার বড় ভাইয়ের মতো গাছের নীচে গিয়ে বিশ্রাম করতে করতে ঘুমিয়ে পড়লো ।

ওদিকে সকালবেলা ভাইনী বুড়ি বখন দেখলো তার খলি আর অতিথি দুই-ই অদৃশ্য, তখন রাগে গরগর করতে করতে সে ছুটে চললো ছেলোটর খোঁজে । রাতার মাঝে সেই ঘর, মাঠ ও কুয়া আগের মতোই মেজভাইয়ের খোঁজ নিয়ে দিলো ভাইনী বুড়িকে । মেজ ভাইকেও সহবলে ভাইনী ধুলো-পড়া দিয়ে অদৃশ্য করে দিলো আর বাড়ী ফিরে গেল সোনার খলি নিয়ে ।

এদিকে ছোট ভাই একলা থাকে । কোন রকমে তার দিন চলে । অবশেষে এমন সময় এমন এলো যে, আর তার দিন কাটে না । এইভাবে চলতে চলতে তারও বিতৃষ্ণা এসে গেল সংসারে । তখন সে-ও একদিন বেরিয়ে পড়লো ভাগ্যাবধেয় । তারপর চলতে চলতে এসে পড়লো সেই ভাইনীর বাড়ীর কাছে এবং এসে সেও আশ্রয় পেল বাজের জন্তে । অনেক রাত্রে তার ঘুম ভেঙে যেতে—খলি ভতি বোঁহর দেখে, বুড়ি ঘুমিয়ে পড়ার পর সেও সেটা নিয়ে চম্পট দিলো । যেতে-না-যেতে সে এসে পৌঁছলো সেই ঝুঁড়ে ঘরের কাছে । ঘর তাকে বললে, ভেতরে বড় ময়লা জমে আছে, পরিষ্কার করে দেবে ভাই একটু ?

এই ছোটভাইটি ছিল ভীষণ পরোপকারী, কখনো কাউকে 'না' বলতো না । সে সেই কথা শুনে বললে, হ্যাঁ, দেবো । পরিষ্কার করতে যদিও তার সময় লাগলো, তবু সে ভালো করে সব ময়লা পরিষ্কার করে দিলো । তারপর আবার ছুটতে শুরু করলো যতদূর না মাঠের কাছে এসে পৌঁছলো ।

আমার আশপাশের ঝোপগুলো পরিষ্কার করে দেবে ? বললে মাঠ । ছোট ভাই আশঙ্কিত করলো না । সে মাঠের চারিদিক পরিষ্কার করে দিলো ; আগাছা, ঝোপ-ঝাড় সব তুলে ফেল দিলো । তারপর সে ভাইনী বুড়ির এসে পড়ার ভয়ে ছুটতে আরম্ভ করলো । ছুটতে ছুটতে গিয়ে পৌঁছলো সেই কুয়ার ধারে । তাকে দেখে কুয়া বিজ্ঞেয় করলো, আমার গায়ের ঝাঙলাগুলি একটু পরিষ্কার করে দেবে ভাই ?

এবারও ছোটভাই 'না' বললো না । যদিও তার ভীষণ ভয় হচ্ছিল যে, ভাইনী বুড়ি এসে নিশ্চয়ই তাকে খবে ফেলবে, তবু সে ভালোভাবেই কুয়ার গায়ে অশ্রু-ঝাঙলাগুলি পরিষ্কার করে দিলো । তারপর হুপুরবেলা পরিশ্রান্ত হয়ে সে গিয়ে বিশ্রাম করতে লাগলো সেই বটগাছটার তলায় ।

এখন, ডাইনী বুড়ি সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে ছোটতাই আর তার সোনার মোহরের থলি কোনটাই দেখতে পেলো না। তখন সে বিদ্রোহের মতো ঘেটে পড়লো। ছুটে চললো ছোট ভাইয়ের সন্ধানে। যেতে যেতে গিয়ে সেই কুঁড়ে ঘরের কাছে এসে ভিজ্ঞপন করলো—

থলি কাঁধে একটি ছেলে,
আমার মতো টাকাকড়ি,
নিরে গেছে করে চুরি,
পাবো তারে কোথায় গেলে ?

কুঁড়ে ঘর তাকে কিছু বললো না। কিন্তু হঠাৎ বাড়ির মতো ঘরের চালটা উড়ে এলো ডাইনী বুড়ির নিকে বাঁশগুলো পটাপট খুলে গিয়ে এসে পড়লো বুড়ির ঘাড়। ডাইনী বুড়ি ছোট্ট ছুটি করেও রেহাই পেলো না, তার অবস্থা প্রায় সন্নিহন হয়ে উঠলো। অবশেষে কোনরকমে পরিমাণ পেয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগিয়ে চললো বুড়ি। থামলো এসে—মাঠের কাছে। ভিজ্ঞপন করলো তাকে—

থলি কাঁধে একটি ছেলে,
আমার মতো টাকাকড়ি,
নিরে গেছে করে চুরি,
পাবো তারে কোথায় গেলে ?

মাঠ তার উত্তরে ধুলোর বাড় উড়িয়ে ডাইনী বুড়িকে প্রায় অন্ধ করে দিলো। সে চোখ ঢাকতো ধুলো ঢোকে মুখে, মুখ ঢাকলে চোখে। অতিষ্ঠ করে তুললো তাকে।

তারপর কুয়ার কাছে গেল ডাইনী। তাকে বললে—

থলি কাঁধে একটি ছেলে,
আমার মতো টাকাকড়ি,
নিরে গেছে করে চুরি,
পাবো তারে কোথায় গেলে ?

কুয়া কিছু বললে না, কিন্তু তার ঝল হঠাৎ বাড়তে লাগলো। বাড়তে বাড়তে তার ঠাণ্ডা হাত দিয়ে বুড়িকে টেনে নিয়ে ডেতরে ফেল দিলো। ডাইনী বুড়ি ঝলে ডুবে—কোথায় তলিয়ে গেলো।

ছোটতাই বাড়ী ফিরে গেলো। তারপর সেই মোহর নিয়ে সে হুবে ঘর-সংসার করতে লাগলো।*

উচিত-জবাব

শ্রীকণিকুষণ বিশ্বাস

বজ্রাতে উঠি' আকবরশাহ নিত্য-দিনের মত—
প্রথমে শুধান সবার কুশল পাত্র মিত্র যত ।
তারপর নানা গল্পের ছলে ধর্মের কথা উঠে,—
যমূনার জল আরো কালো হয়, আকাশেতে তারা কোটে ।
বাদশা হঠাৎ প্রশ্ন করেন, “দেখ হে টোডরমল ।—
আমাদের চেয়ে তোমার দেবতা—অসহায় দুর্বল !
তেত্রিশ কোটি দেবী-দেবতার কত না বাহন আছে,—
তবু কেন তাঁরা নিজে ছুটে যান ভক্তজনের কাছে ?
আমার খোদার অচেল দোয়া, এমনি মেহেরবাণী,—
পয়গম্বর হুঃখ ঘোচান, পীরেরা মোছান পানি ।
আসমানে বসে খোদাতালা শুধু করেন হুকুম জারি,—
ভক্তের তবে ভামাম বিশ্বে তালিম চলেছে তারি ।”
“এ বড় হুকুম কঠিন প্রশ্ন,” হেসে বীরবল কয়,—
বজ্রুর হয়ে উচিত জবাব দেবো আমি নিশ্চয় ।
আদেশ করুন তবে, জাহাঁপনা, সাতদিন পরে ফের—
পণ্ডিতে পুছি' দেবো সমুচিত উত্তর প্রশ্নের ।
আগ্রায় ফিরে বজ্রু হু'জন—পরামর্শের পর—
আনলেন ডেকে আগ্রার সেরা নাম করা কারিগর ।
কহিলেন তাঁকে বীরবল ডেকে, “শোন হে শিল্পী ভাই,—
একটি দামাল ছেলের মতন মোদের পুতুল চাই ।
দিতে পারো যদি ঠিক বাদশাহর ছেলেটির মত করে,—
যত চাও দেবো মোহর কেবল তোমার হু'হাত ভরে ।”
প্রস্তাব শুনি' কহিল শিল্পী, “একশ' মোহর পেলে,—
আমি, জাহাঁপনা, গড়ে দেবো সেই নিখুঁত জ্যান্ত ছেলে !
সাধনার মাঝে সার্থক হবে জাগ্রত অম্লকৃতি,—
বিদায়ের আগে জানানো শিল্পী স্মৃঢ় প্রতিজ্ঞাত ।

সপ্তাহ পরে জ্যোৎস্না প্রাবন এসেছে যমুনা কূলে,—
 সেদিনের সেই প্রেমের কথা বাদশা গেছেন ভুলে ।
 যমুনার স্রোত ঘীরে বয়ে যায়, উঠে কল্লোল তান,—
 তানপুরা ল'য়ে মাতোয়ারা সুরে তানসেন গাহে গান ।
 “সাবাস ! সাবাস !” চলছে তারিক, বাদশাহ মশগুল,—
 তন্দ্রায় ঘেন আকাশের চাঁদ, স্রোতারিণী বিলকুল ।
 বজরাতে বসে মতলব ভাঁজে একপাশে বীরবল,—
 মাঝ দরিয়ায় রাংতার মত চিক্‌চিক্‌ করে জল ।
 সামনে ঘুরেই হঠাৎ নৌকা বাঁদিকে যখন টলে,—
 চমকে তখন বাদশা দেখেন কি ঘেন পড়েছে জলে ।
 যায় বুঝি ভবে যমুনার জলে বাদশার ছোট ছেলে,—
 কাঁপ দেন জলে বাদশা সহসা সত্যপারিষদ ফেলে ।
 হাঁ হাঁ করে উঠি' বীরবল বলে, “একি, একি সম্রাট !—
 একটি মোমের পুতুলের তরে এত কেন বিভ্রাট ?
 নফর বান্দা সকলেই পারে তুচ্ছ যে কাজ হেন,—
 তার-ই উদ্ধারে শাহনশাহ আপনি স্বয়ং কেন ?
 একবার যদি করতেন শুধু একটু আদেশ দান,—
 পুতুলের তরে প্রস্তুত ছিল বান্দারা দিতে প্রাণ ।”
 জল থেকে উঠি' বাদশা বলেন, “নিজ সম্মান-জ্ঞানে,—
 হৃদয়ের টানে কাঁপ দিয়েছিছু যমুনার মাঝখানে ।
 ছেলের বিপদে স্বয়ং পিতার চূপ করে থাকা দায়,—
 শ্রমের তাগিদে সব অহমিকা মন থেকে মুছে যায় ।”
 বীরবল বলে, “পেয়েছি জবাব প্রেমের জাহাঁপনা,—
 মোর দেবতার সবচেয়ে প্রিয় ভক্ত-আপন-জনা ।
 তাই পুত্রের বিপদ জ্ঞানেই ভক্তজনের প্রেমে—
 আমার দেবতা বার বার করে মর্ত্যে আসেন নেমে ।”

আগুন পাড়ার মাঠ

আদরদিঙ্গকুমার রায়

আগুন পাড়ার মাঠ। দিনের আলো নিবে গেলেই সকলে মরে পড়ে, কেউ আর পথ চলে না এই মাঠ দিয়ে। লোকে বলে,—“রাতে নাকি আগুন জলে গুঠে এই মাঠের বৃকে। কোন কোন দিন দূর থেকেই দেখা যায় রক্তিম গগনমণ্ডল। পাড়া-প্রতিবেশীরা রাতের আধারে কপিকের জন্তু চেয়ে থাকে স্থবিরের মত দূরে ঐ আকাশের দিকে, তারপর আশ্রয় নেয় যে দ্বার ঘরে। কেউ-কেউ আবার বলা-বলি করে বিশ্বতপ্রায় অতীত কাহিনীটি।

বৈশী বড় না হলেও, একেবারে ছোট নয় এই মাঠ। আর কোন জন-বসতি নেই এখানে সত্যি, কিন্তু এই প্রান্তর এমনি জনহীন ছিল না চিরদিন। একদিন এখানে ছিল যখন জন-বসতিপূর্ণ ছোট্ট একটি গ্রাম। সেই গ্রামে বসত হাট—সেই হাটে বিলিত হ'ত ভিন্ন-ভিন্ন গ্রামের গ্রামবাসীরা। স্নিগ্ধ ছায়া-শীতল গাছের নীচে চলত লোকের কেনা-বেচা। যুহুযুহু বাতাসে আন্দোলিত বৃক্ষের শাখাগুলি বিহঙ্গকূলের কলরবে যখন মুগুর হয়ে উঠত,—সন্ধ্যার ছায়া যখন স্পর্শ করত পৃথিবীর বৃক, যখন পল্লীর কুটীর-কুটীরে জলে উঠত মাটির ঘোপ, বেগে উঠত মন্বল শঙ্খধ্বনি,—তখন বিদায় নিত একে একে সবাই আপন ঘরের টানে। শূন্য প্রান্তর আবার জনহীন হয়ে পড়ে থাকত, কেবল ছায়া-ছবির মত দেখা যেত ইতস্ততঃ সূর্য গ্রামটির কুটীরগুলি।

চিরদিন কখনও সমান যায় না—নদীর বৃকেও চড়া পড়ে মাটির বৃকও শুকিয়ে ওঠে। সে শুক কঠিন বৃকে জন্মায় না আর জামল তৃণের বল। আকাশের বৃকে দেখা যায় না। জল-ভরা কৃষ্ণ-কালো মেঘ। পৃথিবীর বৃকে নেমে আসে হৃদিক্শের করাল ছায়া। মলিন হয়ে ওঠে গ্রামবাসীদের মুখ। ঘরে-ঘরে গুঠে কাগজর রোল, কিন্তু তবুও নিত্যা-নিয়মিত ভাবেই চলে দৈনন্দিন কাম্যকর্ম, হাট-বাজার, সব কিছু। বাইরে থেকে বোঝা যায় না কিছুই, কিন্তু হঠাৎ একদিন পল-তের শিবা শেষ জলে নিবে যায় মাটির প্রদীপ,—তাতে তেলের লেশ থাকে না।

আগুন—আগুন! হ্যাঁ, আগুন লেগেছে। চারদিকে অগ্নির তেলিহান শিখা। অগ্নিদেব যেন আজ স্ত্রীত্বস্তির জন্ত গ্রাম করতে চান সমস্ত গ্রামধানিকে। বাতাসে বাতাসে ভেসে চলেছে পোড়ার গন্ধ আর পটপট মড়মড় শব্দ। চারদিকে করুণ আর্তনাদ আর ছুটোছুটি হড়োহড়ি। সকলের মুখেই সামাল সামাল রব। দলবদ্ধ গ্রামবাসীরা আজ ছুটে এগেছে আগুন মেবাতে। এ সাহায্য সহায়ত্বস্তির, না আপন আপন বিপদের তাগিদে তা জানেন একমাত্র ঈশ্বরই।

সকলেই ছুটে চলেছে ব্যস্তভাবে, কিন্তু দূরে দাঁড়িয়ে হাসছে এক পাগল। ইয়া, পাগল ছাড়া আর কি! সমস্ত গ্রামকে ধ্বংস হ'তে দেখেও যে নির্বিকার ভাবে হাসতে পারে, তাকে পাগল ছাড়া আর কি বলা যায়? একজন ব্যস্ত ভাবে ছুটে যেতে-যেতে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। পাগলকে হাসতে দেখে সে বলল,—“তুই দাঁড়িয়ে হাসছে যে?”

পাগল বলল—“বিপদে পড়ে সবাই কাঁদে। কিন্তু হাসতে পারে কে? তাই আমি হাসছি?”

আর একজন যেতে-যেতে থমকে দাঁড়িয়ে বলল,—“পাগল এখানে দাঁড়িয়ে কেন...এস আগুন নেবাযে এস।”

পাগল বলল—“আগুন, আগুন, কত আগুন! দুনিয়ার চারদিকেই আগুন! ঘরে আগুন, বাহিরে আগুন, পেটে আগুন—কোন আগুন আজ নেবাযে বলো?”

পাগলকে—পাগল ভেবে কেউ আর দাঁড়ায় না, মূৰ ফিরিয়ে নিয়ে সকলেই চলে যায়।

সহসা পাগল গুনতে পায়, দূরের ঐ বট গাছটার নীচে বসে কে যেন কাঁদছে। সম্বর্ণণে পা কলে এগিয়ে যায় সে। দেখে, একটি ছেলে বসে কাঁদছে। বীরে তার পিঠে হাত দিয়ে সে অফুট-বীরে বললে,—“কাঁদছিল কেন?”

বালক কণকাল কণকাল দৃষ্টিতে চেয়ে বলল,—“বড় বিদে! দু'দিন থেকে কিছু খাই নি বাবা!”

পাগল এবার দূরে আত্মল দেখিয়ে বলল,—“ঐ দেখ আগুন লেগেছে, কত লোক ছুটে গেছে দেখছিস? আগুনের উত্তাপ আছে, সকলের গায়ে লাগে, পুড়ে সববার ভয় আছে, তাই ছুটে গেছে সকলে, কিন্তু তুই দু'দিন ধরে কাঁদেছিস কেউ শোনে নি,—কেউ আসে নি ছুটে! ষা'পনর, পাখান সব! পাখানকে ডাকলেও হয়তো সাড়া মেলে রে, কিন্তু মা'হু হা'সে!”

পাগলের কথাগুলো বুলতে না পেরে বালকটি ফাল-ফাল করে চেয়ে থাকে। পাগল এবার তার কাঁধের জীর্ণ বস্ত্রি পুটুলি নামিয়ে, কিছু শুকনো কুটি আর একটু গুড় বের করে বালকটির হাতে দিয়ে বলল,—“নে, বা। আমি তো'র অন্তে ভাল নিয়ে আসি।”—কথাগুলো বলে দীর্ঘ কালে। হাতঘটা আর্থারের মাঝে মিলিয়ে যায়।

কিছুক্ষণ পর একটা ঘাটির ভাঙে করে জল নিয়ে এসে বালকটির হাতে দিয়ে পাগল বলল,—“নে জলটুকু খেয়ে ফেল।”

বালকটির খাওয়া শেষ হলে পাগল বলল,—“খাকিস কোখায়?”

বালক বলল,—“ঐ পাশের গ্রামে।”

পাগল বলল,—“দেখানে কে আছে তো'র?”

বালক বলল,—“মা আছে।”

পাগল বলল,—“তোমার বাবা নেই?”

বালক বলল,—“না।”

কিছুক্ষণ নীরব থেকে পাগল বললে,—“তোমার মা ভোঁ বেশ লোক, তাকে উপোস রেখে, নিজে বাড়ীতে খেয়ে-দেয়ে বসে আছে।”

বালক এবার চোখ দু'টো মুছে নিয়ে বলল,—“না গো, না। দু'দিন থেকে মা'ও উপোস ক'রে রয়েছে। সারাদিন কীসেছে আর ভগবানকে ডাকছে।”

বালকের কথায় ধীরে ধীরে সম্বল হয়ে উঠল পাগলের চোখ দু'টো। চোখ দু'টো মুছে নিয়ে সেও বলল,—“হা ভগবান!”

কিছুক্ষণ নীরব থেকে পাগল এবার তার শেষ সম্বল পুঁটলিটা বালকের হাতে দিয়ে বলল,—“বা নিয়ে যা—তোমার মাকে খেতে দিও।”—কথাগুলো বলে সে আর পাড়াল না, আধারের বুকে মিলিয়ে গেল।

ঘুরতে ঘুরতে একটা পুকুরের ধারে এসে পাড়াল পাগল। ধীরে ধীরে নেমে গেল বাঁধান ঘাটটার শেষ ধাপে। অগুলি ভ'রে, পুকুর থেকে জল তুলে, তাই ঢক-ঢক করে পান করল সে। জল পান করে এবার সে উঠে পাড়িয়ে অফুট বয়ে বলে উঠল,—“বাক আগুন নিবেছে!”

রাতের নির্জনতায় আধারের মাঝে ঘুমিয়ে আছে গ্রাম। মহসা দেই নির্জনতা ভঙ্গ করে কে যেন আর্তিবরে চীংকার করে উঠল,—“আগুন—আগুন!” তার মে চীংকারে ঘুম হেসে গেল সকলের। সকলেই ব্যস্তভাবে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। সমস্ত গ্রামবাসী উঠল সরগোল। সকলে ছুটে এসে দেখল, পাগল ছটকট করেছে আর কাতরভাবে বলছে,—“আগুন—ওগো আগুন লেগেছে—আগুন!”

গ্রামবাসীরা সকলে তাকে ঘিরে পাড়িয়ে ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞাসা করল,—“এই পাগল কোথায় আগুন লেগেছে?—বল বল, তাড়াতাড়ি বল?”

সকলের প্রতি করুণ দৃষ্টি মিলে পাগল বলল,—“দেখতে পাচ্ছ না?” সকলে ব্যাকুলভাবে এদিক-ওদিক চেয়ে বলল,—“কই, কোথায় আগুন লেগেছে?”

পাগল এবার অবসরভাবে নিজের পেটের মিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে অফুটবয়ে বলে উঠল,—“আগুন—আমার পেটে!”

পাগলের কথায় সকলেই এবার হো হো করে হেসে উঠল। পাগল তখন চোখ বুজে পড়ে

আছে মাটির ওপর। চোখে তার দু'টি ফোঁটা জল,—একটি সকলের প্রতি দিকারের—অপরটি আত্ম-বেশনার।

রাতের আঁধারে আজও আগুন পাড়ার মাঠে যে আগুন জলে ওঠে, সে আগুন শুধু একমাত্র পাগলের পেটে নয়—হুনিয়ার সমবেত বুদ্ধি আত্মা বোধ হয় দেখানে মিলিত হয়ে রক্তবাগে রঞ্জিত করে তোলে গগনমণ্ডল। অপরকালের জন্ত শৈশবিক চেয়েই বোধ হয় গ্রামবানীরা সকলে শিউরে ওঠে!

রেডিও-এক্টিভ্ ইস্কুল

শ্রীপতিতপাবন বন্দ্যোপাধ্যায়

বালিগঞ্জ, টালিগঞ্জ, হাজরার মোড়ে বা,
বেলতলা, বেলঘাটা নয় বেলঘোরে বা।
কোথা যেন জায়গাটা—ভুলে গেছি

তাইতো।

খাবারে ভেজাল খেয়ে ঘিলু আর নাইতো।
'দি রেডিও-এক্টিভ্' ইস্কুল সেখানে
দশ মাসে দিগ্গজ্জ ক'রে দেয় যেখানে।
বিশ্ব-ফেরৎ লোক, অবিকল সেন যে।
এর পিছনেতে আছে শুধু তারই 'ব্রেন' যে।
ইংরাজি, অস্ত্র ও 'জিওগ্রাফিক' 'হিসট্রি',
বাংলা, সংস্কৃত, 'ফিজিক্স', 'কেমিস্ট্রি';
বিষয় যা শিক্ষার, কলা, বিজ্ঞান বা
যা-কিছু হাতের কাজ, বাজনা ও গান বা;
মাইক্রোট্রেনেতে ফেলে প্রচণ্ড চাপেতে
পরমাণু ক'রে তাকে তেজী ক'রে

তাপেতে।

'ক্যাপ'সুলে' ভরা আছে তারই মিহি চূর্ণ,
তাই খেলে শিখে যাবে সব পরিপূর্ণ।

জড়-বুদ্ধির ফলে যে রয়েছে মুখ্য

ইন্জেকশনে তার ঘুচে যাবে দুঃখ।

তা ছাড়া, গবেষ্ট আর একবারে 'ব্লাক্ট' যে
তাদের তরেও আছে 'রে' দেবার 'প্লাক্ট' যে।

আঙুলের পাব্ গুণে যোগ দেয় যে-ছেলে,
'র‍্যাসলার' হ'য়ে যাবে অস্ত্রের 'রে' পেলে।

মগজে 'রে' পুরে নিয়ে যে যে-দিকে ছুটবে,
ডিএম্ তো লুঠবেই, চাক্রাও জুটবে।

'লাইফ্-টাইম' দেয় 'গ্যারাণ্টি' সে লিখে –
'সাক্সেস্ফুল' হবে যাক না যে যে-দিকে।

অবিকল সেন বলে – "গতি আর নাইতো;
'এ্যাটমিক্' যুগে এই পদ্ধতি চাইতো।

কলেজ ইস্কুলে পড়া—সে কি কম কষ্ট।

পয়সার শ্রাদ্ধ ও সময়টা নষ্ট।"



সবজ্যাস্তার আসর ...

ছাপাখানার কথা

দিগ্গজ্ঞ শর্মা

এর আগে কাগজের কথা দিয়ে শুরু করেছিলাম—এবার বসছি ছাপাখানার কথা। কেননা, এই ছাপাখানা আর কাগজের কথা, একদল মানুষ যদি না ভাবতো, না জানতো—তা'হলে আশু ও পৃথিবীর অগণিত লোক, অজ্ঞতার অন্ধকারে ডুবে থাকতো।

প্রথম ১৫ শতকে ছাপাখানা আবিষ্কার হয়। ছাপাখানা আবিষ্কার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দিকে দিকে তা চালু করার অঙ্কে কিছু কাগজের লোক উঠে পড়ে লাগলো। ক্রমে তার রূপ ও ব্যবহার পান্টাতে পান্টাতে, এমনভাবে তার প্রচেষ্টানীয়তা বেড়ে গেল—যার ফলে, ছোট বড় শহরের অনিতে-পলিতে ছাপাখানা সৃষ্টি হতে থাকলো। তাই, এখন যা কিছু তোমরা ছাপতে চাও হাক্কামা নেই। আবার যে বইগুলো তোমরা পড়তে চাও, খুঁজে-পেতে পড়তেও কোন বাধা নেই। অথচ তাবলে অবাক হবে, শিকার-দীকার উন্নত আজকের যে ইংরেজ,—যাদের সভ্যতা, ভাষা, সাহিত্য ও শিল্প এত উন্নত ও পৃথিবীর সর্বত্র সমাদৃত, তাদের বেশেও ঠিক পাঁচশো বছর আগে—লেখাপড়া জানতো খুব কম লোকই।

তা'হলে শোন,—কবে, কে, কোথায়, প্রথম এই ছাপাখানা নিয়ে মাথা ঘামালো; আর কি করেই বা মানুষের হাতে আঁকা ছবি, ছাপার হরকের পাশাপাশি এসে ঠাঁই পেলো। বর্তমান যুগে এসব কথা সবাইই জানা প্রয়োজন। যদিও চীন ছাপাখানার বাপার প্রথম পথপ্রদর্শক, তবুও বই ছাপিয়ে সর্বপ্রথম মানুষের সৃষ্টি আকর্ষণ করলো—জার্মানীর গুটেনবার্গ।

১৪৫৬ সালে বই ছাপানোর আগে—বই খেঁধে ও কট করে গুটেনবার্গকে নিজের হাতে

প্রতিটি হরফ কাঠের ওপর খোদাই করে সাজাতে হয়েছিল—প্রতি পৃষ্ঠার অন্তে তিন তিন কাঠের ফলকে ৪২ লাইনে বাইবেলের সব কথা-কাহিনী। পরে নির্ভূত পরিপাটি করে তাঁকেই আবার ছাপতে হয়েছিল বইটির প্রতিটি পৃষ্ঠা অতি সাবধানে। এমন কি লেখার পাশে পাশে নিজের হাতে রঙিন ছবি একে চিত্রিত করতে হয়েছিল সেই বইখানি। জার্মানির মেনজ (Mainz) শহর হতে ১৪৮৬ সালে গুটেনবার্গের Mazarin Bible প্রথম প্রকাশিত হয়। এই না দেখে, শুধু হয়ে যায় জার্মানীর শহরে শহরে—ছাপাখানা আর বাইবেল ছাপানোর হিড়িক। ক্রমে জার্মানীর সীমান্ত ছাড়িয়ে এই ছাপাখানার কাজ ছড়িয়ে পড়লো ইটালীতে, ফ্রান্সে ও ইংলণ্ডে। ইংলণ্ডে যখন ছাপাখানা বসলো তখন ১৪৭৪ সাল। পুরো তিনটি বছর দারুণ পরিশ্রম তবে, একঘেয়ে এই বাইবেল না ছাপিয়ে, উইলিয়াম ক্যান্টন ছাপালেন—“দি এ্যালমোনরি অব ওয়েস্টমিনিস্টার অ্যাবি”। সেজন্য আনন্দ ও বিস্ময় নিয়ে রাজা চতুর্থ এডওয়ার্ড ও তাঁর রাণী দেখতে এলেন ক্যান্টনের ছাপা পদ্ধতি আর তার কাণ্ডকারখানা। তারপর নতুন উৎসাহে “হিস্টরি অব ট্রয়” প্রকাশের ইচ্ছায় ক্যান্টন সাহেব নিয়ম হলেন অক্ষর খোদাইয়ের কাজে। পুরো তিন বছর ধরে অক্লান্ত পরিশ্রমের পর, যেদিন তার বই বের হলো—সেদিন তিনি মৃষ্টিশক্তি ফেললেন হারিয়ে। তবুও নিরাশ না হয়ে ছাপাখানার উন্নতিকরে তিনি বেরিয়ে পড়লেন জার্মানী ও বেলজিয়ামের মধ্যে।

ক্রমে শতাব্দীর পর শতাব্দী কেটে গেল—ছাপাখানা অগণ্য ছেয়ে ফেললো। সেই সঙ্গে উদ্-কাট ছবির এমন উৎকর্ষ বেড়ে গেল যে, ইংলণ্ডের ধর্মীয় বিউটিক একাডেমি আদর্শ হয়ে রইলেন। আর জার্মানীর ডুরার সাহেব তামার পাতে হুম্ব ছবি কাটা ও প্রিন্ট দেখিয়ে—অগণ্যবিখ্যাত হয়ে গেলেন।

১৮ শতকের গোড়ার দিকে জার্মানীর স্ট্রেজারিক কোনিগ, যন্ত্র-চালিত দ্রুত প্রিন্টং মেশিন তৈরী করলেন। এরপর ইংলণ্ডে উইলিয়াম ক্যালসন নামে এক বন্ধুকের কারখানার শিক্ষানবীস, ষ্টীল থেকে টাইপ কেটে ছাপার হরফের কাটকে একবারে বাতিল করে দিলেন। ১৯ শতকে আমাদের দেশেও শ্রীরামপুর শহরে, বৃষ্টান মিশনারী উইলিয়াম কেরী সাহেব, সর্বপ্রথম বাংলায় বাইবেল ছাপানোর প্রয়োজনে এক বাঙালী কর্মকারকে দিয়ে বাংলা টাইপের সৃষ্টি করেন। এরপর এই শতকেই কলের যুগ ও বিজ্ঞানের যুগ ছাপাখানার পুরোন পদ্ধতিতে আমূল পরিবর্তন এনে দিল। এবং যুগ যুগ ধরে বহু লোকের সাধনা, চেষ্টা ও নিষ্ঠার জয়-অজয়কার হলো ছাপার কাজে। আবিষ্কার হ'ল—বিদ্যুৎ-চালিত যন্ত্র-চালিত, রোটারী প্রেস; ছবির কাজে আফসেট ছাপা; আর হাতে হাতে টাইপ সাজানোর হাজারি থেকে সময় বাঁচাতে লিনো-টাইপ মেশিন।

একটি সাঁততালী উপকথা

— শ্রীরাণা বসু

একদিন এক রাখাল-ছেলে মনের আনন্দে মাঠে বাশি বাজিয়ে বাড়িয়ে ঘুরছিল। ঘুরতে ঘুরতে রাখাল-ছেলে হঠাৎ দেখল, এক জায়গায় একটা বাঘ কী ভাবে একটা বড় পাথরে চাপা পড়ে যন্ত্রণার চিৎকার করছে। রাখাল-ছেলেকে দেখতে পেয়ে বাঘ বলল : দয়া করে আমার শরীরের ওপর থেকে পাথরটা সরিয়ে নিন না, আমি যন্ত্রণার হাত থেকে রক্ষা পাই। শুনে রাখাল-ছেলে বলল : কখনো না, আমি আমি পাথরটা সরিয়ে নিলেই তুমি আমার জীবন শেষ করবে। বাঘ বলল : না, না। আমি কথা দিচ্ছি আপনার আমি কোনো ক্ষতিই করব না বরং আমার পাথরটার চাপ থেকে মুক্ত করলে একটা হুন্ডর নখরকান্দি হরিণ আপনাকে উপহার দেব।

বাঘের প্ররোচনার রাখাল-ছেলে পাথরটাকে বাঘের শরীরের ওপর থেকে সরিয়ে তাকে মুক্ত করে দিল। মুক্তি পাবার পর বাঘটা হাত-পা নাড়িয়ে-চাড়িয়ে দেখতে লাগল। দেখল, তার শরীরের হাড়-পাঁজরা ঠিকই আছে, কিছু ভাঙে নি।

হঠাৎ রাখাল-ছেলের দিকে তাকিয়ে বাঘ বলল : আমার ভীষণ খিদে পেয়েছে। সামনেই যখন তুমি রয়েছে। তখন তোমাকেই উদরসাৎ করি। বাঘের কথা শুনে রাখাল চমকে উঠল। বলল : এ কী কথা! তুমি মরে যাচ্ছিলে, আমি তোমায় যন্ত্রণার হাত থেকে রক্ষা করলাম আর এখন তুমি কিনা বলছো আমার বাবে! বাঘ বলল : তুমি অতি দুর্ব। যেমন আমার কথার ওপর বিশ্বাস করে আমার মুক্ত করেছ, তেমনি আমি তোমার ঘাড় মটকে উপকারের প্রতিদান দেব। রাখাল দেখলে, গতিক হাবিধের নয়। তবুও বলল : তুমি যদি আমার খাও তাহলে খুব অন্তর আর পাপ করবে। এত শুনেও বাঘের মনে এক বিন্দু ককণা হল না। রাখাল জানলো তার মরণ ঘনি়ে আসছে। হুনিশ্চিত মরণ জেনে রাখাল শেষবারের মতন বাঘকে অহরোধ জানালো : আমাকে তোমার খাওয়া উচিত কিনা সে বিষয়ে যে কোনো তিনবনের মতামত নিলে হয় না। যদি তারা একবাক্যে বলে আমারই অপরাধ, তাহলে তুমি আমার মেরে খেও।

বে আমগাছটার তলায় দাঁড়িয়ে এতক্ষণ রাখাল-ছেলে আর বাঘের কথা হচ্ছিল, রাখাল সেই আমগাছটাকেই প্রথম দ্রিষ্ণে করল : আমগাছ তুমি বল, আমাকে এই বাঘটার মেরে খাওয়া উচিত কিনা? আমগাছ মাথা নাড়িয়ে দাবাব দিল : অপরাধ তোমারই। তোমাকে বাঘের

খাওয়াই উচিত। মাহুব জাত বড় নিমকহারাম। তোমাদের মতন নিমকহারাম মাহুব জাতকে বাঘের মেরে ফেলাই উচিত। দেখ না, যে গাছ আমার তোমাদের ফল দিই, ছায়া দিই, তোমরা হযোগ মতন একদিন সেই গাছকে কেটে ফেলতে এতটুকুও মায়া কর না। গাছের কাছ থেকে এরকম নিদারুণ অব্যব পাবার পর রাখাল-ছেলে সামনে যে জলাশয়টা ছিল তাকেই মূহ গলায় প্রাণ করলো : মরোৱর, তুমিই বল, এই বাঘের আমার শুধু শুধু মেরে খাওয়া উচিত কিনা? বিপদের সময় আমি শুকে সাহায্য করেছি, এখন বিপদ কাটিয়ে উঠেই ও আমাকে মেরে ফেলতে চাইছে। আমি কী এমন অপরাধ করেছি যে ও আমাকে শুধু শুধু মেরে বাবে! রাখালের কথা শুনে জলাশয় উত্তর দিল : হ্যাঁ, তোমাকে বাঘের খাওয়াই উচিত। এই যে জল যার অভাব হলে তোমরা একদণ্ড বাঁচতে পার না, তা খুব ভালো করে জেনেও এই জলে তোমরা যা-তা ময়লা কাঁপড় জামা কেচে আমাদের পরীর ময়লা কর। তোমাদের মতন নির্ধর মাহুব জাতকে এই বাঘের মেরে ফেলাই উচিত।

জবাব শুনে রাখাল হতাশ হল। জানলে তার মরণ হুনিশিত। আর একজনর মতামতের ওপরই এখন তার বাঁচা-মরা নির্ভর করছে। মরিয়া হয়ে এবার রাখাল-ছেলে সামনের শাল গাছের ডালে একটা যে বানর বসেছিল তার কাছেই সে শেখ মত জানতে চাইলো। বানর তার কথা শুনে বলল : ডাই, আমি কানে কিছু কম শুনি, তুমি বা বলতে চাইছো তা যদি একটু কষ্ট করে ওপরে আমার কাছে এসে জানাও তাহলে শোনার পর আমি অব্যব নিতে পারি।

রাখাল গাছে উঠে বানরটাকে সব খুলে বলল। শুনে বানর বলল : দেখছি তুমি একজন ভীষণ বোকা লোক! এমন একটা নিরাপদ জায়গায় বসেও তুমি মরার ভয় করছো। বাঘের এখন এমন কী ক্ষমতা আছে যে সে তোমাকে পেতে পারে! তুমি এখান থেকে 'বাঘ বাঘ' বলে চিৎকার কর, তাহলেই দেখবে লোকজন লাঠি নিয়ে বাঘ মারতে ছুটে আসছে।

যেমনি বলা ওমনি কাজ। রাখাল 'বাঘ বাঘ' বলে চিৎকার করতেই ধারে কাছে যে সব রাখালরা ছিল তারা বাঘ মারতে লাঠি হাতে ছুটে এলো। বাঘ আর কী করে, গতিক স্থিতির নয় চিন্তা করে প্রাণটা নিয়ে ভয়ে ভয়ে বনের ভেতর ঢুকে পড়ল। রাখাল-ছেলে প্রাণে বাঁচল।

* প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা *

গত চৈত্র মাসে 'আমাদের খুল' নামক যে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা 'মোঁচাকে' দেওয়া হয়েছিল, আগামী মাসে তার ফলাফল প্রকাশিত হবে।—মোঃ, সঃ

খেলোয়াড়দের তালিকা

মেই ১৯৫৬

টোকিওতে তৃতীয় এশিয়া ক্রীড়া

সম্প্রতি জাপানের রাজধানী টোকিও শহরে তৃতীয় এশিয়া ক্রীড়া প্রতিযোগিতা বহু সমা-
রোহে শেষ হয়েছে। এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতায়
এশিয়ার আফগানিস্তান, বর্মা, কম্বোডিয়া, সিংহল,
ইরান, ইন্দোনেশিয়া, ফরমোসা, চীন, হংকং,
ভারত, জাপান, ইসরাইল, দক্ষিণ কোরিয়া,
মালয়, নেপাল, উত্তর বোর্নিও, পাকিস্তান,
ফিলিপাইন, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম
প্রভৃতি ক্রীড়ার অধিক দেশের মহিলা এবং পুরুষ
প্রতিযোগিতা বোগদান করেছিলেন। বিভিন্ন
মল যে শব্দক অর্জন করেছেন নীচে তার একটি
তালিকা দেওয়া হল :

পদকের তালিকা

	বর্ষ	রোণা	ব্রোঞ্জ
জাপান	৬৭	৪১	৩০
ফিলিপাইন	৮	১০	২১
দক্ষিণ কোরিয়া	৮	৭	১২
ইরান	৭	১৪	১১
ফরমোসা	৬	১১	১৭
পাকিস্তান	৬	১১	২
ভারত	৫	৪	৩
ভিয়েতনাম	২		৪
বর্মা	১		১
সিঙ্গাপুর	১		১
সিংহল	১		১
থাইল্যান্ড	০		৩
হংকং			১

ইন্দোনেশিয়া
মালয়
ইসরাইল

এশিয়া ক্রীড়া প্রতিযোগিতার

মুখ্য রেকর্ড

তৃতীয় এশিয়া ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় যেট
রেকর্ড হয়েছে আথলেটিক্স-এ ২৬টি, ভারো-
স্তোলন-এ ২২টি, জলক্রীড়ায় ১৭টি, সাইক্লিং-এ
৪টি এবং স্ট্রিং-এ ১টি। স্থানান্তরিত: মাত্র
কয়েকটি উল্লেখযোগ্য রেকর্ডের তালিকা প্রকাশ
করা হল :

আথলেটিক্স—১. হাইজাম্প—এথিওপীয়
সিংহ (সিংহল) ৬ ফু. ৭. ৩ ইঞ্চি। ২. ৫০০
মিটার দৌড়—ওসামু ইনোর (জাপান) ১৪ মি.
৩২ সেকেন্ড। ৩. ৪০০ মিটার হার্ডল রেস—সাই
চেন জুর (ফরমোসা) ৫২.৪ সেকেন্ড। ৪. ৪০০
মিটার দৌড়—মিলবা সিং (ভারত) ৪৬.৬ সেকেন্ড।
৫. বর্ষা নিক্ষেপ—মহম্মদ নাওয়াজ (পাকিস্তান)
২২৬.৭ ফুট। ৬. ব্রডজাম্প—হু ইয়ং জু
(কোরিয়া) ২৪.৭ ফুট। ৭. ৮০০ মিটার দৌড়
— বোশিতাকা মুরোয়া (জাপান) ১ মি. ৫২.১
সেকেন্ড। ৮. মহিলাদের ২০০ মিটার দৌড়—টেকি
ডি সুজা (ভারত) ২৫.৮ সেকেন্ড। ৯. মহিলাদের
শট পাট—মেকো শুবোনাই (জাপান) ৪৩.৫
ফুট। ১০. পুরুষদের শট পাট—পরজামন সিং
(ভারত) ১৫.০৪ মিঃ (৪৯ ফুট, ৪ ইঞ্চি)।
১১. ১০,০০০ মিটার দৌড়—তাকাশি বাবা
(জাপান) ৩০ মিঃ ৪৮.৪ সেকেন্ড। ১২. মহিলাদের
হাইজাম্প—এমিকো কামিহা (জাপান) ১.৫৮

মি: (৪ ফুট. ২½ ই) । ১৩. মহিলাদের ৮০ মিটার হার্ডল—মিচিকো ইন্সালেতো—(জাপান) ১১'৬ সে: ।

ভারোত্তোলন—১. ব্যাটাসওয়েট—সিগো কেগোর (জাপান) মোট ৩২৫ কিলোগ্রাম, স্ন্যাচে ১০০ ও জার্ক ১৩০ এবং মহম্মদ নামজুব (ইরান) গ্রেসে ১০০ কিলোগ্রাম । ২. লাইট-ওয়েট—তান হো লিফাং (সিঙ্গাপুর) মোট ৩৭৫ কিলোগ্রাম (৮২৬ পাউণ্ড), গ্রেসে কেনরি ওহমার (জাপান) ১১৫, স্ন্যাচে তান হুইলিয়াং ও তামরাজ হেনলিক (ইরান) ১১২'৫ জার্ক কেনজি ওহুমার ১১০ কিলোগ্রাম । ৩. মিডল-ওয়েট—কাও উ মিং (ফরমোজা) মোট ৩৮০ কিলোগ্রাম । ৪. লাইট-হোভিওয়েট—মিরজালাল মনসুরী গ্রেসে ১২৭'৫ কিলো, স্ন্যাচে ১২২'৫ কিলো জার্ক ১৫০ কিলো ও মোট ৪০০ কিলো ।

—

জুডিং—ক্রাইকেল—এ্যাডলফ ফেলিসিয়ানো (কিলিপাইন)—১০'৬২ পয়েন্ট ।

—

সাইক্রিং—১. ২০০ মিটার—স্কেবি হিবামা (জাপান) ১২'২ সেকেন্ড । ২. ১০০০ মিটার টাইম ট্রাচাল—ওনাওডা তেংহুর (জাপান) ১ মি. ১৪৮ সে: । ৩. ৪০০০ মিটার টিম পারস্টিট—(জাপান) ৫ মি: ৫৬'৭ সে: ।

—

সাঁতার—৪০০ মিটার স্কি স্টাইল (পুরুষ)—হুয়েমি ইয়ামানাকা (জাপান) ৪ মি: ২৩'৩ সে: (বিশ্ব-রেকর্ড) ।

—

ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপের ফলাফল

গত ১০ মে ইন্ডোন উজানব্ব ইণ্ডোর স্টেডিয়ামে রাজ্য ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপের পরমহাষ্টি

হয়েছে । এই দিন তপস্বিৎ বানানি পুরুষদের সিঙ্গল ও ডাবলস খেলায় জয়ী হয়ে বি-মুক্ত লাভ করেন । অস্ত্রান্ত ফলাফল : বালকদের সিঙ্গলস : সুহুমার ঘোষ ১৭-১৪. ১৭-১৪, পয়েন্টে রমেন ঘোষকে পরাজিত করেন । পুরুষদের সিঙ্গলস : তপস্বিৎ বানানি ১৫-১২, ২-১৫, ১৫-২ পয়েন্টে দীপু ঘোষকে পরাজিত করেন । সিঙ্গল ডাবলস : মৌদা দাস এবং পঙ্কজ গুহ ১৭-১৫, ১৭-১৬, ১৫-১৩ পয়েন্টে নীলিমা তিকস ও শবর বানানিকে পরাজিত করেন । পুরুষদের ডাবলস : অরুণ বানানি ও তপস্বিৎ বানানি ১৫-২, ১৮-১৩ পয়েন্টে অমরনাথ ও দীপু ঘোষকে পরাজিত করেন ।

—

আন্তঃ-স্কুল ভলিবল

১৪ই মে হেয়ার হিন্দু স্কুল মাঠে আই. এল. এম. এ. কলকাতা পরিচালিত আন্তঃ-স্কুল ভলিবল লীগের পুরস্কার বিতরণ উৎসব অনুষ্ঠিত হয় । মেট্রো (মেন) স্কুল পরপর দ্বিতীয়বার শিল্ড পাবার গৌরব অর্জন করে এবং হেয়ার স্কুল দল রানাস-আপ আখ্যা লাভ করে । এই অস্থান উপলক্ষে যে প্রদর্শনী ভলি খেলা হয়, তাতে মেট্রো স্কুল দল অবশিষ্ট দলকে ১৫-৮, ১২-১৫, ও ১৫-৮ পরাজিত করে । খেলাড় শেষে ট্রফি ও প্রশংসা-পত্র বিতরণ করা হয় ।

—

টেলিফোনে খেলার খবর

কলকাতার ফুটবল ও অস্ত্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ খেলার ফলাফল জনসাধারণকে জানানোর ক্ষেত্রে টেলিফোন কর্তৃপক্ষ এক বিশেষ ব্যবস্থা করেছেন । একটি টেলিফোন কলের চার্জ দিয়ে ২৬ নং ডায়াল ব্যবহার করলেই যে কেউ খেলার ফলাফল জানতে পারবেন ।

—



প্রাণী পাঠ

* হরেক রকম *

১। কোন্ গাছে ফল কিংবা ফুল হয় না, অথচ তার বংশবিস্তার হয়?

২। এমন কোন্ প্রাণী আছে যার রক্ত নীল?

৩। জয় হবার পর কোন্ জিনিস নড়াচড়া করে না?

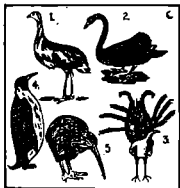
৪। কি এমন জীব আছে, যা পানী হ'য়েও ওড়ে না, যা ছ না-হ'য়েও ঘলে স্নাতার কাটে ও জলের জিনিস খেয়ে জীবন ধারণ করে, ব্রাহ্ম না-হ'য়েও দু'পায়ে দোঁড়া হ'য়ে ইটিতে পারে?

৫। কি পান করলে পেট ভরে না?

(উত্তর পরের পাতায় দেখ)

শ্রীঅসিতকুমার চৌধুরী

* পাখী চেনা *



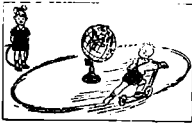
এরা সব কি কি পাখী চেনায়া মেবে তোমরা বলতে পারো কি?

(উত্তর পরের পাতায় দেখ)

* বুদ্ধির দৌড় *

নিচের দেওয়া জিনিসগুলি কার ঘারা এবং কবে আবিষ্কার হয়েছিল, চট্ট ক'রে বলতে পার কিনা দেখ। না পারলে পরের পাতায় দেওয়া উত্তরের সঙ্গে মিলিয়ে নাও।

(১) ডুবোজাহাজ (২) বেলুন (৩) বাপীয় ইম-বোট (৪) ইম-ইজিন (৫) ছুতা শেলায়ের কল (৬) রবার টায়ার (৭) বাইনাইকেল (৮) সেক্টি ম্যাচ বা দেশলাই (৯) টাইপরাইটার (১০) ডিনসাই (১১) টেলিফোন (১২) ডাক্তারী থার্মোমিটার (১৩) ইলেকট্রিক রেলওয়ে বা ট্রাম (১৪) চলচ্চিত্র (১৫) প্রথম মোটর গাড়ী (১৬) রেডিও (১৭) এক্স-রে।



* ছবির মানে *

পাশে বেগুয়া ছবিটি ভাল করে দেখ। একটি বাচ্চা নেয়ে হাতে ত্রিপিং করার একটি দড়ি নিয়ে, পেছনে হাত রেখে হানি-হানি মুখে পাড়িয়ে আছে। অথাক বিশ্বয়ে পাড়িয়ে পাড়িয়ে দেখছে ছোট ভাইটির কীতি। তিনি তো হারখানে একটি মোব রেখে ক্ষত তার চার-দিকে প্রদক্ষিণ করছেন ব্যালেন সাইকেলে। দিকিকে ঐ ভাবে চেয়ে থাকতে দেখে, ছোট ভাইটি বলে, “দিদি, পৃথিবীকে মধ্যে রেখে তার চারদিকে কিসের মত ঘুরছি বলতো?”

উত্তরে দিদি বলে, “ঠিক যেন.....এর মত।”

ছোট ভাইটি বলে, “ঠিক বলেছ।”

এখন ভোমরা বলো ভাইটি দিদিকে কিসের মত বলেছিল? আসলে চার অক্ষরের একটি শব্দ বসাতে হবে এখানে।

ধাধার উত্তর

হরেক রকম—১। বাশগাছ, ২। অক্টোপাস বা কেঁচো, ৩। ডিম, ৪। পেঙ্গুইন, ৫। ধূমপান।

পাখী চেনা—ইন্ড, ম্যাক লোয়ান, লাইরী বার্ড, পেঙ্গুইন, কিউই।

বুজির দোড়—(১) ১৭৭৫ সালে—বুশনেল (Bushnell)। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ব্যবহৃত হয়। (২) ১৭৮৩ সালে—মঙ্গলকিরের (Montgolfier)। এই বেলুনের সাহায্যে মানুষ প্রথম আকাশে ওঠে। (৩) ১৮০৭ সালে—ফালটন (Fulton) বর্তৃক বাষ্পীয় পোত আবিষ্কৃত হয়। (৪) ১৭৭৩ সালে—ওয়াট (Watt)। (৫) ১৮৬০ সালে—ম্যাক (Makay)। (৬) ১৮৬৫ সালে—ট্রাবেনন (Travenon)। (৭) ১৮৫৫ সালে—মিশো (Michaux)। (৮) ১৮৫৪ সালে—প্যাশ (Paash) কর্তৃক সেফটি ম্যাচ বা দেশলাই আবিষ্কৃত হয় প্রথম। (৯) ১৮৬৫ সালে—শোলেস (Sholes)। (১০) ১৮৬৭ সালে—নোবেল (Nobel)। (১১) ১৮৭৬ সালে—বেল (Bell)। (১২) ১৮৬৮ সালে—আলবুট (Albutt)। (১৩) ১৮৭২ সালে—সিমন ও হালসকে (Siemens & Halske)। (১৪) ১৮৮৭ সালে—এডিসন (Edison)। (১৫) ১৮৯১ সালে—দুরিয়া (Dureya)। (১৬) ১৮৯৮ সালে—মাদার কুরি (Curie)। (১৭) ১৮৯৫ সালে—রন্টজেন (Rontgen)।

ছবির মানে—‘শুটনিক’।

॥ সংক্ষিপ্ত জীবনী ॥

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন

(জন্ম: ১৮৭০ মৃত্যু: ১৯২৪)

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের * মৃত্যুতে কবিগুরু
রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—

“এনেছিলে মাথে করে

মৃত্যুহীন জীবন—

হরণে তাহাই তুমি

করে গেলে ধান।”

বিখ্যাত ব্যারিষ্টার ও রাজনীতিক চিত্তরঞ্জন দাশের তিরোধান ঘটে এই ছুন দাসের ১৬ই তারিখে, ১৯২৪ সালে—দাঙ্কিলিং-এ। চিত্তরঞ্জনের পিতার নাম ছিল ভুবনমোহন দাশ। এঁদের আদি নিবাস ছিল ঢাকা জেলার তেলিনিপাড়া গ্রামে। ১৮২০ সালে বি. এ পাশ করে, চিত্তরঞ্জন বিলেত যান এবং ব্যারিষ্টার হয়ে আসেন। ১৯০৭-৮ সালে আলিপুর থোমার মামলার অরবিন্দ ঘোষের পক্ষ নিয়ে ইনি বিশেষ যশ অর্জন করেন। ১৯২১ সালে মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে প্রথম কারাবরণ করেন। এবং ১৯২২ সালে গয়া কংগ্রেসের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রথম মেয়র হন চিত্তরঞ্জন দাশ। ‘স্বরাভ’ পাটি গঠন ও ‘লিবার্টি’ নামক একখানি কাগজ বার করে তাঁর রাজনৈতিক স্বত্বাধি প্রচার করেন এবং অসহযোগ বুদ্ধিসত্তার পরিচয় দেন। বাঙলা-সাহিত্যের প্রতিও তাঁর অত্যন্ত অগ্রবাহ ছিল। দেশবন্ধু ‘মারাগণ’ নামক একখানি পত্রিকা প্রকাশ করেন এবং ‘মালক’, ‘দাগর সঙ্গীত’, ‘দালা’, ‘অসুধাধী’ প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন। অসামান্য ত্যাগ ও দানের স্রষ্টা চিত্তরঞ্জনের নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে আমাদের দেশে। কলকাতার ভবানীপুর অঞ্চলে তাঁরই গৃহের উপর ‘চিত্তরঞ্জন সেবাসন’ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

॥ জ্ঞান কি ॥

জ্যাকার্ড

শাড়ীর পাড় বা সূজানী প্রভৃতিতে যে সব রম্যর রম্যর ডিজাইন দেখতে পাওয়া যায়, সেগুলি তাঁদের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া ‘জ্যা:’ নামক একরকম কলের মধ্যে দিয়ে এসে মান। রকম নক্সার সৃষ্টি করে কাপড়ের পাড় প্রভৃতিতে। জে. এন. জ্যাকার্ড নামক একজন ফরাসি এই মিনিসটি প্রথম আবিষ্কার করেন। এখন এই ব্যাণ্ডারে আরও অনেক উন্নতি হয়েছে।

চমরী

একরকম গাড়ী। প্রধানতঃ হিমালয় প্রদেশের কোন কোন স্থানে ও তিব্বতে পাওয়া যায়। শ্রীতের ঘেঁষে বদলায় করে বলে এদের গায়ের লোম দীর্ঘ। এদের লেজে যে লম্বা লম্বা লোম থাকে, তা থেকে চামর হয়। গৃহপালিত পশু হিসাবে তিব্বতীরা এর দুধ খায় এবং এরা ভার বহনের স্রষ্টাও ব্যবহৃত হয়। বস্ত্র চমরীর গায়ের রঙ বেশীভাগই কাল এবং শরীর অত্যন্ত ভারী।

গৌরী সেন

‘লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন’ কথাটা ভোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ। ঈষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলের লোক এই গৌরী সেনের আদি বাস ছিল বহরমপুর মেলায়। পঃ অস্ত্র তিনি কলকাতার আহিহিটৌলার এনে বদলায় করে। লোকে বিপদে পড়লে সব সময় ইনি টাকা দিয়ে সাহায্য করতেন। কেউ বিফল মনোরথ হয়ে এর কাছ থেকে কখনও ফিরে যেত না। কিংবদন্তী আছে যে, একবার তিনি শান্তখানি নৌকো বোকাই করে মেদিনীপুরে কিছু মাল পাঠান, কিন্তু সেখানে সেগুলি পৌঁছেলে দেখা যায় যে, নৌকার সব মাল রূপো হয়ে গেছে।



নতুন বই



(দখলোচনার অতঃপূর্বেই পাঠ্যবই)

ভালিম গাছে মো—অবগাণকর রায়। এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লি., ১৭ বকিম চাট্জো স্ট্রিট, কলিকাতা ১২ হইতে খ্রীঃখ্রিঃ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ২/-

ছোটদের ছড়া লেখার অবগাণকর দিব্যহস্ত। হেলা ফেলা করবে এমন সব কথা মিল তিনি দিয়ে দেন যা পড়তে মজা তো লাগেই এবং অর্থও হয় তার মজার মজায়।

সর্বসম্মত ছোটবড়ো ৩৪টি ছড়া আছে 'ভালিম গাছে মো'-এ। এই ছড়াগুলির সঙ্গে বইখানিতে ছবি আছে ৪১ খানি। শিল্পী পঙ্কজ বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রবন্ধোক্তি পেন এই ছবিগুলি আঁকেছেন খুব সুন্দর করে।

বগলানন্দ, পার্বত্য মুখিক, বিড়ালছানার হিমালয় ভ্রমণ, যেখানে বাঘের ভয়, বাতাসিয়া লুপ, হাভাতে, বাগমহাভাষ্যমী, বমন বারণ প্রভৃতি কয়েকটি ছড়া পড়তে সকলেরই যে ভাল লাগবে তাতে আর সন্দেহ নেই।

বইটি আগাগোড়া ছ'রঙে ছাপা এবং উপরের মলাটটিও স্তারী সুন্দর।

ছোটদের গল্প সঙ্কলন—শ্রীঅনন্দের মুনোপাধ্যায়। আন্তডোব লাইব্রেরী, ৫ বকিম চাট্জো স্ট্রিট, কলিকাতা ১২। মূল্য ১৫/-

বড়দের প্রবীণ ও খ্যাতিমান লেখক অনন্দের মুনোপাধ্যায় ছোটদের ভগ্নেও যে নানা ধরণের লেখা লিখে থাকেন, তার পরিচয় 'মোচাকের' পাতাতেও অনেক সময় অনেকে তোঁমরা পেয়েছ।

তার এই বইখানির মধ্যে ১২টি সুনির্বাচিত গল্প আছে। গল্পগুলির প্রত্যেকটি পড়ে তোঁমরা যে আনন্দ পাবে তাতে আর সন্দেহ নেই। বিশেষ করে 'বেবসুয়ারগণের মর্ত্য-ভ্রমণ', 'একদম ঠাকি', 'পঁচিশ থেকে পাঁচ', 'পান্নি গোপাই' পড়ে আঁমরা যেমন বিম্বিত হয়েছি, তেমনি আনন্দ পেয়েছি।

গুণু ছোটরা কেন, ছোটদের অভি-ভাবকরাও এই গল্পগুলি পড়ে ভাবিক করবেন। কিন্তু এই গল্প-সঙ্কলনের মধ্যে একেবারে ছবি না থাকায় ছোটদের কাছে এর আকর্ষণ অনেকখানি ক্ষুণ্ণ হয়েছে।



ইন্টারমিডিয়েট ও ইন্ট্রাল-কাইনালের পরীক্ষার ফল বেরিয়েছে। পরীক্ষার ফল এবারে খুব ভালো না হলেও মোটামুটি ভালোই হয়েছে, তবে আই. এম. সি. পরীক্ষার ফল আরো একটু ভালো হওয়া উচিত ছিল। বাংলা কৃতকার্য হয়েছে তাদের সাক্ষ্যের ভিত্তে রইলো আমার প্রাণঢালা ভালো-বাসা। আর বাংলা কৃতকার্য হতে পারনি, তাদের বলি—ভারা যেন দুঃখ কোরো না। কর্ম এবং কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করাই আমাদের দায়িত্ব, তার ফলের অধিকারী আমরা নই। ফল ভালো হলে খুবই আনন্দের কথা, আর যদি তা না হয় তার ভিত্তে দুঃখ করে লাভ নেই। —শ্রীতায় বলে, কর্মে আমাদের অধিকার, ফলে নেই। অতএব তার ভিত্তে অহুতাপ করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।

ইদানিং একটা কথা খুব মনে হচ্ছে, সেটা হোল যে পরীক্ষার কৃতকার্য না হওয়া ক্রমশঃ আমাদের এক জাতীয় সমস্যা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এর কারণ কি তা খুঁজে বার করা অসম্ভব খুবই দুর্লভ ব্যাপার। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার কোথায় গলতি হয়ে গেছে তা বোঝা যাচ্ছে না। কেউ কেউ বলছেন ক্রমবর্ধমান ছাত্র-ছাত্রীর তুলনার শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা অত্যন্ত কম, এবং তাইই ফলে ঠিকমত পড়ানো হচ্ছে না। হয়ত তা কিছুটা সত্যি—কিন্তু কলেজে বা স্কুলে পড়ানো শেষ হলে তারপরে আমরা আমাদের পড়া শেষ করবো এই ধারণাটা থাকে উচিত নয়। কারণ স্কুল কলেজে নানা কারণে হয়ত নির্দিষ্ট পাঠ্য-বই শেষ করা সম্ভব হয় না—তাবলে আমরাও সে বিষয়ে নিষ্ক্রিয় থাকবো-কেন। তবে এটা স্বীকার্য যে, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা আরো বাড়ানো প্রয়োজন। কারণ, ক্রমে অত্যধিক মাত্রায় ছাত্র-ছাত্রী থাকলে পড়ানোর যে শাস্ত্রতাব তা ভীষণভাবে বিঘ্নিত হয়। পড়ানো হওয়ার চেয়ে হটগোলটাই হয় বেশী। আরো একটা কথা এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে সেটা হোল যে, পরীক্ষার মানদণ্ডও ভীষণভাবে নেমে যাচ্ছে আনকাল। পাশের হার শতকরা ৩৬ থেকে ৩০ করা সত্ত্বেও ইংরাজী ও বাংলার পাশের সংখ্যা মোটেই আশাভরূপভাবে বাড়ছে না। মনে হয় এর কারণ হোল, পাঠ্য-পুস্তক পড়ার চেয়ে সাহায্যকারী বই (Help Books) পড়ার দিকে আমাদের ঝোঁক বেশী পড়ছে—ইদানিং প্রশ্ন করার প্রেক্ষিতরও পরিবর্তন হচ্ছে, তার ফলে ঐ সাহায্যকারী বই পড়ে প্রশ্নের যথাযথ উত্তর লেখা ঠিকভাবে হচ্ছে না।—আশা করি ভবিষ্যতে আমাদের এ বিষয়ে খুব বেশী সচেতন হতে হবে—এবং পরীক্ষার আশাভরূপ কৃতকার্য না হওয়া সেই ইঙ্গিতই দিচ্ছে।

গত ১৬ই জুন বাংলা ওড়া ভরতের দুই দিকপালের—একজন বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অন্তর্জন রাজ-নীতি ও মানবতার ক্ষেত্রে—মৃত্যু-বাধিকী অহুতিত হলো। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে অপরিশীল সাধনা করে গেছেন তা দু'এক কথায় বলে শেষ করা যায় না। বাঙ্গালীর শিক্ষা-জীবনে বিজ্ঞানের জয়যাত্রার পথ তিনিই নতুনভাবে উদ্বোধন করেন। বিজ্ঞানের রহস্য ও কঠিন আবরণ

উন্মোচন করে তিনি বিজ্ঞানে অসামঞ্জস্য, তদ্বৎ শঙ্কা দূর করার পবিত্র-ব্রত গ্রহণ করেছিলেন।—আচার্য শুধু ঐ একটি মাত্র কারণে আমাদের কাছে যে স্মরণীয় হয়ে আছেন তাই নয়, বাঙালীর ব্যবসায় বিদ্যুৎতাকে নানাবিধে সমলোচনা করে বাঙালীর মনকে ব্যবসায়ী-মনোবৃত্তিতে উৎসাহ করে তুলেছিলেন। আচার্যের এই সাধনা ও ত্যাগকে আমরা আজ সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করি।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনর প্রসঙ্গ মৃত্যুসময়ে বলার মত কিছুই নেই। ব্যাধিটায় চিত্তরঞ্জন জীবনের সব কিছু বাস্তব স্বপ্ন, ঐশ্বর্য বিলাস-বাসন ত্যাগ করে কাঁপিয়ে পড়েন দেশের বৃহত্তম আশ্রানে। সে আশ্রানে দেদিন অনেকেই সাক্ষাৎ করেছিলেন—কিন্তু দেশবন্ধু ছিলেন তাঁদের অন্ততম অনন্ত। রাজনৈতিক প্রতিভায় দীপ্ত চিত্তরঞ্জন বাংলার রাজনৈতিক জীবনকে মৃত্যু করে সজীবিত করে তুলেছিলেন। চিত্তরঞ্জনর শুধু এই দিকটি জানলেই আমাদের সম্পূর্ণ জানা হোল না—তিনি ছিলেন অক্লান্ত দৃষ্টি-দৃষ্টি-পীড়িতজনের দরলী মাধুর্য। কত শত জনের অভাব-অনটন দুঃখ-দুরবস্থা তিনি যে দূর করেছেন তা দু'এক ছব্রে বলে শেষ করা যায় না। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

“এনেছিল মাগে করে মৃত্যুহীন প্রাণ

মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান ॥”

—মৃত্যুহীন চিত্তরঞ্জন আজও আমাদের কাছে স্মরণীয় হয়ে আছেন। তাঁর অমরাত্মার প্রতি রইলো আমাদের ত্রিপিপ্লব প্রশংসা।

এবারে তোমাদের চিঠির স্রাব দিই : সমরেশ, নিখিলেশ ও অনিমেঘ ভট্টাচার্য (কোলকাতা)—তোমাদের চিঠি পেয়ে আনন্দ হোল। রত্না ঝোঁপাধ্যায় (কোলকাতা)—গরমের ছুটিতে পুণী গিয়েছিলে কেনে খুসী হলাম। শিবানী রায়চৌধুরী (বাবানীপুর)—তোমার চিঠি পড়ে বেশ ভালো লাগল। আশা করছি স্বন-ফাইনাল পত্রিকার সাফল্যের সংবাদ পাবে। জিতেন্দ্রনাথ ঝোঁপাধ্যায় (বেণীপুর)—তোমার দু'খানা চিঠিই পেলাম। তুমি ঋণ ঠিকানা জানতে চেষ্টা, তাঁর ঠিকানা আমার জানা নেই। আশা করি এবারে তোমার লেখা বখানানে পাঠাতে তুলে হবে না। দীপক রায় (মিউ আলীপুর)—বিজ্ঞ হবার খবর পেয়ে আনন্দিত হলাম। তোমরা দু'জনে পার্থক্য বিজ্ঞ হও এই আমার অন্তরের আশীর্বাদ। শ্রীভি ঘোষ (পতিচৌরী)—তোমার হাতে আঁকা ছবিটি 'বখানানে' দিলাম, মনোমীত হলে প্রকাশিত হবে। অঞ্জলি সেনগুপ্ত (জামাবাজার), যুগল দাস ও চিন্ময় বসু (বাগবাটার), আনন্দ সেন (ভবানীপুর)—তোমাদের সকলের চিঠিই পেয়েছি।

আজ্ঞা আজ এইখানেই শেষ করি। আমার শুভেচ্ছা ও ভালবাসা রইল তোমাদের অঙ্গে।

তোমাদের—

মহুদী

শ্রীমদীপচন্দ্র সরকার কর্তৃক ১৪ বর্ষের চাট্‌জো স্ট্রিট, কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত

ও তৎকর্তৃক প্রকৃত প্রেস, ৩০ কর্মণ্ডালিস স্ট্রিট, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত

মূল্য : চল্লিশ নয়া পয়সা



পুথির বিষয়ে

756

012/20

8/ CENTRAL
LIBRARY
UNIV - K



৩৯ বর্ষ]

শ্রাবণ-১৩৬৫

[৪র্থ সংখ্যা

বিষ্টি পড়ে

ত্রিবিভুত্সাদ বসু

বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর টুপ

বিষ্টি পড়ে—

দস্তি ছেলে আর কথা নেই চুপ

বন্ধ ঘরে।

বিষ্টি পড়ে—

পাগলা ঝড়ে

মাটির ঘরে

দেওয়াল নড়ে—

গাছের খুঁটি
আঁকড়ে ধরে,
কান্না মিছে
আর্ত স্বরে ।
শাখার ডানা
ঝাপটে মরে—
বিষ্টি পড়ে ।
ধ্বংস শিলা
ধরায় ঝরে—
বিষ্টি পড়ে ।...

বিষ্টি পড়ে
বাদলা ঝড়ে
ন'দেয় বান
উপচে পড়ে—
শিব-ঠাকুরের
বিয়ের তরে
তিন কস্তা
আসেন ঘরে ।
বিষ্টি পড়ে ।...

বিষ্টি পড়ে ঝম ঝমা-ঝম ঝপ
আকাশ কালি—

দৃষ্টি ছেলে কি দেখে আজ চুপ
দুটি জালি' ৭

বজ্র পড়ে
বর্ষা ঝড়ে—
শিকড়-শাখা
প্রবল নড়ে
বিষ্টি পড়ে ।
ঝড় দামাল
উড়োয় চাল
উড়োয় জোর
জীর্ণ ঝড়ে
বিষ্টি পড়ে ।...

গড়তে ভাঙে
ভাঙতে গড়ে,
সমান কাঁপে
চেতন জড়ে ।
বিষ্টি পড়ে ।...
ধ্বংস ধরার
রক্তে চড়ে—
ঘূর্ণি ঝড়ে
বিষ্টি পড়ে ।...



(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

৬১

আঠারোশ তিরানকুই সালের একত্রিশে মে জাহাজ ছাড়ল স্বামীজির। তাঁর বয়েস তখন ত্রিশ বছর সাড়ে চার মাস।

দশ কমণ্ডলু আর কৌপীন ধীর একমাত্র সত্বল জাহাজে তাঁকে এক বিস্তীর্ণ লটবহর সামলাতে হচ্ছে, পোশাকের আর বিছানার, ট্রান্স আর ওয়ার্ডরোব বোঝাই যত বিচিত্র আচ্ছাদন। এ সব কি আমার কর্ম। এ সবার তদারক করতে-করতেই কি সমস্ত শক্তি ব্যয় হয়ে যাবে? কিন্তু উপায় নেই, মহাকালের নির্দেশ পালন করতে চলেছি—আর ঠাকুর বলে দিয়েছেন, যখন যেমন তখন তেমন।

অন্তর্জ্যোতির্ময় দীর্ঘদেহ পুরুষ, সিংহের মত বিচরণ করছে। স্বয়ং কাপ্তেন পর্যন্ত আকৃষ্ট না হয়ে পারছে না। নিজের থেকে জুড়ে দিয়েছে গল্প, জাহাজের কলকল্লা এটা-দেটা সব বোঝাচ্ছে সমস্তে আর সব তাতেই স্বামীজির শিক্ষার্থীর মত কৌতূহল। যাত্রীদের সঙ্গেও আলাপ জমে গেছে, আলাপের থেকে অবধারিত বন্ধুত্ব। বিদেশী খাত বিদেশী রীতিপদ্ধতি বিদেশী পরিবেশ, তবু খাপ খাওয়াতে বেগ পেতে হলনা। সদাজাগ্রত তীক্ষ্ণ মনের কাছে কোনো সংস্কারই বন্ধন নয়।

সাতদিন পরে কলকাতাতে জাহাজ পৌঁছুল। পুরো একদিন থামবে। স্বামীজি শহর দেখতে বেরলেন। গাড়ি করে গেলেন প্রসিদ্ধ বুদ্ধমন্দিরে যেখানে বুদ্ধের সুবিশাল মূর্তি—পরিনির্বাণমূর্তি—শুয়ে আছে। তদ্ব্যয় হয়ে দেখতে লাগলেন বুদ্ধকে।

মানুষকেই বড় করেছেন বুঝ্‌দেব, মানুষের মুখকে তিনি ফিরিয়ে দিয়েছেন দেবতার দিক থেকে, ফিরিয়ে দিয়েছেন নিজের দিকে, আত্মশক্তির দিকে। মানুষ হীন নয় দৈবাত্মন নয়, মানুষ তার উজ্জমে ও অধ্যবসায়ে মহীয়ান।

নিরন্তর চেঁচা নিরন্তর আঁগ্রহ—নিরন্তর দাঁড় টেনে যাওয়া। হীনবল হীন সাহস না হওয়া। ‘কখনো হীন সাহস হবিনি। খেতে শুতে পরতে, গাইতে বাজাতে, কনোরোলে কেবলই সংসাহসের পরিচয় দিবি। ভাববি আমি কার সম্মান? তবে কেন আমার এই দুর্বলতা? হীনবুদ্ধি হীন সাহসের মাধ্যম লাখি মেরে, আমি বীর্যবান, আমি মেধাবান, আমি ব্রহ্মবিৎ—বলতে বলতে দাঁড়িয়ে উঠবি। রামপ্রসাদের গান শুনিসনি? তিনি বলতেন, এ সংসারে ডরি কারে রাখে যারে মা মহেশ্বরী। এমনি অভিমান সর্বদা জাগিয়ে রাখতে হবে। তাহলে মনে কখনো দুর্বলতা আসবে না। মহাবীরকে শ্রবণ করবি। তাহলেই মহামায়া কৃপা করবেন।’

বনপথ দিয়ে যাচ্ছেন নারদ, কাহিনী বলছেন স্বামীজি, দেখতে পেলেন একামনে বসে এক যোগী ধ্যান করছে নিশ্চল হয়ে। তার চারদিকে ছোট-বড় বিচিত্র উইয়ের ঢিবি উঠে গেছে। তবু স্থান বদল নেই যোগীর, এমন অনন্তলক্ষ সাধন। নারদকে দেখতে পেয়ে যোগী জিগগেস করলে, প্রভু কোথায় যাচ্ছেন?

নারদ বললে, বৈকুণ্ঠে যাচ্ছি।

তাহলে দয়া করে নারায়ণকে জিগগেস করবেন, আমার আর মুক্তির দেরি কত? সাম্মুখে বললে সেই যোগী।

কতদূর এগিয়েছেন নারদ, আরেকজনের সঙ্গে দেখা। তার সাধন-ভজন কিছু নেই ধ্যান-সমাধির সে ধার ধারেনা। সে শুধু লক্ষ-কক্ষ করছে আর গান গাইছে। সে গানেও না আছে শুর না আছে তালমান। কণ্ঠস্বরও বিকৃত-কর্কশ। নারদকে দেখে উল্লসিত হয়ে সে জিগগেস করলে, ‘কোথায় চলেছেন প্রভু?’

বৈকুণ্ঠে।

বাঃ, তাহলে একবার জিগগেস করবেন তো ভগবানকে, আমার মুক্তির আর কতদিন।

বৈকুণ্ঠ থেকে তারপর যখন ফিরছেন নারদ, সেই বন্দীকল্পপাবত যোগীর সঙ্গে ফের দেখা। যোগী জিগেস করল, আমার কথা বলেছিলেন নারায়ণকে ?

বলেছিলাম।

কি বললেন নারায়ণ ?

বললেন, আরো চার জন্ম লাগবে।

আরো চার জন্ম ? বিলাপ করতে লাগল যোগী। এত যম নিয়ম আসন প্রাণায়াম এত ক্লেশকৃচ্ছ, এত একাগ্রসংযোগ, চারদিকে বন্দীকল্প উঠে গেল তবু এখনো চার জন্ম বাকি ? যোগী আর্তনাদ করতে লাগল।

আরো কিছুদূর এগিয়ে সেই নাচুনে লোকটার সঙ্গে দেখা।

কি হে দেবর্ষি, আমার কথা জিগেস করেছিলে ভগবানকে ?

করেছিলাম।

কি বললেন ? আরো কত জন্ম ?

তোমার সামনে এই তেঁতুল গাছ দেখতে পাচ্ছ ?

পাচ্ছি।

এর কত পাতা পারছ গুনতে ?

ওরে বাবা, অসংখ্য অগণন—

ও গাছে যত পাতা, ভগবান বললেন, তোমার তত জন্ম বাকি !

আনন্দে নৃত্য করতে লাগল সেই লোক। বলতে লাগল, এত শিগগির ? এত শিগগির ? এত কম জন্ম ? এত অল্প সময় ?

নারদ বিমূঢ়ের মত রইল তাকিয়ে।

সেই লোকটা বলতে লাগল, তবু আমি যে আমি, আমরা তো একদিন মুক্তি হবে, আমিও একদিন পাব সেই পরমপদ। কি মন্দা। হোক লক্ষ জন্ম, হোক কোটি জন্ম, কোটি-কোটি জন্ম, তবু একদিন আমরা তো হবে সেই অধিকার, তাইতেই আমি কৃতার্থ। আমি কিছুতেই নিরুদ্বম নই আমার যাত্রায়, কিছুতেই অবসাদ নেই আমার অধ্যবসায়—

বৎস, দৈববাণী হল, এই মুহূর্তেই তুমি মুক্ত। যে উজ্জমলীল যে অধ্যবসায়-সম্পন্ন উচ্চতম-ফল শুধু তারই প্রাপ্য।

কলহো থেকে পেনাঙ, পেনাঙ থেকে সিঙ্গাপুর। সিঙ্গাপুরে নামলেন স্বামীজি। গেলেন বোটানিক্যালগার্ডেন দেখতে। কত জাত ও চেহারার পাম-গাছই না এখানে লালিত হচ্ছে। এই সেই কটিকলের গাছ। মাত্রাজে যেমন আম অপরিপুষ্ট এখানেও তেমনি ম্যাঙ্গোস্টিন! ম্যাঙ্গোর সঙ্গে ম্যাঙ্গোস্টিনের কি তুলনা হয়? আম হচ্ছে অমৃতের নামান্তর।

সিঙ্গাপুর থেকে হংকং। হংকঙেই বিশাল চীনের প্রথম আভাস, এই সেই চীন, স্বপ্ন আর রূপকথার রাজ্য। কে জানে তাদের কর্মচাকলাই হয়তো রূপকথা, তাদের কর্মনৈপুণ্যই বৃষ্টি স্বপ্নের মত। জাহাজ পারে নোঙর করার সঙ্গে সঙ্গেই শয়ে-শয়ে নৌকো এসে হাজির, ডাঙায় নিয়ে যাবে। আর সেই সব নৌকোর মাঝি মেয়ে। নৌকোও অদ্ভুত, দুটো করে হাল। মেয়ে মাঝি একটা হাল হাত দিয়ে আরেকটা হাল পা দিয়ে চালাচ্ছে এক সঙ্গে, ছেলের এতটুকুও হেরফের হচ্ছে না। আর সব চেয়ে মজা, তাদের পিঠে একটা করে ছেলে বাঁধা, মার যেটা কনিষ্ঠ। ছেলেগুলোর একটুও ভয় নেই, একটুও কান্নাকাটা করছে না, বরং দিবি হাত-পা নাড়ছে, তাকাচ্ছে মিটমিট করে। প্রাণপণ শক্তিতে মা-রা নৌকো চালাচ্ছে, বোঝা সরাচ্ছে, এক নৌকো থেকে আরেক নৌকোয় লাফিয়ে পড়ছে, যে কোনো মুহূর্তে শিশুটার টিকিওলা মাথাটা গুঁড়া হয়ে যেতে পারে, তবে মা ও শিশুর কান্নাই ক্রক্ষেপ নেই। মাঝে মাঝে মা যে তাকে একটু করে ভাতের মণ্ড খেতে দিচ্ছে তাইতেই শিশু মহাপ্রসন্ন।

যে মায়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে তার আর ভয় কি, অভাব কি। রাগতে হলেও মা ফেলতে হলেও মা। মায়ের কাছে যদি আঘাত পাই মায়ের কাছেই আবার উপশম পাব।

এই প্রথম উপলব্ধি হল স্বামীজির, চীন কত দরিদ্র, ভারতবর্ষেরই মত। সভ্যতার যারা ভিত্তি তারা যে সোপান ধরে উঠতে পারছে না উচ্চতরে তার কারণই হচ্ছে দারিদ্র্য, সবচেয়ে বা কঠিন শৃঙ্খল। নিত্য অভাব ও দারিদ্র্যের তাড়নায় যারা

উদ্ভাস্ত তাদের অশ্রু চিন্তা করবার সময় কোথায়? পেটে যার ভাত নেই মাথায় তার কি থাকবে?

হংকং থেকে ক্যাটন। শুনলেন এখানে অনেক চীনে-মঠ আছে, একটা কোথাও দেখে আসি। খোঁজ নিয়ে জানলেন বিদেশীদের সেই মঠে ঢোকবার অধিকার নেই। অধিকার নেই? স্বামীজির রোক চাপল। কি হয় যদি বিদেশী কেউ ঢোকে? স্বামীজির দোভাষী বললে, খুন করে ফেলে। চলোই না দেখি না, কেমন খুন করে। যারা মঠবাসী তারা বৃদ্ধাশ্রমী আর তারা নিশ্চয়ই জানে বৃদ্ধর জন্ম হিন্দুর দেশ, ভারতবর্ষ। যদি তাদেরকে জানানো হয় তিনি সেই ভারতবর্ষের একজন হিন্দু সাধু তবে নিশ্চয়ই তারা হেড়ে দেবে দরজা, আমাকে মনে করবে তাদের সহোদর-সগোত্র।

দোভাষী তবু দ্বিধা করতে লাগল। স্বামীজি বললেন, 'আগেই পালাই কেন, দেখি না তাদের কেমন অভ্যর্থনা।'

কেমন অভ্যর্থনা? ফটকের কাছে যেতেই চার-চারজন মঠবাসী হাতে গদা নিয়ে মার-মার শব্দে তেড়ে এল।

ঐ, ঐ দেখুন। ভীতব্যস্ত দোভাষী পালাবার জন্তে ফিরে দাঁড়াল।

তার হাত চেপে ধরলেন স্বামীজি। বললেন, 'পালাতে চাও পালাবে, আমি একাই মরব, কিন্তু যাবার আগে বলে যাও চীনে ভাষায় ভারতবর্ষের যোগীকে কি বলে?'

অক্ষুটস্থরে সেই প্রতিশব্দটা উচ্চারণ করে দোভাষী উর্ধ্বাঙ্গে ছুট দিল।

দূর হতে শব্দের ধ্বনির মত ঘোষণা করলেন স্বামীজি, আমি যোগী, আমি ভারতবর্ষের যোগী।

সাপের ফণায় ধুলো পড়ল। যে হাত গ্রহণে উত্তপ্ত ছিল তা প্রণামে অবনত হল। আপনি যোগী? আশ্রম অশ্রম আমাদের মঠে। আমাদের ধ্যান করুন।

মুহূর্তে ইন্দ্রজাল ঘটে গেল দেখে দোভাষী এগুলো ধীরে ধীরে।

বিচিত্রশব্দে লোকগুলো কোলাহল করতে লাগল। একবর্ণ বোঝেন স্বামীজির সাধ্য কি।

শুধু একটা কথা তাঁর হৃদয়ঙ্গম হচ্ছে। সে কথাটা হচ্ছে ‘কবচ’, আর তাদের হাতের ভঙ্গি থেকে অনুমান করতে পারছেন, হিন্দু যোগীর কাছে তারা কবচ চাইছে।

দোভাষীকে জিগগেস করলেন স্বামীজি, ‘কবচ কথাটার কি মানে? কি চাইছে ওরা?’

‘ওরা কবচই চাইছে, মন্ত্রপূত কবচ, যাতে করে ওরা ভূতপ্রেত বা অশুভ আত্মার থেকে রক্ষা করতে পারে নিজেদের। আর কিছু নয়, আপনার কাছ থেকেই ওরা ত্রাণ চায় আশ্রয় চায়।’

এই কথা? স্বামীজি পকেট থেকে শাদা কাগজ বের করলেন ও তাকে ভাঁজ করে করে টুকরো-টুকরো করলেন ও প্রতিটি টুকরোতে সংস্কৃত অক্ষরে লিখলেন, ও, তৎস্বাতীত সত্যের যা ঘনোক্ত মন্ত্র। প্রত্যেককে দিলেন একটি টুকরো। প্রত্যেকে অন্ধারিত মাথায় তা গ্রহণ করল। প্রণাম করল স্বামীজিকে, মঠের মধ্যে নিয়ে চলল।

মঠের মধ্যে অগণিত সংস্কৃত পুঁথি, আর কি আশ্চর্য, সেই সব সংস্কৃত বাংলা অক্ষরে লেখা। বৌদ্ধদের যে দারুণ মূর্তি সাজানো আছে, সব যেন বাঙালির মূখ। কত বাঙালি ভিক্ষুই না এসেছিল চীনে বুদ্ধের অনির্বাক্ত নির্বাক্তবানীর দীপ নিয়ে। তারা আজও জ্বলছে, আজও জাগছে স্বামীজির চোখে। স্বামীজিকে প্রেমময়নেত্র আশীর্বাদ করছে।

(ক্রমশঃ)

পরিচয়

জীনগেন্সকুমার মিত্রমজুমদার

মজুমদার নন্দী রায়ের লম্বা ভীষণ নাক,
দিন-ভূপূরে গভীর রাতে যায় শোনা তার ডাক।
খলোবাবুর বঁটা গায়ের লম্বার চেয়ে কালো,
কালোবাবুর বঁটা গায়ের বেন চাঁদের আলো।
লম্বা ঠোঁটের নবীন বুড়ো ভালপাতার দেয়ার,
হাত দুটো তার নলি নলি অস্থি গোনা যায়।
বিশ্বানিন্দীর সবটা গলার কাব না পরিচিত।
মনরাত তার অগড়া শুনে সবাই লক্কিত।

টেকাটাের টাকটা বড়—টেকা লম্বার চেয়ে,
ভেল জল বা ঢালে মাথায় পড়ে চিবুক বেয়ে।
নেবেন চাঁকোর পেটটা বেন জলের বিঘট জাল,
এক এক ঘাসে খেয়ে ফেলে অন্ন ছ'চার খাল।
দয়ালটানে কে বলেনা কল্প হৃৎকার ?
ফোঁকলা দেতো হৃৎলটাকুর তার কি কথার জোর !
খয়রা চোখো কয়রাটাকুর দৃষ্টি অলঙ্কণে,
খুঁজতে এদের হয় না পাড়ায় পরিচয়ের স্তনে।

খোকার কথা!



অফিস থেকে এসে

বাবা বলেন হেমে:

রচনা তুমি লেখোনা-এতো তোমারি অন্যথা!

খোকন বলে: কালিকোথা? কালি বিলে

কি রচনা লেখা যায়?



দাদা বলেন: অনেক কালি আছে দিদির

কাছে,

আমারো আছে বিলেতী কালি দেবাজে

এক ডজন,

এব দিয়ে লেখো নাকেন? বকছো

ওধ বাজে।

লেখার অল্প কালির দোষ দিচ্ছ কেন

খোকন?

খোকন বলে ঠাড়া বৈকিয়ে, দু'চোখ

ক'রে টেরা:

তোমার কালি, দিদির কালি, কালিতে

নয় ছাই!

লেখার মতো লিখতে হ'লে অব

দেশের মেলা

অবদু প্রিয় 'মুণেখা' কালি চাই॥



ছেলেমেয়েদের জন্যে আবেকটি সহজ গিবস্ ডেন্টাল্ফিস্ চিহ্ন প্রতিযোগিতা লোভনীয় পুরস্কার !



প্রথম পুরস্কার:
ব্রাসে বাইসাইকেল—



দ্বিতীয় পুরস্কার:
এইচ. এম. ডি গ্রামেফোন



তৃতীয় পুরস্কার:
ডিউ দাঁটার গ্রোমিটার সেট

এবং আরও ১০০টি লোভনীয় পুরস্কার:

এই ছবিটিতে রং দাঁও। এটি এত সহজ, এত মজার! তুমি এমন কিছু একটা জিতে যেতে পার যা পাওয়ার ইচ্ছে তোমার অনেকদিনের। তুমি গুয়াটার কালার, রংগে পেনসিল, হুডে চক্ বা যে কোন রং তোমার কাছে আছে ব্যবহার করতে পার। তুমি ছবিটিকে বসে পার হুম্বর কর। তারপর ছবিটি আমাদের কাছে পাঠিয়ে দাঁও— গিবস্ ডেন্টাল্ফিস্ মাকনের ওপরে সেলাফোনের মোড়কের ওপরের গিবসের সীলটি শুদ্ধ। মাকে বসে আদাই তোমার একটা গিবস্ ডেন্টাল্ফিসের কোটা কিনে দিতে। প্রত্যেকদিন ব্যবহার কোর কিছু গুটা। তিনমাস বিচারক নিয়ে তৈরী একটি গোষ্ঠী দ্বারা করলে যোগ্যতা অধ্বাঙ্গী কোন ছবিগুলি শ্রেষ্ঠ। আদাই বোণ দাঁও। এই নিয়মগুলি মনোযোগ দিয়ে পড়: ১। ভারতের অধিবাসী ১৪ বৎসর বয়স পর্যন্ত সব ছেলেমেয়ে এই প্রতিযোগিতায় বোণ দিতে পারে। ২। তুমি দস্তগুলা ইচ্ছে ছবি পাঠাতে পার কিন্তু প্রত্যেকটি ছবির সঙ্গে গিবস্ ডেন্টাল্ফিস্ মাকনের ওপরে সেলাফোনের মোড়কের ওপরের গিবসের সীলটি পাঠাতে হবে। ৩। তোমাদের ছবিগুলি এই ঠিকানায় পাঠাও: গিবস্ ডেন্টাল্ফিস্ কংট্রে, শো: আ: বক্স নং ১০১১১ বোম্বাই ১। ৩০ শে আগষ্ট, ১৯৪৮ অর্থাৎ নবমবার বেসো ১ টার মধ্যে এগুলো আমাদের কাছে পৌছন দরকার। ৪। যদি কোন ছবি হারিয়ে যায়, পৌছতে দেয়ী হয়, এমিক গমিক হয়ে যায়, অথবা পত্রাণ হয়ে যায় তার মধ্যে কোম্পানী দায়ী হবেননা। ৫। ১ম, ২য় এবং ৩য় পুরস্কার যারা পাবে তাদের নাম এই পত্রিকার মডেবর সংখ্যাতে ঘোষনা করা হবে। অন্যান্য পুরস্কার বিজয়ীদের ডাক কারকং জানানো হবে। ৬। কোন একজন



নাম _____

আমার ঠিকানা _____

আমি জানাচ্ছি এই ছবিটি বিনামূল্যে
আমার নিজের সংগ্রহ এবং আমার
বয়স—

প্রতিযোগী একটির বেশি পুরস্কারের অধিকারী হতে পারেন।
৭। বিচারকদের মতামতই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে এবং
প্রত্যেককে মেনে নিতে হবে। ৮। এই প্রতিযোগিতার
ব্যাপারে কোন চিঠিপত্রের আদানপ্রদান চলবেনা।

জিবস্ ডেন্টিফ্রিস্

দাঁত ভাল পরিকার করে,
খাব ভাল, আর চলে অনেক দিন।



১৮৯৩

সাল থেকে

আপনাদের সিবাইনিয়াজিত



অমৃতাজন বোজি:

ডাক্তার অর্পিত বৈদ্য নামক চন্দ্র
অমৃত, বসন্ত, সর্দি, কালি, কৌর
প্রকৃতি বৈদ্যে প্রাপ্ত ফলপ্রস

দাদের মলম

কলি:

অর্পিত ডাক্তার অর্পিত নামক চন্দ্র
দাদ, বসন্ত, প্রকৃতি চর্মরোগে প্রাপ্ত ফলপ্রস



প্রস্তুতকারক —
অমৃতাজন লিঃ-পোঃ বক্স নং ৬৮২৫, কলিকাতা-৭
বোম্বাই চাডোজ কলিকাতা

শ্রীস্বধীরচন্দ্র সরকার-কৃত

পৌরাণিক অভিধান

মানব সভ্যতার সব চেয়ে বড়ো স্মৃতি হ'ল বই। হাজার হাজার বছরের সংস্কৃতি ও জীবনধারণ বহু বিচিত্র বাস্তব অবিচ্ছিন্ন স্রূজে বিধৃত হ'য়ে থাকে শুধু বইয়ের পৃষ্ঠাতেই। সমস্ত-প্রকাশিত 'পৌরাণিক অভিধান' এমনি অসংখ্য বইয়ের সাব-সমুদ্র বিবাত সংগ্রহ-গ্রন্থ। কেবলমাত্র অষ্টাদশ পুরাণ ও উপপুরাণ নয়,—সমগ্র বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, সংহিতা সম্পর্কিত অসংখ্য চরিত্র ও আত্মবী কাহিনী এই গ্রন্থে মনোজ্ঞ ভাষায় আলোচিত হয়েছে। সাধারণ অভিধানের সমগোত্র নয় বলেই 'পৌরাণিক অভিধান'-এর সরস কাহিনীগুলি প'ড়ে সাধারণ পাঠক-পাঠিকা পরিতৃপ্ত হবেন এবং ছাত্র, শিক্ষক ও সাহিত্যকর্মীরাও উপকৃত হবেন অজন্মভাবে। দেব-দেবীগণের স্বপ্ন ও হৃদোন্মত্ত চিত্রগুলিও এই অভিধানের অন্ততম আকর্ষণ

মূল্য : দাত টাকা

এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড

১৪, বঙ্কিম চাটজো স্ট্রীট, কলিকাতা-১২



সন্ন্যাসিনীর ত্রিভুজ কল শ্রদ্ধাঙ্গীকার

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

বেশ ঘুম ঘিয়ে সন্ন্যাসিনী চোখ মেলাল। চাঁদ অস্ত গেছে, আকাশের মেঘ কেটে গিয়ে এক আকাশ তারা ঝলমল করছে। ছাউনিতে সাড়া পল নেই, সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে।

সন্ন্যাসিনী তারু আর কানাতের বিছানার ওপর আঙু আঙু উঠে বসল। কোমরে হাত দিয়ে মেথল নারকেল ছোবড়ার ধড়ি আর চক্‌মকি পাথর ঠিক আছে, লোহা বীখানো পাঁচনবাড়িও হাতের কাছে আছে। এতক্ষণে তার চোখে অন্ধকার সরে গেছে; তার কানও খুব তীক্ষ্ণ। সে সমস্ত ইঞ্জির সন্ধান করে কিছুক্ষণ শব্দ হয়ে বসে বইল।

না, ছাউনির সবাই ঘুমোর নি, চৌকিদারেরা জেগে আছে। কামানের পাশে দু'জন চৌকিদার আগের মতই টহল দিচ্ছে, তাছাড়া কয়েকজন চৌকিদার মশাল জালিয়ে সমস্ত ছাউনি ঘিরে চকর দিচ্ছে। তারা চকর দিতে দিতে মাঝে মাঝে চীৎকার করে হাঁক দিচ্ছে—‘হঁসিয়ার! হঁসিয়ার! দুবমনের এলাকায় শাবথানে ঘুমোও।’ মশালের আলোতে চৌকিদারদের দেখে মনে হয় ওরা মাহুদ নয়। প্রেতমূর্তি; ওদের বিকট হাঁক শুনে পিলে চমকে ওঠে।

সন্ন্যাসিনী মনে মনে ভবানীর নাম স্মরণ করে নিল, তারপর হামাগুড়ি দিয়ে তাঁবুর গাথা থেকে নামল। যেসকলে বাহুরের পিণে কানাৎ-ঢাকা আছে সেই দিকে চলল। কাণো বিভ্রাল অন্ধকারে যেভাবে চলল সেইভাবে চলল। একটু শব্দ হল না।

যে চৌকিদারগুলো ছাউনির চারপাশে ঘুরে ঘুরে পাহারা দিচ্ছে তারা অস্ত্র দিকে চলে গেল। যে দু'জন কামান পাহারা দিচ্ছে তাদের মশাল নেই, অন্ধকারেই পাহারা দিচ্ছে; তারা একবার কামানের সারির এধারে আসছে, একবার ওধারে চলে যাচ্ছে। সদাশিব কামানের সারির দশ-বারো গুলেও মধ্যে এসে একটা ঝোপের আড়ালে মাটিতে বুক দিয়ে শুয়ে পড়ল। চৌকিদার দু'জন এদিকেই আসছে।

সদাশিব নিঃশব্দ বদ্ধ কণ্ঠে শুনতে লাগল। চৌকিদারদের পায়ের শব্দ এক জায়গায় এসে থেমে গেল। তারা নীচু গলায় কথা কইছে। একজন বলল,—‘কি মিঞা, ঠাণ্ডা লাগছে?’

দ্বিতীয় চৌকিদার বলল,—‘হাঁ আগা, বেশ ঠাণ্ডা। পাহাড়ে বেশ, তাই রাজে ঠাণ্ডা পড়ে। একটু আগুন জ্বালতে পারলে বড় ভাল হত।’

আগা বল,—‘খবরদার! আগুনের নাম মুখে এনোনা। বাকদের কাছে আগুন জ্বাললে গর্দানে মাথা থাকবে না।’

উত্তরে মিঞা কি বলল শোনা গেলনা, তারা আবার কামানের সারির দু’পাশ দিয়ে উল্টো দিকে কিয়ে চলল। তাদের কথা শুনে সদাশিব নিশ্চিন্ত হল, বাকদের পিঁপে এখানেই আছে।

তাদের পায়ের আওয়াজ ঘুরে মিগিরে ঘাবার পর সদাশিব বোপের আড়াল থেকে বেরল, হাঙ্গাড়ি দিয়ে ছায়ার মত গরুর গাড়ির দিকে চলল। তাকে যদি কেউ দেখতে পেত, মনে করত একটা প্রকাণ্ড কীকড়া গর্ত থেকে বেরিয়ে শিকার খুঁজে বেড়াচ্ছে; মাহুঁব বলে চিনতে পারত না।

দশ-বারো গুল এই ভাবে গিয়ে সদাশিব সামনের গরুর গাড়ীর তলায় লুকিয়ে পড়ল। ঠিক এই সময় শুনতে শেল চৌকিদারেরা কিয়ে আসছে। সদাশিব গরুর গাড়ীর তলায় মাটির সঙ্গে বিশেষ নিঃশব্দে বসে রইল।

চৌকিদারেরা সামুনা-সামুনি হয়ে আবার কথা কইল। সদাশিব তাদের পা থেকে কোমর পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছে; তারা এত কাছে এসে ঠাড়িয়েছে যে, সে হাত বাড়িয়ে তাদের ছুঁতে পারে।

একজন বলল,—‘মিঞা, এ সময় এক পেহালা শিরাজি হলে কেমন হত?’

মিঞা বলল,—‘শিরাজি মাথায় থাক, এক ভাঁড় ভাড়ি গেলে বর্তে যেতাম আগা।’

আগা গলার মধ্যে হাসল, তারপর দু’জনে আবার কিয়ে চলল। তাদের পায়ের আওয়াজ বন ঘুরে চলে গেল তখন সদাশিব গরুর গাড়ীর তলা থেকে ভিতর দিকে যেখানে কানায় ঢাকা ব্যালনের পিঁপে আছে সেইখানে ঢুকে পড়ল, কানায়ের কোণ ভুলে তার তলায় লুকিয়ে রইল। এখানে বেশ নিরাপদ, বাইরে থেকে দেখা যাবার ভয় নেই।

এতক্ষণে সদাশিব ঠিক জায়গায় এসে পৌঁছেছে। এবার আসল কাজ। কানায়ের তলায়

কিছু দেখা যাচ্ছে না, মিশ্রমিশ্রে অন্ধকার। সদাশিব হাতড়ে হাতড়ে দেখতে লাগল। তার হাতে ঠেকল একটা পিপের গা।

পিপের গণের তক্তা ঢাকা, তার গণের কানায়। সদাশিব তক্তার তলার হাত ঢুকিয়ে দিল; বালির মতন গুঁড়ো পিপেতে ভরা রয়েছে। শিবাজী মহাবাহু শিখিয়ে দিয়েছিলেন, সদাশিবের বুকে বাকি রইল না যে এক বাকুদই বটে। তার বুক নেচে উঠল।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বৃকের স্পন্দন প্রায় বন্ধ হয়ে গেল। একটা ভয়ঙ্কর আওয়াজ—ঢং ঢং ঢং। নিঃশব্দ রাত্রির মাঝখানে এই আওয়াজ বেশ আকাশ ফাটিয়ে বেরিয়ে এল।

কিছুই নয়, ছাউনিতে বাত ছুপুরের ঘন্টা বাজছে! কিন্তু সদাশিব প্রত্যন্ত ছিলনা, তাই একেবারে কাঁঠ হয়ে গিয়েছিল। ঘাটা খেমে বাবার পরগ সে খানিকক্ষণ আড়ষ্ট হয়ে বসে রইল। তারপর স্তন্যে পেল ছাউনির চৌকিদারেরা হাঁক দিতে দিতে চলে গেল—‘হঁসিয়ার! হঁসিয়ার—!’

সদাশিব চাপা নিঃশ্বাস ফেলল। এইবার!

কোমর থেকে নারকেল ছোবড়ার দড়ি খুলে তার একটা মূখ সে পিপের বাকুদের মধ্যে গুঁজে দিল, দড়ির অল্প মুখটা মাটিতে রেখে কবি থেকে চক্ৰমকি পাথরের হুড়ি বার করল। পাঁচনবাড়ির মূর্ত লোহা বাধানো। সদাশিব অতি সম্বর্ণণে লোহা দিয়ে চক্ৰমকি ঠুকতে লাগল। ঠুক ঠুক ঠুক। খুব আন্তে ঠুকতে হলে, কানাতের বাইরে আওয়াজ না যায়! চৌকিদারেরা যদি আওয়াজ স্তন্যে পায় তাহলেই সর্বনাশ।

ঠুক ঠুক ঠুক। আগুনের ছোট ছোট ফুল্কি বেরিয়ে ছোবড়ার দড়ির মুখে পড়তে লাগল। ক্রমে দড়ির মুখে আগুন ধরল। একটুখানি আগুন, প্রায় গোপে দেখা যায়না; কিন্তু একবার ঘনন ধরেছে তখন আর নিববে না। দড়ি পুড়তে পুড়তে আগুন বাকুদের পিপের গিয়ে ঢুকবে। তখন...

বাইরে চৌকিদার হুঁশন নিশ্চিন্ত মনে টহল দিচ্ছে। তারা জানেনা তাদের হাতের কাছে কী ভয়ঙ্কর আগুন জ্বলেছে।

তারপর হুযোগ বৃকে সদাশিব কানাতের তলা থেকে বেরিয়ে এল। ছায়ার মত ছাউনি পেরিয়ে কোণকাড়ের ভিতর দিয়ে ছুর্গের দিকে ছুটল। কেউ কিছু জানতে পারল না।

ছুর্গের ধরঞ্জায় সদাশিব পাঁচনবাড়ির ঠোকা দিল। স্বয়ং শিবাজী দরজা খুলে দিলেন। তাঁর পিছনে ছুর্গের সমস্ত লোক কাতার দিয়ে লাড়িয়ে আছে।

শিবাজী বিজ্ঞাসা করলেন,—‘কাজ হয়েছে?’

সদাশিব বলল,—‘হয়েছে।’

শিবাজী ছ'হাতে তাকে বৃকে জড়িয়ে ধরলেন ।

দুর্গের ছাদে আসনের ধারে সবাই ঝাড়িয়ে আছে । অন্ধকার ভেস করে তাদের দৃষ্টি দূরে ওই ছাউনির ওপর গিয়ে পড়েছে । ছাউনি ভাল দেখা যাচ্ছে না ; কেবল তারার আলোর শাদা তাঁবুর আভা । আর তাদের ঘিরে ধোঁবাকির মত মশালের আলো পাক যাচ্ছে ।

শিবাজী হাথখানে ঝাড়িয়েছেন, তাঁর এক পাশে সন্ন্যাসি, অন্য পাশে ভানাজী আর বেসাজী । কালুর মুখে কথা নেই, সবাই যেন নিঃশ্বাস বন্ধ করে প্রতীক্ষা করছেন । নির্দয় শত্রুর হাত থেকে উদ্ধারের একমাত্র উপায়—নারকেল ছোঁষড়ার দড়ির মুখে এতটুকু আগুন ।

সময় যেন আর কাটে না । একটি মুহূর্ত কাটছে আর সন্ন্যাসি ভাবছে—কী হল ? এখনও কিছু হচ্ছে না কেন ? তিন হাত দড়ি জ্বলতে এতক্ষণ সময় লাগে ? তবে কি আগুন নিবে গেছে !...

ক্রমে পূর্বের আকাশে একটুখানি আলোর ছোঁয়া লাগল, দক্ষিণ দিক থেকে কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস বইতে লাগল । রাত্রি শেষ হয়ে আসছে—

ঠাণ্ডা ছাউনির মাটি বিলীর্ণ করে আগুনের একটা উজ্জ্বল আকাশে ছড়িয়ে পড়ল ; তার তাঁর আলোতে চোখ ঝলসে যায় । তারপর এল আগুয়াজ । কী ভীষণ আগুয়াজ ! এক লক্ষ হাক্স যেন একসঙ্গে গর্জন করে উঠল । একটা দমকা হাওয়া আগুনে হাজার মত দুর্গের ওপর দিয়ে বয়ে গেল । আবার অন্ধকার ।

‘হর হর মহাদেও !’

দুর্গের ছাদে ভানাজী টপ করে সন্ন্যাসিকে কাঁধে তুলে নিয়ে নাচতে লাগলেন । শিবাজী বললেন,—ভয় বা ভবানী !—চল, এবারি দুর্গ থেকে বেরতে হবে ।’

স্তোরের আলো ফুটতে না ফুটতে শিবাজী তাঁর আড়াইশো সৈন্য নিয়ে বেরলেন । যেখানে ছাউনি ছিল সেখানে ছাউনির চিহ্ন নেই ; প্রায় পাঁচশো সিপাহীর মৃতদেহ পড়ে আছে । ভাঙা হাথখ একটাও নেই, সব পালিয়েছে । কলসানো মাটির ওপর কেবল ভালগাছের শুঁড়ির মত কামানগুলো পড়ে আছে, গরুর গাড়িগুলো পুড়ে ছাই হয়ে গেছে ।

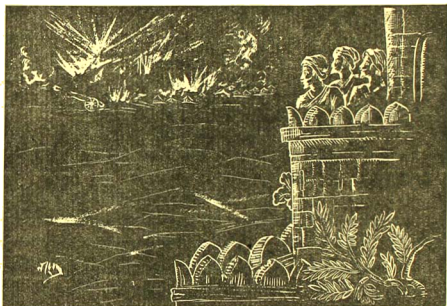
তবু ছাউনিতে এবং তার আশপাশের আরণ্যে অনেক জিনিস পওয়া গেল । টাকা মোহর হাড়িকুড়ি বস্ত্র তলোয়ার, আরও কত ধাতুনির্মিত জিনিস । শিবাজীর সৈন্তেরা বে বা গেল দখল করল ।

শিবাজী কামানগুলোকে দখল করলেন । কামান দুর্গে তুলে নিয়ে যাওয়া হল । একটা কামান তুলে নিয়ে বেতে মিশ্রজন করে লোক লাগল । অনেক কামানের গোলাও চারিদিকে পড়ে

ছিল, সেগুলোকেও আনা হল। শিবাজী বললেন,—এই কামান দিয়ে আমি তোৰ্ণা দুর্গ রক্ষা করব।
যত ইচ্ছা শত্রু আহুক, আর তত্ব করব না।'

সদাশিব বলল, — 'কিন্তু—বারুদ ?'

শিবাজী বললেন,—'বারুদ তৈরি করতে জানে এমন আত্মস কারিগর পুণায় আছে,
তাদের নিয়ে আসব। বারুদ তৈরি করা শক্ত নয়, কামান চালাই করাই শক্ত। এমন কামান
পেয়েছি, আর কারুর সাধ্য নেই তোৰ্ণা দুর্গ কেড়ে নেয়।'



'হঠাৎ ছাউনির মাটি বিসর্জন করে আগুনের একটা উদ্‌গাস আকাশে ছড়িয়ে পড়ল'

বিকেল বেলা সবাই দুর্গে ফিরে এলেন। সবাই আনন্দে আত্মহারা, সবাই সদাশিবকে কাঁধে
তুলে নাচতে চায়। কিন্তু সদাশিব পাগিয়ে বেড়াচ্ছে। কাঁধে উঠে নাচা তার অভ্যাস নেই।

সন্ধ্যার সময় জিজ্ঞাসাই তাকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে বললেন,—'কি খাবি বল্।'

সদাশিব বলল,—'দুধির হালুয়া।'

সদাশিব আগে কখনও দুধির হালুয়া অর্থাৎ লাউয়ের হালুয়া বায়নি।

চাঁদ আমাদের কে?

শ্রীপুলকেশ দে সরকার

পৃথিবীর উৎপত্তি আজও আমাদের কাছে এক রহস্য হয়ে আছে। এ নিয়ে অনেক তত্ত্বকথা হয়েছে, কিন্তু ঠাক নেই এমন একটিও তত্ত্ব পাইনি। হুতরাং, ঘুরে-কিরে অমীমাংসিত গ্রন্থ কিছু থেকেই যায়। তবে একথা এক রকম নিশ্চিত যে, হয় পৃথিবীর উৎপত্তি হয়েছে সূর্য থেকে, নয়তো সূর্যের সঙ্গী দ্বিতীয় তারকা থেকে, অথবা সূর্যের চারদিককার বাষ্পস্ফোটার থেকে। এর জন্মকাল সম্ভবত ২০০ কি ৩০০ কোটি বছর আগে। বায়ু, এইটুকু ছাড়া সৌরজগতের অতীত ইতিহাস আমাদের নিশ্চয় ক'র কিছু জানা নেই।

হুতরাং, চাঁদ কেমন ক'রে এল তাও আমরা সঠিক বলতে পারি না; তবে অসম্ভবতের আলোর হাতড়াতে হাতড়াতে যদি ধানিকটা সত্যোৎকৃষ্ট সন্ধান পাই, হুম্ব কি?

এ কথাটা নিঃসন্দেহে বলা যায়, চাঁদ এককালে খুবই উজ্জ্বল ছিল। এদিনে অধিকাংশ ঝর নিঃস্রাব কিছু উজ্জ্বল তা-প্রায় উবে গেছে। পৃথিবী অনেকখানি নিরেট-কঠিন হয়েছে, কিন্তু চাঁদ আরও অনেক খেঁকি হিম হয়ে গেছে; তার সোজা কারণ চাঁদ পৃথিবীর চাইতে ছোট। ছোট বস্তুর তুলনায় বড় বস্তুর উত্তাপ দীর্ঘতরকাল থাকে। চাঁদ আগে ঠাণ্ডা হয়েছে বলে, সে পৃথিবীর তুলনায় "বুড়ো" এমন কথা মনে করার কোন হেতু নেই।

১৭২৬ সালে প্রখ্যাত ফরাসী গাণিতিক লাম্বার্ত সৌরজগতের উৎপত্তি সম্পর্কে যে তত্ত্ব প্রবর্তন করেন, তাই বহুকাল সর্বজনীন স্বীকৃতি পেয়েছে। তাঁর মতে একদা সূর্য বিপুল এক রকম গ্যাসবাস্পে পরিবেষ্টিত ছিল, তাই টুকরো টুকরো ছিন্ন হয়ে বতুলাকার মেঘ, পরিণামে তাই বাষ্পময় গ্রহের আকার ধারণ করে। পৃথিবী তাদেরই একটি। আর, ঐ পৃথিবী নিজের মাধ্যাকর্ষণ কেন্দ্রের দিকে স্থবর্তে থাকে। এই সময় তারই এক টুকরো উৎক্লিষ্ট হয়। ঘনীভূত সেই বস্তুটির নামই চাঁদ।

হুতগাণিত্য, লাম্বার্তের এই "নীহারিকা-তত্ত্ব" কালজরী হ'তে পারেনি। গাণিতিকদের কথা হ'চ্ছে এই যে, বাষ্পমেঘ সঙ্কুচিত হ'লে যে-বস্তু থেকে যায়, তা এ বস্তু নয়। হুতরাং, ও তত্ত্ব পরিত্যক্ত হ'য়ে গেছে।

জোন্সার-ভাঁটা

উনিশ শতাব্দীর শেষ ভাগটার এক ইংরাজ গাণিতিক অধ্যয়ন করেন, আশিভে চাঁদ আর পৃথিবী, এরা দুটিতে এক ছিল। সেই ইংরাজ গাণিতিকের নাম জি. এইচ. ডাকইন; বিখ্যাত প্রকৃতি-বিজ্ঞানবিদ ব্রিটার্লি ডাকইনের ছেলে। তিনি এই উপসংহারে এসেন যে, চাঁদ বাষ্পীয়

আঁটির মতো বিকিপ্ত হয়নি, হয়েছে একতাল তরল বস্তুর মতো। এই তত্ত্বের আধুনিক ভাষা অনুসারে এই বিচ্ছেদের আগে ওপরটার এক পর্দা পাতলা আন্তরণ পড়বার মতো ঠাণ্ডা হয়েছিল পৃথিবী। পৃথিবী নিজের আঁকের ওপর অনেকটা বেগমাল মাতালের মতো ঘুরছিল, এমনি ক'রে ওর আকৃতি হ'ল ডিম্বাকৃতি—এর ওপর দু'টো শক্তির ক্রিয়া হচ্ছিল; হৃৎ থেকে এর ওপর জোয়ার-ভাঁটার ক্রিয়া, আর, ওর নিম্নস্থ স্পন্দনের স্বাভাবিক পর্যায়ের ক্রিয়া। এই দুটো শক্তি যখন এক হুরে বাধা হ'ল, তখন জোয়ার-ভাঁটার প্রাবল্যে এর সমগ্র দেহের আকার একটি ছাদপাতির আকার ধারণ করল; তারপরের আকার হ'ল, ব্যায়ামবীরদের "ডায়েলের" মতো ("ডায়ে-বেল" হ'চ্ছে একটি মোটা লোহার চুম্বকে দু'টি টেনিদবলের মতো লোহার বল; বল দুটোকে বলে বেল; ডায়ে মানে নিরেট)। আমরা যে ডায়েলের কথা বলছি তার একটি বেল হ'ল পৃথিবী, আর একটি চাঁদ; প্রথমটি দ্বিতীয়টির চাইতে অনেক বড়। তারপর একদিন, ঐ যে দুই বেলের সংযোগ-সেতু (লোহার রডটি) ছিল তা গেল জেও; হ'ল নতুন পৃথিবীর জন্ম।

বিখ্যাত মার্কিন চাঁদ-পর্বেবন্ধক অধ্যাপক ডবলিউ. এইচ. পিকারিং বললেন, এই তত্ত্ব যদি স্বার্থ হই, তবে এও বলা সরকার ঘে, ঐ অবস্থানটি বিচ্ছেদের সময় যে-জারগায় বিচ্ছিন্ন বস্তুপিত ছিল, সে-জারগায় মত একটি গর্ত রেখে গেল। কেবল তাই নয়, ঐ নাকী-ছেঁড়া ভরকর ঝাঁকুনিতে আরও অনেক ফাটল দেখা দিল। পিকারিংয়ের বক্তব্য হচ্ছে এই যে, আঁকের প্রশান্ত মহাসাগরের বিপুল গর্তটি চাঁদ-শিওর ছিটকে যাওয়ার পতীর ক্ষত ছাড়া কিছু নয়। আমাদের সব চাইতে বড় মহাসাগরের গর্ত থেকেই আমাদের উপগ্রহটির জন্ম।

এখন আমরা পৃথিবীর জলভাগ থেকে বিচ্ছিন্ন বিকিপ্ত যে ভূখণ্ড দেখতে পাই, সে ঐ সেকালের বিচ্ছেদ-ভূকম্পেরই পরিণতি। নানা ভাবে নানা দিকে ওর আঘাত পৃথিবীর মাটিকে খণ্ড-বিখণ্ড করে নিয়েছে, আর ফাটলের সৃষ্টি করেছে। ঐ সব ফাটলে হৃৎ থেকেই জল ছিল না; এই জল ঘন দৃষ বাষ্পের মতো আকাশে ত্রিশকু হ'য়ে ঝুলছিল। তারপর একদিন আবহাওয়া ঠাণ্ডা হ'য়ে এলে জল নামল সাগরে মহাসাগরে, আর আমাদের মাটি যোগনিদ্রার নারায়ণের মতো জলে ভাসতে লাগল।

এ কি সত্যি ?

এই যে তত্ত্ব আমরা বললাম, আর্থ্যাং পৃথিবী ছিল এক লেলিহান অগ্নিশিখাপিণ্ড, ওর ওপরকার গরম এক পর্দা আন্তরণ একদিন আকাশে একটি চাঁদের আকারে উৎক্ষিপ্ত হ'ল—এই তত্ত্ব কল্পনা করতে বেশ লাগে। কিন্তু এ সত্যি কিনা কে বলবে? অনেক পণ্ডিত মনে করেন, চাঁদ মোটে আমাদের উপগ্রহই নয়, বীতিমত একটি গ্রহ; হয় পৃথিবীর কাছাকাছি ওর উদ্ভব হয়েছে, নতুবা পরে কোন সময় মাধ্যাকর্ষণ পৃথিবী চাঁদকে আপন বাহুভোরে বন্দী করেছে। একথা মনে করার

প্রথম কারণ হচ্ছে উপগ্রহের তুলনায় চাঁদ বড় বড়। সৌরজগতে এর চাইতে বড় উপগ্রহ নেই, সেকথা কিন্তু বলছি না; বলছি, তুলনায় একটি খুবই বড়। পৃথিবীর ব্যাসের এক চতুর্থাংশ হবে চাঁদের ব্যাস, আর এর বস্তুপিত্তও হবে পৃথিবীর বস্তুপিত্তের শতকরা ৮১ভাগ। শনিগ্রহের যে ন'টি উপগ্রহ আছে তাদের সব চাইতে বড় উপগ্রহটি হচ্ছে টাইটান; তা তার ব্যাস হবে শনিগ্রহের ব্যাসের কুড়ি ভাগের এক ভাগ, আর বস্তুপিত্তও হবে ৪৭০০ ভাগের এক ভাগ। টাইটান কিন্তু চাঁদের চাইতে অনেক বড়। হুভার্টা, পৃথিবী আর চাঁদকে যুগল গ্রহ বলাই সমীচীন, নিছক গ্রহ-উপগ্রহ সম্বন্ধ নয়।

কার্ল ফন ভাইংসাকার বলছেন, পৃথিবী আর চাঁদ কোন কালেই এক ছিল না। তারকা-জোয়ার মেঘপুঞ্জের ভেতর দিয়ে স্থর্ষের পরিক্রমাকালে তার চারদিকে যে বাষ্পাবরণ ঘনিয়ছিল তাই পরে জমাট বেঁধে গ্রহগুলোর সৃষ্টি হয়েছে। বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস ও নেপচুনের আভ্যন্তরীণ উপগ্রহগুলো এসেই আবহাওয়ার আওতায় উদ্ধৃত হয়েছে। কিন্তু আমাদের চাঁদের মতো আর সব উপগ্রহ বড় বড় গ্রহের চানে কাছাকাছি এসে পড়েছে।

এই মুহূর্তে কোন একটি ভবকে আমরা বেছে নেব, স্থির করা কঠিন। সব ভবেরই কিছু-না-কিছু ধোরালা যুক্তি আছে, অব্যক্তিকতাও আছে। তাহলে আমাদের সেই মূলে যেতে হয়। অর্থাৎ সৌরজগৎ কেমন করে এল সেই রহস্যের কিনারা ক'য়ই প্রথম কর্তব্য হয়ে পড়ছে আমাদের। তবে, এইটুকু বলে রাখা যায় যে, খুবই সম্ভব যে চাঁদ পৃথিবীরই বিকিষ্ট একটি অংশ।

চাঁদ গোল দূরে

তা যাই হোক না কেন, এ বিষয়ে সম্বন্ধ করার অবকাশ কম যে, বিবর্তনের প্রথম ভাগে আমাদের তুলনায় চাঁদ আমাদের আরও কাছে ছিল। সেই হ্রদ্ব অতীতে চাঁদের একবার পৃথিবী প্রাকৃতির "মাস" ছিল এখনকার চাইতে সংক্ষিপ্ত। ১১,০০০ মাইল দূরে চাঁদের এক চক্র দিতে লাগত মাত্র সাড়ে ছয় ঘণ্টা; পৃথিবীর দিন (বা দিবসের পরিমাণ) ছিল সাড়ে ছয় ঘণ্টা। এটা বোকা যায় যে, এই দুই 'ভূমণ্ডলে' পরস্পরের ওপর যে জোয়ার-ভাঁটা খেলত, তা ছিল ভয়ঙ্কর প্রবল। আজ চাঁদের দূরত্ব আড়াই লক্ষ মাইল। এত দূরে থেকেও চাঁদ মহাসাগরে উত্তাল জোয়ার-ভাঁটা খেলিয়ে থাকে। মাত্র ১১,০০০ মাইল দূরে এই জোয়ার-ভাঁটা কেমন প্রবল ছিল, অহমান করা যায়। বৃহস্পতির বস্তুপিত্তও পৃথিবীর আকর্ষণ চাঁদের চাইতে অনেক বেশী প্রবল। তাই চাঁদের দূরতোগও বেশী। উভয়ের এই পারস্পরিক জোয়ার-ভাঁটার দুটি বিশেষ ফল দেখা গেল। তারা পৃথিবী ও চাঁদের আপন আপন অক্ষরেণুর আবর্তন সমীকৃত করে দিল, আর, আমাদের কাছে প্রায় চাঁদকে দিল বহুদূরে ঠেলে। একথা মর্মে মর্মে বুঝি বলেই না আমরা ডাকি,—'আর, চাঁদ আর।'



শিশুক

ত্রিহিডেন্দ্ৰমোহন বসু

‘তিমি’ নাম শুনেছ তোমরা ; ভুল করে বলি তিমি মাছ। আসলে তিমি স্তন্যপায়ী পশু—
বাছা অবস্থায় মায়ের দুধ খায়। পশু-পাখীসের নানা ভাগে বা বর্ণে (Order) ভাগ করে
দিয়েছেন প্রাণীবিজ্ঞানীরা। তিমি যে বর্ণে আছে সেটা হল তিমি বর্ণ। এই তিমি-বর্ণের একটি
প্রাণীর বিষয়ে আজ কিছু বলব। এটি হচ্ছে শিশুক বা শিশুমার—চলিত কথায় শুভক।

ভারতে শিশুক আমরা দেখতে পাই ব্রহ্মপুত্র, গঙ্গা এবং যমুনা নদীতে : লম্বায় হাত চারেক
হবে, মাথাটি ছোট, ঠোঁট লম্বা এবং লম্বা খরখের। প্রত্যেক মাসীতে প্রায় ২০টা করে দাঁত থাকে।
রঙ : পিঠের দিকটা ধোঁয়াটে, পেটের দিকটা হালকা রঙের—তাতে লালচে আভাও দেখা যায়
মাকে মাকে। চোখ এসের এত ছোট যে, এরা প্রায় দেখতেই পায় না বা খুবই কম দেখে বলে
বিজ্ঞানীরা মনে করেন। আশ্চর্য বলতে হবে, কারণ : এরা মাংসাশী, ছোট ছোট মাছ, চিড়্‌ড়ি
ইত্যাদি খায় ; এই আহাৰ এরা সংগ্রহ করে কি করে ওই ক্ষীণ দৃষ্টি দিয়ে !

শিশুকরা তিমি-বর্ণের প্রাণী ; মাছ নয়, স্তন্যপায়ী জলচর পশু। বাস-প্রস্থাসের ক্ষত এদের
খোলা বাতাসের (অক্সিজেন) দরকার হয় ; সে অক্সিজেন এরা জলের নীচে থেকে সংগ্রহ করতে
পারে না, যেমন পারে মাছেরা। তাই এরা জলের নীচে বেশীক্ষণ ডুবে থাকতে পারে না।

তোমরা হয়তো লক্ষ্য করে থাকবে যে, নদীতে কোনও একটা বিশেষ জায়গায় একটা শিশুক
কিছুক্ষণ পবে পবে (প্রাণী সমান লবয় অন্তর) ভেসে উঠেই গৌত্তা মেয়ে আবার ডুবে থাকে।
এই দৃষ্ট কলকাতার ঘাটে বাধা বড় বড় জাহাজের কাছে প্রায়ই দেখতে পাবে। প্রকাণ্ড মাছের
হতন একটা জীব জল ভেঙ্গে লাগিয়ে উঠেই আবার ডুবে গেল, সঙ্গে সঙ্গে ‘শুপ’ করে একটা শব্দ হল।
নদীসকলে প্রায়ই এমন দেখা যায়।

বিখ্যাত প্রাণীবিজ্ঞানী হার্ডন লিখে গেছেন যে, ঢাকার কাছে গারমারী বলে এক বনজাত
আছে, তারা নাকি শিশুকের মাংস খায়। তাদের শিশুক শিকারও নাকি অভিনব। শিশুকের
তেল বাতের ওদুধ হিসেবেও ব্যবহার করে।

আমার গ্রাম

শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

আমার গাঁয়ের মেঠো পথখানি মন ভূলালো,
হাতছানি দিয়ে খানের শিক্তা গ্রাণ ভূলালো ।
এঁকে বেকে চলে যমুনা নদী,
কত না লোকের ছিল বলতি
এর ফুলে ফুলে রচেছি একদা খেলার ঘর,
হর্ষ-বিভোল হয়েছি কখন এসেছে কড় ।

কাজল মেঘের কাঁজরী নৃত্যে নেচেছি মোরা,
গাঁয়ের সবুজ বৃক্ষেতে ছিলাম পাগ্লাম্বোরা ।
আলো-করা শত কৃষাণ-কুঁড়ে
ছিল যে মোদের স্নায়ু জুড়ে
ফুলের ফসল করেছি তাদের আভিনা মাঝে,
কৃষাগী মেয়ের আনন্দ গান শুনেছি গাঁয়ে ।

সবুজ পরীবা এখনো হেথায় রাতের বেলা,
জোনাকীর সাথে বকুল বনেতে করিছে খেলা ।
এখনো ডোরের ভজন গানে
পুলক আগায় শিশুর প্রাণে
হুয়ে হুয়ে পড়ে মাটির কোলে কুহুম রাজি,
এপারের ঘাটে ওপারের তরী ভিড়ায় মাঝি ।

তোমরা বাহারা এসেছ মোদের অনেক পরে,
জানো কি কোথায় স্মরণ-অস্ত্র বিরলে করে !
অরণ্য-ঘেরা এ গাঁয়ে এসে,
প্রাচীন-লিপিকা পড়িও শেষে ;
ঘটীতলার দাঁড়িও বারেক বটের ছায়ে,
পাণে ইতিহাস স্তরমেউল-পটের গায়ে ।



কুন্দুরী খণ্ড

[উপস্থাপন]

দেবাচার্য

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

বাহুরেও কঠে মহাহুতুরি হর। দাস্তনা দেয়—তাইতো রে, সত্যি, লম্বুর উপর স্বর্ধকে
উঠতে না দেখে—হ্যা—দাঁড়া, দাঁড়া—একটা উপায় আছে, একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম—আমি
আমার সঙ্গে আয়, আর দেখি নর।

বাহুর ক্ষিপ্রগতিতে হাটতে শুরু করে খালি পায়ে। পিনাকীকে বলে, ছুতো ছেড়ে আয়—
দৌড়ে যেতে হবে, না হলে স্বর্ধ উঠে পড়বে।

পিনাকী বারান্দায় ফিরে গিয়ে ছুতো ছেড়ে আঁদে। আগতে না আগতেই বাহুর ছুটে থাকে
বালির উপর গিয়ে। বাহুরের পিছন পিছন পিনাকীও দৌড়ে যায়। কণীমনদার বাক অদৃশ হযে
যায় দুটি বালকমুতি। দাধনা মানী, মেদোমনায় তখনও বিছানা ছেড়ে ওঠেন নি।

১২ রাতি ও দিনের সন্ধিক্ষণে আঁধার ও আলোর বহুস্তময় সংমিশ্রণ।—আকাশ, বাতাস, গাছ, মন
—সবেরই এখন সেই সংমিশ্রণের ছোঁয়াচ। অম্পট ও ম্পটের মাঝখানে কুলছে কণমুহূর্ত। স্নিত-
কালের তুরান্নার মতন। দুপুরের সেই গরম বালি এখন কেমন ঠাণ্ডা মনে হয় খালি পায়ে। পিনাকীর
পা চুকে যায় বালির মধ্যে। দৌড়ে এগিয়ে যাওয়া কঠিন। বাহুরের অভ্যাস আছে অনেকটা, তাই
অনেক আগেই পৌঁছে যায় গন্তব্যস্থানে। পিনাকী হাফাতে হাফাতে যখন বাহুরের পাশে এসে
দাঁড়ায় তখনও স্বর্ধের আভা ভালভাবে দেখা যায় নি।

—ওই জাখ্—এদিকে তাকাচ্ছিম কেন—কি দেখতে পাচ্ছিস্ ?

একটা বাজ-পড়া তালগাছের শুকনো গুড়ির উপর উঠে পাড়িয়ে পিনাকী চারিদিকে তাকিয়ে দেখে।

—বন দেখা যাচ্ছে, অনেক গাছপালা।

—দূর, গাছপালা নয়—সমুদ্রের জল—নীলজল দেখা যাচ্ছে। ডেউ আছে কিনা, তাই দূর থেকে বনের মত বোধ হয়।

—সমুদ্র! এতো কাছে? আমি ভেবেছিলাম অনেকদূর হবে এখান থেকে।

—খুব কাছে নয় রে, উচুতে পাড়িয়ে আছিস কিনা, তাই কাছে দেখাচ্ছে, হেঁটে যা, অনেকক্ষণ লাগবে।

—জাখ্, জাখ্—ওমা, কি হুমর! সত্যিই তো—খুব উঠছে—উঠছে... ঐ লাফ দিয়ে উঠে গেল—কি মজা কি মজা!

—কেনন—বলেছিলাম না?...

—ঐ ব্লি সাত ঘোড়া? ওই যে লাল নীল ঘোড়ার মতন দেখা যাচ্ছে, এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়, সাত—রথে চলেছে, রথে চলেছে—ঐ ঘাঃ, আর দেখতে পাচ্ছিস না।

—কৈ, কৈ, কৈ? সত্যি পিশ্, তুই দেখতে পেলি?

—হ্যাঁ, তাইতো মনে হোল প্রথমে—ইশ্, রদুয়ের তেজটা বেড়ে গেল, মা হ'লে তুইও দেখতে পেতিস্! আমি রোজ খুঁধেবকে প্রণাম করি—ভোরে উঠে, জানিস; তাইতো দেখতে পেলাম।

কথা বলতে বলতে আনন্দে হাততালি দেয় পিনাকী। কি হুমর লাগছে আজ সকালবেলাটা। টাল সামলাতে না পেরে পড়ে যায়—গাছের গুড়ির উপর থেকে বাণির উপর। বাণির পাহাড়টা ঢালু হয়ে নেমে গিয়েছে। বাহুর বলে, গড়িয়ে যা, গড়িয়ে যা, কিছু লাগবে না গায়ে।

কি আশ্চর্য! মোটেই লাগছে না তো।

বর জানোয়ারের মতন খেলার বেশার যেতে ওঠে ছ'মনের মন। গড়িয়েই চলেছে, গড়িয়েই চলেছে, থামে না আর।...

—পিশ্, ও পিশ্—ঈগ'পির উঠে পড়্—ইশ্! তার মাথা একেবারে বালি ভর্তি, চুলের মধ্যে কচ্কচ্ করবে। মাথা উচু রেখে গড়াতে হয়, তা জানিস না।

—বা রে, তুমিতো একবারও বল্লে না।

—মাথা উচু রাখবি, তা আবাব বলে দিতে হবে কেন?

পিনাকীর হঠাৎ স্মরণ হয় পাঠাপুস্তকে লেখা গল্পের সাবধান-বাণী—মাথা নীচু, রাখলে মরজায় চৌকর লাগে না। সমুদ্রে স্নান করতে গিয়েও তো সেই একই শিক্ষা পেয়েছে। তবে ?...

সূর্যের আলোর ঝলমল করছে সমুদ্রের নীল জল। দিগন্তে বিলীন বেলাকুমির উপর দিক্ত বালুকণা সূর্যের কিরণে চিক্‌চিক্‌ করে—কোটি কোটি রূপোর টাকাই কি জ্বলছে ওখানে ? সূর্যের কিরণেই তো কমল পেকে ওঠে, কমল পাকলেই তো টাকা, পিনাকী আবার হাতভোড় করে সূর্যকে প্রণাম করে। এবার চোখ ঝলসে মিছে সূর্য—বিরাট গোলাকার সোনার তুটবলের মতন সূর্যকে আর দেখা যায় না। নিকটের কোণে কতকগুলো চডুইপাখী কিচির মিচির শব্দ করে। অনেকগুলো তিতির পাখী উড়ে যায় মাথার উপর দিয়ে। একপাল হরিণ কোথা থেকে ঘেন তাড়া খেয়ে ছুটে আসছে। অবাধ হয়ে পিনাকী তারিয়ে থাকে। বাহুর পিনাকীকে ছাচকা টানে বালির উপর ফেলে দেয়, নিজেও শুয়ে পড়ে। পরক্ষণেই গুড্ডু-গুড্ডু শব্দে মহা বালির প্রস্তর প্রকম্পিত হয়। বাহুর কিসকিস্‌ করে বলে—গোরাবা শিকারে বেরিয়েছে। ঘেই মেঘবি হরিণেও পাল দৌড়ে পালাচ্ছে, অমনি মাথা নীচু করবি। একেবারে মাটিতে শুয়ে পড়বি, বুকলি। তাহলে আর ভয় নেই।

কথা শেষ হোতে না হোতেই আবার বন্ধুকের আওহাঙ্গ শোনা যায়। বাহুরের স্মরণ হয় এইবার—বাং, আজকের দিন কোথাও বের হোতে নিবেধ বরোছিলেন। মদলবলে লাটমাহেব বন্ধু হাতে শিকার করতে বেরিয়েছেন। বিহার ও উড়িষ্যার লাটের গ্রীষ্মাবাস পুরী। ছোট নদীর পাড় বেয়ে গামবুট পরা গোরাবা, মেমলাহেবরা, চাপরাশপরা অর্দালী তৃত্য, পঞ্চপ্রদর্শক—অনেকের মূর্তি এগিয়ে আসছে পিনাকীসের দিকে। বামিকের কণীমনদার আড়লে অদৃশ্য হয়ে যায় হরিণের দল।

বতপুত্র যেতে যে ছোট নদী বেয়ে এসে সমুদ্রে পড়েছে, কোথা থেকে নদীর উৎপত্তি তা কেউই ঠিক বলতে পারে না, খান্‌দর্ভ, নদীর জলটা সমুদ্রের জলের মতন এতটা বিবাদ নহ্ন। উড়িষ্যাবাসীরা অনেকই নদীর জল বালির মধ্যে চুঁইয়ে ব্যবহার করে। শুকনো ভালগাতা দিয়ে আগুনে জল ফুটিয়ে নেয়, ঐ জল দিয়ে হৃদয় মাংস রান্না করাও চলে।

গুলি লাগার ভয়ে পিনাকী ভালভাবে হরিণের দলকে দেখতে পায় না। জয় চোখ বুজে শুয়ে থাকে সে, বালির মধ্যে পাল রেখে। বাহুরও পিনাকীর গা ঘেঁষে উপুড় হয়ে মাখনের দিকে তাকায়। পূব দিক থেকেই আসছে নিকারীরা।

ঘোড় লওয়ার কয়েকজন সার্ভেট ঘোড়া ছুটিয়ে চলে যায় পঞ্চাশ গজের মধ্যে। বালি উড়ে যায় চারিদিকে। ভাল গাছের ভগায় কাক কা-কা করে ডাকতে থাকে, আচমকা উড়ে যায়, আবার ফিরে এসে বসে।

—লাটমাহেককে দেখবি পিতৃ ? মেমরাও আদছে—ওই তাখ ।...

বাহুর হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে যায় খানিকটা সামনের দিকে। অনেকগুলো তালগাছের চারা, নিম, বাবলা ও কাউ গাছ মিলে কুকের মহন আড়াল সৃষ্টি করেছে জায়গাটায়। অনেকগুলো গর্ত চারিপাশে। সৰু সৰু মুখ বেরিয়ে আসছে, আবার নেমে যাচ্ছে গর্তের মধ্যে; পিনাকী সন্তরে পিছন হটে আসে। অভিজ্ঞ বাহুর সগোত্রবে মাথা ছুলিয়ে হেলে বলে—দূর বোকা, বরগোদ—বরগোদকে আবার ভয় করে কেউ ?

আখদকী পরে প্রায় সারাপথ হামাগুড়ি দিয়ে এসে এখন তারা বাড়ী ফেরে চুপিচুপি, তখনও বন্ধুকের আওয়াজ বন্ধ হয় নি। বাহুর বলে—চল্ বালি খুঁড়ে লতা আম বের করি গে—লতা আম সব ছুরিয়ে গেছে। বাবা এখনো ঘুমুচ্ছে, হাও বোধ হয় ওঠে নি।

—ঐ তো মোজোমানী রাষ্ট্রাখরে, দেখতে পাচ্ছিন না ?...

ও হা, তাইতো! ঘনজামও এসে গিয়েছে দেখছি! রাষ্ট্রাখরের পিছনে আমগাছের তলায় হাওনী, কালারাম, জগন্নাথ ও নবকৃষ্ণ মিশ্রের সঙ্গে গোল হয়ে বসে বালির উপর কি সব দাগ কেটে বুঝিয়ে দিচ্ছে যেন। হুম্বর কাঠের ক্রেমওয়ারা গরুর গাড়ী; অচেনা বলব দুটো কিছু দূরে ডাবার বিচুলি খাচ্ছে। একি, আমবাগানের মধ্যে ওটা কারা? দৌহামা, হরিহরবাবু, শিবানীর মা—সবাই এসে গিয়েছেন এখানে! কখন? যেশোমশায় দাগকাটা আখ-মরলা চামরে সর্বাঙ্গ ঢেকে খালি পায়ে কুঁজো হোয়ে হেটে চলেছেন বাগানের দরু পথ বেয়ে। শিবানীও কি এদেছে? কৈ তাকে তো দেখা যাচ্ছে না।...

বাহুর ও পিনাকীর উপর নম্বর পড়তেই ঘনজাম উঠে আসে, তিরস্কারের স্বরে বলে—দাংবাবু তোমারা দুইজন অ কুন্টী বাইখিলে? দাংবাবু ডকি ডকি হেইরান হই গেলেন!

বাহুর ঘনজামের তিরস্কারকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে প্রশ্ন করে—ওরা কখন আসলেন? কোন পথ দিয়ে? (ক্রমশঃ)

কি খাই?

পরিমল রায়

শুধু ভাই পানীয়
এক কাপ আনিও

দ্বিজাঙ্গা য়িথো
জোর নেই পিঙে।

আগ কিছু চাই না,
সম্প্রদেয় খাই না।

খেলে হবে অমল
সেহে হবে কম বল।

শুধু দুটি নিম্বকি?
খাই আমি ভিন্ন কি?



মাকড়সার কীর্তি

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

সবু তখন পৃথিবীর স্রষ্টা হয়েছেন। হাছুর, অন্ত-জানোয়ার, সাপ, মাছ, কুমীর হাড়র স্রষ্টা করে ভগবান তাদের ছেড়ে দেছেন মর্ত্যলোকে—হাছুর গ্রাম-নগর-পথ-বাট-বাড়ী-ঘর তৈরী করে থাকবে; অন্ত-জানোয়াররা থাকবে বনে—মাছ আর কুমীর হাড়র—এরা থাকবে জলে।

গ্রাম নগর বনো, রাজ্য বনো—তৈরী হতে-হতেই তো শান্তি বা শৃঙ্খলা হয়না। কে করবে শাসন-শোষণ, কে করবে দাস্ত—তা নিয়ে তর্ক আর ঝগড়া-মারামারি চলে বিস্তর। সেকালে-একালে কোনো ব্যতিক্রম নেই এতে! হাছুরের কথা আজ বলছি—বগছি অন্ত-জানোয়ারদের কথা!

বনে জানোয়ার-মহলে অনেক সভা-সমিতি করে, চৌচাষেচি মারামারি করে স্থির হয়েছে—সিংহের গায়ে সব চেয়ে জোর—সে হবে অন্ত-জানোয়ারদের রাজা—শেখাল মন্ত্রী, বাঘ সেনাপতি, হাতী কোতোয়াল এমনি আর কি! কুসে-প্রাণী মাকড়সা...এদিক ওদিক ফরফরিয়ে বেড়াচ্ছিল...জাল পাতা আর জাল পাতা...মুখের হুঁরে জাল তৈরী করে—কোনো কিছু মালমশলা চায় না—সম্পূর্ণ নিঃখরচার। মাকড়সা জেবেছিল, তাকে একটা কোনো গদি দেওয়া হবে—তার কিছু না! রাগে গরগর করতে করতে বাতালে হুতো মলে দিয়ে সেই হুতো বেয়ে সে এসে ছুটে ভগবানের কাছে! ভগবান তখন ষাওয়া-দাওয়া সেবে বিজ্ঞানের আয়োজন করছেন, মাকড়সা এসে চাঁচানি হুক করলে—ঠাছুর বলি, ও বিধাতা ঠাছুর...

চাঁচানির বিরাম নেই। এতে হাছুরের ঘুম হয় না, তা ভগবানের! তিনি এলেন সন্দের—বললেন—কে? কি চাই?

মাকড়সা বললে—আমি মাকড়সা আপনার কাছে বিচার চাইতে এসেছি, ঠাছুর!

কিসের বিচার? ভগবান বললেন।

মাকড়সা বললে—কি অরাজকতা ঠাছুর—তা আর আপনাকে কি বলবো! গোমা-গোদা

জানোচায়েগা শুধু চেহারা দেখিয়ে গদিগুলো বিলকূল দখল করে বসেছে...আমার চেহারাখানা না হয় হুত, কিন্তু বুদ্ধি ! আমাকে একটা গদি দিলে না।

ভগবান বললেন—যটে ! অ...

মাকড়সা বললে—শুধু গায়ের জোরে...মানে, গুণামি আর আঁফালনে সৃষ্টি রক্ষা পাবে, জাবেন ?—আপনি মাথা খাটিয়ে এতখানি যে সৃষ্টি করলেন, সে সৃষ্টি রক্ষা করতে বুদ্ধির দরকার ! একথা মানবেন, নিশ্চয় ? আপনিই বলেছেন, বুদ্ধির্ধন্য বলং তন্ত্র।

ভগবান বললেন নিশ্চয় একথা মানবো।

মাকড়সা বললে—তাহলে আপনি বিচার করে দিন ঠাঁহু—আমার বরাতে গদি কেন মিলবে না ? বুদ্ধির পরধ নেওয়া হোক—সিদ্ধীর বুদ্ধি বেশী, না, আমার ?

ভগবান বললেন—বেশ, তুমি যদি বুদ্ধির পরিচয় দিতে পারো, তাহলে নিশ্চয় আমি হুবিচার করবো।

মাকড়সা বললে—বলুন, কি করলে আপনি আমার বুদ্ধির পরিচয় পাবেন ?

ভগবান একটু ভাবলেন, তেবে তিনি বললেন—তোমাকে তিনটি কাজ করতে হবে। যদি পারো, বুঝবো, তোমার শক্তি-সামর্থ্য হাতী, বাঘ, সিঁদী, গণ্ডারদের চেয়ে কম নয়।

মাকড়সা বললে—কি তিনটি কাজ চান, বলুন ?

ভগবান বললেন—প্রথম কাজ আমাকে তুমি এক-কলসী জ্যাম্ব মৌমাছি এনে দেবে। দ্বিতীয় কাজ, প্রকাণ্ড একটি জ্যাম্ব মহাল-দাঁশ, এনে দেবে। আর তৃতীয় দফার জ্যাম্ব একটি কৈলো-বাঘ এনে দিতে হবে।... যদি পারো—তোমাকে আমি শেরা গদি দেবো।

খুঁই মনে মাকড়সা এলো পৃথিবীতে ফিরে এসেই কনি আর মতলব তাঁক।

মতলব এলো মাথার...মাকড়সা একটা মাটির কলসী ধোয়াড় করলো—কবে সে কলসী নিয়ে এলো বনে। প্রকাণ্ড মহা গাছে মৌমাছির দল ভৈরী করেছিল ইয়া-বড় মৌচাক দেই মৌচাকের ধারে। এলে মৌচাকের দিকে চেয়ে বিড়বিড় করে বকতে লাগলো—গুতো মৌমাছি যা আছে বত, তারা পারবে শুধু দিয়ে এ কলসী সুরিয়ে ভুলতে...হয়তো পারবে...নয় তো না...হয়তো ই...নয়তো না।

মাকড়সার কথা শুনে আর রকম দেখে মৌমাছিদের কেমন মহা লাগলো। তারা বললে—বিড়-বিড় করে কি তুমি বকছো মাকড়সা ?

মাকড়সা বললে—ভগবানের কাছে পৃথিবীর খবর জানতে গিয়েছিলুম—আমার ওপর তিনি

কাঁধের ভার সেছেন ! তা তাঁর সঙ্গে কথায় কথায় মহা-তর্ক । তিনি বলেন—এ কলনী যুঁ দিয়ে তরিয়ে তুলবে—কোনো মৌমাছির সে সাধ্য নেই...আমি বলেছি, আছে ঠাকুর আলবৎ আছে । তাই মানে, যেখানে বত চাক আছে, হুঁড়ে হুঁড়ে দেখছি আমি—এ-মৌচাকটা দেখছি সবচেয়ে পেজায়—তা তোমরা কি বলে ?

মৌমাছির আশ্ফালন করে বললে—তোমার কলনীর মধ্যে আধাবেলা যদি আমরা কাজ করি, তাহলে মধুতে ও-কলনী ভরতি করে দিতে পারি ।

—বটে ! এই তো চাই মৌমাছি ভাইয়েরা ! এসো তবে আমার কলনীর মধ্যে...মধুতে কলনী ভরে তোলো—ভগবানকে আমি দেখিয়ে বলতে পারবো—সেখুন ঠাকুর, এদের কেরামতি ।

কলনীর মূখ খুলে খরলো মাকড়সা—আর চাক থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে লাথ লাথ মৌমাছি বেরিয়ে কলনীর মধ্যে ঢুকলো । যেমন ঢোকা—কলনীর মূখে সরে এটে মাকড়সা এলো কলনী নিয়ে ভগবানের কাছে ; এসে বললে—এই সেখুন ঠাকুর !

সেখে ভাগবান বললেন—হ্যাঁ ! এনেছো বটে ! বেশ, বেশ—এখন ঘুরের কাজ...ময়াল-মাশ ।

—এখনি নিয়ে আসবো ঠাকুর... বলে মাকড়সা ফিরলো পৃথিবীতে ।

ফিরে ঘুরছে, ঘুরছে ঘুরছে বন-জঙ্গলে, গিরি-পর্বতে, ময়াল-মাশের সম্মানে । সে-দিন আর সে-রাত তাঁর ঘুরে ঘুরেই কাটলো...কত মাশ দেখলো...গোবরো, কেউটে, কাল-নাগিনী, লাউ-ভগা, হেলে, জল-চৌড়া...ময়ালও দেখলো,—তবে সেগুলো ছোট ছোট ! পরের দিন সকালে—হ্যাঁ—মনের মতো মত্ত এক ময়াল পড়লো নম্বরে । একটা গোটা শাহাড় প্রায় ঘিরে ফেলেছে...পাক দিয়ে জড়িয়ে ! ঘুরে ঘুরে অনেকক্ষণ ধরে তাকে দেখলো...দেখে, প্রকাণ্ড একটা লগি খুঁজে সে এসে দাঁড়ালো ময়ালের সামনে । পাড়িয়ে পা তুলে তুলে কত রকমের ভদী...যেন নাচছে ! ময়াল দেখলো,—দেখে ময়াল বললে—সকাল বেলায় কী হলো যে তোর মাকড়...ঠ্যাং তুলে তুলে নাচছিস যে !

মাকড়সা বললে—নাচিনি—মাশ কবছি ।

—কিসের মাশ ? ময়াল বললে ।

মাকড়সা বললে—ছিন্নিয়া ঘুরে কত কি দেখে বেড়াচ্ছি ময়াল মাশা...ওখানে ইয়া-লখা একটা বাঁশের লগি পড়ে আছে...তোমাকে দেখে ভাবছি, কোনটা বেশী-লখা ? ঐ বাঁশের লগিটা ? না, তুমি ?

ময়াল বললে—খেশেছিস ! লগি হবে আমার চেয়ে লখা ? খেৎ !

মাকড়সা বললে—ভাধোনি বলে একথা বললে মাশা ! যদি দেখতে, তাহলে আমার মতো তোমারো খোঁকা লাগতো !

ময়ালের খেয়াল...ময়াল বললে—খোঁকার থাকাবার দরকার ? চ, দেখি গিয়ে—তোমার খোঁকা যুচবে ।

ময়ালকে নিয়ে মাকড়সা এলো সেই লগির কাছে । ময়াল বললে—কি ? কি মনে হচ্ছে ?

মাকড়সা বললে—ঠিক বুঝতে পারছি না, দাদা ! এক কাজ করি !

—কি কাজ ?

মাকড়সা বললে—লম্বালম্বি হয়ে লগিটা জড়িয়ে যদি জুতে পারো, তাহলে আর সম্ভেদ থাকে না ।

—বেশ ! বলে লগিটা ঘিরে ময়াল শুতো লম্বা হয়ে—মাকড়সা তখন করলে কি, খুব মোটা লতা দিয়ে ময়ালকে বাঁধতে লাগলো লগির গায়ে । ময়াল বললে—কি হচ্ছে ?

মাকড়সা বললে—তুমি দেখতে পাচ্ছো না—কিন্তু আমি দেখছি মাঝে মাঝে তোমার গা হুঁচকে হুমড়ে আছে—তাই লগির সঙ্গে বেঁধে লম্বাটা বেধে ঠিক করছি ।—

—ও ! ময়াল বললে—তা ঝাঝ, ভালো করেই ঝাঝ !

লগির সঙ্গে বাঁধা শেষ হলে ময়াল-বাঁধা লগি নিয়ে মাকড়সা, চললো ভগবানের কাছে—
ভাকলো, ঠাঁহুর...

ভগবান বললেন—এই যে মাকড়সা ! কি খবর ?

—এনেছি ঠাঁহুর, জ্যাক ময়াল...

ভগবান দেখেন, সত্যি তো...তিনি বললেন—ভালো, দুবারের পরীক্ষায় পাশ ! এখন তিনের কাজ !

মাকড়সা বললে—জ্যাক কেঁদো বাঘ...ঠিক এনে দেবো ঠাঁহুর ।

পৃথিবীতে কির মনে নানা রকমের মতলব...একটা মতলব লাগদই লাগলো । মাকড়সা তখন একটা ছুঁচে হুতো পরিবে বনে চললো—একবারে অজগর বনে । হালুহ-হলুহ ভাক শুনলো—বেমন শোনা—মাকড়সা অমন চুপ করে এলে চোখ বুজে । ঘাসের উপর হুতো পরানো ছুঁচটা বুলোতে লাগলো । বাঘ এলো...জ্যাক কেঁদো বাঘ । বাঘ দেখে, মাকড়সা বলে চোখে কি বেন দেখছে ! ভাবলো চোখে কি পড়লো বুঝি ওর ! বাঘ এলো কাছে, বললে—করছিস কি, এঁয়া !

মাকড়সা শুখন ছুঁচ-হুতো বেধে বলে উঠলো—বাঘামাঝা ! এ হে হে, করলে কি, বলো তো ! কত-কি দেখছি...আর তুমি ভেকে সব মাটি করে দিলে ।

বাঘ বেন আকাশ থেকে পড়লো ! বাঘ বললে, তার মানে ?

মাকড়সা বললে—মানে, এই ছুঁচ আর হুতো ! খালি চোকে কতটুকুন আমাদের নজর চলে । এই ছুঁচ-হুতোর এমন গুণ...চোখে দিলে ছুনিয়ার যেখানে যা আছে...সব দেখতে পাবে । শুখু

তাই নয়—হুনিচার বাইরেও নজর চলবে। শিকারের অস্ত্র তীব্র হতে হবে না। কাছাকাছি কতটুকু আত্মনা—তাতে কি পাবে? সুখে নজর লাগাবে—শিকারের সন্ধানে।

জনে বাঘের মন মেতে উঠলো। ছাশিম সে উপোসী আছে—শিকার হেলেনি। শিকারী এখন বেশ চাণাক হয়ে উঠেছে—খালি লুকিয়ে লুকিয়ে থাকে—পালিয়ে বেড়ায়।

বাঘ বললে—আমাকে দেখাতে পারো?

—নিশ্চয়। তবে একটু ব্যথা পাখে চোখে...ছুঁচ-ছুঁটানো ব্যথা। সে আর কিবা এমন...

শিকারের তুলনায়!

বাঘ বললে—ব্যথা! ছুঁচ! কুহ পরোয়া নেই।

মাকড়সা বললে—তাহলে স্থির হয়ে বসো...নড়াচড়া নয়—মুখে দু'শব্দটি নয়।

বাঘ বললে—বেশ।

বাঘ বললো স্থির হয়ে। মাকড়সা বললে—চোখ বুজতে হবে—চোখ আঁশি সেলাই করে দেবো...খোলা আর খালি চোখে দেখা যাবে না।

বাঘ চোখ বুজলো। মাকড়সা ছুঁচ চালিয়ে বাঘের দুচোখ দিলে প্যাট্ প্যাট্ করে সেলাই করে। হাতনা বেশ—বাঘ দু'শব্দ করছে না—চুপ করে আছে। নজর একবার চললে হয়, তখন এক লাফে হুনিচার যেখানে যত শিকার—হঁঃ!

বাঘের চোখে পড়লো মোক্ষম সেলাই—তারপর তার লাজ ধরে মাকড়সা বললে—এবারে তোমাকে নিরে গিয়ে এমন জায়গার বসিয়ে দেবো—বদবামাত্র এই বন্ধ চোখে নজর যা চলবে—দেখো তখন...

বাঘ বললে—বেশ কথা!

লাজ ধরে ব্যথকে টানতে টানতে মাকড়সা গিয়ে হাজির ভগবানের কাছে।

ভগবান দেখলেন; দেখে বললেন—হ্যাঁ মাকড়সা—তোমার ক্ষমতা আছে। আমার বিচারে দোষ পাবে না। আজ থেকে তোমার বুদ্ধির তারিফ করবে সকলে—জন্তু-জানোয়াররা বস্তু দৃষ্টই যে হোক—তোমার জালে পড়লে কাকেও বেকতে হবেনা। আর তোমার শিকার—তুমি যেখানে খুশী জাল পেতে বসবে, সেইখানেই তারা এসে ধরা দেবে। তাছাড়া মানুষরা তোমার জাল দেখে তোমার ক্ষমতার কথা বইয়ে লিখে লিখে প্রচার করবে। ছোট হলেও—টিকটিকি-সিরগিটির মতো তোমাকে কেউ ভুজ্জ করবে না—তোমার জাল হবে দুর্ভেদ্য।

সেই থেকে মাকড়সার এমন দাপট! মাকড়সা যেখানে বড় বড় বীর বাহাদুরও স্তম্ভ পান—তুমি আঁশি তো ভুজ্জা বীর!*

* পশ্চিম-আফ্রিকার রূপকথা

ক্ষুদ্র বটে তুচ্ছ নহ

বিজ্ঞানপ্রিয়

কটাগট্ট কটাগট্ট আওয়াজ শুনে চোখ পড়লো সেই দিকে। এ কি কাণ্ড! থাকে দেখলে আমরা তরে আংকে উঠি, তিনি নিজে শক্রর কবলে! তাঁকে দেখে আমিও দিউরে উঠেছিলুম প্রথমে; তারপর তাঁর অবস্থাটা ভাল করে দেখে হাসবো না হাস-হাস করবো ঠিক করতে পারলুম না। তিনি বতই গা-ঝাড়া দিয়ে নিজেকে মুক্ত করবার চেষ্টা করছেন, শক্ররা ওতই তাঁকে ছেকে ধরছে। মাঝে মাঝে গর্জে উঠে বলছেন, “একা একা লড়ে যা না দেখি!” কে কার কথা শোনে। “একটার সঙ্গে তোরা এতগুলো, লক্ষ্য করে না?” প্রাণপণে গর্জন করলেন তিনি। শত্রুপক্ষ উপহাসের হাসি হেসে খেন বললে—“লক্ষ্য মাঝার থাক, এখন তো তোমার আগে শেষ করি!” তাদের সংখ্যা গিল্গিলিয়ে বেড়ে চলে। তিনি নিফল আক্রোশে কামড় দেবারও চেষ্টা করলেন অনেক, কিন্তু কিছু হ’লো না। সে কামড়ে আমরা বাচতুম কিনা সম্ভব, কিন্তু ওদের তাতে কি হবে। বাঁচবার চেষ্টা প্রাণপণ করেও শেষ পৰ্যন্ত তিনি ইহলীলা সংবরণ করলেন—অৰ্ঘ্যে মারা গেলেন।

কে কার ঠাতে মরলেন বুঝতে পারলে কি? একটা পাঁচ ছ’ফুট লম্বা বিষধর সাপ বুন্দো লাল পিঁপড়ের খুঁপরে প্রাণ মিল। লাথ লাথ পিঁপড়ে ছেকে ধরেছিল তুচ্ছ প্রত্নকে—একটা বেশ পুরু, কোটিং থাকে বলে, পড়ে গেল সাপটার গায়ে দেখতে না দেখতে কতক্ষণ আর লড়াই করবে। কাকেই বা ছোবল মাংবে? সাপের ছোবলকে পিঁপড়েরা ভয় কবে না। ক্ষুদ্রের মিলিত শক্তি যে অসাধ্যসাধন করতে পারে তার একটা ছোট্ট নিদর্শন চোখে পড়লো।

তোমরা বিশ্বাস করো কি না জানি না—অসীম ক্ষমতা আর অসাধারণ বুদ্ধি এই পিঁপড়ের। মানবের শক্তি এদের দেহে, মানবের বুদ্ধি এদের মাথার—আচার-আচরণে, কাজে-কর্মে এরা মানুষের সমান অনেক বিষয়ে। এদের দেহের শক্তির কথা শুনলে অশ্বাক হতে হয়। পিঁপড়েরা তাদের দেহের ওজনের চারপাশ ওপাশী বিভিন্ন তুলতে পারে। সেই অল্পপাতে একটা মেড়মনী মানুষকে তুলতে হয় ছ’শ মণ। ওদের দেহের আকার খুব ছোট তাই রকে, যদি সেইটা বড় হতো—তাহলে ওদের বুদ্ধি আর শক্তির জোরে মানুষকেও তোমাক্য করতো না; তাহলে পিঁপড়েই হতো জীবজগতের প্রভু—বিজ্ঞানীরাই এই রকম কথা বলেন এদের সম্বন্ধে। তার কারণ আছে।

জীব আর উদ্ভিদবিজ্ঞার থিরা অস্থূলন করেন, তাঁদের ইংরাজীতে বলে ক্রাচাভ্যালিট—আমরা বলতে পারি প্রকৃতিবিজ্ঞাবিদ এঁরা পিঁপড়ের জীবনযাত্রা আচার-আচরণ ও কাম-কর্ম গর্বেবক্ষণ করে

দেখেছেন যে, মাহুকের সমাগের সঙ্গে পিপড়ের সমাগেও অনেক মিল আছে। মাহুকের মত অনেক কাজই পিপড়ের করতে পারে। ওরা চাষ-আবাদ করে শস্ত সংগ্রহ করতে পারে, ওদের আবার কীটনাশ আছে, তারা ওদের নির্দেশমত কাণ করে; পিপড়েরা এক রকম কীট পালন করে দোহন করে, যেমন আমরা গরু পালন করি। ছুখ-সওয়া এই কীটগুলোকে রীতিমত চরাবার, ভালভাবে রাখবার ব্যবস্থাও করে পিপড়েরা। এ ছাড়া পিপড়েরা মাহুকের মতই বিরাট সেনাবাহিনী পরিচালনা করে। তাদের সেই বিশাল বাহিনী কাজকর্ম খুঁটিনাটি দেখলে তাক্ষর বনে যেতে হয়। তারপর পিপড়ের বসতি, তাদের ঘরবাড়ী পথ-ঘাট, তাদের ঘর-সংসার প্রভৃতি দেখে বহু বিজ্ঞানী ওদের বুদ্ধি এবং কর্মশক্তি:ক মাহুকের মতই বলেছেন। ওদের সংগঠন ক্ষমতাও খুবই উচ্চ স্তরের।

ভোমরা শুনে অবাক হবে যে, প্রায় পড়ে তিন হাজার জাতের পিপড়ে আছে বিজ্ঞানীদের জ্ঞান। ওদের সকলেরই বুদ্ধিবৃত্তি সমান কিনা সে বিষয়ে তারা একমত নন। তবে, বিজ্ঞানীদের মতে পিপড়ের বুদ্ধিবৃত্তির চরম উন্নতি যা হবার তা নাকি কোটি কোটি বছর আগেই হয়ে গেছে। পিপড়ের কসিগ অর্থাৎ পাখর-হুয়ে-বাওয়া-অবস্থা পরীক্ষা করে জানা গেছে যে, বহু লক্ষ বছর আগে তাদের বন্যাবাদের ধারা যেমন ছিল, এখন তার চেয়ে কিছুই বদলায় নি। তার মানে কি জান? তারা তাদের সভ্যতার চরম দীর্ঘায় পৌঁচেছিল বহুকাল আগেই—তাদের জাতের উন্নতির আর কিছু করার ছিল না। সেই ভাবেই চলে আসছে আজও তাদের সমাজ-জীবন। যা দেখলে বিশ্বের শোনা থাকে না।

পিপড়ে সেনাপালের কাণ্ডকারখানাও দেখবার বিষয়। ঝাঁকে ঝাঁকে ওরা চলে দারে দারে তালে তালে, তাদের সঙ্গে চলে শিঁধির-কর্মা অস্ত্র পোকার দল। বিমান বাহিনীর মত বুনো ঝাছির ঝাঁকও উড়ে চলে তাদের সঙ্গে সঙ্গে। তাদের চলার পথে বা পড়বে তার রকেট নাই; তা সে সাপই হোক, সিরগিটিই হোক বা পশু পক্ষীই হোক। দিনে আধ হাউল পথ বেতে পারে দৈনিক পিপড়ের দল। এখন চলতে থাকে বা কোনো কাজ করে তখন ওদের ক্রান্তি দেখা যায় না। আবার ঘরকার মত কিছুদিন এক জায়গার বিশ্রামও নেয়। সেনাবাহিনীর মিলিত কাজ দেখলে মনে হবে যেন একটা পিপড়ে বহু হয়ে একই ভাবে কাজ করে চলেছে। পৃথক পৃথক ভাবে এখন কাজ করে, তখন প্রত্যেকের নিজস্ব বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। কাজ হাঙ্গিল কওয়ার ক্ষেত্রে জীবন দান করা ওদের যেন স্বভাবের মধ্যেই রয়েছে। আমরা চীন-জাপানের একটা যুদ্ধের কাহিনীতে জানি সৈন্যদলকে একটা নদী পার করার ক্ষেত্রে কত শত জাপানী সৈনিক বেচ্ছার মৃত্যু বরণ করে তাদের দেহ দিয়ে সেতু রচনা করে দিয়েছিল—তার উপর দিয়ে অস্ত্র সৈন্যরা হেঁটে পার হয়ে শত্রুপক্ষের দুর্গ আক্রমণ করলো। পিপড়ের মধ্যে এই রকম শহীদ হওয়ার উদাহরণ প্রায়ই দেখা যায়। হরত জল পার

হয়ে তবে খাবারের পাত্রে পৌছতে হবে, সেখানে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে এক শার পিঁপড়ে মরে ভাসছে মলে; তার উপর চলেছে জীবন্ত মৈনিকের মল। আবার জীববিজ্ঞানবিদ্যার দর—এমন ব্যাপারও লক্ষ্য করেছেন যা দুঃসাহসিকদের পক্ষেই সম্ভব। পিঁপড়াদের মধ্যে দুঃসাহসিকের সংখ্যা কম নেই। তারা হয়ত সটান সেওয়াল বেয়ে কড়িকাঠে পৌছলো ঠিক খাবারের পাত্রটার উপরে। তারপর হাত পা ছেড়ে পড়লো তার উপর। ভাবতে পারো—কি দুঃসাহস এদের। স্তূপে দানব ছাড়া কি বলা যাবে এদের!

এতটুকু তো জীব কিন্তু এদের দৃষ্টিশক্তি কত প্রখর, সন্ধান করবার ক্ষমতা কত সূক্ষ্ম সে অল্পশ্রমে মাহুকের কিছুই নেই। এদের যে কেবল মাহুকের মত বৃদ্ধি আছে তা নয় স্বরণ করে রাখবার ক্ষমতাও কম নয়। যে পথ দিয়ে তারা এগোয়, সে পথ বতই জটিল হোক, নির্দিষ্ট স্থানে তারা ঠিক কিরে আসতে পারে সেই পথেই। পথের চিহ্ন হিমাংগে হয়তো কোনো কাঠের টুকরো, কোনো ছড়ি, ঘাসের খণ্ড পিঁপড়েরা ঠিক করে নেয় খাবার সম্বন্ধ। ভ্রমের পথে দেইগুলো দেখে দেখে ঘিরে আসে। এদের মনে রাখবার শক্তি কেমন তা তোমরাও চেষ্টা করলে দেখে নিতে পারো। এক টুকরো খাদ্যবস্তু কেনে রাখো। কিছুক্ষণ পরে হয়ত একটা পিঁপড়ে দেই পথে যেতে যেতে আবিষ্কার করলো খাবারটা। চেষ্টা করে দেখলো তার একার ক্ষমতায় সেটাকে নড়ানো যায় না। চলে গেল সহকারীর খোঁজে। ঠিক লক্ষ্য রাখলে দেখা যাবে মলবল নিয়ে হাজির হলো সেই জাহ্নগায়—তারপর সেটাকে সকলে মিলে তুলে নিয়ে চললো নিষেদের আন্তানায়। এ থেকে বোঝা যায় ওদের স্বরণ শক্তি কেমন। খাবারটা কোথায় দেখে এসেছে সেটা ভোলেনি বলেই প্রথম পিঁপড়েরা অল্প সকলকে পথ দেখিয়ে বখানানে নিয়ে এসে।

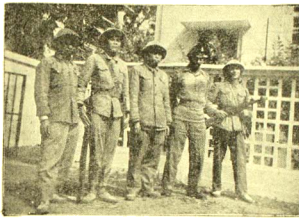
জীববিজ্ঞানবিদ্যার দলের পর্যবেক্ষণ থেকে তোমাদের কয়েকটা উদাহরণ নিম্ন পিঁপড়ের বৃদ্ধি আর দৈহিক শক্তির ঐরা ওদের জীবন প্রণালী নিয়ে গবেষণা করেছেন, তাঁরা ওদের সম্বন্ধে কত তথ্য যে আবিষ্কার করেছেন তা পড়লে অবাক হয়ে ভাবতে ইচ্ছে করবে মাহুকের ওদের দেখে শিখেছে কিনা—ঐ মিলে-মিলে কাজ করবার ধারটা। অতি ক্ষুদ্র অতি তুচ্ছ জীব কিন্তু বৃদ্ধিবৃত্তিতে তুচ্ছ নয়।

গিবস্ ডেটিফ্রিস চিত্র-প্রতিযোগিতার ফলাফল

প্রথম পুরস্কার :: ক্রিপস্ রেভিও। পেয়েছে :: টি. মনামিশি ডাটা, পুলিগার, সারাতাউট পোষ্ট, সাগং (শিমোগা ওয়েস্ট)। দ্বিতীয় পুরস্কার :: ফেবার লিউবা রিট ওয়াচ। পেয়েছে :: প্রভাপ সিং দেবজা, মিকা ক্যান্টারি, ডান্না বোগানী (বোগানী)। তৃতীয় পুরস্কার :: আগলা আইগোলা ক্যামেরা। পেয়েছে :: রাকেল থোজা, ১৩২২ আগিপুর রোড, মিল্লী। এ ছাড়া একশো কমসোলোপন পুরস্কার দেওয়া হয়েছে একশো জনকে।

ইন্দোচীনের চিঠি

শ্রীঅজিতকুমার ভট্টাচার্য



একজন ভারতীয় সৈনিকের সঙ্গে সীপ-ডাইটার গিটেন,
হোয়াং ও ওলের হাঁমন বহু

এখানে আমাদের সরকারী
দীপে চড়ে বেড়াবার খুবই সুযোগ
ও সুবন্দোবস্ত রয়েছে। তবু
আমি প্রায়ই একা একা অথবা
হু'একজন সঙ্গী নিয়ে পদব্রজে
চলে যাই অনেক দূরে, ঘুরে-ফিরে
দেখি এখানকার গ্রাম ও শহরের
লোকজন ও প্রাকৃতিক দৃশ্য।
এতে আনন্দও পাওয়া যায়
প্রচুর, আর সেখাও যায় বেশী।
তাছাড়া এসেন্সীর দীপ-চালকদের
কথা আমরা খুঁচি না এবং গুরাও
ইংরেজী অথবা আমাদের ভাষা

বোঝে না বলে অনেক সময় হেঁটে খেঁড়ানোই প্রের মনে করি।

তবে সম্প্রতি আমি কিছু কিছু ভিয়েনামী ভাষা শিখেছি, আর এখানকার কেউ কেউ
আমাদের সঙ্গে বিশেষ একটু-দাঁখটু হিন্দীও শিখেছে। তবে এখনও মাঝে মাঝে উণ্টো-পাণ্টা বলে
ফেলি, সামান্য উচ্চারণেরও ভুল হয়ে যায় এবং এই অর্থ-তারতম্যের ফলে ঘটে নানারকমের বিভ্রাট।
এই ভাষা-বিভ্রাট সম্বন্ধে এবার একটু তোমাদের বলব :

‘ভি চৈ’ বলেই ডাইটার লিখেন আমাদের নিয়ে যার বেড়াতে। একদিন আমার সঙ্গী বন্ধিন
ভারতের লোক নাহার ওকে ‘ভি চুই’ বলাতে হ’ল কি, ও আমাদের নিয়ে গিয়ে পৌঁছে দিল
এক কলার বাঁধারে। ‘চুই’ মানে কলা।

আমি আবার শুদ্ধ কবে বলতে গিয়ে—বলাম, ‘হোং চুই’ (চুই নয়) হবে চু-য়া। এর ফলে
আমরা কিছুক্ষণের মধ্যেই পৌঁছে গেলাম একটা স্থান বোদ্ধ-মন্দিরে।

এসম্ভে একঘরে মন্দির দেখতে এখন আর ভালো লাগে না। তবে এটা মন্দির ভালো
যে, বত খুলি মন্দিরই দেখা যাক, আমাদের দেশের মত মন্দিরের পাণ্ডা-পুঙ্কতরা এখানে পর্যায়ান্তে
পাণ্ডা করে তোলে না। পরমা দিলেও অনেক মন্দিরে তা গ্রহণ করা হয় না।

এমনি আর একদিনের কথা
বলি : সেদিন ড্রাইভারকে 'ডি ফ
চোই' বলতেই সে আমাদের নিয়ে
গেল একটা সুস্থির বেচা-কেনার
ঘাটে। মহা ফাঁপাধেই পড়া
গিয়েছিল সেদিন। আমরা ওখানে
গিয়ে কি করবো? আলো সেদিন
আমি বলতে চেয়েছিলাম, 'ডি ফ
হাং চুই' অর্থাৎ কলার বাজার
ঘাও। একটা কথা এইখানে বলতে
চুলে গেছি যে, আমাদের বাসস্থানটি



ইন্দোনেশিয়ার একটি বৌদ্ধ-মন্দির

ছিল 'ফো হাং চুই' নামক রাতার উপর—একটা সুস্থির ভেতলা বাড়িতে। ও রাতটা নিয়ে সর্বদা
কলার ব্যাপারীরা প্রচুর কলা বাজারে নিয়ে যেত বলে ওটার ঐ নামকরণ হয়েছিল। কলারীদের
সেওয়া নাম বদল করা হয়েছে সম্প্রতি। 'ডি ফ চোই' মানে হ'ল সুস্থির বাজারে বাও।
সেদিন আমি 'ডি ফ হাং চুই' এর বদলে ওরকম ওলট-পালট করে বলে ফেলতেই হয়েছিল
এরূপ অবস্থা।

আর একদিন লিয়েনকে (ড্রাইভারের নাম) বলেছিলাম, 'ডি আনহ'। লিয়েন নিয়ে গেল
আমাদের নিকটেই এক শরাইয়ের স্তম্বলোকের মাঝে। তিনি আমাদের সঙ্গে দেখাও করে বলেন,
'চাও তং' (নমস্কার)।

আমি কি বলব একটু ইতস্ততঃ করছি, এমন সময় আমার আরেকজন সঙ্গী পদ্মী (গাড়োয়ালের
লোক) হঠাৎ বলে ফেলেন, 'আনহ বম্' অর্থাৎ মিসেস কোথা? তখন ড্রলোকটি ডাবলেন,
আমরা বোধ হয় ওর স্বীর সঙ্গেই আলাপ করতে এগেছি। তাই তিনি তাঁর স্ত্রীকে দেখিয়ে দিলেন।
মহিলাটি আমাদের কাছে এসে করমর্দন-পর্ব শেষ করে বদতে বলেন, এবং অনর্গল ইংরেজীতে কথা
বলতে শুরু করলেন। আমরাও হাঁফ ছেড়ে বীচলাম।

তদ্রূপমহিলাটি আমাদের ভাষা-বিজ্ঞানের মজাদার মজাদার কথা শুনে খুব একচোট হেসে নিলেন,
এবং ওর স্বামীকে নিজের ভাষায় বলেন আমাদের কথা। তারপর পথকে বলেন, আপনি 'আন কহ'
(ভাত পাওরা) বলার বদলে বলেছিলেন, 'আনহ বম্' তাই এরূপ হয়েছে।

—“ও ড্রলো না হলে যে আপনার মত একজন ড্রল ও তিন্থী মহিলার সঙ্গে আলাপ-

আলোচনার স্বার্থেই ঘটত না।" চালাকি করে পছন্দী হলেন। মহিলাটি শেখিন আমাদের চা-পানে আশান্বিত করেছিলেন।

আরেক দিন জীপে চড়ে আমি একলাই বেরিয়ে পড়লাম সন্ধ্যাবেলায় হানোই শহরের আশপাশের জায়গাগুলি দেখেই বলে। সঙ্গে শুধু ড্রাইভার হোয়াং। প্রবলবেগে হোয়াং জীপ চালিয়ে চলছে, কিছুতেই থামছে না; ওকে থামাতে বলে বলে হুয়ারান হয়ে পড়লাম। আমার ভণন 'চালিয়ে যাও তাড়াতাড়ি' বলবার কথা দুটি 'ভি মাউলেন, মাউলেন' মনে রয়েছে, অথচ হুঃখের বিষয় প্রয়োজনের সময়ে 'থামো থামো'র দুটি কথা 'হুংলাই হুংলাই'-ই ভুলে গিয়েছি। সার্বজনীন ভাষা অর্থাৎ সংস্কৃত বা ইশারা-চিহ্নারা প্রয়োগ করেও সেদিন কোনো ফল হ'ল না।

যা হোক, জীপটা পরে থামল গিয়ে প্রায় ৪০০০ মাইল দূরে একটা গণ্ডগ্রামে। কোনো কোনো বিষয়ে মনে হ'ল বাংলায়ই কোনো গ্রামে এসে পৌঁছেছি যেন আমি। দেখলাম মেয়েরা সেখানে ধান ভানছে আমাদের দেশের পদ্ধতিতে। ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা হৃদয়ে প্রদীপ রেখে বেচে বেচে গান করছে অনেক অনেক। খালে স্ত্রী-পুরুষরা একত্র মিলে মাছ ধরছে ধর্মজাল দিয়ে ও অন্তরায় কায়দায়। ওদের হাতে রয়েছে মশাল, টর্চলাইট ও লাঠি। মনে পড়ল এক সময় দেশের খালে এইভাবে মাছ ধরে কতই না আনন্দ পেয়েছি—ইচ্ছে করল, ওদের সঙ্গে মিশে গিয়ে মাছ ধরি।

ওদের মাছধরার দিকে কতক্ষণ চেয়েছিলুম ঠিক মনে নেই, এমন সময় দেখি আমার ড্রাইভার হোয়াং জীপ ফেলে রেখে কোথায় উধাও! জীপের ভেতরে বসে বসে আকাশ-পাতাল ভাবছি, এমন সময় আমার চাবুকিক লোকের ভিড় মনে গেল। আমি যেন এক আত্মব জীব! কেউ কেউ 'চাও তং চাও তং' (নমস্কার, নমস্কার) বলে আমার সঙ্গে সেক্ষাও করল। আমার উত্তর ঠিক হচ্ছে না শুনে ওরা সবাই হেসে লুটোপুটি। ওদেশের নিয়ম হ'ল 'চাও তং' বলতে হবে বয়স্ক পুরুষকে, আর বৈধবৎসর স্ত্রীলোককে বলতে হবে 'চাও কো', 'চাও দে' ইত্যাদি। বিবাহিতা স্ত্রীলোককে 'চাও বা', অবিবাহিতাকে 'চাও কু'। ছোটো ছেলেদের 'চাও এং' আর মেয়েদের বলতে হবে 'চাও চি'। সত্যিই ভাবার ব্যাপারে এ এক অদ্ভুত কাণ্ড! আমি তো 'চাও' বলেই ইা করে চেংর থাকি, পরে এম্, চি, কু, কো, বা, দে, জুড়ে দেব ব'লে; আর মনে মনে ভাবতে থাকি, আর কখনও সোভাবীকে সঙ্গে না নিয়ে এভাবে বাহাজুরি ক'রে পথে বেরব না!

ঠিক এই সময়, প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে 'এংলে, এংলে' (ইংরেজী, ইংরেজী) চিংকারের সঙ্গে হোয়াং-এর কণ্ঠস্বর শোনা গেল। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম আমি। শীতের রাত্রিও যেমি উঠেছিলাম সেদিন। হোয়াং চেঁচা করে ইংরেজী জানা একজন পুরুষ ও আরেকজন স্ত্রীলোককে

হাজির করেছিল আমার সামনে। মোতাবীদের সহায়তার ওদের গ্রাম্যজীবন সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানলাম। ধর্মজালের সাহায্যে মাছও ধরলাম। বেশীরভাগই কৈ, ভাগুর, পুঁটি ও পাংখা প্রভৃতি জাতীয় মাছ ওদেশে পাওয়া যায়। সেদিন চা (দুধ ও মিষ্টি ছাড়া) এবং কৈ মাছ ভাজা দিয়ে তাম-বাসীর আমাকে আপ্যায়িত করল।

গ্রামের লাইব্রেরী বা পাঠাগারে গিয়েও বেশ আনন্দ পেলাম। এখানে অনেক বইপত্র ও ছবি রয়েছে। কোনো গণ্ডগোল না করেই সবাই (স্ত্রী-পুরুষ) বলে বলে পড়ছে। পাশে নির্গোষ আরাম-প্রমোদের অন্ত্রে আলাদা বড় একটি ঘর আছে, সেখানে রেডিও বাজছে।

গ্রামের বাড়িঘর সবই বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন—যদিও প্রত্যেক বাড়িতেই গোরু, ঘোষ, হাঁস, সুবর্ণী, শূকর প্রভৃতি পোষায় ব্যবহৃত আছে। গ্রামের কয়েকটি বাড়িতে গিয়ে নাচ গান প্রভৃতিও উপভোগ করলাম। ওদের নাচ অতি মনোরম। এদিন বাড়ি ফিরলাম অনেক রাত্তিরে।

পরের দিন ক্যাপ্টেন থিয়ার (ডিরেংনামী) সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে বুঝলাম, তিনিই আমাকে ঐ গ্রামে নিয়ে যাবার অন্তে হোয়াংকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। কারণ, একদিন কথায় কথায় ওর প্রবন্ধ উত্তরে আমি জানিয়েছিলাম—শুধু নদর দেখে কোনো দেশকে জানা যায় না, গ্রাফিকলও দেখতে হয়।

কিছুদিন আগে কলেজের ছাত্র থিয়েন আমাদের কয়েকজনকে ওদের বাড়িতে চায়ের নেমকম করেছিল। ওর মা, বাবা, দাদা, তাইবোন ও বৌদিরা সকলেই করমর্মন-যোগে ঝাঁপত জানিয়ে ও দাদার অভ্যর্থনা করে আমাদের নিয়ে গেলেন অন্ধরমহলে। 'নমস্কে', 'জয়হিন্দ' বলে হাততোড় করে ভারতীয় প্রথাৎ লংবর্ন জানালেন আংয়ের বিশেষভাবে থিয়েনের মা ও বাবা।

থিয়েন ও ওর দাদা ইংরেজী জানে, আর অন্য কেউই দু'একটি শব্দ ছাড়া ভালো ইংরেজী জানে না। ফরাসী ভাষায় কথা বলতে জানে প্রায় এদেশের সবাই। মোতাবীর কাজ সুইভাবে চালিয়ে নিল থিয়েন ভ্রাতৃঘর। থিয়েন আঙ্গকাল হিন্দী শিবতে আমাদের সঙ্গে মিশে, আর আমরা শিখছি ওর কাছে থেকে ওদের ভাষা, ডিরেংনামী। ভাষাবর্ষণ ও ভারতের কলা, কৃষ্টি, রীতি-নীতি শিক্ষা-নীতি, ধর্ম, ষাভ, কৃষি, নাচগান ও ভাষা প্রভৃতির বিষয়েই এদিন আলাপ আলোচনা হ'ল বেশী।

ওদের বাড়িতে কয়েকটা তৈলচিত্রে দেখলাম, খুব সুন্দর। কয়েকটা ফরাসী শিল্পীদের কাজ, আর বাকী কয়েকটা ওদের নিজেদের হাতের। ভালো ভালো বইপত্রও রয়েছে প্রচুর। ওদের বাড়িঘর খুবই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। বলা বাহুল্য, ওদেশের বাড়িঘরের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রতি সকলেরই নজর আছে। বাড়ির কর্তা ও গিন্নী রোজ দু'বেলা ঝাঁটা হাতে নিয়ে কাজ করে থাকেন, আর তাঁদের

মখে মখে ছোটরাও ডাতে বোগদান করে। তাদের আর বল দিতে হয় না বা তেকে আনতে হয় না। কতো শিক্ষক, শিক্ষয়িত্রী, প্রিন্সিপাল, প্রফেসর, উকীল, ব্যারিষ্টার, সাংবাদিক, ম্যাজিষ্ট্রেট ও দেশের নেতারা দেখেছি অস্বাভাবিক ভাঙির ও বাড়ির মলগ্ন রাস্তা নিশ্চেষ্টা ঝাঁট দিচ্ছেন।

আমলে, ওদেশের বাড়িঘরের ভেতরে ঢুকলে সর্বত্রই পাওয়া যায় হুকটী ও মত্যাভার পরিচয়।

আরেকটা কথা নিম্নে কুলে গেছি। ওদেশে প্রথা আছে, কোনো অতিথি-অভ্যাগত কাকুর বাড়িতে গেলেই প্রথমে যেতে হয় ওদের ঠাকুর ঘরে বা মন্দিরে। ওখানে বৃদ্ধদেবের বা যিত্তর দার বা ধর্ম দেই অল্পব্যয়ী মূর্তি বা পট রয়েছে, আর বাড়ির স্ত্রী-পুরুষ দ্বারা আগে পরলোক-গমন করেছেন তাঁদের মূর্তি অথবা ফটো। ওাদের সবারই উদ্দেশ্যে ও-ঘরে গিয়ে ফুলের মালা বা ফুল দিতে হয়। মালা বা ফুলের ব্যবস্থা করে বেন বাড়ির মালিকই। আমরাও থিয়েনদের বাড়ি গিয়ে ঐ প্রথা অল্পব্যয়ী কাজ করেছি। থিয়েনদের বাড়িতে নানান আলোপ-আলোচনা করতে করতে ফাঁকে ফাঁকে ওদের বাড়ির ছেলেপুলেদের নাচ-গানও খুব উপভোগ করলাম।

থিয়েনের একটি দ্বিগুণ্ট ৩৪ বছর বয়সের ভাইপোর সঙ্গে আমার অল্প সময়েই বেশ একটু ভাব জমে উঠল। সকলের সঙ্গেই বিনামূল্যে মজার জামিয়ে ও সেদ্ধাও করে বেকবার সময়ে আমার ঐ ছোট বন্ধু পু পু কথো দাঁড়াল। সে আমার যেতে দিবে না কিছুতেই। আমি থাকতে রাগী না হওয়ায় এবং আরেক দিন এসে থাকবো বলায়, সে আমার একটু প্রলোভনও দেখাল। বলে, "দুপুর বেলায় আজ আমাদের বাড়িতে মস্ত বড় একটা কুকুর কেটে রান্না হয়েছিল, যেতে কি সুবাদ! তার কিছুটা রাজির অন্তেও রয়েছে, তুমি এখানে থেকে গুটা খেয়ে যাওনা কেন? তুমি যদি এবেলা বেয়ে যাও, তবে তোমার জন্মে একটা বিড়ালও কেটে রান্না করে নেওয়া হবে!" বলে কাছের একটা বোটাসোটা বিড়ালকে আঙুল দিয়ে আমার দেখিয়ে দিলে। ওর কথা শুনে ওর কাকা থিয়েন জিব কেটে ও পরে মুখের সামনে তর্জনী রেখে "চূপ করো" বলে ইশারা করতেই পু চূপ করে গেল।

এরপর অবশ্য পু কথার মোড় কিয়দে বসে, "না না আমি বলছিলাম কি, তুমি যদি আজ আমাদের বাড়িতে থেকে যাও আর আমার কথা মেনে চল, তবে তোমার একটা পিস্তল ও একটা তিন চাকার সাইকেল কিনে দেব।" ওর চালাকি লক্ষ্য করে আমরা সকলেই সেদিন খুব হেসেছিলাম।

খেলোয়াড়দের খবর

মেঠুড়ে

লেকে ফুটবল স্টেডিয়াম গঠনের সম্ভাবনা

আই. এম. এম. এ. দক্ষিণ কলকাতা ও ডেটারেল ক্লাব পরিচালিত স্কুলের ছাত্রদের 'ফুটবল কোচিং' নিয়মিত লেক ময়দানে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। কলকাতা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের চেয়ারম্যান শ্রীশৈবাল গুপ্ত একদিন এই শিক্ষাকেন্দ্র পরিদর্শন করতে এসে বলেন যে, কলকাতা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের পক্ষ থেকে লেক ময়দানে স্টেডিয়াম তৈরির প্রস্তাবিত পরিকল্পনা নিয়ে তিনি বেশ কিছুদূর এগিয়েছেন। সরকার তাঁর পরিকল্পনা অনুমোদন করেছেন। সরকারী সাহায্য পাওয়া গেলে তিনি অবিলম্বে স্টেডিয়ামের নির্মাণ কাজ শুরু করতে পারবেন বলে মনে করেন। তিনি বলেন যে, এই স্টেডিয়ামের সঙ্গে প্যাভিলিয়ন, লেকচার হল, স্পোর্টস লাইব্রেরী, খেলোয়াড়দের সাক্ষর প্রত্নতি থাকবে। হলের ভেতর খেলোয়াড়দের ছাত্রাচিত্রবাণে ঘাতে খেলার কৌশলদি দেখানো যায় তারও ব্যবস্থা করেছেন তিনি।

ছাত্রদের ক্রিকেট শিক্ষণ শিবির

গত ২২ জুন অপরাহ্নে ইডেন উডানে কেন্দ্রীয় শিক্ষা বরখালয়ের উদ্যোগে এবং ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড পরিচালনায় পূর্বাঞ্চল স্কুলের ছাত্রদের পর্য্যভাসিত দিন ব্যাপী ক্রিকেট শিক্ষণ শিবিরের পরিপূর্ণাঙ্গি ঘটেছে। ঐ দিনের পরিপূর্ণাঙ্গি অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করেন ক্রিকেট এসোসিয়েশন অব বেঙ্গল-এর সভাপতি শ্রীযুগাকান্তি ঘোষ।

এই শিক্ষণ শিবিরে পূর্বাঞ্চলের চারটি রাজ্যের (আসাম, বিহার, উড়িষ্যা ও পশ্চিমবঙ্গ) মোট চব্বিশজন ছাত্র অংশ গ্রহণ করেছিলেন। শিক্ষা শিবিরের কোচ ছিলেন শ্রীকান্তিক বহু। জানা গেছে যে আগামী জুলাই মাসের মাঝামাঝি কলকাতাতেই রাজ্য প্রধায় রাজকুমারী অনুভূত কাউর ক্রীড়া শিক্ষণ পরিকল্পনাগ্রহণী এই ধরনের আর একটি শিবির খোলা হবে এবং আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত চলবে। কুড়ি বছর পর্যন্ত বয়সের উদীয়মান খেলোয়াড়রা এই শিবিরে যোগদান করতে পারবে।

চলচ্চিত্রে এশিয়া ক্রীড়া

বরখালয়ের এক খবরে জানা গেছে যে, জাপানী চিত্র প্রযোজকদের উদ্যোগে এশিয়া ক্রীড়ার তথ্যমূলক চিত্র সম্পাদনার কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। চিত্রটি বহুবর্ণ। সম্পূর্ণ চিত্রটি দেখতে মনুই মিনিট সময় লাগে। আশা করা যায়, ঈগরিগরই শহরের বিভিন্ন চিত্রগৃহে আলোচ্য ছবিটি দেখতে পাওয়া যাবে।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের ভারত সফর

পি. টি. আই-এর এক প্রবর থেকে জানা গেছে আগামী শিতকালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল ভারত সফরে আগবেন। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল ভারতে পাঁচটি টেস্ট ম্যাচ এবং বিভিন্ন আয়গায় বাবোটি ম্যাচ খেলতে রাজী হয়েছেন।

টমাস কাপ

গত ১৫ জুন সিঙ্গাপুরে টমাস কাপ (আন্তর্জাতিক) ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতার ফাইনালের দ্বিতীয় দিনে মালয়েশিয়া দলের ব্যাঙ্গী একাদশিত্বের অবদান ঘটেছে। প্রথম দিন ইন্দোনেশিয়া দুটি সিঙ্গেলস ও একটি ডাবলসে বিজয়ী হয়ে ৩-১ ম্যাচে এগিয়েছিল, দ্বিতীয় দিন দুটো খেলায় ইন্দোনেশিয়া ৪-১ ম্যাচে এগিয়ে গেলে মালয়েশিয়ার হার হয়। আবার তিন বছর পরে ইন্দোনেশিয়ার টমাস কাপ প্রতিযোগিতার খেলা হবে। টমাস কাপের খেলা শুরু হয় আজ থেকে দশ বছর আগে। সোনা দিয়ে তৈরি টমাস কাপের দাম ১৮০০ স্টার্লিং।

উইম্বেলডন টেনিস

গত ২৩ জুন লন্ডনে উইম্বেলডন টেনিস প্রতিযোগিতার খেলা শুরু হয়। প্রতিযোগিতার উদ্বোধন দিনে, ভারতের তিনজন খেলোয়াড়—আর. কৃষ্ণান, নরেশকুমার ও আশতার আলি দ্বিতীয় রাউন্ডে উন্নীত হন এবং তিনজন—নরেন্দ্রনাথ, প্রেমজিৎলাল ও উদয়কুমার প্রতিযোগিতা থেকে বিদায় গ্রহণ করেন। এ বছর প্রতিযোগিতায় ৮৮টি দেশ থেকে আগত আড়াইশ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। উদ্বোধনের দিন ১৭,৫৮৫ জন দর্শক দর্শনী দিয়ে খেলাটি দেখেন। তৃতীয় দিনের খেলার ভারতীয় ভেনিস কাপ দলের অধিনায়ক নরেশকুমার দ্বিতীয় রাউন্ডে ৩-১ সেটে ডেনমার্কের লার পিমেটালোর কাছে পরাজিত হন এবং আর. কৃষ্ণান ট্রেট সেটে ব্রিটেনের অল্পতম শিবহান্না খেলোয়াড় আইডর গুয়ারউইককে হারিয়ে দিয়ে তৃতীয় রাউন্ডে উন্নীত হন। চতুর্থ দিন কৃষ্ণান ৮-৬, ৬-১ ও ৬-০ সেটে ক্রাফের জাঁ-ক্লড হলিনারিকে হারিয়ে দিয়ে শেষে ফোলকন খেলোয়াড়ের ডেভর স্থানলাভ করেন। পুরুষদের সিঙ্গেলসের চতুর্থ রাউন্ডে কৃষ্ণান ট্রেট সেটে মার্কিন দূতরাষ্ট্রের ব্যারিম্যাকের কাছে হার স্বীকার করেন। কৃষ্ণানের পরাজয়ে ভারতের ছ'জন খেলোয়াড়ই পুরুষদের সিঙ্গেলস থেকে বিদায় নেন। অবশ্য পুরুষদের ডাবলসের তৃতীয় রাউন্ডে থাকেন কৃষ্ণান ও কৃষ্ণা, কিন্তু তাঁরাও শেষ ডাবলসের কোয়ার্টার ফাইনালে হুইটেনের বেন ডোভডসন ও উলফ-স্বিথের কাছে ৬-৪, ৭-২, ৬-৪ ও ১১-২ সেটে পরাজিত হন।



শ্রীকৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণদের জন্ম

যুগল শব্দের ভিন্নতা

এই ধরা বিশাল অতি

মধু দিয়ে গড়া,

সর থেকে সরে ঘাই

পাছে পড়ি ধরা ।

প্রাণাদ থেকে সেখেন রাজা

সঙ্গে নিয়ে মিতে,

সারি সারি বাড়ে লোক

পূজার প্রদান নিতে ।

কাণ্ডি গিয়ে কানী হ'ল

মনটা খুঁজ ভাব,

পুরী গিয়ে থাকেই পুরি

ছাংলা স্বভাব দার ।

হৃত হৃত শর ঘেরে

পড়ল পুঙ্খপাড়ে,

নীল পান ক'রে পাণ্ডি

বসে গিয়ে দাঁড়ে ।

স্বর কভু শূর নয়

ভাঁজে ভঙন স্বর,

গান গেয়ে তিকা বাগে

সাধক সে প্রভুর ।

অর থেকেই অন্ত কোথা

বেগ নাকো ভাই,

শব ছুঁয়ে সব স্থানে

যেতে চেয়ে নাই ।

মাঝার শালা শাল গারে

শালের ব্যবসা করে,

শালের হিসাব রাখতে দে যে

মাথা ঘুরে মরে ।

পিশের শালায় মূদ্রির মৌকান

গুড়গু তথায় পাবে,

পিশীর বরের কথায় গুচ্-

তত্ত্ব পাবে ভাবে ।

তরনেতে ছোটো নাকো

তুরন বাছাইর,

বীণা বিনা জমবে নাকো

আজকে গানের স্বর ।

পড়ার সময় হ'য়ে এস,

পড়তে এবার ঘাই,

'পড়া' স্থানে উপর থেকে

সেবনা কেউ তাই ।

রাত দুপুরে চব্বতে ক্ষেত

ঘায় না চাচা ক্ষেতে,

বেজার আবার পাছে ক্ষিমে

বাচ্ছি কিছু খেতে ।

শ্রীকল্যাণী চক্রবর্তী

লাবান পাহাড়

ঘুম ভোর। ঘুম ভেঙ্গে গেল। হাত মুখ ধুয়ে আনিলার কাছে এসে বসলাম। সামনেই লাবান পাহাড়। টিপটিপ কোরে বৃষ্টি পড়ছে। লাবান পাহাড়টা মেঘে ঢাকা। আকাশ থেকে চারদিকে পেন্সা তুলোর মত কুয়াশা পড়ছে। বিষ্টির মধ্যে ছ'একটি বক উড়ছে। লাবান পাহাড়ে বৃষ্টি হচ্ছে।

চাঁ খেয়ে কাগজ-কলম নিয়ে বসলাম। পাহাড়কে কেন্দ্র কোরে একটা গল্প লিপিতে হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার, চোখ দু'টো নিজের অজান্তে বার বার পাহাড়ের দিকেই চলে যাচ্ছে। এত কুন্সর সময়টা ব্যর্থ হোল; কিন্তু লিখতে পারলাম না। হাঁ কোরে তাকিয়েই রইলাম।

এমন সময় শিল্পী বন্ধু রবি মস্তের প্রবেশ। রবি বল্ল—“কিছু লিখবে নাকি অমিত? আমি এদেছি লাবান পাহাড়ের একটি ছবি আঁকবার জন্তে।” বন্ধুর আমার উত্তরের অপেক্ষা না কোরেই কাগজের উপর তুলির রেখা টানতে শুরু করলো।

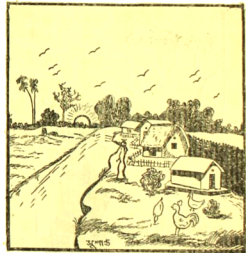
আবার দৃষ্টি পুনরায় পাহাড়ের গায়ে নিবদ্ধ হলো। মনে হচ্ছে বৃষ্টিটা একটু এবার ধরে আসছে। ঘোরে ঘোরে পাহাড়ের কুয়াশা কেটে যাচ্ছে। পাইন গাছের ঠাক একটুখানি রোদের আভাস পাওয়া গেল। এই হোল লাবান পাহাড়ে রোদ গুটার পূর্বাভাস।

একটু পরেই পাহাড়ের কুয়াশা কেটে গিয়ে রোদ উঠল। মনস্ত পাহাড়টা রোদে কলম

করছে। জলে-ভেজা পাতার উপর বোদ মুক্তোর মতো দেখাচ্ছে। রবি দত্ত এক মনে ছবি এঁকে চলেছে। বেলা বাড়লো। পাইন বন রোদে ভেতে উঠেছে, কিন্তু হঠাৎ রোয়টা এতো নিশ্চেষ্ট হলো কেন? গুৱাকি আর এখানে থাকতে নারাজ?

একি! আস্তে আস্তে আবার অন্ধকার হয়ে এলো যে! লাবান পাহাড়ে আবার মেঘ জমছে। পাইন বনে কোড়ে হাওয়া গিলছে। হঠাৎ আবার কুয়াশার লাবান পাহাড় ঢেকে গেল। পাইন বনে অন্ধকার ঘনিয়ে এল। লাবান পাহাড়ে বৃষ্টি হবার পূর্বাভাস। হঠাৎ ক্রম ক্রম কোরে বিষ্টি এলো। শুরু হলো লাবান পাহাড়ের বর্ষাকাল।

শ্রীঅমিতা ঘোষ দত্তদ্বার



একটি গ্রামের সকাল

শিল্পী : শ্রীমশাঙ্ক চক্রবর্তী

দস্তি-খুনী

পাচ বছরের ছোট্ট ফুটুটে একটি মেয়ে। নামটিও তার খুই ছোট্ট, কিন্তু মানে তার অস্তি বড়—“খুনী”! হ্যাঁ, একটি ক্ষুদ্র খুনীই বটে! যিনি এই নামটি বেখেছিলেন, নিশ্চয়ই তিনি তার স্বভাবের সঙ্গে পরিচিত হয়েই বেখেছিলেন। দিনবাত সে এটা ফেলে, ওটা ভালে, একে মারে, ওকে মারে, এই তার কাজ। এই সেদিনই তো নালিতে হুপ করে কিছু পড়ার পল শুনে দৌড়ে গিয়ে দেখি—আমাদের মেমি বেড়ালটা নালির সঙ্গে হাবুডুবু খাচ্ছে, আর খুনী দাঁড়িয়ে ছিছি করে হাসছে। কার না রাগ হয় এতে? অথচ কিছু বলাও যায় না—কারণ, খুনীর বাড়ির



বাউল

শিল্পী : শ্রীহনোল্লভন বসু

সকলেই “Development-এ বাধা দিতে নেই” এই বীড়িকেই মেনে চলেন। এই ভাবে প্রতিদিন অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে খুনীর উপহাস থেকে নিজেকে বাচিয়ে চলতে হয়। এরই মধ্যে একদিন খবর পেলাম যে, আমাদের খুনীর নাকি শক্ত ব্যামো হয়েছে। বা-তা বকছে শুধু। একটু কোতুহল হ’ল, গেলার খুনীকে দেখতে। বিগাদ হয় না যে সেই দস্তি মেয়ে এরকম নিজস্ব হ’য়ে শুয়ে থাকতে পারে। মাঝে মাঝে সে চোঁচিয়ে উঠছিল, “আমায় ছেড়ে দাও, আর করবো না। এবার ঠিক লক্ষ্মী মেয়ে হব।” একটু পরে ডাক্তারবাংও এলেন, ওষুধ দিয়ে গেলেম আর আমাদের খুনী একটু একটু ক’রে সজীব হ’তে লাগল। কিন্তু এ সজীবতা একেবারে অল্পবয়স। এবার তার আঙ্গল নামটা বলি—“শান্তি”। শুনতে চাও খুনী থেকে তার নাম শান্তি হ’ল কিভাবে? যখন সে ভুল বকছিল তখন সে একটা বিশ্রী স্বপ্ন দেখেছিল। ঘেবেছিল যে, এতদিন সে থাকে থাকে মেয়েছে, বা বা ভেঙেছে, তারি সবাই একজোট হয়ে তাকে মারতে এগেছে। এমনকি তার ছোট ভাই টুটুলের ভাঙ্গা মোটরটাও লাফাতে লাফাতে তাকে চাপা দিতে আগছিল! দিসির ইতিহাস বইয়ের ছেঁড়া পাতা থেকে একে একে শেরশাহ ও নাদিরশাহা উঠে এসে চোখ পাঁকিয়ে তরঙ্গ দেখাচ্ছিল। আমাদের মেমি বেড়ালটা নাকি সৈন্তসহ যুদ্ধ করতে এগেছিল। তারাই সব ভয় দেখিয়ে খুনীকে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছে—তাই না খুনী আজকাল এত শান্ত, অবস্ত্র এলব কণা শুধু সে আমাকেই

বলেছে। তা বলে তোররা যেন আবার তাকে
বলে দিও না তাহলে বেচার। বড়ই লজ্জা
পাবে।

শ্রীকল্যাণী চক্রবর্তী

বাদলে

অম্মম্ অম্মম্
ঝরে ঐ বৃষ্টি,
মনে হয় এই বৃষ্টি
ডুবলো রে সৃষ্টি।
অিকমিক করে ঐ
আকাশতে বিদ্যাম্,
ছুটে চলে তারা সব
দূর হ'তে বহু দূর।
অম্মম্ নাচে যেন
বৃষ্টির কল্লা,
পদ্মায় নাচে আজ—
উত্তাল বক্স।
শনশন্ চোটে হাওয়া
তালগাছ হুলছে,
সীমাহীন প্রান্তরে
দুলো-বালি ফুলছে।
ভোর হ'তে খেয়া-বাওয়া
হ'ল আজ বন্ধ,
দূর হ'তে ভেসে আসে
ফুলেদের গন্ধ।

কাপে ধরা শুনে ঐ
মেঘেদের গর্জন,
আজ শুধু দিনরাত
অবিরাম বর্ষণ।
ঘরে বসে শোন ঐ
বৃষ্টির শব্দ,
দুটু ছেলের মল
আজ সব জল।

শ্রীঅরুণকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার ফলাফল

*

পূর্ব ১৫তম মাসে 'আমাদের স্থল' নামের যে
প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা দেওয়া হয়েছিল, তার
ফলাফল প্রকাশিত হ'ল।

প্রথম পুরস্কার : শ্রীঅমিতাভ ত্রিপাঠী
৮০৮, রমা রোড ইস্ট, কলিকাতা ৩০।
(৮০ টাকার বই)

দ্বিতীয় পুরস্কার : কুমারী কাজলা বসু
৫/০, মি: পি. সি. বসু, পো: বলাসির,
উড়িষ্যা। (৮৫ টাকার বই)

তৃতীয় পুরস্কার : শ্রীগৌতমকুমার রায়,
১৬২ আশার দারকুলার রোড, পো: শ্রাম-
বাজার, কলিকাতা ৪। (৬০ টাকার বই)



নতুন বই



(সমালোচনার জন্য দু'খানি বই পাঠাবেন)

ছোটদের রঙমহল—হুশীল দত্ত ও জামাপ্রদাদ দরকার সম্পাদিত। তৃতীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৪ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা ১ হইতে প্রকাশিত। মূল্য ৬।

‘ছোটদের রঙমহল’ ছোটদের উপযোগী কতকগুলি নাটক-নাটিকার সম্বলন। ঠিক এ-ধরনের সম্বলন ইতিপূর্বে সম্ভবত আর প্রকাশিত হয়নি। খুল-কলেজ ও ক্লাবের নানা অস্থানে ছোটদের অভিনয়ের জন্য অনেক সময় উপযুক্ত নাটক-নাটিকা খুঁজে বেড়াতে হয়, সেদিক থেকে এই সম্বলন তাদের যথেষ্ট উপকারসাধন করবে। এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথ থেকে হালদিলের লেখক-লেখিকাদের ২২ জনের ২২টি নানা ধরনের নাটিকা আছে। বইখানি সুসম্পাদিত এবং প্রচ্ছদপটটিও মনোরম।

কু কু কিক্ কিক্—বিদ্যনাথ দে। আর্ট ইউনিয়ন, ৫৫/৭ গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা ৬ হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১টা ২০ ন. প

ছোট ছোট ছড়া আর ছবিতে ভরা এই বইখানি। আগাগোড়া দু’রঙে আর বড় টাইপে ছাপা। ছোটরা এমন বই হাতে পেলে আর ছাড়তে চাইবে না। শিল্পা চণ্ডী লাহিড়ীর ঐক্য ভিতরের ছবিগুলি সহজ সুন্দর ছড়াগুলিকে আরও সুন্দর করে তুলেছে। উপরের ছবিটি এঁকেছেন বিখ্যাত শিল্পী অম্বা মুন্সীর পুত্র আরবী মুন্সী।

গদাধর—হৃদয়দাস দাশগুপ্ত। কলাগী দাশ-গুপ্ত কর্তৃক লক্ষ্য হইতে প্রকাশিত। প্রাণিখান—ক্লাসিক প্রেস, কলিকাতা। মূল্য ১৪।

ঠাকুর ত্রিপুরারামকর জীবন-কাহিনী নিয়ে অসংখ্য বই লেখা হয়েছে। কিন্তু ছোটদের উপযোগী ক’রে সহজ কবিতায় এমন সুন্দর বই আর লেখা হয়নি বললেও চলে। লেখক ঠাকুরের জীবনের প্রধান প্রধান কাহিনীগুলির সঙ্গে কিছু কল্পনার রঙ মিশিয়েছেন বটে, কিন্তু তাতে মূল ঘটনার কোন ক্ষতি হয়নি। বইখানি তোমরা পড়ে খুবই আনন্দ পাবে। উপরের প্রচ্ছদপটটি ভারী সুন্দর।

রূপকথার ঝাঁপি—সৌরীন্দ্রমোহন মুখো-পাধ্যায়। ইণ্ডিয়ান অ্যান্টোনিয়িটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ, ২৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭। মূল্য ২টা ২৫ ন. প

‘রূপকথার ঝাঁপি’ সৌরীনবাবু নতুন প্রকাশিত গল্পের বই। গল্পগুলি সবই রূপকথার ধরনে হলেও, তার মধ্যেই শিক্ষার ক্ষেত্র আছে, আর আছে বিচিত্র বিষয়। কামারের মেয়ে, না-গি আর না-ছাড়ি, কথার দাম, মহাপণ্ডিত, আশ্বমেধ, কাঠের ঘোড়া, সদাগরের তিন ছেলে নামক নাট্যটি গল্পই সব দিক থেকে সার্থক হয়ে উঠেছে লেখার গুণে। শিল্পী সোম্য মুখোপাধ্যায়ের ঐক্য ভিতরের ছবিগুলি সুন্দর।



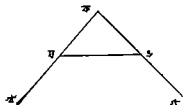
খাঁখাঁ পাতা

ত্রীননীগোপাল চক্রবর্তী

• চোখের ধাঁধা •

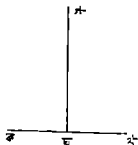
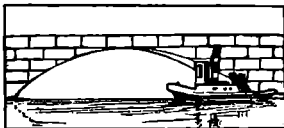
আমরা কথার বলি—‘চাক্ষুস সত্যি’। কিন্তু চোখে আমরা যা দেখি তাই-ই কি সত্যি? ট্রেনগাড়ী যখন দ্রুত চলে, তখন চোখে দেখতে পাই—গাছপালা, বাঘ, সব উল্টো দিকে ছুটেছে; কিন্তু সত্যিই তো তা ছোটে না! চোখে তো আমরা দেখি, স্বর্ষ পূর্ব দিক থেকে উঠে পশ্চিম দিকে অস্ত যায়, কিন্তু সত্যিই তো তা যায় না! এই জন্য চোখে আমরা যা দেখি তার উপর সব সময় বিবাস করা চলে না।

১

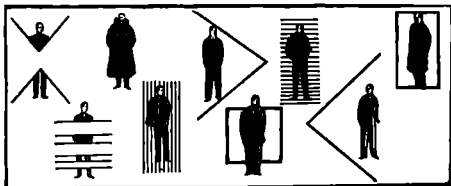


১। ক খ গ জিহ্বারের ক খ ও ক গ বাহুর মধ্যে ঘ ও ঙ বিন্দু সংযুক্ত করা হয়েছে। না মেনে বলতে পার ঘ ঙ, ক খ ও ক গ বাহুর মধ্যবিন্দু কিনা?

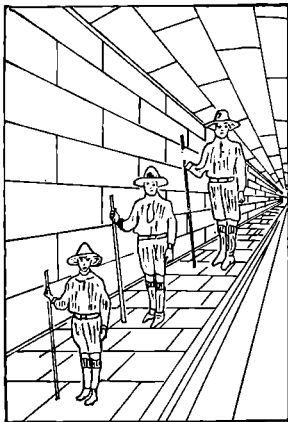
২। ক খ সরলরেখার উপর গ ঘ লম্ব টানা হয়েছে। না মেনে বল তো ক খ ও গ ঘ-র মধ্যে বড় কোন্টি?



৩। ছবিতে দেখতে পাচ্ছ, এক-খানি ষ্টীম-বোট যাচ্ছে নদী দিয়ে, সম্মুখে একটি পুল। বলতে পার ষ্টীম-বোটটি পুলের নীচে দিয়ে যেতে পারবে কিনা?



৪। উপরের ছবিতে নয় জন লোক দেখা যাচ্ছে। বিভিন্ন ভঙ্গীতে এবং বিভিন্ন আকারে কার্যদায়



তাদের দাঁড় করানো হয়েছে, সহজে ভোমরা যাতে না বুঝতে পারো সেইরকম করে। কিন্তু একটু ধৈর্য ধরে, বুদ্ধি খরচ করলেই ভোমরা ধরতে পারবে যে, ওদের মধ্যে সব চাইতে বেশি লম্বা কোন জন ?

৫। পাশের ছবিতে একই মেয়ের উপর তিনটি ছেলে দাঁড়িয়ে আছে পরপর। অবশ্য বেশ খানিকটা করে তফাত আছে এদের প্রত্যেকের মধ্যে, এবং এদের দেখেও বোকা যাচ্ছে ঝড়ো-ছোট। যাই হোক এখন ভোমরা ভাল করে দেখে বলো ওদের মধ্যে লম্বায় কোন ছেলেটি বড়ো ?

উত্তরগুলি শেষের দিকে বেওয়া আছে দেখতে পাবে।

* গোপন খবর *

(ক)

১৯৪৫ সালে ইংল্যান্ড
১৯৪৬ সালে অস্ট্রেলিয়ায় ও ফ্রান্স
১৯৪৭ সালে অস্ট্রেলিয়ায় ১৯৪৮ সালে
১৯৪৯ সালে অস্ট্রেলিয়ায় ১৯৫০ সালে
১৯৫১ সালে অস্ট্রেলিয়ায় ১৯৫২ সালে

গোয়েন্দারা মনে করেছিল, এবু'লি কোনও গৃহস্থের বাড়ী; কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা খরে কেলেছে, এ বাড়ীতে কোনও ঘরেছেলে থাকে না।

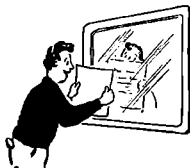
ইংরেজ আমলের তখনকার দিনে পুলিশ, এমন কি গোয়েন্দা পুলিশের মধ্যেও দেশপ্রেমিক ছিল। তারা হুকোশলে উঠে গোয়েন্দাগিরী করত। তার ফলে মহাসম্মান। জানতে পারল, পুলিশ ইন্সপেক্টর (বুড়ো) অমুক তারিখে যাচ্ছে। অমনি গোপন চিঠি গেল মাণিকতলায়।

চিঠিখানির নকল উগরে দেওয়া গেল। এখন তোমরা চেষ্টা করে দেখ, পুলিশের গোয়েন্দাকে ফাঁকি দেওয়া এই চিঠির অর্থ উদ্ধার করতে পার কিনা। কিন্তু একথা মনে রেখ যে, এটা লেখার ২৪ ঘণ্টা লেখা অক্ষর নয় যে, উদ্ভাষ দিলেই অক্ষরগুলি ছুটে উঠবে। কিভাবে এই লেখাটির পাঠোদ্ধার করা যায় বলত? এই চিঠিতে যা লেখা আছে তার অর্থই বা কি?

উত্তরটা পরের পৃষ্ঠায় দেখতে পাবে।

মাণিকতলার ভাড়া বাড়ী।
মহাসম্মান করকল্পন আত্মনা
নিয়ন্ত্রে সেখানে। হাত-বোমা
ভেঁরি করে তারা।

এরিকে গোয়েন্দা পুলিশ
খুঁজে বেড়াচ্ছে তাদের এসে-
সেনে। মাণিকতলার ভাড়া
বাড়ীর ছাদের আলসের দিকে
শাড়ী কাপড় মেলা থাকতে দেখে



চিঠিটির উদ্ধারকাণ্ড হচ্ছে

উত্তর

চোখের ধাঁধা

- ১। চোখে উপরের অংশ ছোট বলে মনে হলেও ঘ ড মধ্যবিন্দু।
- ২। গ ঘ কে বড় বলে মনে হলেও, ক খ ও গ ঘ সমান।
- ৩। ছবিতে আঁহাখানি পূলের নীচে দিয়ে যেতে পারবে বলে মনে হলেও, আসলে কিছু যেতে পারবে না।
- ৪। আর সকলেই লখায় সমান, কেবল নীচের লাইনে '(বর্গক্ষেত্রের) তৃতীয় মাছখটি বেশি লম্বা।
- ৫। লখায় সকলেই সমান।

গোপন খবর

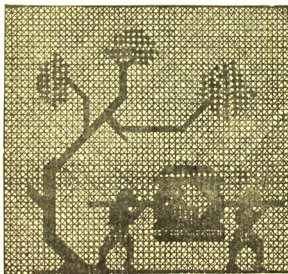
চিঠিতে লেখা আছে :

"খুড়ো চই যাচ্ছে।

নাড়ু ও ঘোরাগুলি হাড়িতে রেখে জলে ডুবায়। টিকটিকিতে বেন দেখতে না পার।
অতীমকে সন্দেশ পাঠায়। বন্দেযাত্তরম্।"

খুড়ো অর্থাৎ গোয়েন্দা পুলিশ ইন্সপেক্টর। নাড়ু ও ঘোরা হচ্ছে ছোট ও বড় হাত বোমা।
টিকটিকি হচ্ছে গোয়েন্দা পুলিশ। সন্দেশ কথাটির অর্থ খবর।

একখানি আয়নার সামনে চিঠিখানি ধরলেই লেখাগুলি আয়নার পথিকার হুটে উঠবে।



ঘর কেটে ছবি করার

* সহজ পদ্ধতি *

ঘর কেটে ছবি করার সহজ পদ্ধতিতে আঁকা। এই ধরনের ছবি আঁকার সস্তা গত ঐচ্ছ্য্য মানে আমরা একটি নমুনা দিয়েছিলাম। সেই নমুনা অঙ্ক-যায়ী কয়েকখানি যে ছবি আমা-দের হাতে এসেছে, তা থেকে এটি প্রকাশিত হ'ল, পরে আরও প্রকাশিত হবে।—মৌ. স.



কি ভীষণ পরম—আর পারা যাচ্ছে না বাবা : এই কথা শুনে শুনে আমরা যখন অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম ঠিক সেই সময় বৃষ্টিধারা নেমে আমাদের তপ্ত, ক্লান্ত শরীর ও মনকে ঠাণ্ডা করলো। কিন্তু এবারে বৃষ্টি যে শুধু ধেরি করে আরম্ভ হোল তাই নয়, বর্ষাকালের যে বৃষ্টির জন্তে বাংলাদেশের কৃষকসমাজ গভীর আগ্রহে সারা বৎসরের মধ্যে এই শুভক্ষণটির জন্তে উদ্গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করে, এবারে তাদের বোধ হয় নিরাশ হতে হবে। বাংলাদেশ, তথা ভারতের পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির অধিকাংশ লোকই প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে কৃষি-লব্ধদের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু এবার কি যে হবে তা বোঝা যাচ্ছে না। অশস্ত বাংলা-বিহার উড়িষ্যার নানাস্থানে ছোট-বড় বাধ তৈরী করে জল সঞ্চয় করে রাখার পরিকল্পনা কার্যকরী করা হয়েছে বটে, কিন্তু তা আমাদের অতি-প্রয়োজনের তুলনায় আশাহরূপ এখনও পূর্ণ হয়নি।

এবারে ফুল-ফাইনাল ও ইন্টারমিডিয়েট পাশের সংখ্যা আশাহরূপ না হলেও, পরীক্ষার্থীর সংখ্যা অভ্যস্ত বেশী থাকায় কলেজে ভর্তি হওয়া নিয়ে খুবই অস্থবিধার সৃষ্টি হয়েছে। সেইজন্তে বিভিন্ন কলেজে, বিশেষ করে কোলকাতা ও তার আশপাশের কলেজগুলিতে এক বিরাট সমস্যা দেখা দিয়েছে। প্রায় সব কলেজেই “জায়গা আর নেই” রব উঠেছে। যারা ভালোভাবে পাশ করতে পারেননি আর যারা ভাজানী, ইঞ্জিনিয়ারিং পড়বার আশা থেকে নিরাশ হয়ে ফিরে এসেছে, তাদের অবস্থা যে কি হবে তা সত্যিই ভাববার বিষয়। আগেই বলেছি, এ-সমস্যা বিশেষ করে কোলকাতা এবং তার আশপাশের কলেজেই দেখা দিয়েছে বেশী করে। গত কয়েক বছর আগেও এদব অঞ্চলে যে সব কলেজ ছিল তার তুলনায় আজ কলেজের সংখ্যা অনেক বেড়েছে যে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই এবং সরকারী প্রচেষ্টাও এ বিষয়ে খুবই প্রাণসর্গ, কিন্তু তবুও সমস্তার সমাধান হচ্ছে না। এ সম্বন্ধে আমাদের মনে হয়, কোলকাতা এবং আশপাশের কলেজগুলিতে ভর্তি হওয়ার কথা মন থেকে সরিয়ে দিয়ে, যদি পল্লী অঞ্চলের কলেজে ছাত্র ছাত্রীরা ভর্তি হবার জন্তে চেষ্টা করে তাহলে অনেক ভালো হবে। এতে পড়ালোনাও ভালো হবে, উপরন্তু এই সমস্তার বেশ কিছুটা সমাধানও হতে পারবে। আশা করি এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ছাত্র-ছাত্রী ও অতিভাবকরা নিশ্চয়ই একটা স্থাব্যস্থা করবার চেষ্টা করবেন।

সম্প্রতি ধবরের কাগজে তোমরা দেখছ—তার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সহধর্মিণী কর্মসীর ভ্রাতাপ্রসাদ-জননী বোগমায়ী দেবী ৮৭ বৎসর বয়সে সন্ধ্যানে পরলোক গমন করেছেন। বাংলাদেশের

বহু সার্থক জননীর মত বোগমায়ী রত্নগর্ভা ছিলেন। সার্থক সম্ভবন স্রাব্যপ্রদান মূণোপাখ্যায়ের অবসানে লোকান্তরিত হওয়ার পর থেকেই তাঁর শরীর ও মন হেঁসে পুড়ে। তাঁর অন্তরিত রক্তী সম্ভবন ও আত্মীয়স্বজনদের সমবেদনা জানিয়ে আমরা বোগমায়ী দেবী আত্মার শান্তির কামনা করি।

এবারে তোমাদের চিঠির বলি অভ্যাস ভারী হয়েছে। ফুল-ফাইনাল ও ইন্টারমিডিয়েট পাশের বহু হ্রস্ববাহন বহন করে এনেছে এই সব চিঠি। মায়ারাগী চক্রে (কোলকাতা)—তুমি অনার্স নিয়ে বি. এম. সি পড়া শুরু করেছ জেনে খুসী হলাম। এখন থেকেই মনোযোগ দিয়ে অনার্স পড়তে শুরু করো তাহলে চল ভালো হবে। অলকরকুমার ওল (মহিমীপুর)—যাঁরা চন্দ্রনামে লেখেন, তাঁদের আদল নাম জানতে চাওয়া কি উচিত ভাই? আর তছাড়া তোমার তালিকায় এমন দু' একজনের নাম আছে যারা সাহিত্যক্ষেত্রে মনোযোগ—তাঁদের নামও আমার জানা নেই। 'মৌচাক' ঠিক মত না পেলে তোমার স্থানীয় ডাকঘরে খবর নিও। এখান থেকে ঠিক মতই পাঠানো হয়। খনা ও ক্রামল দেব (শিলং)—গুরুত্বপূর্ণ পড়েছিল, কিন্তু এখন মাকে মাকে রুটি হওয়াতে কোলকাতার লোকেরা খানিকটা স্বস্তি পেয়েছে। শংকরকৃষ্ণ দাস (বাণীগঞ্জ)—খাঁসা তুমি সম্পাদক মহানয়ের নামে পাঠিও, মনোমীত হলে নিশ্চয় ছাপা হবে। মালী চক্রবর্তী (হাওড়া)—গোটা গোটা অঙ্করে লেখা তোমার চিঠি পেলাম। তুমি এবারে ফুলে বাগার জন্তে তৈরী হোক জেনে খানন্দা হোল। গোপা দত্ত (শিলং)—তোমার আগের চিঠি ভাই আমি পাইনি। পেলে নিশ্চয়ই অব্যবস্থিত। গল্প সম্পাদক মহানয়ের নামে মৌচাকের ঠিকানায় পাঠাবে—মনোমীত হলেই ছাপা হবে।—মৌচাক বহু প্রচলিত ও সবচেয়ে পুরানো শিশু-পত্রিকা বলে অনেক বিজ্ঞাপন-মাতা এ বাগজে বিজ্ঞাপন দেন। তোমার অল্প 'লাঞ্ছনাম'টি আমাদের মনে রইলো—স্বর্ষিষে মত ব্যবস্থা করা হবে। পলা পজনবীণ (কোলকাতা)—কোলকাতার বড় গুরুত্ব লাগছে? কিন্তু এখন তো রুটি নেমেছে—কি রকম লাগছে জানিও। স্বরনা দে (কোলকাতা)—ঈশ্বরকাল নিশ্চয় ভালো, কিন্তু সবালবেলা বিছানা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করে না যে। তুমি যে প্রতিবোধিতার কথা লিখেছ সেটি দর্ভারতীর ভিত্তিতে; কাঁধেই কলাকল করে বেগবে ঠিক জানা নেই—কারণে নিশ্চয় কলাকল দেখতে পাবে। কবেলা মিত্র (পুলিগা)—তোমার ছবিটি স্বর্ষাহানে দিলাম—কলাকল পরে জানতে পারবে। শিবানী রায়চৌধুরী (কোলকাতা)—কলেজের নতুন পরিবেশ ভালো লাগছে জেনে খুসী হলাম। ঐ রকম কোন প্রতিষ্ঠানের নাম আমার আপত্তিক: জানা নেই। আজ এইখানেই শেষ করি, ভালোবাসা নিও। ইতি—

তোমাদের—মমুদী

ঔষধীয়চক্র সরকার কর্তৃক ১৪ বর্ষিক চাইল্ড্রেন স্ট্রিট, কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত

ও তৎকর্তৃক প্রকৃ প্রেস, ৩০ কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত

মূল্য : চল্লিশ নয়া পয়সা

136
0121

মোচাক—ভাদ্র, ১৩৬৫



বিন্নবী বীর বতীজনাথ (বাঘা বতীন)



৬৯ বর্ষ]

ভাদ্র-১৩৬৫

[৫ম সংখ্যা

দুশোনারাণীর ছেলে

শ্রীবীরু চট্টোপাধ্যায়

আচ্ছা মাগে, ঐ যে দূরে রাজবাড়ীটা দেখা যায় ।
 তোরগটা তার কত উচু সেপাই আছে ডাইনে-বায় ।
 হাতি ঘোড়া আছে কত,
 লোক লস্কর শত শত,
 সিংহাসনটা কেমন বড় মণিমুক্তা অনেক তায় ।
 ঐ যে দূরে মস্ত বড় রাজবাড়ীটা দেখা যায় ॥

রাজার কুমার ওদের বাড়ীর মোর বয়সী হবে ;
 সমান যখন আমরা দৌড়ে মেশেনা কেন তবে ?

দামী পোশাক পরে ও যে
 সেপাই গাছে এতকি পোঁতা

সাথে সাথে ঘুরে বেড়ায়, বাইরে বেরয় যবে ।
রাজার কুমার ওদের বাড়ীর মোর বয়সী হ'বে ॥

আচ্ছা মাগো, তোকে সবাই রাণী কেন বলে ?
ওদের দিকে চেয়ে চেয়ে ভাসিস আঁখির জলে ।
ওদের রাণী মাছের মুড়ো,
তুই খাস যে খুদের কুঁড়ো,
মোদের গাছে ফুল ধরেনা, ওদের সোনা ফলে ।
বলনা মাগো, লোকে তোকে রাণী কেন বলে ?

তুধাই যবে এড়িয়ে যে যাস্ ঐ তে তো রাগ ধরে—
আমরা কেন পড়ে আছি বল এমন কুঁড়ে ঘরে ?
বাবার কথা শুধাই যবে
চোখের জল ফেলো তবে

দাঁড়িয়ে কেন থাকিস্ মা তুই মুখটি নিচু করে ?
তুধাই যবে এড়িয়ে যে যাস্ ঐ তে তো রাগ ধরে ॥

ওদের রাণী রাজবাড়ীতে থাকে পরীর মত ।
তুই কেন মা কুড়িয়ে বেড়াস্ পাড়ার ঘুঁটে যত ?
রাজার কুমার পোশাক প'রে
বেড়ায় সদাই ঘোড়ায় চড়ে,

আমার জমা-কাপড় কেন ছিল শত শত ?
ওদের রাণী রাজবাড়ীতে থাকে পরীর মত ॥

দুঃখটা তোর আমার কাছে খুলেই না হয় বল ?
মনের ব্যথা গুম্বরে রেখে কীই বা হবে ফল ?
দেখি যদি উপায় থাকে

করব খুলী আমার মাকে,
তোর ঐ মলিন মুখ মেখে যে চোখে আসে জল ।
কষ্টটা তোর আমার কাছে খুলেই না হয় বল ?



(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ক্যান্টন থেকে আবার হংকঙে ফিরলেন স্বামীজি হংকং থেকে জাপানের অভিমুখে ।

প্রথমে নাগাসাকি । নাগাসাকি থেকে কোবে । কোবেতে জাহাজ ছেড়ে দিয়ে ট্রেন নিলেন, উদ্দেশ্য শুধু বন্দর নয় মধ্যবর্তী প্রদেশটাও একটু দেখি । ওসাকা, কিয়োটো আর টোকিয়ো ঘুরলেন । সমস্ত দেশ শিল্পে-বাণিজ্যে যন্ত্রে-অস্ত্রে চিত্রে-স্থাপত্যে জেগে উঠেছে, মেতে উঠেছে । বড়-বড় পা কেলো সঙ্গ ধরেছে পশ্চিমের । কিসে দেশের সর্বাঙ্গীণ হিত হবে, সভ্যতার আবাস থেকে দারিদ্র্য নির্বাসিত হবে সমস্ত জাতি এই এক লক্ষ্যে প্রেরিত । ধর্মেও পিছিয়ে নেই । আর আশ্চর্য, মন্দিরের গায়ে সংস্কৃত মন্ত্র বাংলা হরফে লেখা ।

যা কিছু সং আর মহৎ, জাপানীদের কাছে, ভারতবর্ষই তার স্বপ্নরাজ্য ।

কি করছ তোমরা ? ইয়াকোহামায় এসে তার মাজাজী শিশুদের লিখছেন স্বামীজি : সারাজীবন কেবল বাজে বকছ । এস একবার এদের দেখে যাও, তারপর গিয়ে লজ্জায় মুখ লুকোও । ভারতবর্ষের যেন ভীমরতি ধরেছে । দেশ ছেড়ে বাইরে গেলে তোমাদের জাত যায় । হাজার বছরের কুসংস্কারের বোঝা কাঁধে নিয়ে বসে আছ, শুধু খাড়াখাড়ের শুদ্ধাশুদ্ধি বিচার করে শক্তিকর করছ । পুরোত্তলির আহাম্মকির আবর্তে পড়ে ঘুরপাক খাচ্ছ । শত শত যুগের অবিরাম অত্যাচারে তোমাদের ভিতরের মনুষ্যস্বাভা একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে । তোমরা কী বলো দেখি ।

এস, মানুষ হও। আরো লিখছেন বিবেকানন্দ : তোমরা কি দেশকে ভালোবাসো? দেশের মানুষকে ভালোবাসো? তা হলে তুই পুরোতগুলোকে আগে দূর করে দাও। যাতে আমাদের দেশের উন্নতি হয় তার জন্তে লাগো প্রাণপণে। পেছনে চেয়োনা, কাঁদক প্রিয়জন; শুধু সামনের দিকে তাকাও, সামনের দিকে এগোও, হোক পথ চড়াই, হোক গন্তব্যস্থল দূরদূরান্তে। সামনে বাড়া।

ভারতমাতা অনন্ত সহস্র যুবক বলি চান। মনে রেখো মানুষ চাই, পশু নয়। যে আছ ক্ষুধার্তের মুখে অন্ন দেবে, নিরক্ষরদের মাথে শিক্ষা বিস্তার করবে আর যারা পূর্বপুরুষদের অত্যাচারে পশুর পদবীতে নেমে এসেছে তাদের মানুষ করবার ব্রত নেবে!

ধীর স্তব্ধ অথচ দৃঢ়—এই তিনমন্ত্র সার করে কাজ করো। মনে রাখবে নাম যশ আমাদের উদ্দেশ্য নয়।

ইয়াকোহামা থেকে জাহাজ ছাড়ল। থামল ভ্যানকুভার। কানাডার কাছে প্রশান্ত মহাসাগরে—বৃটিশ কলাম্বিয়া নামে যে দ্বীপ আছে তারই রাজধানী। এখান থেকেই যেতে হবে শিকাগো, ট্রেনে করে, কানাডার ভিতর দিয়ে।

হাড়ে-দাঁত-বসানো শীত। সমস্ত জাহাজ প্রায় কাঁপতে-কাঁপতে এসেছেন। জামাকাপড় মন্দ ছিলনা কিন্তু এই তীব্রঔষ্ণ শীতের কাছে যৎসামান্য। কেউ অনুমানও করতে পারেনি জুন-জুলাই মাসেই এমনি বরফ-গলা ঠাণ্ডা পড়বে।

একটানা ট্রেনে তিন দিনের দিন শিকাগোতে এসে নামলেন স্বামীজি। পথভ্রষ্ট শিশু যেমন করে তাকায় তেমনি করে তাকাতে লাগলেন চার দিকে। কোন দিকে যাবেন, কোথায় উঠবেন, কি করে বা সামলাবেন এ সব মালপত্র! তখন শিকাগোতে ওয়ার্ল্ডস ফেয়ার বা বিশ্বমেলা বসেছে, তাই শহরে বিস্তর লোকের আমদানি। তাদের চোখের সামনে স্বামীজি এক কিম্বাকার-কিন্তুত। গায়ে আলখাল্লা মাথায় পাগড়ি, এ কি কোনো সার্কাসের ক্লাউন না সাপুড়ে-বাজীকর! রাস্তার ছোঁড়াগুলো পিছনে লাগল, হাততালি দিতে লাগল, কেউ কেউ বা কাটতে লাগল টিটকিরি। যেন অজানা দেশের পথভোলা এক পাগল এসে উপস্থিত হয়েছে। একে শীত ভায় অনাহার ভায় এই উৎপাত।

‘একটা হোটেল নিয়ে যেতে পারো?’ পথের একটা মুঠেকে জিজ্ঞেস করলেন স্বামীজি: ‘হ্যাঁ, যে কোনো হোটেল, যেটা সব চেয়ে কাছে?’

কত ভাড়া দেবেন? ভাড়ার হার আমি কি কিছু জানি? যা স্থায্য তাই দেব অনায়াসে। স্থায্য? যা চার আনা তাই মুঠেদের স্থায়ে চার টাকায় দাঁড়াল। লুক্কের স্থায় আর লুক্কের স্থায় কি এক?

সমস্ত রাস্তা একটা মৃতিমান ভামাসা হয়ে, আশেপাশের লোকজনের প্রচুর হাসি আমোদ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের খোরাক জুগিয়ে অবশেষে পৌঁছুলেন এক হোটেলে। বিরক্ত বিধ্বস্ত বিলীনস্থপ্ন। থাকতে দেবে এখানে? দেব। কিন্তু টাকা দিতে পারবে তো?

দেখি যত দিন পারি। একটা চুরুটের দাম আট আনা। আমেরিকায় টাকা তো নয় খোলামকুচি। এক কণা মাটি রাখেনি যেখান থেকে সোনা না উৎপন্ন হয়। যেমন বিস্তীর্ণ দেশ তেমনি অফুরন্ত প্রাণশক্তি। তুমিও দাও মাটিও দেবে। তুমিও ঢালো মাটিও অটল হবে। এত অপর্ধাণ্ড যে একটা কুলির দিনে অন্তত দশটাকা রোজগার।

নোটে-নগদে একশো উনাশি পাউণ্ড ছিল স্বামীজির কাছে, এরই মধ্যে প্রায় পঞ্চাশ পাউণ্ড বেরিয়ে গেছে। হোটেলেই এক পাউণ্ড করে দৈনিক খরচ। তারপর যে পারছে ঠিকিয়ে নিচ্ছে ছুহাতে। এরকম ভাবে চললে কদিন পরেই তো ফতুর। তারপর কি আমি ভিক্ষায় বেঝব? আমেরিকায় ভিক্ষুক নেই, ভিক্ষায় বেঝলে স্টোন স্ট্রিট। বিদেশে এসে কি শেষে জেলে যেতে হবে?

অসম্ভবের সঙ্গে যুদ্ধ করছেন স্বামীজি। তারপর খবর নিয়ে জানলেন শিকাগোর ধর্মসভা আরম্ভ হতে এখনো ডের দেরি। এখন জুলাইয়ের মাঝামাঝি, সভা বসবে সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে। এত আগে না এলেও চলত। তা ছাড়া, বক্তৃতা যে দিতে চাও তোমার ডেলিগেটের টিকিট কই? ডেলিগেটের টিকিটই বা কি যাকে-তাকে দেওয়া যায়? তার সঙ্গে উপযুক্ত সার্টিফিকেট চাই। তা তোমার আছে? আর থাকলেই বা কি। সে টিকিট দেবার দিনও শেষ হয়ে গিয়েছে। এখন আর উপায় নেই, স্বস্থানে প্রস্থান করো।

যারা তাঁকে পাঠিয়েছে, ভেবে-চিন্তে নিয়মশৃঙ্খলার রাস্তা ধরে পাঠায় নি। ভেবেছে স্বামী বিবেকানন্দ একবার গিয়ে দাঁড়ালেই সভার রক্তদ্বার খুলে যাবে, সে সভা যতই মদমত্ত হোক আর সে মরজা হোক যতই উদ্ধত-উত্তুঙ্গ। কিন্তু আইন-কানুনের যে কত বায়নাঝা তা কারু জানা ছিলনা। নিজেও সামান্যিক রীতিনীতির ধার ধারেন নি স্বামীজি, তিনিও এসব বিষয় দেখেননি তলিয়ে। কিন্তু এখন দেখলেন অনেক লাল ফিতের জটিলতা, অনেক পত্র-পত্রিকার জঞ্জাল।

তবে আর কি। ঘরের ছেলে আবার বিবরে ফিরে যাই।

কিন্তু আমি যে এখানে এসেছি এ কি আমি আমার নিজের ইচ্ছায় এসেছি? আর কেউ কি আমাকে নিয়ে আসেননি হাত ধরে? আমি নিজে পথ দেখতে পাচ্ছি না বলে আর কেউ কি আমাকে দেখছেন না?

আমিও তবে দেখে যাব শেষ পর্যন্ত।

৬২

কপূরতলার রাজা এসেছেন শিকাগোতে। তাঁকে কেটবিটু ঠাউরে শিকাগোর সমাজ খুব মাতামাতি শুরু করেছে। তিনিও এমন একখানা ভাব করে আছেন যেন হিমালয় থেকে নেমে এসেছেন। দেদার ঢাকা ওড়াচ্ছেন কুর্তিতে। বইয়ে দিয়েছেন বিলাসের বস্তা।

ওয়ার্ল্ডস ফেয়ারে গিয়েছেন একদিন, স্বামীজির সঙ্গে দেখা। কে কোথাকার পথের ফকির, মুখ ফিরিয়ে নিলেন রাজা, কথাও কইলেন না।

ধুতি-পরা এক মারাঠী ব্রাহ্মণ, মাথায় পাগলামির ছিট, হাতের নখে কাগজে ছবি আঁকে বিক্রি করছে সেই মেলায়। রাজার অহঙ্কার দেখে সে বেজায় খেপে গিয়েছে। খবরের কাগজের রিপোর্টার ঘুরছে চারদিকে, তাদের কয়েকজনকে জড়ো করে সেই পাগল রাজার নামে কেছা কাটিতে লাগল। নানারকম মুখরোচক কাহিনী, শুনলেই বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে। রিপোর্টারদের লোভ হল এই সব কাহিনীর কিছু পাঠকসমাজে পরিবেশন করি। লুফে নেবে সংবাদ-সুধাতুরের মল। কিন্তু এই পাগলাটে লোকটাকে এ সব কাহিনীর স্রষ্টা বলে প্রচার করলে সত্যের মত

শোনাবে না। ঐ কে একজন এসেছে না ভারতবর্ষ থেকে, রাজ্যার স্বদেশ থেকে? সোম্যদর্শন, অনেক জ্ঞানের কথা বলে, ইংরেজি-জানা শিক্ষিত—স্বামীজিকেই নির্দিষ্ট করল সকলে—ওরই নামে চালিয়ে দেওয়া যাক। তা হলেই লোকে নেবে, সত্যের গন্ধ শুঁকে খুঁকে পড়বে কোতুলে।

হলও তাই। খবরের কাগজের দুই স্তম্ভ বোকাই হয়ে বেরুল রাজ্যার কুকীতির গল্প। এ সব কার বলা? আজ্ঞেবাজ্ঞে লোক নয়, ভারতবাসী এক বিখ্যাত পণ্ডিত, দূর্বল নয় ইহাগত, নাম বিবেকানন্দ। কর্পুরতলাকে নামাবার জন্তে স্বামীজিকে এরা স্বর্গে তুলল, আবার যখন দরকার হবে স্বামীজিকে করা যাবে কূপোকাং। সে পাগল মারাঠি যা যা বলেছিল সব এনে বসাল স্বামীজির মুখে, স্থানে অস্থানে একটু বা রং চড়িয়ে। ফলে কর্পুরতলার খ্যাতি উড়ে গেল কর্পুরের মত। আর কে সেই পণ্ডিত? হোটেলের ভিড় বাডুতে লাগল রিপোর্টারদের।

আমাকে দিয়েই আমার এক স্বদেশবাসীর অপযশ করানো হল। একেই বলে সংবাদপত্রের সত্য। স্বামীজি প্রতিবাদ করলেন, কিন্তু কে তা কানে তোলে? যা হয়ে গেছে বেশ হয়েছে, এখন তোমার নিজের কথা বলো। মনে হয় তোমার ভিতরে আছে অনেক খবরের খবার। উপবাসী দেশকে তাই এখন আমরা বিতরণ করি।

সম্প্রতি অর্থাভাবে ক্লিষ্ট হচ্ছি এই আমার একমাত্র খবর। এ তো আর রিপোর্টারদের বলা যায়না, এমন বন্ধু নেই যার সঙ্গে বা এ ব্যাপারে অন্তরঙ্গ হওয়া যায়, সুতরাং মাত্রাজী বন্ধুদেরই ফের চিঠি লেখা যাক টাকা চেয়ে।

‘যদি আমার এখানে থাকবার জন্তে টাকা না যোগাড় করতে পারে অস্তুত যাতে দেশে ফিরে যেতে পারি তার রাহা-খরচটা পাঠিও। ধর্মসভা শুরু হতে এখনো ঢের দেরি, তা ছাড়া আমি ডেলিগেটের টিকিট পাইনি, আমার প্রবেশের অধিকার নেই। যে যেখান থেকে পারছে নানারকম ধোঁকা দিয়ে আমার থেকে টাকাপয়সা লুট করে নিচ্ছে। একটা কেবল যে করব সাহস পাই না। প্রতি শব্দের দাম চার টাকা।’

বারো দিন কাটল শিকাগোয়—এ তো অনর্থক কালক্ষেপ। যদি অপেক্ষাই

করতে হয় একটা সস্তার জায়গা দেখা ভালো। কিন্তু কোথায় যাই ? নিজে সস্তা হব না অথচ জায়গা সস্তা হবে এমন জায়গা কোথায় ?

কেউ-কেউ বোস্টনের নাম করলে। আর দেরি নয়, বোস্টনের ট্রেন ধরলেন স্বামীজি।

শিকাগোর থিয়োসফিস্টরা খাপ্পা ছিল স্বামীজির উপর। স্বামীজির চর্চশা দেখে তাদের বড় আহ্লাদ। পালিয়ে যাচ্ছে শুনে আরো।

তাদের একজন লিখল : শয়তানটা শিগগির মারা যাবে। ঈশ্বরের দয়ায় বাঁচব সকলে।

‘যদি কেউ তোমার গলা কাটতে আসে’, লিখছেন স্বামীজি : ‘তাকে না বোলো না। কারণ তুমি নিজেই নিজের গলা কাটছ। কোনো গরিবের কিছু যদি উপকার করো তা হলে বিন্দুমাত্র অহঙ্কৃত হয়োনা। তা তোমার পক্ষে উপাসনা মাত্র। তাতে অহঙ্কারের কিছুই নেই। সমুদয় জগৎই কি তুমি নও ? এমন কোথায় কি জিনিস আছে যা তুমি-ছাড়া ? তুমিই জগতের আত্মা। তুমিই সূর্য চন্দ্র নক্ষত্র। সমুদয় জগৎই তুমি। তুমি কাকে ঘৃণা করবে, কার সঙ্গে ঘৃণা করবে ? শুধু জেনে রাখো তিনিই তুমি। আর সমুদয় জীবন ঐ ছাঁচে গড়ে তোলে। যে এই তত্ত্ব জেনে জীবনকে সেইভাবে গড়ে তোলে সে আর কখনো অন্ধকারে ভ্রমণ করেনা।’

(ক্রমশঃ)

ইংরেজ শাসনের নমুনা

১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধের পর এদেশে ইংরেজের প্রাতিপত্তি বাড়িল। ইংরেজেরা মীরজাফরকে প্রথমে নবাব করিয়া পরে স্বপ্রয়োজনানুসারে পরচ্যুত করিলেন। মীরজাফরের পর মীরকাশিমের প্রতি তাঁহার বিশেষ সম্মতি হইলেন। ফলে তাঁহার মন্ত্রকে রাজমুকুট শোভা পাইতে লাগিল। তিনি নামে নবাব হইলেন, ইংরেজেরা প্রায় সর্বস্ব কর্তা হইয়া উঠিলেন। মীরকাশিম নিতান্ত দুর্বলচিত্ত ছিলেন না। সেসে ইংরেজের বথেচ্ছাচার তিনি সহিতে পারিলেন না। দরিদ্র প্রজার কষ্টমোচন করিতে গিয়া তাঁহাকে ইংরেজের কোপানলে পড়িতে হইল। ইংরেজেরা আবার অকথা অত্যাচারে বাঙালীকে উৎপীড়িত করিতে লাগিল। লোকের সর্বস্ব অগ্ৰহণই সে সময় ইংরেজদিগের এদেশে শাসনের মূলমন্ত্র ছিল।—দেশের কথা।

অভয়-মন্ত্রের মহিমা

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়



সে দিন রবিবারের বৈঠক একেবারে জমজমাট

বামুনশাড়ার যে পোড়োবাড়ীখানায় আজ পনেরো বছর ধরে থালি পড়ে আছে, সেখানে আজকাল নাকি লজ্জা হলেই কি যেন ছায়া ছায়া আনাগোনা করে, চ্যাচার, গান গায়, নাচের ধুমধড়াতার মাটি কাপায় এবং হালির চোটে আকাশ ফাটায়, প্রভৃতি।

আমি হেসে ফেলি বললুম, “হুতিবাড়ী ভূত! বত সব বাজে কথা! তোমাদের গল্পের হুলি বুঝি থালি হয়ে গেছে, তাই একটা অসম্ভব ভূতকে নিয়ে এই টানাটানি?”

আজ্ঞাধারীরা বললে, “বিবাদ না হয়, অকুস্থলে নিজেই যেতে পারো।”

আমি বললুম, “রাজী।”

—“রাজী? ভূতের ঠেলা গামলাতে পারবে?”

—“আলবৎ! সে যদি সত্যিই ছায়া-ছায়া অর্থাৎ অশরীরী হয়, আমার কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। আর সে যদি শরীরী হয় তা’হলেও আমার অহবিধা নেই। আমি বস্ত্রি, মুদুহু, লাঠিখেলা শিখেছি, তাকে ক্যাক্ করে ধরব আর কুপোকাং করব।”

—“তোমার ভয় করবে না?”

—“কিসের ভয়? আমি যে অভয়-মন্ত্র জানি।”

—“বাজে বকিয়ে না দাদা, বাজে বকিয়ে না! বামুনশাড়ার পোড়োবাড়ীখানায় হঠাৎ ভূতের উপজব শুরু হয়েছে? এতদিন ওখানে একটা ভূতেরও টিকি দেখা যায় নি, নতুন কোন মাহুৰও ওখানে পটল তোলে নি, তবে ভূতের জয় হবে কেমন ক’রে?”— এই বলে আজ্ঞার মাঝখানে গিয়ে ব’সে পড়লুম।

সেদিন রবিবারের বৈঠক, আসব একেবারে জমজমাট। সকলেই মুখে শুনি এক কথা।

—“অভয়-ময়! দে আবার কি?”

—“হোজাদের দ্বিভাষা কোরো।”

• • •

বামুনপাড়ার পোড়োবাড়ীখানি দোতাল্য। শেষ মালিক ছিলেন নিঃসন্তান এবং খুব সম্ভব অনাঙ্কীয়, কারণ তিনি যার। যাবার পর আর কেউ এখানে বাস করে নি। সংস্কার ও যত্নের অভাবে এই মেকেলে পোড়ো-বাড়ীখানার অবস্থাও হয়েছে এমন নড়বড়ে ও পড়ে-পড়ে যে, কৃত-পেত্রী আর বাসুহারা ছাড়া অন্য কারুরই দৃষ্টি পে আকর্ষণ করবে না।

গুনেছি অমাবস্তার রাতকে নাকি কৃত-শ্রেতরা শুভরাত্রি বলে মনে করে। তাই পরের অমাবস্তার রাত্তাই আমি একটা পেট্রলের লঠন ও একটা মোটা লোহার ভাঙা নিয়ে পোড়ো-বাড়ীর দোতাল্য গিড়ে উঠলুম। আজ্ঞারান্নী বন্ধুরা কেউ এখানে আসতে চাইলে না বটে, কিন্তু পথের ওপাশে একখানা বসন্তবাড়ীর ভিতরে নিরাপদে বসে শ্রেতের কবলে আমার অপঘাত-মৃত্যুর খবর মেবার হস্তে সাগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগল।

অন্ধকারের কালো বন্যতে মোড়া আকাশ ও পৃথিবী; চোখে দেখা যায় না বাইরের কিছুই, কিন্তু কানে শোনা যায় নানান ধনি ও প্রতিলম্বি—বাহুড়ের ডানার ঝটপটানি, প্যাটার চক্কে চীংকার, ঝিঁঝির ঝাঁঝ। গলার কহর এবং ঝিমিয়ে-পড়া নিশুত রাতের ঝিম্ ঝিম্ ঝিম্ ঝিম্।

লঠনের আলোতে একবার ঠিক মেরেই একটা রাতের চেয়ে কালো বিড়াল আবার কোণায় গাটাকা নিয়ে ক্রমাগত কাকে ঘেন ডাকতে লাগল আও, আও, আও, আও! সঙ্গে সঙ্গে বাইরের হাত। থেকে একটা কুকুরও কাঁপতে শুরু করলে কুই, কুই, কুই, কুই!



চাকামুণ্ডা, খন্ডাল চোখো, বাড়ি-ঝিরঝিরে শুটকো
কপনি-পরা এক চাট্যামুটিক

কুড়ুড়ে গল্পে যে সব ভৌতিক বর্ণনা পড়েছি, মিলে যাচ্ছে অন্ধরে অন্ধরে। ব্যলুম, বহুমক প্রভৃতি, যথনিকা উঠতে দেয় নেই।

ঠিক তাই! মিনিটধনেক কাঁটতে না কাঁটতেই ঘরের পশ্চিম কোণে ধোঁয়া-ধোঁয়া কি-একটা যেন তুলতে লাগল।

কি ওটা? চায়া? উহঁ! ওটা দেন ছায়ামূর্তি—দীয়ে দীয়ে ধোঁয়াটে ভাব কাটির ঘন হয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠছে!

* * *

ঠিক! ছায়ামূর্তিই বটে, কিন্তু ক্রমেই নিরেট কায়ায় পরিণত হ'তে লাগল। মনে মনে ভাবলুম, ছায়া কেন কোণলে কায়া হয়ে দাঁড়ায় সেটা জানতে পারলে অনেক কাজেই লাগতে পারে।

অবশেষে দেখা গেল একটা চাকামুখো খতালচোখো আলুকাংরা-কালো হাড়-জিরজিরে শুটকো কপনি-পর্যন্ত না। চ্যাঙা মৃতিকে—তার দাঁতাল মুখের ডানলিকে নেই একটা কান এবং বাঁ দিকে নেই আধখানা গৌক।

প্রথমে মিনিট দুই ধরে আমরা দুজনই বীরবে তাকিয়ে তাকিয়ে দুজনকে দেখতে লাগলুম। তারপর কেলো ভূতটা চোখ কটমটিয়ে লকলকে ভিত্ত্ব বার করে আমাকে বিচ্ছিরি ডেংচি কাটলে।

আমি একটুও ভয় পেলুম না, মনে মনে জপতে লাগলুম অভয়মন্ত্র—বার বাণী হচ্ছে, মা ভৈঃ, মা ভৈঃ!

আবার গুঢ়বিবাস, যোজাদেবও একমাত্র শব্দ হলো ঐ অভয়মন্ত্র এবং কুচ-পরোয়া-নেই ভাব! তবু বে ভারী মুখে বিড়গিড়' করে মন্ত্র পড়ে, সে হচ্ছে ভূতকে ডড়কে দেবার ও হাছুক ঠকাবার জন্তে কতকগুলো অর্থহীন শব্দ।

চোখ কটমটিয়ে ও ডেংচি কেটেও আমাকে কাহিল করতে না পেরে সে এগিয়ে আসতে আসতে বাজখাই গলায় চৌচিরে বললে, "হুম্‌হাম্‌, হুম্‌হাম্‌, হুম্‌হাম্‌!"

আমিও চাখ-কাটানো, টিকটিকি-ভাঙানো, পাড়া-কাঁপানো চীৎকার করে বললুম, "চোপরাও রোগা-পটকা ভূত, ফের হুম্‌হাম্‌ করবি জো হুম্‌হাম্‌ কিল খাবি!"

ভূতটা বেজায় চমকে উঠল, তারপর ধমকে দাঁড়িয়ে প'ড়ে সবিস্ময়ে বললে, "কি আশ্চর্য, তুমি ভয় পেলে না?"

আমি বুক ফুলিয়ে বললুম, "ভয় পাব? কেন ভয় পাব রে?"

ভূত বললে, "কি আশ্চর্য, তুমি কি জানোনা, ভূত দেখলেই মানুষের ভয় পাওয়া উচিত?"

ভূতদের একটিমাত্র ব্যবসা আছে, আর তা হচ্ছে মাহুকে ভয় দেখানো। তোমরা ভয় না পেলে আমাদের ব্যবসা চলে কি করে বাপু ?”

ভূতের গলার আঙঠাকে মিনতির ঝাঁড়াস পেয়ে বুকলুম অস্তরমস্তর দাঁওরাই ধরেছে। বললুম, “আমি হচ্ছি বোজা, ভূত দেখে ভয় পেলে আমাদেরও ব্যবসা চলে না।”

ভূট্টা অবিস্মারের খয়ে বললে, “উহু, তোমাকে দেখে রোজা বলে মনে হচ্ছে না তো। তুমি হাল-ফাসানের বাবু। রোজার চেহারা তোমার মত হতেই পারে না।”

অবিচলিতভাবে বললুম, “এর মড়াখেকো হাদারাম, “আমি হচ্ছি আধুনিক রোজা।”

—“হটে ? তুমি ভূত-ভাগানো মস্ত-তস্ত কিছু জানো ?”

—“জানি বৈকি !”

—“বল তো একটা শুনি।”

—“শোনো :

অক, বক, ককো, গকো, দক, তক, জকলে,

মগাসতি গগা গগা যগা ভূতের দকলে,

ভগ, চগ, মগতগ থগ থগ থটাত,

ভুগ, শুগ, চিত্ত চটাত, মুগ কটাত হটাত।

খোজা, পোজা, মোজা, নোজা দস্তখারীর আজা রে,

ডমলোচন কি ভয়ঙ্কর, ডস্কা ভুতুম্ ভাগ বা রে !”

ভূত ভাবাচ্যাকা খেয়ে বললে, “এ আবার কিরকর মস্ত ?”

—“এ হচ্ছে অতি-আধুনিক মস্ত। অনেকটা অতি-আধুনিক কবিতার মত।”

—“তোমার তুলনা ঠিক হ’ল না। আমি কাঁড়ি কাঁড়ি অতি-আধুনিক কবিতা পড়েছি, কিন্তু তিনহাস ধরে মাথা ঘামিয়ে ও একটা কবিতারও মানে বুঝতে পারিনি, শেষটা মাথার অঙ্কে ভুগে সে চেষ্টা ছেড়ে দিয়েছি।”

আমি রেগে বললুম, “ওরে বোকা ভূতো, কি বলতে চাস্ তুই ?”

—“তোমার এই অতি-আধুনিক মস্তের কিছু কিছু মানে বোকা যায়।”

—“যার নাকি ?”...

—“হঁ। ‘চিত্ত চটাত, মুগ কটাত’, ‘ভুতুম্ ভাগ বা রে’—এসবের মানে বুঝতে পারব না, এমন মুখা আমি নই।”

—“তবে ভাগো না বাবা, এখানে ঝাঁড়িয়ে বসবক্ করছ কেন ?”

—“না, না, কিছুতেই বাব না, তোমার কৃত-ভাগানো অতি-আধুনিক মত শুনেও বাব না ! পূর্ববঙ্গের উষ্মবঙ্গের জন্তে শংরে খালি বাড়ী পাখার উপায় নেই, কত খুঁজে শেষটা এই পোড়ো-বাড়ীখানা আবিষ্কার করছি, তোমার কথা আমি গ্রাহ্যের মধ্যেই আনব না । আমি তো এখানে থেকে বাবই না, বরং বাঁচতে চাও তো তুমিই তাড়াতাড়ি দ’রে পড়ো—মইলে তাঁরা সবাই হাঁউ-হাঁউ-খাঁউ বলে এবনি এসে পড়বেন !”

—“তাঁরা ?”

—“হ্যাঁ, ভাণ্ডাগাছের পেড়ী-পিসী, বীশবনের শাকচূরী মানসী, গোরস্থানের মামসোসাহেব, তা ছাড়া আরো অনেক । মামসোসাহেবের মেজাজ প্রশংসনীয় নয়, আমার একটা কান আর আধখানা গৌক তিনিই ছিঁড়ে নিয়েছেন । আজ এখানে তাঁদের পিকনিক হবে ।”

আমি যেন আকাশ থেকে পড়ে বললুম, “এখানে পিকনিক ? বাড়ীর ভেতরে পিকনিক ?”

—“তা নয়তো কি ? মাহবাবা পিকনিক করতে যায় ঘর ছেড়ে যেন, আর কুতরা পিকনিক করতে আসে বন ছেড়ে ঘরে, এও জানো না ? তবে তুমি কি ছাই রোমা হে ?”

বাধা হয়ে কৃতচাঁর পদেপদে বসিয়ে দিলুম ভারী ওজনের এক চড় । আর যায় কোথা, বিকট ধরে এত জোরে সে কেঁদে উঠল যে আমারও পিলে চমকিত না হয়ে পারলে না ! তারপর সে ক্রমাগত লাটুর মত বন বন ক’রে ঘুরতে ঘুরতে ব্যাঙের মত ঘন ঘন লাফ মারতে লাগল ।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম, “এ আবার কি ঢং হচ্ছে !”

কৃত ঘুরপাক-খাওয়া ও লাফ-মারা খামিয়ে ডেউ ডেউ ক’রে কীংকতে কীংকতে বললে, “জং নয় গো ঢং নয় ! তোমার চড় খেয়ে আমি কুসুমন্তর হুলে গিয়েছি !”

—“কুসুমন্তর ?”

—“হ্যাঁ গো, হাওয়ার সঙ্গে হাওয়া হয়ে মিলিয়ে যাবার কুসুমন্তর ! ওগো আমার কি সর্বনাশ হ’ল গো ! কুসুমন্তর হুলে গেলে কুতসমাজে আমার যে আর ঠাই হবে না গো !”

ওদিকে এই বেয়াদা কার্যাকাটি শুনে বাস্তার ওখারের বাড়ীর ভিতর থেকে বন্ধুর দল সম্বন্ধে চেষ্টায়ে হার হার ক’রে উঠল ।

তাঁদের আবিস্ত করবার জন্তে জানালার কাছে গিয়ে চাঁৎকার ক’রে বললুম, “মা ভৈঃ, মা ভৈঃ ! আমি কীংছি না, কুতে কীংছে ! কৃত আমার বন্ধী । দেখতে চাও তো দৌড়ে এস !” ..

বন্ধুরা এককাকো দৃঢ়কণ্ঠে জানিয়ে দিলেন, বন্ধী বা স্বাধীন কোনরকম কৃত দেখাবার জন্তেই তাঁদের কাকর আগ্রহ নেই ।

আচম্বিতে ঘরের মধ্যে ঘোড়ার মত চিঁহি-চিঁহি ক’রে কে হেসে উঠল ।

শচমকে মন বললে, মাঝেমাঝেব এলেন নাকি ! কিন্তু চাই করে ঘিরে দেখি, সব ঘুকা !
 ভীতু ভূতটাই অদৃশ ! মিস্ত্র মিলিয়ে বাবার কুসুম্বরটা আবার তার মনে পড়ে গিয়েছে ।

মস্তুরটা তার কাছ থেকে আদায় করে নিতে পাহলু না বলে আমি দুঃখিত । অদৃশ বাহুব
 হওয়ার স্ববিধা কত !

রাতের স্বপ্ন

শ্রীমদ্বসুদন চট্টোপাধ্যায়

•

সারা রাত ধরি একঘেয়ে জল পড়িছে গানের সুরে,
 ভিজে বনে বনে বিরাজ করিছে কী ভীষণ স্তম্ভতা ;
 হাওয়া কমে গেছে—গাছের পাতারা কয় না একটি কথা ;
 সারা রাত ধরি একই ছন্দেতে বারি ঝরে বন্ধ রে ।

ছোট নদী আর উলান, গলি মাঠ হতে বারে বারে
 জগতের প্রাণ স্থির হয়ে শোনে কী কথা কোতূহলে,
 গন্ধ জাগিছে—গন্ধ দানিছে সিক্ত গোসাপ দলে,
 যেত দেবদূত গান গায় একটানা সে অন্ধকারে ।•

মাটি চাপা ইতিহাসের অধ্যায়

বিজ্ঞানপ্রিয়

প্রায় দু'শ বছরের আগেকার কথা। একদল হৃদয়-প্রমিত কোদাল, গাঁতি, সাবল, ইত্যাদি মাটিখোঁড়া, পাথর-কাটা হেতের আর পাহাড়-কাটানোর মালমশলা নিয়ে কাজে বাস্তব। সম্ভবপে মাটি খুঁড়ে চলেছে। চাষ করবার ক্ষেত্রে নয়, খাতুশিও তোলবার ক্ষেত্রে নয়, বিরাট কোনো বাঁধের ভিত্তি বসানো করবার ক্ষেত্রে নয়, গুপ্তধন পাওয়ার ক্ষেত্রেও নয়। তবে কিণের ক্ষেত্রে? মাটিচাপা ইতিহাস খুঁড়ে বার করবার ক্ষেত্রে। এও একরকম গুপ্তধন বটে—তবে গুপ্তধন না বলে একে গুপ্ত ঐশ্বর্য বললেই ভাল হয়। প্রাচীনকালে আমরা কেমন ছিলাম; আমাদের আচার-ব্যবহার রীতি-নীতি কেমন ছিল; আমাদের ঘরবাড়ী পথঘাট কেমন ছিল; আমাদের পোশাক-পরিচ্ছদ, আমাদের আসবাবপত্র, আমাদের প্রতিদিনের ব্যবহারে গিনিদপত্র বস্ত্রপাতি কেমন ছিল—এইসব বিবরণ জানবার আগ্রহে আমরা মাটিচাপা 'বাছুর' খুঁড়ে বার করি। বাছুরে যেমন প্রাচীনকালের কত জিনিস থাকে ধরে ধরে সামান্যো আমাদের দেখবার ক্ষেত্রে, বোঝাবার ক্ষেত্রে, জানবার ক্ষেত্রে, ডেহনি রয়েছে মাটিচাপা শহরগুলোতে। হঠাৎ মাটির তলায় চলে ঘাবার আগে যেমন ছিল সব, ঠিক তেমনই অবস্থায় রয়েছে তাকে মাটি খুঁড়ে বার করবার পূর্ব পর্যন্ত।

কেমন আমরা ইতিহাস খুঁড়ে বার করবার চেষ্টা করি? পুরানো দিনের পরিচয় জানতে পারবো বলে; অজানা, অদেখা অনেক কিছু থেকে আমাদের আধুনিক জ্ঞান-ভাণ্ডারে নতুন আলোক-পাত করতে পারবো বলে। জানাবার বেশাতেই মাহুত কত মাটি খে খুঁড়ে, কত অর্থ, কত পরিশ্রম নিয়োগ করেছে তার হিসাব নাই। সব সময় যে সর্বত্র মফল হয়েছে চেষ্টা, তাও হয় নি; তবুও তার চেষ্টার বিরাম নাই। সর্বপ্রথম কে যে ইতিহাস আবিষ্কারের এই পথের সন্ধান দিয়েছেন তা ঠিক করে বলা কঠিন। তবে, এই চেষ্টা থেকেই যে প্রত্নতত্ত্ববিজ্ঞা, ইংরাজিতে বাকে বলে আর্কিয়লজি (Archaeology) পরিপুষ্ট হয়েছে তা সহজেই অনুমান করা যায়।

তোমাদের যা বলছিলাম। একদল শিক্ষিত খনক খুঁড়ে চলেছে। গাঁতির কলার বধনই ঠেকছে কোনো কঠিন বস্তু, অতি সাবধানে মাটি সরিয়ে তাকে অক্ষত অটুত অবস্থায় বার করা হলো—সেটা হয়তো কোনো খোদাই-করা পাথরের মূর্তি, অথবা স্তম্ভের ভগ্নাবশেষ, কিংবা নাটমঞ্চের চত্বর। বাণী ম্যারিনা এমেলিয়া ক্রিষ্টাইনের সপ—মাটির তলায় কোথায় কি হৃদয় মূর্তি পাওয়া যায় সংগ্রহ করবার। তাই চলেছে ধনেন্দ্র কাজ বিজ্ঞ পরিদর্শকের পরিচালনায়। নেপলের রাগীর

সব অবসর কিছুদিন পরে মিটে গিছিলো, কিন্তু পুণ্যভূমি-জানতে-আগ্রহান্বিত সাহসবলির সব মিটলো না। এখন কাজ চলতে লাগলো। তারই ফলে ধীরে ধীরে পর্বত উপর সিনেমা ছবি দেখান হুটে ওঠে, ভেমনি বেরিয়ে এলো মাটির তলা থেকে কত হাজার বছর আগেকার ময়ে বাওয়া শহর—পম্পিয়াই আর হারকিউলেনিয়ায়। ইটালীর দক্ষিণ-পশ্চিমে ভিহুভিডাস আগ্নেয়গিরির খুব কাছেই এই দুই শহর। হারকিউলেনিয়ায় ছিল সমুদ্রতীরে। লাভা (Lava) আর ল্যাপিলিতে (Lapilli) চাপা পড়েছিল এককাল। এখনও চলেছে তার খোঁড়াখুঁড়ির কাজ।

লাভা আর ল্যাপিলি দুইই আগ্নেয়গিরির মুখ থেকে বেরোয়, কিন্তু দুটোর মধ্যে তফাৎ আছে অনেক। লাভা বলে গলে-বাওয়া বানিজ ধাতু, পাথর প্রভৃতির মিশ্রণকে। আগ্নেয় স্রোতের মত বেরিয়ে আসে আগ্নেয়গিরির মুখ থেকে—ঠাণ্ডা হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কঠিন পাথরে পরিণত হয়। আর ল্যাপিলিতে থাকে আগ্নেয়গিরিজাত শিলাখণ্ড বা চূর্ণ আর চট-চটে ছাই; আগ্নেয়গিরির মুখ থেকে বেরিয়ে আসে কতকটা ইঞ্জিনের মুখ থেকে বেগে বেরোনা ধোঁয়ার মত। আগ্নেয়গিরির মুখ থেকে বেরিয়ে শৃঙ্খল চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে, তারপরে আস্তে আস্তে যবে পড়ে ঝুটির ধারার মত। এই ল্যাপিলির আবরণে ঢাকা ছিল পম্পিয়াই, খুব গভীর ছিল না এর আবরণ। কিন্তু হারকিউলেনিয়ায় উপর দিয়ে চলেছিল লাভাস্রোত। প্রায় বাট-পরাবড়ি কিট কঠিন লাভার তলায় ভুবে গিছিলো হারকিউলেনিয়ায়।

সেই দিনের কথা কল্পনা করতে পার ? যেদিন ভিহুভিডাস হঠাৎ উঠলো জেপো; জেপো নয় একবারে বেগে অগ্নিমুখি হয়ে। তার হুৎকারে বেরোচ্ছে ল্যাপিলি আর মুগ দিয়ে অবিরাম তরল আগ্নেয় স্রোত, লাভা। ষ্টেপুর্ষ উনআন্টি জেপের কথা। অগাঠের মাঝামাঝি, কোনো লক্ষণই ছিল না ভিহুভিডাসের ক্রমশঃ ধারণ করবার। আগেকার দিনের মত ২৪শে অগাঠের ভোরবেলা বেশ মনোহরমই ছিল। সূর্যের অরুণ আলো সেদিনও শহরবাসীদের জাগিয়ে দিবেছিল তার মধুর স্পর্শে। অস্ত্রান্ত দিনের মতই কর্মচকল ছিল শহরবাসী। বেলা দুপুর হবার আগেই হঠাৎ বনলে গেল সকলের নুগের অবস্থা—আনন্দ গেল মিলিয়ে—আভবের উৎকর্ষা হুটে উঠলো সর্বত্র। প্রচণ্ড শব্দে ভিহুভিডাসের বন্ধ-মুগ বিদীর্ণ হয়ে গেল, ধোঁয়ার কুণ্ডলী সূর্যকে ঢেকে দিলে; ছাই আর শিলাচূর্ণ পড়তে লাগলো ঝুটির ধারার মত—থেকে থেকে বিকট গর্জন শোনা যেতে লাগলো সেই সঙ্গে, আর তার মুখে গোখ-রঙ্গমানো আগ্নেয় হুয়া। চারিদিকে প্রাণ-বাঁচানোর জন্তে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটোছুটি—চাঁৎকারে আর্তনাদে পূর্ণ হলো শহর এক মুহূর্তে। উদ্ভস্ত পাখীরা মরে পড়তে লাগলো, গৃহপালিত পশুরা ছুটলো নিরাপন্ন আশ্রয়ের দিকানে। সঙ্গে সঙ্গে প্রবল জলস্রোত শহরের পথে গধে; কেউ জানে না কোথা থেকে আসছে এই প্রলয় বারিস্রোত—আকাশ থেকে, না সমুদ্র থেকে।

কিশোর-সাহিত্যের অমর গ্রন্থ

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
মাকড়শ পুঁথি ৩০
'বনকুল'
রজনী ২২
বিকৃত্ত্বরণ মৃণোপাখ্যায়
হেসে বাও ২২
শোহুর চিঠি ১০
বিদ্যাল মিত্র
টক-কাল-মিষ্টি ২২
প্রতিভা বহু
সব চেয়ে বা বড় ১০
বুদ্ধদেব বহু
রাগা থেকে কাগা ১০
অ-ক-ব
খামখেয়ালী ছড়া ১০
পশুপতি ভট্টাচার্য
হৃদয় দেশের রূপকথা ২২
সীতা দেবী ও শান্তা দেবী
হিন্দুস্থানী উপকথা ৩০
লীলা মজুমদার
হলদে পানীর পালক ২২
অশন বুড়ো
অশন বুড়োর মজার গল্প ১০
শিবরাম চক্রবর্তী
নিখরচায় জলধোপ ১০
ববোজ বৈজ্ঞ
মায়া বাঈ ১০

প্রত্যেকখানি এই ছবিতে ছাপায় অনবদ্য

নানা বস্তুর ছবিতে ভরা নিম্ন ও বিশেষ-সাহিত্যে আর একখানি বিশ্বব্যাপক প্রকাশ ভারত সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা

২৫০
গল্প
মনোদার
নিম্নের
গ্রন্থ

দন্তমঞ্জুর
নবপর্যায়

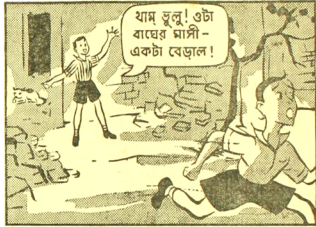
সুবিখ্যাত বীজবীরক
ডেন্টনিক
ক্রোমোফিল সহযোগে
আধিকতর শক্তিশালী



নির্মল মুখগহ্বর
দৃঢ় দন্ত ও মাড়ী
দুর্গন্ধহীন প্রশ্বাস
ক্রোমোফিল
ডেন্টনিক দন্ত
মঞ্জুর সহজলভ্য
হইবে

বেপল কেমিক্যাল
কলিকাতা-বোম্বাই-কলকাতা





যা: আর বাজে বকিসনা।
-যাই হোক, একটা কথা
শুধু জেনে রাখ- তুই
যদি বোজ আমার মত
আরও বেশি দুধ আর
'ডালডায়' রাঁধা খাবার
না খাস তুই কিছুতেই
সাহসী আর শক্তিশালী
হতে পারবিনা।

হ্যাঁ, 'ডালডায়' রাঁধা
খাবার দাবার পুষ্টির
এবং স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল।
'ডালডায়' যোগ করা
হয় স্বাস্থ্যদায়ী ভিটামিন
'এ' এবং 'ডি' যা আপনার
দাঁত ও হাড় সুদৃঢ়
করে। সবসময়
কিনবেন 'ডালডা'
টিনের ওপর খেজুর
গাছের ছবি দেখে
নিতে ভুলবেন না।



আগ্নিশিঙনলেথবাক ২য় খাবেন যে...

রোমান সম্রাট নিয়োর ঘূষে একটি কাঁচের
পেলানের দাম ২৭,০০০ টাকা পর্যায় হোত।
কেনে ক্রীতদাস যদি এরকম একটি পেলান
ভেঙ্গে ফেলতো তাহলে তার শাস্তি হোত
অত্যন্ত কঠোর। সেই একই পেলান এখন
যে কোন ছোট বোকামে পাঁচ ছয় আনা
দামে পাওয়া যায়।
এমন কিছু জিনিষ আছে যা রাস্তারজুড়ার
কোয়াদারের সমস্ত ধন দিয়েও পাওয়া
যায়না। সম্রাট বাবরের ঘেঁষে হুমায়ূনের
একবার কঠিন অহং হুয়ছিল।



হাকীমেরা সব ঔষ প্রাণের আশা ছেড়ে দিলেন।
শেষে বাবর ঔষ ছেলের বিছানার চারিশাশে ঘুর
ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলেন—“হে ভগবান
আমার প্রাণ নিয়ে আমার সমস্তকে বাঁচিয়ে
দাও।” ঔষ প্রার্থনা সফল হোল। বাবর ঔষ
নিয়োর প্রাণের বিনিময়ে ঔষ সমস্তকে
বাঁচিয়ে ফুললেন।

আমাকে কাঁচের পেলান সমা কিই বাধ্য



আমাকেও বাবর হুমায়ূনের ঘূষের মতই অনুভব সম্পন্ন।

ভাল বাছা ভগবানের আশীর্বাদে মৃত। কিন্তু

খুলো মরলা সব সময় আশাধের
হাওয়ার পক্ষে সত্যিকার। আশা

বাই করিনা কেন, আশা করনই

খুলো মরলা এড়াতে পারিনা। মরলার থাকে যোগের বাঁজাণু তার
থেকে সব সময় আশাধের হাওয়ার সমুদ্র স্রুতি হতে পারে।

লাইকবর সাবান এই সব মরলা জন্মিত বোজাণু ঘূষে
বার করে দেয় এবং আপনতার স্বাস্থ্য সুরক্ষিত
রাখে। সারাদিন সতেজ থাকবার জন্যে
সর্বদা লাইকবর সাবান দিয়ে স্নান করুন।



দুই শহর অকস্মাৎ নিউরে উঠলো আতঙ্কে। বাঁচবার কোনো পথ নাই। জল, কর্ম আর লাভা-
শ্রোত হারকিউলেনিয়মকে গ্রাস করতে করতে এগোতে লাগলো। প্রাচ্যের জল যেমন ধীরে ধীরে
ডুবিয়ে দেয় ধরবাড়ী পথবাট গাছশালা—তেমনি ডুংতে লাগলো হারকিউলেনিয়াম। অদি-গলি
রাজপথ বেধে গলন্ত লাভা ঢুকলো ঘরে ঘরে ধরবা জানালা দিয়ে, ভরে গেল সব ফাঁকা জায়গা স্পর্শে
জল ঢুকে গেলে যেমন হয়। তলিয়ে গেলে সবশূন্য শহর। বারা পালিয়ে যেতে পারলো না লাভার
তলার জীবন্ত কবর হলো তাদের।

পশ্চিমাইও মরলো সেদিন। তবে লাভার প্রাচ্যে নয়, ল্যাপিল্লির স্বর্ণে। প্রাচ্যে চাই বৃষ্টি,
খুব হাচ্চা চাই বইতো নয়, লোকে কেড়ে কেসে দেয় গা থেকে। কিন্তু তার পরই প্রবল স্বর্ণ গুরু
হলো ল্যাপিল্লির; মাঝে মাঝে বোঝার মত ভারী ভারী ঝাঝা পাথরের বৃষ্টি। লোকে যখন বিশেষ
গুরুত্ব বুঝতে পারলো, তখন পালাবার সময় নাই। গন্ধক বাষ্পপূর্ণ বায়ু তখন শহরের বুকে চেপে
বসে গেছে; নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। বাতাস—বাতাস, দম নেবার ভঞ্জে একটু মুক্ত বাতাসের
আশায়—বারা মুখ চাপা দিয়ে ঘরের বাইরে ছুটে আসছে প্রবল ল্যাপিল্লির বৃষ্টিতে, তারা আবার
ফিরে যাচ্ছে ঘরে। অষ্টোপাসের শুঁড়ের মত ধীরে ধীরে প্রবেশ করছে সেই বিষাক্ত শহরের রক্ত
রক্তে। জানালা ধরবা বন্ধ করেও নিস্তার নাই—মৃত্যু, ঐ এগিয়ে এলো—ঐ! এইভাবে বাগরুদ্ধ
হ'রে মরে গেল পশ্চিমাই—অর সময়ের মধ্যেই সব শেষ—কোনো শব্দ নাই—আর্জনার নাই—সব
স্থির। আটশ ঘণ্টা পরে যখন সূর্যের আলো দেখা গেল, তখন আর সেই প্রাণচকল ঐ স্বর্ণশালী
স্বন্দর শোভাময় হারকিউলেনিয়ম আর পশ্চিমাইয়ের কোনো চিহ্ন নাই। তাদের আশপাশের দশ
বারো মাইল ব্যাপী জায়গা একেবারে ধ্বংসস্তুপে পরিণত হলো। তিমিরতারার মত ক্লান্তমুখিও
আর নাই। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে অগ্নির মত দিলিয়ে গেল শহর দুটো।

দেই ধ্বংসলীলার পর দীর্ঘ সত্তর শ' বছর পরে নতুন ক'রে খুঁজে বার করা হলো এই দুই
শহরকে—বিশ্বের বিস্ফারিত হলো আমাদের দৃষ্টি—কি অপূর্ব ছিল নগরগুলো! কত উগ্রত ছিল
তখনকার সভ্যসাম্রাজ্য! যে নগর ধীরে ধীরে কালের কবলে চ'লে যায়, তার সঙ্গে মৃত পশ্চিমাই
শহরের তুলনা অনেক। কে যেন বাহুদয়ে একদুহুর্তে সম্মুখি সচল নগরীকে অচল ক'রে রেখে
দিয়েছে মরণের মামির মত ভয়ঙ্কর তলার; এমন মনে হবে পশ্চিমাইকে দেখলে।

অতকাল আগেকার এই দুর্ঘটনার বিবরণ কে দিলে, তাই প্রশ্ন করচো? সেই শহরই দেখিয়ে
দিয়েছে—তার মর্মান্তিক ঘটনার ছবি এক এক ক'রে। খনকের কোদাল আর গ'তির তলার তারা
সকলে যেন জেগে উঠেছে—বারা পেমিন বাঁচবার ক্ষেত্রে প্রাণপণে চেষ্টা করেছিল। পায়ে শিকল
বাঁধা জীতদাসের কড়াল, মাতার বুকে শিশুর কড়াল-মুতি; সারা জীবনের সঞ্চিত ধনসম্পদ নিয়ে

পলারমান নবনাগীর কহাল ; কোথাও বা খেলাধুলার মত শিশুর দল ; কোনো ঘরে বা রকনরত গৃহিণী ; কোথাও বা দীর্ঘকায় শক্তিশালী পুরুষ তার স্ত্রী আঁধ পুত্রকে ধরে নিয়ে চলেছে বাঁচাবার আশায়—এই রকম কত শত ছবি—সব কহাল হ'য়ে তাদের কাহিনী বর্ণনা করলো আত্মকর মাহুঘের কাছে তার হিণাব নাই। ক্রমে ক্রমে দেখা দিল সারি সারি অট্টালিকা, ঘরবাড়ী, বাগপথ, বিরাট ই্যান্ড্রিফিটোর—টেবিলের উপর প্যাপিরাস রোল, কংলালার বস্ত্রপাতি, শরাইখানায় টেবিলের উপর ভোজন-পাত্র, এমনকি তাড়াতাড়ি চলে যাবার আগে হিলাব চুকিয়ে দেওয়া পয়লাগুলো পর্যন্ত রয়েছে পড়ে। দেওগালে ঝাঁকা ছবি এবং পোসাইকরা কবিতার ছত্র আবিষ্কৃত অবস্থায়। যেন মহাকাল আধুনিক কালের মাহুঘের ক্ষেত্রে বিরাট এক বাহুবল তৈরী করে রেখেছে অতীতের অমূল্য স্মারক পূর্ণ করে—যাতে প্রাচীনকালের ইতিহাসকে রূপ দেবার মত তথ্য সংগ্রহ করতে পারে। এই শহর দু'টোর মত আরও অনেক প্রাচীন নগরীর ধ্বংসস্থল খুঁড়ে মাহুঘের ইতিহাসের স্মৃতি তলায় চাপা-পড়া অখায়গুলোর পাঠ উদ্ধার করা হয়েছে, এবং এখনও হচ্ছে। তোমরা এ সব কাহিনী শুনে অবাক হ'য়ে যাবে।

বুলবুলি

শ্রীবারীশ্রকুমার ঘোষ

আয়রে আর বুলবুলি,
করিস নে আর চুলবুলি,
উদ্ভাড় করে তোর বুলি
ফল এনে দে গুল-গুলি।

আয়রে আয় বুলবুলি,
ডাকছে তোকে টুলটুলি,
টকটকে লাল ফুলগুলি
দে এনে দে—বুলবুলি।

বুলবুলি আয় বুলবুলি
খেলেতে খোকার ড্যাংগুলি,
খোকার চিকন চুলগুলি
উড়ছে হাওয়ায় তুলতুলি।

বুলবুলি আয় বুলবুলি,
গান শোনা তুই প্রাণ খুলি,
খোকন গেছে নিদ্-ভুলি,
ঘুম এনে দে বুলবুলি ॥

মেঘ

ত্রিশুধীভূষণ তর্কাতার্ক

সাগরের বুকে আমি ভ্রম নিয়োগি। পাহাড়ের কোলে আমি বাস করি। খোলা আকাশ আমার খেলার মাঠ। বল দেখি আমি কে? আমার নাম মেঘ!

আমার অনেক পোশাক আছে। তাহার মধ্যে ভ্রমকালে কালো পোশাকটাই আমি বেশি ব্যবহার করি। এছাড়া আমার যে একটা সাদা পোশাকও আছে, তাহা তোমরা লক্ষ্য করিয়াছ কি? পূজার সময় তোমরা নতন নতন জামা পরিয়া খেলা কর। তাহা দেখিয়া আমারও নতন জামা পরিবার সপ হয়। আমি তখন সাদা পোশাকটা পরিয়া আকাশে খুব ছুটাছুটি করি। সেই সাদা পোশাকে আমাকে কেমন জ্বলন্ত দেখায় বলতো?

সূর্য আমার বন্ধু। তাহার সহিত রোজ সকালে ও বিকালে বেড়াইতে বাহির হই। তখন টুকটুকে লাল পোশাকটাই আমি পরি। আমরা দুজনেই ভাল ছবি আঁকিতে পারি। আকাশে সাত-রঙা একটা রেখা দেখিলে তোমরা তাহাকে তোমাদের রামচন্দ্রের ধনুক বলিয়া মনে কর। তোমরা কি বোকা! ওতো আমাদেরই আঁকা ছবি!

সূর্য মাঝে মাঝে দূর হইতে আমার গারে নানা রঙের কালি ছিটাইয়া দেয়। সূর্য ছেলেটি ভারী দুট। আমি তাহাকে কি ভাবে লজ্জা করি জান? আমি সুযোগ পাইলে আমার সেই কাল পোশাকটা দিয়া তাহাকে একেবারে ঢাকিয়া ফেলি। তখন তোমরা সূর্যকে হেসিতে পাও না।

আমার একটা ছোট্ট বোন আছে। তাহার নাম বিদ্যা। সে বড় চকল। তাহাকে ধরিতে গেলে সে ছুটিয়া পলায়। আমি তাহাকে কিছুতেই ধরিতে পারি না। বড় ভাই হইয়া ছোট বোনের সহিত পারি না, সে কি আমার কম অপমান। গুনিয়াছি, সে সময় আমার স্বরটা তেমন মধুর শোনায় না।

কিন্তু খেলাধুলা ও বাবুগিরি করিয়াই আমি সারাদিন কাটাই না। আমি ভ্রমবাসীর সেবার ভার নিয়াছি। আমার অনেক কাজ। ঘুরিয়া ঘুরিয়া সকলের আহাতির ব্যবস্থা করিয়া দিতে আমার বড় আনন্দ। হাঙ্গর যে বাঘাবর বৃন্তি ছাড়িয়া চাখ-ব'গে মন দিয়াছিল, সে তো আমারই ভরসাঘ। তাহার ফলেই হাঙ্গর আজ এত সভা, ভগৎ এত সমৃদ্ধ। তোমাদের মহাকবিরা সকলেই আমার ভক্ত। তোমাদের বিজ্ঞানীরাও আমার গুণের কথা জানেন।

বাতাস আমার বাহন ও বৃষ্টি আমার মধ্য। সেবারতে এরাই আমার প্রধান সহায়। বৃষ্টি মাঝে মাঝে তোমাদের দেশে বায় তাই তোমরা তাহাকে ভাল করিয়াই জান। সে তোমাদের খেলা

ভাড়া দেয়। দেহন্ত তোমরা কি বৃষ্টির উপর রাগ করিয়া থাক? কিন্তু বৃষ্টি তোমাদের কত উপকার করে তাহা একবার ভাবিয়া দেখিয়াছ কি?

তোমাদের গরমে কষ্ট পাইতে দেখিলে আমি বৃষ্টিকে পাঠাইয়া দিই। গরমে তোমাদের নদী-পুকুর শুকাইয়া গেলে বৃষ্টি তাহা জলে পূর্ণ করিয়া দেয়। তখন তোমরা জলে নানিয়া কতক্ষণ কাঁপা-কাঁপি কর। তোমাদের আনন্দ দেখিলে আমি বড় হুগু হুই।

বৃষ্টি গিয়া তোমাদের দেশের মাটি ভাল করিয়া ভিজাইয়া দেয়। তাই তোমাদের দেশে ফল জন্মাইতে পারে। যে দেশে বৃষ্টি নাই, সেখানকার মাটি ক্রমে বালিতে পরিণত হয়। এই বালি বাড়িয়া একটা দেশকে গ্রাস করিয়া ফেলিতে পারে। তখন তাহাকে বলা হয় মরুভূমি। সেখানে নদী-নালা কৃণ-জলাশয় কিছুই নাই। চারিদিকে ধূ ধূ করে বালি। মরুভূমিতে মানুষ বাস করিতে পারে না।

তোমাদের সঙ্গে এখন আর গল্প করিব না। ঘুরে ঐ সব দেশের লোকেরা গরমে কষ্ট পাইতেছে, দেখিতেছি। চল বৃষ্টি, উহাদিগকে গিয়া বৃষ্টি করি। কাজের সময় গল্প করিয়া সময় নষ্ট করিতে নাই

একতারার গান

শ্রীঅচ্যুত চট্টোপাধ্যায়

‘তারবাঁধা’ হাট থেকে একতারার কিনে
তাঁর ভারে সুর বেঁধে তারানাথ রায়
চললেন মেঠো পথে গ্রীষ্মের দিনে
পড়ন্ত রোদ্দরে গামছা মাথায়,
‘তনয়ে তার তারা’—গান গেয়ে গেয়ে,
ভাল লয় জ্ঞান নেই, শুধু, চীৎকার ;

কাজ সেরে ফিরছিল ধোপাদের মেয়ে
পেছনে নখর গাধা গুটি তিন চার,
তার সাথে ছাধা ভালপুকুরের পাড়ে ;
গান শুনে উল্লাসে রাসভের দল
তেড়ে নিয়ে গ্যালো তাঁকে গরুর
ভাগাড়ে

একতারার ফেলে, ফেলে চাকের জল—

গঙ্গায় চান্ন ক’রে এই অবেলায়

ফিরলেন ভাস্করিক তারানাথ রায় ॥



হৃদয়ী শূন্য

[উপস্তাস]

মেবাচার্ঘ

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

শিবানীরা চলে গিয়েছে অনেকক্ষণ। জুরিভোজে তৃপ্ত বাহুর বিকেল পৰ্বস্ত ঘুমিয়ে হঠাৎ উঠে বসে, চোখ রগড়ায়। স্টোভের শব্দ কানে আসে তার, শব্দ লক্ষ্য করে উপস্থিত হয় মায়ের ঘরে। মা চা করছে, বাবা বসে আছেন চূপ করে বাটের উপর।

—কি বাবুর ঘুম ভাঙ্গল? চা খাবি?

—থাব। মা, পিনাকী কোথায়?

—পিনাকী গিয়েছে শিবানীদের সঙ্গে। তুই নাকি বলেছিল পুথীতে এসে স্বর্গধারে না থাকলে পুথীতে আদাই বুধা? দাদাও হোটেল থেকে রাতিরে, তাই পিনাকীকে পাঠিয়ে দিলাম।

বাহুর মায়ের কথার উত্তর দেয় না, চূপ করে শোনে। স্টোভ থেকে কেটলি নাহিয়ে চা তৈরী করেন দাখন দেবী। মাথব চক্রবর্তী অর্থাৎ বাহুরের বাবা, ট্যাক থেকে নত্নির কোটো বের করেন, একটিপ নত্নি নাকে টানতে টানতে বলেন—চক্রবর্তী কি লিখেছেন? কি বলছিলে তখন?

দাখনা দেবী কাপে চা ঢালতে ঢালতে উত্তর দেন—খবর ভাল নয়। পিনাকীকে কালকেই পাঠিয়ে দেওয়া দরকার। দিদির অসুখ। কেবল নাকি পিনাকীকে দেখতে চাচ্ছে।

বাহুর উদ্‌ঘীব হয়ে গুনছিল, উৎকণ্ঠিতভাবে জিপোস করে—কি মা, কি হয়েছে?

—না, কিছু না। জর—জর হয়েছে তোর বড়মাসীর।

বাহুর বেশ বৃত্তে পারে কি যেন কি ঘটনা ঘটেছে, মা ডাক্তরে চাচ্ছে না তার সামনে চা খেয়ে বেরিয়ে, বায়ান্দার খুঁটি খবে পাড়িয়ে উল্লাস নয়নে চারিদিকে একবার চেয়ে দেখে। পিনাকী নেই, মনটা ফাঁকা ফাঁক লাগছে তার। আকাশে সূর্যের তেজ ক্ষিপ্ৰগতিতে নিবে আসছে। সূর্য ডুংডুং। আর কিছুকালের মধ্যে আঁধারে ঢেকে যাবে বিশ্ব চরাচর। কালা রাম ভাঙ্গা গাড়ীটার উপর বসে ছর করে গান গায় আঙে আঙে...

সেয়ে কু চুড়া বি পণ্ডা কদলী

মাখি কিরি পকই দ'ব...

অমৃত ভাণ্ড—অমৃত ভাণ্ড—অমৃত—ভা...

ছাড় ছাড়া কথার রেণ, বাহুরের স্মরণ হয়, মা উড়িয়া বই পড়তে পারে। মায়ের বইয়েতেই বোধ হয় হবে—লেখা আছে, ব্যর্থপ্রায় পুত্রীর পাতার গান...

যাত্রী না গুটে কোণেড়ে মিলি

গোড়-অ গেলা প্রত্ন বনমাণী

ইপাক-অ শিশাক-অ বাট-অ চালি

হাফশ্যাটেও পকেট থেকে ছুরিটা বের করে বাহুর। ভাঙ্গা ইটের উপর বালি রেখে শানিয়ে নেয়। রান্নাঘরে ঢুকে বিনা বাক্যব্যয়ে অমৃতভাণ্ডের সন্ধ্যাবহার শুরু করে।

পিনাকীর চেয়ে সামান্য কয়েক দিনের বড় বাহুর, কিন্তু পিনাকীর মতন পড়াশুনায় বেধাবী নয়। স্মৃতিশক্তি কম, বাহুর বৃত্তে পারে না, কেন যে ক্রাশের বই একটাও পড়তে ইচ্ছে করে না তার। কথামালা যদিবা পড়ে রস পেয়েছে, বোধোদয় পড়তে গিয়ে গিয়ে জ্বব আসে। কি গুরু-গম্ভীর সব শব্দের সমাবেশ! এতও জানে পৃথিবীর পত্তিতেয়া! পাতার পর পাতা, কত কি ছাই-ভস্ম লিখে রেখেছে, তাই আবার কষ্ট করে সব ছেলেবেই পড়তে হবে বাহুরের ভাবী ইচ্ছে হয়, পুরাকালের রামপুত্রের সহচর ময়ূপুত্র হ'তে। তা না হ'লে, সঙ্গরপুত্র; নিভাস্ত পক্ষ বোটাল-পুত্রের ভাগ্যটা যদি সে পেয়ে যেত তা হলেও চলত। শাদা ঘোড়া, স্বালর বেগুয়া আসন, রামপুত্র বসে আছেন, আগে আগে চলেছেন। বাহুর পিছন পিছন একটা লাল অথবা কালো বা পাওয়া যায় সেই রঙের ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসে বলে—হাট ঘোড়া, হাট—

দৱজা দিয়ে মাকে ঢুকতে দেখে বাহুরের মনে রূপকথার আমেজ কেটে যায়।

সাদনা দেবী কৃত্রিম ক্রোশ প্রকাশ করে বলেন—তাই বলি, বাহুর এত লম্বা ছেলের মতন কোথায় গেল? সাড়া শব্দ নেই। ওমা, কি শেটুক ছেলে হয়েছিল তুই! এই হুপুরে এক পোয়ার

উপর মাংস পেলি, এর মধ্যেই এত ক্ষিপে শেষে গেল—গোটা পেপেটাই শেষ! এখন তোর বাবাকে কি খেতে দি, বল? উনি তেজ আর মাংস খান না।

মায়ের কথায় বাহুরের আনন্দমাঝে কিছুমাত্র আঘাত লাগে বলে মনে হয় না। সে বাকী কাটাটা ভাড়াভাড়া শেষ করে বলে—মা, তুমি বড় কম করে খেতে যাও, আর একটু যদি ভাত আর মাংস বেশী করে দিতে তাহলে তো আর পেপেটাই খেতাম না।

সাধনা দেবী পুত্রের অদৃষ্ট বৃত্তি শুনে অতিকষ্টে হাসি দমন করেন। বাহুরের মাথায় নতুন চিন্তা খেলে যায়, সোংসাহে বলে—মা, মা, ঠিক হয়েছে, চল বাগানে আমাদের সঙ্গে। আমরা পাকা পেপে পেড়ে দেব চার পাচটা, কালকে দেবেছিলাম, আমাদের মধ্যে তৈরী হয়ে গেছে নিশ্চয়।

—হ্যাঁ, এই সম্ভাব্যতার পেপে পাড়তে গিয়ে শেষকালে সাপের মুখে—

হঠাৎ স্মরণ হয় সাধনা দেবীর রাত্রির আধারের কথা। বিশেষ অসাব্যস্তা ত্রিভিতে সাপের নাম করা উচিত হয় নি। তিনি অধিলম্বে তিনবার আত্মিক-আত্মিক, গরুড়-গরুড় বলে বুকুর কপালে ঠেকান, মা মনসার নিকট গোপন প্রার্থনা জানান। কে যেন একবার ত্বর দেখিয়েছিল বাহুরের ফাঁড়া আছে বার বছরের মধ্যে, সম্ভব অসম্ভব সমস্ত ব্রহ্মের ভীতি ও আশঙ্কায় আন্দোলিত হয় মায়ের মন, বাহুরের নিকে আর একবার তাকিয়ে কথা বুঝিয়ে বলেন সাধনা দেবী—

তুই নাকি ছড়া বামিয়েছি, শোনাবি বল্দি, শোনালি না তো?

ছড়াটা বাহুর বানায় নি, ওচনা করেছে পিনাকী। বাহুর শুধু দু'একটা শব্দ ঘোণান দিয়েছে এবং স্নেহের উপর লিখেছে। চার লাইনেই শেষ, মনের মতন ছড়া। অল্প সময়ের মধ্যে বাহুরের মৃৎ হয়ে যায়। 'মানবের আতিশয্যে থাকে ছড়া শোনাতে এসে থমক খেয়েছে জুপুবোলা, তখনো কারুনি খাওয়ারাওড়া হয়নি। সাধনা দেবী বাহুরের তরকারীর কড়াই নামাতে বাস্ত, এমন সময় ভাঙ্গা স্নেহ হাতে বাহুরের প্রবেশ।

—মা, শোন, শোন, ছড়া বামিয়েছি, আমি আর পিনাকী—

নীল জল টলমল।

চোখ করে ছলছল।

প্যাট কেন ঢলঢল।

মাংস খেয়ে গিয়ে বল।

বাহুরের কথায় অন্তরমনস্ক সাধনা দেবীর হাত ফসে আর একটু হলে তরকারীর কড়াই পড়ে যেত, বিরক্তভাবে বলেন—রাখ, রাখ, ছড়া রাখ, এখন ছড়া শুনবার সময় নয়!

শিবানী তখন মাঘের পাশে রান্নাঘরের দরজা ঘেঁষে একটা লম্বা বেকের উপর বসেছিল। সামনে তাকিয়ে, আনমনাভাবে। বাহুরেব মাঘের তিরস্কার তার কানে বাধ। তাবে, ছড়া বামিয়েছে কে—
 পিনাকী না বাহুর ?

প্রথমটা যখন বাহুর ও পিনাকী বাড়ী ফিরল, শিবানীর অভিয টের পায়নি কেউই তখন। শিবানী ছিল ঘরের ভিতর। কেরোসিন কাঠের স্বয়ংলা টেবিলের উপর রাখা বইগুলি উলটিয়ে-পালটিয়ে দেখছিল। ছেড়াপাতা পুস্তক কয়েকখানা বই, তার তলায় লালমলাটের নতুন খাঁচের একদারসাইড বুক, সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। খাতা খুলতেই চোখ পড়ে প্রথম পাতায়, পরিষ্কার বড় বড় অক্ষরে নাম লেখা—ত্রিপিলাকী চক্রবর্তী, কোর্থ স্কান, জে, 'লি, কলিম্বিয়েট স্কুল,—এন, সরকারি স্ট্রিট, বলিকাতা। পরের পাতায় লাল নীল পেলিলে খাতা তারতবারের হানচিত্র। খেপ হৃদয় তো! শিবানী পাতা উলটে চলে।

(ক্রমশঃ)

ছড়ার সুরে পড়ে।

ত্রিবিষ্মনাথ দে

লাল বড়ি নীল বড়ি
 শাক পাতা চচ্চড়ি।
 এই নাও লিপি—
 রান্না করেছি দিদি
 টক-ঝাল-মিষ্টি।

তাতে দিই হিং—
 চীনেম্যান্ বলে এসে
 চ্যাঙ-চ্যাঙ-চিঙ,।

গুনেছিস্ বন্ধা
 পাঁচসের লঙ্কা—
 খেতে লাগে মিষ্টি
 একি অনাছিটি।

বন্ধাটা এই গুনে
 দশবার গুনে গুনে
 ফ্যাচ, ফ্যাচ, হাঁচলো—
 তারপরে কাশলো।

সাদা সাদা টোন স্নুতো
 কানা মুচি ছেঁড়া জুতো।
 মুচি যাবে বাড়ীতে—
 চ'ড়ে ট্রাম গাড়ীতে।
 হাঁটে মুচি খুই খুই
 ছুঁটি পায় লাল বুট।
 বুটে নেই ফিতে—
 ফিতে জোড়া ডুবিয়েছে
 এক বাটি ঘি-তে।

চুল নয়তো, ঘেন কাকের বাসা!

হুলো, ময়না, খুসকী আর জট—সব মিলিয়ে সত্যিই আপনান্নর চুল কাকের বাসার মত বিস্তীর্ণ হয়ে ঝাঁড়তে পারে। ভাল চুলের অধিকারিণী হতে হলে চুলের বস্তু আপনাকে নিতেই হবে। কোন রকমে একটু তেল দিয়ে তাড়াতাড়ি আন সারলে চুল কিন্তু তার খান্স থেকে

বঞ্চিত হয় আর ক্ষুধার্ত চুল না খেতে পেয়ে গুকিয়ে অকাল-বাত্ব্য ডেকে আনে।

চুলের বস্তু নিতে হলে কতকগুলি অতি অল্পা কৰ্তব্য আপনাকে নিশ্চয়ই

পালন করতে হবে; যেমন চুল পরিষ্কার করে আঁচড়ে বাঁধা, সপ্তাহে একদিন করে মাথা ঘষা ইত্যাদি। প্রতিদিন নিয়মিতভাবে অন্ততঃ দশ মিনিট জবাকুসুম দিয়ে চুলের গোড়াগুলিকে

মাশিন করতে চুলবেন না। জবাকুসুম তেল শুধু অগচ্ছ বিতরণ আর

সাদু সিদ্ধ করেই কাস্ত হয় না, সেই সঙ্গে আপনান্নর চুলের ষোণাক জুগিয়ে তাকে

হৃদয় আর প্রাণবন্ত করে তোলে।



জবাকুসুম



সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ

জবাকুসুম হাউস, ৩৪, চিত্তবল্লভ এভিনিউ, কলিকাতা-১২

১৯৫২.৪

১১৭, আর্দেনিয়ন ষ্ট্রিট মাদ্রাজ-১

সাইক্লিট

সবার সেরা



ইন্ডিয়া সাইকেল

সাইক্লিট (হকম ইন্ডিয়া সাইকেল) যে দবার সেরা একটা নাম। বিশ্বের বিখ্যাত ইন্ডিয়া সাইকেল কোম্পানিতে 'সাইক্লিট' এবং কখনো অস্বীকার্য।

আমাদের অস্বাভাবিক মূল্যে দেখতে পাবেন।

ইন্ডিয়া সাইকেল ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিঃ কলিকাতা-১

ছেলেমেয়েদের জন্যে আবেকটি সহজ গিবস্ ডেন্ট্রিফ্রিস্ চিত্র প্রতিযোগিতা লোভনীয় পুরস্কার !



প্রথম পুরস্কার:
২০০০ বাইশাইকেন ---



দ্বিতীয় পুরস্কার:
৫০০, ৫০, ১০ টি মাসের মাস



তৃতীয় পুরস্কার:
১০ টি মাসের মাসের মাস

এবং আরও ১০০ টি লোভনীয় পুরস্কার:

এই ছবিটিতে স্নেহ মাও। এটি এত সহজ, এত মনোরম! তুমি এমন কিছু একটা কিতবে যেতে পার বা পাওয়ার ইচ্ছে তোমার মনে কখনো নেই। তুমি ওয়াটার কালার, রাউন্ড পেনসিল, রাউন্ড চক বা যে কোন রং তোমার কাছে আছে ব্যবহার করতে পার। তুমি ছবিটিকে কত পার সুন্দর কর। তারপর ছবিটি আমাদের কাছে পাঠিয়ে দাও— গিবস্ ডেন্ট্রিফ্রিস্ মাসের ওপরে সেলা। কোনও মোড়কের ওপরের গিবসের শীট শুদ্ধ। দ্বিতীয় বর্ষ তোমার একটা গিবস ডেন্ট্রিফ্রিসের কোটা কিনে দিতে। প্রতিবছর ব্যবহার কোর কিছু ওটা। তিনজন বিচারক নিয়ে তৈরি একটি গোল্ডেন বিজ কমিটি যোগ্যতাসহ কোন ছবিগুলি সিলেক্ট। আচ্ছা বোম্ব দাও এই নিয়মগুলি মনোযোগ দিয়ে পড়: ১। ভারতের অধিবাসী ১৪ বৎসর বয়স পর্যন্ত সব ছেলেমেয়ে এই প্রতিযোগিতায় বোম্ব দিতে পারে। ২। তুমি কতগুলো ইচ্ছে ছবি পাঠাবে পার কিন্তু প্রতিবার ছবির সঙ্গে গিবস্ ডেন্ট্রিফ্রিস্ মাসের ওপরে সেলাকোনের মোড়কো ওপরের গিবসের শীট পাঠাতে হবে। ৩। তোমাদের ছবিগুলি এই ঠিকানায় পাঠাও: গিবস্ ডেন্ট্রিফ্রিস্ কন্টেক্ট, পো: অং বক্স নং ১০১১২ বোম্বাই ১। ৪। ৩০ মে আগস্ট, ১৯৫৮ অবধি বর্ষাব্যাপী বোম্বা ১ টার মধ্যে একদো আমাদের কাছে পৌছন দরকার। ৫। যদি কোন ছবি হারিয়ে যায় পৌছতে দেয়ী হয়, এদিক ওদিক হয়ে যায়, অথবা খারাপ হয়ে যায় তার ক্ষেত্রে কোম্পানী দায়ী হবেননা। ৬। ১ম, ২য় এক ও ৩য় পুরস্কার বাছা পাবে তাদের নাম এই পত্রিকার নতুন সংখ্যায় বোম্ব দাও কক্ষ হবে। অস্বাস্থ্য পুরস্কার বিবেচ্যদের ডাক মারফৎ জানানো হবে। ৭। কোন একত:



নাম _____

আমি জানাচ্ছি এই ছবিটি বিনামূল্যে

আমার ঠিকানা _____

আমার নিজের হকেলা এবং আমার

বয়স— _____

বয়স—

প্রতিযোগী একটির বেশি পুরস্কারের অধিকারী হতে পারেন।
৭। বিচারকদের মতামতই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে এবং
প্রত্যেককে মেনে নিতে হবে। ৮। এই প্রতিযোগিতার
ব্যাপারে কোন চিঠিপত্রের আদান-প্রদান চলবে না।

গিবস্ ডেন্টিফ্রিস্

দাঁত ভাল পহিঁকার করে,
স্বাধ ভাল, আর চলে অনেক দিন।



পরিবর্তন



পুত্রের ছুটির পরেই মিনি ফিরলো যখন দেশে,
কলকাতাতে এসে

চললো ছুটে পানের বাড়ী, বিনী যেখানে আছে।
কী দেখেছে ছুটির ক'দিন বলবে সে তার কাছে—
কবুনা পাহাড় ঘাটের ধারে ফুলের রাশি ফোটে
ছোট্ট নদী নিরবধি বালুর চরে লোটে।
সকাল সীকে বেড়িয়েছে সে কতই খুশী বনে
দল বেঁধে সব চড়ুইভাতি শালের বনে বনে।
হরেক বকম হৈ-হুন্স। করলো সাগা মিনই
বিনির কাছে আদর্শে গেলো বলতে সে সব মিনি।

মেধা হতেই মিনির সাথে বন্ধু বিনি বলে

অবাক হুতুহলে—

"কিন্তু তোরা কবে মিনি? সত্যি, ওমা! এ কি—

আজব ব্যাপার দেখি।

চেহারাটা বললে গেছে,—স্বাস্থ্য গেছে কিরে,

রক্তের জলস্রব জোর বেড়েছে। ব্যাপারখানা কি রে?



মিনি বললে "খুব ঘুরেছি, কবুনা নদীর লেকে
স্নান করেছি গা ধুয়েছি 'মার্গো সাবান' মেখে।
ওঃ হয়েছি বর্ণা ভাতাই, স্বাস্থ্য হোলো ভালো—
শরীরটা তাই আমার আরও হয়েছে জমকালো।"
এই না বলে হাসলো মিনি, টোটেব কাঁকে ঠাক,
মুক্তো সম পাতগুলি তার বলতে বেন থাকে।
বিনি বললে, 'পাতগুলি সাফ করলি কি কৌশলে?'
মিনি বললে, 'নিম ইথপেট' ব্যাভার করার ফলে।

দ্বি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ কত্ ক প্রচারিত

বোম্বাই

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

বোম্বাই।

সেন্ট্রাল ষ্টেশনে এসে নামলায়, রাত তখন সাড়ে আটটা।

ষ্টেশনের বাইরে এসেই চোখ বুলসে গেল। আলো আর বাড়ীর জৌলুস। বড় বড় পথ, উঁচু উঁচু বাড়ী, চমক্কার দোকান, আলোর আলো, জমকালো শহর। কলিকাতার চেয়ে বোম্বাইয়ের চমক অনেক বেশী।

ক্রফোর্ড মার্বেটের পাশে বাঙালী হোটেল। এইখানেই আমাদের থাকার কথা ছিল, পথের উপর দুটি সীটের একখানি ঘর পেলাম দোতলায়। বোম্বাই শহরের জুলনার চার্জ অনেক কম—দৈনিক তিনটাকা মাত্র, তবে টিকিনের ব্যবস্থা নেই, সেটা পৃথক বরচে নিজেদের ব্যস্থা করতে হবে।

বোম্বাইয়ে আমাদের প্রোগ্রাম ছিল—এলিফান্টা, কান্‌হেরি ও যজ্ঞেশ্বরী গুহামন্দির দেখা, স্থিতি হলে দাদারে দু'একটি কিন্নটুডিওতে হুটিং দেখা, ও জুহু সমুদ্রতীরে ঘুরে আসা। কিন্তু প্রথম দৃষ্টিতেই বোম্বাইয়ের যে রূপ চোখে পড়লো, তাতে এইটুকু ব্যতীত যে, এই শহরে আমাদের মত লোকের পক্ষে সহজভাবে ঘোরাকেরা করা, সহজ ব্যাপার নয়। প্রভাস বললো—শহর বা দেখছি, এখানে তো হারিয়ে যাওয়া।

কথাটা সত্য। এই শহরে ঘোরাকেরা করতে হলে একজন সবজাতীয় দর্শীর প্রয়োজন। ভবেশ বলেছিল—বোম্বিতে আমি ক'দিন থাকবো, আপনারা বোম্বাই পৌঁছেই আমাকে টেলিফোন করবেন।

ভবেশের দাদা থাকেন বোম্বিতে, ভবেশ আগেও ক'বার এখানে এসেছে।

ভবেশ টেলিফোন পেয়েই বললো—কোন তারনা নেই, আমার সব জানা-চেনা, কাল সকাল থেকেই বেকখে। ন'টার সময় তৈরী থাকবেন।

নিশ্চিন্ত হলাম।

তারপর পুরো চারটি দিন একটানা চললো প্রোগ্রাম—বোম্বাই দর্শন। কখনো বাসে, কখনো ট্রামে, কখনো বা পনক্রয়ে। সত্যিই ঘুরে বেড়ানোর মত শহর এই বোম্বাই। এমন পরিচ্ছন্ন, এমন জমকালো, এমন মনোরম শহর আর আমাদের চোখে পড়েনি।

বোম্বাই শহরটি মনে হয় বেশ নতুন শহর; অধিকাংশ বাড়ীই মনে হয় নতুন তৈরী হয়েছে।

প্রশস্ত পথের উপর যত বাড়ী সবই প্রায় ছ'তলা। পুরানো অঞ্চলে দোতলা তিনতলা বাড়ীও কিছু কিছু আছে, তবে ছ'তলা বাড়ীর দিকেই বোম্বাইবাসীর ঝোঁক বেশী। কিন্তু বাড়ীগুলিকে ছ'তলা না বলে সাততলা বলাই ভালো। পথের উপরে ছ'তলা দেখা যায় বটে, মাটির নীচেও একটি তলা আছে। এই নীচের তলায় কোথাও বসে ইতুল, কোথাও থাকে মালপত্র আবার কোথাও বা মোটর গাড়ীর গ্যারেজ। এই ঘরগুলির মধ্যে ঢুকলে আমাদের বোম্বা পড়ার যুগের 'অশ্রয় কক্ষগুলির' আঁটার গ্রাউন্ড সেলটারের (underground shelter) কথা মনে পড়ে।

শহরের সর্বত্রই টেট্রাল চলে। তবে আমাদের মত ভিড়ে ঠেলাঠেলি হয় না। সবাই লাইন দিয়ে অপেক্ষা করে, নামার লোক আগে নামে, ওঠার লোক ওঠে তারপর। কোন বাসে অতিরিক্ত ভিড় করার সুবিধা নেই, বাস ভিড় হয়ে গেলে আর লোক উঠতে দেওয়া হয় না।

ট্রামও আছে। তবে কলকাতার মত শহরের সর্বত্র ট্রামলাইন নেই। ট্রামগুলি পুরানো লোকের দরপের। ট্রামে কোন সময়েই বাজীর ভিড় দেখেনি।

এখানকার ট্রামে-বাসে কোন পথের নাম দেখা থাকে না। ট্রামের মাধ্যম থাকে নম্বর—১০, ১৩, ১৬, ইত্যাদি। আর বাসের মাধ্যম থাকে অক্ষর—এ, বি, সি, পি, আর, এন্স, ইত্যাদি। এক এক নম্বর ও এক এক অক্ষরের এক একটি রুট। সেই রুট জানা না থাকলে বড়ই অসুবিধা।

বোম্বাইয়ের মধ্যে ইলেকট্রিক ট্রেনের অনেকগুলি স্টেশন আছে। কাচাকাছি স্টেশন থেকে ট্রেনে উঠে লোকের বরাবর চলে যায় শহরের বাইরে। সেজন্য ট্রামে-বাসে ভিড় কিছুটা কম হয়। কিন্তু আপিস টাইমে ইলেকট্রিক ট্রেনে ভিড় কম হয় না। আমরা ট্রেনে বাজীদের খুলে বেতেও দেখেছি। তবে দেখানোও ওই একই কথা। কোন স্টেশনে ট্রেন এসে থাকলে আগে বাজীরা নামবে, তারপর উঠবে। থাকঃধঃকি, হটোশাটি নেট। বোম্বাইয়ের লোকদের শিক্ষা ও সংস্কম কলিকাতার মাহুষদের চেয়ে উন্নত।

আমরা বোম্বাই শহরটি ছোট। পশ্চিম ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ বন্দর ও ব্যবসার কেন্দ্র। অল্প স্থানে বেশী মাহুষের সংস্থান করার জন্যই বোধ হয় নতুন বাড়ী বা কিছু হচ্ছে সবই। সাততলা,— নীচে একতলা, উপরে ছ'তলা। কিন্তু অধিকাংশ লোকই কাজকর্মের জন্য বোম্বাই আসে, থাকে শহরের বাইরে। বোম্বাইয়ের উপকণ্ঠ পল্লার মাইল অবধি বিস্তৃত। দানার, শাক্তীকৃত, ছুর প্রভৃতি বোম্বাইয়ের বাইরের পল্লী। এই সব পল্লীর সঙ্গে বোম্বাইয়ের একমাত্র বোগাযোগ ইলেকট্রিক ট্রেন। এই ট্রেন চলে স্তোর চারটে থেকে রাত বারোটা অবধি। (অবশ্য বোম্বাইয়ের সত্যিকারের সকাল হয় সাতটার সময়। কলিকাতার ঘণ্টাখানেক পরে বোম্বাইয়ে সূর্যোদয় হয়।) প্রতি দু'তিন মিনিট অন্তরই এক একখানি করে ট্রেন ছাড়ে। টাইম টেবিলের কোন বালাই নেই।

এতি প্ল্যাটফর্মে একটি বড় ঘড়ি
আর বোর্ড আছে। পনের ট্রেন
ক'টার ছাড়বে, ঘড়ির কাঁটার
তার নির্দেশ দেওয়া থাকে, আর
কোথায় থামবে বোর্ডে তা লেখা
থাকে; সেই লেখা না দেখে ট্রেনে
উঠলেই মুহুর্ত—সব ট্রেন সব
জায়গায় থামে না। আমরা
একদিন লেখা না দেখে ট্রেনে
উঠেছিলাম জুহু ঘাব বলে, সে
ট্রেন জুহুর তিন স্টেশন পরে
গিয়ে থেমেছিল। বোম্বাইয়ের
বাইরের বস্ত লোক এই ট্রেনেই



মালাবার্‌হিলস থেকে বোম্বাই শহর

ঘাতারাত করে। আট-দশ বছরের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও নিত্য এই ট্রেনে এসে শহরের
ইন্ডুলে হাঝিরা দিয়ে যায়। ইন্ডুল টাইমে এই সব ট্রেনে ছোট ছেলের ভিড় বেশ থাকে।

ইন্ডুল বোম্বাইয়ের একটি বিশেষত্ব। পাড়ায় পাড়ায় ইন্ডুল। আবার ইন্ডুলে ইন্ডুলে এতি
সপ্তাহেই ছেলেরা এক-একদিন 'আউটিং' করে। পথে প্রায়ই চোখে পড়ে ছেলের দল হার্ট করে
যাচ্ছে, সঙ্গে দু'চারজন শিক্ষক। বাইরে কোন পার্ক বা দর্শনীয় স্থানে গেলে দেখা যায় ইন্ডুলের
ছেলেমেয়েরা সেখানে বনভোজনে ব্যস্ত। গুবানকার ছেলেমেয়েদের বেশ চটপটে ঢালাক-চতুর ভাব
দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

ইলেকট্রিক ট্রেনের সুবিধার জন্য বোম্বাইয়ের উপকণ্ঠের উন্নতি হয়েছে খুবই। নতুন নতুন
বাড়ী, সবই আধুনিক ধরনের চার পাঁচতলা। দরব্রাই থেন ছোট-খাটো এক একটি বালিগঞ্জ।

বোম্বাই নগরটি চাঁদের মত। দুটি মুখ দু'দিকে সমুদ্র বক্ষে এগিয়ে গেছে ধনুকের মত। এক
মুখে কোলাবা, আরেক মুখে মালাবার পয়েন্ট। এই এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত সমুদ্র
তীর ধরে প্রশস্ত পথ—মেরিন ড্রাইভ্‌। এই পথেরই এক অংশের এখন নার হয়েছে নেভাজী
স্বভাব রোড। এই রাস্তার পাশ দিয়েই সমুদ্র তীরে প্রশস্ত ফুটপাথ, ভ্রমণ-বিলাসীদের জন্য এই
ফুটপাথের পাশে পাশে সারি সারি বেঞ্চি পাতা আছে। পথের আরেক দিকে নতুন ভিক্টোরিয়ার
বস্ত বিরাট বিরাট ছ'তলা বাড়ী। এই মেরিন রোডের শেষেই চৌপটি। সেখানে দাগর তীরে



‘বুড়ীর জুতা’—কমলা বেহের পার্ক
মালাবার হিলস্

বহু পুষ্কা, পকোড়ী ও দহিষড়ার ফেরিওয়ালারা বসে দফ্ফার সময়। এই খড়্গের উপর বোম্বাই বাণীদের লোভ খুব। বড় বড় মোটর নিয়ে তারা এখানে আসে এই সব খেতে।

মালাবার পয়েন্টের দিকে এই পথের উপরেই মালাবার হিলস্। ছোট একটি পাহাড়। সমুদ্রের তীরেই। পাহাড়টির উপর ধাপে ধাপে ফুলের বাগান, ঘরের পর গুহ উঠে গেছে। পথের আরেক পাশ দিয়ে সেই বাগানই ধাপে ধাপে নেমে গেছে সমুদ্র বেলার, জলের কিনারা অবধি। এই অংশটুকুর নাম কমলা মেহের পার্ক। এই পার্কটি অতীব রমণীয়। রকমারি রঙীন ফুলের কাপেট বিছানো চারিপাশে, মাঝে একটি ঝরনা, তার উপর হৃদয় পূলা। এক পাশে একটি জুতোর

আকারের দেতলা একখানি বাড়ী, নাম ‘বুড়ীর জুতা’, ওল্ড্ লেডিজ্ শ্ (old lady's shoe)। সিঁড়ি দিয়ে এই বাড়ীর মোতলার উঠলে, ছাপে উঠলে, চারিপাশের নয়নাভিরাম দৃষ্ট আরো মনোহর হয়ে চোখে পড়ে,—মালাবার হিলস্, ফুলের শোভা, ঘেরিন ড্রাইভ, সাগর-বিগল সব মিলিয়ে যেন একখানি অপূরণ ছবি চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। মালাবার হিলস্‌র পাশেই আরেকটি পার্ক আছে, তার নাম ফিরোজ শাহ্ মেটা পার্ক। আগে এর নাম ছিল ঝুলন্ত বাগান—হ্যাংগিং গার্ডেন (hanging garden)। অবশ্য বাগানটি শূন্যে ঝুলছে না, এই বাগানের নীচে বোম্বাই নগরের জলাধার আছে, খিলানের উপর বাগানটি, তাই এই নাম দেওয়া হয়েছিল। এই পার্কের সামনে কংগ্রেসী প্রত্যাধা ফিরোজ শাহ্ মেটার একটি স্মরণমূর্তি আছে।

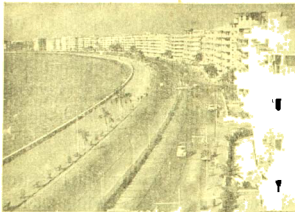
গম্ভ্যাবেলা সমুদ্রের ধারে, এই উজ্জানগুলি নানা রঙের আলোকমালায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তখন মেরিন ড্রাইভের অল্প দিক থেকে মালাবার হিলস্‌র পানে তাকালে মনে হয় এ বুঝি কোন স্বপ্নপুরী, আরবা উপত্যকাসের কোন নগর রূপকথার বই থেকে বাস্তব হয়ে উঠেছে। বোম্বাইবাসীরা সত্যিই তাদের নগরীকে হৃদয় করতে জানে।

খিলাতে সাহেবদের কাছে তারতভূমির পরিচয় দেওয়া হয়—জম্বল, বাব-সাপের দেশ, মাহুগগুলি অন্তত। তাদের মধ্যে তাদের এখানে আসার সৌভাগ্য হয় তারা মাহাজ থেকে নেবেই বিন্মিত হয়ে যায়, বলে—এ তো লণ্ডন শহরেই এসে পড়েছি। এ যে ‘লণ্ডন অফ দি ইষ্ট।’

বোম্বাই-এর এই উন্নতি অবশ্য ইংরেজদের চেষ্টাতেই হয়েছে। বোম্বাই আগে একটি নগণ্য জনপদ ছিল। এখন যেখানে এস্প্রানোড, সেখানে আগে মুম্বাই দেবীর এক মন্দির ছিল। মুম্বাই হলের মহাশায়া। সে মন্দির অবশ্য এখানে এখন আর নেই, এখন নতুন মন্দির উঠেছে তেতীবাড়ারে। কিন্তু এই মুম্বাই দেবীর মন্দির থেকে মারাঠারা এখানকার নাম দিয়েছিল মুম্বাই। তাই থেকেই নাম হয়েছে বোম্বাই। আবার কেউ কেউ বলবে—না তা নয়। এখানকার ভাষায় ওই স্থানটির প্রাকৃতিক দৌন্দর্ভের সমস্ত স্থানীয় লোকেরা বলতো—‘বোন বাহিয়া’ (Boun Bahia) অর্থাৎ হুম্বর বর্গভূমি। সেই দু’টি শব্দ এক সঙ্গে যুক্ত হয়ে হয়েছে বোম্বাই। অবশ্য হুম্বর বর্গভূমি কথাটা মিথ্যা নয়, বোম্বাই সভ্যই হুম্বর।

এ যুগে বোম্বাইকে বড়টা রমনীয় করা হয়েছে, এই স্ত্রী মধ্যযুগে ছিল না। বোম্বাইয়ের চারপাশে অনেকগুলি ছোট ছোট দ্বীপ আছে, এগুলি বন্দর হিসাবে বোম্বাইয়ের উপযোগিতা অত্যধিক। কিন্তু মোগল যুগে মোগল সম্রাটরা নৌবহর নিয়ে বেশি মাথা ঘামাতেন না, জলপথের দিকে তাদের বিশেষ দৃষ্টি ছিল না, স্থলপথ দিয়েই ভারতভূমি বার বার আক্রান্ত হয়েছে, স্থলপথের দিকেই তাঁরা ছিলেন সজাগ। এই নগরটি ছিল অনাহত। এই দিকে, এই সব দ্বীপে সেই কারণে পতুর্গীজ হার্মাদিদের ছিল একাধিপত্য। বোম্বাইয়ে তারা রীতিমত কতৃৎ করতো। পতুর্গালের রাজকর্তার সঙ্গে বিভীষ চার্লসের যখন বিয়ে হলো, তখন পতুর্গালের রাজা বোম্বাই নগর যতুক দিলেন মেয়ে-জামাইকে। ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী তখন এই সেনে ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করেছে, ইংরাজ রাজ তাদের হাতে এই নগর ইজারা দিলেন, বার্ষিক দশ পাউণ্ড খাজনায়। কোম্পানী এখানে কুঠা বানালো, কেজা তৈরী করলো, ব্যবসার একটা বড় কেন্দ্র গড়ে তুললো। তারপর কোম্পানীর হাত থেকে মহারাষ্ট্র যেমিন সমগ্র ভারতের শাসনভার গ্রহণ করলেন, বোম্বাইও সেমিন কোম্পানীর হাত থেকে চলে গেল। তারপর এই নগরটি দ্রুত উন্নতি হতে শুরু করে এবং পশ্চিম ভারতের প্রথম বন্দরে পরিণত হয়। চারিপাশেই সমুদ্র, তাই চারিপাশেই বন্দর। তবে প্রিন্সেস ডকটি সব চেয়ে বড়। এটি তৈরী করতে ইংরেজরা আটবটি লক্ষ টাকা খরচ করেছিল।

বড় ব্যবসায় কেন্দ্র জনবহুল হবেই। বোম্বাই জনবহুল নগর। ভারতের সব রাজ্যের মানুষই এখানে আছে। কিন্তু বেশকিছু দেখে বোম্বাইর উপায় নেই, কে কি! সবাই প্যাণ্ট পরে। তবে পার্শ্ববর্তী চেনা দায় সাধারণ টুপি দেখে, আর গুজরাতীদের হুঁতি পরায়। দাঁরা প্যাণ্ট পরে না, তাদের পরনে সাধারণ। তবে যে বাই পুরুন সবই মোপদ্রুত। মরলা জামাকাপড় পরার রেওয়াজ এখানে নেই বলতে চলে। বন্ধুর বাড়ীতে বসে আছি বাড়ুনার এলো নর্দমা সাক্ষ করতে, তার



বোম্বাইয়ের সমুদ্রতীরের শ্রেষ্ঠ পথ—নরিন ড্রাইভ

একবার এনে নিয়ে যায়। পথে অনেক ল্যাম্পপোস্টের গাছ ছোট ছোট টিনের পাত্র বাঁধা আছে, পথচারীরা কাপড়ের টুকরো, সিগারেটের টুকরো সেই সব পাত্রের মধ্যে ফেলে। ঝাড়ুদারদের রাস্তা ঝাঁট দেবার জন্য বার বার হেঁট হয়ে কোমরে বাধা ধরাতে হয় না। এক এক গাছি লাঠির সঙ্গে এক একটি ঝাঁটা বাঁধা থাকে, ঝাড়িয়ে দাঁড়িয়েই পথ ঝাঁট দেওয়া চলে।

বোম্বাই শহরের আরেক বিশেষত্ব হলো তার প্রকাণ্ড স্ট্রাট বাড়ীগুলি। ছ'তলা বিরাট বিরাট এক একগুনি বাড়ী। তার মধ্যে ছোট বড় অসংখ্য স্ট্রাট। এক একটি স্ট্রাটে এক একটি পরিবার। কেউ মাসিক ভাড়ায় আছে, আবার কেউ স্ট্রাট কিনেও নিয়েছে। এখানে স্ট্রাট বিক্রী হয়। ভবেশের দাগা এমনি এক স্ট্রাট কিনে বাস করছেন। তিনতলার দু'গুনি ঘর, একগুনি রান্নাঘর, গায়নে একফালি ঢাকা বারান্দা, কল, পাঠখানা—মূল্য ১৬ হাজার টাকা। বাড়ীর মালিক সাধারণতঃ কোন যৌথপ্রতিষ্ঠান, বাসিন্দাদের স্বপ্ন সুবিধা দেবার স্বপ্নোন্মত্ত তারাই করেন। এতো উঁচু বাড়ীতে লিফ্ট ছাড়া চলে না, সে জন্য প্রত্যেক বাড়ীতেই অটোমেটিক লিফ্ট আছে। বেল টিপলেই আপনি লিফ্ট নেমে আগবে, যে নখরের বোতাম টিপবে, সেই তলার গিয়ে পৌঁছে যাবে। বাড়ীতে বা স্ট্রাটে ঘোঁসার কোন উপজীব নেই, রাস্তা হয় গ্যাসে বা ইলেকট্রিক। এখানকার বাড়ীঘরের ট্যাক্স যুব বেশী। তা হোক, তবু একটা কথা সহজেই মনে ওঠে যে, এখানকার বাসিন্দারা নগরীর স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্যের কথা চিন্তা করেন।

এই স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতার দিকে দৃষ্টি আছে বলেই, এখানে ক্রীড়াশ্রিয়দের জন্য স্থানর একটি

পরনে ধপধপে সাদা হাফপ্যান্ট, হ্যান্ডশাট ও কেডস জুতো। হাতে ঝাঁটা না থাকলে তাকে ঝাড়ুদার বলে চেনার উপায় ছিল না।

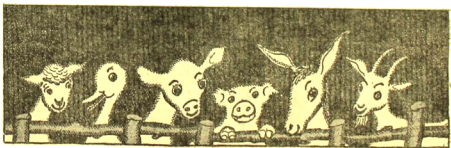
বোম্বাইয়ের ঝাড়ুদারদের অবস্থা কলকাতার চেয়ে অনেক কম মেহনৎ করতে হয়। আবার মত বাড়ীর অংশাংশ আন্তর্কুঁড় করে রাখা হয় না। যে বার সম্ভাব্য বাড়ীর মধ্যে বেধে দেয়, ঝাড়ুদার মিনে

ষ্টেডিয়াম আছে। সামনে পথের উপর প্রকাণ্ড ছ'তলা বাড়ী—কত লোকান, কত স্ট্রাট, আবার মাটির তলায় থোটোরের গ্যারেজ। পিছনে প্রকাণ্ড ষ্টেডিয়াম, পাকা সিমেন্টের গ্যালারী, দেখানে লক্ষাধিক লোক স্বচ্ছন্দে বসে যে কোন খেলা দেখতে পারে। এই ষ্টেডিয়ামটি দেখলে কলকাতার ক্রীড়ামোদীরা বোম্বাইবাসীকে হিংসা করবেন নিশ্চয়ই।

বোম্বাইয়ের পৌরপ্রধানেরা শহরবাসীদের জন্য যে চিন্তা করেন তার পরিচয় পাওয়া যায় চার্চ গেট ষ্টেশনের 'দাব ওয়ে' দেখলে। বোম্বাই শহরে অনেকগুলি ইলেকট্রিক রেলপথের ষ্টেশন আছে। তার মধ্যে চার্চ গেট ষ্টেশনটাই সবচেয়ে হুম্বর। এটি নতুন তৈরী হয়েছে। উপরের তলে আপিস, আর নীচের তলে গ্যাটকর্ম। এই ষ্টেশনটি একেবারে শহরের কেন্দ্রে অবস্থিত। এখানে পথ পার হওয়ার জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়। সেইজন্য এই ষ্টেশনের সামনেই পারাপারের জন্য ভূগর্ভস্থ পথ করা আছে। কয়েকটা সিঁড়ি নামলেই প্রাণত পথ, আলো বাতাসের কোন অভাব নেই, মনে হয় যেন কোন ছাদওয়ালী বারান্দা দিয়ে চলে যাচ্ছে। স্বচ্ছন্দে পথের উপারে পৌছানো যায় গাড়ী চাপা পড়ার কোন ভয় থাকে না। এই সাবওয়ে দেখে কলকাতার চৌরঙ্গী অঞ্চলের কথা ও শিয়ালদা অঞ্চলের কথা বতঃই মনে পড়লো, এখানে সাবওয়েও হয় না, ওভারব্রিজও হয় না, বোম্বাইয়ের চেয়ে আমরা কত পিছনে পড়ে আছি।

বোম্বাই নগরে দর্শনীয় অনেক কিছুই আছে। বাজুঘর, চিত্রশালা, চলচ্চিত্র চিড়িয়াখানা, আপোলো বন্দর, প্রিন্সেস ডক, ফ্লোরা ফাউন্টেন, হাইকোর্ট, বিশ্ববিদ্যালয়, কামগড় ময়দান, ইত্যাদি। কামগড় ময়দান অংশ বোম্বাইয়ের মধ্যে একটি বড় মাঠ। এই ময়দানে বহু রাজনৈতিক সভা বসেছে। এরই পাশে বোম্বাই হাইকোর্ট ও বিশ্ববিদ্যালয়। এরই অঙ্গণের 'গোয়ালিয়া তলাও'। এই অঞ্চলে একটি গুজরাটি মন্দিরের চত্বরে, কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন বঙ্গ ১৮৮১ সালে। ফ্লোরা ফাউন্টেন শহরের নামকরা চৌমাথা, মাঝে একটি সুদৃশ্য ফোয়ারা আছে। আর তার সামনেই আছে বোম্বাইয়ের সর্বজনবরণ্য নেত্রী দাদাভাই নোরজীর একটি মর্মরমূর্তি।*

* কটা : ঐন্দরগতি রায়



বেজান্ন বেভুল

ত্ৰীপৰিতোষকুমার চক্ৰ

*

স্ট্যাণ্ডে এসেই ট্যান্সি প্ৰথম পেলেন বাবু যেটা,
দৰ্জা খুলেই তাড়াতাড়ি চড়ে বসেই সেটা—
সামনে কাগজ মেলে ধরে নজর রেখে তাতে—
বলেন, চালাও ট্ৰেন্টা আমার ধরতে পারি যাতে ।
মিনিট কুড়ির মধ্যে আমার হাওড়া যাওয়া চাই,
তা না হোলে ধরতে সে ট্ৰেন্ পাৰবো নাকো ভাই ।
এই না বলে হাতের কাগজ করলেন গুৰু পড়া,
চোখের তারা ঘোরা ছাড়া নেইকো নড়াচড়া ।
পাতার পরে পড়েন পাতা নেইকো কোন ছ'শ,
কোনো দিকেই নেইকো নজর বেবাকই বেহ'শ ।
এমনি ভাবে কাগজ পড়েই কাটিয়ে মিনিট বোলো,
বাইরে চেয়ে বলেন বাবু, এ কি রকম হোলো ।
এখনও সেই গলির মোড়, ওই তো তাঁরই বাড়ী,
যেথায় ছিলো ঠিক সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে গাড়ী ।
গাড়ী চড়ার সময় বাবু দেখেন নিকো ঘোটে,
ড্ৰাইভারটি আছে কিনা বসে তাহার সীটে !
এখন চেয়ে দেখেন তিনি সীটটা যে তার ঝাঁকা,
কি করে হয় চলবে গাড়ী, ঘুরবে সেটার চাকা ।
অশ্রুমনা হওয়ার এ-ফল বুঝতে পেরে শেষে ।
একা একাই হোহো হিহি মরেন কেবল হেসে ।

জন্মদিন

ত্রিশিউলি গুপ্ত

ভাওলা ও পানায় তারা পুহুটায় বৃড়ো কোলা ব্যাঙ, তার গিন্নী আর তার ছেলেনিলে নিয়ে বাস করে।

কর, কর, বৃষ্টি পড়ছে। বৃষ্টির মিকে চেয়ে চেয়ে বৃড়ো ব্যাঙ ভাবলে এবারে তার ছোট ছেলে চ্যাং-এর জন্মদিন উৎসব করবে। কিন্তু জন্মদিন মুখে বললেই তো আর হয় না। আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের নেমন্তন্ন করতে হবে। রীতিমত খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। একটু-আধটু গান-বাল্লনার ব্যবস্থা না করলে উৎসব জমে উঠবে না। ছানামা আছে। তা হোক,— বৃড়ো ব্যাঙ ভাবলে এতদিন বাসে ছেলেটা যখন হয়েছে, তার জন্মদিন উপলক্ষ্যে দুমখাম না করলে আত্মীয়-স্বজনেরা নিষেধ করবে। বন্ধুবান্ধবেরা টিটুকিরি দেবে।

বৃড়ো ব্যাঙ বৃড়ী গিন্নীকে ছেলের জন্মদিন পালন করবার কথা বলতেই গিন্নী বেজায় খুশি হয়ে বললে—“যেদিন চ্যাং জন্মেছে সেইদিনই তো জন্মদিন করতে হয়। বন্ধুদের মাঝখানে তো আর কেউ জন্মদিন করে না।”

বৃড়ো ব্যাঙ বললে—“যখন হয়েছে, সব কথা মনে থাকে না। তা চ্যাং জন্মেছে কবে কোন দিন? তোমার নিশ্চয় মনে আছে।

গিন্নী বললে—“আমারও বয়সটা কি কম হলো! আমারও ঠিক মনে নেই। তবে চ্যাং যেদিন জন্মেছিল, সেদিন খুব বৃষ্টি পড়ছিল। আজ যেমন পড়ছে।”

বৃড়ো একটু চটে গিয়ে বললে—“এটা কি একটা উত্তর হলো? কতদিনই তো বৃষ্টি পড়েছে।”

গিন্নী হোলায়েম হুয়ে বললে—আহা চটো কেন! বৃষ্টি পড়েছে অনেক দিনই, কিন্তু আমি একটা বিশেষ দিনের বৃষ্টির কথা বলছি। সেই যে চ্যাং হবার পর বৃষ্টি মাথায় করে তুমি তোমার বন্ধু খরগোশকে শুভ-সংবাদ দিয়ে এলে। তার নিশ্চয় দিনটা মনে আছে। তাকেই জিজ্ঞাসা করে এসো না। বৃষ্টি তো ধরে গেছে।

নাচার হয়ে ব্যাঙ ছুটলে সোম্বা খরগোশের বাসায়। বন্ধুর বাড়ীর কাছে এসে বৃড়ো ব্যাঙ হাঁকতে লাগল। কিছুক্ষণ বাস থেকে বৃড়ো ব্যাঙ হাঁক দিলে—“খরগোশ ভায়া! বাড়ী আছে।”

পেট মোটা খরগোশ তড়াক্ করে লাফিয়ে বেরিয়ে এসে বললে—“অসময়ে যে! খবর কি?”

ব্যাঙ একটু দম নিয়ে বললে—“আমার ছেলে চ্যাং কবে জন্মেছে, সে তারিখটা তোমার মনে আছে ? সেই বে আমি এসে তোমার খবর দিলাম।”

খরগোশ ঘাড় নেড়ে বললে—“তারিখটা তো সঠিক আমার মনে নেই। তবে স্পষ্ট মনে আছে যেদিন খুব বৃষ্টি পড়ছিল।”

খরগোশের কথা চাপা দিয়ে ব্যাঙ বললে—“সে আমিও জানি!—তাংলে উপায়।”

খরগোশ একটু ভেবে বললে—“বাক, ভাবনা নেই। ছাংলা তারিখটা জানে।”

ব্যাঙ অবাক হয়ে বললে—“সে আবার কে?”

খরগোশ উত্তর দিলে—“সে আমার পুরানো বন্ধু। তার কাছে চলো, সে খবরটা জানেও জানতে পারে।

খরগোশ ব্যাঙকে সঙ্গে নিয়ে বেশ কিছুদূর এগিয়ে একটা বড় আম গাছের সামনে এসে থমকনে গলায় হাঁক দিলে—“ছাংলা ভায়া বাড়ী আছিস্?”

ওপর থেকে কে যেন মিষ্টি গলায় উত্তর দিলে—“একটু দাঁড়াও, আমি ঘাচ্ছি। তারপরই তব্ভব্ করে গাছ পেরে নেমে এলো এক কাঠবেড়ালী।”

কাঠবেড়ালী অবাক হয়ে বললে—“ওমা! ব্যাঙ দাদা তুমি এখানে—ব্যাপার কি?”

ব্যাঙও বড় কম অবাক হলো না। একটু কেশে বললে—“ভায়ে তুই! তা তুই এখানে? বাক, তোর সঙ্গে দেখা হলো অনেকদিন পরে।”

কাঠবেড়ালী সাই দিয়ে মাথা নেড়ে বললে—“সত্যি দাদা, অনেক দিন পরে।”

ব্যাঙ প্রশ্ন করলে—“তা হঠাৎ বাগা বদল করলি কেন?”

কাঠবেড়ালী হাত পা মেড়ে বললে—“মাঘে কি করেছি, ঠোঁটের চোটে করেছি। আম গাছটার তো ছিলাম বেশ আরায়ে। হঠাৎ কোথা থেকে হাজার হাজার মূসে লাল শিংড়ে এসে উৎপাত আরম্ভ করলো। ছেলেশিলেগুলোকে কামড়াতে লাগলো। কি আর করি? গিন্নী বললে বাড়ী বদল করে ফেল। তাই চলে এদেছি এখানে।”

এর আগে পুকুরের পাশে ব্যাঙ-এর বাড়ীর খুব কাছে একটা বেশ বড় আম গাছে কাঠবেড়ালী, তার বউ ও ছেলেশিলে নিয়ে বাস করতো। প্রায় বছরখানেক আগে।

ব্যাঙ বললে—“তা তুই তোর নামটাও বদল করে ফেলেছিস নাকি বাড়ী বদল করবার সময়? আগে তো তোর নাম ছিল ক্যাংলা।”

ল্যাজ নেড়ে কাঠবেড়ালী উত্তর দিলে—“হ্যাঁ হ্যাঁ দাদা ঠিক বলেছ। ভেবে দেখলাম বাড়ী বদল করার সময় নামটাও বদল করা দরকার। তাই নিজের নাম দিয়েছি এখন ছাংলা।

খরগোশ এতক্ষণ অবাক হয়ে দু'জনের কথা মন দিয়ে শুনছিল। ব্যাঙকে সে জিজ্ঞেস করলো—
“তুমি ছাংলকে চিন্তে নাকি?”

ভূঁড়িটা দু'লিয়ে ব্যাঙ বললে—“আরে হ্যাঁ হ্যাঁ। ও আমার খুব চেনা। আমাদের পাড়ায় থাকত কিনা! তা এখনও যে নামটা বরলে কলেছে তা তো আর আমি জানিনা, নইলে ওর নামটা শুনলেই ওকে চিনি ফেলতাম।”

কান ছুটো পাড়া করে খরগোশ বললে—“আজ্ঞা, এবার কাজের কথা কওয়া বাক।”

তারপর সে কাঠবেড়ালীর মুখের দিকে চেয়ে বললে—“আজ্ঞা ব্যাঙ দাঁদার ছেলে চ্যাং-এর জন্মের তারিখটা তোর মনে আছে?—আছে বোধ হয়।”

ছাংলা বাড় নেড়ে বললে—“মোটাই না। সে তো তুমি সেই কবে বলেছিলে! তা এখন কি আর মনে আছে? তা হ্যাঁ তারিখ নিয়ে টানাটানি কেন?”

একটু হেসে খরগোশ বললে—“ব্যাঙ দাদা যে ছেলের জন্মদিন করবে। সেইজন্যই তো সঠিক তারিখটা মরকার।”

ছাংলা ব্যাঙকে বললে—“তা তোমার মেয়ে চ্যাং-এর তো কোনদিন জন্মদিন হয় নি।”

খরগোশ টিপ্তনৌ কাটলে—“বুলেনা একটা ছেলে,—তা আবার এতদিন বাসে!”

ছাংলা একটু ডেবে বললে—“আমার কিন্তু এইটুকু স্মৃতি মনে আছে সেদিন আকাশ ছুটো হয়ে যেন বৃষ্টি পড়ছিল। তবে তারিখটাতো মনে নেই।”

খরগোশ ব্যাঙের দিকে চেয়ে বললে—“তাহলে তো মুন্সিল! এখন কি করা যায়?”

ছাংলা হঠাৎ বলে উঠল—“তারিখটা বোধহয় মিনি জানতে পারে। চলো না তাঁর কাছে।”

যেতে যেতে পথের মাঝেই মিনির সঙ্গে তাদের দেখা। মিনি ওখন একটা গাছের তলায় বসে চোখ বুজে আত্মা করে একটা মাছের কাঁটা চিংছে। তাদের দেখেই ল্যাজ নিয়ে মুগ চাটতে চাটতে বললে—“কোথায় বাচ্ছ সব?”

ছাংলা ব্যাঙকে দেখিয়ে বললে—এঁর ছেলেরই জন্মদিন।

ইতিমধ্যে মিনির মাছের কাঁটাটা খাওয়া শেষ হয়েছে। ঠোঁটটা জিব দিয়ে মুছে মিনি বললে—
“আজ্ঞা, আপনাকে যেন কোথায় দেখেছি মনে হচ্ছে।” তারপর একটু স্তেবে মিনি আবার বললে—
“আজ্ঞা আপনি আমার আপনার বিয়েতে ইলিশ মাছের একটা মুড়া খাইয়েছিলেন। আমার বেশ মনে পড়েছে।”

তারপর ভক্ততার বাস্তিরে মিনি জিজ্ঞেস করলে—তা আপনার ক’টি ছেলেশিলে?

এতক্ষণে ব্যাঙ যেন মিনিকে চিনতে পারলো। সে হেসে বললে—“এক মেয়ে, এক ছেলে।” ব্যাঙের মনে পড়ে গেল এই মিনি তার বিয়ের ঘটকালি করেছিল।

এইবার হাংলা বললে—“ব্যাঙ দাদার ছেলের জন্মের তারিখটা চট করে বলে দাও তো মিনি।”

একটা প্রকাণ্ড হাই তুলে মিনি বললে—“তারিখটা ভাই আমার ঠিক মনে নেই। কিন্তু সেদিন অদম্বব বৃষ্টি পড়ছিল। আমার স্পষ্ট মনে পড়ছে।”

এইবার ব্যাঙের বেজাৰ বেজাৰ খাশাণ হয়ে গেল। সব জায়গায় সেই একই কথা—বৃষ্টি পড়ছিল, বৃষ্টি পড়ছিল! তারিখের হদিস কেউ দিতে পারলো না।

ব্যাঙ হাংলাকে বললে—“চলোর বাক্, জয়দিনে আর কাৰ নেই। এখন বাড়ী ফিরে চলো!”

মিনি তখন বললে—“হতাশ হচ্ছেন কেন ব্যাঙ দাদা? চলুন চিত্তের কাছে। সে বোধহয় জানতে পারে।

তখন পেয়ে খরগোশ বলে উঠল—সর্বনাশ! বাঘ মশাইয়ের কাছে আমি যেতে পারবো না। মিনি ছাড়া সকলেই খরগোশের কথায় দায় দিলে।

ঘাড় নেড়ে মিনি তখন বললে—“তাহলে তো হয় না।”

হাংলা কাকূতি-মিনতি করে বললে—“তা মিনি তুমিই বাও না। আমরা এখানে আছি।”

নাচায় হয়ে মিনি গেল বাঘের বাড়ী। বাড়ী ছিল না বাঘ। বাঘের ছানা কানা বললে—“বাবা তো বাড়ী নেই।” হতাশ হয়ে মিনি ঘন ঘিরে যাচ্ছে, পথে বাঘের সঙ্গে দেখা। বাঘ তখন একটা প্রকাণ্ড হরিণ বেরে কাঁধে বেলে বাড়ী কিয়ছিলো। মিনিকে দেখে বলল—“হাসী, চলেছ কোথায়?”

খুঁশ হয়ে মিনি বললে—“তোমার বাড়ী গিয়েছিলাম দেখা না পেয়ে ফিরে আসছি।”

চিত্তে বললে—“কি করব হাসী, গিন্নী বললেন ঘরে কিছু নেই। ছেলেপিলেরা ধাবে কি! তাই বাবারের খোঁজে বেড়িয়েছিলাম সেই সকাল বেলা। আর হাসী, হরিণগুলো আজকাল বেজায় চালাক হয়ে গেছে। আমাদের গায়ের গন্ধ পেলেই চট করে সরে পড়ে। তা চলো তোমার খবর কি?”

মিনি তখন আন্তে-আন্তে সব কথা বললে। শুনে বাঘ বললে—“হাসী, সেদিন বৃষ্টি তো খুব পড়ছিলো, কিন্তু তারিখটা তো ঠিক মনে নেই।

মিনি বললে—“তাহলে কি হবে? আমি তো ব্যাঙ দাদার কাছে মুখ দেখাতে পারবো না।”

চিতে বললে—“ভাবছো কেন? ভূঁড়ো শেয়াল জানতে পারে। কারণ আমি তাকে বলেছিলাম।”

মিনি একটু অবাক হয়ে বললে—কি রকম?

চিতে বললে—“তুমিই তো মাগী আমার খবরটা দিয়ে গেলে। আমি তখন বাড়ীর সমরে বসে। বৃষ্টি হচ্ছিল খুব। দেখি শেয়াল ভায়া ভিজতে ভিজতে যাচ্ছে। জিজ্ঞাসা করতেই বললে পাছে চড়ে কাঠাল খেতে যাচ্ছি। আমি খুববরটা তাকে দিয়ে দিলাম।”

মিনি বললে—“তাহলে তুমিও আমার সঙ্গে চলো।”

ঘাড় নেড়ে চিতে বলল—“না সে হবে না। গিন্নী আমার পথ চেয়ে বসে আছেন। এই হরিণ নিয়ে গেলে তবে রান্নাবান্না হবে। তুমি যাও। বরং হরিণটা পৌছে দিয়ে এসে আমি তোমার কাছে যাব।”

মিনি গেল ভূঁড়ো শেয়ালের বাড়ী। গিয়ে হাঁক দিলে—“শেয়াল মশাই বাড়ী আছেন?”

বিরক্ত হয়ে শেয়াল বাড়ী ভেতর থেকে বলে উঠল—“কে হে, দুপুর বেলা বিবস্ত্র করছো?” তারপর বাইরে এসে মিনিকে দেখে অবাক হয়ে বললে—“ব্যাপার কি হে? একেবারে ভব-দুপুরে?”

মিনি প্রায় চোখ দুটো কপালে তুলে বললে—“আরে তুমি?” তারপর আন্তে-আন্তে সব কথা ভূঁড়োকে বললে।

সব শুনে ভূঁড়ো বললে—“তা ছেলের বাপের কাছেই চলো। দেখা দাঁক তারিখটা বের করা যায় কিনা।”

মিনি ও ভূঁড়ো এসে দেখলে ছাংলা খরগোশ ও ব্যাঙ চুপচাপ বসে আছে।

ভূঁড়ো শেয়াল একগাল হেসে ব্যাঙকে বললে—“আপনারে ছেলের জয়দিন! তা কি খাওয়াবেন?”

ব্যাঙ মনে মনে ভাবলে শেয়ালটা তো আচ্ছা পেটুক; কিন্তু মুখে হাসি এনে বললে—“যা চাইবেন তাই খাওয়াবে। কিন্তু জয়দিনের তারিখটা ঠিক জানতে না পারলে...”

বাখা দিয়ে ভূঁড়ো বললে—“সেদিন তো খুব বৃষ্টি পড়েছিল।”

ব্যাঙ একটু চটে গিয়েই বলল—“সে তো আমরা সবাই জানি। এ আর নতুন কথা কি!”

ভূঁড়ো হেসে বললে—“এ সমস্তার সমাধান আমি করে দিচ্ছি। তারিখটা কাকর মনে নেই। কিন্তু এই কথাটা সকলেরই মনে আছে সেদিন খুব বৃষ্টি পড়েছিল। এক কাজ করুন। সেদিন খুব বৃষ্টি হবে, সেদিন আপনার ছেলের জয়দিন করুন।”

সবাই ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে বললে—ঠিক কথা।

হুঁড়ো আবার বললে—“কিন্তু ব্যাঙ মশাই পেট ভরে খাওয়াতে তুলবেন না।”

এমন সময় বাঘ এনে উপস্থিত হলো। সব শুনে সে বললে—“ঠিক কথা—সাথে কি সকলে বলে শেরালের বেজায় বৃদ্ধি। কিন্তু ব্যাঙ মশাই মাছ-টাছ খেতে আমি ভালোবাসি না। বেশ ভালো ভেড়ার মাংস আমার খাওয়াতে হবে।”

ব্যাঙ হেসে বললে—“মাছ-মাংস ফলমূল সবেরই ব্যবস্থা থাকবে। কাজেই খাওয়ার সুখকে সকলে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।”

এরপরে খুশী হয়ে যে ঘর বাড়ী চলে গেলো।

বর্ষাকাল। রোজই বৃষ্টি হয়। কালো মেঘে ঢাকা থাকে আকাশ। ব্যাঙ ভাবে আনন্দে। বৃষ্টি সে রকম জোর হলো না, কাল নিচের বেশী বৃষ্টি হবে। এমনি করে কত বর্ষা, কত শীত, কত গ্রীষ্ম কেটে গেল।

এরপরেও কি তোমরা মনে কর ব্যাঙের ছেলে চ্যাং-এর জন্মদিন হয়েছিল আর বুড়ো কোলা ব্যাঙ পেট ভরে তার বন্ধুদের নৈমন্ত্য খাইয়েছিল?

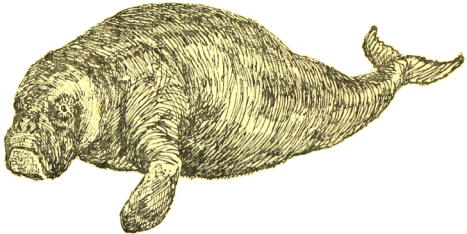
ক্যালেন্ডারের পাতা নিয়ে মজার খেলা

বড় ক্যালেন্ডারের একটি পাতা নিয়ে অনেক জনে এই খেলাটি খেলা যায়। তবে যে ক্যালেন্ডারের পাতায় ১, ২, ৩ প্রভৃতি তারিখগুলি বড় বড় অক্ষরে দেওয়া আছে, সেই ক্যালেন্ডারের পাতাই এই খেলার পক্ষে সুবিধে। পাতাটি ঘরের মেঝের উপর রাখবে, তারপর যে ক'জনে খেলবে তারা একটু দূরে বসে অথবা দাঁড়িয়ে (হাত তিনেক দূরে হলেই হবে), একটি নয়। পয়সা নিয়ে একজন করে ঐ পাতার উপর পয়সাটি ছুঁড়ে ফেলবে। পয়সাটি যে সংখ্যার উপর পড়বে, সেই সংখ্যাটি তার নামে লেখা হবে একটি কাগজে। এইভাবে প্রত্যেকে ফেলে, যার আগে সংখ্যাগুলির যোগফল একশত হয়ে যাবে সেই হবে প্রথম এবং তারপর দ্বিতীয় ও তৃতীয়। ১০০০ সংখ্যা ধরেও এইভাবে খেলা যায়। পয়সাটি ঠিক তারিখের সংখ্যার উপর না পড়ে মাঝামাঝি পড়লে, তার দান নষ্ট হয়ে যাবে।

ডুগঙ বা সিন্ধু-গব

ত্রিহিতেন্দ্রমোহন বসু

সুস্তপায়ী জলচরদের মধ্যে 'মানাটি' ও 'সিন্ধু-গব' সাইরেনিয়া বর্গের (Order Sirenia) অন্তর্গত। মানাটি আমাদের দেশে পাওয়া যায় না। সিন্ধু-গব আফ্রিকান ও নিকোবর দ্বীপের উপকূলে দেখা যায়। সিন্ধু-গব বা Sea-cow-এর আসল নাম হ'ল ডুগঙ। এই নামটি মালয় দেশীয় 'ডুয়োগ' নাম থেকে এসেছে।



ডুগঙ বা সিন্ধু-গব

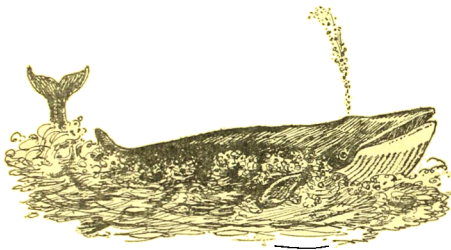
ডুগঙ লম্বায় প্রায় ছয় হাত পর্যন্ত হয়। রঙ নীল আভাযুক্ত ধোঁয়াটে। মূখ্যনাথ বেন অনেকটা বাঁড় আর বুল-মার্লিফ কুকুরের আদলটি মিশিয়ে (ছবিটা দেখেই না একবার!) তৈরি। কানের জায়গায় একটা ক'রে ছাঁদা আছে, দাঁত : ছেদন দন্ত ওপরের মাড়ীতে দুটো ক'বে, কবের দাঁত প্রত্যেক মাড়ীতে পাচটা ক'রে। মাখনের হাত দুটি দেখতে পাখনার মতন, পেছনের পা-এর কোনও পাতাই নেই। লেজটি আকাবে মাছের লেজেরই মতন, তবে এর বিস্তার পাশাপাশি, মাছের লেজের মতন ওপরে-নিচে বিস্তার নয়। সুস্তপায়ী জলচর মায়েদেরই (শিতুক, ডুগঙ, ভিমি ইত্যাদি) এইরকম লেজ থাকে—যার বিস্তার পাশাপাশি। এই তথ্যটো লক্ষণীয়।

ডুগঙ, নিরামিষভোজী, খায় সামুদ্রিক তৃণ শুষ্ক শেলা ইত্যাদি। উপকূলের কাছাকাছি থাকে, গভীর সমুদ্রে এদের পাওয়া যায় না। স্বভাব নিরীহ। আগে এরা মাছকে ভয় পেত না। এমন

কি, শোনা যায়, পূর্বে নাকি অষ্ট্রেলিয়ার আদিবাসীরা ভূগর্ভের মধ্যে খেলাও করত। কিন্তু সভ্য মানব বেদিন থেকে এদের উৎখাত করতে আরম্ভ করেছে, সেদিন থেকে এরা মানুষকে এড়িয়ে চলে।

তিমি

গভবাদের মৌচাকে তোঁররা গানের শিল্পক দেখছে শুনেছ। নগীর শিল্পক ছাড়া আরও কয়েক রকমের শিল্পক দেখা যায় বঙ্গোপসাগরে ভারতমহাসমুদ্রে এবং আরবসাগরে। এরা লম্বা আড়াই হাত, রঙ, কালো, মুখের কাছটার সাদা রেখা ও নজ্জা।



নীল তিমি

তিমি-বর্গের আসল জীবগুলির মধ্যে এবার কিছু শোনো। প্রাণজগতেও সবচেয়ে বড় জীব হ'ল তিমি। তিমির আবার নানা উপজাতি আছে। সব উপজাতিই সমান বড় হয় না। তিমিকে প্রধানতঃ দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে : শব্দ ও নির্দ্বন্দ্ব, অর্থাৎ বাসের দাঁত আছে, আর বাসের দাঁত নেই। যে-সব তিমির দাঁত হয় না, তাদের মুখের ভেতরে—ভালু থেকে—প্রায় গালের ভেতরটা জুড়ে, অসংখ্য লম্বা লম্বা সরু কাঠির মতন শলা জন্মায় ; এত কাছাকাছি আর ঘন ঘন যে, দেখায় যেন একটা বিশাল চিকনি—একটা। দুর্গা-টুনটুনিও গলতে পারবে না তার ভেতর দিয়ে। এই তিমিরা মৃগটি হা ক'রে ঘোরা-ফেরা করে শিকারের সময়ে—আর হা করার সঙ্গে সঙ্গে ওই চিকনিটা একটু ওপরে উঠে যায়। এমিকে ক্রমাগত বল চুকতে থাকে তার মুখে, আর জলের সঙ্গে শুগলি, বিহুক

চিংড়িও চুকে যায়। বেশ কিছু চুকেছে টের পাওয়া যায় তিমি মুখ বন্ধ ক'রে দেয়; আর ঠোঁট ঠাক ক'রে দিয়ে, তার প্রকাণ্ড জিহ্বা দিয়ে ঠেলে, মুখের ভেতরের সমস্ত জল দেয় বার ক'রে—সঙ্গে সঙ্গে মুখের ভেতরের চিকনি-খাঁচার ভেতর চিংড়ি ইত্যাদি সব আটকা পড়ে যায়! তারপর খালি কৌৎ ক'রে একটা শব্দ, অর্থাৎ তিমি-মশাই গিললেন। সঙ্গে সঙ্গেই আবার হাঁ! ও-পেট কি ঘে-পেট নাকি! এমন আবার কত-কতবার 'হাঁ' হবে।

দস্তহীন তিমির যে শলার মতন কাটা-কোণ জন্মায় মুখের ভেতরে, সেই শলাকে বলা হয় হোয়েল-বোন (whalebone)। বাঙ্গারে এই হোয়েল বোনের নাম আছে—আর এই নামের জন্মই তিমিটার প্রাণের কোনও দাম নেই। তিমির শরীরে প্রচুর তেল জন্মায়। সে-তেলেরও নাম আছে বাঙ্গারে। কালেকাজেই বাহুব ক্রমাহীন হুড় ঘোষণা করেছে তিমির বিরুদ্ধে—তিনি ত্যাগে আর মারো!

দস্তহীন তিমিই আকারে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। বঙ্গোপসাগরে যে বৃহৎ দস্তহীন তিমির আঁতটি দেখা যায় তার নাম ভারতীয় নীল তিমি। এই তিমি লম্বায় ৭৫ হাত পর্যন্ত হয়। এত বড় তিমি বা প্রাণী আর কোথাও দেখা যায় না। ভারতের সামুদ্রিক উপকূলে মাঝে মাঝে অটিকাভ্যন্ত হ'য়ে আছাড় খেয়ে পড়ে দু-একটা নীল তিমি।

নীল-তিমি ছাড়া অন্য জাতের দস্তহীন তিমিও দেখা যায় বঙ্গোপসাগরে। যথা: ভারতীয় 'রয়কোরাল'। এরা বেশী বড় হয় না, বড় জোর ২৫ হাত।

সদন্ত তিমিও কয়েক জাতের পাওয়া যায় বঙ্গোপসাগরে ও ভারতমহাসাগরে। এরা আকারে ছোট। একটা জাতের নাম Lesser Sperm-whale বা ছোট জাতের স্পার্ম-তিমি। এদের মাথাটার আকার অল্প, যেন একটা প্রকাণ্ড গাছের শুঁড়ি—করাত দিয়ে কাটা। এই মাথার ভেতর নোয়ের মতন একরকম গর্ভাশ্রয় পাওয়া যায়, যার নাম স্পার্মাসেলি (Spermaceti)। তাই এই তিমির নাম হয়েছে স্পার্ম-হোয়েল।

ভারতমহাসাগরের ক্ষুদ্রকার স্পার্ম-হোয়েল লম্বায় ১০ ফুট (আনুমান) হয়ে থাকে।

অভিকার স্পার্ম-হোয়েল লম্বায় ৬০ ফুট পর্যন্ত হয়। প্রকাণ্ড মাথা—গোটা তিমিটার চার ভাগের একভাগ শুধু মাথাটাই। চ্যাপ্টা মুখখানার উপরভাগে নাকের ছায়া। তিমির উপজাতি ভেদে নাকের ছায়া দুটো এক ভায়গায় মিলে কোথাও একটা, আবার কোথাও দুটো করেই ছায়া থাকে—মাথার সর্বোচ্চ স্থানটিতে। তাই ভাসবার সময়ে (তিমির সমস্ত শরীরটা একসঙ্গে ভেসে ওঠে—শুধু মুখটি আগে ভাসলো, এমন হয় না) নাকটি আগে ভেসে ওঠে। তিমি যখন ভাসে তখন তার প্রথম কাজ হ'ল নিঃশ্বাস ছাড়া। এই নিঃশ্বাস ছাড়বার সময়ে হাওয়ায় সঙ্গে অসংখ্য জলকণা

মিশে বাষ্পের মতন বেরোতে থাকে—দূর থেকে মনে হয় যেন জলের কোয়ারা। আসলে সেটা জলের কোয়ারা নয়।

এই অতিকায় তিমি-শিকারে মাঝে মাঝে শিকারীদের বিপদে পড়তে হয়েছে। জাহাঙ্গ থেকে নৌকো নাথিয়ে দিয়ে তাতে দু-জন বা তিনজন শিকারীর হাতে বর্ষা-বন্দুক দেওয়া হয়। এই বর্ষার সঙ্গে কড়া দড়ি বাঁধা থাকে, আর সে-দড়ি মত্ত লাটাই-এ জড়ানো থাকে। আঙে আঙে তিমির দিকে নৌকোটাকে বেয়ে নিয়ে গিয়ে, যখন শিকারীরা বোম্বে বন্দুকের পাল্লায় মধ্যে তারা এসে গিয়েছে, তখন তারা ওই বর্ষা-বন্দুক ছোঁড়ে। ইংরেজীতে একে বলে হারপুন (Harpoon)। বর্ষা গিয়ে গারে বেঁধা মাত্র আরম্ভ হয় টানাটানি। কখনও কখনও বেঘনায় ক্ষেপে গিয়ে তিমি নৌকোর আরোহীদের আক্রমণ করে। আঘাত-হত নৌকো চুবুয়ার করে দিয়ে জাহাঙ্গটাকেও ভাঙন করেছে এমন ঘটনা অনেক হয়েছে। একবার একটা তিমি তো একটা নৌকোকে কানড়ে ধরে চিহ্নিয়ে চিহ্নিয়ে গুঁড়ো করে দিয়ে তবে ছেড়েছিল!

ইরাবতীর মকর

ব্রহ্মদেশের ইরাবতী নদীতে এক রকম মকর বা ডলফিন (Dolphin) পাওয়া যায়। এদের স্বভাব সম্বন্ধে ডাক্তার অ্যাণ্ডারসন বা লিখে গিয়েছেন তা পড়লে আশ্চর্য হতে হয়। এই মকরের খাম্ব হ'ল মাছ। ইরাবতী নদীতে জেলেরা মাছ ধরে। এই জেলেরা বলে যে, মাছ ধরার সময়ে যখন ওরা অর্ধচন্দ্রাকারে জাল ছড়িয়ে দেয়, তখন এই মকর নাকি সমস্ত মাছকে তাড়িয়ে এনে ওই জালের মধ্যে ঠেলে দেয়। মাছধরার উপযুক্ত প্রত্যেক জায়গাতেই নাকি একটা সর্দার মকর থাকে। এই সর্দার মকর মেছুড়েনের হামেশাই মাছধরার কাজে এইরকম সাহায্য করে থাকে। মেছুড়েরা এই সর্দার মকরদের নাকি চেনে। প্রত্যেক সর্দার মকরের একটা করে নামও মেছুড়েরা দিয়ে থাকে। এই সব মকরের কোনও অনিষ্ট কেউ করতে পারে না। ডাক্তার অ্যাণ্ডারসন চেষ্টা করেছিলেন গোটা কয়েক মকর ধরে বা মেঝে আনতে। মেছুড়েনের সববেত চেষ্টায় তাঁর সে-প্রয়াস বিফল হয়েছিল।

খুনে বা রাক্কুসে তিমি

এবার ডলফিন বা মকর গোত্রের (তিমিবার্গের অন্তর্গত) সবচেয়ে ভয়ঙ্কর প্রাণীটির সম্বন্ধে শোনো। এদের নাম রাক্কুসে বা খুনে তিমি (Killer Whale)। এরা আকারে বৃহৎ—প্রায় ১৫ হাত লম্বা, মাথা আর ঘুঁথে মিলে যেন একটি অতিকায় কানানের পোলা! মকরদের যেমন ছুঁচলো ঠোঁট হয়, এদের তা

নেই। মাটিতে বড় বড় দাঁত।
 ঐশ্বর্য্যাদি থেকে অস্ট্রেলিয়া, সব
 সমুদ্রেই এদের গতিবিধি। গতিবিধি
 দলবদ্ধ হয়ে। এ-সময়ে সাধনে যে
 ঐশ্বর্য্য পড়বে তার নিস্তার নেই—তা
 সে মাছই হোক বা সিঙ্কঘোটকই
 হোক কিম্বা তিমিই হোক। বত



গুনে বা বাবুসে তিমি

বড় তিমিই হোক, এই রাক্ষসের বা সামুদ্রিক নেকড়েদের (Wolves of the Ocean) আক্রমণে তাকে হার মানতেই হবে। আক্রমণের কার্য্যনাট্য অনেকটা এইরকম : তিন-চারটে 'রাক্ষস' মিলে তিমির ঠোঁট কামড়ে ধরে, গোটা কয়েকে মিলে পিঠে আর পাশে কাষড়াতে থাকে, আর খাবল্য খাবল্য মাংস ভুলতে থাকে। ব্যথায় পীড়িত হয়ে তিমি যদি হাঁ করে তা হ'লে তো আর কথাই নেই—অহনি একটা "রাক্ষস" মুখের ভেতর ঢুকে তিমির ম্জিডটা কামড়ে ছিঁড়ে নেবে। বড় তিমির ঝট-পটানিতে যদি দু-একটা খুঁমে তিমি মারাও যায়, তাতে এর অশ্বেপও করে না।

এদের বিশেষ লেগেই আছে, যখন বা পাছে তাই থাকে। পেট কখনও ভরে না। একটা রাক্ষসে তিমির পেট চিরে তেরোটা মকর আর ১৪টা সিঙ্কঘোটকের দেহাংশ পাওয়া গিয়েছিল।

ক্ষুদ্রকায় রাক্ষসে তিমি

একটা ছোট জাতের রাক্ষসে তিমি পাওয়া যায় ভারত এবং অস্ট্রেলিয়ার উপকূলের কাছাকাছি সমুদ্রে। এরাও দলবদ্ধ হয়ে চলে আর বচাওটাও ওই আসল রাক্ষসে তিমির মতন। বড় কুচকুচে কালো আর আকারে একটু ছোট, এই হাত দশেক (১৫ ফুট) হবে। কখন-কখনও ডেনমার্কের উপকূলেও এদের দেখা যায়। সর্বভূক এই রাক্ষসগুলোকে ভয় করে না এমন জলচর নেই।

॥ আইজ ॥

শ্রীঅতসী চৌধুরী



সন্মানেই আমাদের বাৎসরিক পরীক্ষা। আর
বেশী দেয় নেই। আমরা চার ভাইবোন মিলে পুরোনবে
পড়াশোনা আরম্ভ করেছি। এর অবশ্য কারণ আছে।
কোনবার এত পড়ি না—এইবারই বা আমাদের এত
পড়াতে পেয়ে বললো কেন? কারণটা আর কিছুই নয়;

আমাদের মেজকাকা বলেছেন যে, যে এবারকার বাৎসরিক পরীক্ষায় প্রথম দশজনের ভেতর একজন
হোতে পারবে তা'কে তিনি দেবেন পুরস্কার— বা'র বা ইচ্ছে তাই।

উঃ, সে কি পড়ার ঘটা! বেশীরভাগ সকলেই পড়ছে অনেক রাত পর্যন্ত। বা'র আবার রাত
জাগার অভ্যাস নেই, সে তোর হবার আগেই বই নিয়ে বসছে। মা তো রীতিমত বকাবকি শুরু
ক'রে দিয়েছেন। বলছেন, “ছেলেমেয়েলোর রাত-নেই গিন-নেই, পড়া আর পড়া, চোখারা হোচ্ছে
দেখ না গিন দিন... বাবা!—এবার তোরের পড়া রাখ। তোদের গলা ইকিয়ে পড়ার আলার আমি
আর টিকতে পারছি না এ বাড়ীতে।”

আমি ছিলাম ভাই-বোনদের মধ্যে বড়। বয়সটা হয়তো হ'বে পনেরো কি ষোল। আমি
পড়তাম ক্লাস এইটে। বয়সের তুলনায় একটু নীচ ক্লাসেই পড়তাম বলতে হবে। আর আমার পরেই
ছিলো আমার বোন কুম্মিকা। আমি মায়ের বড় ছেলে, কাজেই আমার ওপর মায়ের আশা-ভরসাটা
ছিলো কিছু বেশীই। তাই মায়ের আদরটা সবচাইতে বেশী পেয়েছি আমি। আমার লেখাপড়ার
কোনকালে মায়ের বোধ করি ততটা রাগ হোত না; কেন না, আমি পড়াশোনা বত করি ততোই
মদল। কিন্তু মায়ের সবচাইতে বেশী রাগ ছিলো ছোট বোন কুম্মর ওপর; উঠতে-বসতে মা শুকে
বকতেন। কুম্ম পড়াশোনায় ভালো ছিলো। বাবা পড়াশোনা ভালবাসতেন ব'লেই কুম্মকে খুশে ভতি
ক'রে দিয়েছিলেন মায়ের তুমুল আগ্রহি সবেও। মা'র অবশ্য রাগারাগির কারণও ছিল, কারণ
বাড়ীর বাবতীর কাজ কোরতে হোত থাকেই। আমাদের অবস্থা সম্বল ছিল না বলে, লোক
রাখাও সম্ভব হ'ত না। কাজেই মায়ের কর্মব্যস্ততার মাঝে মাঝে সাহায্য করার লোক ছিল
একমাত্র ঐ কুম্ম। তাই কুম্ম বখন খুশে ভতি হোলো বা আশ্বেপ ক'রে বরেন, “বেখ, কুম্মকে খুশে
পাঠাচ্ছ পাঠাও, কিন্তু ঘরের কাজ শিখতে পারবেনা বলে মিলুয়া।” এই সব নানান কারণে মায়ের
রাগটা কুম্মর ওপর দিন দিন বেড়েই চলেছিলো, ফলে মেজকাকার কাছ থেকে উৎসাহ পেয়ে কুম্ম
পড়াশোনার স্বাভাবিক বখন আরও বাড়লো, তখন মা আর রাগ সাহায্যে পারলেন না, উঠতে-বসতে
তাকে বহুনি দিতে লাগলেন। তবু পড়াশোনার মাঝেও কুম্ম বখনই শান্তো, সাহায্য কোরতো
মাকে। কুম্মর একটা অদ্ভুত গুণ ছিলো, হাজার বহুনি খেয়েও কখনও ও মায়ের মুখের উপর উত্তর

কোরত না। আমি অবশ্য অনেক আদরে মাহু হোয়েও একটু এদিক থেকে ওদিক হোসেই শুকনদের সঙ্গে তর্কাতর্কি করতে কখনও বিধাবোধ করিনি। সবাই বলতেন, আমি নাকি আদর পেয়ে পেয়ে এমন হোয়ে উঠেছি।

বাক্, কি বেন বলছিলাম? হ্যা, আমাদের পরীক্ষা এসে গেলো দেখতে দেখতে, আর শেষও হোয়ে গেল দেখতে দেখতে। পরীক্ষার পর ছুটি হোয়ে গেল মাসখানেকের জন্তে। আমার অস্ত্র পরীক্ষাগুলো বোটাটুটি একরকম হোসেও, অস্ত্রটা কেমন বেন গোলমালে হোয়ে গেল! প্রতিবারের মতো, এবার আর ঠ্যাও করার আশা আমি করিনি। আমি বে পড়াশোনা একেবারে কোরতাম না তা নয়, কিন্তু আমার বুদ্ধিটা ছিলো অত্যন্ত কম, এবং নৃতিশক্তিটাও। বা পড়তাম ভুলে যেতাম। কি বে হোত আমার! বাড়ীর লোকরা অবশ্য বলতেন, “এ নিকে সব বুদ্ধিই আছে, কেবল অস্ত্র করবার বেলাতেই বুদ্ধি আসেনা ওর মাথায়।” বাক্ এ নিয়ে বাগ্ বিতণ্ডা কোরতাম না আমি, মনে মনে ভাগ্যকেই দোষ দিতাম। অস্ত্রান্ত ভাইগুলো এবার কিরকম পরীক্ষা দিয়েছিল আমি তা জানতাম না বটে, তবে কুম্ব পরীক্ষাটা বে খুব ভালো হোয়েছিলো এটুকু জানতাম।

ছুটির মধ্যে স্থল বছের দিনছড়ির মধ্যে সবাইকার রেজাল্টই বেরিয়ে গেলো এক এক ক’রে। বলাবাহুল্য, আমি পাণ কোরতে পারলাম না এবার। মা বাবা কাঁকা সবাই আমাকে খুব বকলেন। বলেন, “ওত সব বাজে ছেলেনের সঙ্গে মিশে মিশে দিন দিন ছেলোটো একেবারে ব’য়ে যাচ্ছে। গরীব বাপের এতগুলো রক্ত-জল-করা টাকা নষ্ট হ’লো সেজন্তে এতটুকু লজ্জা নেই!”

বহুনি ধেরে ছঃখ্ হোসো খুব। মুখে মুখে উত্তর করবার মুখ আর ছিলনা এবার। তাই চুপ ক’রে রইলুম, আর মনে মনে প্রতিজ্ঞা কোরলুম কারও সঙ্গে মিশব না আর। আর কুম্? কাঠ হোয়েছে এবার। সত্যি ও ছেলে আর আমি বেয়ে হোয়ে জন্মালে বাবা-মায়ের কাজ দিত! ওর কি মজা! মেজকাঁকা কিনা-কি কিনে দেবেন ওকে...কুম্টা এতো ভালো...আমারই লজ্জা পাওয়া উচিত ওর কাছে। আমি ছেলে হোসে, ওর বড় ভাই হোয়ে, পাশটুকু পর্বস্ত কোরতে পারলাম না; আর ও বেয়ে হোয়ে মা-বাবার মুখ উজ্জল কোরলো! মেজকাঁকা বলেন, “বাং, কি সুন্দর রেজাল্ট!” হাসতে হাসতে আবার রসিকতা ক’রে বলেন, “এ মেয়ে তো মেয়ে নয়, দেবতা নিশ্চয়।” বাবা বলেন, “সাথে কি আর লেখাপড়া দেখাচ্ছি ওকে। ওর বে এত বুদ্ধি হ’বে তা’ আমি আগেই জানতুম।” বে মা কুম্কে উঠে-বসতে লাহনা-পঙ্কনা করেছেন, সেই ভিবিও বলেন, “সত্যি, আমার কুম্ব মতন পড়াশোনায় এমন লক্ষী মেয়ে আর ক’বনের হয়? হ্যা, বলা হয় নি তো? ছোটভাইরাও কেউ ঠ্যাও কোরতে পারেনি, মেজকাঁকা এদিক থেকে বানিকটা ঝাচোয়া। মেজকাঁকা রিজেন্স কোরলেন কুম্কে, “কি চাই, এবার বলে ফেল্ মেথি?” কুম্ বলে, “বা দেবেন তাই।” মেজকাঁকা বলেন, “না

তা' হবে না। আমি যখন বলেছি তোমরাই বেছে নেবে তোমাদের পূর্বকার তখন আমার ইচ্ছেতে দিলে মেটা অস্তায় হবে। যা হোক একটা কিছু বলতে হবেই।" আমি ডাবলায় কুমু হাতো দানী একটা কিছু চেবে বলবে—হয় পার্কীর গেন, নয়তো একটা শিকের শাড়ী অথবা ঐ রকমই দানী কিছু একটা। কুমু বলে, রবীন্দ্রনাথের "স্বীতাঙ্গলি"। মেজকাকা বলেন, "বেশ! বেশ! তাই হবে।"

সেইদিনই বিকেলে বেড়িয়ে বাড়ীতে এসেই গুনলাম যে, মেজকাকীর টেলিগ্রাম এসেছে মেজকাকীর খুব বাড়াবাড়ি অস্থ। মেজকাকীর অনেকদিন থেকেই কি একটা অস্থ করেছিলো। কি অস্থ আমরা তা' জানতাম না। বাপের বাড়ী ভাগলপুরে শরীর সারাতে গিয়েছিলেন মেজকাকী। মেজকাকা পরের দিন সকালেই সেখানে রওনা দিলেন। বাবার দরদ কুমুকে বলে গেলেন, "কুমু, তোর প্রাইভেট কথটা কিন্তু তুলিনি, স্বযোগ পেলেই কিনে পাঠাবো।" কুমুর লজ্জায় মুখটা লাল হয়ে উঠলো। মনে মনে সে ভাবলে : মেজকাকীর সামনে বিশদ আর গুর প্রাইভেট না পেলেই নয়, এফুনি এফুনি।

এরপর আর ছুটির বেশী দিন ছিলো না। ছুটির দিনগুলো শেষ হোয়ে আসতে লাগলো। মেজকাকীর কয়েকদিন ধরে খুব বাড়াবাড়ি হোয়েছিলো, তারপর উনি আগের থেকে কিছুটা ভাল হোয়ে উঠলেন। কিন্তু মেজকাকীর যা মেজকাকাকে ছাড়তে চাইলেন না। মেজকাকীয়ার বাবা নেই। তাই-তাইও ছিলো না। কাজেই পুঙ্খমাশ্রয় বলতে যেখানে বাড়ীতে কেউ নেই, সেখানে মেজকাকাকে ছাড়লে চলবে কেন? তাই মেজকাকা গুপান থেকেই ছুটির দরখাস্ত কোরলেন এক-মাসের জন্য। মেজকাকীর চিঠি আসতো মাঝে মাঝে। কুমুকেও চিঠি দিতেন মেজকাকা আলাদা করে। একটা চিঠিতে লিখলেন—

"স্নেহের কুমু, তোমার কৃতিত্বের মূল্য এখনও পর্যন্ত আমি দিতে পারিনি, কোলকাতার আমি থাকলে, এতদিন তোমার গীতাঙ্গলি হতো পড়ে পড়ে মুগ্ধ হোয়ে যেতো। কিন্তু, আমি তোমার মেজকাকীয়ারে নিয়ে এত ব্যস্ত যে, কিছুতেই আর স্বযোগ-স্ববিধে হোচ্ছে না। ডাক্তার বলেছে মেজকাকীয়া ভালোর দিকে হোলেও বর নিতে হবে বেশী করে। মেহাশিপ নিও। যা বাবাকে প্রণাম জানিও আর অন্ত্যত তাইদেরও জানিও আমার শুভানুধ্যায়। ইতি—মেজকাকা।"

সত্যি, মেজকাকা কুমুকে অদম্য বরদ ভালবাসতেন। তাঁর হোলে সবাই ভালবাসে। আর আমি ছিলাম মেজকাকীর ছুঁচকির বিব। মেজকাকীর কাছে আমার বরদশি ছিলো : হাত্তার ধারে বোঝাকে বলা আভামারি বদ্ ছেলের মত। বাক্ ওদব কথা। যা বলছিলাম, কুমুর তেতরে হাত্তো আনন্দেব সীমা-পরিমীমা ছিল না, কিন্তু আমার সামনে গুকে আমি কখনও বেখিনি প্রথম হওয়ার আনন্দে উল্লসিত হোয়ে উঠতে, পাছে আমি ছুখ পাই। কেননা, আমি গুর পরীক্ষায় ফেল-করা বদ্ তাই।

এত সৌভাগ্য কুম্ব নইলো না বোধহয়। ছুটির মধ্যেই হঠাৎ কুম্ব ভীষণ অর হলো, কেন হলো—কি থেকে হলো—সে সব আমি কিছুই জানি না। টেম্পারেচার নিয়ে দেখা গেলো ১০০° ডিগ্রী অর। বাবা ব্যস্ত হোয়ে ডাক্তার ডেকে আনলেন। ডাক্তারবাবু কুম্বকে দেখে বলেন, “এ তো ভাল বোধ হচ্ছে না। রক্তটা একবার পরীক্ষা করে দেখতে হবে।” পরীক্ষার ক’রে দেখা গেলো “টাইফয়েড”। কুম্বকে অস্ত্র জানানো হোলোনা এর কিছুই। অর কমলো না কিছুতেই। বাবা কিন্তু চিকিৎসার কোন ক্রটি রাখলেন না—শেষকালে মায়ের দু’একটা গহনা বিক্রী ক’রে চলতে লাগলো কুম্ব চিকিৎসা। যখন ক’রে হোক কুম্বকে বাচাতেই হ’বে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হোল না।

আমার বেশ মনে আছে সেদিনকার দুপুরটা। চারিদিকে একটা ধমধমে ভাব। একটা বিল্ডি গরম পড়েছিলো সেদিন। একটা মেশী কুকুর রাস্তার ভেঁকে ভেঁকে উঠছিলো কর্কশ আওয়াজ ক’রে। এই মহাদুর্ভাগ্যবশিত মৃত্যুর মাবেই কুম্ব আমাদের ছেড়ে চলে গেলো! মা-বাবা ও ভাইরা সবাই কাঁদতে লাগলো। কাঁদতে পারলাম না কেবল আমি। বাবা দুঃখ ক’রে বলেন, “মেয়েটা বাঁচলে হয়তো লজনের মধ্যে একজন হোতে পারতো! বড্ড ভাল ছিলো মেয়েটা!” কুম্ব মৃত্যুর পর থেকে সব কিছুই আমার কাছে অবাক অবাক ঠেকেতে লাগল। যদিও কানলাম না একটুও, কিন্তু একটা চাপকাটা গুমরে গুমরে উঠতে লাগলো আমার কানের অন্তরালে। আমার এখনও বেশ মনে আছে—আমি কেন জানি না, কুম্ব মারা বাবার পর থেকেই যেন দিন দিন ক্রিয়কম শান্তিষ্ট হোয়ে গিয়েছিলুম। কোথাও বেরোতুম না, যখন-তখন গালে হাত দিয়ে বলে বলে ভাবতুম কি সব! কি ভাবতুম তা’ এখন আমার আর মনে নেই।

মেজকাঁকাকে তখনও গরম দেওয়া হয়নি, কি একটা কারণে। বাবা বলেন, “না। ওকে আর এই দুঃসংবাদটা দিয়ে কাজ নেই, ও খুব শক্ পাবে। আমার কুম্বকে যে ও নিজের মেয়ের মতোই ভালবাসতো। যখন আদবে—তখনই জানতে পারবে একেবারে।” এমনি ক’রে যখন আমাদের ছোট পরিবারে শোকের ছায়া পড়েছে। আর আমরা যখন সেই শোকের ব্যথা নিয়ে দিন কাটিয়ে চলেছি, ঠিক সেই সময়ে হঠাৎ একদিন একটা “বুকপোষ্ট” নিয়ে এলো পিওন, আর তার সঙ্গে একটা ছোট দু’লাইনের চিঠি। চিঠিটা এই—

“মেয়ের কুম্ব, আশা করি তোমরা ভাল আছ সবাই। তোমার পুরস্কার পাঠালাম। এখন খুশী হোলে তো? হেনাশিস নিও। ইতি—তোমার মেজকাঁকা।”

আর খুশী! কুম্ব এখন আর এক রাজ্যে। এবার আর আমি থাকতে পারলাম না, অকোয় খারাপ অশ্রু নেমে এলো আমার দু’চোখে। কান্নার মাঝেই বলে উঠলাম : “কুম্ব! লক্ষ্মীটি একবার আর ভাই—এসে দেখে যা তোমার প্রাইজ দু’চোখ ভরে!”

খেলোয়াড়দের খবর

—খেইড়ে

লীগ বিজয়ী ইস্টার্ন রেলওয়ে

গত ১ আগস্ট শনিবার বিকেলে মহম্মদান স্পোর্টিং মাঠে ইস্টার্ন রেলওয়ের এগারো জন তরুণ বাঙালী খেলোয়াড় বাঙালার ফুটবল ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় রচনা করেছেন। বিপুল দর্শকজনের সামনে এইদিন ইস্টার্ন রেলওয়ে দল প্রতিদ্বন্দ্বী কর্জ টেলিগ্রাফ দলকে ২-১ গোলে হারিয়ে দিয়ে শিনিয়র ডিভিশন লীগ চ্যাম্পিয়ানশীপ লাভ করে। সুদীর্ঘকাল পরে বাঙালার একদল তরুণ খেলোয়াড়দের এই বিজয়ে বাঙালী মাঠেই গর্ববোধ করবেন। এই দলের যে সব খেলোয়াড়রা এবারের লীগের বিভিন্ন খেলার অংশগ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের ভেতর সি. বর্ধন, বি. ঘোষ, বি. মিত্র, টি. গোস্বামী, সি. বসু (অধিনায়ক), এন. নন্দী, সি. কে. ব্যানার্জি, এ. গোস্বামী, এস. রায়, এস. নন্দী, ডি. দাস, সি. সিংহ, এ. সেনগুপ্ত, এস. চ্যাটার্জি, আর. কল্ল, এ. চৌধুরী, কে. মণ্ডল, টি. বসু, সি. কুমারী, এস. বসু (ছোট) প্রমুখের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ইস্টার্ন রেলওয়ে কী ভাবে লীগ পেয়েছে

স্পোর্টিং ইউনিয়নকে ১-০, ১-০ গোলে; পুলিশকে ৩-০, ২-০ গোলে; বালী প্রতিভাকে ২-১, ২-১ গোলে; হাওড়া ইউনিয়নকে ২-১, ৪-০ গোলে; উরাড়ীকে ৪-১, ১-০ গোলে, মহাম্মদান স্পোর্টিংকে ২-১, ২-১ গোলে; এরিয়াককে ৩-০, ২-০ গোলে; মোহনবাগানকে ১-১, ১-০ গোলে; বিমির-পুরকে ৩-১, ২-১ গোলে; কর্জ টেলিগ্রাফকে ২-০, ২-১ গোলে; বি. এন. আরকে ০-০, ২-১ গোলে ও ইষ্টবেঙ্গলকে 'বি-মে' ম্যাচে

পরাজিত করেছে এবং রাজধানীর কাছে ২-০, ২-২ গোলে, ইস্টার্ন স্ত্রাশনালের কাছে ১-০, ১-২ গোলে এবং ইষ্টবেঙ্গল-এর কাছে ১-০ গোলে পরাজিত হয়েছে।

আন্তঃকলেজ ফুটবল লীগ

৮ই আগস্ট হরেন্দ্রনাথ কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় মাঠে স্ত্রাশনাল মেডিকেল কলেজ দলকে এক গোলে হারিয়ে দিয়ে আন্তঃকলেজ ফুটবল লীগের চতুর্থ গুপে অপরাজিত অবস্থায় চ্যাম্পিয়ানশীপ লাভ করেছে। এই দিনের জয়যুক্ত গোলটি সেন সেটীর করোগার্ড এন. রাহা। লীগের ছটি খেলার ভেতর হরেন্দ্রনাথ কলেজ ডু করে কেবলমাত্র এক গরুট নষ্ট করেছে।

লীগ চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স আপ

	খেলা	জয়	ড্র	পরাজয়
ইস্টার্ন রেলওয়ে	২৮	২২	৩	৩
মোহনবাগান	২৮	১২	৮	১
পক্ষে	বিপক্ষে	গোল পক্ষে		
৪৮	১৮	৪৭		
৪৭	১৩	৪৬		

দক্ষিণ চীন দল

আগামী ৬ই ও ৭ই সেপ্টেম্বর দক্ষিণ চীনের ফুটবল দল কলকাতার দুটি প্রদর্শনী ফুটবল মাঠ খেলতে রাজী হয়েছে। এই দলে আছেন সতের জন খেলোয়াড়। এই দলের সঙ্গে সেই দলজন খেলোয়াড় আছেন হারা টৌকিওতে অস্থায়ী ভূতীর এশিয়া ক্রীড়ায় করমোদা চীন দলকে স্বর্ণপদক পেতে বিশেষভাবে সহায়তা করেছিলেন।

ভারতীয় ক্রিকেট দলের ইংলণ্ড সফর

আগামী বছর (১৯৫২) গ্রীষ্মকালে ভারতীয় ক্রিকেট দল সাড়ে চার মাস ব্যাপী ইংলণ্ড সফর করবে। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড ভারতীয় দলের সফরের যে ক্রীড়ান্বীতি ঘোষণা করেছেন, তাতে জানা যায় এই সফরে ভারতীয় দল পাঁচটি টেস্ট ম্যাচ ও বত্রিশটি সাধারণ ম্যাচ খেলবে। এই সঙ্গে আরো জানা গেছে যে, রণজি ট্রফি প্রতিযোগিতার রক্ত-জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে আগামী ফেব্রুয়ারী মাসে কলকাতার এক প্রদর্শনী খেলার আয়োজন হয়েছে। খেলা হবে চ্যাম্পিয়ন দল বনাম অন্তর্গত ঝারা রণজি ট্রফিতে খেলবেন তাঁদের ডেভর থেকে একমল বাছাই করা খেলোয়াড় নিয়ে।

—

আন্তঃস্কুল ক্রিকেট

ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের কার্যকরী কমিটির সভায় ব্রিট হুইচ, নির্মল ভারত আন্তঃস্কুল ক্রিকেট প্রতিযোগিতা বধারীতি আন্তঃ-রাষ্ট্রা এবং আঞ্চলিক ভিত্তিতে পরিচালিত হবে। আন্তঃআঞ্চলিক সেমিফাইনাল-এর খেলা দু-দিনের বরলে তিনদিন ব্যাপী হবে। ফাইনাল খেলা চারদিন ব্যাপী হবে। খেলার চূড়ান্ত সীমান্সা না হলে, প্রথম ইনিংসের ফলাফলের ভিত্তিতে বিজয়ী নির্ধার করা হবে। যদি চার-দিনের খেলাতেও (দু'বলের) প্রথম ইনিংসের খেলা শেষ না হয়, তাহলে প্রথম ইনিংস শেষ না হওয়া পর্যন্ত খেলা চলবে

—

এম্পায়ার ক্রীড়ার খবর

এ বছর ওয়েলসে ষষ্ঠ ব্রিটিশ এম্পায়ার ও কমনওয়েলথ ক্রীড়ার সীতাবে ছ-টি, আথলেটিকসে তিনটি, এবং ভারোত্তোলনে একটি—মোট

দশটি বিশ্ব রেকর্ড অতিক্রান্ত হয় এবং দুটি ক্ষেত্রে বিশ্ব রেকর্ড স্পর্শ হয়। নিচে প্রথম আটটি পদকপ্রাপ্ত দেশের একটি তালিকা দেওয়া হল—

	যুগ	রোশ্য	ব্রোজ
ইংলণ্ড	২২	২২	২২
অস্ট্রেলিয়া	২৭	২২	১৭
দক্ষিণ আফ্রিকা	১০	১০	৮
স্কটল্যান্ড	৫	৫	৩
নিউজিল্যান্ড	২	৪	৬
জামাইকা	৪	২	১
পাকিস্তান	৩	৫	২
ভারত	২	১	০

—

সম্মানিত স্তর ডল ব্র্যাডম্যান

এম. সি. সি-র সদর কার্যালয় লর্ডস থেকে ঘোষণা করা হয়েছে যে, অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন টেস্ট অধিনায়ক ব্যাডম্যান ক্রিকেট খেলোয়াড় স্তর ডোনাড ব্র্যাডম্যান এম. সি. সি-র সম্মানিত জীবন সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। এতোদিন পর্যন্ত এম. সি. সি-র সম্মানিত জীবন সদস্যের পর ইংলণ্ডের রাজবংশোদ্ভবদের এবং প্রখ্যাত রাজনীতিকদের ডেভরেই সীমাবদ্ধ ছিল। এম. সি. সি-র সম্মত প্রবর্তিত এক নতুন নিয়মাবলীসারেই ব্র্যাডম্যানের নির্বাচন সম্ভবপর হয়েছে।

ক্রিকেট জগতের বিখ্যাত ব্র্যাডম্যান ১৯৪৮ জীৱনে ইংলণ্ড সফরের শেষে ক্রিকেট খেলা থেকে অবসর গ্রহণ করেন। দীর্ঘ কুড়ি বছরের 'ক্রিকেট জীবনে' ব্র্যাডম্যান গড়ে ২৫১৪ রাণ রাণ হিসেবে মোট ২৮,০৬৭ রাণ করেছেন। তিনি জীবনে মোট ১১৭টি সেঞ্চুরী করেন। কুইন্সল্যান্ডের বিপক্ষে অপরাজিত ৪৫২ রাণই তাঁর জীবনের সর্বাধিক রাণ।

—



প্রোথ্র প্রোথ্রদের জগত

একদিনের কথা

১০ই জুলাই রবিবার (১৯৪৮) রবিভোরের 'চণ্ডালিকা' নিউ এশ্যায়ারে অহুটিত হয়েছিল। সেইদিন আমার উপর ভার ছিল প্রোথ্রাম বিজয় করার। এক একটি প্রোথ্রামের দাম ছিল এক টাকা করে।

এক তলার লাউয়ে কয়েকজন মেয়ে বিক্রি করছিল, ছুঁজন মেয়ে ছিল সিঁড়িতে। কয়েকজন আবার এক তলার অভিটোরিগামেও প্রোথ্রাম বেচছিল। আমি আর সন্ধ্যা বলে একজন মেয়ে দোতালার অভিটোরিগামে প্রোথ্রাম বেচছিলুম। প্রথমেই একজন ভদ্রলোক আমাকে প্রোথ্রামের জন্য পাঁচ টাকার একটি নোট দিলেন। আমি মুস্থিলে পড়লুম—কারণ, আমার কাছে চেঞ্জ ছিল না। সন্ধ্যাদিকে জিজ্ঞাসা করলুম—কি করা যায়? তখন সন্ধ্যাদি আমাকে বললেন, "নীচে কাউন্টারে গিয়ে টাকাটা ভাঙিয়ে আনো।" নীচে কাউন্টারে ভিড় দেখে একটু ইতস্ততঃ করছিলুম, তারপর কাউন্টারের ভদ্রলোককে বললুম যে, আমাকে একটু তাড়াতাড়ি চেঞ্জটা দিয়ে দিতে। তিনি নোটটা নিয়ে পাঁচখানা একটাকার নোট আমার হাতে দিলেন। আমি টাকা নিয়ে

সেই ভদ্রলোকের কাছে গেলুম। চারটাকা কেবল দিয়ে বাকি এক টাকা মণিকাগে পুরলুম।

এরপর প্রায় চার-পাঁচটা প্রোথ্রাম বেচা হয়ে গেছে, আমি নীচের অভিটোরিগামে বাবো বলে নামছি, এমন সময় এক বয়স্ক ভদ্রলোক ও তাঁর স্ত্রী উপরে আসছিলেন—আমি তাঁদের জিজ্ঞাসা করলুম যে, তাঁরা প্রোথ্রাম নেবেন কিনা? বয়স্ক ভদ্রলোকটি বললেন, "না, তোমাদের ঐ প্রোথ্রাম কিনে আর আমার দরকার নেই। যা দাম বাবা:!" আমি নিরাশ হয়ে চলে আসছিলুম, সেই সময় গুনতে পেলুম তাঁর স্ত্রী বলছেন, "হ্যাঁগা, তুমি দিনে দিনে কি হুজ্জ বলত? ছোট একটি মেয়ে প্রোথ্রাম বেচতে এলো, আর তাকে তুমি নিরাশ করে ফিরিয়ে নিলে!" ভদ্রলোক তখন আমার ভাকলেন এবং বললেন, "হ্যাঁও একটা প্রোথ্রাম আনোদেহ।" তিনি একটা প্রোথ্রাম নিলেন, তখন তাঁর স্ত্রী জিজ্ঞাসা করলেন আমাকে, "তোমার নাম কি বাবা?" আমি বললুম, "আমার নাম—স্বপর্ণা। মুখোশাখ্যায়।" তিনি বললেন, "বা: বেশ নামটি তো!" বলে তাঁরা চলে গেলেন; আমিও নীচে নেমে এলুম।

নেমে একতলার অভিটোরিগামে গেলুম। সেখানে একটা বয়স্ক ছুঁজন বাঙালী ক্যান্ডেলবল

ভক্তমহিলা বসেছিলেন, তাঁদের আমি প্রোগ্রাম কিনবেন কিনা জিজ্ঞাসা করলুম। তাঁরা বললে, "We don't want any programme, you go." আমি বেরিয়ে এলুম। তারপর একটু আচর্ষ হলুম—বাঙালী ঘেরের ইংরেজী বলার কি মরকার ছিল ভেবে। তখন 'চণ্ডালিকা' আরম্ভ হতে মাত্র আর মিনিট তিনেক বাকী। একটা প্রোগ্রাম আর টাকাটা দেরত দিয়ে আমি নিজের গীটে গিয়ে বসলুম। কানে এলো কতরকম কথা : অপরের লাঞ্ছনাজ, চলা-ফেরা নিয়ে কেউ টিকা-টিপন করছেন, আবার কেউ করছেন বড়মাহুঘীর গল্প। আমার মনে হচ্ছিল, এঁরা এখানে এসেছেন 'চণ্ডালিকা' দেখতে, না অপরের খুঁৎ খরতে ! ভাগ্যিস তুম্বুনি পর্দা উঠে 'চণ্ডালিকা' শুরু হলো—নাহলে কতরকম মাহুঘের মুখে আরো কত রকমের যে কথা শুনতুম তার ইয়ত্তা নেই ! ব্যাপার হয়তো খুবই দামান্ত, কিন্তু সেই একদিনে এক ঘটনার মধ্যে কতরকম মাহুঘ দেখলুম, হাসিখুশি দেখলুম ও তিরিকি মেজাজ দেখলুম বলতে পারি না !

কুমারী সুপর্ণা মুখোপাধ্যায়

নৈসর্গিক

প্রভাতের মুহূর্ত আলোর হাঝে,
মিষ্টি হাওয়ার ছন্দে,
আমার প্রথম পদচর
কাকনজ্জবারুঁসাথে।

যেখানে মাটির সবুজ মিশেছে

আকাশের নীলিমায়,

যেখানে সপ্তাশ্বাহন খামান তাঁর রথ
এই সেই পুণ্যভূমির অপরাধের ঋষি কাকনজ্জা !
আকাশের নীলিমায় প্রস্ফুটিত হয়েছে একটি কুমুদ
তার বিপুল জিজ্ঞাসা নিয়ে।

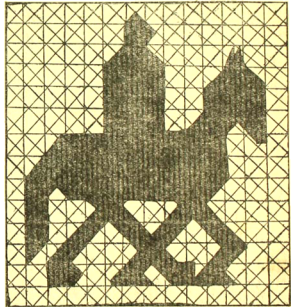
নিবিড় তমিষা ভেদ করে জাগছে তরুণ তপন
শতধারে করে পড়ছে, দরিত্রীর বন্ধ-রক্ত
পাহাড়ের মাথায় মাথায়—।

'ঝলে উঠছে তার যেত-কিরীট।

জগে উঠছে বিহগ-কাকলী—

প্রভাতের বৈভালীক গীতি !

মহুয়া বিলী



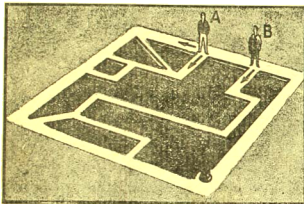
যব কেটে ছবি আঁকার নমুনা
শিল্পী : শ্রীপ্রবোধোত্তি: মুখোপাধ্যায়



প্রাচীন পাতা

শ্রীললীগোপাল চক্রবর্তী

আন্দাজ ক'রে বলতে পার ?



(উত্তর পাবে পরের পাতায়)

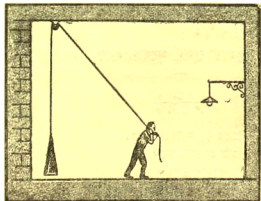
(১) ঘাটের মধ্যে অনেক-গুলি পথ। A এবং B দুটি লোক। চৌকো ঘাটের এক কোণে একটি খাম। A এবং B-র ঘাট-পথে ভীর চিহ্ন দেওয়া আছে। A তার সম্মুখের বা ডান দিকের যে কোনও একটা পথ ধরতে পারে। দু'জনে একই গতিতে চললে কে ঐ খামটির কাছে আগে পৌঁছবে বলতে পার ?

—

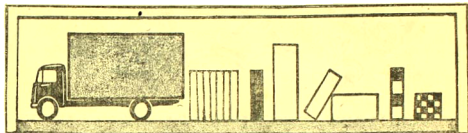
দড়ি টানার টানাপোড়েন

(২) লম্বা দড়ির এক প্রান্তে বাঁধা আছে একটা লোহার গুঁজন। ছাদের সঙ্গে আটকানো আছে একটা পুলি। পুলির ভিতর দিয়ে দড়িটা এগেছে। বলতে পার লোকটি সম্মুখের দেওয়ালের কাছে গেলে ঐ গুঁজনটা ছাদের নীচে পৰ্ব্বত বাবে কি না ?

(উত্তর পাবে পরের পাতায়)



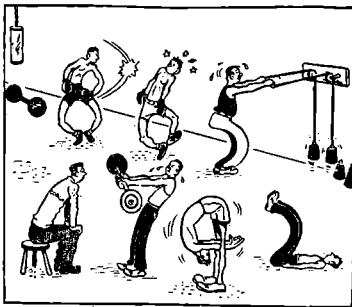
লরীতে মাল ধরবে কি ?



(৩) মালটানা মোটর লরী আছে একখানা। কাছেই পাঁচটি বিভিন্ন পড়ে আছে মাটিতে।
বিভিন্নগুলি একটির উপর আর একটি না রেখে ঐ গাড়ীতে নেওয়া যাবে কি ?

সংখ্যাগুলি বার করো

(৪) ছবিতে এই
অ্যাথলেটস্-দের মধ্যে
অদ্ভুত ভাবে কতকগুলি
সংখ্যা লুকিয়ে আছে
শিল্পী কায়দা করে সে-
গুলি একেছেন এক থেকে
নয় পর্যন্ত। তোমরা
এখন কি ঠিক সংখ্যা
কায় মধ্যে আছে বার
করো এবং তার যোগ-
কল কত হ'ল যোগ দিয়ে
দেখ।



উত্তর

(১) ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯ (১) । ১২৩৪৫৬৭৮৯১০১১২৩৪৫৬৭৮৯১০ (২) ।
(৩) ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯ (৩) । ১২৩৪৫৬৭৮৯১০১১২৩৪৫৬৭৮৯১০ (৪) ।



এ সাসের বিশেষ দিনটি ১৫ই আগষ্ট সারা ভারতবর্ষে বিশেষ উৎসাহের সঙ্গে পালিত হয়েছে। এই দিনটি কি কারণে আমাদের কাছে এত আকর্ষণীয় সে কথা বলে দেবার আবশ্যক নেই। স্বতঃস্ফূর্তভাবে, সহজ আনন্দে ও পরম প্রত্যয় স্বাধীনতা দিবস আমরা পালন করে থাকি। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের শুক্ল শুধু ভারতবর্ষেই সীমাবদ্ধ নয়—এশিয়া তথা পৃথিবীর ইতিহাসে ভারতবর্ষের স্বাধীনতাপ্রাপ্তি একটি গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় সংবোধন করেছে।

এশিয়ার মুক্তি-আন্দোলন কেন্দ্র করে বিংশ শতকে যে ইতিহাস রচিত হয়েছে, তার অনেকখানি স্থান ছুড়ে রয়েছে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রাম। বাংলার আত্মত্যাগে স্বাধীন জাতি বলে পরিচয় দেবার গৌরব অর্জন করেছি আমরা, আজ সমস্ত চিন্তে তাঁদের স্মরণ করি। ভাংসভাগ্যবিধাতার কাছে প্রার্থনা করি ভারতবর্ষ জয়মুক্ত হোক।

স্বাধীনতা দিবস পালন উপলক্ষে প্রাদেশিক কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ সম্মতি যে কর্মসূচী গ্রহণ করেছিলেন, তার অন্ততম ছিল এ বছরে যে সব ছাত্রছাত্রী মাধ্যমিক শিক্ষাপর্ব্ব এবং বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অধিকার করেছে তাদের অভিনন্দন জ্ঞাপন। এ ধরনের অসুষ্ঠান পালনের ব্যবস্থা করে কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ শিক্ষামোদী মাজেরই ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। যেসব শিক্ষার্থী এইভাবে অভিনন্দন পেলেন, তারা ভবিষ্যতের পরীক্ষার এবং জীবনের পরীক্ষাও যোগ্যতার সঙ্গে উত্তীর্ণ হবে এই আশা পোষণ করি। স্বাধীন দেশের ছেলেমেয়ে বলে গর্ববোধ করা স্বাভাবিক, কিন্তু শুধু গর্ববোধ করলেই তো হবে না, তার উপযুক্ত হতে হবে, দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা অর্জন করতে হবে আমাদের। স্বাধীনতা সম্বন্ধে শিখতে গিয়ে বার্কের একটা কথা মনে পড়ছে—“Liberty in order to be enjoyed must be restricted”—কথাটা অল্প হুঁশো বছরের পুরোনো, কিন্তু একবারে নির্ভেজাল আমাদের কথাটা শুধু মনে রাখা নয় বেনে চলাও আমাদের প্রত্যেকের কর্তব্য।

সংবাদপত্রে পড়ছিলাম যে; স্বাধীনতা দিবসে একদল ছাত্র বিনা পয়সায় বাস ভ্রমণের সুযোগ পায়নি বলে বাস আক্রমণ করেছে, বাসের চালক লুণ্ঠন হয়েছে। সিনেমা হাউসে বিনা-টিকিটে

চুক্তিতে দেওয়া হয়নি বলে তারা চিত্রগৃহের দরজা জানল। ভেঙেছে, আসবাবপত্র নষ্ট করেছে। এই খবরটা অত্যন্ত মর্মান্তিক। সুদীনতা আর উজ্জ্বলতাকে যদি আমরা কথার ও কাগজে অস্তিত্ব করে তুলি তাহলে জাতির পক্ষে সেটি হবে অত্যন্ত লক্ষ্যকর ও শোচনীয়। শোভন ব্যবহার, মার্জিত কচি, সংযত আচরণের আদর্শ থেকে যদি আমরা ভ্রষ্ট হই, তাহলে জাতির জীবনে দুর্দৈব ঘনিষে আসবে। দেশের কিশোর তরুণদের শিক্ষা-সীকা, শোভনতা ও শালীনতার উপর নির্ভর করছে দেশের ভবিষ্যৎ।

চিঠির উত্তর

অমরনাথ সেন (ধানবাদ)—তোমাদের পরিচিতদের মধ্যে অনেকেই পরীক্ষার উত্তীর্ণ হতে পারেনি জেনে দুঃখিত হলাম। বিশেষ করে বাবা আগের পরীক্ষার ত্রুটিদের পরিচয় দিয়েছিল তারাও এবার সাফল্যলাভ করতে পারেনি জেনে বিম্বিত হচ্ছি। হৃত পরীক্ষার সত্ত্ব যতটা প্রস্তুতির প্রয়োজন ছিল, ততটা প্রস্তুতির অভাব ঘটেছিল বলে পরীক্ষার ফল এমননি অভাবনীয় হয়েছে। বাই হোক আগামী পরীক্ষায় তারা সবাই সাফল্যলাভ করুক কামনা করি। তুমি যে অকৃতকার্য ছাত্রটির আত্মহত্যার কথা লিখেছ তা জেনে দুঃখিত হলাম। পরীক্ষার ফল আশাহতরূপ না হলে আত্মহত্যা করতে হবে এটা কোনো ক্রমেই সমর্থন করা যায় না। জীবনের পথে সাফল্য-অসাফল্য দুই-ই থাকবে। সাফল্যলাভে অতিরিক্ত উল্লাস বোধ কর। যেমন সমর্থন বোণা নয়, তেমনি অসাফল্যের দরুন জীবনের উপর বিতৃষ্ণা আসতে দেওয়াও অন্তায়। অসাফল্যের বিরুদ্ধে সাহসের সঙ্গে এবং দৃঢ়তার সঙ্গে সংগ্রাম করে যাওয়াই মানুষের ধর্ম। সে ধর্ম থেকে বিচ্যুত না হওয়াই মঙ্গল।

লিনেট ও উদয়ন দত্ত (কোলকাতা)—তোমরা যা লিখেছ তা সম্পাদক মহাশয়কে জানিয়ে দিলাম। গৌতম রায় (সিন্ধুরি)—অত অসুবিধার মধ্যে না গিয়ে সোভান্ধি মৌচাকের গ্রাহক হলেই তো হয়। মৌচাক প্রতিদ্বন্দ্বিতাই প্রকাশিত হয়—কারণ এটি মাসিক পত্রিকা।

কল্যাণী চক্রবর্তী (মল্লিকপুর)—চিঠি পেলে নিশ্চয় মধুচক্রে নাম দেখতে পেতে। কিন্তু কবিতা প্রকাশ হয়েছে বলে খুশী হয়েছে, সেজন্য আমিও খুশী হলাম। পড়াশুনার ঠাক ঠাকে লেখার চর্চা করে। মালা, দোলা ও পলা (হাওড়া)—চাঁদে কি আছে জানতে চেয়েছ—চাঁদ একটা গ্রহ কিন্তু সেখানে আজ পর্যন্ত কোনো মানুষ যেতে পারেনি, তবু চাঁদে কি কি আছে সে সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকরা মোটামুটি কতকগুলো ধারণা করেছেন। তাঁদের যতে চাঁদে জল বাতাস কিছুই নেই, জীবন্ত প্রাণীও নেই, আছে কেবল ছাই, পাথর, পাছাড়া, গুহা এবং সমুদ্রের প্রকাণ্ড গুকিরে যাওয়া যায়। আর তোমাদের ছোট ছোট ভাইবোনদের জিজ্ঞাসা করলে কি বলবে

বলত ? বলবে—চরকা-বুড়ী আছে, চরকা কাটছে ; বা ঠাহুমার কাছে তোমরা শুনেছ। তার কল্পনা সত্যিই হবে।

রত্না, চন্দ্রা বন্দ্যোপাধ্যায় (কোলকাতা)—এম-সি-সি কি জানতে চেয়ে ভাল করেছ— কারণ এ সম্পর্কে বড়দেরও অনেকের তুল ধারণা আছে। পরীক্ষার্থীরা এম, সি, সি বলতে 'হুগল কংগ্রেস কমিটি' বোঝায় এমনি জবাব লিখেছে—এই দৃষ্টান্ত দেখা গেছে। আসলে এম-সি-সি মানে মেরেলবোন ক্রিকেট ক্লাব। প্রতিটি গোড়ার কথা নিয়ে হলো এম-সি-সি। এটি ইংলণ্ডের খুব নাম করা ক্লাব। ক্রিকেট খেলার এরা ভারী ওস্তাদ।

যুথিকা, মল্লিকা, শিউলি রণজিৎ সরকার ও গোপা পালা (কোলকাতা)—ম্যারাথন রেস কি জানতে চেয়েছ। অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতা অহুত্বিত হয়। ২৬ মাইল দৌড় প্রতিযোগিতায় যিনি জয়ী হন তাঁকে বলা হয়—ম্যারাথন জয়ী। এই নাম কেন হলো বলি : 'এনেককাল আগের কথা, একবার এথেন্সের সঙ্গে যুদ্ধ হয়েছিল পারস্তের। পারস্তের সৈন্য-সংখ্যা ছিল অগণ্য, এথিনীয়দেরা তাদের তুলনার মূর্তিমেয়, কিন্তু জয়ী হলো এথিনীয়দেরাই। পারস্তের পক্ষে মারা গেল ছ' হাজার চারশো, আর এথিনীয়দের যাত্র একশো কি দু'শো। খবরটা জবর। এথেন্স-এর নাগরিকদের না জানিয়ে স্বত্তি পাচ্ছিল না তাদের বোদ্ধারা। খবরটা খুব তাড়াতাড়ি পৌঁছন সরকার কিন্তু রাস্তা তো কম নয়। ম্যারাথন থেকে এথেন্সের দূরত্ব ২৬ মাইল। কাইডিলাইডিস খবরটা পৌঁছে দেবার ভার নিলেন। যুদ্ধে ক্লান্ত হয়ে পড়লেও তবু ছুটে চললেন তিনি—পথে কোথাও একটু না থেমে পৌঁছলেন এসে এথেন্সে। যেশবানীকে বল্লেন : 'তাই সব আনন্দ করো, আমরা জয়ী হয়েছি !' কিন্তু এই তাঁর শেষ কথা। তারপর অতিরিক্ত পরিশ্রমে গতপ্রাণ হয়ে লুটিয়ে পড়লেন। তারপর থেকে তাঁর স্মৃতিরক্ষার জন্য 'ম্যারাথন রেস'-এর প্রবর্তন কর হয়েছ।

জুধাংশু, সীতাংশু, সজু ঘোষ (টালিগঞ্জ), অষ্টিধর মুখোপাধ্যায় (চান্দবাটি)—তোমাদের চিঠি পেয়েছি।

যেহ-শুভকামনার—তোমাদের যুধি।

ব্রীহদীশচন্দ্র সরকার কর্তৃক ১৪ বন্ধিম চাটুজ্যে স্ট্রিট, কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত

ও তৎকর্তৃক প্রত্ন প্রেস, ৩০ কর্নওয়ালিস স্ট্রিট, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত

মূল্য : চল্লিশ নয়া পয়সা

ছড়ার বই

নতুন ছড়া

ছলেমেয়েদের লেখায় ও রেখার সুখলতা রাওয়ের
 াম অনেক উঁচুতে। তাঁর এই ছড়ার বইখানি
 ছলেমেয়েদের হাসাবে, ভাবাবে, শেখাবে। পাতায়
 পাতায় ছ'রঙা ছবি। অপূর্ব প্রচ্ছদপট। ১'২৫

তুধারকান্তি ঘোষের

আরও বিচিত্র কাহিনী

ম্পূর্ণ বিষয়কর গল্প বলার ভঙ্গীতে লেখা।
 পাতায় পাতায় ছবি। ৩'০০

জগন্নাথ পণ্ডিতের

জগন্নাথের খেয়াল-খাতা

জ্ঞাতো অনেক রকম পড়ো তোমরা কিন্তু সব গল্প
 তা মনে থাকে না, কারণ পড়ার সময় মনই থাকে
 । সব গল্পে। সত্যিকার মনকে ধরে রাখবার মত
 লেখা এতে আছে। অসংখ্য ছবিতে ভরপুর। ২'৫০

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের

তোমাদের অভিনয়

কেশোরদের উপযোগী ছয়টি নাটক। অভিনয়ের
 ক্ষমতা ও পড়ার ক্ষমতা বিশেষ উপযোগী। ০'৬২

ছড়ার বই

রাঙা ধানের থৈ

ছলেমেয়েদের আকৃষ্টি করার মত কতো যে মজা
 ছড়া আছে, হাতের কাছে একখানা বই নি
 দেখো। ছ'রঙে ছাপা পাতায় পাতায় ছবি। ২'

বিমল দত্তের

সিংখুড়োর গল্প

এই হাসির গল্পগুলি পড়তে পড়তে পেটে বি
 ধরে যাবে। শেষ না করে ওঠা যাবে ন
 পাতায় পাতায় ছবি। ২'০০

অবনীন্দ্র ঠাকুরের

একে তিন তিনে এক

সব বই ক্লেয়ে রেখে এই বই পড়তে হবে। হা
 পেলে খুসীতে ভরে উঠবে ছোটদের মুখ। ৩'০০

শিবরাম চক্রবর্তীর

ছোটদের উপযোগী হাসির নাটক। পড়তে
 মজা লাগবে

পণ্ডিত বিদ্যায় — ০'৫০

বাজার করার হাজার ঠালা — ০'৬২

প্রাণকেশের কাণ্ড — ০'৬২

Regd. No. C. 1035.

(Approved by the Director of Public Instruction, Bengal, Notification No. 9 T. B. 23, Dec. 1938).

লিলি বিস্কুট

স্বাস্থ্যের
সবার উপরে

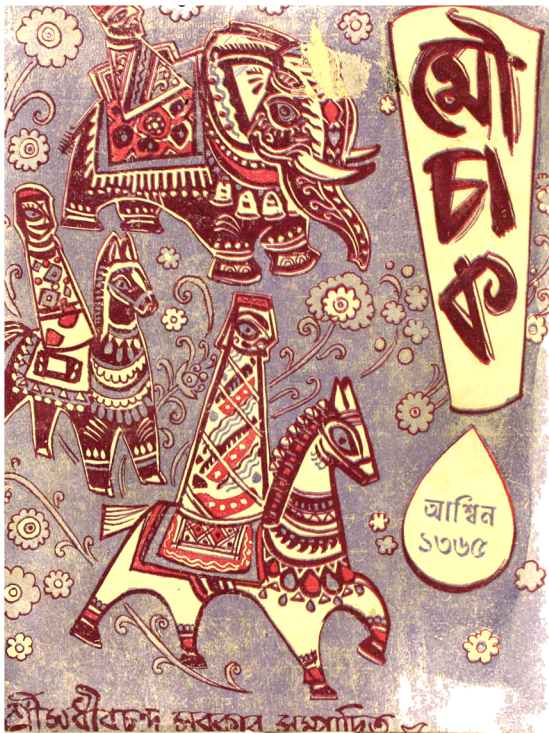
রকমারি তার
বা দেওগড়ে
অতুলনীয়



লিলি বিস্কুট কোং (প্রাইভেট) লিমিটেড

কলিকতা-৪

LS-500 PAA



ଭାଷା

ଆଶ୍ରିତ
୧୭୬୫

ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବିଜୟ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଆଲୋଚନା

মৌচাকের নিয়মাবলী

১। বার্ষিক মূল্য সভাক ৪ টাকা ২৫ নয়া পয়সা। বাৎসরিক ২ টাকা ২৫ নয়া পয়সা। প্রতি সংখ্যা ৪০ নয়া পয়সা। বৈশাখ মাস হইতে বর্ষ আরম্ভ। যে কোনও মাস হইতে গ্রাহক হওয়া যায়। ভিঃ পিঃ যোগে কাগজ পাঠান হয়। ভিঃ পিঃ খরচ স্বতন্ত্র লাগে।

২। বাল্য মাসের প্রথম সপ্তাহে পত্রিকা প্রকাশিত হয়। কোন সংখ্যা না পাইলে সেই মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে জানাইতে হইবে, নচেৎ উক্ত সংখ্যা পাওয়া যাইবে না। ঠিকানা পরিবর্তন করিতে হইলে পূর্ব মাসের ২৫ তারিখের মধ্যে জানাইতে হইবে। চিঠিপত্রে এবং মানঅর্ডার কুপনে সব সময়ই গ্রাহক নম্বর উল্লেখ থাকা চাই, নচেৎ জবাব দেওয়া সম্ভব হয় না। নূতন গ্রাহকদের “নূতন” কথাটি লিখিয়া দিতে হইবে।

৩। লেখা পাঠাইতে হইলে সকল সময়েই নকল রাখিয়া পাঠাইবেন। লেখা প্রকাশ হওয়া না হওয়া সম্পাদকের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। উপযুক্ত ডাকমাণ্ডুল না দেওয়া থাকিলে অমনোনীত রচনা কেবল পাঠান সম্ভব হয় না। রচনার সহিত লেখকের নাম ও ঠিকানা না দেওয়া থাকিলে সে লেখা গ্রাহ্য হয় না।

৪। এজেন্সীর জন্য ৫৮ টাকা অগ্রিম জমা রাখিতে হয় এবং কমপক্ষে ৫ কপি করিয়া পত্রিকা লইতে হয়।

৫। বিজ্ঞাপনের হারঃ ১ পাতা ৩০৮ টাকা, ১/২ পাতা ১৫৮ টাকা, ১/৪ পাতা ৮৮ টাকা।

৬। যাবতীয় চিঠিপত্র টাকাপয়সা নিম্ন-ঠিকানায় পাঠাইলেই চলিবে।

এম, সি, সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ
১৪, বঙ্কিম চ্যাট্টো স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

ছোটদের ও বড়দের

যে কোন বইয়ের জন্য

যখনই আপনাদের প্রয়োজন হবে

আমাদের জানাবেন।

আমরা সকল প্রকার সুবিধা ও যত্নসহকারে

সে সকল বই আপনাদের সরবরাহ করব।

এম, সি, সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ

১৪, বঙ্কিম চ্যাট্টো স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

যখন তখন চুল ভেজাবেন না কিন্তু

আমাদের দেশের পুরুষরা বাড়ীর বাইরে গেতে হলেই চট্ করে মাথায় একটু জল দিয়ে চুল ঝাড়ে নেন। যখন তখন চুলে জল গিলে চুল বেশীর ভাগ সময়েই ভিজে থাকে—তার ফলে চুলের সৌন্দর্য্য আর সাবলীনতা নষ্ট হতে শুরু করে। ভিজে চুল মাথার পক্ষেও মারাত্মক রকম ক্ষতিকর।

অতিদিন জবাকুসুম তেলচুলের গোড়াগুলিতে ভাল করে মালিশ করলে জল না দিয়েও চুল ঝাড়াতে অসুবিধা হয় না। জবাকুসুমের হালধি গন্ধ শুধু আপনার মনে সর্বদা একটা সুখের অনুভূতিই অগিছে রাখবেনা সেই সঙ্গে সংসারের নানা কামেবার মধ্যেও আপনার মনের প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ থাকবে।

জবাকুসুম



সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস, ৩৪, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-১২
১১১, আর্দেবিনন ট্রাট, বাত্রাজ-১

১১১

স্পাইন্ট

দ্রবার সেরা

স্পাইন্ট (যেমন ইন্ডিয়া সাইকেল) যে দ্রবার সেরা এতো কারো কথা।
খিঁচুত নির্দোষ নুখে আর কারোই 'স্পাইন্ট' জন্ম ও মৃত্যু অস্বপ্নবোধ।

●

আমাদের অস্তিত্ব মতলও দেখতে পাবেন।

ইন্ডিয়া সাইকেল ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিঃ কলিকাতা-১

১১১

পরিবর্তন



পূজার ছুটির পরেই মিনি ফিরলো যখন দেশে,
কলকাতাতে এসে
চললো ছুটে পাশের বাড়ী, থিনী বেখানে আছে।
কী মেখেছে ছুটির ক'দিন বলবে সে তার কাছে—
অবুনা পাহাড় মাঠের ধারে ফুলের বাসি ফোটে
ছোট নদী নিরবণি বালুর চরে লোটে।
সকাল জাঁকে বেড়িয়েছে সে কতই খুশী মনে
দল বেঁধে সব চড়ুইভাতি শালের বনে বনে।
হবেক বকম হৈ-হুমা করলো সারা দিনই
বিনির কাছে আজকে গেলো বলতে সে সব মিনি।

দেখা হতেই মিনির সাথে বন্ধু বিনি বলে
অবাক হুতুহলে—
“ফিরলি তোরা কবে মিনি? সত্যি, ওমা! এ কি—
অজ্ঞা ব্যাপার দেখি!
চেহারাটা বললে গেছে,—আত্মা গেছে ফিরে,
রঙের জলুস জোর বেড়েছে। ব্যাপারখানা কি রে?”



মিনি বললে “খুব ঘুরেছি, অবুনা নদীর লেকে
স্নান করেছি পা ধুয়েছি ‘মার্গো সাবান’ মেখে।
বং হয়েছে কর্ণা তাতেই, আত্মা হোলো ভালো—
শরীরটা তাই আমার আরও হয়েছে জমকালো।”
এই না বলে হাসলো মিনি, ঠোঁটের ঝাঁকে ঝাঁকে,
হুক্কা সম দাঁতগুলি তার বলতে বেন থাকে।
বিনি বললে, ‘দাঁতগুলি স্নাক করলি কি কৌশলে?’
মিনি বললে, ‘নিম টুথপেস্ট’ ব্যাভার করার ফলে।

১৮৯৩

স্মান থেকে
আপনাদের *জিবাং* নিয়োজিত



অমৃতাজন বাজি

ওষুধের অর্থেই যেমন নামক চলবে
জ্বর, গর্ভ, সর্দি, জ্বালি, বসন্ত
প্রভৃতি রোগে আশু ফলপ্রস

দাদের মলম কম

অর্ধপুষ্কর চর্মরোগের চিকিৎসা পণ্ডিত শ্রীমদ্রাজ
দাদ, গর্ভের, প্রভৃতি চর্মরোগে আশু ফলপ্রস



প্রস্তুতকারক —

অমৃতাজন লিঃ(পাঃ) বক্স নং ৬৮২৫, কলিকাতা-৭

বোম্বাই চাডাজ কলিকাতা

শ্রীমুখীরচন্দ্র সরকার-কৃত

পৌরাণিক অভিধান

মানব সভ্যতার সব চেয়ে বড়ো সৃষ্টি হ'ল বই। হাজার হাজার বছরের সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রার বহু বিচিত্র স্বাক্ষর অবিচ্ছিন্ন সূত্র বিধৃত হ'য়ে থাকে শুধু বইয়ের পৃষ্ঠাতেই। সম্ভ-প্রকাশিত 'পৌরাণিক অভিধান' এমনি অসংখ্য বইয়ের সাথ-সমৃদ্ধ বিরাট সংগ্রহ-গ্রন্থ। কেবলমাত্র অষ্টাদশ পুরাণ ও উপপুরাণ নয়,—সমগ্র বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, সংহিতা সম্পর্কিত অসংখ্য চরিত্র ও আচর্য কাহিনী এই গ্রন্থে যেনোজ ভাষায় আলোচিত হয়েছে। সাধারণ অভিধানের সমগোত্র নয় বসেই 'পৌরাণিক অভিধান'-এর সমস্ত কাহিনীগুলি প'ড়ে সাধারণ পাঠক-পাঠিকা পরিতৃপ্ত হবেন এবং ছাত্র, শিক্ষক ও সাহিত্যকর্মীরাও উপকৃত হবেন অজন্মভাবে। দেব-দেবীগণের স্বন্দর ও সুশোভন চিত্রগুলিও এই অভিধানের অন্ততম আকর্ষণ

মূল্য : সাত টাকা।

এম. সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড

১৫ সেকিয়ার চার্টারড সীট প্রিন্টার্স



রচনা লিখে নিম্নে যাই না - তাই
শাস্ত্রের বকুনি বোজা খাই -
আর খাবো না, যাবোনা স্কুলে,
খোকন বলে ভীষণ রেগে ফুপে ॥

অফিস থেকে এসে

বাবা বলেন হেমে :

রচনা তুমি লেখোনা-এতো তোমারি অন্যথা!

খোকন বলে: কানিকোথায়? কানি বিনে

কি রচনা লেখা যায়?



দাদা বলেনঃ অনেক কানি আছে দিদির

কাছে,

আমারো আছে বিনেতী কানি দেবোজে

এক ডজন,

এম্ব দিয়ে লেখো নাকেন? বকছো

তুধু বাজে।

লেখার জন্যে কানিরদোষ দিচ্ছ কেন

খোকন?

খোকন বলে ঝড় বৈকিনে, দু'লৈখ

ক'লে চেরা:

তোমার কানি, দিদির কানি, কানিতে

নয় ছাই!

লেখার ঝতো লিখতে হ'লে অব

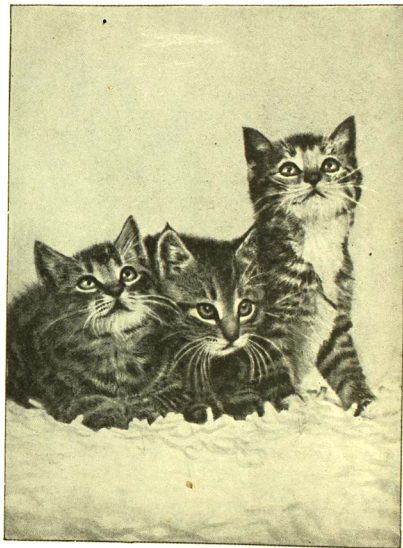
দেশের মেদা

অবরু শ্রিয় 'মুখেথা' কানি চাই ॥



মৌচাক--ডাখিন, ১৩৬৫।

7/56.3
012/20



আমরা তিনটি ভাই
শিবের গাজন গাই।'



৩৯ বর্ষ]

আশ্বিন—১৩৬৫

[৬ষ্ঠ সংখ্যা]

ছাতা ও জুতা

বাণীকুমার

একদিন কোন্‌ ছোঁষ্ঠ মাসে
 হুপুং বেলায় রোদ্‌দুরে,
 জমদগ্নি করেন খেলা
 ধনুক দিয়ে তীর ছুঁড়ে ।

রেণুকা-বউ যান্‌ বারেবার
 আনতে ছুটে তীরগুলি,
 কাঁঠকাটা রোদ লাগলো মাথায়,
 পায়ের মাটি যায় ছলি' ।

সূর্য-তাপে কষ্ট পেয়ে—
 বসেন তিনি গাছের ছয় ;
 ফিরতে দেরি—দেখে ঋষি
 হলেন রেগে অগ্নি-প্রায় ।

গর্জে ওঠেন ঋষি তবে :
 “কিসের দেরি আনতে শর ?”
 রেণুকা কন : “রোদের আগুন
 ভোগায় মোরে নিরন্তর ।”

কহেন জমদগ্নি হেঁকে :

“শান্তি দেবো সূর্যেরে ।”

দিব্য-ধনু নিলেন হাতে

আর শত বাণ তুণ ত’রে ।

জানো নাকি—সূর্য কত

আকাশে না রহেন স্থির ।

তবে ভুমি—হে ঋষিগণ,

কী ক’রে তাঁয় ষিঁ ধবে তাঁর ?”

ব্রাহ্মণেরি বেশে রবি

আসিয়া কনু সন্মুখে :

“সূর্য-নিপাত দিয়ে কী লাভ,

কেন করো কোন্‌ দ্বন্দ্ব ?

কহেন ঋষি : “জ্ঞানের চোখে

তোমায় আমি খুব জানি,

দুপুরে আধ-নিমেষ ধামো—

তখন দিব তাঁর হানি’ ।”

সূর্য-কিরণ যে-রস টানে,

সে-রস করে বর্ষাতে,

তাইতো লোকে অন্ন লভে,

চাহো কি সে ঋণাতে ?

সূর্য ঋষির শরণ নিতে,

ঋষি তাঁরে দেন অভয়,

চান্‌ যে উপায়—তপ্ত পথে

লোকের না আর কষ্ট হয় ।

সূর্য তখন ঋষির হাতে

দিলেন জুতা আর ছাতা,

কহেন : “দুই-এ আমার তাপে

বাঁচবে চরণ আর মাথা ।”



(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

রণে কিছুতেই ভঙ্গ দেবেননা স্বামীজি। দেখে যাবেন শেষ পর্যন্ত।

‘এখন অসম্ভবের সঙ্গে যুদ্ধ করছি।’ লিখছেন স্বামীজি : ‘বারে বারে মনে হচ্ছিল এদেশ ছেড়ে চলে যাই। কিন্তু আবার মনে হচ্ছিল আমি একটুয়ে দানা, এত সহজেই হেরে যাব। আমি কি ঈশ্বরের কাছ থেকে আদেশ পাই নি ? আমি পথ দেখতে পাচ্ছি না কিন্তু তিনি তো সব দেখছেন। তাঁর চিরজাগ্রত চক্ষু তো এক মুহূর্তের জন্তেও অস্ত যচ্ছেনা। তবে আর ভয় কি, মরি-বাঁচি, আমার উদ্দেশ্য যেন না টলে।’

শোনা গেল বোস্টনে খরচ কম, সুতরাং বোস্টনের দিকে যাত্রা করলেন স্বামীজি। আর সেই ট্রেনে মিস কেট স্তানবর্নের সঙ্গে দেখা।

বৃদ্ধ ভদ্রমহিলা, অনিমেবে তাকিয়ে রইলেন স্বামীজির দিকে। এ কে প্রদীপ্ত-পুরুষ। আকাশের সুবর্ণসূর্য যেন নেনে এসেছে মাটিতে।

আলাপ শুরু করলেন মহিলা।

‘কতদূর যাবে ?’

‘বোস্টন।’ বললেন স্বামীজি।

‘উঠবে কোথায় ?’

‘জানিনা। শুনেছি বোস্টন সস্তার জায়গা, দেখি কোনো একটা সাদাসিদে হোটেল পাই কিনা।’

‘আচ্ছা, তুমি তো ভারতীয় সন্ন্যাসী—তাই না?’

সায় দিলেন স্বামীজি।

‘আমেরিকায় এসেছ কেন?’ কৌতুহলে একাধি মিস স্তানবর্ণ।

‘বেদান্ত প্রচার করতে। আসল উদ্দেশ্য ছিল শিকাগোতে ধর্মসভায় যোগ দেব, কিন্তু সভা আরম্ভ হতে এখনো আরো প্রায় তিন সপ্তাহ বাকি। এতটা সময় শিকাগোতে থাকি আমার এমন রসদ নেই। তাই চলেছি সস্তার জায়গার উদ্দেশ্যে।’

‘তুমি আমার ওখানে যাবে? আমার অতিথি হবে?’ মিস স্তানবর্ণ আগ্রহে উজ্জ্বল হয়ে উঠলেন।

অবহু বিদেশে এ কার স্নেহস্বর। এ কার হাত বাড়ানো!

‘তুমি থাকো কোথায়?’ কৃতজ্ঞ চোখে মহিলার করুণামাখানো নীল চোখ দুটির দিকে তাকিয়ে রইলেন স্বামীজি।

‘বোস্টনের কাছে এক গ্রামে মাসাচুসেটস-এ আমি থাকি।’ বললেন মিস স্তানবর্ণ: আমার কুটিরের নাম ‘ব্রীজি মেডোজ’—হাওয়াখাওয়া মাঠ। বাড়ির চারদিকে পাইন আর রুপোলি বার্চ, দেওয়ালবাওয়া আঙ্গুরের লতা। পদ্মকুলে ভরা দিঘি, আর কাছেই দুটো ঋণী, তাদের ধারে ধারে করগেট-মি-নট কুটে আছে। যাবে তুমি?’

‘যাব।’

মিস স্তানবর্ণের বেশ সচ্ছল অবস্থা, প্রসন্ন আতিথেয়তায় গ্রহণ করলেন স্বামীজিকে। রোজ এক পাউণ্ড করে খরচ বেঁচে যেতে লাগল স্বামীজির। কিন্তু স্তানবর্ণের লাভ কি? বহুমহলে একটি ভারতীয় কিউরিয়ো দেখিয়ে প্রতিপত্তি বাড়ানো। দেখ দেখ কি অদ্ভুত পোশাক। মাথায় একটা কাপড়ের স্তূপ তারপরে আবার একটা পুচ্ছ ঝুলছে। আর গায়ে এই লম্বা টিলে বালিশের অড় দেবেছ, একটা গোটা হামুখই আস্ত খোলার মধ্যে। যে দেখে সেই হাঁ করে থাকে। রাস্তায় বেকলেই টিটকিরি দেয়।

উপায় নেই, এ যন্ত্রণা সহ্য করতে হবে মুখ বুজে। সমস্ত উদ্ধৃত বিকল্পতাকে বিগলিত করব, সমস্ত বিজ্ঞপকে নিয়ে যাব অমিশ্র স্তুতিতে—তবেই তো আমি বিবেকানন্দ।

একদিন হু বোড়ার গাড়িতে করে মিস স্তানবর্গ স্বামীজিকে নিয়ে বেরুলেন রাস্তায়। সাধককে কে চিনতে পারবে, ভাবল ভারতের কোনো রাজারাজড়া চলেছেন বেড়াতে। খবরের কাগজে বেরুল ভারতবর্ষের এক রাজা এসেছে স্তানবর্গের কুটিরে। তার যেমন রূপ তেমন শোভা। সর্বোপরি তার বিচিত্র বেশ।

শুধু পোশাক দেখবার জন্তেই কাতার দিয়ে লোক দাঁড়ায় রাস্তায়। স্বামীজি ঠিক করলেন, সাধারণ চালচলনে চলবেন। গেরুয়া, কালো লম্বা একটা কোট তৈরি করে নিতে হবে। যদি সভায় গিয়ে দাঁড়াতে হয় বকুতা দিতে তখন পরব আমার রাজবেশ—আলখান্না আর পাগড়ি। এই এখানকার মেয়েদের পরামর্শ। আর পোশাকব্যাপারে মেয়েরাই সর্বময়ী কর্ত্রী এখানে। কিন্তু চলনসই একটা পোশাক করতে তিনশো টাকা খরচ। হাতে মোটে ষাট পাউণ্ড অবশিষ্ট।

যা থাকে অদৃষ্টে, বোস্টনে গিয়ে পোশাকের অর্ডার দিলেন স্বামীজি। কিছু টাকা পাঠাবার কথা লিখলেন আলমিস্তাকে।

‘যদি নাও পারো, আমি ছাড়বনা, আমি শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করে দেখব। আমি যদি এখানে রোগে শীতে বা অনাহারে মরে যাই, তোমরা আহ, তোমরাই এই ব্রত নিয়ে উঠে পড়ে লাগবে। কি ব্রত? শুধু পবিত্রতা সরলতা আর বিশ্বাস। অগ্নিময় বিশ্বাস। রোম একদিনে নির্মিত হয়নি। প্রভু আমাদের নেতা, জয় দাও প্রভুর। আমরা জ্যোতির তনয়, জয় দাও জ্যোতির্ময়ের। তুচ্ছ জীবন তুচ্ছ মরণ তুচ্ছ কুখ্য তুচ্ছ শীত। শুধু অগ্রসর হও। কে পড়ল চেয়ে দেখোনা। একজন পড়বে তো আরেকজন তার জায়গা নেবে। বন্ধ হবেনা অগ্রগতি।’

হমাবাই হিন্দু মেয়ে, খুস্টান হয়েছ। আমেরিকায় ঘুরে ঘুরে মেয়েদের ক্লাব খুলছে। হিন্দু বালিকাবিধবাদের অবর্ণনীয় দুর্দশা, তারই প্রতিকারের জন্তে এসব ক্লাবের সাহায্যে টাকা তুলছে অজস্র। দুর্দশা, তাতে সন্দেহ কি। তাই বলে, ধর্মাস্তর গ্রহণ করেছ বলে দেশের বিধবাদের তুমি হেনস্তা করবে? যা নয় তাই বলে

দেখাবে ? বোস্টনে একটা রমাবাসি-সার্কল ছিল, স্বামীজি সেখানে বক্তৃতা দিতে গেলেন ।

আমেরিকায় সেই তাঁর প্রথম বক্তৃতা ।

বিষয়, ভারতীয় নারী—তথা বালবিধবা ।

আমেরিকার মেয়েরা যারা শুনতে এসেছিল তারা ধমকে গেল । ভারতে নরীষ ক্রীষ নয়—ভারতে নারীষ মাতৃষ ।

এমন সব শুনে পবিত্র উজ্জল কথা বললেন স্বামীজি যা রমাবাসি বলেনি । এমন ছবি তুলে ধরলেন যা কলঙ্কের উল্লেখ চিত্রিকার মত ।

তারপর একদিন মিস স্তানবর্ণ স্বামীজিকে নিয়ে গেলেন শেরবর্ণ মহিলা জেলখানায় ।

মাখায় হলদে পাগড়ি গায়ে জলন্ত গেরুয়া, বিষাদধূসর বন্দীশালায় সর্বকাল-প্রসাদ বিবস্থান সূর্যের মত আবিস্কৃত হলেন স্বামীজি । সর্ববন্ধন বিমোচন ও সর্বব্যধি-নিমুক্তির আশ্বাস নিয়ে । কয়েদীর দল বহুমঙ্গল সম্মানসৌকে দেখে উল্লাস করে উঠল । তিনি যেন রুগ্নের আরোগ্য—দরিদ্রের বৃহৎনিধি ।

সেখানেও ভারতীয় নারীর জীবনযাত্রা নিয়ে বক্তৃতা করলেন স্বামীজি ।

দণ্ড যে প্রতিশোধের জন্তে নয় সংশোধনের জন্তে এই নতুন তত্ত্ব দেখলেন এই জেলখানায় । যারা পাণী আর পতিত তাদেরকে ঠেলে ফেলে দেবার জন্তে নয় তাদেরকে টেনে তুলে নেবার জন্তেই এই আশ্চর্য কর্মমন্দির । তারা যে পশু নয় ক্রীত-দাস নয় গৃহহীন ভিক্ষুক নয় এই বিশ্বাসে তারা বলীয়ান ।

‘যখন ভারতবর্ষের দরিদ্র ও পতিতের কথা ভাবি,’ লিখছেন স্বামীজি, ‘তখন ব্যথায় বুক বিদীর্ণ হয়ে যায় । তাদের দাঁড়াবার জায়গা নেই, ঠেঁটার উপার নেই, রাস্তা নেই পালাবার । তারা ভুবে যাচ্ছে দিন দিন । তারাও যে মানুষ এ কথাটাই তাদের কাছ থেকে গোপন রাখা হচ্ছে প্রাণপণে । হিন্দুধর্মের দোষ কি । হিন্দুধর্ম তো শেখাচ্ছে যেখানে যত প্রাণী সবাই তোমার আত্মার প্রতিক্রিয়া মাত্র । দোষ ধর্মের নয়, দোষ হৃদয়ের অভাব । প্রভু এসেছিলেন যুদ্ধ হয়ে, পরিবের জন্তে দুঃখীর জন্তে পাণীর জন্তে কত কঁপে গেলেন, কত শেখালেম কাঁদতে, কেউ তাঁর কথায় কান

দিলে না। কিন্তু নিরাশ হয়েনা। প্রভু আবার আমাদের ডেকেছেন, কোমর বাঁধো, সমুদ্র পতাঁকা তুলে নাও নুতকরে।

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রীক সাহিত্যের ডক্টর, অধ্যাপক জন হেনরি রাইট স্তনতে পেয়েছেন স্বামীজির কথা। স্থানবর্ণদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা অনেক দিনের, মিস কেটই পরিচয় করিয়া দিলেন। কিন্তু কি বৃহত্তর ব্যক্তিত্ব স্বামীজির, কথা কিছুতেই শেষ হতে চায়না। রাইট ভাবলেন একদিন তাঁর নিজের বাড়িতে স্বামীজিকে নিয়ে গেলে কেমন হয়।

যে কাছে এসে দেখে, কথা কয়, সেই জয় গায়। কেট স্থানবর্ণের খুড়তুতো ভাই ফ্রান্সলিন বেঞ্জামিন—তারও কানে উঠেছে এই অদ্বুতদর্শন হিন্দু সাধুর কথা। বিজ্ঞপ করে উড়িয়ে দেতে চাইছিল কিন্তু কাছে বসে কথা কইতে এসেই মজে গেল। যে সে লোক নয় ফ্রান্সলিন, সংবাদপত্রী, দার্শনিক, সমাজসেবক। ধরে নিয়ে গেল নিজের বাড়িতে, বোস্টনে।

রাইট এসেছেন বোস্টনে, স্বামীজির ধোঁয়ে। কোথাও ছুজনে বেরিয়ে গিয়েছে হয়তো, ধরতে পেলেন না। চিঠি লিখে রেখে গেলেন : স্বামীজি, যদি দয়া করে আসেন আমার ওখানে, সমুদ্রের ধারে আনিসকোয়াম গ্রামে, যদি আমাদের সঙ্গে কাটান একটা উইক-এণ্ড।

এক শুক্রবার এসে হাজির হলেন স্বামীজি। গৈরিকের সৈনিক, দিব্যদীপ্তিতে মহাস্রাণ্ড। যেন স্বপ্নের স্মৃতিতে জাগ্রত সত্য এসে দাঁড়ালেন। সমস্ত গাঁ-শহর আলো হয়ে গেল। ছল্লোড় পড়ে গেল চারদিকে। বাড়ি-ঘর-হোটেল-দোকান ভেঙে পড়ল দলে-দলে।

ত্রিশ বছরের যুবক, দেখ কি মহিমা তার আকৃতিতে। দেখ কি গৌরবে বহন করছে তার দেহ। যেহেতু নয় উজ্জ্বল-উজ্জ্বল জ্বল। অব্যাহতবল বিগ্রহ। বিপুলাস, মহাবাহু, কঙ্গুগ্রীব, বিশালাক্ষ। স্নিগ্ধবর্ণ, সর্বপুন্ডলকর্ণ, নিত্যনির্মলাঙ্গা। চলো দেখবে চলো। আছে কোথায় ? হোটেল-মেলে নয়, গাছতলায় নয়, ডক্টর রাইটের বাড়িতে। পণ্ডিত চিনেছে এবার পণ্ডিতকে : সারাক্ষণ কি কথা কইছে হে ? শুধু ধর্মের কথা। প্রতি নিশ্বাসে প্রত্যেকটি চক্ষুর পলকে ধর্ম। ধর্মই আলো ধর্মই বাতাস ধর্মই জল ধর্মই ষাণ্ড।

উনি বলছেন আর সবাই তাই শুনেছে স্থির হয়ে ? সায় দিচ্ছে ? তর্ক করছে না ?

অনর্গল তর্ক করছে। কিন্তু সাধ্য নেই তাঁকে তুমি পরাস্ত কর। পরাস্ত করা দূরের কথা সাধ্য নেই তাঁকে তুমি ফেল বেকায়দায়।

সেই শুদ্ধ জ্ঞানের দক্ষিণামূর্তির কাছে সমস্ত তর্ক স্তব্ধ। তুমিও বসে পড়ো সামনে। তারপরে শোনো উৎকর্ষ হয়ে।

একদিন রাইট স্বামীজিকে গির্জাতে নিয়ে গেলেন। মন্ত্রমুগ্ধের মত সবাই শুভল তাঁর দীপ্তবাণী। যাকে সবাই মূর্তিপূজক বলে চেয়েছিল নূর রাখতে, তাকেই এখন হৃদয়ে এনে বসাল ধ্যানের মূর্তি করে।

‘জগত্তের সমগ্র জাতিকে বলতে হবে বেদের ভাষায়, তোমাদের বাদবিসম্বাদ বৃথা। তোমরা যে ঈশ্বরকে প্রচার করতে চাও তাকে কি দেখেছ কখনো ? যদি না দেখে থাকো, প্রচার নিরর্থক, তুমি কি বলছ তাই তোমার জানা নেই। আর যদি তুমি ঈশ্বরকে দেখে থাকো, আর কিসের তবে বিবাদবচসা ? তোমার মুখ তখন অশ্রু-শ্রী ধারণ করবে। জীবনে তাই শ্রীমান হয়ে ওঠে। এক ঋষি তার পুত্রকে ব্রহ্মজ্ঞানলাভের লক্ষ্যে পাঠিয়েছিল গুরুগৃহে। শিক্ষা সমাপ্ত করে পুত্র যখন ফিরে এল ঋষি জিজ্ঞেস করলে, কি শিখলে ? নানা বিজ্ঞা নানা বাক্য নানা বেদ। কিছু হয় নি। আবার যাও গুরুগৃহে। আবার যখন ফিরল আবার সেই বাগাড়ম্বরের স্পর্ধা। এবারও হয়নি, আরেকবার চেষ্টা করো। তৃতীয়বার যখন ফিরল পুত্র, তখন তার আর কথা নেই, তখন তার শুধু বিজ্ঞা, তার শুধু শ্রী। তখন ঋষি বললেন, বৎস, তোমার মুখ আজ উদ্ভাসিত দেখছি, তোমার ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছে। যখন কেউ ঈশ্বরকে জানবে তখন তার মুখশ্রী তার স্বর তার দৃষ্টি তার ভঙ্গি তার সমগ্র আকৃতিই বললে যাবে। তখন সে মানুষের মহামঙ্গলস্বরূপ হয়ে উঠবে। তখনই সে ঋষি নামের অধিকারী হবে। ঋষিলাভই হিন্দুর মুক্তি।’

এ কি সেই হিন্দু নয় ? এ কি নয় সেই ঋষি ?

(ক্রমশঃ)

কুরুক্ষেত্র

শ্রীশক্তিপদ রাজস্কর

ইচ্ছাটা আমার অনেক দিন থেকেই ছিল। নানান ভ্রমণ-কাহিনী পড়ে—ছবি-ছায়া ঘেঁষে মনটা প্রায়ই উধাও হয়ে যেতো। যাকে যাকে নীল আকাশের নীচে—স্বপ্নাকার বালিচরে বলে স্বপ্ন দেখতাম—ধূ ধূ বককুমির ধারে বলে আছি। ‘খর’ বককুমির বুক চিরে রেললাইন চলে গেছে—কোথাও লোকালয় নেই, ধূ ধূ বালি আর বালি। বাতাসে খুনখুন করে বাজছে। না হয় কোন সমুদ্রের ধারে বলে আছি, পাঁয়ের কাছে ইয়া সন্নিহিত টেউগুলো এসে ছিঁত্ব পড়ছে; ফেনায় ফেনায় ভরে উঠছে মাটি। হিসালয়ের কোলে হরিহার শহরে এসে পড়েছে শঙ্কর শ্বর্ষের আজা, গদ্যার কাচ-খার অগ্নে দাতার ঘিরে বেড়ায় মহাশোল মাছগুলো—হরহর ধনি উঠছে চারিদিকে।

—এয়াই!...হঠাৎ ডাক শুনে চমকে উঠলাম। দেখি নাপিতদের স্ত্রী; অধিকারীবাগান থেকে চুরি করে পাড়া পেয়াটার কামড় দিতে দিতে বলে—একটা টাকা দিতে পারিল?

—টাকা! সর্বান্ন জলে যায় আমার। এতক্ষণে কোথায় পুরী-কান্ধী-হরিহারের স্বপ্ন দেখছিলাম—উনি এলেন টাকা চাইতে। জবাব দিই—টাকা! চাটে পরগার লস্কর শিমিন মাথের কাছে কড় বহুনি খেলাম।

স্ত্রীরা একটু হতাশ হয়ে পেয়াটার মৌলস্ব কামড় দিয়ে বলে—খ্যাং, একটা চিমটে হতো রে; গুণীকামার তৈরী করে রেখেছিল জটাধারী বাবজীর লস্করে; সে ব্যাটা নেবেনা। আমাকে তাই বল—

—স্ত্রীরা প্রায়ই বলে নামা-মানীর গালমন্দ বহুনি খড়োই পরোয়া করে সে, সম্রাট হলে বাবে তীরে তীরে।

—কান্ধী হরিহার প্রমাণ সব বেতে হবে তাহলে! ঘাবি তো? শুভালাম তাকে।

স্ত্রীরা বুকটান করে পদ্মাসন হয়ে বসেছে বালুচরে আকন্দভায়ায়। ইতিমধ্যেই তপস্বী আশন সে শিখছে। আমার কথায় বলে ওঠে—আলবৎ; প্রমাণে গিয়ে তো মাথা মুড়োতে হবে। তবেই দীক্ষা।

‘প্রমাণে মুড়িয়ে মাথা

যা রে সাধু কথা তথা।’

কিন্তু আমি না তুই। আরে বই পড়লে শেখা যায় না। দেশভ্রমণ করতে হবে—বুঝি?

স্ত্রীরা জান সেথো মুড় হই। স্কুলের দিক মাড়ায় না—গাঁবে সাধু এলেই সেইখানে গিয়ে

গোড়হাত করে বসে থাকে ; বাগেশ্বরের সাধুবাবা ভোঁ স্নাড়াকে আশ্বির্বাদ করে গেছেন—ভক্তি হোক তোঁর ।

ইতিমধ্যে স্নাড়া সাধুদের মত একটা বিচ্ছেদ রপ্ত করে ফেলেছে । কেবেরদিবাতে মহামেবের পাট ডুবোনো থাকে । গাঙ্গনের দিন শিবন্তত সেই কাটা-ওঠানো পাটে চিং হয়ে শোয়, পিঠের নীচে অনেক কাটাপেরক তোলা—স্নাড়া ভুবে ভুবে সেই জাগ্রত পাটকে তুলে কেয়া কোঁপের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছে, আমাকে দেখিয়ে তাক লাগিয়ে দেয় । স্নাড়া চিং হয়ে শুয়ে পড়ে জাগ্রত পাটের উপর ।

—হ্যাঁ রে, এ যে মহামেবের পাট !

—হোক না, আমিও ভোঁ সন্মোদী হবো । একদিনের সন্মোদী নয় দুখলি—শাকা সাধুবাবা ।

ডাকাবুকা ছেলেটা সব পারে ; পাটটাকে আবার কেয়া কোঁপের মধ্যে লুকিয়ে দেয়—শাপের আতানা ওই কোঁপে ওর কোঁপ ভরডর নেই ।

—তাঁ দিবি একটা টাকা ?

—কবে বেঞ্চবি ?

তোড়োড় কয়ই আছে । তা তুই কি পারবি বেতে ? ওই মিন্মিনে গলা—বাটকারার ওটকে শরীর—পারবি সইতে এই থকল ?—তবে দেশ দেখা ভোঁ হবে ।

আমিও তৈরী হয়ে আছি । বহু কঠোর সঞ্চয় পনের টাকার থেকে স্নাড়াকে একটা টাকা হাতছাড়া করলাম ।

—দে দিকিন আরও গণ্ডাকতক পয়সা ; গেকয়া রং কিনতে হবে—দু'এক আনার শিঙিও চাই । রাত-তোরেই বেঞ্চতে হবে কিন্তু—কাক-কোকিল ডাকবার আগেই ।

পায়ে হেঁটে তিন কোশ পথ, তারপর বাসে চেপে আঠার মাইল গেলে ইষ্টিশান । সেখানে পৌঁছতে পারলে আর ভাবনা নেই । গেকয়া পরলে ট্রেনের চেকারও নাকি প্রণাম করে বদবার জায়গা করে দেয়, টিকিট চাইবে কি—উলটে চা খাওয়াবে গাঁটের পরদা খরচা করে ।

মুখ-আধারি স্তোর । পথের আনন্দে বুক কাঁপছে দুকদুক । স্নাড়া গভীরভাবে আগে আগে চলছে, পিছনে পুঁটুলি বগলে আমি । জামা প্যান্ট গেকয়া কিছু নগন টাকা, চিড়ে-জুড় ওতেই বাঁধা । স্নাড়ার হাতে সেই বকবকে চিমটে, লোটা-কষল পিঠের সঙ্গে বাঁধা ।

—ঝুন ঝুন বনাং । ঝুন ঝুন বনাং ।

—কেমন শব্দ শুনেছিস, তেজী সন্মোদীর চিমটে, শুপে তৈরী করেছে ভালো ।

আমার মনে একটার পর একটা ছবি ভেসে উঠছে।...

—হা রে, কুরুক্ষেত্র যাবি তো? ভীমের গণা দু'একটা। ভীর-ধনুক যদি পাওয়া যায় নিয়ে আসতে হবে। শেনিন পটলা বলছিল—ওসব ঐক্ বাজে কথা।

ভাড়া বামিয়ে দেখে আমাকে—চূপ কর। কুরুক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র কবির নি—শেষকালে কুরুক্ষেত্র বেধে যাবে।—কে আসছে মনে হচ্ছে না?—থমকে দাঁড়িয়েছে ভাড়া—

চারিদিক দেখে বলি—কই না তো?

—না রে, কালীদাশনা, সন্ন্যাসী হওয়া এসব শুভ কাজে মা কালী নানা মূর্তি ধরে এসে বাধা দেয় বুলি। ঠর ঝাড়ুরী যে কীস হয়ে যাবে। হাঁ হাঁ বাবা, এসব ভেঙ্কী, মায়া। সন্ন্যাসীর কাছে ওসব ট্যাং-কু চলেবে না কিনা তাই বাধা দেবেই।

ওসব কথা আগে শুনিনি—ভেঙ্কি বাম্বী! ও যে কেশবপাড়ের মেলায় আসে চার পরদার টিকিট।

—খ্যাং! ভাড়া বামিয়ে দিয়ে হন হন করে চলতে থাকে।

শহরের কাছাকাছি এনে সকাল হয়।...লোকজন শুখনও পথে দেখা দেয়নি; দূরে শহরের শাধা বাড়ী দেখা যায়। হঠাৎ ঝনাং করে চিমটেটা ফেলে দিয়ে ভাড়া বাস্তা ছেড়ে বাঠে নেমে দৌড়ছে দেখে অবাক হয়ে যাই। টং টং করছে লোটা আর কবলের বোঝা। আল পগার টপ্কে ভাড়া দৌড়ছে একটা শিয়ালের পিছনে।—হেঁ-উলো হেঁ!—উলো হেঁ। শিয়ালও এক একবার পিছন মিকে চায়, আবার দৌড়; বাস্তা পার হয়ে সটান উজিরে পালাল শিয়াল।

ভাড়া বাস্তায় উঠে হাঁপাচ্ছে হাঁদড়াস করে।

—কি হল রে?

—চল, বাস্তা শুভ করে। এলাম। কথায় বলে বাঁ-শিয়াল। দেখলি না ভাইনের শিয়ালকে বাস্তে তাড়িয়ে এনে বাস্তা বদলালাম। জয় গুরু—কালীকরালবন্দনায়া।

ঝুন ঝুন ঝনাং! আবার চিমটে-বাস্তির সঙ্গে বাস্তা হুক হল।

লোকজন আগে উঠেছে শহরে। ভাড়ার অপরূপ মূর্তি হয়েছে। কেবতায় দিয়ে কাপড় পরা, একটা গামছার এক মিকে বাঁধা ভাজ করা কবল—পিঠের একদিকে ঝুলছে টং টং শব্দে লুস্ত একটা ঘটি; আর হাতে ঝকঝকে চিমটে বাস্তা—ঝুন ঝুন ঝনাং।

পিছনে চলছি আমি—এতখানি পথ হেঁটে হাঁপিয়ে উঠেছি, বাড়ির পুটুলিটা মেহাং কম নয়; এ-কাঁধ ও-কাঁধ করে নিয়ে চলছি।

—এই ভাড়া, একবার নেবা এটা।

—খাং, সাধুবাবা পুটলি বইবে কি রে ? চালা থাকে কেন ? নিয়ে চল একটু, দূরেই মটর অপিস—এল গেছি ।

সর্বাঙ্গ জলে ওঠে—আমার টাকার কেনা চিমটে, আমার বহুকষ্টের অমানো পরমায় ওর পেকয়া ছাপান ; জামাটা পর্যন্ত আমার । একটু পুটলি বয়ে নিয়ে যেতেই এত বড় কথা ! গলদঘর্ষ হয়ে উঠেছি, তবুও কোন রকমে টেনে নিয়ে চলি ।

স্টাড়ার ভোগলুমি ভগ্নানী আছে । সটান মটর অপিসে গিয়ে বাসে ওঠ—তা নয়, ও গিয়ে অপিসের সামনের অশথতলার ডেরা নিল । বার কতক ব্যোম ব্যোম ডাক তুলে স্বাধান দিয়ে চিমটে গেড়ে বলল সাধু ।

—শেষকালে টেনে পড়বি স্টাড়া । চেনা লোক কেউ বেরিয়ে পড়লে বিপদ হবে । চল এই মটরেই কেটে পড়ি । দূরে গিয়ে ডেরা নিবি ।

—চিনলে কি হবে ? চুরি করিনি তো । ভাবনা কিদের । তুই টপ করে দু'ভাঁড় চা, না-না, ঘটিটা নিয়ে যা—কল থেকে জল নিয়ে—চা আনবি ।

—পরদা ? বলে উঠি ।

ফ্যাট করে ওঠে স্টাড়া—হাড়কেল্লন তুই । ব্যবসা থেকে রোজগার করতে গেলে টাকা চালতে হয় আগে । খাইয়ে-দাইয়ে রাখ, দেখবি ছ'হাতে টাকা কামাব । অটেল টাকা । ঘোর না কত ঘুরবি হিম্মি-দিম্মি । নে চা আন, গংম পেয়াজি পেলে লুকিয়ে পকেটে পুরে আনবি, বুরলি—

হাড়শিল্পি জলে উঠছে সাতসকালে । তিন কোশ পথ ওর মোট বয়ে এবেছি । একবারও কাঁধ লাগায় নি । টাকা দিয়ে ওকে চিমটে বানিয়ে দিয়েছি—নগদ দশগুণ পরদা আরও মিথৈছি । তারপর চাকরের মত জল চা ইত্যাদি আনৃ নিষের পরদা খরচ করে !

—এই শেষবারের মত আনছি কিন্ত । এরপর আর খরচ করতে পারবো না । এখনও সব দেখা বাকী, কান্দি হরিষার ফুকফেজ কিছুই দেখা হ'ল না ।

আবার ফুকফেস্তর ! তুই ভাবিস নি দেখ ভেঙী লাগিয়ে দোব ।

চা-পেয়াজি খেয়ে স্টাড়া বলে—কাল সকালের মটরে যাবো । তার মধ্যে হুঁচোর পরদা আয়দানী করে দোব—তুই এদিক-ওদিক একটু ঘুরে আয় ।

বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমন্ত শহর ভেগে উঠেছে । বাজার পাড়ী পাড়ী তরকারী, ধান চাল আয়দানী শুরু হয়েছে, অবাক হয়ে তাই দেখছি । কাছারীর বাগান্ধার বট অশথ পাছের নীচে উকিল বকেলের হল হৈ চৈ করছে । বাওয়া-মাওয়ার ব্যবসায়ীও কিছু হয়নি । দেশ দেখার প্রথম আনন্দে বেশ মশগুল হয়ে আছি ।

মটর আগিলের ওপাশে
খটতলায় দেখি দু' চারজন লোক
জমা হয়েছে। জাড়াকে চেনবার
উপায় নেই। মাথা নীচু করে
পা ছুটে ভাঁজ করে উপরে তুলে
ঠার ধ্যানস্থ হয়ে আছে। ছাই
মাথা, পা কপালে একতাল মেটে
দিন্দুব। সামনের গাষছার বেশ
কিছু পরশাও পড়েছে—ও পাশে
কে বালক ব্রহ্মচারীকে নামিয়ে
দিয়ে গেছে কয়েকটা আম-বেল-
কলা, আতপ চাল ইত্যাদি। তা
ক্যো জাড়া বোঝবার করেছে মন্দ নয়।



সামান হাতে জটা পরচুলাটা বাস থেকে গেল—পড়ে রইল জিম্বল-চিমটে-
কথল আর লোটা—জাড়া হারলে চোচা পৌড়।

হঠাৎ এই দিকে জাড়ার সামাকে এগিয়ে আসতে দেখে চমকে উঠি। গীজাণোর লোক,
নেশার ঘোরে চোখ দুটো লাল টকটকে হয়ে উঠেছে। সকাল বেলাতেই বাড়ীতে না দেখে বোধহয়
খুঁজতে বের হয়েছে।

কিস্কিন্ করে বলি—জাড়া!

গম্ভীর গলায় জাড়া বলে—কল্যাণ হোক।

নিকুচি করেছে তোম কল্যাণের; পুটুলিতে আমার চৌক টাকা—জামা-কাপড় আছে, আর
ওই চিমটে এক টাকা; সব গুটিয়ে নিয়ে পালাব কিনা ভাবছি, অতর্কিতে এসে জাড়ার সামা গর্জন
করে ওঠে—আই জাড়া!

সাদুবাবার ধান তল হয়ে যায়; শুড়াক করে লাফ দিয়ে আসন ছেড়ে উঠে পৌড় মেবার
আগেই ওর চুলের জটা সমেত মাথাটা ধরে কেলে। জাড়াও মরীচা হয়ে হেঁচকা টানে মাথাটা গলিয়ে
নিরে চোচা পৌড়। সামান হাতে জটা পরচুলাটা বাস থেকে গেল—পড়ে রইল জিম্বল-চিমটে-কথল-
লোটা আর আমি পুটুলিসমেত। সামাও নাছোড়বান্দা—দৌড়ে গিয়ে ভারেক ধরে আসল।

—চিমটেটা আমার।

সামান আগেই আমি দখল নিয়েছি নোভুন চিমটেখানার। সামা গর্জন করছে—চল বাড়ী।
লোকজন ভবে গেছে। মটরের বাড়ীদল—লোকজন বিনা থরচায় এমন মজা দেখবে ভাবতে

পারেনি। কে সঙ্গপদেশ দেয় : দেন না আজ্ঞাসে অ'ড়ং খোলাই—টিট হয়ে যাবে। আজ কালকার ছেলেরদের সাহস দেখুন দিকি।

কে বলে ওঠে পরীক্ষায় ফেল করেছে নাকি খোঁকা ?

—ভেঁপো ছোকরা। সে না টাটিয়ে লাল করে।

ইত্যাধি নানা মধুর মধুর সম্ভাষণ শুনতে শুনতে বের হয়ে এলাম। খুনখুন করে বাজছে চিমটে। ওই বাড়িই তোর রাতে কত মিষ্টি লাগছিল—এখন গা জলে ওঠে।

জাড়ার হাথা তিন কোণ পথ জাড়াকে নিয়ে গেল ঠিক যে ভাবে হাকখ্যাক 'ক্যাবি' করে গোলের দিকে বল নিয়ে চলে সেই ভাবে। একটা করে মোলারেনে কি'ব করে আর বলটা থানিকটা গড়িয়ে যায়—আগে আগে। জাড়াকে ছুটবল ভেবেছে ওর হাথা। মাঝে মাঝে আমার দিকে গজগজ করে চাইছে যেন কাগজিলেবু-চোখা করে চুবে কেলবে এইবার হাক-টাইয়ে। গর্জাজ্জে : কুরুক্ষেত্র—দেখবি চল কুরুক্ষেত্রের কাকে বলে!

পথেই এই কাণ্ড—বাড়ী ফিরে এসে বা অবস্থা হয়েছিল তা আর নিম্নের মুখে বলি কি করে। ওটা ভেবে নিও। তবে তাতেই কুরুক্ষেত্রের কিছুটা নমুনা পেয়েছিলাম।

সেই চিমটেখানা এখনও ঘরের এককোণে পড়ে আছে—ভোজটোজের সময় উত্থন ঝাড়া চলে—মাঝে মাঝে ছান থেকে ওরই খুন-খুন শব্দে বাধব তড়াই।

শালিক শালিক

ত্ৰিগলাশ মিত্র

শালিক শালিক শালিকটি

ঘোমটা মাথায় দিয়ে

ফুল গুঁজেছে এলো চুলে

আজ যে তারি বিয়ে।

গয়না নিয়ে মথনা আসে

হলুদ মেখে বাবুই হাসে

বরের পিসী চড়ুই এল

পান-সুপারি নিয়ে

শালিকরাণীর বিয়ে।

শালিক শালিক শালিকটি

ঘোমটা মাথায় দিয়ে

ইকিড় মিকিড় করবে খেলা

শবুর বাড়ি গিয়ে।

ঘুঙুর পায়ে নাচবে দিনে

বাপের বাড়ি আসবে দিনে

চকোলেট আর লজ্জেল নিয়ে

সঙ্গে যাবে টিয়ে

শালিকরাণীর বিয়ে ॥

তোমরাও এমনি হ'তে পারো

— শ্রীনেল্লনাথ সিংহ —

তোমরা লেখাপড়া শিবহ। যদি তোমাদের ভিজ্ঞেস করি, “কেন এই লেখাপড়ার আয়োজন?” মনে হয় অনেকেই শোনাবে কবিতার সেই ছুটি লাইন—

“লেখাপড়া করে বে

গাড়ী ঘোড়া চড়ে দে।”

মতিই কি তাই? আসল লেখাপড়ার আয়োজন কিন্তু প্রয়োজনের ভাগিদে নয়। তা কেবল জিনিষ জড় করবার বিভ্রাট আয়ত্ত করা নয়। তবে লেখাপড়ার বা শিকার উদ্দেশ্য কি? এই প্রশ্নের উত্তর নিশ্চয় বহুবার তোমাদের কানে গিয়ে থাকবে। গুরুজনারা যখন আশীর্বাদ করেন, তখন কি বলেন? “লেখাপড়া শেখো, মানুষ হও।” মানুষ হওয়ারটাই বড়। সেটাই বড় কাজ ও শক্ত কাজ। কতকগুলো বই গড়ে পরীক্ষায় পাশ করলেই লেখাপড়া শেখা হয় না। লেখাপড়া করে গাড়ী চড়লেই মানুষ হওয়া যায় না। মানুষের মতন মানুষ তাই অগতে দুর্গম। পণ্ডিত হওয়া এক কথা, আর মানুষ হওয়া আর এক কথা। তাই প্রকৃত মানুষ ক'জনই বা মানুষের ইতিহাসে দেখা দিয়েছে। ইরাস্মাসের ইরাস্মাস (Erasmus), জার্মানীর গ্যটে (Goethe), আইনষ্টাইন (Einstein), আলসেসের শ্বেইৎজার (Schweitzer) ইতালীর লিওনার্দো দা ভিঞ্চি (Leonardo Da Vinci), ভারতের বিজ্ঞানাগর, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী, বিবেকানন্দ, এঁদের মতন স্বপ্নজন্মা পুরুষদের জন্তে আমাদের অনেকদিন ধরেই অপেক্ষা করতে হবে।

মানুষ হওয়ার পথ বড়ই দুর্গম। সে পথ রেলের পথ, ভাণ্ডারের পথ, সংস্কারের পথ। পনের আনা লোকের তাই নজর টাকার খলির উপর। সেই জন্তেই মানুষের মধ্যে ক্রুর-পুণ্ড্র আজ সংক্রামক হ'য়ে দেখা দিয়েছে। অর্থাৎ এমন কাজ করে যাতে টাকার পুঁটলী মোটা হবে, পাড়ী হবে, বাড়ী হবে, বাগান হবে—স্বপ্নের সরঞ্জামের অভাব হবে না। প্রাচুর্যের স্রোতে গা-ভাসিয়ে নিয়ে চলে যাবে। মধু-মুগ্ধানী যৌমাছির মতন তাই আমরা ছুটছি স্বপ্নের সন্ধান—স্বপ্ন পাই না, কেবল শব্দ মিটিয়ে চলি। স্বপ্নের নামে সৌখীন উপাচার সংগ্রহ করি। একটা গল্প বলি শোন :

এক বিরাট ধনী ছিলেন বেলজিয়মে। প্রচুর অর্থ-সম্পত্তি রেখে তিনি যারা যান। মৃত্যুর আগে তিনি এক শেষ চিঠি লেখেন। সেটা লেখেন বেলজিয়মের প্রসিদ্ধ দার্শনিক লেখক মরিস মোটারলিঙ্কে, যিনি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। ঐ ধনিক ব্যক্তি লিখেছিলেন, “বে

ঐশ্বরের অধিকারী আমি হিন্দু, তা একজন মাহবের থাকা উচিত নয়। হুশাই কাটিয়েছি বছরের পর বছর স্বর্গের সন্ধানে।”...মেটাবলিক বলেছেন যে, “টাকা দিয়ে যা কিছু পাওয়া যায়, তা সবই ঐ ধর্মীর ছিল, কিন্তু তাঁর সমস্ত সম্প্রদান করার ক্ষমতা প্রায়শই তা কেমনা যায় না। সেটা ছিল হুগো তাঁর নাগালেরই মধ্যে এবং তাঁর ক্ষমতা কিছু খরচ করতে হয় না।”

কি হুগোর পরস্তের সেই পুরাতন গল্পটি। একজন প্রবল প্রতাপশালী রাগা ছিলেন, কিন্তু তাঁর মনে স্বর্গ ছিল না। স্বর্গী হোতে হলে কি করা দরকার জানবার ক্ষমতা তিনি তাঁর রাজ্যের জ্যোতিষীদের সঙ্গে পরামর্শ করতে বসে গেলেন। অস্বাস্থ্য গবেষণার পর তাঁরা রাজ্যের সমস্তর এক উত্তর খুঁজে বার করলেন। বললেন, “আপনাকে এক স্বর্গী লোকের জামা পরতে হবে।” বছরকাল ধরে চলল খোঁজাখুঁজি। সম্পূর্ণরূপে স্বর্গী এক গরীব চাবাকে পাওয়া গেল। কিন্তু জীর্ণ-শীর্ণ সেই মাহুবটির গায়ে কোন জামা ছিল না।

তাই মেটাবলিক বলেছেন, “জীবনের অনেক স্বর্গ ও অনেক দুর্ঘটনাই বৈধাত্মিক, কিন্তু আমাদের অন্তরের শান্তি দেবের শাসনের বাহিরে অংশ আমি তা বলতে চাই না যে, সব মাহুবই বাইরের জিনিষ পেয়ে হুগো হতে পারে। বাইরের অবস্থা অনেক কিছুই করতে পারে, কিন্তু আমাদের মধ্যে মনোভেদে কম ভাগ্যবান যিনি, তিনিও শাস্ত্র স্তায়বান ও উদার হয়ে আন্তরিক জীবনকে স্বপ্নের করতে পারেন। তাঁর অন্তরে থাকবে না হিংসা, ঘেদ, মাংসর্ষ এবং ব্যর্থতার ঘেদ; এই স্বপ্নের অমাবিল অন্তরের দৃষ্টিতে দেখতে শিখতে হবে সকল জনকে। এই হলো প্রকৃত স্বর্গের পথ।”

শাস্ত্র, স্তায়পরায়ণ, উদার হিংসা-ঘেদ বীন হুগোই প্রকৃত মানসিক স্বলাভের যোগ্যতা অর্জন করা। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা হল চাই কাজ। এমন কাজ করতে হবে যে, যে কাজ করবে এবং আর যার ক্ষমতা করবে, তারা উভয়েই হবে ধন। আলকের পৃথিবীর সেরা মাহুব আর্গবাট হুইংজার এই কাজের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন, এটার নাম হল, ‘আমার দ্বিতীয় কাজ’। অন্তত মাহুব এই হুইংজার। বয়স এখন ৮৩ বছরের কাছাকাছি। অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী, দর্শন-শাস্ত্র, সঙ্গীত-শাস্ত্র, ধর্ম-শাস্ত্র, চিকিৎসা-শাস্ত্র—চার-চারটি শাস্ত্রে ডক্টর উপাধি পেয়েছেন, দারাজ পৃথিবী জুড়ে তাঁর খ্যাতি। খ্যাতি শুধু তাঁর জ্ঞানের নয়, খ্যাতি তাঁর দেবার ও আন্তরিকতার। দেবাণ্ডা তিনি শিখেছিলেন গাড়ী-ঘোড়া চড়বার ক্ষমতা নয়, আক্রমণের গভীর জ্ঞানে সূর্য, দরিয় কালো নিগ্রোসের সেবার জীবন উৎসর্গ করার ক্ষমতা। তাই তিনি আজ ৪৫ বৎসর ধরে এই অস্বাস্থ্য দেবার আন্তরিকতা করে চলেছেন।

প্রায় চার পাঁচ বছর আগে তিনি যান আমেরিকায়। ধন-সুখের দেশের লোকেরা চাইল তাঁর কাছে বাস। তখন তিনি ‘তোমার দ্বিতীয় কাজ’ নামক তাঁর এই বাণী শোনান—

—“রনের এই পেশার কৃপাকেই আমি বলি ‘তোমার দ্বিতীয় কাম’। এ কাজ করার হুযোগ লাভ করা ছাড়া এতে আর কোনো পাওনা নেই। এ কাজই এনে দেবে তোমাকে মহৎ হুযোগ, আর এতেই পাবে তুমি অদ্বীপ শক্তি। তোমার ভিতরকার যে সকল শক্তি এখনও কোনো কাজে লাগেনি, সেই সকল শক্তিকে নিয়োগ করতে পারা যাবে। অস্ত্রের সেবার আত্মনিয়োগ করেছে, এমন সব লোকেরই আজ পৃথিবীতে অভাব। হার্বলেশহীন এই প্রমের অস্ত্র উপকারী ও উপকৃত উভয়ের উপরেই আসে আশ্রয়।” তিনি আরও বলেন, “ব্যক্তিগতভাবে আমরা মৃত্যু ভুল করি এই যে, জীবনে আমরা চোখ বুজে চলি, আমাদের কাজ করার হুযোগগুলি লক্ষ্য করি না। আমরা আমাদের চোখ বুজে যখনই খুঁজতে আরম্ভ করি, তখনই দেখতে পাই বহু লোককে বাঘের জন্তে আমাদের সাহায্যের প্রয়োজন রয়েছে—বড় ব্যাপারে নয়, অতি সামান্য ছোট ছোট কাজের জন্তে। মানুষ যেমিকেই চোখ ফেরাক সে একজন না একজনকে দেখতে পাবে, যে তার সাহায্য চায়।”

স্বইংজার তাঁর অভিজ্ঞতার একটি কাহিনীও এখানে শোনান। তিনি বলেন: “তিনি জার্মানীতে রেলের এক তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় ভ্রমণ করছিলেন (তিনি তৃতীয় শ্রেণী ছাড়া চড়েন না, আমাদের গাড়ীও যেমন করতেন)। তাঁরই পাশে বসেছিল একটি উৎসব বৃদ্ধ, কি-বেন-কোন অচেনা জিনিষ খোঁজার ভাব নিয়ে। তাঁরই অপর দিকে বসেছিল উষ্ণ ও চিন্তাবিত্ত এক বৃদ্ধ। তখনই ছেলেটি বলে উঠল যে, ‘আমরা কাছের সবচেয়ে বড় শহরে পৌছবার আগেই অবসর গ্রহণ করব।’

বৃদ্ধটি চিন্তিত ভাবে বললেন—“জানি না যেখানে পৌঁছে আমি কি করব। আমার একমাত্র ছেলে হাসপাতালে পীড়িত হয়ে পড়ে আছে। আমাকে সঙ্গে সঙ্গে আসতে বলে এক টেলিগ্রাম করেছিল। তার মৃত্যুর আগে আমার তাঁর সঙ্গে দেখা করতেই হবে। আমি গ্রামের লোক, জয় হর শহরে গয় হারিয়ে ফেলবো।”

এই কথার উত্তরে ছেলেটি বলল—“আমি এই শহর ভাল করে চিনি। আমি এখানে নেমে, আপনাকে আপনার ছেলের কাছে পৌঁছে দিয়ে পরের গাড়ীতে চলে যাব।”

কামরা ছেড়ে তারা যখন নেমে গেল মনে হল যেন তারা হুঁল্লন পরম আত্মীয়।

এই সামান্য সংকালের মূল্য কে নির্ধারণ করতে পারে? সমাগ থেকে তোমরাও তো এইসব ছোট ছোট কাজ করতে পারো।”...

তারপর তিনি আরও বললেন, প্রথম মহাযুদ্ধের সময় লণ্ডনের ঘোড়ার গাড়ীর এক বৃদ্ধ কোচম্যানের সৈন্তদলে যোগদানের বিফল চেষ্টার কথা। ঘটনাটি হচ্ছে—“সেই বৃদ্ধ সৈন্তদলের বিভিন্ন নিয়োগ-কেন্দ্রে ব্যর্থমনোরথ হয়ে, নিজেই এক কর্মসূচী নির্ধারণ করে নিল। শহরের

বাহিরের ক্যাম্প থেকে রণাঙ্গনে যাবার আগে তারা যে ছুটি পেত, সেই ছুটি উপভোগ করতে অনেক সৈন্যই লগনে আসত। প্রতিদিন রাত্রি আটটার সেই বৃদ্ধ কোচোয়ান গাড়ী নিয়ে বেল-ষ্টেশনে উপস্থিত থেকে সিক্-জাস্ট দৈন্ত্রের সাহায্য করতে লেগে'গেল। সৈন্তদল ভেদে দেওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সে প্রতি রাতে চার-পাঁচবার লগনের গোলক-খাঁচার মতন রাস্তার পথ-প্রদর্শক বেচ্ছাসেবকের কাজে লেগে গিয়েছিল।

অন্তে কি মনে করবে এই আশঙ্কাতেই না আমরা কত সং ইচ্ছা কার্যকরী করবার দাঁহস পাইনা। বড় বড় শহরের ভিড়েই মানুষ বেশী একা-একা বোধ করে। জনয়ের দুয়ার খোলা বিশেষ দরকার সেইখানেই। যেখানেই থাক না কেন,—অফিসে, কারখানায়, রেল, নিজেকে অপরের কাজে লাগাও। কে বলতে পারে, সামান্য একটু হাসির ছোঁয়া, দরদ-স্তরা চাউনি মানুষের মনে স্বর্ষচ্ছটার মত প্রবেশ করে, অস্ত্রকার দূর করে দিয়ে, তাকে মৃত্যুর হাতছানি থেকে সরিয়ে নিতে না পারে।

যদি সৌভাগ্য তোমার প্রতি প্রসন্ন হয়, তুমি মনে কোরো না যে সৌভাগ্যের দান কেবল তোমারই প্রাপ্য। হৃৎক ভোগও যদি করে থাক, এই শপথ করো যে সেই হৃৎক থেকে অন্তকে রেহাই দেওয়াই তোমার জীবনের কর্তব্য। কষ্ট করে যে ত্যাগ স্বীকার করা হয়, সেটাই প্রকৃত ত্যাগ। এই ত্যাগ ও পরিহিত ব্রতই তোমার জীবনে এনে দেবে প্রকৃত স্বা।" এই সব কথা মহান্ পুংগব হুইংজার বলেছিলেন আমেরিকায়।

তাই কবির কণ্ঠের সঙ্গে হর মিলিয়ে তোমরাও এই শপথ করো যে—

“নদী যেমন দুই কূলে তার

বিলিয়ে চলে জল।

ছুটিয়ে তোলে তরুলতা

শস্ত্র, ফুল ও ফল।

তেমনি ক'রে মোরাও ভবে

পরের ভালো ক'রব সব ;

মোদের সেবার উঠবে হেসে

এই ধরশীতল।”



[উপভাস]

ঘোচাচাৰ্য

(পূৰ্ব-প্ৰকাশিতের পর)

একি, এসব কি লেখা। ছড়ার পর ছড়া, শিবানী পড়ে—

এল সেদিন একটা হরিণ

সবুজ ঘাসে হয়ে বিলীন

ছোট্ট মন্থীর ধারে,

বাস্ত লেজ নাড়ে।

আরও কত কাটা-কাটা ছড়া, কোনটার মিল আছে, পড়তে ভাল লাগে, কোনটার মিল খুঁজে
পাওয়া কঠিন, থাকলেও কানে লাগে। সব কথার অৰ্ধও বোকা যায় না।

এ মা, এ কি ছড়া !

বাহুরল

নাকুর ভ্যাং ।

খিনি-খিনিজা

নাকুর ভ্যাং ।

হাইশো বোলা

ঢাক পেটে লালবিহারী ।

কলার খোলা

ফেরি হাঁকে গলা ছাড়ি ।

নাকুর ভ্যাং ।

নাকুর ভ্যাং ।

নাকুর ভ্যাং ।

নাকুর ভ্যাং ।

ভাকলো ব্যাং ।

মাবল ল্যাং ।

ভাকলো ট্যাং ।

ভাকলো ট্যাং ।

বহু মাষ্টার ঘমের বাড়ী ।

বল হরি হরি বোল ।

শলু বেদের চাপ বাড়ী ।

হরিবোল হরিবোল ।

বেলার হাদী ।
 গুণের রাশি ।
 হেডমিস্ট্রেস বি.এ পাশ
 তাঁহার ছিল কত আশ ।
 স্বামী বটে মহৎ লোক ।
 মেয়ে কিন্তু ফিটে জোক ।

আবার মানচিত্র, বাংলা দেশের । তারপর আবার কত হিজিবিজি লেখা, কোনটা গল্পর বিষয়
 প্রবন্ধ, কোনটা ইংরেজী ভাষায় প্রবন্ধ রচনার ব্যর্থ প্রয়াস ! চার লাইন লিখে আর অগ্রসর হতে
 পারে নি রচয়িতা । আবার ছড়া—

এবার ছড়াটার অর্থ ঠিক বুঝতে পারে না শিবানী । পিনাকী লিখেছে—
 শিবের বউ শিবানী । ইঁদুর ছিল মেয়েটা ।
 বুদ্ধি নেই এক আনি । কামড়ে দিল টিয়েটা ।

শিবানীর ঠোঁটের কোণে হাসি এসে মিলিয়ে বায় । প্রথম লাইনটা বন্দ্য লাগে নি । শিবের
 বউ হ'তে কেন্ মেয়েই বা আপত্তি করবে ? যদিও বউ কি বন্দ্য তা ঠিক জানে না শিবানী, তথাপি
 মায়ের নিত্য শিবপূজার ঘট। দেখে শিবের প্রতি ঘোঁড়াঘুটি ভাবে প্রকার ভাবই পোষণ করে সে ।

কিন্তু পূর্বজন্মে ইঁদুর । এ অগবাস অসহ । শিবানী অনেক ভেবে-চিন্তে ছড়ার নীচে গোটা
 গোটা অক্ষরে ভোঁতা পেন্সিল দিয়ে লিখলো—

পিনাকী । তেঁতুল গাছের তলে ।
 চালাকী । খুঁতরো মূল গলে ।
 জোনাকী । নাকুর ড্যাডাং ড্যাং ।
 মিট মিট জলে । ভাস্ক-তার ঠ্যাং ।

আর জোড়া দিয়ে পারে না শিবানী । বাহুর ও পিনাকীর প্রবেশে তার প্রতিশোধ-কাব্যে
 ছেঁষ পড়ে ।

আচমকা পিনাকী এসে পড়বে শিবানী ভাবতে পারে নি । সে একবার বাহুরের দিকে
 তাকায়, আর একবার পিনাকীর দিকে নজর দেয় । তিনজনের মধ্যে কারুরই হঠাৎ বাক্যশ্রুতি
 হয় না ।

অবশেষে বাহুর এগিয়ে এসে শিবানীর হাত থেকে খাতটা টেনে নিয়ে পড়তে শুরু করে ।...

পিনাকী চালাকী জোনাকী ।

কৈ শিনাকীর মনে তো রাগ হচ্ছে না মোটেই। ঢালাকী আবার জোনাকী হয় কি করে ?

আম্বকের মেজাজ পূর্ণী, এমনকি ঠ্যাং ভাঙ্গুক এই দুঃভিলাষ প্রকাশ করে লিখতে বার পেলিলে এতটুকু ঋটিকার নি, তাকেও ক্ষমা করতে আপত্তি নেই শিনাকীর। সত্যিই তো ঠ্যাং ভাঙছে না তার। তাছাড়া তিন বছর আগে যেমনটি ছিল, এখন তো আর তেমনটি নেই। শিবানীর রচিত লাইন কব্বটির উপর আর একবার চোখ মুলিয়ে নেয় শিনাকী। অ কৌচকার, কিন্তু শিবানীর বিছানী ধরে টান দেবার ইচ্ছে নেই আর।

শিবানীর গায়ের রঙ, শিনাকীর মুখের রঙ, ধ্বংসও ফর্সা। গোলাপ ফুলের আভা গালে। টানা টানা চোখে নীল আভা। দীহু নামা বলে, খাঁটি আর্বদের চোখ কটা হয়, নীল আভা দেখা যায়। তবে কি শিবানী খাঁটি আর্বকরা? শিনাকীর চোখের মণি অনেকখানি কালো। কালো মানে অনার্ব। মনে বার শিনাকীর মন। অনার্ব হলোই বা কি ক্ষতি? ইতিহাসের বইতে আর্বরা যদি অনার্বদের হারিয়ে না মিত বারবার, তাহলে অনার্ব হতে শিনাকীর বিশেষ আপত্তি ছিল না। অনার্ব হওয়ার অনেক সুবিধেও আছে। প্রথমতঃ, সব রকমের মাংস খাওয়া চলে। শূন্যের মাংসেও আপত্তি নেই। মূর্গী খাওয়াও যায়। বিওগ্রাফির মাষ্টার রমানাথবাবু বলেন, জগতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুবাস্তু মাংস হোল মূর্গীর আর বগাহ অবতারের। আর্ব জাতির রঙ, ফর্সা বলেই কি কালো রঙের জয়-মোনোরারের প্রতি দৃষ্টাবোধ জেগেছিল? শিনাকী অশ্রুতভাবে ভেবেছে অনেক, ঠিক ঠিক হরিস করে উঠতে পারে নি।

কেন, এই পাড়াখান্ড বিচার ?

শিনাকীর বড় লোভ হয় একবার অন্ততঃ রামপাখীর মাংস রান্না খেয়ে বেঁচে। ববাহের আশ্বাস না জানি কি উপায়ের।

বাহুর ভাবে, শিনাকী একটা পোটা পেশে খেতে চেয়েছিল, মাংসের প্রস্নে বলে—মা জানো শিহু কেন কবিতা লিখেছে :

পেশে খাও,

নাহি ঘোষ

যত চাও

যত ঘোষ।

শারনা দেবী হেসে বলেন, এই বুকি একটা কবিতা হোল? বাহুর কবিতা কি বস্ত তা নিয়ে মাথা ঘামাতে উৎসাহী নয় মোটেই। কথা দু'রিয়ে প্রস্ন করে—

—মা, শিবানীর বাবা কি খুব বড়লোক ছিলেন ?

—কেন রে ?

—শিবানী বলেন, তার বাবা মহাপুরুষ। মহাপুরুষ মানে কি মা ?

—মহাপুরুষ হানে যিনি মহৎ অর্থাৎ বড় কাজ করেন এবং যে কাছের লোক দেশের ও দেশের কল্যাণ বাড়ে ।

—কল্যাণ হানে কি ?

—হানে, মঙ্গল অর্থাৎ ভাল—পৃথিবীর ভাল করেন মহাপুরুষরা ।

বাহুর মনোযোগ দিয়ে শোনে, কি যেন ভাবে, গভীর ভাবে বলে—হা, ওমা, শুনছ ?

—কি রে, বল না ।

—আমি মহাপুরুষ হব ।

—সাদনা দেবী দুই হেসে ছেলের দিকে চেয়ে বলেন—বেশ তো, হ্যাঁ । ভাল করে পড়াশুনা কর তা'হলে আজ থেকে ।

বাহুরের মুখটা হঠাৎ রান হয়ে যায়, পুনরাব প্রশ্ন করে—আচ্ছা হা, না পড়ে কি মহাপুরুষ হওয়া যায় না ?

সাদনা দেবী এবার স্তম্ভম গাভীরের হৃদে উত্তর দেন—যাও, কিন্তু তোমার বেলায় তা চলবে না । একজন মহাপুরুষ বলেছেন ঢালাকী ছারা কোন মহৎ কাজ হয় না ।

বাহুর মায়ের কথা শেষ করতে না দিয়েই উৎসাহের সঙ্গে বলে—জানো হা, শিনাকী বদছিল, সেদিন জুদেবাবু ওদের ক্লাপে বলেছেন—রাইকাক ঠাকুর দক্ষিণেথরে থাকতেন, তিনি মহাপুরুষ, কিন্তু লেগাপড়া লেখেন নি । কি করে হলেন হা ?

এবার সাদনা দেবী বাহুরকে কোলের উপর টেনে বসান, বুকে জড়িয়ে বলেন—ভগবানকে খুব ভালবাসতে পারলে লেখাপড়া না শিখলেও জানী হওয়া যায় ।

বাহুর মায়ের স্নেহবন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে নেয়, উৎসাহের হৃদে বলে—আমি হা আর ইন্সুলে বাব না, ভগবানকে খুব ভালবাসব ।—হা, ওমা!—বড় দ্বিধে পেয়ে গিয়েছে, খেতে দাঁও ঈগগির ।

সাদনা দেবী এক পা পেছিয়ে বাহুরের চোখে চোখ রাখেন । অভিকষ্টে হাসি বমন করে বলেন—ও ছেলে, এই তোমার মহাপুরুষ হওয়া ! বিশেষ পেয়েছে কি রে, এইমাত্র গোটা পৈপে খেলি ! রাগা হোক, তবে তো খেতে দেব ।

—ঐ তো খাটের তলায় কুড়ির মধ্যে প্রসাদ রয়েছে, দাঁও না, খাই ।

বাহুর মায়ের অহমতির অপেক্ষা না করেই হুজুক করে খাটের তলায় বাধা গলায়, সাদনা দেবী বাধা দিতে না গিডেই একটা আঁত গলা মুখের মধ্যে পুরে দিয়েছে ততক্ষণে । (ক্রমশঃ)

ভক্ত-হস্তী পারিলেয়ক

ত্রিরেখা চট্টোপাধ্যায়

ভগবান্ বৃন্দেব যখন প্রয়াগের অপর পাশে কৌশাখী নগরীতে ধর্মপ্রচার করতেছিলেন, সেই সময়ে কৌশাখীর নিকটে এক বিরাট অরণ্য ছিল। এখানে একটি বৃদ্ধ হস্তী বাস করিত, তাহার নাম ছিল পারিলেয়ক।

এক পারিলেয়ক বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে, তাহার উপর অসংখ্য হস্তীসের মত সে স্বভ্রাতৃস্বপ্নের গন্ধে মেলামেলা করে না, ইহাতে তাহার শাবকেরা ও সহচরগণ তাহার উপর বিশেষ সন্তুষ্ট ছিল না। ফলে তাহার জলপানের পূর্বে তাহার নদীর জল খোলা করিয়া রাখিত। বন হইতে পারিলেয়ক কচি কচি ভালপালা ডাকিয়া আনিলে, তাহার পাতা ও ডালের নরম অংশ সব খাইয়া ফেলিত। তাহার লজ্জা শুধুমাত্র সস্ত্র ভালগলা ফেলিয়া রাখিত। এই ভাবে দিনের পর দিন পীড়ন সহ করিয়া শেষে একদিন পারিলেয়ক তাহাদের সমস্ত সস্ত্র ছাড়িয়া দূরে গভীর বনের মধ্যে খাইয়া নির্জনে বসবাস করিতে লাগিল।

এই সময় বৌদ্ধ ভ্রমণ সম্প্রদায়ের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয় ও শেষে নানাবিধ ভগড়া-বিবাদে পর ভগবান্ বৃদ্ধের অজ্ঞাতদারেই তাহার দুইটি পৃথক সত্ত্ব বিস্তৃত হইয়া যান। এই সংবাদ পাইয়া বৃন্দেব অত্যন্ত মর্মাহত হন এবং নিজে এই উভয় সত্ত্বের কাছে খাইয়া তাহাদের বিশেষভাবে উপদেশ দিয়া বোঝাইতে থাকেন। কিন্তু তাহার সমস্ত উপদেশই মিথ্যা হইল, দাক্ষণ মোহবশে তাহার কেহই বৃন্দেবের আদেশ মানিয়া লইতে প্রস্তুত হইলেন না। ইহাদের ব্যবহারে বৃন্দেব অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া তাহাদের সমস্ত সংস্রব ভাগ করিয়া নিকটের সেই বনে গমন করিলেন, এবং একাকী সেখানে থাকিবার সঙ্কল্প করিয়া ধীরে ধীরে গভীর বনের মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। বৃন্দেবের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে সেই বন হইতে হিংস্র জীবজন্তু সকল সরিয়া বাইতে লাগিল। এমিকে পারিলেয়ক ভগবান্ বৃন্দেব দর্শন করিয়া তাহার সেবা করিবার লজ্জা অগ্রসর হইয়া আসিল। সে শালবৃক্ষের শাখা ভরিয়া সমগ্র স্থানটি পরিষ্কার করিয়া দিল এবং প্রতিদিন নিয়ম মত তাহার আশ্রয়স্থল মার্জনা করিতে লাগিল। প্রাতঃকালে হাতমুখ ধুইবার লজ্জা একটি ভাত ভরিয়া জল আনিয়া দিত। আনের লজ্জা গরম জলের প্রয়োজন বৃন্দেব এক অদ্ভুত উপায়ে পারিলেয়ক সে কাজও সম্পাদন করিত। প্রথমে সে শুঁড় দিয়া কাঠে কাঠে ঘষিয়া আগুন জ্বালাইয়া তাহাতে প্রচুর পরিমাণে বনের শুক ভালপালা আনিয়া আগুনটি ভাল করিয়া জ্বালাইত। ইহার পরে সেই আগুনের মধ্যে শুঁড়ে করিয়া আনিয়া

পাথরের খণ্ড নিক্ষেপ করিত। এই পাথরের খণ্ডগুলি বেশ গরম হইয়া যাইলে, তখন বংশখণ্ড বা শুঁড় দিয়া এই পাথরের খণ্ডগুলি কোন একটি কুপের গলের মধ্যে ফেলিত। এই ভাবে সমগ্র কুপের গুলটিকেই গরম করিয়া ফেলিত এবং নিজের শুঁড় দিয়া গলের উত্তীর্ণ ঠিক হইয়াছে কিনা তাহাও পরীক্ষা করিত।

বৃদ্ধদের প্রশ্ন সমাধা হইলে পারিলেইক শুঁড়ে করিয়া একটি ভাও তরিয়া পানীয় জল ও বনের ছপক ফলসুল আনিয়া বৃদ্ধদের সম্মুখে উপস্থিত করিত। বৃদ্ধদের সমগ্র বর্ষাকাল ধরিয়া এই বনে পারিলেইকের সেবার বন্ধন্থে কাটাইলেন।

বর্ষা শেষ হইলে নিকটবর্তী গ্রামে তিনি ডিঙ্কা করিতে যাইতেন। এই সময় পারিলেইক নিয়মিত পাত্রচীর মাথায় করিয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে যাইত। বনের শেষপ্রান্তে আসিয়া বৃদ্ধদের তাহার নিকট হইতে পাত্রচীর চাহিয়া লইয়া গ্রামে প্রবেশ করিলে, পারিলেইক বৃদ্ধের প্রত্যাগর্তনের আশায় সেখানেই চুপচাপ অপেক্ষা করিত। বৃদ্ধদের ডিঙ্কা করিয়া ফিরিয়া আসিলে পারিলেইক পুনরায় পাত্রচীর মাথায় লইয়া বৃদ্ধদের অঙ্গগমন করিত এবং বনের মধ্যে আসিয়া সমস্ত ম্লিন্থপত্র বধাঙ্গানে রাখিয়া দিত। আহাতিদি শেষ করিয়া ভগবান বৃদ্ধদের বখন বিদ্রোম করিতেন, তখন শুঁড়ে করিয়া তালবৃন্ত লইয়া সে প্রকৃকে ব্যজন করিত। এরপর রাত্রি বখন বৃদ্ধদের শয়ন করিতেন, তখন একটি বংশখণ্ড শুঁড়ে ধরিয়া পারিলেইক সারারাত্রি আসিয়া বনের হিংস্র লক্স জানোয়ারের আক্রমণ হইতে তাহার প্রকৃকে রক্ষা করিত। এরপর রাত্রি প্রত্যাহার সঙ্গে সঙ্গে তাহার নিত্যকার কাজ আবার আরম্ভ হইয়া যাইত।

এইভাবে প্রায় তিন মাস অতিবাহিত হইল। বৌদ্ধ-গণের ছয়বার নানরূপ যতবিরোধ দেখা গিল। বৃদ্ধদের আশ্রয় ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমণদের জ্ঞান ঘোষিতঃ তপঃ তেজ সমস্তই বেন স্তিরোহিত হইতেছিল। এমন কি মঠের শিষ্ট দেবক সকলেরই শ্রদ্ধা-ভক্তি বীরে বীরে করিতে-ছিল। এইবার শ্রমণেরা ঠিক মত বুঝিতে পারিলেন যে, বৌদ্ধ-বিহার রক্ষা করিতে হইলে ভগবান বৃদ্ধদেরকে যত ডাড়াডাঙি সমস্ত আবার তাহাদের মধ্যে কিয়টাইয়া আনিতে হইবে। ইহার পর তাঁহারা সকলে মিলিয়া বৃদ্ধদের অঙ্গসম্মানে ফিরিতে লাগিলেন। কিছুকাল পরে তাঁহারা খবর পাইলেন যে, অরণ্যের মধ্যে বৃদ্ধদের বাস করিতেছেন এবং বনের এক হস্তী তাঁহার সেবার নিযুক্ত আছে। এই খবর তাঁহারা অত্যন্ত সর্বাঙ্গ হইলেন এবং নিজেদের অপরাধের পরিমাণ বুঝিতে পারিয়া অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন। তাঁহাদের সমস্ত অহঙ্কার ও অভিমান এক মুহূর্তে ভাসিয়া গেল।

একদিন সমস্ত শিষ্যের প্রতিনিধি হইয়া ভগবান বৃদ্ধের অন্ততম প্রধান শিষ্য আবদন বৃদ্ধের সঙ্গে দেখা করিবার অন্ত বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া পারিলেইক

বংশধর লইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল। শেষে বুদ্ধদেবের আদেশে পারিলেয়ক তাঁহাকে বুদ্ধদেবের নিকটে আসিতে বাধ্য দিল না। আনন্দ এইবার বুদ্ধের চরণে পতিত হইয়া কমা-ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। এবং পর বৌদ্ধ-সংঘের দূরবাহার কথা সমস্ত বিশদভাবে বর্ণনা করিতে লাগিলেন। শেষে বলিলেন যে, পঞ্চত ভ্রমণ অরণ্যের বাহিরে তাঁহার জন্ত অপেক্ষা করিয়া আছেন। বুদ্ধদেব তখন আনন্দকে এই সমস্ত ভ্রমণ শিষ্যদের তাঁহার নিকট লইয়া আসিতে বলিলেন। ভ্রমণগণ আদেশ পাইয়া সকলে আদিয়া বুদ্ধের চরণে পতিত হইয়া তাঁহার কমাভিক্ষা করিতে লাগিলেন।

সকল শিষ্যের কাতর প্রার্থনায় শেখ পূর্ণ বুদ্ধদেব তাহাদের সহিত বিহারে ফিরিয়া যাইতে প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু অসুস্থ পারিলেয়ককে ছাড়িয়া যাইতে তাঁহার মনেও কষ্ট হইতে লাগিল। আর পারিলেয়ক তাহার প্রভুর মনের অবস্থা বুঝিয়া অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িল। প্রত্যেকে প্রাণ তরিয়া লেখা করার সাধ যে তাহার তখনো যেটে নাই, অথচ আশ্রয় পশু সে তার মনের ভাব প্রকাশ করিবে কি প্রকারে? এবার সে প্রভুর স্বাভাবিক বন্ধ করিবার জন্ত তাহার বিশাল বপু লইয়া পথের উপর শুইয়া পড়িল। ভগবান বুদ্ধ তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া শিষ্যদের বলিলেন যে, আশ্রকের মত তোমরা সকলেই এখানে অবস্থান কর। পারিলেয়ক আজ তোমাদের অতিথি সেবা করিবে। সুতরাং সে দিনের মত পঞ্চত শিষ্যসহ বুদ্ধদেব সেই বনেই বাস করিলেন। পরদিন প্রভাতে পারিলেয়ক বাসীকৃত আঁষ, কাঠাল, কলা প্রভৃতি স্বখাদ্য ফল আনিয়া হাজির করিল। সকল শিষ্যসহ বুদ্ধদেব এই ফল আহার করিয়া পরিতৃপ্ত হইলেন।

বুদ্ধদেব এইবার শিষ্যদের লইয়া বন ছাড়িয়া যাইবার জন্ত প্রস্তুত হইলেন। পারিলেয়ক পুনরায় পথের উপর শুইয়া পড়িয়া তাহাদের গতিরোধ করিতে উদ্যত হইল। এবার ভগবান বুদ্ধদেব তাহাকে অনেক করিয়া বুঝাইয়া শান্ত করিলেন। তখন সে তাহাদের পথ ছাড়িয়া দিল মত, কিন্তু মুখের ভিতর শুঁড় পুরিয়া এমন করণ স্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল যে, তাহার সেই আর্ত-ক্রন্দনে সকলের প্রাণেই প্রিয়জন-বিচ্ছেদের শোক উৎপাদিত হইল।

এইভাবে ক্রমাগত ক্রমাগত পারিলেয়ক বুদ্ধদেবের পিছনে পিছনে চলিল। শেষে লোকালয়ের কাছে পৌঁছিলে ভগবান বুদ্ধ তাহাকে ফিরিয়া যাইতে আদেশ করিলেন। পারিলেয়কের মন কিছুতেই বুদ্ধদেবের সম্বন্ধ ত্যাগ করিতে চাহিতেছিল না, কিন্তু তথাপি প্রভুর আদেশ অমান্য করিতে পারে না, তাই সেইখানে দাঁড়াইয়াই নীরবে অশ্রুবিন্দু করিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে শিষ্য পরিতৃপ্ত ভগবান বুদ্ধদেব তখন দৃষ্টিপথের বাহিরে চলিয়া গেলেন, তখন হারণ হুংবে পারিলেয়ক সেইখানেই মাটিতে শুইয়া পড়িল এবং ধীরে ধীরে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিল।



এক যে আছে পুঁথি
ইজর দেখ ভয়েই মরে,
ভাগ্যে দেখে থুসী।
সে যে বাঘের মাসী পুঁথি।

বাঘ সে তো নয় যেমন-তেমন
সৌন্দর্য বনের বাঘা
একদিনেতে ফেলল খেয়ে
তিনটি হাজার কাগা।

কাক ডাকে না সকাল বেলা,
ঘুমোয় সৃষ্টি মামা।
দিনের বেলা রাতের আধার
দিচ্ছে সুখে হান্না।



ঘুমোয় ঘরে খোকন সোনা,
ঘুমোয় দৌরে পুঁথি,
ঘুমোয় বনে ভাগ্যে বাঘা—
ঘুমের মাঝই থুসী।

ঘুমোয় শুয়ে রাজার মেয়ে
ঘুমোয় সারা দেশ।
কেউ জানে না কবে হবে
এই ঘুমেরই শেষ।

কোথায় আছে রাজার ছেলে ?
কোথায় সোনার কাঠি ?—
যার ছোঁয়াতে জাগবে সবাই,
জাগবে বেশের মাটি।



দক্ষিণ মেরু ও উত্তর মেরু

নতুন করে আবিষ্কার

‘সন্ধানী’

১৮৭৮ সালে দক্ষিণ মেরু নতুন করে আবিষ্কৃত হয়েছে।

দক্ষিণ মেরু প্রথম আবিষ্কৃত হয় ১৮১১ সালে নবগৃহের ক্যাপ্টেন আমণ্ডসেনের দ্বারা। তারপর ১৮১২ সালে ইংল্যান্ডের ক্যাপ্টেন স্ট্রট দক্ষিণ মেরুতে পৌঁছতে পেরেছিলেন। তারপর ৪৬বৎসর পরে এই বছরে আরও দুইজন দক্ষিণ মেরুতে পৌঁছতে পেরেছেন। তাঁদের একজন হচ্ছেন স্যার এডমণ্ড হিলারী, যিনি টেনজিং-এর সঙ্গে এডাম্বেস্টেট বিষয় করেছিলেন, আর একজন হচ্ছেন ইংরাজ ইঞ্জিনিয়ার স্কট্।

কিন্তু সব চেয়ে বিশ্বব্যবস্থাবৈজ্ঞানিক ঘটনা হচ্ছে এই বছর উত্তর মেরুতে পৌঁছনো। সাধারণ ভাবে চিরতুষারাকৃত জমির উপর দিয়ে মেরুতে পৌঁচেছেন অনেকেই। উড়োজাহাজেও দুইজন মেরুতে পৌঁছন। এবার উত্তর মেরুতে পৌঁছনো কেবল বিশ্বব্যবস্থার নয়—বিজ্ঞানের চরম উন্নতির একটি স্বাক্ষর। বিখ্যাত ফরাসী লেখক জুলে ভার্ন নরুই বৎসর আগে তাঁর বিখ্যাত আ্যাদৃতকারের বই—‘টোয়েন্টি থাউজন্ড লিগস্ আণ্ডার দি সী’-তে ‘নটিলান’ (Nautilus) নামক একটা ডুবো-জাহাজ সমুদ্রের ২০,০০০ লিগ নিচে দিয়ে যাবে কল্পনা করে গিয়েছিলেন। বিখ্যাত লেখকের এই কল্পনা ১৮৭৮ সালের আগষ্ট মাসে বাস্তবে পরিণত হয়েছে। একটি আমেরিকান ডুবো-জাহাজ, যার নাম রাখা হয়েছিল জুলে ভার্নের ডুবো জাহাজের নামে,—সেই ‘নটিলাস’ নামক ডুবো-জাহাজটি ডুব দিয়ে প্রশান্ত মহাসাগর থেকে বাজা ক’রে, উত্তর মেরুর চিরতুষার চাপের নিচে দিয়ে একেবারে আটলান্টিক মহাসাগরে এসে পড়েছিল। এই প্রকাণ্ড লম্বা বাজা-পথে ডুবো জাহাজটিকে ১,৮৩০ হাইল পথ বরফের তলা দিয়ে গিয়ে দক্ষিণ মেরু ভেদ করে একেবারে আটলান্টিক মহাসাগরে পৌঁছতে হয়। উত্তর মেরুতে বরফ ৫০ ফিট পুরু, এবং তার মধ্যে মধ্যে অনেক ছিদ্র দেখা যায়। কিন্তু ঠিক দক্ষিণ মেরুর কাছে বরফের নিচে সমুদ্রের গভীরতা ১৩,৭১৪ ফিট এবং মলের শৈত্য সেখানে ৩২ ডিগ্রী। শীতকালে সমস্ত মেরুপ্রদেশ অন্ধকারাকৃত, এখানে আলো দেখা যায়।

দললু খেকে গত ২৩ জুলাই এই ডুবো-জাহাজটি বাজা ক’রে বেরিং ষ্টেটের তিতর দিয়ে আর্টিক মহাসমুদ্রে প্রবেশ করে। এই জাহাজের দাত্তী-সংখ্যা ছিল ১১৬। ১লা আগষ্ট এই সাবমেরিনটি সমুদ্রের ভাসমান বরফের তলায় প্রবেশ করে ডুব দিয়ে অগ্নির হতে থাকে। টেলি-ভিশনের সাহায্যে সাবমেরিনের দাত্তীরা সাধারণ উপরে স্বচ্ছ বরফ দেখতে পান। তাঁদের মনে হয় যেন সাধারণ উপর দিয়ে মেঘ ভেঙ্গে চলেছে। ৩রা আগষ্ট সাবমেরিনটি দক্ষিণ মেরুর ঠিক তলা দিয়ে ডুবে এগিয়ে চলে। তারপর একেবারে গ্রীনল্যান্ড ও স্পিটসবার্গের মধ্যে এসে ডুবো

জাহাজটি জলের উপর ভেসে ওঠে। ২৬ ঘণ্টা ক্রমাগত বরফের তলায় ডুব দিয়ে এই ডুবো-যানটিকে অগ্রগর হতে হয়েছিল, আর অতিক্রম করতে হয়েছিল ১,০৩০ মাইল পথ।

জোয়ার্দের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, কি করে এমন আশ্চর্য ব্যাপার সম্ভবপর হোল। এর উত্তর হচ্ছে : আধুনিক যুগে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির ফলে যে সাবমেরিন স্নাত দুই মিল পর্যন্ত জলের নিচে ডুবে থাকতে পারতো—এখন এই নৃতন ধরনের সাবমেরিন ২৬ ঘণ্টা অনায়াসে জলের তলায় ডুবে থাকতে পেরেছে। আটম শক্তির দ্বারা পরিচালিত বলে এই জাহাজের দাবীদারের জন্ত বা বাতাস দরকার তা এই জাহাজেই পাওয়া যেত। জাহাজটি ছিয়ানবলই ঘণ্টা জলের তলায় ছিল এবং আবশ্যক হোলে আরও অনেক ঘণ্টা বেশী থাকতে পারতো আটমের পরিচালনা শক্তিতে! এ কথা সকলেরই জানা আছে যে, বেকর কাছে দিগ্‌দর্শন যন্ত্র অর্থাৎ Mariners Compass, দ্বারা সাহায্যে সমুদ্রে জাহাজ ইত্যাদির দিকনির্ণয় করে চলে, একেবারে একেধাে হয়ে যায়। পথ-প্রদর্শক কোন তারিও সাবমেরিনকে পথ দেখতে একেবারেই অসমর্থ এখানে। তাই এক নৃতন আবিষ্কৃত পদ্ধতি অহুদারে (Internal navigation system) এই জাহাজ সোজা পথ খুঁজে নিতে পেরেছিল।

কাঁকড়া

শ্রীনবকুমার ভট্টাচার্য

পুকুর পাড়ে,
জলের ধারে,
গরতে আমার বাস,
আনি নইকো কারো দাস।

পেটে ক্ষুধা হলে,
চলে যাই জলে,
চরে চরে বেড়াই,
জলের পোকা বাই।

পেট যদি না ভরে,
মাথায় আগুন চড়ে,
সামনে যা পাই
কামড় লাগাই।

তবু,—পেট যদি রয় বালি,
বাই ছোট্ট মাছ আর বালি,
মোর দেহটা শক্ত, ভাই
তাই ভয়ের কিছু নাই।

শুধু ভয় করি ঐ মানুষেরে,
আর ঐ বনের শেরালেরে,
ওরা মোরে খায়,
কড়মড়িয়ে খায়।

মোর ভরসা গোদা ঠাণ্ড,
যত পাখী, পোকা, ব্যাঙ,
ভয়ে করে চিঃ, চিঃ, চিঃ
আমি হাসি হিঃ, হিঃ, হিঃ।

দাড়ি-মেধ

সত্যবান

জামবাজারের বীরেনদা'কে চেনো তো নিশ্চয়। ঐ যে পাক্কা ছ'ফিট লম্বা, আড়াই ফিট চওড়া যে ভক্তলোক আঠারো ইঞ্চি বাইসেল্, ফুলিয়ে বিকেল বেলায় মাঝে মাঝে পার্কের মাঠে ভ্রমণ সজ্জার ছেলোমের মার্চ করান, বস্ত্রি: পেশান, ঐ চক্করের মত বখাটে ছেলে বার ভয়ে ঢিট্ হ'য়ে আছে, সেই স্বনাশ্রযাত বীরেনদা'কে যদি না গিনে থাক তাহলে তোমার মগ্নই বুধা। অন্তত: জামবাজারে না থেকে হুম্মরবনে বাস করাই তোমার উচিত ছিল।

কি একটা বড় কোম্পানীর ইন্সপেক্টর ছিলেন বীরেনদা। ঘুরে ঘুরে বেড়ানই ছিল তাঁর কাজ। অফিসে সবাই ভাকত তাঁকে বীরম্বর মি: বলে। অবশ্য একমুখ কাল চাপ দাড়ী, বিরাট পালোয়ানী চেহারার বীরেনদাকে হঠাৎ দেখলে পেশোয়ারী কাবুলী বা পাক্কাবী শিব ছাড়া অপার কিছু মনে করাই শক্ত ছিল। আর পাড়ার নটরাজ নাট্যজায়তীর মদাড়ি পাটগুলো তো প্রায় বীরেনদারই একচেটিয়া ছিল।

সেবার, মানে বছর কয়েক আগেকার কথা। বীরেনদার ছোটশালার বিয়ে জাবণ মাদে। হঠাৎ কি একটা অবিসের জরুরী কাজে বীরেনদাকে চলে যেতে হ'ল লক্ষ্মী না রুড়কী কোথায়। ফলে, বৌদি একাই সপুত্রকস্তা দুজনের হ'য়ে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গেলেন। আর বাপেরবাড়ী গেলে মেয়েদের বা' হ'য়ে থাকে, শরীর খারাপের অজুহাতে থেকে গেলেন সেখানে। হ্যাঁ, বলতে ভুল হ'য়ে গেছে—বীরেনদার শশুরবাড়ী বীরজুসের ঐমিকে কোথায়।

বৌদির চিঠির মাধ্যমে ছোট ভায়রাতাই সমবেশের রূপগুণের মালফার বর্ণনা মাজ্জ গেলেন বীরেনদা এবং তাতেই প্রায় মোহিত হ'য়ে পড়লেন।

সেবার পূজার ছুটির আগে থাকতেই শশুরবাড়ীর সকলের কাছ থেকেই জোর ত্যাগাদ আসতে শুরু করল। এবার যেতেই হ'বে পূজার সময়। ছেলে আর মেয়েকেও মেধেননি দু'মাস। শেষ অবধি নিমন্ত্রণ রক্ষাই স্থির ক'রে ফেললেন।

পূজার ছুটি এসে গেল। বধাসরমে অবিসের কাজ সেরে বীরেনদা উঠলেন বাত মাড়ে ম'টার ১৩ম আপ নিয়ালদহ মিল্লী এক্সপ্রেসে। ঝোড়ার মধ্যে পদ্মার ইলিশ মাছের চাইভেঙে ঠানঠানি ক'রে পাড়ীর মধ্যে বাতীর হল। বাস, পোটলা, খিছানা, বালতি, ছাতা, লাঠি, ঝোড়া-ঝড়ি, বুড়ো-ঝড়ী, খুকী-খোকা, জোরান, বিনমিনে, মোটা, রোগা, চ্যাপ্টা, চ্যাপা, বেটে, চৌকো, গোল,



বাকের উপর সর্বত্র মুক্তি দিয়ে হাটকেশ মাথার বীরেননা ভয়ে

মধ্যেও বীরেননা ব্যথারীতি নিষিকার। বাকের একটি কোণে আপনার হাটকেশটির ওপর মাথা দিয়ে, চান্দরখানা মুখের ওপর ঢালিয়ে, টেনের শব্দের সঙ্গে সম্মানজ্ঞাৎ নাক ভাকার পাঠা দিতে লাগলেন।

নাক ভাকার মাহাশ্বেই হোক আর চেহারাখানার মৌলতেই হোক বর্ধমান অবধি বীরেননা'কে আর ধাঁটালনা কেউ। বর্ধমান স্টেশনে পাকী খামতেই লোকজনের ঠেলাঠেলি হুড়োহুড়ি চা-গ্রন, কুলী, পান-সিগারেট ইত্যাদির কোরাসে পূজা-সংস্করণ লঙ্কাকাণ্ডেরই এক অধ্যায় স্বক হয়েচে, এমন সময় বিবি লাঙ্গলোজ করা দৌধীন মত এক ভ্রমলোক একরকম চিড়ে-চাপাট্টা হ'য়ে অতি কষ্টে সাধ্যমত আমার ইম্রী আর জুতোর পালিশ বাঁচাতে বাঁচাতে সেই কামরায় উঠে, আর কোথাও বদলার আয়গা না পেয়ে, সেই অগাধ সমুদ্রে একটুখানি লাইফবোটের মতন বীরেননার বাকের কাছে এসে বীরেননাকে হারলেন এক থাকা—ও মশায় উঠুন না, শুতে হয় কাঠ'রানে দিয়ে বার্ষিক রিজার্ভ

মেরে-পুঙ্খ নানান বেশের
নানান জাতের সব একে-
বারে ভালগোল পাকিয়ে
মাড়ে বজ্রিণ ভাকার মতন
একটা ব্রিক্কেস বানিয়ে
ফেলেছে। যাইরে রঙ-
বেরঙের আলখাল্লাপরা
ভুতুড়ে টুপি মাথায় বে
ছেলেটা চানচুর ভালা
বিক্রি করতে নানান হরে
হরেকরকম শুকীতে চাঁৎ-
কার করছে—“ভেরিখাল
—তে এ এ রি হাস কুজ-
গ্রেপ্‌স, পুজা ইমগিতাল
—তে এ রি হা আস ..”
পাকীর ডেডরে অবস্থা
তার চাইতে মোটেই
ভাল নয়। কিন্তু এর

ক'রে শোন গে যান। তুর্জনের সঙ্গে সঙ্গে ভিড়ের ঠেলায় হ্যাটকেশটা ওপরে রাখতে গিয়ে লাগলেন এক খাচা বীরেনদারই মাথায়।

আর বাবে কোথায়! বীরেনদার মাথায় গেল বক্ত চ'ড়ে। একে আচরকা ঘুম ভাঙান, তার ওপর গাল বেওয়া, তার ওপর মাথায় হ্যাটকেশের ঠোঁটর—একবারে আব্রাম্পর্শ।—“তবে রে, ব'লে উঠেই বীরেনদা লাফিয়ে নেমেই সেই ভক্তলোকের দিকে ছুড়লেন এক বিরাশী পাউণ্ডের ঘূষি। জোসুই-মার্কা ঘূষিটা লাগল কোথায় বলা যায় না, কিন্তু কল হ'ল রীতিমত রোমহর্ষণ। ‘বাপ’, বলে ভক্তলোক ভো দুই হাত তুলে চিংপাত পাশের এক বুড়ীর ঘাড়ে। বুড়ীর পাশে ব'লে তুলছিল এক বুড়ো মাড়োয়ারী। তিনজনে মিলে ভালগোল পাকিয়ে পড়ল বেঙ্কির মাঝে কোন এক প্যালেঙ্কারের বাসনের বস্তাটার ওপর। কনকন শব্দে মেগসো গিয়ে লাগল এক ভক্তমহিলার হটুতে। অত্যাগিনী ভক্তমহিলা তাঁর ক্যান্ডান-দুরন্ত দাঙ্গপোষের মর্দাণা একদম তুলে, তাৎক্ষণে আর্ডনাই করতে গিয়ে দিলেন বাচ্চা ঘুমন্ত ছেলের হাত চিপটে। তারপর সে এক হৈ চৈ ব্যাপার, বৈ বৈ কাণ্ড।—‘ঘুন, ঘুন, গুলিল, স্টেপন মাঠার, গার্ড সাহেব, চেন টেনে দাও (ঘদিও টেন তখন দাড়িয়ে), কি হ'ল মশায়’—ইত্যাদি শব্দের বহু বিচিত্র সমারোহের ঐক্যতানে যেন বিপুল অর্কেট্রা বেজে উঠল।

রাগের মাথায় হঠাৎ ঘূষিটা ঘেরেই বীরেনদার ঘূষের ঘোর কেটে গিয়েছিল। এ সব গোল-মেলে ব্যাপারে প্রত্যেক বুদ্ধিমান লোক বা ক'রে থাকে, তিনিও তাই করলেন। চান্দরখানার মারা ত্যাগ ক'রে হ্যাটকেশটা নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে গাড়ীর আনাদা স'লে টপ্পে পড়লেন ওপারে। তারপর আধা-অন্ধকারে ভিড়ের মধ্যে মিশিয়ে গিয়ে, দূরে গ্রান্ন-বালি একটা কাঠকান কন্সার্টমেটে উঠে পড়া নক্স হ'লনা তাঁর পক্ষে। গাড়ীতে যে সাহেবটি ছিল আড়চোখে বীরেনদার দাঙ্গপোষাক আর চেহারা মিকে তাকিয়ে ভাল ছেলোটির মত নিছের বার্ধে উঠে শুয়ে পড়ল। তাবলে—এ পাঞ্জাবীটা বোধ হয় রেলের বা কোলিয়ারীর কোন অফিসার।

এদিকে অপর কামরার সেই ভক্তলোক তখনও অজ্ঞান। তবে ভেড়ার গোছালে আগুন লাগার চীংকার তখন একটু ক'মে এসেছে। স্টেপন মাঠারের কাছে সংবাদ গিয়েছে যে, একজন ভক্তর চেহারা কাবুলী ছোরা মেরে এক ভক্তলোকের বখাসবন্দ, এমনকি প্রাণটি পর্যন্ত লুট ক'রে নিয়ে পালিয়েছে। পরে শোনা গেল সেটা নাকি একজন কাবুলী নয়, একজন দুর্ধর্ষ পেশোয়ারী ডাঝাড। সাহেব খুনও নাকি স্বচক্ষে দেখেছেন ব'লে পাশের কামরার কেউ কেউ সরবে জাহির করতে লাগলেন। তারপর হুক হ'ল সমালোচনা—এসব কেবলে চিরকালই বা' হ'য়ে থাকে।

এদিকে ট্রেন আবার ছাড়ল। সাইবিরাতে পৌঁছলে বীরেনদাকে শাকড়াও করলেন বীরেন-

সারাই এক বন্ধু। তিনি ওখানে ঠেশবের কাছেই থাকেন—সিভিল সান্সাইতে বেশ শীশাল গোছের চাকরি করেন। ফলে বীরেনদাঁকে উঠতে হ'ল তাঁর বাড়ীতে।

ছোট ভাসাই সমরেন্দ্র ইতিমধ্যে শগুড়বাড়ী পৌছে গেছে। বপালে মত্তবড় একটা ফেটা জড়ান, চশমা ভাঙা, চোঁট দুটো ফুলে হটনটট্টের লজ্জা মিছে, নাকটাতে স্কোল্‌ই-এর তুলনা মেলে। বাড়ীতে সবাই তো আতকে উঠল। বাবাভীর তখন আর ভাল ক'রে কথা বলার সামর্থ্য নেই। একপলসি ডাক্তারের মলম লাগিয়ে আর কড়া কয়েক ভোজ শুষ্ক খেয়ে চুপচাপ পড়ে রইলেন তিনি।

সেদিন এই ভাবেই কাটল। পরদিন শগুড়ী পূজা। সন্ধ্যার পানের পূজা বাড়ীতে বাড়ী আরতি আর বাজা দেখার অন্তে সকলের নিয়ন্ত্রণ—সবাই ঘাবে।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। বারান্দার ব'সে ছোট ভাসাই তার নাক বেঁতদানোর লোমহর্ষণ ইতিহাস বর্ণনা ক'রে চলেছে। ইতিমধ্যে সে একটু সারলে উঠেছে।

'...হ্যা, তারপর বা' বলছিলাম সিবি। তারপর সেই চারটে কাবুলীর মধ্যে দুটো এখন ভিড়ের মধ্যে বসবার লায়গা পেলনা, তখন হঠাৎ ছোঁরা বার ক'রে একটি মহিলাকে প্রায় ধোর করেই তুলে দিল। তারপর পানের আর দুটি নিরীহ গোছের লোককে লাঠির ভঁতো দিয়ে হাঁকায় দিলে—'এ বাঙ্গালী, উঠো উঠো, বেহুত্ব, কীহাকা...!' আমার আর সহ্য হ'ল না। একে মেয়েদের অপমান, তার ওপর ভাত তুলে গাল দেওয়া! 'চাপ'রও উল্লু।' বলে মারলাম এক বেটার নাকে এক ঘুঘি। আর এক বেটা লাঠি নিয়ে তেড়ে আসতেই সেই বেকির ওপর পাড়িয়েই জুতোবল্লু বেড়ে দিলাম এক লাথি বেটার পেটে। হু' বেটাই তো 'বাণ'পা হো' বলে পপাত: ধরলেন। গাড়ীর ভিতরের আর সব প্যাসেঞ্জারগুলো তখন এককোণে জাড়জড়ি ক'রে ঠক্‌ঠক্ ক'রে কাঁপছে। একটার হাত চেপে ধরেছি, এমন সময় আর এক বেটা তেড়ে মেরে দিল তার গোঁদা লাঠিটা পেছন থেকে আমার মূণের ওপরে। হাত দিয়ে ঠেকাতে গিয়েও পারলাম না। তারপর একদিকে আমি আর একদিকে সেই কাবুলী দুটে—ভূমল ঘুঘোঘুঘি। শেষে আর দু'বেটাও উঠে এসে বোঁগ দিলে। ইতিমধ্যে রেলের পুলিশ এসে চার-চাটাকাই'...

নিঃশব্দ বন্ধ ক'রে গল্প শুনেছে সবাই। হঠাৎ বেলু চেঁচিয়ে উঠল—না, না, বাবা...ঐ দেখ।

দূরে দেখা গেল গেটের মধ্যে দিয়ে স্ট-পথ স্ট্যাকেশন নিয়ে ঢুকছেন বীরেন্দ্রচন্দ্র। হেঁ হেঁ করতে করতে বাড়ীর সব ছোটল বীরেন্দ্রচন্দ্রকে অভ্যর্থনা করতে।

অভ্যর্থনার পালা শেষ হ'তে, আর ঘেরি হওয়ার অন্তে কৈকিয়তের জের বিটতে, বেশ খানিকটা সময় কাটল। ছেলেপুলের দল ঠাণ্ডা হ'লে বীরেন্দ্রদার শাণ্ডী বললেন, 'চলো বাবা তোমাকে ছোট ভাসাই-এর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই।'

কিন্তু ছোট জামাই ভক্তবশে বেন উপে গিয়েছে। বেশ খানিকটা খোজাখুঁজি করেও বন তার পাতা মিলল না, তখন বাড়ীর লোকেরা স্থির করল যে, শহরেই কোথায় তার কোন এক বন্ধুর বাড়ী আছে বলেছিল, বোধ হয় সেইখানেই দেখা করতে গিয়েছে।

আর সেরি করা সম্ভব নয়। চৌধুরীবাড়ী আরতির সময় হ'য়ে গিয়েছে। আরতির পরই খাওয়াশাওয়া, তারপরই যাত্রা গান শুরু হ'বে। বাড়ীর সকলের আগে থেকেই নিমন্ত্রণ সব কটাতেই।

পাড়াগাঁয়ের যাত্রা আর হাঁকডাকের ওপর নিত্যন্ত শহরে রাহুঘ বীরেনদার বাড়াবিকভাবেই বিরাম। তার চাইতে বিছানার লগা হ'য়ে ঘুম লাগান অনেক বেশী লোভের। বাড়ীতেই জলটল খেয়ে স্নানির অভ্যাস দেখিয়ে বীরেনদা হ'য়ে গেলেন বাড়ীতে এবং বৌদি সম্মত সবাইকেই জোর ক'রে পাঠিয়ে দিলেন পুজো-বাড়ী।

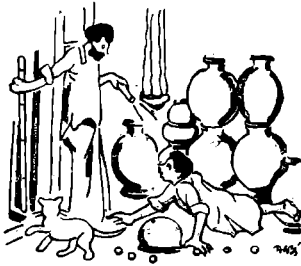
রাত প্রায় বারোটা। হঠাৎ কি একটা পড়ার শব্দ চম্কে ঘুম ভেঙ্গে গেল বীরেনদার। নীচে ঠাণ্ডার ঘরের ভেতর কি বেন শব্দ হচ্ছে। নিশ্চয় চোর। জানে বাড়ীতে কেউ নেই; চুরির মতলবে ঢুকছে।

—'দাঁড়াও বেটো, বাঘের ঘরে যোগের বাসা! আজ তোমার দাঁধকাটি তোমার পিঠেই ভাষব!' বলতে বলতে বীরেনদাও ঘর থেকে বার হ'য়ে পড়লেন। হাতে টর্চ লাইট আর একগাছা মোটা লাঠি।

শুভরবাড়ীর ঘর দুয়ার সবই খানা। তার ওপর চাঁদের আবিছা আলো ভেতরে এসে পড়েছে জানালার ফাঁক দিয়ে। চুপি চুপি বীরেনদা এগিয়ে চললেন ঠাণ্ডার ঘরের দিকে। ঘরের ভেতরে শুনলেন কি বেন একটা খুশখাস শব্দ হচ্ছে। কে বেন সম্ভবপণে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার সঙ্গে চাপা নিঃশ্বাসের শব্দ। নিশ্চয়ই চোর! এ্যাড্‌জেক্টারের সজাবনায় বীরেনদা তখন রীতিমত উত্তেজিত। হাতের টর্চ আর লাঠির ওপর আত্মশঙ্কলে লোহার গাঁড়ানীর মত চেপে বসেছে। তাই বাইপেন্স আর বুকুর চাতি ফুলে উঠেছে প্রায় দু'গুন! চোরের আঁদ আর বক্ষা নেই!

হঠাৎ কি বেন 'ফ্যান' করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে, 'বাবাগো' বলে চাপা আওয়াজ আর মড়াম ক'রে শব্দ। বাজখাই গলায়, 'বরদনার' বলে হাঁক দিয়ে লাক্ষিরে বীরেনদা ঠাণ্ডার ঘরে ঢুক দরজা আটকে ধাঁড়ালেন। হাতের টর্চ জলে উঠল।

বাড়ীর কুতো বেড়ালটা 'হ্যাওও' বলে ছুট দিল পায়েব ফাঁক দিয়ে বাইরে। টর্চের আলোতে দেখা গেল একটা এ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়ী উপুড় হ'য়ে পড়ে। পেটাকতক পান্ডরা এদিক-ওদিক হুড়ান। তার দাঁতবানে তালগোল পাকিয়ে প'ড়ে আছে একটা রাহুঘ। টর্চের আলো গায়ে



ধরবার। ব'লে বীরেনদা টর্ট ফেলে ধরলেন

পড়তেই সমস্ত হ'রে চমকে উঠলো লোকটা; তারপর হামাগুড়ি দিয়ে তাড়া-তাড়ি লুকোতে গেল যে চৌকিটার ওপর ভালের ইাড়িলো আছে তার আড়ালে।

‘এই ব্যাটা, পাড়া, কে তুই?’ বজ্রগভীর স্বরে বীরেনদার গর্জন। সে চীৎকারে সাধারণ লোকের গিলে রীতিমত চমকে যাবে। গেলবার পূর্ব্বেই সমস্ত ভীমবাহার পার্কের মোড়ে নটরাজ

নাট্য-ভাবতীর ‘কর্ণার্জুন’ অভিনয়ের সময় ভীমবেশী বীরেনদার হুঃশাসনের রক্তপান দ্বারা বেধেছে তার বুকতে পারবে এ গর্জন কি বিপুল!

‘আজ্ঞে, আমি, আমি...’ ধরবার ক’রে কাপতে কাপতে লোকটা উঠে দাঁড়াল। বীরেনদা দেখলেন চোর হলেও তার পোশাকটা বেশ ভদ্রগোছের, চেহারাটাও ভাল—বদিশ রস আর কাদার জামা-কাপড়ে ছোপ লেগে গুলবাঘের মতন হয়ে গেছে জায়গায় জায়গায়। একবারে ছিঁচকে চোর ব'লে মনে হ'ল না। লাঠিটা নোজা বসিয়ে দিতে একটু বিধা লাগল।

‘আজ্ঞে আমি...মানে?’ বীরেনদার সগর্জন ধরক।

‘আজ্ঞে—আজ্ঞে—এ...আমি, আমি, .. মানে এ-বাড়ীর ছো-ছোট জামাই; মানে সমরেন্দ্র...’

‘আরে, সমরেন্দ্র তুই,...’ ব'লে আর একটু ভাল ক'রে টর্ট ফেলে দেখতে গিয়ে বিবর রক্তের চমকে উঠলেন বীরেনদা। বেন চেনা চেনা লাগছে। তাছাড়া কপালের কাটা দাগ আর ফুলো ঠোঁট।...

আমতা আমতা করে জিজ্ঞাসা করেন, ‘আজ্ঞা, তোমাকেই কি আমি ভুল ক'রে দিলী এক্সপ্রেসে...’ ব্যক্তিটা সন্মোচে আর শেব করতে পারলেন না।

‘আজ্ঞে হ্যাঁ।’ প্রায় কীদো কীধো হ’রে উত্তর দেয় সমরেন্দ্র : ‘আপনার ঘৃষিতেই আমার এই রকম...’

বিছাডের ঝলকের মর্ন্তন মনে প’ড়ে যায় বীরেনদার, বর্ধমানের কাছেই কোন একটা গ্রামে যেন ছোট শালীর বিরে হুয়েছে—এইরকম একটা খবর পেয়েছিলেন। আরও এনে পড়ল বৌদির চিঠির কথা—সমরেন্দ্রও নাকি বস্ত্রবাড়ী পূজার সময় আগচে।

শেষে জিড়ের মধ্যে নিভের জায়গাডাইকেই...আরে ছিঃ ছিঃ ছিঃ

লঙ্কিত ভাবে বীরেনদা আমন্ত্রণ জানান : ‘আরে এস ডাই এস। চল আমার সঙ্গে উপরকার ঘরে চল।’

সভ্য নৃষ্টিতে একবার বীরেনদার লাঠি, একবার বাইসেপ্, আর বুকের ছাতির মিকে তাকিয়ে স্বীণ করে নিভাণার আভাস জানায় সমরেন্দ্র, ‘আজ্ঞে—আ-আ-আপনি ?...’

‘আমি বীরেন্দ্র হে, এ বাড়ীর বড় জামাই, সম্পর্কে তোমার দাদা হই। আমায় আবার ভয় কি। চল চল...’

ওপরে গিয়ে স্থস্থির আর সম্ভবমত সভ্য হয়ে বসবার পর, বীরেনদা শুনলেন সমরেন্দ্রের কাহিনী। বীরেনদাকে গেটের কাছে দেখেই বেচারা বৃকেছিল যে, এবার কেলেকারীর একশেষ। গল্পের রত্নচণ্ড ধূয়ে গিয়ে এবার আসল কাহিনীর বড়নড়ি সব বার হ’য়ে পড়বে। তাই সবাই বধন মদরে বীরেনদাকে অভ্যর্থনা করতে ছুটেছে তখন চুপি চুপি পাশের দি’ড়ি গিয়ে নেমে গিয়ে ভাঁড়ার ঘরে ঢুক চৌকির তলায় লু’কিয়ে পড়ে সে। মতলব করেছিল যে, রাতে বীরেনদার ছোট শালী ফিরলে তার কাছে জেনে নেবে সব ব্যাপারটা। এমিকে হাত রাতে পায় তরানক খিলে। শিকের ওপরকার পাখোয়ার হাঁড়ীটা অন্ধকারে নামাতে গিয়ে হাঁড়ী উটে নীচে প’ড়ে যে নশ্ব হয়, তাতেই বীরেনদার ঘুম ভেঙ্গে যায়। অন্ধকারে হাঁতড়ে হাঁতড়ে বধন পাখোয়ার খুঁজে স্মৃষ্টি করছিল তখন না দেখতে পেয়ে বাড়ীর বেড়াগটার লেজের ওপর আচমকা পাটা প’ড়ে যায়। সেটা আবার ঢুকছিল অন্ধকারে ইত্ব ধরতে। হঠাৎ সবে ধন নীলমণি একটি হাত জুতো লেজের ওপর এরকম রাহাজানী হওয়াতে আপণি জানিয়ে ফাস্ ক’রে ওঠে বিভালী। সেই শব্দে সমরেন্দ্র স্থির ক’রে নেয় যে নিচর গোথরো সাপ—কামড়াল তাকে।

হঠাৎ বীরেনদার পা জড়িয়ে ধরে সমরেন্দ্র। বলে, ‘তিনি যেন কাউকে না বলেন এসব কথা। কারণ, মানসম্মত সবই এখন বড়দা আপনার হাতে।’ মানে বীরেনদা এখন ‘বড়দা’তে প্রমোশন পেয়ে গেছেন।

বীরেনদা শুভিত নির্বাক। সামলে নিতে বেশ ধানিকটা সময় লাগল তাঁর।

তারপর ছই জামাইয়ে মিলে হুক হ'ল সলা-পরামর্শ—কি করলে সব দিকই বজায় থাকে। তারই ফলে শেষ রাতের গাড়ীতে সমরেন্দ্র একবারে সাইথিরা, তারপর সেখান থেকে কলকাতার উদ্দেশ্যে।

পরের দিন সকালে বাজা শুনে সব বাড়ী ফিরে ছোট জামাই—এর খোঁজ নিতেই বীরেনদা গম্ভীরভাবে মালাই দিলেন যে, 'সমরেন্দ্র রাত ৯টার সময় বন্ধুর বাড়ী থেকে ফিরে এসেই এক টেলিগ্রাম পায়, তার সাংকেতিক লিপিভাষায় এসে কি এক বিশেষ স্ক্রী কাক্সে তার করেছে। একটুও মেরি করার উপায় ছিল না। রাতের শেষ ট্রেনেই তাই সে চ'লে গেছে। সময় না থাকায় কাক্স সঙ্গে দেখা ক'রে যেতে পারেনি।'

হ্যাঁ, আসল খবরটাই বলতে ভুল হ'য়ে গিয়েছে।

পরের দিন সকালে কাগজে দেখা গেল যে লোমহর্ষণ এক ভাষাভির বিবরণ বার হয়েছে : লক্ষ্মীর রাতে জনকরেক কাবুলী না পেশোয়ারী ভাষায় বর্ধমান স্টেশনে আসি দিল্লী এক্সপ্রেসে চুকে কি কারণে কয়েকজন বাজীকে মারশিট করতে থাকে। বাধা দিতে বাওরায় একজন বাজীকে ছোঁরা মেরে গুরুতর ক্ষত করে দেয়, বেচারার বাঁচবার নাকি বিশেষ আশা নেই। আর একজন বাজীর কোন সন্ধান মিলছে না। ভাষাতত্ত্বের দল বাজীদের কিছু টাকাকড়ি আর জিনিসপত্রও ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছে। রেল-পুলিশ জোর তদন্তে লিপ্ত আছে। এ প্রসঙ্গে কয়েকজনকে গ্রেপ্তারও নাকি করা হয়েছে।—ইত্যাদি ইত্যাদি।

বীরেনদা প'ড়ে নিজের মনে মনে হাসলেন বটে, কিন্তু কলকাতা ফেরার আগে তাঁর অত সাধের সুপুত্র দাড়িটিকে শব্দরবাজীর নাপিতের হাতে একটাকা নগ্নিণা সমেত হান ক'রে এলেন। এ দাড়ি-মেথের রহস্য আজ অবধি একমাত্র বীরেন-বৌদি ছাড়া আর কেউ জানে না।

তারপরকার বার সন্ধ্যাতী পূজার সময় নটরাজ নাট্য-ভাণ্ডার যে 'কেনার রায়' প্রে হ'ল, তাতে কার্তালোর পার্ট নিলেন বীরেনদা—সে তো ভ্রাম্যভ্রাম্যের সবাই জানে।



॥ দানবীর ॥

শ্রীবিমলকুমার ঘোষ



তোমরা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন নাম শুনেছ।
দেশের হিতের জন্ত, দেশবাসীর মঙ্গলের জন্ত তিনি
ঊঁর সবকিছু বিলিয়ে দিয়েছিলেন। তারপর
তোমরা অতি-আধুনিক চিত্তরঞ্জন, পরলোকগত
রাষ্ট্রপাল ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়ের নামও
হয়ত অনেক শুনেছ। প্রথম জীবনে বিশ্ব-

বিদ্যালয়ের অধ্যাপক থাকাকালীন তিনি ঊঁর বেতনের অধিকাংশ বিবিডালয়কে দান করতেন।
রাষ্ট্রপাল থাকাকালেও তিনি ঊঁর বিপুল বেতন থেকে মাত্র পাঁচশ টাকা নিয়ে বাকী সবই
বিবিডালয়ে দান করেছেন। বিশেষ করে আমাদের এই বাংলাদেশে বন্ধা আরোগ্যতর কলোনী
গড়ে তুলবার প্রচেষ্টা করার জন্ত ঊঁর নাম অমর হয়ে থাকবে। আশ্রম এমনি একজন দানবীরের গল্প
শোনাতেই আমি তোমাদের হেতায়ুগে নিয়ে যাব।

ঊঁর নাম ছিল রাজা উদ্দীনর। দান-দান, ধর্মপ্রাণতার জন্ত তখন ঊঁর রাজ্যভাড়া নাম।
ঊঁর প্রশংসার কথা শুনতে শুনতে একদিন বয়ঃ স্বেবরাজ ইন্ড্রেরও হিংসে হল। ইন্ড্র তাঁকে পরীক্ষা
করবার জন্ত অগ্নিসেবের সঙ্গে এক পরামর্শ আটলেন। ইন্ড্র হলেন এক স্ত্রেন আর অগ্নি হলেন
এক কপোত। স্ত্রেন যেন তার খাশ কপোতকে ভাড়া করেছে এমনভাবে অভিনয় করতে করতে
তার। দু'জনে হুড়ুহুড় করে উদ্দীনরের রাজশতায় এসে উপস্থিত হলেন। ঊঁর ভয়ে কম্পমান কপোত
রাজার কোলে আশ্রয় নিলে। রাজা তাঁকে বললেন, “তোমার কোন ভয় নেই। পরমাগতকে
রক্ষা করা আমার ধর্ম। কেউই তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। তুমি স্থির হয়ে বস।”
স্ত্রেন তখন রাজাকে বললে, “হাজার, কপোত আমার ভক্ষ্য। আপনি শুকে ছেড়ে দিয়ে আমার
প্রাণরক্ষা করুন।” রাজা বললেন, “তোমার স্থা নিবৃত্ত করতে আমি বাধ্য। তুমি যে মাংস
চাইবে, বল, আমি তাই এনে দিচ্ছি। কিন্তু পরমাগতকে ছেড়ে দিয়ে অধর্মে পতিত হতে পাংব
না।” স্ত্রেন তখন বললে, “আপনি ঐ একটি প্রাণ বাচাতে গিয়ে অনেকগুলি প্রাণকে হত্যা করতে
চান? আমি স্থার ভালার মরে গেলে আমার উপর নির্ভরশীল আমার স্ত্রী-পুত্রও অনাহারে
মারা যাবে। ঐ কপোত আমার ভক্ষ্য। ওর উপরে আমার স্বাভাবিক অধিকার আছে।
আমি আপনার অবাচিত দত্তা নেব কেন?” কিন্তু ততলোকের এক কথার মত রাজার ঐ এক
কথা। তিনি আশ্রিতকে ত্যাগ করতে পারবেন না। স্ত্রেন তখন বিজ্ঞপ করে রাজাকে বলে
উঠল, “ঐ সামান্ত কপোতটার উপর যদি আপনার এতই দয়া, তবে ওর সমান মাংস আপনার দেহ
থেকে কেটে আমাকে দিন না কেন।” রাজা তৎক্ষণাৎ ঐ প্রস্তাবে রাজী হয়ে তুল্যদত্তর একটা

পাকায় কপোতটাকে বেবে নিজের হাতে নিজের দেহ থেকে মাংস কেটে ওজন করতে লাগলেন। কিন্তু অগ্নিদেবের মায়ায় বারবার মাংস কেটে ওজন করতেও কপোতের সমান হল না। রাজা তখন নিজেই তুণাগণ্ডে চেপে বসলেন। মুহূর্তে ত্রেন ও কপোত “মাধু”, “মাধু” বলে স্বরূপ ধারণ করলে। শুদ্ধিত রাজা দেখলেন তাঁর সামনে গাড়িয়ে আছেন অপরূপ রূপলাবণ্যময় দেবরাজ ইন্দ্র আর অগ্নিদেব। মুখে তাঁদের প্রসন্ন হাসি। ইন্দ্র রাজার ক্ষতস্থানে হাত বুলিয়ে গেলেন নিরাশ্রয় করে গিলে রাজা আবার তাঁর পূর্ব দেহই বিধে গেলেন।

ইন্দ্র দু’হাত তুলে রাজাকে আশীর্বাদ করলেন। একেবারে প্রাণতরে আশীর্বাদ করলেন। তারপর বললেন, “রাজা তুমি ধন্ত! তোমার কাছে আমরা পরাস্ত হলাম। শুনেছিলাম, সত্যার্থ ও ত্যাগে তুমি আমার অপেক্ষাও মহৎ। সেকথা যে সত্যি এখন তা প্রত্যক্ষ করে ধন্ত আমরা। তোমার এই কীর্তি লগনের ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবে।”



“এত রূপকথা রাজা শুনি, তবু যখন আকাশে চাই,
মনে হয়, ওই উহাদের কথা কেহ কি জানেনা, ভাই ?
দলে দলে ওরা কোথা হ’তে আসে,
ঝিঁঝি ডাকে যবে হেথা চারিপাশে,
কুলের গন্ধ বেড়ায় বাতাসে—
দেখিতে কিছু না পাই,
শুধু যে ওরাই চোখে-চোখে ডাকে, আকাশে যে-দিকে চাই।”

—মোহিতলাল মজুমদার

ফুল ফুটিলো

প্রীতিমালয়নির্মল সিংহ



ফুল আজ আনন্দে ফুটিলো ।
জন্মজন গান গেয়ে
তাই বুঝি পথ বেয়ে
যেথো,—কতো মধুর ফুটিলো...
: মধুর মধু ওই লুটিলো ।

আজি এই তিরিতিরি বাতালে
ফুল নাচে, আর নাচে পাতা পে
কুহমের নৃত্যে
বিধানিত চিত্রে
যতো মানি, যতো ব্যথা টুটিলো...
: ফুল আজ তাই বুঝি ফুটিলো ?

নির্জন রাতি
আমি একা বাতী
ফুল শুঁকে চলি নিজ ছন্দে—
মনোরম পুষ্পের গন্ধে ।

ফুলের রূপেতে মন তুলিলো ।
মৃদু মৃদু সমীরণ
প্রাণে আনে নিঃসরণ—
সে আবেগে মন-প্রাণ তুলিলো,
—ফুল প্রাণে সংকার তুলিলো ।

মোর বেথে ফুল বেগে উঠিলো ।
ভাহার রঙিন হাসি
দেখিতে যে ভালোবাসি,
সে হাসিতে মনে ফুল ফুটিলো ।
: ফুল আজ কার তরে ফুটিলো ?

তাপে ওই দৌরভ
কুহমের গৌরব
ওরা মাঝে আছে তাই ঘুমিয়ে,
রাত্রির আশ্রানে
পৃথিবীর প্রীতি-টানে
ফুল করে ধরণীরে চুমিয়ে...
করা-ফুল তুলে নিয়ে
দেবতার পায় দিয়ে
পূজা করে যবে নব ভক্তে,
ফুল হয় স্বর্গীয়
মানব-দেবতা প্রিয়
অর্গেতে থাকে সেই শর্তে ।



খেলোয়াড়দের খবর

মেরুড়ে

ইংলিশ চ্যানেল সম্ভরণ

আন্তর্জাতিক মরণাসম্পন্ন ইংলিশ চ্যানেল সম্ভরণ প্রতিযোগিতায় হার্কিন মহিলা সীতার গ্রেটা এগারদশ প্রথম স্থান অধিকার করে সমস্ত ভগৎকে বিশ্বমুগ্ধিত করেছেন। গতবারও প্রিমতী এগারদশ চ্যানেল সম্ভরণে এই পৌরবের অধিকারিণী হয়েছিলেন। এই সাক্ষ্যের কলে গ্রেটা এগারদশ আগে এক বছর উর্কিটি নিম্নের কাছে রাখতে পারবেন। ১২০১ সালে ক্যানাডার বিশিষ্ট বাটলিন এক হাজার স্টাণিং পাউণ্ড দানের এই উর্কিট দান করেছিলেন। উর্কিটি ছাড়াও প্রিমতী এগারদশ মগসে ১২০০ স্টাণিং পুংকার পাবেন।

একুশ হাইল দীর্ঘ এই সম্ভরণ অভিযন্ত্রের ভগ্নে পাকিস্তানের প্রিমতী দাস মরতে মোট ত্রিশজন সীতার ক্রান্তের ল' সিংহন উপস্থল থেকে মনুত্রে অর্থদীর্ঘ হন। পনমোগেটি রাষ্ট্রের ত্রিশজন সীতারকর ভেতর চারজন মহিলা সীতারক ছিলেন। প্রিমতী গ্রেটা বেশ রিক্রমজ থেকে ভোতার পর্ষদ এই একুশ হাইল সম্ভরণ অভিযন্ত্র করেন এগারো বছরে। ১২০১ সালে ব্রিটেনের মহিলা সীতারক রেণ্ডা কিলার ১২ বছর ৪২ মিনিটে এই পথ পাড়ি দিয়েছিলেন। এবার গ্রেটা তাঁর চেয়েও কম সময়ে এই পথ অভিযন্ত্র করে রেকর্ড করলেন।

পূর্ব-পাকিস্তানের সীতারক বছরের বাঙালী সীতারক প্রিমতী দাস প্রৌদউইচ সময় বিকেল ৪টে ২ মিনিটে ভোতারের পূর্ব নিকে ইংলণ্ডের মাটি স্পর্শ করে এ বছরের চ্যানেল সম্ভরণে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। প্রিমতী গ্রেটার প্রায় ৪ বছর। পরে প্রিমতী ইংলণ্ডের উপস্থলে পৌছন। চ্যানেল সম্ভরণে তাঁর মোট ১৪ বছর ৪৭ মিনিট সময় লেগেছিল। দ্বিতীয় স্থান অধিকারী হিসেবে প্রিমতী দাস পাঁচশ স্টাণিং পুংকার পাবেন।

প্রিমতী দাসের অম্মদ্বান ঢাকা। দেশ ভাগ হওয়ার আগে প্রিমতী কলকাতার সেন্ট্রাল হাইমিং ক্লাবের সদস্য ছিলেন। দুই পাঠার সম্ভরণে অতিমত্তা অর্থনের অন্তে প্রিমতী দাস একাধিকবার পূর্ব পাকিস্তানের পদ্মা ও মেঘনার সীতার কেটেছেন। প্রিমতী দাসের সাক্ষ্যে পাকিস্তান সরকার ঢাকার সরকারী ছুটি ঘোষণা করেছিলেন আমর। প্রিমতীকে তাঁর এই কৃতিত্বের জন্য অম্মদের সঙ্গে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানান।

স্বাধীনতা দিবসে জীড়ানুষ্ঠান

স্বাধীনতা দিবস ও প্রিমতী দাসের অম্মদ্বান উপলক্ষে প্রিমতী দাসের জীড়ানুষ্ঠান কমিটির উদ্যোগে মহামোক্তান-এরিয়াল মাঠে যে জীড়ানুষ্ঠান হয়, তাতে কয়েক হাজার ছাত্র-ছাত্রী অংশ গ্রহণ

করেছিলেন। বিভিন্ন অঙ্গঠানের মধ্যে সমষ্টি
ধর্মশাস্ত্রিক, সমবেত ক্রীড়াঙ্গণ, দেহ সৌষ্ঠব
প্রতিযোগিতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য হয়। মার্চ
পাস্টে বালক বিভাগে স্বাক্ষর প্রথম ও দ্বিতীয়
স্থান অধিকার করে বঙ্গবানী স্কুল ও বারাকপুর
গভর্ণমেন্ট স্কুল এবং বালিকা বিভাগে কমলা
গার্লস স্কুল ও লেক গার্লস কন গার্লস।

—

চুণী গোস্বামী

শ্রীগোষ্ঠ পালের সভাপতিত্বে কেটোয়েল
ফুটবল ক্লাবের বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত
কমিটির সভাপতি মোহনবাগান ক্লাবের তরুণ
ইনসাইড লেফট শ্রীচুণী গোস্বামীকে এ বছরের
শ্রেষ্ঠ ফুটবল খেলোয়াড় বলে ঘোষণা করেছেন।
শ্রীগোস্বামীকে আমরা আমাদের শুভেচ্ছা
জানাই।

—

ডঃ হরেন্দ্র মুখার্জি স্মৃতি-শীল্ড

১৫ অগস্ট স্বাধীনতা দিবসে মহামেডান
স্পোর্টিং ও মোহনবাগান ক্লাবের ভেতর যে
প্রদর্শনী ফুটবল খেলা অহুত্বিত হয়, তাতে
মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব এক পোলে জয়ী হয়ে
পরলোকগত রাজাপাল ডঃ হরেন্দ্রকুমার মুখার্জি
স্মৃতি-শীল্ড লাভ করেছে। এই খেলাটি দেখবার
অন্তে শেনিন মোহনবাগান মাঠে বিপুল দর্শক
সমাবেশ হয়েছিল। বেলা শেষ হবার কিছু
আগে মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের সেন্টার
কনওয়ার্ড ওয়র জয় নির্দেশক গোলাটি করেন।

—

রোমে অলিম্পিক ক্রীড়া

রয়টারের এক পথর থেকে জানা গেছে যে,
রোমে ১৯৬০ সালের অলিম্পিক ক্রীড়ার অন্ত
অলিম্পিক গ্রাম তৈরির পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় পূর্ব-
বিভাগ চূড়ান্তভাবে অগ্রসর করেছেন। গ্রাম
তৈরির অন্তে প্রায় ৬৫০ কোটি লীরা (ইতালীয়
মুদ্রা, প্রায় ৩,৭৫০,০০০ ডলার) খরচ হবে।
রোমের অলিম্পিক স্টেডিয়ামের কাছে অবস্থিত
এই গ্রামে আট হাজার লোক বাস করতে
পারবে।

—

আই.এফ.এ শীল্ড প্রতিযোগিতা

ভারতের শ্রেষ্ঠ ফুটবল প্রতিযোগিতা আই.
এফ.এ. শীল্ডের বেলা গত ২৫ অগস্ট থেকে
শুরু হয়েছে। উদ্বোধন দিবসে জামশেদপুরি এবং
জর্জ টেনিসগ্রাফ দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। বারোটি
বহিরাগত দল লম্বাট মোট বিয়ার্লিগি দল এ
বছর এই প্রতিযোগিতার অংশ গ্রহণ করছে। শেষ
পর্বত নানা বিশদ-আপদ অতিক্রম করে আমাদের
প্রিয় দুটি দল—মোহনবাগান ও ইষ্টবেঙ্গল
ফাইনালে উঠেছে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অন্তে।

—

সারা পশ্চিমবঙ্গে স্টেডিয়াম-শৃঙ্খল

সম্পত্তি চন্দ্রনগরে অহুত্বিত এক অনন্যতায়
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অন্ততম মহী শ্রীচুণ্ডি
মজুমদার বলেন যে, ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের
খেলাধুলার মাঠের ব্যবস্থা করার অন্ত পশ্চিমবঙ্গ
সরকার সারা পশ্চিমবঙ্গ রাস্তা স্টেডিয়াম-শৃঙ্খল

তৈরীর ব্যাপারে মন দিয়েছেন। কলকাতার টেডিয়াম তৈরীর কথা উঠলে শ্রীমজুমদার বলেন, আদালতে বর্তমান যে মামলা দায়ের আছে তার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত কলকাতার টেডিয়াম তৈরীর কাছে হাত দেওয়া বাধে না।

—

রমানাথন কৃষ্ণানের সাফল্য

পশ্চিম জার্মানিতে আন্তর্জাতিক লন চ্যাম্পিয়ন প্রতিযোগিতার সিঙ্গলস ফাইনালে ভারতের দেবী খেলোয়াড় রমানাথন কৃষ্ণান জয়ী হয়েছেন। সিঙ্গলস ফাইনালে কৃষ্ণান তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর ব্রিটনের কার্ণারভেকে পাঁচ সেটের খেলায় হারিয়ে দেন। কৃষ্ণান জয়লাভ করেন ৬-৬, ৬-৩, ৬-৬, ৬-১ ও ৬-২ সেটে। এ ছাড়াও ডাবলস ফাইনালে প্রাক্তন উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন জাগোন্সভ ডুবনির সঙ্গে জুটি বেঁধে কৃষ্ণান জয়লাভ করেছেন। কৃষ্ণান ও ডুবনি ৬-২ ও ৬-২ সেটে ব্রিটনের বোজার বেকার ও টনি শিকার্ডকে পরাসিত করেন।

—

জে কনরাডের সাতটি বিশ্ব-রেকর্ড

আন্তর্জাতিক সম্ভরণ সম্ভের কংগ্রেসে অস্ট্রেলিয়ার বোম্বো বছরের কিশোর সীতার লন কনরাডের ফ্রি স্টাইল সম্ভরণে স্থাপিত সাতটি বিশ্ব-রেকর্ড অস্বীকার করা হয়। একক কোনো সীতার লন সংখ্যা এতো বেশি রেকর্ড এর আগে কংগ্রেসে অস্বীকার করা হয় নি। কনরাড-এর রেকর্ডগুলো ছাড়াও অস্ট্রেলিয়ার মহিলা সীতার

ডন ফ্রেজারের ফ্রি স্টাইলে চারটে রেকর্ড অস্বীকারিত হয়। —

সীতার লন মাও সে তুং

চীনের রাষ্ট্রপ্রধান চৌবট্ট বছরের মাও সে তুং-এর কর্মজীবনব্যাপার এক তথ্য উল্লেখিত হয়েছে। শিকিং-এর "ইন্ডিনিং নিউজ" পত্রিকার এক খবরে প্রকাশ যে, গত সীতার লন মাও সে তুং পশ্চিম-পশ্চিম চীনের ইয়াংকিং নদী সীতার কেটে পার হন। শ্রীতুং তাঁর স্বাভাবিক পোশাক পরেই জলে নেমে আধ ঘণ্টারও বেশি জলে ছিলেন এবং এক হাজার গজ পথ অতিক্রম করেন। গত দু' বছরে শ্রীতুং সীতার কেটে চারবার ইয়াংকিং নদী পার হয়েছেন।

—

ওয়েস্ট ইন্ডিজের নির্বাচিত খেলোয়াড়বৃন্দ

আগামী অক্টোবর মাসে ওয়েস্ট ইন্ডিজের যে সব খেলোয়াড়রা ভারত ও পাকিস্তান দ্বারা আগমনে নিষেধকরতলী তাঁদের নাম ঘোষণা করেছেন। যে আঠারোজন খেলোয়াড়ের নাম ঘোষণা করা হয়েছে তাঁদের ভেতর আঠের চামাইকার ফ্রান্স আলেকজান্ডার (অধিনায়ক), জ্যাকি হেণ্ড্রিক্স, রয় সিলফাইট, কলি স্মিথ, জন হোন্ট; বার্বাদোসের গারিক্স সোবার্দ, কনরাড হাল্ট, এরিক এটকিনসন, ওয়েসলি হল, রবিন বাইনো; ব্রিটিশ গায়নার বেশিপ ক্লার, জে। সলোমন, রোহন কানহাই; ত্রিনিদাদের উইলি রড্রিগস, অনটাইক টেমার, সোনি রামাধীন প্রমুখ এক-তাকে চেনা খেলোয়াড়বৃন্দ।

—



খাঁখাঁ পাণ্ডা

স্বাক্ষর খেলা

ত্রীননীগোপাল চক্রবর্তী

গণিত

[মুখে মুখে উত্তর দিতে হবে। প্রতি প্রশ্নে দু'টি নম্বর করে মোট একশো নম্বর থাকল।
তুমি কত পাণ্ডা সেব।]

১। এক গোয়ালী মশদের ৩ পাঁচ সের দুটি পাত্রে মোট পনের সের দুধ বিক্রি করতে এনে
ছিল। তার পাঁচ-পেরী পাত্রেই সব দুধ বিক্রি হয়ে গিয়েছে। এমন সময় একজন তিন দেহী
একটি পায় নিয়ে এল এক সের দুধ নেবে বলে। আর কোন পাত্র সেখানে নেই। গোয়ালী ঐ
লোকটিকে কি উপায়ে এক সের দুধ দিতে পারে?

২। মদীতে একখানি ছোট্ট মোকা আছে। এই মোকার মাজ একজন লোক এবং তার
সঙ্গে আর একটা প্রাণী বা বস্তু যেতে পারে। একটা লোকের সঙ্গে আছে একটা বাঘ, একটা
ছাগল এবং এক ঝাঁটি পান। লোকটি কি করে এইসব নিয়ে পার হয়ে যেতে পারে? মনে রাখতে
হবে লোকটি কাছে না থাকলে বাঘে ছাগল বাবে এবং ছাগলে পান খেয়ে ফেলবে।

৩। ভাঁটনে দুটা কাঠি পুঁতে তার একটার স্তম্ভ স্তম্ভের এক প্রান্ত বাঁধলাম। তারপর
ঘুরিয়ে অপর কাঠিতে জড়িয়ে আবার প্রথম কাঠিতে জড়িয়ে নিয়ে এলাম। এইভাবে জড়ানোর পর
যে কাঠিতে প্রথমে স্তম্ভের একপ্রান্ত বাঁধা হয়েছিল, সেই কাঠিতে এসে অপর প্রান্ত শেষ হ'ল।
সুখে দেখা গেল দুই কাঠির মাঝখানে স্তম্ভের ছ'টি তার হয়েছে। এরপর একটি দুই হুঁলে এসে
একখানা কাঁচি দিয়ে ঐ দুই কাঠির মাঝখানের ছ'টি তারই একসঙ্গে হুঁবার করে কেটে দিলে।
কাঁচি আঁত স্তম্ভে ক'পাছা পাঁচরা বাবে?

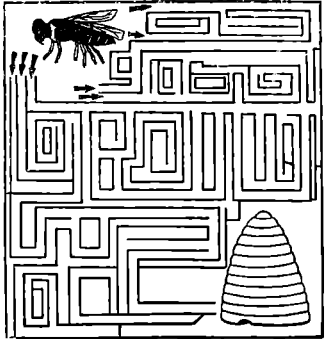
৪। আমি রাজা ঘরে থাকতে ভালবাসি। আমি গরম হলে তোমরা মনে কোনো না আমি রেগে গেছি। সব কাজই করতে আমি রাজী আছি। কাজ করতে করতে অনেক সময় আমি শিস্ রেই বা গান ক'তি, বলতো আমি কে ?

৫। একজন রাক্ষসীরা নগে ঠিক হ'ল সে চার ফুট লম্বা, চার ফুট চওড়া এবং চার ফুট বাড়াই একটি বেদী তৈরী করে দেবে। সেজন্য তাকে দেওয়া হবে বশিষ্ট টাকা। সে ছ' ফুট লম্বা, ছ' ফুট চওড়া এবং ছ' ফুট বাড়াই তৈরী করে মকরী কাছে অন্তর চলে গেল। সে যতখানি কাজ করেছে তার মন্ত সে কত পাবে ?

৬। এক পুতুরের চার কোণার চাবটি শিব মন্দির আছে। মন্দিরের নিয়ম, যে ফুল নিয়ে পূজা করতে যাবে তার অর্ধেক দিয়ে শিব পূজা করে বেরিয়ে ঘাবার সময় একটা ফুল দরজায় ফেলে দিয়ে যেতে হবে, এবং শেষ মন্দির থেকে বেরিয়ে ঘাবার সময় তোমার কাছে একটা ফুলও থাকবে না। ক'টা ফুল নিয়ে যাবে তুমি পূজা করতে ?

কোন রাস্তায় ঘরে
ফিরি !

৭। যেচারা মৌষাছি !
পথ হারিয়ে ফেলেছে। কোন
বাঁতা দিয়ে গেলে সে সহজে
ঘরে গিয়ে পৌঁছুতে পারবে
সেলিলের লাইন দিয়ে ট্রেস
করে দেখ।



উত্তর

গোয়ালার কাছে পাত্ৰ আছে দুটি—একটি পাঁচ-সেরী খালি এবং অপরটি দশ-সেরী দুধ ভর্তি। যে লোকটি দুধ কিনবে এক সের, তার কাছে আছে একটি তিন-সেরী খালি পাত্ৰ। এই তিন-সেরী পাত্ৰে সে এক সের দুধ এই ভাবে নিতে পারে—

দশ সের দুধ থেকে তিন-সেরী পাত্ৰে তিন সের ঢাললাম। তারপর ঐ তিন সের দুধ গোয়ালার পাঁচ-সেরী খালি পাত্ৰে ঢাললাম। আবার ঐ দশ-সেরী দুধের পাত্ৰ থেকে তিন-সেরী পাত্ৰে তিন সের দুধ ঢাললাম। পাঁচ-সেরী পাত্ৰে এখন তিন সের দুধ আছে। ঐ পাত্ৰে তিন-সেরী পাত্ৰ থেকে আরও দু'সের দুধ ঢেলে দিলে ঐ পাত্ৰে থাকবে এক সের। এই ভাবে এক সের দুধ কেনা যাবে।

২। লোকটি প্রথমে ছাগলটাকে নিয়ে ওপার যাবে। এপারে বাঘে পানি বাবে না। তারপর ফিরে এসে পানি নিয়ে ওপার যাবে। এবার থাকবে বাঘ এক। ওপারে পানি রেখে ছাগলটাকে সঙ্গে করে এপারে আনবে। এবার ছাগলটাকে এপারে রেখে বাঘকে ওপারে রেখে আনবে। তারপর ফিরে এগে ছাগলটাকে নিয়ে ওপারে যাবে।

৩। খণ্ড হুতো পাওয়া যাবে তের গাছ। তার মধ্যে এক দিকে দুটো ও অপর দিকে তিনটে বড় টুকরো, মাঝখানে দুটো এবং এক ধারে দুটো এই আটটি ছোট টুকরো পাওয়া যাবে। দুটো তারের মাঝখানে কাঁচি দিয়ে ছ'বার কাটা হয়েছে বলে $৬ \times ৩ =$ আঠারটা আঙুল হুতোর টুকরো হবে না।

৪। কেটুঁলি।

৫। চার টাকা পাবে। কারণ, খাড়াই চার ফুটের বমলে বন সে দু'ফুট খাড়াই করল, তখনই দমত কাজের অর্ধেক করা হ'ল। তারপর লম্বার দিকে অর্ধেক এবং চওড়ার দিকেও অর্ধেক করলে সম্পূর্ণ কাজটির আট ভাগের এক ভাগ করা হয়েছে। সেইজন্য সে ৩২ টাকার আট ভাগের ভাগ ৪ টাকা পাবে।

এটি ঘন ফলের অংশ। ঘন ফল—দৈর্ঘ্য $\times$ বিস্তার $\times$ বেধ (বা খাড়াই); এখানে $৪ \times ৪ \times ৪ = ৬৪$ ঘন ফুটের বমলে সে করেছে $২ \times ২ \times ২ = ৮$ ঘ. ফু. এই জন্য ৪ টাকা পাবে। বক্রিণ টাকার অর্ধেক হোল টাকা নয়।

৬। ত্রিশটি ফুল। ১ম মন্দিরে ১৪টি দিয়ে পূজো করে দরজার ১টি। থাকল ১৪টি। ২য় মন্দিরে ৭টি দিয়ে পূজো করে দরজার ১টি। থাকল ৬টি। ৩য় মন্দিরে ৬টি দিয়ে পূজো করে দরজার ১টি। থাকল ২টি ৪র্থ মন্দিরে ১টি দিয়ে পূজো করে দরজার একটি দিলে হাতে একটিও থাকবে না।

সেই মন্দির থেকে হিসাব করতে হবে। কান্দু সংখ্যার অর্ধেক ও একটি দিলে কিছুই থাকে না—২; এই ভাবে।



নতুন বই



(দখালোচনার সত্ত্ব দু'খানি বই পাঠাবে)

ছবি-আঁকা (গ) - শ্রীমহেন্দ্র নাথ দত্ত।
শ্রীমহেন্দ্র নাথ দত্ত কর্তৃক লিখিত সাহিত্য সংসদ
প্রাইভেট লি., ৩২এ আগার সার্কুলার রোড,
কলিকাতা ২ হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১/-

ছোট বেল খেকেই ছবি আঁকার মিকে
ছেলেমেয়েদের যে স্বাভাবিক প্রবণতা দেখা যায়,
তাকে অনেকই উৎসাহিত করেন না ছুটি কারণে।
প্রথম কারণ হ'ল, ছবি আঁকার অভ্যাসবাদের
নিষেধে বই কোন অভিজ্ঞতা থাকে না বলে, এবং
দ্বিতীয় কারণ এতে লেখাপড়ার (সম্ভবতঃ) ক্ষতি
হয় বলে। আগে চিত্রশিল্প এখানে মোটেই
অর্থকরী ছিল না বলে, কোন ছেলে ছবি-আঁকার
মন গিলে বাড়ির সকলেই চটে উঠতেন, লেখা-
পড়ার ক্ষতি হবে বলে। তাছাড়া এ সম্বন্ধে ভাল
বই পস্তর না থাকায় অভিভাবকরা ছেলে-
মেয়েদের কোন সাহায্যও করতে পারতেন
বাড়িতে। বর্তমানে দৃষ্টিভঙ্গী অনেকেরই বদলেছে
এবং শিল্পও অনেক অর্থকরী হয়েছে আগেকার
তুলনায়। বইপস্তরও উৎকৃষ্ট ধরনের বেকছে
আজকাল ছবি আঁকার বিষয়ে।

প্রকাশক লিখিত সাহিত্য সংসদ অনেক ভাল
ভাল কাজের সঙ্গে ছোটদের ছবি-আঁকা শেখবার
মহায়ত্ব হিঁসাবে এই দিগ্বিজয়ের বইগুলি বার করে
যথেষ্ট উপকার সাধন করেছেন। 'ছবি-আঁকা'
দিগ্বিজয়ের এটি তৃতীয় বই। ব্যাংকোয়া শিল্পী

মহেন্দ্রনাথ দত্ত অত্যন্ত স্বতঃস্ফূর্ত ও বৈজ্ঞানিক
মন নিয়ে ছবি-আঁকা শেখবার সহজ সরল উপায়-
গুলি অনেক ছবির সাহায্যে দেখিয়েছেন। রঙীন
ছবি আঁকার নমুনা হিঁসাবেও ছবি আঁকে
কয়েকটি। বইখানি হাতে পেয়ে ড্রয়িং-এর
ব্যাপারে ছেলেমেয়েরা যেমন উৎসাহিত বোধ
করবে, তেমনি উপকৃতও হবে।

—
জুগলী নদীর তীরে—শ্রীবিমলেন্দু
বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীমদভূমার বন্দ্যোপাধ্যায়
কর্তৃক বঙ্গ-ভূমি, গোন্দলপাড়া, চন্দ্রনগর
হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১০/-

বিনোদবিহারী বিজ্ঞানিকতত্ত্বকে কেন্দ্র
করে এবং তার ছেলের নিয়ে এই কাহিনীর
স্থাপনা। অনেকগুলি চরিত্র আছে এর মধ্যে,
কিন্তু আগলে হাবুলই এর মায়ক এবং তাকে
নিয়ন্ত্রিত গল্প এগিয়েছে। চন্দ্রনগর গোন্দল-
পাড়ার হাবুল আর তার মেজমামার ঘটনার
মধ্যে এসে পড়েছে পিরবী দলের কথা—কানাই-
লালের কাহিনী। হাবুলের ঐ মেজমামার ভেলের
মধ্যে কানাইলালের চোখে লুকিয়ে দিয়ে এমেলিল
রিভালবার। কাহিনীটি সাধারণ ব্যাপারে
কুশলী শিল্পী পণ্ডিত না থাকলেও, ঘটনাটি বেশ
রোমাঞ্চকর এবং পড়তে ভালই লাগে।



গোয়ালিয়ার লেখা

হায়াসিহাস ফুলের ইতিকথা

অনেক, অনেক বছর আগে গ্রীষ্ম মাসের এক
প্রাণে বাস করতো এক সুন্দর ফুল। হায়াসিহাস
ছিল তার নাম। ডোরবেলার সুবর্ণের মতই সে
ছিল উজ্জ্বল আর হাসিমুখী। শিকার করা ছিল
হায়াসিহাসের ভারী কৌশল। পৃথিবীর কোন
প্রাণীকে সে ভয় করতো না।

সুবর্ণবস্ত্রা এ্যাণ্ডেলো এই সুন্দর হাসিমুখী
বালকটিকে খুব ভালোবাসতেন। নিশ্চয়ই যশ্বর
আর ভক্তদের ছেড়ে তিনি হায়াসিহাসের সঙ্গে
বনে বনে ঘুরে বেড়াতেন। কখনও তার সুসু-
গন্ধকে খরতেন, কখনও বা তাকে তাঁর ছুঁতে
লাহায্য করতেন। এমন করে এ্যাণ্ডেলো ও
হায়াসিহাসের দিনগুলি নদীর মত তরতর করে
বয়ে যেত।

বসন্তের এক সুন্দর দিন। বনে বনে ঘোরার
পর ক্লান্ত হয়ে এ্যাণ্ডেলো আর হায়াসিহাস
বনের প্রান্তে এক সুন্দর কুঁড়ির মধ্যে বিশ্রাম
করছিলেন। বসন্তের শীতল হাওয়া তাদের তপ্ত
দেহকে জুড়িয়ে গিচ্ছিল। ক্লান্ত-মুক্ত হয়ে

এ্যাণ্ডেলো 'কুইট' খেলার প্রস্তাব করলেন।
একটা লোহার বড় গোলককে আকাশে ছুড়ে
হেঁচকি হোল 'কুইট' খেলা। সবচেয়ে বে-
ঘরে ছুঁতে পারত সে হ'ত জয়ী। হায়াসিহাস
আনন্দে মগ্ন হলে, কিছুক্ষণের মধ্যে তাঁদের খেলা
ঘমে উঠল।

এ্যাণ্ডেলো একবার এত ঘোরে গোলকটা
ছুড়লেন যে সেটা মীল আকাশ ভেদ করে
মাটিতে মলমল এসে পড়ল। হায়াসিহাস বন্ধুর
খেলার মৃদু হয়ে সেটা আনতে গেল, কিন্তু সেই
ভারী ভিনিসটা মাটিতে ধাক্কা খেয়ে তার কপালে
এসে লাগল। পরক্ষণেই অদ্ভুত আর্দ্রতা করে
পড়ে গেল সে।

এ্যাণ্ডেলো বন্ধুর মশা দেখে দৌড়িয়ে গেলেন
তার কাছে। বুঝে পান। খেতে তার ক্ষতের
উপর লাগলেন; গভীর স্নেহে, ব্যাকুলতার তার
কপালে হাত বুলায়ে দিতে লাগলেন। কিন্তু
বৃথা চেষ্টা। ক্রমা-ক্রমে মতই হায়াসিহাসের
জীবনধীপ নিবে গেল।

এ্যাণ্ডেলো বন্ধুর মৃত্যুতে শোকে-দুঃখে তাঁর
চিরসার্থা বাণী তুলে নিলেন, এবং যে মধুর



নর্তকী

শিল্পী : ইন্ডলতা মিত্র

সদ্যত তাঁর বীণার তার থেকে ঝড়ত হল, সেই
সদ্যত তাঁর হৃদয়ের বেদনাকে বহন করে দিকে
দিকে ছড়িয়ে পড়লো। বনের পাতার পাতার
কম্পন জাগিয়ে সেই স্বর আন্তে আন্তে মিলিয়ে
গেল। কিন্তু তাঁর রেশ বনের অঞ্চল নিস্তব্ধতাকে
আরও করুণ করে তুলল।

বীণা বেধে নত হয়ে আঁপোলো ছায়াশিঁড়াসের
ললাট স্পর্শ করলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে বেথানে
ছায়াশিঁড়াসের দৃতমেহ পড়ে ছিল, সেখানে বেথা
ছিল এক অপূর্ণ রক্তের মত লালফুল।

তারপর বহু বছর কেটে গেছে, কিন্তু আজও
যখন পৃথিবীতে স্বত্বরাজ বন্যের আবির্ভাব
হয়, তখন দেখা যায় বনের প্রান্তে কোমল
ছুঁচুনে এক রক্তবরণ ছায়াশিঁড় ফুল। বাতাস
কিসকিসিয়ে তার পাপড়ী তুলিয়ে যায়। আর
ফুলটি যেন কানে কানে স্বর্গদেবতার অকৃত্রিম
ভালোবাসার স্বতি তাকে বলে ওঠে।

শ্রীউত্তরা সেন

শরৎ

নীল গগনের আকাশ পথে

শরৎ এসেছে আজি

সোনালী আলোর বলয়ল করে

রঙীন পুষ্পরাশি।

সাদা সাদা মেঘ আকাশের পথে

চলিছে হৃদয়ে ভাসিয়া,

শিশির-মোত ভামল শোভায়

শিউলি উঠিছে হাসিয়া।

প্রান্তর মাঝে মাঝে কাশফুল

উঠিছে হাওয়ায় ছলিয়া,

ভরা নদী জল হেসে হেসে কুলে

ছলছল পড়ে লুটিয়া।

অবিচল তারা বাতলের পরে

নৃতন কৃষণে সাজি

নীলগগনের আকাশ-পথে

শরৎ এসেছে আজি।

শ্রীরক্তকান্ত রায়



দেখতে দেখতে পূজো এসে গেল। চারিদিকে খুণী আবেশ ছড়িয়ে পড়েছে। শহরে যারা আছো তাদের তো আনন্দ উপভোগ করার অনেক পথ আছে, আং বাং শহর থেকে দূরে তাদের আনন্দ নীমাবদ্ধ হলেও প্রাপ্যবস্ত। আমার তো মনে হয় শহরের বারোয়ারী পূজার আত্মীয় দাঁড়িয়ে লাউভঙ্গীকারের কান-ঝালাশালা করা সঙ্গীত-পরিবেশনে যতটা আনন্দ পাওয়া যায়, গ্রামাঞ্চলের আড়খরগীন বারোয়ারীতলাব পূজার তার চেয়ে অনেক বেশী আনন্দ পাওয়া যায়। তার শ্রদ্ধতা, পবিত্র-উৎসবকে আরও অনেক বেশী পবিত্র করে তোলে। শহরের পূজার সকল পবিত্রতা ম্লান করে দেয় যখনই পূজো-শ্যাওলা থেকে অহোরাত্র উজ্জ্বলবে বাঁধা লাউভঙ্গীকার সহযোগে অতি-প্রচলিত আধুনিক গানের হর ভেঙ্গে আসে। শহরের পূজার আত্মাদের আনন্দ মাটি করে দেয় তার বাইরের চাকচিক্য। অস্তরের সাড়া তাতে পাই না।—বাহোক পূজো পূজোই। বাঁধালীর নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের শাওলীয়া পূজার এই দিন কয়টির জন্তে আমরা সারা বছর অনেক আশায় বসে থাকি। সেই আশা সার্থক হোক, হৃদয় হোক, এই আমাদের একমাত্র কাম্য আর সেই পথে বলি :

শরতের কাশফুল শেফালির রাশি
বোধনের হুরে ভরে বিগনের বাশি
ভেতামেডন দূব করে আসে শাওলীয়া
সেই হুরে ভেঙ্গে থাক দ্ব্যাকার হিয়া।

এবারে তোমাদের অনেক চিঠি পেরেছি। সব চিঠির উত্তর দেওয়া সম্ভব হবে না। কিছু আগামীমাসের তত্ত্ব রাখতে হোল। রত্না বন্দ্যোপাধ্যায় (কোলকাতা)—তোমার বড় বড় অঙ্কের লেখা চিঠি পেলাম। স্থলে যেতে ভালো লাগছে জেনে খুব খুশী হয়েছি। মন দিয়ে লেখাপড়া করো। সুধাংশু ও মঞ্জু ঘোষ (টালীগঞ্জ)—এরোপেন আবিষ্কার করেন আমেরিকার রাইট নামে দুই ভাই। হরিতোষ চট্টোপাধ্যায় ও শংকর দাস (বাণীগঞ্জ)—লেখনীষক

ব্যবস্থা আগে ছিল—আপাততঃ বন্ধ করা হয়েছে। শিকুল চক্ৰবর্তী (বাণীগঞ্জ)—তোমার চিঠিতে স্বপ্নের পেলাম। আগে জানাওনি তো? মধুচক্রের মাধ্যমে দু'জনের আলাপ বা গড়ে উঠেছে তা মধুর হোক এই আশাই করি। ব্রণবীর মজুমদার (লখনউ)—তোমাদের নতুন বাড়ী খুব ভালো লাগছে কেনে আনন্দ পেলাম। সুবোধ ষামাস্ত্র (২৪ পরগণা)—তোমার প্রেরণ উত্তর সঠিকভাবে দেওয়া সম্ভব নয়। তবে এটুকু বলকে পারি যে, এই লেখক দু'জনের বেশ কিছু দাস্তব অন্তিমত। ছিল তা নাহলে এরকম মর্যস্পর্শী লেখা সৃষ্টি সম্ভব হত না। জিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বেশীপুর)—এ রকম কোন তারা আগাগে উঠতে পেরিনি বা তনিওনি। সেইজন্মে ও সবকিছু কিছু বলা উচিত হবে না। শিবানী রায়চৌধুরী (কলকাতা)—সংবিত্ত বিধির দীর্ঘ জীবন তুমি কি স্মিতে পায়ে? তোমাদের আলাপের স্বপ্নের পেলাম। আলাপ সার্থক হোক। চন্দ্রা বন্দ্যোপাধ্যায় (কলকাতা)—অনামিকা চট্টোপাধ্যায় (বরাহনগর)—ঘনা ও শ্যামল দেব (দিল্লী)—দেববাণী মুখোপাধ্যায় (বহুবাজার)—তোমাদের সকলের চিঠি পেয়েছি।

প্রীতি ও শুভেচ্ছা রইলো। তোমাদের—

মধুদি

পূজা-সংখ্যা মোচাক

অগ্রাশ্র বহুরের মত এ বছরেও মোচাকের কার্তিক সংখ্যা পূজার সংখ্যা হিসাবে আগামী মহালয়ার পূর্বেই প্রকাশিত হবে। বহু নামকরা লেখক গল্প, প্রবন্ধ ও কবিতা লিখবেন এই সংখ্যায়।

ঐশ্বর্যচন্দ্র সরকার কর্তৃক ১৪ বর্ষের চাটুজ্যে স্ট্রিট, কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত

ও তৎকর্তৃক প্রকৃত প্রেস, ৩০ কর্নওয়ালিস স্ট্রিট, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত

মুলা : চল্লিশ নয়া পয়সা

মৌচাক--কাঠিক. ১৩৬৫।



শুভার ফুল



মোচাক

৩৯ বর্ষ]

কার্তিক—১৩৬৫

[৭ম সংখ্যা

শান্তিনন্দীয়া

শ্রীদীনেশ গঙ্গোপাধ্যায়



আল আর মেঘ নেই ঘল নেই, বড় নেই,
আকাশ কি নীল।

নবীতরা কুল কুলে হাটি তরা কলে কুলে
ধৈ ধৈ বিল।

নাচে প্রজাপতিগুলি বুলিয়ে বড়ের তুলি
আকাশের কাছে,

কত রঙ বয়ে তার ফুল-কাটা পাখনার
ছবছর নাচে।

সব্ব ধানের ক্ষেতে টিরা-রঙ সাজী গেতে
রেখেছে কি কেউ?

কচি কচি ধান-শীবে বাতাসের গান বিশেষ
কি ধূঁর ডেউ!

নবীকুল ছুঁয়ে ছুঁয়ে কি খুঁতে হয়ে হয়ে
ঘোলে কাশফুল

ফুলছে বীঘির মলে পদ্ম-পাতার কোলে
পদ্ম-মুকুল।

সবুজ এই পৃথিবীর হাসি-ভরা ছবিটির
 রূপের হোঁচকার
 রাজা হলো সব প্রাণ বাজে কি সবুজ গান
 মনের বীণায় !

ভাইনে লক্ষী-সতী বামে শুভা পরবতী,
 কেশরী বাহন,
 কাভিক গণেশ সাথে অস্ত্র ধরে দশ হাতে
 পাড়ালে এমন ?

ধরবীর কি যে স্বপ্ন ! ভরেছে স্ত্রাসল বুক
 তরল শিউলীতে,
 প্রভাতের রোমে একি পূজো-পূজো আভা দেখি
 সোনালী ছবিতে !

এত দয়া যা তোমার ? দত্ত হয় জয় বার
 এক কথা পেলে,
 আজি এ শায়দ-প্রাতে, তুমি কি আপন হাতে
 তাই দিতে এলে ?

ভবনী জয়তুমি, কে বলে গো মাটি তুমি ?
 'মা' তোমার নাম :
 তুমি প্রাণ, তুমি গতি, তুমিই মা ভগবতী,
 তোমারে প্রণাম ।

জ্ঞান, বিদ্যা, দিগ্ধি, জয় ধন-খাত্ত, বরাস্তয়
 কি তোমার নাই ?
 এক কথা সেই ঘন দাঁও মা গো, এ জীবন
 পূর্ণ করে বাই ।

তুলেছি তোমার পুষ্পা রূপ ধরে দশকুজা
 তাই কি এসেছো ?
 অহর নাশের তরে দশ দিক আলো করে
 এ বেশে সেজেছো ?

দাঁও আলো, দাঁও আশা, প্রাণে প্রাণে ভালবাসা,
 স্ত্রীচরণে হতি,
 অন্ন দাঁও, আত্ম দাঁও তক্তি দাঁও, মুক্তি দাঁও
 দাঁও শুভ গতি ।

অহরের কালো ছায়া মুছে থাক মহাশায়া
 তোমার প্রদাসে,
 হুরে থাক হুঃখ শোক, সব প্রাণ গুচি হোক
 পবিত্র প্রভাতে ।





আচিন্ত্যকুমার (সেনগুপ্ত)

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

৬৩

‘ভারতবর্ষকে তুলতে হবে, গরিবদের খাওয়াতে হবে পেট ভরে, শিক্ষার বিস্তার করতে হবে দিকে-দিকে আর পুরোতের দলকে এমন ধাক্কা দিতে হবে যেন তারা ঘুরপাক খেতে-খেতে আটলান্টিক মহাসাগরে ছিটকে পড়ে—তা তিনি ব্রাহ্মণই হোন, সরোদীই হোন, যিনিই হোন।’ আলাসিদ্ধাকে লিখছেন স্বামীজি : ‘সামাজিক আচার একবিন্দুও যাতে না থাকে তাই দেখতে হবে। প্রত্যেকে যাতে আরো ভালো করে খেতে পায় আর সুবিধে পায় উন্নতি করতে—তাও। আমাদের নির্বোধ যুবকেরা ইংরেজের থেকে ক্ষমতা পাবার জন্তে সভাসমিতি করছে, ইংরেজ হাসছে মুখ লুকিয়ে। যে অস্ত্রকে স্বাধীনতা দিতে প্রস্তুত নয় সে কি করে স্বাধীন হবার যোগ্য? ধরো ইংরেজ তোমাদের হাতে শক্তি ছেড়ে দিলেন, তাতে হবে কি? আর কেউ এসে শক্তি কেড়ে নেবে। দাসেরা শক্তি চায় অস্ত্রকে দাস করে রাখবার জন্তে।’

আর ইংরেজ ?

‘ভারতবর্ষে কী রেখে যাবে ইংরেজ?’ বক্তৃতা দিচ্ছেন স্বামীজি : ‘হিন্দু-রাজারা রেখে গিয়েছে মন্দির, মুসলমান রাজারা অট্টালিকা আর ইংরেজ ? ইংরেজ রেখে যাবে ভাঙা ব্র্যাণ্ডির বোতলের স্তূপ। কী করেছে ইংরেজ ? নিজের কৃতির জন্তে আমাদের শেষ রক্ত বিন্দু পর্যন্ত গুবে নিয়েছে। শত হাতে আমাদের ভাগ্য লুট করে নিয়েছে যাতে আমরা নিরস্ত্রের দল পথে-পথে ঘুরে বেড়াই। তাদের পশু-শক্তির নির্গঞ্জ প্রতীক হচ্ছে বুট আর বুলেট। একটা গোটা দেশের মুখ থেকে

কেড়ে নিয়েছে ভাষা, দেহ থেকে খসিয়ে নিয়েছে মেকুদণ্ড। কিন্তু নিরাশ হবার কিছু নেই। আসছে জলন্ত প্রতিশোধ। সে জলন্ত প্রতিশোধ আর কেউ নয়—সেই জলন্ত প্রতিশোধ চীন। চীনের জনজলপ্লাবন।’

‘আমাদের এই চূর্ণদর্শা কেন?’ আবার বলছেন স্বামীজি : ‘আমরা আমাদেরই দেশবাসীকে হয় বলে অপজ্ঞাত বলে অস্পৃশ্য বলে নির্ধাতন করেছি—সেই হেতু। যেখানে অত্যাচার, জানবে, সেখানেই প্রতিশোধ। স্তূপীভূত মেঘের মধ্যে বজ্রের আয়োজন।’

রাইট বললেন, ‘তুমি যাও এবার শিকাগো—’রাইটের কণ্ঠস্বর স্পষ্ট ও দৃঢ়।

রাইটের মুখের দিকে সবিস্ময়ে তাকালেন স্বামীজি। শিকাগো! সে আশা তো তিনি কবে ছেড়ে দিয়েছেন।

‘শিকাগো। সে তো অনেক দূর।’

‘না, মোটেই দূর নয়। আমিই সব ব্যবস্থা করে দেব।’

‘আপনি ব্যবস্থা করে দেবেন?’ অবিশ্বাসের হাসি হাসলেন স্বামীজি : ‘আমার ঢাল নেই তরোয়াল নেই, ঢাল নেই চুলো নেই—আমাকে পাস্তা দেবে না।’

‘আপনাকে পাস্তা দেবেনা!’ ক্রমে উঠলেন প্রফেসর : ‘আপনার জগ্জেই তো ধর্মসভা, আপনিই তো সেই সভার প্রধান ব্যক্তি, প্রথম ব্যক্তি।’

‘বলেন কি! আমি যখন সেখানে গলাম আমাকে বললে আপনার সার্টিফিকেট কই? পরিচয়পত্র কই?’

‘বললে?’ প্রফেসর গর্জন করে উঠলেন : ‘তা হলে যেন ওরা নূর্যকে জিগগেস করে, তুমি যে আকাশে আলো দেবে, তোমাকে কে চেনে, কোথায় তোমার বাড়ি-ঘর, কবে আর কোথায় এর আগে আলো দিয়েছ, তোমার সম্বন্ধে কার কি অভিমত, এত বড় আকাশে আলো দিতে পারবে তার ভরসা কি। কার প্রেমের তোয়াকা করে না, ধার ধারে না কোনো অধিকারের। সে নিজের ঔজ্জ্বল্যে পরিচিত। স্বামীজি, তুমি সেই নূর্যের মত স্বপ্রাণ।’

‘ডেলিগেটের টিকেট দেবে কে আমাকে?’

‘প্রতিনিধি নির্বাচনের কমিটির যে চেয়ারম্যান সে আমার বন্ধু। তাকে আমি

চিঠি লিখে দিচ্ছি। তুমি হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিত্ব করবে।' গম্ভীরমুখে বললেন প্রফেসর রাইট।

এ সব কি গল্পকথা শুনছি নাকি।' স্বামীজি উৎসাহে প্রতাপ হতে লাগলেন। শ্রবণ করতে লাগলেন ঠাকুরকে।

'তুই দেখে নিস।' দেশে থাকতে বলেছিলেন তুরীয়ানন্দকে : 'এই আমার জন্মেই শিকাগোতে ধর্মসভা হচ্ছে, শুধু আমি সেখানে বক্তৃতা দেব বলে। তুই দেখে-নিস হরি ভাই।'

'কিছুতেই ভয় পেয়োনা,' লিখছেন রামকৃষ্ণানন্দকে, যতদিন তিনি আমার মাধ্যম হাত রাখছেন, ততদিন কি কারুর আমাকে দাবাবার জো আছে? তবেশুঃ কঠাগতা প্রাণাং, প্রাণ কঠাগত হোক, তবু ভয় পাবে না। সিংহবিক্রম অথচ কুশুমকোমলতার সঙ্গে কাজ করবে।' আরো লিখছেন : 'তিনি কি শুধু ভারতের ঠাকুর? এ সংকীর্ণ ভাবের থেকেই অধঃপতন হয়েছে। ঐ সংকীর্ণ ভাবের বিনাশ না হলে কল্যাণ অসম্ভব। আমার যদি টাকা থাকত তোমাদের প্রত্যেককে পৃথিবী-পর্যটনে পাঠাতাম। কোণ থেকে না বেরলে কোনো বড় ভাব হৃদয়ে আসেনা। তিনিই কাণ্ডারী, ভয় কি?'

কমিটির চেয়ারম্যানকে চিঠি লিখলেন রাইট। লিখলেন, 'যাকে পাঠাচ্ছি তাঁর একার বিজ্ঞা আমাদের দেশের প্রাক্ত পণ্ডিতদের একত্রিত বিজ্ঞার চেয়ে বেশি। ধারে তো বটেই, ভারেও।'

'তবে একটু ইংরেজি ভাষাটা দোরস্ত করতে হবে।' স্বামীজি লিখছেন ব্রহ্মানন্দকে : 'অর্থাৎ ফলকথা এই যে, এদের দেশের বাঘভাল্লুক-পাঞ্জি পণ্ডিতদের মুখ থেকে রুটি ছিনিয়ে নিয়ে খেতে হবে। অর্থাৎ বিজ্ঞার জোরে এদের দাবিয়ে দিতে হবে, নইলে ফু করে উড়িয়ে দেবে দেখো। এরা না বোঝে সাধু, না বোঝে সন্ন্যাসী না বোঝে ত্যাগ-বৈরাগ্য। বোঝে বিজ্ঞার তোড়, বক্তৃতার ধুম আর মহা-উজোগ। জগদম্বার ইচ্ছায় সকলি সম্ভব।'

'আপনি তো পাঠাচ্ছেন আমাকে শিকাগোতে—' ভাবতেও স্বামীজি রোমাঞ্চিত হচ্ছেন, বলছেন, 'কিন্তু আমার ট্রেনের টিকিট কেনবার পয়সা কই?'

‘আমি দেব।’ বললেন রাইট।

‘আপনি দেবেন?’

‘হ্যাঁ মনে করো ঈশ্বরই দিচ্ছেন করুণা করে।’ রাইটের হৃৎচাখ চকচক করে উঠল।

‘কিন্তু সেখানে থাকব কোথায়? খাব কি?’

‘তাও পুরোপুরি বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি।’

সন্দেহ কি, ঠাকুরের করুণা। ঠাকুরের অমিত মহিমা, অমোঘ মহিমা।

কিন্তু শিকাগো থেকে উত্তর আসতে দেরি আছে। সভা তো সেই এগারোই সেপ্টেম্বর। এর মধ্যে ঘুরে আসি সালাম। মিসেস টানাট উডস সেখানে নেমস্তন্ন করেছেন বক্তৃতা দিতে। “৭ট গ্যাণ্ড ওয়ার্ক” ক্লাবের একজন বিশিষ্ট সভ্য, মিসেস উডস আবার শিশু-সাহিত্যেরও রচয়িত্রী। একেবারে তাঁর বাড়িতে এনে আশ্রয় দিলেন স্বামীজিকে। একটি নিত্যানন্দবর্ধন শিশুকে।

“৭ট গ্যাণ্ড ওয়ার্ক” ক্লাবেই বক্তৃতা। বক্তৃতার বিষয় ভারতবর্ষ, তাঁর ধর্ম ও রীতিনীতি।

কে বক্তৃতা দেবে? নাম কি?

কেউ বলে বিবেকানন্দ, কেউ বিবিক্তানন্দ কেউ বা বিবিষ্কানন্দ।

করে কি?

জানো না বুঝি? ভারতবর্ষের কোন এক রাজা। সভায় আসবে তার স্বদেশে তৈরি রাজকীয় পোশাকে। তারি মজা। দেখবে চলো। শুনবে চলো।

এ কি! রাজা কোথায়? এ যে রাজরাজেশ্বর। এ যে নববেশে বুদ্ধ, যীশুখৃষ্টের আবির্ভাব। আর কি কণ্ঠস্বর! যেন স্বতর্কৃত আনন্দে বিশাল সমুদ্র সম্ভাষণ করে উঠেছে।

সে কণ্ঠস্বরে সারল্য ও আন্তরিকতার জাহ্নু, পবিত্রতার অমৃতস্ফর্শ।

কী বলছে? নতুন কথা বলছে। পশ্চিম কখনো শোনেনি এমন কথা। বলছে, ভালোর জগ্গেই ভালো কাজ করো, পুরস্কারের জগ্গে নয়। আর কী ভালো কাজ করেছে তা যেন না বলে বেড়াও। নিজের আমি-টাকে হাম-বড়া ভাবটাকে জলাঞ্জলি

দাও। সোজা কথা, ভালো কাজই ঈশ্বরের কাজ। এই ঈশ্বরের কাজেই নিযুক্ত থাকো, নিমগ্ন থাকো।

সবাই অমুভব করল, বক্তার উপস্থিতিটাই ঈশ্বরকর্মের উদ্দীপনা। পরের কথা ভাবা, পরের হিতের জগ্গে কাজ করাই ঈশ্বরকর্ম।

পরোপকারে কার উপকার ? নিজের উপকার। বলছেন বিবেকানন্দ। উচ্চ মস্তকের উপর দাঁড়িয়ে, দুটো পয়সা নে রে, বলে গরিবকে তা দিও না, বরং তার প্রতি কৃতজ্ঞ হও যে সে গরিব হওয়াতে তাকে সাহায্য করে তুমি নিজের উপকার করতে পারছ। যে গ্রহণ করে সে ধন্য হয় না, যে দাতা সেই ধন্য। তুমি যে তোমার দয়াশক্তি প্রয়োগ করে নিজেকে পবিত্র করতে পারছ, কৃতার্থ করতে পারছ, তাতে নিজেই তুমি কৃতজ্ঞ হও। যদি দুঃস্থ না থাকত তবে তোমার এই আশ্চর্য শক্তিটাকে দেখাতে কি করে ? কি করে নিজের মধ্যে পেতে তুমি তোমার অপরিমেয়তার স্বাদ ?

সুতরাং জগতের উপকার করব এই অজ্ঞানের কথা ছাড়ো। জগৎ তোমার বা আমার সাহায্যের জগ্গে বসে নেই। আমাদের কাজ করতে হবে, সর্বদাই পরোপকার, যেহেতু তা আমাদেরই সৌভাগ্যস্বরূপ। শুধু এই উপায়েই আমরা পূর্ণ হতে পারি। কোনো গরিবই আমাদের এক পয়সা ধারে না, আমরাই তাব সব ধারি, কারণ সে আমাদের দয়াশক্তি তার উপর ব্যবহার করতে দিচ্ছে। এই সুযোগই আমাদের সৌভাগ্য। অমুক অমুক লোককে উপকার করেছি, সাহায্য করেছি এই চিন্তাটাই ভুল। এ বৃথা চিন্তা, আর বৃথা চিন্তাতেই কষ্ট। মনে মনে ভাবি, একে যখন সাহায্য করেছি সে অন্তত একটা ধন্যবাদ দিক, কৃতজ্ঞতা জানাক, না দিলে না জানালেই অশান্তি। কেন প্রতিদান আশা করব ? যাকে তুমি সাহায্য করছ, বলছেন বিবেকানন্দ, তাকে তুমি ঈশ্বরবৃত্তি করো। যদি সে তোমার ঈশ্বর, তাকেই তুমি ধন্যবাদ দাও, তাকেই তুমি জানাও তোমার কৃতজ্ঞতা। তোমার সেই সাহায্যকারীই ঈশ্বরের উপাসনা।

পরের জগ্গেই তুমি, এ বাগী ভারতবর্ষের। আর, চাচা, আপন বাঁচা, এ ধনি পশ্চিমের।

(ক্রমশঃ)



হোদল

মেয়ে আমার খুঁৎখুঁতে
খুঁজে খুঁজে নাম পেলো না,
রাখল—হৌদলকুৎকুতে।
আমার কিন্তু অশ্রু মত
পাড়ায় যত বেড়াল আছে
কেই বা এমন খুবসুরং।
যায় না দেখা রং হেন
শুকনো চাঁপা ফুল দেখেছ
তেমনি গায়ের রং যেন।



হরেক রকম ভঙ্গীতে
বসবে শোবে খানা খাবে
পারি কি সব অন্ধিতে!
ডাকবে সুরে পাঁচ রকম
হরবোলাও হার যেনে যায়
হৌদল মিঞা নয় অখম।



একটিমাত্র দোষ দেখি
এমনতর হাঁদা বেড়াল
আর কোথাও মিলবে কি।



বোকার মতো মুখখানি
বিখ্যাস তাই হয় না আমার
বেড়াল করেন শয়তানী।
মেয়ের কিন্তু অশ্রু মত
সাক্ষী নেই, বলবে তবু
হৌদল খেলো পারাবত।
তখন আমি করি কী!
হৌদলাটাকে ছালায় পুরে
সাঁকোর পারে চালান দি'।

মেয়ের করে মন কেমন
আর কি হৌদল আলবে ফিরে
বাঁচবে সে আর কতক্ষণ।
হৌদল পরে এলো ফের
মনখানা তার গেছে ভেঙে
মুখখানা তার কী দুঃখের।
একেক সময় মালুম হয়

বিড়ালবেশী মানুষ ও যে
হৌদল আমার বেড়াল নয়।

শিশু সাহিত্য-পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত পুজার শ্রেষ্ঠ উপহার
বিংশ শতাব্দীর বৃহত্তম ও অভিনব বার্ষিকী

আহরণী

॥ বিচ্ছাদাগরের যুগ থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের,
বিশেষভাবে শিশুসাহিত্যের লেখক-লেখিকাদের অপূর্ব সমাবেশ ॥

॥ বিগত এক শ' বছর ধরে বাদে সাধনায় ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষা
ও সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়েছে, বাংলার শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের সামনে তাঁদের
সেই সাধনার পরিচয় তাঁদের লেখা সরস গল্প প্রবন্ধ ও ছড়ার মাধ্যমে এই
বার্ষিকীতে পরিবেশিত হয়েছে ॥

॥ লেখক-লেখিকাদের সাহিত্যিক জীবনে সংক্ষিপ্ত পরিচিতি সহ প্রতিটি লেখা
কালানুক্রমিক ভাবে সাজানো ॥

লক্ষপ্রতিষ্ঠ শিল্পীদের আঁকা বহু চিত্রে সুশোভিত
॥ সুন্দর ছাপা পাঁচ শতাধিক পৃষ্ঠার বিয়াট বই ॥

॥ দাম : মাত্র চার টাকা ॥

বিঃ দ্রঃ মনিঅর্ডারে পাঁচ টাকা পাঠালে ঘরে বসেই বই পাবেন :
॥ এক্সেকুগণকে আগে থেকে টাকা জমা দিয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বইয়ের
জম্ম অর্ডার দিতে হবে ॥

॥ এম সি সরকার এণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ। ১৪ বক্সি চাট্‌জো স্ট্রিট : কলিকাতা-১২ ॥
॥ ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি : ১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট : কলিকাতা-১২ ॥



সাহসী
কালু

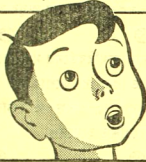
ও



গুলবাজ
ভুলু



কিরে ভুলু! আবার
বড়াই করছিস?



বড়াই? জানিসনা
আমি মাহুকে সাতার
কাটা শেখাতে পারি?



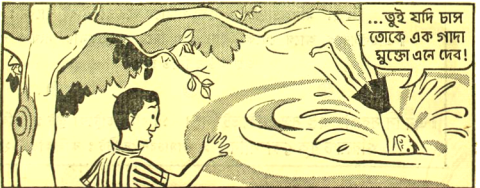
আমি একবার
ডাইভ দিয়ে
পাতাল পর্যন্ত
ঘুরে আসতে
পারি!



দ্যাখ...



...ভুই যদি চাপ
তোকে এক গাদা
মুজো এনে দেব!





আজেবাজে বকিস না।
ভুলু, তুই যে সব করবি
বলে বড়াই করিস
তা যদি সত্যিই
করতে চান
তাহলে বোজ
দুধ খা' আর
'ডালডা'য় রাঁধা
খাবার খা'!

বাড়ন্ত শরীরের জন্যে
দরকার 'ডালডা' বনস্পতি;
এটি একটা শক্তিদায়ী
স্নেহপদার্থ যাতে যোগ
করা হয় 'ভিটামিন এ'
এবং 'ডি', 'ডালডা'য়
রাঁধা খাবার দাবার
খেতেও
সুস্বাদু হয়,
তোমার মাকে
বল খাবার দাবার
'ডালডা'য় রাঁধতে।



• বারো মাস ঘরে রাখবার মতন বই •

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মাসি। আলোর ফুলকি। এই ছুখানি গল্পের বই কিশোর ও বয়স্ক উভয় শ্রেণীর পাঠকেরই সমাদরের বস্তু। মূল্য প্রতিটি ২'৫০ টাকা।

শ্রীরাজশেখর বসু

হিতোপদেশের গল্প। “গল্পগুলি একটি নূতন স্বাদ লাভ করিয়াছে।”—যুগান্তর
“প্রত্যেক ছেলেমেয়ের এই বই পড়া উচিত।”—মোচাক

গল্পগুলি আমাদের দেশের প্রাচীন গল্প। ইহা আমাদের সকলেরই জানা এবং গল্পগুলিও পরিচিত। শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসুর হাতে গল্পগুলি একটি নূতন স্বাদ লাভ করিয়াছে। অনেক ছবি আছে বইতে এবং বাঁধাই ও ছাপা উৎকৃষ্ট—ছোটদের হাতে দিবার পক্ষে নির্ভরযোগ্য বই।”—যুগান্তর

মূল্য ১'০০ টাকা, বোর্ড ১'৮০ টাকা।

জ্ঞানদানন্দিনী দেবী

টাকডুমাডুম ডুম। নাটক। “বালক-বালিকাদের পক্ষে ইহার অভিনয় ও রসগ্রহণ দুইই সহজ।”—আনন্দবাজার পত্রিকা

“নাটকটি অভিনয় করিয়া ছেলেরা আনন্দ লাভ করিবে।”—প্রবাসী

“এ ধরনের পুস্তক বাংলা সাহিত্যে বেশি নাই বলিলে অশ্রায় হইবে না।”—
পরিচয়। মূল্য ১'৫০ টাকা।

শ্রীনিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী

ছেলেভুলোনো ছড়া। উনষাটটি ছড়ার সংকলন। মূল্য ১'০০ টাকা।

বাণীকান্ত

কুড়ুনী। ছোট ছেলেমেয়েদের অভিনয়োপযোগী নৃত্যনাট্য। মূল্য ০'৫০ টাকা।

আমাদের লেখা। শান্তিনিকেতন-বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের লেখা গল্প প্রবন্ধ কবিতা ছবির বার্ষিক সংকলন। ১৩৫৫ থেকে ১৩৬৩ সালের সংখ্যা আছে। প্রতি সংখ্যা ১'০০ টাকা।

বিশ্বভারতী

৬৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭

• পুজোর ছুটিতে পড়বার ও উপহার দেবার মতন বই •

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নাটক

হাস্যকৌতুক ॥ ছেলেদের অভিনয় করবার মত নাট্যকার সমষ্টি। মূল্য ১'৩০ টাকা
মুকুট ॥ ছেলেদের অভিনয়যোগ্য নাটক। মূল্য ০'৮০ টাকা

গল্প ও উপন্যাস

রাজর্ষি ॥ কিশোর-কিশোরীদের উপযোগী উপন্যাস। মূল্য ২'০০ টাকা
কুরুপাণ্ডব ॥ কিশোর-কিশোরীদের উপযোগী মহাভারতের কাহিনী। মূল্য ২'২০
গল্পসল্প ॥ বিচিত্র গল্প ও কবিতার সংগ্রহ। মূল্য ১'৫০ বোর্ড ২'৫০ টাকা

সে ॥ “নাৎনীর ফরমাশে কিছুদিন থেকে লেগেছি মানুষ গড়ার কাজে ; নিছক
খেলার মানুষ, সত্যমিথ্যার কোনো জবাবদিহি নেই। এই যে আমাদের এক
যে আছে মানুষ, এর একটা নাম নিশ্চয়ই আছে। সে কেবল আমরা ছু জনেই
জানি, আর কাউকে বলা বারণ। এইখানটাতেই গল্পের মজা। একে আমরা
শুধু বলি 'সে'।”

এই মানুষের, 'সে'-র, নানা গল্পের বই। রবীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত বহু চিত্রে
শোভিত। মূল্য ৩'৫০ টাকা।

কবিতা

চিত্রবিচিত্র ॥ ছোটো ছেলেমেয়েদের আনন্দদায়ক সরল কবিতাবলী। অনেকগুলি
কবিতা এই গ্রন্থে প্রথম সংকলিত হল। মূল্য ১'৮০, বহু চিত্রে শোভিত সংস্করণ
৩'০০ টাকা।

কথা ও কাহিনী ॥ বৌদ্ধযুগের জাগরণের ও রাজপুত-শিখ-মারাঠা জাতির বীরত্ব-
কাহিনী। মূল্য ১'৫০ টাকা।

শিশু ॥ শিশু ভোলানাথ ॥ এই দুইখানি কাব্যের রস শিশুদেরও হৃদয়গ্রাহী।
মূল্য যথাক্রমে ১'৭৫ ও ১'০০ টাকা।

নৃত্যকথা

ছেলেবেলা ॥ বিশেষ করে প্রথমশিক্ষার্থীদের কথা মনে রেখে আশ্চর্য ভাষায় অপূর্ণ
চিত্র রচনা ক'রে ক'রে রবীন্দ্রনাথ আশ্চর্যকথা বলেছেন এই বইখানিতে
মূল্য ১'০০ টাকা।

বিশ্বভারতী

খবর কি!

আথর গুলি হুতাহালো,
যলেনা ফেউ দেখলেন ডালো,
মবাই শুধু ধর্মকলাগায়,
কব্ব আমি কি?
দোখাত কলম দিবেহু তুলে
ডাবতে বমোছি।



খোফন মানি, খোফন মানি,
ডাবত বমে কি?

ইক্ষুনেতে হাতের লেখা
শ্রুতি দেহোছি।

ডাবলা রাখে খোফন মানি
ডালো কানিহু খবর জানি,
কানির মেরা 'মুলেখা'তে
নেখাটি হয় কালো,
মেই কানিতে হাতের লেখা
লাগবে মবার ডালো॥



মুলেখা ওয়ার্কস লিমিটেড, মুলেখা পার্ক
কলিকাতা-৩২ ইংরেজি প্রচারিত।

১৮৯৩

সাল থেকে

আপনাদের চিকিৎসা নিয়োজিত



অমৃতাজন ব্রজ:

ডাক্তার অর্পেচন্দ্র জেনারাল চিকিৎসা
অমৃতাজন, ঘাত, সর্দি, কাস, কষ্ট
প্রকৃতি রোগে আশু ফলপ্রস

দাদের মলম ব্রজ:

অর্পেচন্দ্র জেনারাল চিকিৎসা ডাক্তার
দাদ, কষ্ট, প্রকৃতি রোগে আশু ফলপ্রস



প্রস্তুতকারক —

অমৃতাজন লিঃ (পাঃ) বক্স নং ৬৮২৫, কলিকাতা-৭

বোম্বাই চন্দ্রজ্ঞে কলিকাতা

শ্রীমুখরচন্দ্র সরকার-কৃত

পৌরাণিক অভিধান

মানব সভ্যতার সব চেয়ে বড়ো হুকুমি হ'ল বই। হাজার হাজার বছরের সংস্কৃতি ও জীবনধারণ বহু বিচিত্র স্বাক্ষর অধিকার সূত্রে বিধৃত হ'য়ে থাকে শুধু বইয়ের পৃষ্ঠাতেই। সমগ্র-প্রকাশিত 'পৌরাণিক অভিধান' এমনি অসংখ্য বইয়ের সার-সমুদ্র বিরাট সংগ্রহ-গ্রন্থ। কেবলমাত্র অষ্টাদশ পূরণ ও উপপূরণ নয়,—সমগ্র বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, সাংহিতা সম্পর্কিত অসংখ্য চরিত্র ও আচরণ কাহিনী এই গ্রন্থে মনোজ্ঞ ভাষায় আলোচিত হয়েছে। সাধারণ অভিধানের সমগ্রোত্ত নয় বলেই 'পৌরাণিক অভিধান'-এর সমস্ত কাহিনীগুলি প'ড়ে সাধারণ পাঠক-পাঠিকা পরিতৃপ্ত হবেন এবং ছাত্র, শিক্ষক ও সাহিত্যকর্মীরাও উপকৃত হবেন অল্পমাত্রায়। যেকোনো বৈশিষ্ট্যের হুম্বর ও হুমোডন চিত্রগুলিও এই অভিধানের অন্ততম আকর্ষণ।

মূল্য : পাঁচ টাকা

এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স, প্রাইভেট লিমিটেড

যখন তখন চুল ভেজাবেন না কিন্তু

আমাদের দেশের পুরুষরা বাড়ীর বাইরে যেতে হলেই চট করে মাথায় একটু জল দিয়ে চুল ঝাড়ে নেন। যখন তখন চুলে জল দিলে চুল বেশীর ভাগ সময়েই ভিজ থাকে— তার ফলে চুলের সৌন্দর্য আর সাবলীলতা নষ্ট হতে শুরু করে। ভিজ চুল মাথার পক্ষেও যারামত রকম অতিকর।

প্রতিদিন জবাকুহুম তেল চুলের গোড়াগুলিতে ভাল করে মালিশ করলে জল না দিলেও চুল ঝাড়াতে অসুবিধা হয় না। জবাকুহুমের হালকা গন্ধ শুধু আপনার মনে সর্বদা একটা সুবন্ধর অহুত্বই জাগিয়ে রাখবে না সেই সঙ্গে সসোরের নানা স্বাদেবার মধ্যেও আপনার মনের প্রসন্নতা অক্ষুণ্ণ থাকবে।

জবাকুহুম



সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
জবাকুহুম হাউস, ৩৪, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-১২
১১১, অর্ডেনিয়ান স্ট্রীট, মাদ্রাজ-১

৭৯

সাইকেল

সবার দেরা



ইন্ডিয়া
সাইকেল

সাইকেল (যেমন ইন্ডিয়া
সাইকেল) যে সময় সেটা
একটা ভাল দ্রব্য।
নিখুঁত বিধানমূল্যে
আর ভালভাবে 'সাইকেল'
অন্য কোনো দ্রব্যের ন্যায়।

আমাদের দস্তার যতলা
দেখতে পারেন।

ইন্ডিয়া সাইকেল ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিঃ কলিকাতা-১

১৯৫৩

শ্রোক-শ্রোক্তি পানা

* অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর *



। বন্দনা মূল সাধনের ।

প্রথমে বন্দিলাম আমি বাহ্যিক কথিষ্য ।

দ্বিতীয়ে বন্দিলাম আমি অঘোষ্য মগর ।

তৃতীয়ে বন্দিলাম পঞ্চ-বটির বন ।

কিচ্চ কিস্বাঘ বন্দিলাম সপ্ততাল ও মধুবন ।

সত্বব্ধে বন্দিলাম দক্ষিণ দ্বাপর ।

স্বর্গলকায় বন্দিলাম অশোক তরুণর ।

সপ্তমেতে বন্দিলাম রাম রাজার লতা ।

বন্দিলাম রামায়ণ—রামনাম কবা ।

। নাম কীর্তন ।

রামং রঘুংরং দীতাপতি হনুরং

কাকুত্স্থং করুণাময়ং গুণনিধি ধামিকং

বালেশ্বরং সত্যশঙ্কং দশরথ ভূময়ং

জামলং শান্ত মুক্তিং

। লোকান্তিরামং রঘুহুল তিলকং

রাঘবং রাবণারিং ।

। মমস্তার ।

রামায় রামচন্দ্রায় রামভক্তায় বেৎসে

রঘুনাথায় নাথায় দীতায়। পতয়ে মমঃ ।



। মূল পাঠ্যেন ৷

রাম মন্ত্র অগ্রে বাটি হাজার বৎসর,
অনাগত রামায়ণ রচেন রত্নাকর ।
নারদের উপদেশে ব্রহ্মীক ভণেশ্বর
প্রকাশ করিল সপ্ত কাণ্ড রামায়ণ
বান্দ্রীকি বান্দিয়া কৃত্তিবাস বিশঙ্কণ
সবল ভাষায় গাঁত কাণ্ড রামায়ণ কন ।
দেবনাগবী রামায়ণ রচেন তুলসীদাস
রঘুন্দ্রনাম রাম-রসায়ন করেন প্রকাশ ।

রামলীলা কথাবলি চন্দের বিলাসে
অবনৈশ্র ঘনি বলি গীত অভিলাষে ৷

। মূল পাঠ্যেন ৷

মরা মন্ত্র জপিয়া বান্দ্রীকি হৈল মুনি
মন দিয়া তন পরে অপূর্ব কাহিনী ।
অলমতিবিস্ময়েণ বিলম্ব কি কার্য
গাহ রত্নলীলাবলি বিশেষ বিচার্য ৷

। বিশা গীত ৷

আরে আকুর্বা ধুনীর মাঝে,
তমসা নদীর চরটি আছে ।
সেখানে বনের গাছে—
ক্রোক-ক্রোকী ভাকতে আছে,
গঙ্গা ঘনুনার প্রাণ-পাখি ঘন
—মিলে আছে কাছে কাছে ।

। মূল পাঠ্যেন ৷

অকর্ণমন্দির তীর্থ ভরষাজ নিশাময়
রমণীয় প্রসন্নাত্ম স্নানস্থল বনোৎপল ।



কার্তিক, ১৩৬৫]

কৌক-কৌকির পালা

(বান্দীকি ও ভরঝাজের ধীরে ধীরে প্রবেশ)

। গীত ডুড়ি-ডুড়ি ।

অকর্ণম নদী নীর,

নির্জন নদী তীর,

নির্দেব নীলাকাশ,

নিরবকাশ বাতাস বয় হেমন্তে শিশির ।

পাৰি হিমালয়-পৰণ-হানি

হেলায় ডানো

আলোছায়া-টানা দেখা যায় বানু তীর ।

। বান্দীকি ।

সাধুব চিত্তের মত নির্মল প্রমত্তমলিলা এই তবস! তীরে আমি অবগাহন ইচ্ছা করিতেছি ।
বৎস ভরঝাজ, কলম গ্রহণ কর, আমাকে বড়ল দাও ।

(উভয়ের প্রস্থান)

। মূল গায়ন ।

সত্ত্বতীরঃ সমাসান্ত তমসায় মূনিতপা

বিচচারই পত্নঃস্তং সখন্তো বিপুলং বনম্ ।

তদন্ত্যাসে তু মিপ্নং চরন্ত মন পার্শ্বিনম্

দদর্শ তগবাংস্তত্র কৌকয়ো চাকুনিখনম্ ।

। গীত ডুড়ি-ডুড়ি ।

অনন্তর মূনিবর গঙ্গার অধরে

চলিলেন কুতূহলে তমসার তীরে তীরে ।

ভরঝাজ শিষ্ট দিলেন কথল আনিয়া

ত্রমিতে লাগিল বনে বেধিয়া বেধিয়া

ঘুরে ঘিরে ।

বন পারে সাড়া শুনি কৌক পাখির,

এ উহারে ডাকি ডাকি

—জাগায় থাকি থাকি বনানীরে ।



(কিল্লর কিল্লরীর প্রবেশ)

। কিল্লর-গীত ।

প্রকৃত শালি প্রদবৈশ্বিত্তানি

মৃগাশ্রমাবুধ বিকৃষিতানি

মনোহর ক্রৌঞ্চ নিনাদিতানি

নীমাঙ্করাগুংহকরন্তি চেতর । ধূম ।

। কিল্লরী-গীত ।

উত্তল পাখি ভেকে বাহ,

রহি রহি অবেলায়,

বনছায়ায়

শীতের নলী তীর—বনহরিণীর

মনকে লোভায় হরিত শোভায়

মোলায় সে মনকে মোলায় ।

যরা নদীর জলপারে

অখীর পাখি,

বলে বাড়ে বাড়ে,

আকাশ পারে মনোহর হর পৌছায় থাকি থাকি ।

। কিল্লর ।

শালিধায়ে হরিৎ ববদী

হরিণ হরিণীর মনহরিণী,

ক্রৌঞ্চ নিনাদে মূবর ঐ বনশানি

—অস্তরকে লইছে টানি ।

শীতের বেলায় চল কাল কাটাই ছুটি প্রাণী ।

। মূল গায়ন ।

প্রকৃত শালিঃ শুভৈর্মনোহরং

কচিং ক্রৌঞ্চ নিনাদ রাবিতম

১৩৬৫, কার্তিক]

ক্রৌঞ্চ-ক্রৌঞ্চির পালা

প্রকাশ কাম প্রযোজন গ্রন্থম্

বরোক কালম্ শিশিরাহম্ ।

(কিয়র কিয়রীর প্রস্থান)



(নিষাদ জুড়ির প্রবেশ ও গীত)

আরে ক্রৌঞ্চ পাখি দিচ্ছে সে সাড়া—

এই বনে না এই বনে !

পাখির দিশা নাই,

সাড়াই পাই

—নিশানা ধরি কোন্ কোণে ।

দুই পহরে শুনি ফুরে দুই জনে,

—কুহ বনে না মহ বনে ।

তপোবনে বেঁধেছে বাসা

ঈত-হাওয়ার গীত-গাওঁ পাখি তারা ।

(উভয়ের নিশানা ধরিয়া প্রস্থান)

। মূল গায়ন ।

ক্রৌঞ্চ-ক্রৌঞ্চি দুই জনে আছিল বৃক্ষতলে

নিষাদ গিরা একটরে তার বিচ্ছিন্নক নলে ।

তাহ্রচূড় সহচর ক্রৌঞ্চ পতি সহ

মিলন বেলায় ক্রৌঞ্চির হায় ঘটিল বিরহ ।

পাপমতি নিষাদপতি অতি দুষ্টাচারি

নিরপরাধ ক্রৌঞ্চে বৃথা ফেলিলেক মারি ।

ভং শোণিত পরিভ্রাং চেষ্টমানঃ মহীভলে

ভাৰ্ঘ্যাত্ম নিহন্তঃ দৃষ্টা কংগাব ককণাঃগিঃম্ ।

কার্তিক, ১৯৬৫]

ক্রৌঞ্চ-ক্রৌঞ্চির পালা

—রক্তচন্দা দ্বিত মন্ত্যার

যেথপুত্র-তপা ক্রৌঞ্চ পাখি।

। বন কিয়র কিয়রীর নৃত্যগীত ।

তমসার জলপায় নিঃশ্বাস নিশ্বাস

বহে আনে হাঁহাকার বারবার

যলে ক্রৌঞ্চি “কোথা ক্রৌঞ্চ, কোথা ক্রৌঞ্চ !”

কোন হৃদর দূর বন-পার ।

(অন্তর্ধান)

। মূল গায়ের ।

শোক হইতে শোক হইল উপদান

মা নিষাদ বলিয়া তাহার উপাখ্যান ।

চারিপদ ছন্দ মুনি লিখিলেন পাতে

আপনি লিখিয়া মুনি না পারে বুঝিতে ।

সেই শ্লোক শুধাইল মুনি মারগেরে

নারদ কহিয়া অর্থ বুঝাইল তারে ।

এই শ্লোক ছন্দে মুনি রচেন রামায়ণ

ক্রৌঞ্চ বধ পালা গান গাওয়া এ কারণ ।

। তুড়ি, ছুড়ি, নট, নটীর নৃত্যগীত ।

আরে পাখি কীদলো

বনের পাখি,

সজল করণ অকণ আঁখি

করণ হুরে অকণ আলো

কবির যে কথা প্রথম জানালো—

সেই কথা অ'জ বাজিছে সীত্বে

ধাকি ধাকি মনেরি তাবে ।

(প্রস্থান)





আমান্যুল

নরেন্দ্র দেব

থুকু ডোক বলে গোয়ালী
এসেছে,

দুধ নেবে এস মামি ।

মা বলেন, তুই যা না ঘটি নিয়ে,
বাস্তব হয়েছি আমি ।

থুকু বলে, মামি, সে গরু তো নয় ।
সে ছিল কেমন সাদা ;
তাকে রেখে হলে এনেছে একটা
পাহাড়ী ধোপার গাধা !

মা এলেন ছুটে, বলেন গরুর
শিং ছুটি নেই কেন ?
পায়ের খুর তো চেরা দেখছিনে,
ল্যাঙ্কটা চামর যেন ।

লোকটা জানায়, গাই আপনার
অনেক মিলবে মা'জী
যাদের কখনো শিং ওঠেনাকো,
চান তো দেখাবো আজই ।

আবার এমন গরুও মিলবে
বড়-সড় যারা বেশ,
কিন্তু, তাদের মাথায় তখনো
ওঠেনি শিঙের লেশ ।

যদি মা আপনি ভাল দুধ চান
কালো গরু দেব দেশী
খুব ঘন দুধ ক্ষীরের মতন
ওছোনেও হবে বেশি ।

মা বলেন, শোনো
গয়লার পো,
আনো সেই গরুটাকে,
পাহাড়ে আসার দিন
থেকে ঝোকা
তারই দুধ খেয়ে থাকে !
লোকটি তখন বললে,
শোনো মা,
আমি তো গোয়ালী



অনেক গরুর শিং

জানো কি মা

আমরাই দিই কেটে ;

নইলে সেগুলো

গুঁতোয় যা' তেড়ে

যেন বুনো বোহেটে

নই,
বাবু চড়বেন,—'টাট্টু' এনেছি—
ডাকুন না, তিনি কই ?

হেসে গড়াগড়ি থুকুটা তখন,
মা বড় অপ্রতিভ,
তাড়াতাড়ি যান বাড়ীর ভিতর
লজ্জায় কেটে জ্বিত ।



বোকার চেয়ে বোকা

(চেক তপকথা অবলম্বনে)

— শ্রীমতী মিলাডা গঙ্গোপাধ্যায়



এক চাবার থাকবার মধ্যে ছিল একটি মূরগী।
বৌ-এর হাতে সেটিকে দিয়ে চাষা বললে—বা, এটাকে
হাটে বেচে আয়।

চাবার বৌ বললে
—কত দামে বেচেবো গো?

চাষা বললে—কত
দাম আর হবে, বা বাজার-
দর তাইতে বেচে আয়।

চাবার বৌ মূরগী
নিরে তো হাটে গেল,
পথে যেতে যেতে এক-
অনের দকে দেখা।

—ও বশার, মূরগী
কিনতে চান?

—কত দাম?

—বা জা র হবে
দেবো।

—বাজার দর তো
এক পয়সা।

—আচ্ছা, তাই দাও।

এক পরলায় মূরগীটা বেচে চাবার বৌ বাজারে গেল। সেখানে একটি থলি আর একগাছি
হাড়ি আখ পরলায় কিনে, থাকি আখলাটি থলিতে রেখে চাষাকে এনে দিতে চাষা তো অবাক বৌটার
বুদ্ধি দেখে।



‘চেয়ে চেয়ে রানী তাকে দেখছেন’

অমন সুবগীটা কিনা বেচে এলো এক পরদার! বৌকে ধমকা-ধমকি ঝানিক করলে, তারপর বেরিয়ে গেল চাষা বকতে বকতে—মেথি তোর চেয়ে বোকা! হাছব খুঁজে পাই তো! ভালো, না হলে আন্ন তোরাই একদিন কি আমারই একদিন—থাক্ এই ঘরে বসে।

চলতে চলতে চাষা এক শহরে পৌছল। সেখানে এসে রাজার বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে, জানলা দিয়ে রানী চেয়ে চেয়ে তাকে দেখছেন। তখন চাষা করলে কি, আকাশে হাত তুলে মাথা উচু করে লাফাতে লাগল।

রানী চাষার কাণ্ড দেখে লানীকে বললেন—হা তো!, দেখ্ তো লোকটা কি করছে।

—কি আবার করছি? স্বর্গে কিরে যেতে চাচ্ছি। সেখানে আমার বন্ধুর সঙ্গে মারামারি করতে করতে সে আমাকে এখানে নীচে ঠেলে ফেলে দিয়েছে। আকাশ ছুঁড়ে পড়েছি, এখন আকাশের সেই ফাটলটা খুঁজে পাচ্ছি না।

দাসী রানীর কাছে গিয়ে সমস্ত বললে।

রানী তখন চাষাকে ডেকে পাঠালেন।

—তুমি কি স্বর্গে গিয়েছিলে?

—গিয়েছিলাম বইকি। আবার কিরে যাচ্ছি।

—আমার ছেলেকে চেন সেখানে?

—িনি নিশ্চয়। সেখানে উত্তরের কাছে সারাদিন পড়ে পড়ে কাঁদে।

—আহা রে বাছা! আমার, উত্তরের পাশে পড়ে কাঁদছে—মরে যাই! তুমি বাপু মদ্য করে এই ক'টা বোহর আর ক'খানা কাপড় আমার ছেলের সন্তে নিয়ে যাও। আর তাকে বোলো, কাঁদে না ঘেন। আমি ঈগ'গিরই তার কাছে যাব।

—এই কথা? নিশ্চয়ই সব খবর দেব তাকে। আর এইসব জিনিষপত্র নিয়ে যাব। রানী তাকে টাকা বোহর এবং রেশমের মধ্যমলের স্ত্রীর কাপড়চোপড় দিতে, চাষা স্বর্গে চললো বলে মরে পড়ল।

শহর পার হয়ে চাষা টাকা আর কাপড় একটা থলির মধ্যে ভরে মাঠে একটু বসল। এরিকে চাষা চলে যেতেই রাজা বাড়ি কিরে এলেন। রানী ছেলের কথা রাজাকে খুলে বললেন। আর বললেন—জিনিষপত্র সমস্ত গুছিয়ে ছেলের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি একটা লোকের হাতে।

—করেছ কি? আচ্ছা বোকা তো! আকাশ থেকে হাছব মাটিতে পড়ে, এ কি কেউ কখনো শুনেছে নাকি? আর যদিও বা পড়ে, কের কি কেউ আকাশে পৌছতে পারে? লোকটা খুব চালাক দেখছি তোমাকে বেশ ঠকিয়েছে।

রাজা তখনি বোড়ার চড়ে সেই চাষায় সন্ধানে ছুটলেন।

চাষা তখনও সেই মাঠে বসে আছে। রাজা আসছেন দেখে ঘোঁহর ক'টা আর কাপড় ক'খান থলি থেকে বার করে অল্প জায়গায় লুকিয়ে ফেলে থলির মধ্যে হুড়ি ভরে বসে রইল।

রাজা এসে শুধোলেন—হ্যাঁ, মশায়? আপনি একজন লোককে থলি নিয়ে এখান দিয়ে যেতে দেখেছেন?

—হ্যাঁ, দেখেছি বই কি! ঐ ভো ঐ বনের নিকে এইমাত্র দৌড় দিলে। দেখে মনে হল লোকটা খুব চালাক। বাপারটা কি মশায়?

রাজা তখন সমস্ত কথা তাকে খুলে বললেন।

—বুঝ তাহলে কি বমমাইশ! এমন রানীকে এমন ভাবে ঠকিয়ে দিলে! কিন্তু আপনি তো দেখছি হাশিয়ে পড়েছেন। দেখুন, আমিই চোর ধরতে ছুটে যেতুম, কিন্তু আমার থলিটা নিয়েই হয়েছে মশকিল। আমার এই থলিতে একটি নানী পাখী আছে। শহরে নিয়ে যাচ্ছি পাখীটাকে একজন বড়োলোকের কাছে বেচতে। কেউ যদি থলিটাকে আগলে বসে থাকতে পারত, নিশ্চয় হতুম। পাখীটা আবার উড়ে না যায়!

রাজা বললেন—আচ্ছা, আমিই বরং এখানে একটুখানি থাকছি, তুমি যখন নিজের চোখে চোরকে দেখেছ তোরার পকেটই ওকে ধরা সহজ হবে।

এই কথা বলে রাজা নিজে বোড়া থেকে বসে চাষাকে বোড়ায় তুলে গেলেন।

—কিন্তু দেখবেন মহারাজ, দয়া করে থলিটা খুলবেন না। তা হলে পাখী উড়ে পালাবে আর আমার ভাণ্ডী লোকমান হবে

রাজা থলি আগলে রইলেন আর চাষা বোড়ার চড়ে জিনিসপত্তর নিয়ে নিজের বাড়িতে নে চম্পট।

রাজা বসে বসে অপেক্ষাই করছেন, চাষার আর কেয়ার নাম নেই। ক্রমশঃ বড় বারাপ লাগতে লাগল তাঁর। রাজা ভাবলেন—থলিহীন পাখীটা নিয়ে বাড়ি যাই; চাষা না হয় পরেই আমার বাড়িতে চোর ধরে নিয়ে যাবে।

থলিটি আস্তে আস্তে তুলে তাঁর ভেতর হাত দিয়ে রাজা দেখেন—যত সব হুড়ি,কাঁকর আর টেলা! বোকা বনে গেলেন রাজা।

এদিকে চাষা গ্রামের ডেউর পৌছেই চোঁচাতে লাগল—ভয় নেই রে বৌ, ভয় নেই! ঘোর ধোল। তোর চেয়ে বোকা লোক খুঁজে পেরেছি। তোর অদৃষ্টে মার নেই, বেঁচে গেলি এ যামা!



আগে আমি ছুটু ছিলাম ভীষণ—
বটের ছায়ায় আমার বনে কত-যে বনবন্
ঘুরে ঘুরেই কাটিয়ে দিতাম দিনের সারাক্ষণ।
সঙ্গে কাঁকে নিতাম জ্ঞান? আমাদের ছোটবোন।

ধমক খেয়ে খেয়ে তবু হুঁশ হত না। এখন
ছুটু আমি শাস্ত দেখ কেমন।

এখন তাকাই ঘড়ির দিকে, ভাবি কত কথাই—
ভাবি, ওদের ঘটে বৃষ্টি নাই বৃষ্টির বালাই।
অমন ঘুরে ঘুরে কেবল নষ্ট করে সময়;
একটুখানি স্থির হলে কী হয়।

আমি ঘড়ির কাঁটা হতাম যদি
পাক খেয়ে পাক খেয়ে অমন দিনরাত্তির ঘোরা
বন্ধ করে দিতাম—
অমন ঘোরা, ও যে কেবল সময় নষ্ট করা
সবাইকে বলতাম।

আমার মতই যেন ছোটবোনকে নিয়ে সাথে
সকালবেলা বিকেলবেলা সন্ধ্যাবেলা রাতে
যখন তাকাও তখন দেখ ঘুরছে ছু-জ্ঞান ওরা।
এই কাজটাই যেন ওদের নিয়ম বাঁধাধরা।

ধমক দেবার মতন ওদের কেউ বৃষ্টি লোক নেই?
ধমক খেতে হল কেবল ছুটু আমাকেই।

ওদের মতই ছুটু ছিলাম আগে
সেসব কথা ভাবতে এখন কেমন যেন লাগে ॥

ঘরের ভিতর বাগান

ডাঃ পদ্মপতি ভট্টাচার্য



আগ্লাওনিয়া (aglaonema)

জগতে অনেক রকমের খেলা আছে—মেহের খেলা, মনের খেলা, বুদ্ধির খেলা ইত্যাদি। যার যেমন পছন্দ। কিন্তু একরকমের খেলা আছে, যা অনেকের কাছেই খুব আনন্দজনক—গাছ লাগিয়ে বাগান তৈরি করা। এ খেলাতে আগ্রহ ক্রমশঃ বাড়তেই থাকে, কখনো ক্রান্তি আসে না। বাড়ির পাশে যার একটু-আধটু জমি আছে, সেখানে নানা-রকম বাহারের গাছ লাগিয়ে দাখালে,—আর অবদর সময়ে প্রত্যাহ্বই তাতে ফল বেগুয়া, সার বেগুয়া, মাটি উল্কে দেওয়া প্রভৃতি পরিচর্যা নিয়ে লেগে থাকলে, এ খেলা কোনোদিনই ফুরোবে না।

কিন্তু যার ভাগ্যে সেটুকু জমিও ছুটল না, সে কেমন করে এই খেলা খেলবে? জমি না থাক, বাড়িতে বারান্দা তো আছে, বাড়ির উপরকার ছাদটা তো আছে। সেখানেই টবের পাশে টব লাগিয়ে সেই টবের জমিতেই বাগানের শখ অনেকের মেটে। কয়েকটা টব রাখবার যদি জায়গা থাকে, এ খেলাতে রীতিমত আনন্দের পাবার পক্ষে তাই-ই যথেষ্ট। সেই টবের গাছগুলিই প্রত্যাহ্ব কিছুকালের খেলার সাথী হলে।

কিন্তু তেমন ভাগ্যও যার নেই? অথচ যেন রয়েছে গাছ লাগাবার প্রচুর শখ? সে শখও তার মিটেতে পারে, এমন কি চারিদিকে দেয়াল ঘেরা ঘরের মধ্যে থেকেই মিটেতে পারে। তারও উপায় আছে। ঘরের মধ্যেও বেশ সুন্দর সুন্দর গাছ লাগানো যায়, তাকে বাঁচিয়ে রেখে বড়ো করে তোলা যায়, পাঁচজনকে তাই দেখিয়ে আশ্চর্য করে দেওয়া যায়। বাইরে বাগান করা তো আনন্দজনক বটেই, কিন্তু ঘরের ভিতর বাগান করা আরো বেশী মজার। টেবিলের উপর, তারের উপর, ব্র্যাকিটের উপর, টিপরেব উপর, আলমারির মাথার উপর, এমন কি দেয়ালে কোলানো শাওয়ার মধ্যে জীবন্ত গাছপালা রয়েছে, প্রত্যেকটির আলাদা আলাদা রকমের সৌন্দর্য নিয়ে, এ দৃষ্টের কোনো তুলনা হয় না। এমন করে ঘর সাধানো এক উত্তম ধরনের চাকশিল্প। এ শিল্পে জাপানীরা খুব দক্ষ। তারা এই নিয়ে রীতিমত চর্চা করে, শিক্ষা করে, মাথা ঘামায়। আমরা এ শিল্পের গুঢ়রহস্য আগে



মনিরঙ (moneyblend)

ততটা জানতাম না, কিন্তু গুহের দেখাদেখি এ খেল। অনেকের মাথায় চুকেছে, তাই এখন অনেকেই এ নিয়ে চর্চা করছে। আমাদের দেশে আর পাচাতান্ত্র্যদেশেও।

কিন্তু ঘরের অঙ্ককারের মধ্যে বন্দী হয়ে একটুও আলো না পেলে গাছ বাঁবে এবং গজাবে কেমন করে? আমরা তো সাধারণতঃ এই কথাই জানি যে, গাছপালারের রীতিমত আলোবাতাস পাওয়া চাই, আকাশ থেকে মুক্ত রোদ ছাড়া তারা বাঁচতেই পারে না। কিন্তু একটু ভেবে দেখলেই আমরা বুঝি যে এ-কথা সকল উদ্ভিদের বেলাতে খাটে না।

বড় বড়ো অরণ্যের মধ্যে উঁচু উঁচু জাতের বৃক্ষেরা এমন ঘেঁষাঘেঁষি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে যে তার মীচে দিনের বেলাতেও অঙ্ককার। অথচ সেই অঙ্ককারের মধ্যেও অন্তান্ত নান্ন বৃক্ষের লতা গুল্ম ও গাছপালা জন্মায়, তারা জীবনে কখনো আলোর মুখ দেখে না, তারা সেই অঙ্ককারেই ক্ষুতি পায়! অঙ্ককারেই তারা বাঁচে। যদি তাদের গায়ে কখনো রোদ লাগে, তাহলেই বরং তারা বাঁচে না। এই ধরনের গাছপালা নিখোঁই লোকে শব্দ করে বাগানের গ্রীন-হাউসের মধ্যে রাখে, যেখানে কখনো আলোই ঢোকে না। সেই সব জাতের গাছপালাই ঘরের মধ্যে রাখবার পক্ষে উপযুক্ত।

কয়েক বকম গাছের দৃষ্টান্ত এখানে দেওয়া থাক।

প্রথমেই বলি একরকম লতাগাছের কথা, আজকাল বার খুব চল হয়েছে, অনেকেই যৈঠক-খানায় বা ড্রাইংরুমে টেবিলের উপর এই গাছ সাজিয়ে রাখছে। উদ্ভিদশাস্ত্রে এর নাম পোথস (pothos), কিন্তু চলতি ভাষাতে একে বলা হয় মনিরঙ (moneyblend)। এর এক আশ্চর্য বিশেষত্ব এই যে, মাটির মধ্যে গোড়ান্না পুঁতে নিলেও চলে, কিংবা আদৌ মাটির সঙ্গে কোনো সংস্রব না রেখে শুধু একটা জলের পাত্রে রাখলেও চলে, সেই জলের মধ্যেই এদের শিকড় গজায়। অনেকে তাই শৌখিন কাচপাত্রের মধ্যে জল ভরে তার মধ্যেই এর গোড়া ডুবিয়ে রাখেন, আর লতাটি কাচপাত্রকে বেড়িয়ে দিয়ে বিভারলাভ করতে থাকে। একটু চওড়া পাত্রের মধ্যেই একে রাখা ভালো, যাতে আলো না পেলেও ভালোবাসার বাতাস পায়। খুব সস্তাতেই তা হতে পারে। কুমোবরের কাছে ঠিক চায়ের শিরিচের মতো দেখতে, অথচ বেশ চওড়া ধরনের একরকম সর। কিনতে পাওয়া যায়, থাকে একটু রং করে টেবিলের উপর বসিয়ে রাখলে বেশ বাহারি দেখায়, মনে হয় চীনেমাটির তৈরি। গুতেই জল ভরে লতাটি তাতে রাখলে, গুর কিনারা ধরে লতাটি



জেরিয়া (zebraia)

বেড়ে যেতে থাকে। কেবল মাঝে মাঝে জলটা বদলে দেওয়া দরকার হয়। ওর মধ্যে পাথরের হুড়ি দিয়ে তলাটা বিছিয়ে রাখলে আরো ভালো দেখায়।

মনিরোঙের পাতাগুলি ছোটো ছোটো পানপাতার মতো, আর দেখতে অতি বিচিত্র রকমের। প্রত্যেকটি পাতার কিছু আলাদা রকমের বর্ণ-বৈচিত্র্য। সব পাতাই অবশ্য সবুজ, কিন্তু তার মাঝে মাঝে সাদা এখান ওখান থেকে যেন কাঁচা লাগানো সবুজ রংটা কুটির ছাট লেগে ধুয়েমুছে গেছে বা অন্য কোনো কারণে ছুটে গেছে, আর রং-এর নিচেকার সাদাটুকু তাই ইতস্ততঃ বেরিয়ে পড়েছে। এমনি ভাবে সবুজের মাঝে মাঝে এলোমেলো সাধারণ ছ্যাকড়া-ছ্যাকড়া ছোপ ধরেছে। এই ছোপ ধরাটাই দেখতে ভারী মজার। তার মধ্যে এক একটি পাতা ক্রমশঃ একেবারে হলদে হয়ে আগতে থাকে। যখন সবটাই তার হলদে হয়ে যায় তখন সেটি কয়েকদিন পরে সবুজের হলদে মধ্যে থাকতে লজ্জা পেয়ে আপনিই

করে পড়ে। আর তার পরেই গম্ভীর আরো নতুন নতুন পাতা। এ গাছের পরিচর্যা কিছু নেই, এমনিতেই বাড়তে থাকে। কেবল মাঝে মাঝে জল বদলালেই হলো, অথবা মাটির টবে থাকলে গরমের দিনে তার গোড়াতে একটু জল ঢেলে দিলেই হলো।

আরো কয়েক রকম গাছের কথা বলি যা ঘরের মধ্যেই রাখবার। এগুলির ভক্ত কিন্তু মাটি চাই, সুতরাং টবে রাখা চাই। খুব ছোটো ছোটো টব হলেই চলবে, যা রং মাঝিরে হৃদয় ক'রে টেবিলের উপর রাখা যায়। তার ভিতরকার মাটিটা বেলে মাটি হলেই ভালো হয়, অর্থাৎ মাটির সঙ্গে বালি বা পুরনো দেহালবসা মাখানো। তার সঙ্গে যদি একটু পাতা-দার মিশিয়ে দেওয়া যায় তাহ'লে আরো ভালো।

একরকম গাছের নাম অ্যাগ্লাওনিয়া (aglaonema)। এ গাছ কোনো কোনো পাহাড়ের জমলে হয়, আসামের শিলং অঞ্চলে পাওয়া যায়। কি স্বন্দর যে এর পাতাগুলি। চোট্টো এক একটি কাণ্ড, তার থেকে আশে পাশে কোণের মতো পাখানো হয়ে বেরিয়েছে চওড়া চওড়া এবং কচুপাতার মতো ছুঁচলো-মুখ পাতা। কিন্তু সে পাতাতে রং-এর কি খেলা, ঠিক যেন তার উপর কেউ ক'নে-চন্দন পরিচয় দিয়েছে। চন্দনের ফোঁটাগুলি ইতস্ততঃ ছিটানো নয়, সৌখিন প্যাটার্ন ক'রে গাখানো।

আর এক রকমের গাছ আছে, তার নাম জেব্রিনা (zebрина) । জেব্রাদের গাছে যেমন লম্বা লম্বা সালা-কালোর ঝাঁজি-কাটা, এর পাতাগুলিতেও ঠিক তাই, সেইজন্য এর ঐ নাম । লম্বাটে লম্বাটে পাতা, তার উপর হলুদে ও সবুজের সারি সারি ঝাঁজি কাটা, দেখলে স্বাভাবিক পাতা বলে মনেই হবে না, কেউ যেন কৃত্রিম পাতার গাছটি ভেঁতরি ক'রে তাতে ঐভাবে রং লাগিয়ে ছেলেবেলা করেছে ।

আর একরকম মজার গাছের নাম মনস্টেরা (monstera deliciosa) । এ হলো ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ থেকে আমদানি । এর পাতাগুলি আশ্চর্য মন, প্রত্যেক পাতার দুই পাশে প্রায় তিনটি ক'রে ছোট ঠাঁক, কেউ যেন কাঁচি দিয়ে পাতার দুই পাশে লম্বা লম্বা জানলা কেটে রেখেছে, কিংবা পাতাগুলো যেন হাতেব ছোটো, তার আঙুলগুলি ফাঁক করা । মনে হয় পাতাকে এমন ক'রে কে কাটলে !

আর এক রকমের গাছ ফিলোডেনড্রন (philodendron) । একে বাথকমে রাখলে ভালো হয়, কারণ এর একটু স্যাঁত-তে আবহাওয়া চাই, সাবানের ছিটে লাগলে কোনো ক্ষতি হয় না, বরং ভালোই ভাতে । একে কোনো অবলম্বন দিলেই লতার মতো এঁকেবঁকে উঠতে থাকে । পাতাগুলি একটু লম্বা ধরনের, আর কচি কলাপাতার মতো উজ্জল সবুজ । জল দিয়ে একটু মুছে দিলে সেই সবুজের স্বকৃমকানি আরো বেড়ে যায়, মনে হয় যেন সজ রং রাখানো হয়েছে ।

এ ছাড়া আরো কত রকমের আছে । কোনো ভালো নাসারিতে বা ভালো মালিসের কাছে আরো কত জিনিসের নাম শোনা যাবে । নানাজাতীয় ফার্নের কথা, আইভিলতার কথা তো প্রায় সকলেই জানে । টবে লাগিয়ে জানলার ধারে মাঝিয়ে রাখলেই হলো, চমৎকার বাহ্যিক হবে ।

ভগবান কত যে রকমারি ধরনের শিল্পসৃষ্টি করেছেন, প্রাকৃতিক রাজ্যে কত যে তাঁর কারিগরি কলিয়েছেন তা এমনিতে কারো মজরেই পড়ে না । কিন্তু এমনি বাগান করার কোঁক চাপলে শুধুমাত্র সেই দিকে আমাদের নজর যায়, আর তখন ভগবানের নতুন নতুন সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের দিকে নজর পড়ে অস্বাভাবিক হয়ে যেতে হয় ।

গ্যাস-বেলুন

‘নিরঙ্কুল’

গ্যাসের বেলুন আর কাগজের ফুল,
মনের বাদল, আর যত কিছু ভুল ;
পাতার পাতার ব্যাক্য বাণি বাণি লেখা,
উপদেশ-বানী কিংবা গল্প বা কবিতা ;

জলজলে রঙে ঝাঁকা মিছিল ছবির,
নব-প্রভাতের সাথে কিরণ রবির ;
শব্দ সভ্য বিখ্যা নয়, নরকো কল্পনা ;
বেলুন ফাগিলে কিন্তু গ্যাসেতে কোলে না ।

মৌচাক-কার্তিক, ১৩৬৫।



পাহাড়ী শড়, যা

দুনিয়াকে যে হাসাচ্ছে আজও

—। অীগজেন্সকুমার মিত্র ।—

যে সবাইকে হাসায়, সে কি নিজে হাসে ?

কে জানে। তবে সাহিত্যের বাজারে ত আমরা দেখি উল্টো। বারা হাসির গল্প লিখে নাম করেছেন তাঁরা বেশীরভাগই খুব গভীর, কিংবা শাস্তিশিষ্ট।

কিন্তু শুধু কি গভীরই—দুঃখীও কি নয় ?

এমনও কেউ কেউ আছেন, যাদের বই পড়ে লক্ষ লক্ষ লোক আনন্দ পেয়েছে, আশ্রয় পাচ্ছে, হয়ত ভবিষ্যতেও পাবে—তাঁরা নিজেরা হয়ত সারা জীবন দুঃখই ভোগ করে গেছেন, হাসবার অবকাশ গেলেন না।

ডেমনাই একজন লেখক, স্পেনের থেরডানডেস—জন হুইক্‌স্টের লেখক।

এই একটি বই, যা গত সাড়ে তিনশ বছর ধরে পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষকে হাসিয়েছে, আনন্দ দিয়েছে। যা পৃথিবীর প্রায় তাৎ ভাষাতেই অনুদিত হয়েছে এবং সব দেশেই পেয়েছে সমান আদর।

কিন্তু তার লেখক ?

টাকা পাননি, সম্মান পাননি—সেটা এমন কিছু বড় কথা নয়। এমন অনেক লেখকই জীবদ্দশার পান না। কিন্তু সারা জীবনভোর যে দুঃখ পেয়েছেন, যে প্রতিকূল ঘটনার সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়েছে—মাহুষের কাছে অংশহলা শুধু নয়—যে অকৃতজ্ঞতা পেয়েছেন, যে কথা শুনে গির আনন্দময় কৌতুককাহিনীর লেখকের মতো ঐ কাহিনীর পাঠকদের চোখে জল এনে দাবে।

১৪৪৭ খ্রিস্টাব্দে স্পেনের এক দরিদ্র অঞ্চল জয় চাবী গৃহস্থের ঘরে গুঁর জন্ম হয়। অনেক কষ্ট করে অনেক দুঃখ করে এক রকম পরের অহুগ্রহে সামান্য একটু লেখাপড়া শিখেছিলেন। শেখার আগ্রহটাই ছিল খুব বেশী তাই হয়ত এটা সম্ভব হয়েছিল। পোনা ঘায় জ্ঞান-পিপাসা মেটানোর জন্যে রাত্তা থেকে থেরডানডেস খুঁজে খুঁজে খবরের কাগজের টুকরো বা পুরনো বইয়ের পাতা কুড়িয়ে নিয়ে পড়তেন।...

একবারে যখন ওর ডেইশ বছর বয়স, তখন জীবনে প্রথম স্বযোগ এল প্রতিষ্ঠা পাবার।

শোণ যাচ্ছেন তুর্কীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে, স্পেনও যোগ দিয়েছে তাঁর দলে। এ স্বযোগ ছাড়তে

আছে ? খেরভানতেস্ ছুটেতে ছুটেতে শহরে এসে সেনাপলে নাম লেখালেন। স্পেনের বিরাট নৌবহর ছাড়ছিল, তারই একটাতে উনিও স্থান পোলেন।

১৪৭১ সালের ১ই আক্টোবর করিষ উপদাগরের উত্তর প্রান্তে স্পেন ও তুর্কীর নৌবহর মুখোমুখি হ'ল। ইতিহাসে দ্বন্দ্বীত্ব সে দিনট—কারণ সে দিনের ঐ যুদ্ধ পৃথিবীর বৃহত্তম নৌযুদ্ধগুলির অন্ততম বলেই গণ্য করা হয়।

খেরভানতেসের সৈনিক অস্থির, খুশি হয়। কিন্তু তাই বলে কি তিনি শুয়ে থাক'বন, বা পিছিয়ে থাক'বেন ? কখনও না। বরং যেখানে সব চেয়ে বিপদ—সেইখানেই এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ালেন তিনি। হাজার হাজার ক্রীতদাস রূপে ওরা রেখেছে—তাদের গলায় শেকল পরিয়ে তাদের দিবে জাহাজ টানাজে—তুর্কীদের কি উনি ক্ষমা করতে পারেন ?

কামানের গোলা লেগে একটা হাত প্রায় চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল, বুক এসে বিঁধল বন্ধুকের গুলি কিন্তু ঠা'র ক্ষত নেই। শরীর থেকে অবিরাম রক্তক্ষয় হচ্ছে তবু উনি এক হাতে তলোয়ার ধরে সিংহবিক্রমে লড়ে যাচ্ছেন।

অংশেবে যুদ্ধ শেষ হ'ল। ঠাঁ'রই হ'ল ভয়। নৌযুদ্ধ প্রাধান্যলাভের আশা চিরতরে নষ্ট হয়ে গেল তুর্কীর। ওদের আশিষ্ট জাহাজ ডুবেল, একশর ওপর নষ্ট হ'ল এবং প্রায় একশু জাহাজ স্পেনের হস্তগত হ'ল। মোট ১২ হাজার ক্রীতদাস মুক্তিস্বাভ করলে।

এইবার বাড়ী করার পাল। চিরদিনের মত একটা হাত নষ্ট হয়ে গেছে—তা বাক। তবু খেরভানতেসের মনে দুঃখ নেই। প্রধান সেনাপতি ঠাঁ'র অসাধারণ বীরত্বের বিবরণ দিয়ে রাজার নামে একটা চিঠি লিখে দিয়েছেন ঠাঁ'র হাতে—প্রশংসাপত্র হিসাবে, উনি জানেন বেশে পৌছতে পারলে রাজদরবারে এবার একটা চাকরি বাণী।

কিন্তু দেশে পৌঁছতেই পারলেন না শেষ পর্যন্ত।

যে ছোট্ট জাহাজটি চড়ে উনি যাচ্ছিলেন, সেটি পড়ল একদল আলজীরীয় জলদস্যুর হাতে। যে ক্রীতদাসদের মুক্তির জন্য তিনি নিজের জীবন পণ করে যুদ্ধ করেছিলেন—শেষ পর্যন্ত তিনিই হলেন সেই ক্রীতদাস।

ঠাঁ'র সঙ্গে ঠাঁ'র ছোট ভাইও কিরছিলেন—হু'জুনকেই ডাকাতরা বন্দী ক'রে নিয়ে গেল নিজেদের দেশে।

তবে একটা ব্যাপারে খুব বেঁচে গেলেন ঠাঁ'রা—ক্রীতদাস হিসেবে বেঁচে রাখলেও, ঠাঁ'দের দিয়ে জাহাজ টানানো বা কোন প্রমদ্য কাজ করাত না। কারণ খেরভানতেসের পকেটে ওরা পেয়েছিল স্পেনের রাজার নামে লেখা সেই চিঠি। নিশ্চয়ই হোমরা-চোমরা কেউ

হবে—অর্থাৎ মোটা মুক্তিপণ আদায় করা যাবে, এই ভেবে বরং একটু ধড়ই করতে লাগল ঠর নতুন মালিকটি।

।

খেরভানভেসে কিন্তু মোটেই দরলেন না। ঠর শয়ে বেড়ী পরানো থাকত সত্য কথা, কিন্তু ঘরে বেঁধে রাখত না ঠকে। উনি পথে-ঘাটেও বেহোতে পারতেন। সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে লাগলেন উনি পূর্ণ মাত্রায়। বডটা পারতেন অপর বন্দী ক্রীতদাসের কষ্ট লাঘব করবার চেষ্টা করতেন, সাধনা দিতেন ওদের, যনে আশার সকার করতেন। অর কয়েকদিনের মধ্যেই উনি কয়েকজন বন্দীকে সঙ্গে করে পালাবারও একটা চেষ্টা করলেন, কিন্তু কোন ফল হ'ল না। থরা পড়ে গেলেন। গিয়েছিলেন সবাই মিলে, কিন্তু যে-হেতু তাঁরই পরামর্শে কাজটা হয়েছিল, সেই-হেতু সমস্ত দারিদ্র্যটা নিজের কাঁধেই তুলে নিলেন—এবং এ প্রচেষ্টার অবশ্যজাতী ফলস্বরূপ প্রচুর নির্ধাতন সহ্য করলেন।

ইতিমধ্যে অপর এক বন্দীর মারকৎ এঁদের খবর পৌঁছল দেশে। আগেই বলেছি যে, ঠরা আত্মীয়রা খুব গরীব ছিলেন—সুতরাং সবাই মিলে, বশতে গেলে ঘটি-বাটি বেচে, যে টাকা ঘোগাড় করলেন তা নিতাবই সাম্য। সে টাকা যখন আলমদারিয়ায় এসে পৌঁছল তখন খেরভানভেসের মালিক-এই হোসেই খুন। পচোশটি মোহরের কম এ বন্দীকে ছাড়তে সে রাজী নয়—তার কাছে সাক কথা। ঠরা মানমুখে কিরে দাঙ্কিলেন—হঠাৎ খেরভানভেসের মাথাতেই এক বুদ্ধি এসে গেল, ঠকে ছাড়া যায় না কিন্তু এ টাকায় ঠর ভাইকে ত ছাড়া চলতে পারে!

সেই অমুরোধই করলেন তিনি, মালিকও রাজী হয়ে গেল। টাকাটা ঘরে খেচে এসে কিরে যাবে, এটাও বোধ হয় তার ভাল লাগছিল না। খেরভানভেসের বদলে তাঁর ভাই ছাড়া পেয়ে দেশে কিরে গেল।

এর মধ্যে বার কয়েকই এই আজব বন্দী পালাবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সফল হন নি। একবার ঠর ভাইকে কোন মতে একটা মাহাজ পাঠাবার সম্ভব খবর পাঠিয়ে, খেরভানভেস আর অপর কয়েকজন বন্দী সমুদ্রের ধারে এক পর্বতগুহার নিকিয়েছিলেন—বলতে গেলে অনাহারেই কাটিয়েছিলেন বহুদিন—কয়েকমাস, (কারণ প্রহরীদের চোখে ধুলো দিয়ে খাবার সংগ্রহ করাই ত দুঃসাধ্য ব্যাপার!) কিন্তু শেষ পর্যন্ত যখন সেই বহুপ্রতীক্ষিত মাহাজ এল, তখন দূর থেকে স্পেনের মাহাজ আসতে দেখেই একজন লক্ষ্যে করলে। হে-চৈ উঠল—এরা থরা পড়ে গেলেন। এতদিন দুঃসহ কষ্ট সহ্য করেও কোন লাভ হ'ল না। এর ফলে খুবই নির্ধাতন সহ্য করতে হয়েছিল। শেকল-বেড়ীর ভারও বাড়ছিল ক্রমেই। কিন্তু সেই সঙ্গে ঠর মালিকের প্রজ্ঞাও বাড়ছিল বৈকি। এমন অসাধারণ বন্দীর অসামান্য দর উঠবে, সে সম্বন্ধে তার প্রত্যয় ক্রমেই দৃঢ় হচ্ছিল।

খেরভানভেন্দেগ তাঁর দেশের শাসকদের কাছেও আবেদন-নিবেদন বড় কম করেন নি। যখন রাজাকেও চিঠি লিখেছিলেন। কোন পথে এসে, কীভাবে আঘাত করলে, যখন আয়াদে আলমীড়িয়া দখল করতে পারবেন তিনি—এর বিকূর্ণ নির্দেশ পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু স্পেনের শাসকরা ঐ সামান্য এক বন্দীর কথায় কর্ণপাত করেন নি।

অবশেষে ঐ বৃদ্ধ বাবা মাত্রিসের রাজ্যের ঘাটে কাছারীতে ছেলের অসহায় অবস্থা, তাঁর শৌর্য ও দেশের জন্য আত্মত্যাগ এবং অপরাধের ইচ্ছাশক্তির আশ্রয় কাহিনী বক্তৃতা দিয়ে বেড়িয়ে প্রায় তিনশ বোহর তুলে একত্বের হাতে দিয়ে ওখানে পাঠালেন।

একটা টাকা হিলে আর তার সঙ্গে একটু অল্পময়-বিনয় করলে কি মন চলেবে না লোকটার ?

টাকা নিয়ে যখন লোক এসে পৌঁছল, তখন খেরভানভেন্দেগের মালিক ঠেকে নিয়ে কনস্টান্টিনোপল্ ঘাড়া করছে। জাহাজঘাটার দেখা হ'ল।

তিনশ বোহর! হুঃ! এক কথার মাহুত সে। পাঁচশ বোহর না গেলে কিছুতেই ছাড়বে জাহাজে উঠে বলল সে গ্যাট হয়ে।

যে লোকটি টাকা নিয়ে এসেছিলেন, এবার তাঁর করুণা হ'ল, খেরভানভেন্দেগের অবস্থা দেখে। হাতে-পায়ে শেকল বঁধা—সেলেছে হুত বা তুর্কীতে বিক্রী হতেই। বিদেশী বিধবীর ক্রীতদাস হয়ে চিরজীবন কাটাতে হবে। হুত আর কোনদিন ধরও পাওয়া যাবে না। তিনি তখন ঐ বন্দরে যে সব বণিক জাহাজ ছিল সেই জাহাজের মালিক এবং বণিক মহাজনদের কাছে সব কথা বলে হাত পাতলেন। তাঁদেরও সম্মত হ'ল। স্ফিকার খুলিও একদিনের মধ্যেই দু'শ বোহর এসে পড়ল। খেরভানভেন্দেগ গেলেন মুক্তি।

পাঁচ বছর বিশেষে বন্দীশায়া কাটাবার পর দেশের মাটিতে পৌঁছে, যেহে কৃতজ্ঞতার প্রথমেই তিনি হাঁটু গেড়ে বসে চুম্বন করলেন তাঁর দেশের মাতিক—জননী জন্মভূমিকে।

কিন্তু দেশ তাঁর এই বীর সভানের জন্য কী করল ?

কিছুই না।

সমস্ত আশাই একে একে আকাশকুহলের মত অলীক প্রতিশর হ'ল। রাজদরবারে সম্মান প্রতিপত্তি ত চুলোর ধাক—একটা ভাল চাকরিও যোগাড় হ'ল না। সব সেরে যে আশা ছিল তাঁর—রাজাকে রাজী করিয়ে দৈন্তসামন্ত নিয়ে গিয়ে তিনি আলমীড়িয়া দখল করবেন, এবং সেখানে যে গঠিত হাজারেরও বেশী ক্রীতদাস বন্দী ক্রীতদাস জীবদ্ভুত অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে—তাদের মুক্তির ব্যবস্থা করবেন—সেটাও সফল হ'ল না। তাঁর কথায় কর্ণপাতও করলে না কেউ।

কার্তিক, ১৩৬৫]

ছুনিয়াকে যে হাসাচ্ছে আজও

এখন বড় গ্রন্থ হ'ল দিন গুজরানের।

এসেই এক বিবাহ করে বসেছেন—পরীথের মেয়ে। বৌতুক বলতে কিছুই এমন পান্নি,
কিন্তু সংসার বেড়েছে।

অবশেষে ধরপাকড় ক'রে অতিকষ্টে দামাস্ত বেত্তনের এক কেরানীগিরি মিল্ল। কিন্তু তাতে
কি সংসার চলে?

কিছু আর বাড়াবার সস্তা খেরজানতেস অনেক ডেবে-চিলে কলম ধরলেন। গল্প-পত্ন
লিখলেনও অনেক, কিন্তু কোন ফয়দা হ'ল না। এক পরশা আর হ'ল না তা খেয়ে—বই কেউ
কিনলই না।

অবশেষে ঘোনার দায়ে তাঁকে মেলে যেতে হ'ল একদিন।

আর সেই মেলে বনেই লিখলেন তাঁর এই অমর বই—‘ডন-কিথোত্তের’ (ডন কুইক্সট)
অপূর্ব কাহিনী!

এমনি করে ভাগ্যের লগ্নে লড়াই করতে করতেই, এমনি হারিজ্যাপিষ্ট হয়ে, প্রায় অজ্ঞাত
অখ্যাত-অবস্থার একদিন এই চির, বীর চির দুঃসাহসী লেখক শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ (১৩১৬ খ্রিঃ)
করলেন।

কিন্তু একটা কথা বলতে হবে। জীবনের কোন প্রতিকূল অবস্থাতেই ভাগ্যের কাছে মাথা
নোতান নি এই লোকটি। মুখের হাসি এবং বুকোর বল কখনও মিলেগে নি তাঁর। অতিবড়
দুঃখের মধ্যেও তামাশা তাঁর মুখে লেগেই ছিল, ঠাট্টা করবার স্বযোগ পেলে ছেড়ে দিতেন না।
নিঃশেষ খেতে পেতেন না—কিন্তু যা-কিছু যখন পকেটে থাকত, নিঃশেষে খান করতেও বিধা
করতেন না।

স্পেনের দোর্দণ্ডপ্রতাপ রাজা ফিলিপ (এলিজাবেথের আমলে তিনি বিরাট ‘আর্মাদা’
পাটিয়েছিলেন ইংল্যান্ড জয় করতে)—বাঁর এতটুকু অলুগ্রহ পেলে খেরজানতেস দেদিন বেঁচে
যেতেন, তিনি আর স্পেনের সেই বিখ্যাত রাজবংশ তাঁদের সমস্ত ঐশ্বর্য আর মর্যাদা নিয়ে কোথায়
মিলিয়ে গেছেন, হারিয়ে গেছেন মাল্লবের বিশ্বস্তির বোন দূর সিগন্তে ; কিন্তু বিশ্ববাসীর মনের
সিংহাসনে দেদিনকার অজ্ঞাত খেরজানতেস আজও পূর্ণ গৌরবে বিরাজিত, দেদীপ্যমান।

পটল তোলা'র আগে

শ্রীপতিতপাবন বন্দ্যোপাধ্যায়

কারখানার বাস কামরায়

বসেছিলেন মাঝ

চম্কে সবাই উঠলো হঠাৎ

শুনতে গেয়ে কান্না।

এ-ওর দিকে চাইতে থাকে

বর্মচারী স্বত।

খোদ কর্তা ছুঁপিয়ে কামেন—

সবাই খতমত।

হেডক্লার্ক বে সতীশবাবু,

একাই সাহস করে

দীরে দীরে কপাট ঠেলে

টুকলো গিয়ে ঘরে।

তাকে দেখেই মাল্লাবাবু

কান্না কি ডেউ ডেউ!

বলেন—“সতীশ, এ খবরটা

জানতে নাকি কেউ!”

কান্দতে কান্দতে সেই দিনকার

কাগজখানা নিয়ে

পড়ে দেখতে বলেন তাকে

দেখিয়ে আবুল দিয়ে।

পৃথিবীটার বয়স নাকি

বাড়ছে দিনের দিন;

তার চে' বড়ো স্বর্ষ

তারও তেজ হচ্ছে কীণ।

হঠাৎ যদি সূর্যের টান

ছেড়ে পটাং ক'রে

কেউ জানে না পৃথিবীটা

কোথায় যাবে স'রে।

“পড়লে সতীশ খবরখানা?”

মায়া কেঁদে কয়—

“হ্যাঁ বা বুড়োর সত্যি যদি

থ ম্‌থোসিসই হয়।

পৃথিবীটা ঠিকরে গেলে

আমরা কোথায় যাবো?

কারখানাটা নষ্ট হ'লে

আর কি ক'রে যাবো?”

সতীশ বলে—“এ খবর যে

অনেক আগেই জানা।

বিজ্ঞানীরা তাই দিচ্ছেন

মহলেতে হানা।

আমার উপর তার দিয়ে মিন

কীমবেন না আর।

এ-কারখানা যদলেতে

করবে ট্রান্সলুকার।

ছাড়লে টাকা ও সব কাজে

কত দিন বা লাগে!

সরে পড়বে এই পৃথিবীর

পটল তোলা'র আগে।”

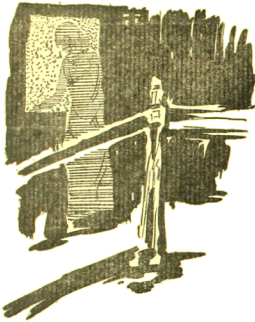
যে কাহিনীটি বলতে বসেছি, এটি বহুবছর পূর্বকাল আমার নিজের দেশে একটি দত্তা ঘটনা। যে পরিবারে এই ঘটনাটি এককালে ঘটেছিলো, তার বংশধরেরা অনেকেই জীবিত; সুতরাং তাঁদের প্রকৃত নাম-খাম আমি প্রকাশ করব না; তাতে মূলবিষয়বস্তুর কোন হানি ঘটবে না। এঁরা ছিলেন অ'হাদের নিকট-আত্মীয়

এঁরা ছিলেন সম্পন্ন গৃহস্থ। পশ্চিমের কোন শহরে বাস করতেন। দুই ভাই। বড় ভাই যোগেনবাবু সেখানকার একজন নাম-করা উকীল; ছোট ভাই পশার-ওলা ড'ক্টার। দু'ভাই মিলে প্রচুর আয় করতেন। সেখানকার সমাজে দু'ভাইয়ের যথেষ্ট নাম-দশ ও ব্যাভি-প্রতিপত্তি।

সংসারটিও বেশ বড়। বৃদ্ধা বাপ-মা, দু'ভাইয়ের দুই স্ত্রী, প্রত্যেকের পাঁচ-ছয়টি কোরে সন্তান, এক বয়সী বিধবা স্ত্রী, তাঁরও চার-পাঁচটি সন্তান। তাদের মধ্যে আবার কাণো বিবাহ হয়েছে, তাঁদের স্ত্রী ও ছেলেপুলে। এ ছাড়া চাকর-বাকর, বি, পাচক, মুহুরী, কমণ্ডিওঁর, সরকার, গোস্বামী প্রভৃতি মিলে সংসারটি খুবই বড়। সর্বদাই জম্জম করত।

এই বৃহৎ সংসারের যিনি সিন্ধী ছিলেন, সকলেই তাঁকে 'বড়মা' বোলে লেখাধন করতো। তিনি যোগেনবাবুর স্ত্রী। বৃহৎ সংসারের ছোট-বড় সবরকম খুঁটিনাটিই তাঁকে দেখতে হতো। ভোর পাঁচটা থেকে রাত এগারোটা পর্যন্ত তাঁর কাজের আর বিরাম ছিল না,—ঘনি ও বিধবা নন্দ কাশ্মিনী দেবী সর্ববিধয়েই তাঁকে সাহায্য করতেন। কিন্তু একবছর হঠাৎ বড়মা মারাত্মক ব্যাধি কলেরাতে আক্রান্ত হলেন ও মারা গেলেন।

তাঁর মৃত্যুর কিছু পরে একটা আশ্চর্য ব্যাপার ঘটলো। বম্বা নামে এক প্রৌঢ়বয়স্ক দাদী অনেকদিন থেকে এ-বাড়ীতে কাজ কোরে আসছিল। ছোট-ছোট জন-কয়েক ছেলে-মেয়েকে নিয়ে রাতে সে দোতলায় একটা ঘরে শুতো। একদিন রাত দুটো-আড়াইটের সময়, তাকে বাইরে আসতে হয়। ঘরের বাইরে একটা খোলা লম্বা টানা বারান্দা ছিল। সেই বারান্দার শেষপ্রান্তে মুখ-হাত ধোবার ঘর ছিল। বাড়ীটা ছিল সেকালের—চক-মেলানো বাড়ী; মাঝে খানিকটা ভূমি উঠানের মত রেখে, চারিধারে চারি সার ঘর, ও চারি সার ঘরের কোলে, ভেতরের দিকে উম্মুক্ত টানা-বারান্দা। ঠিক এর ওপর, এই ভাবেই এর দোতলা। দোতলায় চারি দিককার এই টানা বারান্দার দুই বিশরীত কোণায় দুটো বাথরুমের মত মুখহাত ধোবার ঘর ছিল। সেদিনের রাত্রিটা ছিল জ্যোৎস্নাময়।



বমুনা বড়মাকে পাড়িয়ে থাকতে দেখেছিল

বললো, সে ঐ দিককার বারান্দায়, বড়বাবুর শোবার ঘরের জানালা ধরে বড়মাকে পাড়িয়ে থাকতে দেখেছিলো।

সেদিন কথটা অনেকই হেলে উড়িয়ে দিল বটে, কিন্তু এর কয়েকদিন পরেই বখন গিন্দীমা অর্থাৎ খোগেনবাবুর বিধবা ভগ্নী বললেন যে, গতরাতে হঠাৎ তাঁর ঘুম ভেঙ্গে গেলে, তিনি খোলা জানালা দিয়ে, বড়বোকে ঐদিকের বারান্দার রেলিং ধরে পাড়িয়ে থাকতে দেখেছেন, তখন সকলেরই মনে আতঙ্ক ও দুশ্চিন্তার একটা ঘন ছায়া চেপে বসলো। তখন ব্যাপারটাকে কেউ আর উড়িয়ে দিতে বা অবিশ্বাস করতে পারলেন না।

বমুনা বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে, বিপরীত দিককার বারান্দায় চেয়ে দেখবার সঙ্গে সঙ্গেই, বিকট একটা চীৎকারের সঙ্গে অজ্ঞান হোয়ে পড়ে যায়। তাঁর চীৎকারে অনেকেরই ঘুম ভেঙ্গে যায় এবং তারা সকলে দেখামে ছুটে আসে। ছোট ভাই ঘিষেনবাবু ছিলেন ডাক্তার; তাঁর চোটার শীঘ্রই বমুনীর জ্ঞানসঞ্চার হোল। তারপর একটু স্থব্র হোয়ে বমুনা বা বললো, তা কেউ-বা বিশ্বাস করলো, কেউ-বা তাঁর কথটা হেলে উড়িয়ে দিলো। বমুনা



বমুনা বিপরীত দিককার বারান্দায় চেয়েই বিকট চীৎকার করে উঠল

তারপর থেকেই এইরকম ঘটনা খুব ঘন ঘন ঘটে লাগলো। বাড়ীর অনেকেই 'বড়মা'র ঘোণে-সেখানে দেখা পেতে লাগলো। কখনো ছাদের আলসেতে পা হুলিয়ে বসে আছেন, কখনো রেলিং বা রেলিং-এর লোহার-কুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে আছেন, কখনো বা যোগেনবাবুর শোবার ঘরের একটি কোণায়, লালপাড় শাড়ীর ঘোমটাটা টেনে দিয়ে বসে আছেন। ক্রমাগত দিনের পর দিন এইরকম ব্যাপার ঘটতে থাকায়, সকলের প্রাথমিক আতঙ্কটা অনেক-পরিমাণে কেটে গেল বটে, কিন্তু একটা অন্তত আশঙ্কা সকলেই উদ্বিগ্ন ও ব্যাকুল হোয়ে পড়লেন।

হিষ্টভাৱী বহুবান্ধবের দল নানারকম পরামর্শ দিলেন। তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই বললেন— "খুব শীগগির গয়ায় গিয়ে পিণ্ডারনের ব্যবস্থাটা করে আনুন।" হতভাং তাই করা স্থির হোল এবং তারি যোগাড়-বস্তুর হোতে থাকলো।

কিন্তু কয়েকদিন পরে, কাহিনী সেরীর বড় ছেলে হরেশ রাত প্রায় ১১টার সময় ঘখন বার-বাড়ীর দিড়ি দিয়ে দোতালার উঠে, ভদিককার বারান্দা পার হোয়ে এনিককার বারান্দার দিকে আসছিলো, তখন স্পষ্ট দেখলে যে, বারান্দার একপাশে তাঁর বড় হাশীরা দাঁড়িয়ে আছেন এবং তাঁকে সম্বোধন কোবে বলছেন— "হরেশ, ভগব তোরা কি মন্তলব কচ্ছিস ? কিছু করিসনি, বাবা ; ওতে কোন ফল হবে না।"—কথা করটা বলবার পর আর তাঁকে দেখতে পাওয়া গেল না।

অন্তঃপর গয়ায় পিণ্ডারনও হোল এবং আরো অনেক কিছুই হোল, কলে কিন্তু কিছুই হোল না। এমিকে যোগেনবাবুর শরীর দিন দিনই শুকিয়ে যেতে লাগলো। অথচ তাঁর কোনও নিদিষ্ট রোগের কোন নিদিষ্ট লক্ষণ দেখা গেল না।

তখন আত্মীয়-স্বজন সকলের পরামর্শে স্থির হোল যে, এ অবস্থায় এখান ছেড়ে কোলকাতায় গিয়ে বাস করাই কর্তব্য। হতভাং শাস্থানেকের মধ্যেই তাঁরা সকলে কোলকাতা চলে এলেন।

কোলকাতায় এসেও অবস্থার কোনও পরিবর্তন হোল না। পশ্চিমের বাড়ীর মত এখানেও 'বড়মা'কে সকলে দেখতে পেতে থাকলো। এমিকে যোগেনবাবুর শরীরও দিন দিন বেশী বেশী শীর্ণ হোয়ে আসতে লাগলো। কোলকাতায় তখনকার বড় বড় ডাক্তারদের দেখানো হোল, কিন্তু তাঁর শরীর দিনের পর দিন ভাঙনের দিকেই যেতে লাগলো। কোন রোগের লক্ষণই তাঁর দেহে পাওয়া গেল না ; শুধুমাত্র দুর্বলতা। এমিকে 'বড়মা'র ব্যাপারেও অনেক কিছু করা হোল ; অনেক নামকরা 'দোক্তা'কে আনানো হোল। তারা অনেক কিছু ঝাড়-ফৌক, অনেক কিছু কাণ্ড-কারখানা করলে, কিন্তু ফল—কথা পূর্ব তথা পরম্।

অবশেষে যোগেনবাবু একেবারে লম্বাশায়ী হোয়ে পড়লেন। তাঁর বিকালের দিকে প্রত্যাহই একটু কোবে অরও হোতে লাগলো। এই অর হবার সূত্রটা পেয়ে, ডাক্তাররা অকুলে একটু ঘেন কুল

পেলেন। তাঁরা নতুন উষ্ণমে চিকিৎসা চালাতে লাগলেন। কিন্তু কিছুতেই বোগেনবাবুকে ভালোয় দিকে আনা পেল না। তাঁর অবস্থা ক্রমেই সন্ধিন হোয়ে আসতে লাগলো।

এই সময়টার আমি আমার ঠাকুরমার সঙ্গে এঁদের বাড়ীতে তুলে দিন-পনের থাকি। পূর্বেই বলেছি, এঁরা আমাদের আত্মীয় হোতেন। এঁরা পশ্চিমে থাকার এঁদের সঙ্গে সে আত্মীয়তায় কতকটা ভাঁটা পড়েছিল, কিংবা কোলকাতায় কিরে এলে আবার ঘনিষ্ঠতা ও বাতরাত বৃদ্ধি পায়। বোগেনবাবুর অস্থির বাড়াবাড়ির দিকে খবর পেয়ে, ঠাকুরমা তাঁকে দেখতে গেলেন। আমার তখন বালক বয়স; বোধহয় ১২ কি ১৩ বছর মাত্র।

ঠাকুরমা বোগেনবাবুর ঘরে গিয়ে বসতেই, তিনি ঠাকুরমাকে বললেন—“পিসীমা, এরা আমাদের বাঁচাবার জন্যে অমূল্যক চেষ্টা আর অর্থব্যয় করছে; আমাদের যেতেই হবে।”

পূর্বের মতোই সকলে ‘বড়মা’কে দেখতে পায়। এমিনিসটা এখন সকলের গা-মহা হোয়ে গিয়েছে, সেজন্য প্রথম দিককার মত কেউ আর ভয় খায় না। বিশেষতঃ এই সময়টার, ব্যাপারটা যেন নিতানৈমিত্তিক ব্যাপারে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। অবশ্য এ-ব্যাপারের জন্যে কারোর মনেই শাস্তি ছিল না; অথচ শাস্তি পাবার আশায় প্রত্যেক পথে আগ্রহের হোয়ে, শেষ পর্যন্ত পথ হারানতে হোয়েছে। শুধু একজনকে একটি প্রস্তাব মত কাজ করা সম্ভব হোয়ে উঠে। তিনি বলেছিলেন, স্ত্রীরেতের বাইরে, কোনও স্ত্রীর সপে বোগেনবাবুকে পাঠিয়ে দেওয়া। বাড়ীর সকলেবও ইচ্ছা হোয়েছিল, কয়েকটা মাস ইংলণ্ডে তাঁকে রাখবার জন্য। কিন্তু এ ব্যবস্থা প্রথম দিকে হোলে হুতো হোতে পারতো, এখন তাঁর শরীরের যেকোন অবস্থা, তাতে—ইচ্ছা হোলেও এ কাজ সম্ভবপর নয়। এখন তাঁকে জাহাজে তুললে, হয়ত জাহাজের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু ঘটবে।

ঠাকুরমার সঙ্গে যে-কটা দিন ও-বাড়ীতে ছিলাম, তাঁর মধ্যে আমি দু’দিন ‘বড়মা’কে দেখতে পেয়েছিলুম; কিন্তু বিশেষ কিছু ভয় পাইনি। তাঁর কারণ, ভূত-প্রেতের অজ-প্রত্যক্ষাদি ও তাদের ‘মাকি হুরে’ কথা কওয়া প্রভৃতি সম্বন্ধে, তাঁরাবাদের ছোট ছোট মনে যে-রকম একটা কাল্পনিক বিকট ছবি অঙ্কিত ছিল, সে মনের সঙ্গে এর কিছুই মিল নেই; এ যেন বাড়ীর অন্তঃস্থ মনোবৈজ্ঞানিক একজন। মাহুয়ের মতই আকার, মাহুয়ের মতই কথা, মাহুয়ের মতই কণ্ঠস্বর। বাড়ীর গৃহিণীর মতই তাঁর সব বিষয়ে গৃহিণীপনা। টুকটেকে লাল কত্তা পেড়ে শাড়ী পরা, হাতে বালা, নোয়া, মাথায় সিঁচুর—এ যেন জীবন্ত ‘বড়-মা’ তাঁর বহুদিনের হাতে গড়া বৃহৎ সংসারটির সকল দিকের সমস্ত বৃত্তিমাটি ব্যাপারটাই স্থগীভব মমতা ও শ্রীতির ভবে পরিচালনা করছেন। এই স্ত্রীজ্ঞেই তিনি এক রাতে বিমলা নামে অল্পবয়সী এক বাসীকে বলেন, “জাক্ বিমলি, ন-বৌমার ছোট ছেলোটা দিনদিন পাঁকিয়ে যাচ্ছে। ওর ক্রমি হয়েছে। ঠাকুরপো যেন ওর ওষুধের ব্যবস্থা করে দেয়, বুঝলি?” একদিন যখনবাবুর স্ত্রীকে

বলেন, "ও রে ছোট, নিম্ন কালের মেয়েটা। যোগ্যই মাঝ রাতে কেঁদে কেঁদে কোঠিয়ে বাবার মত হয়। ওর মা কি ম'বে ঘুমায়? ঐ সময় উঠে বলে মেয়েটার গলাটা। একটু ভিজিয়ে দিতে পারে না? কি ঘুম রে বাবা! বলিল তো ছোট, ওর মাকে।"—এই বৃকম জীবিতকালের মত, মরে গিয়েও সব দিকে নম্র। তার মধ্যে বেশী নম্র—স্বামীর দিকে। ন-বৌমার চোটে ছেলে ওম্মের ব্যবস্থা করছেন; নিম্ন কালের মেয়ের প্রতিও সতর্ক দৃষ্টি, কিন্তু স্বামী যে দিনের পর দিন মৃত্যুর পথে এগিয়ে যাচ্ছে, সে বিষয়ে কোনই তাঁর খেয়াল নেই, হুঃব নেই, অস্থিরতা নেই, শুধু আছে একটা গভীর আকর্ষণ। অথচ তখন যোগেন বাবু এমন অবস্থা যে, কবে কোন দিন তাঁর হয়ত কি ঘটে!

কয়েকদিক পরে ঘটলোও তাই। হঠাৎ একদিন মধ্যরাত্রে যোগেনবাবু চিরদিনের মত চক্ষু বৃকলেন।

বিশ্বয়ের কথা এই যে, সেদিন থেকে আর কোনদিনই ও-বাড়ীতে 'বড়মা'কে দেখা যায় নি।

হাওয়া

শ্রীমূলকুমার শুভ

ভোমরা যখন আকড়ে থাক
অনেক চাওয়া পাওয়া
আমি কেবল চাই হতে ভাই
মুক্ত উদার হাওয়া
গড়াঙ্গনার নেইকো বাংলাই,
করি যা চার প্রাণ;
মিহির পটে আঁকি ছবি,
পথে জাগাই গান।
বনের পারে নাচন তুলি,
ধানের ক্ষেতে ঢেউ;
যেখি আমি সব, সেখে না
আমার তবু কেউ।
মেঘের ঘূড়ি গুড়াই নভে,
বনাই রোদের মেলা;
ছটু ছেলেও ভয় জাগাতে
দুয়ারে মিইঠেলা।
বাবার হাতে চিঠি কাড়ি,
পিসীর পুতোর তুল;

মিহির আঁচল তুল টেনে ঘাই
হ'লে পড়ার তুল।
সন্ধ্যা ধনীপ মিহিরে করি
মাকে চিঠিখাওয়া,
কর শিশুর বৃকে ফোটাই
নব আশার সাড়া।
এগজামিনের খাতায় দোহাত
উটে ফেলি কালি;
খুঁকুর খেলনা চুরি করি,
পাপির খাচা খালি।
সন্ধ্যা হ'লে ক্লাস্ত হ'য়ে
মা'য়ের গলা ধ'রে
চুপি চুপি ঘুমিয়ে থাকি
উঠতে জেগে চোরে।
আমার দেখা না পেয়ে মা
তুললে নাওয়া-খাওয়া
যেব দেখা? ডাবব তখন;
আগে তো হই হাওয়া!

কান্‌হেরি গুহা

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর ।



পণ্ডিতবান বুদ্ধমূর্তি
(কান্‌হেরি—১ম গুহা)

কান্‌হেরি গুহামন্দির ।

বোম্বাই থেকে ইলেকট্রিক ট্রেনে ১২ মাইল পথ
বড়িভিল, পেথান থেকে ৪ মাইল দূরে কান্‌হেরি গুহা ।

চার্ট পোট স্টেশন থেকে বড়িভিলে পৌঁছাতে আন-
দের লাগলো মাত্র ৪০ মিনিট । বাকী পথটুকু যেতে হবে
ট্যাক্সি বা টাংগায় । কিন্তু স্টেশনের বাইরে এসে দেখি
টাংগা ট্যাক্সি একখানিও নেই । খানিকক্ষণ যোঁতাযুঁজি
করার পর একখানি 'ঝড়বড়ে' ট্যাক্সি মিললো, কিন্তু এই
পাঁচ মাইল পথ বাতায়নের পে তাজা চাইল মশ টাকা ।
কিন্তু পে গাড়ীর চোহারা দেখে তাতে উঠতে আমরা
সাহস পেলাম না, সম্ভেহ হলো পথে নেমে হরতো এট
পাড়ীকে টেনেতে হতে পারে । কাজেই আরো কিছুক্ষণ
অপেক্ষা করে আমরা একখানি টাংগা তাজা করলাম ।
ছ'টাকার বাতায়ন । কিন্তু টাংগায় পাঁচজনকে বাওয়া
তো কষ্টকর । তবে অভাবে নিয়ম নাস্তি । স্টেশনের
চারিশাশে আর দ্বিতীয় গাড়ী চোখে পড়লো না । এদিকে
বেলা বেড়ে চলেছে, সন্ধ্যার আগেই তো আবার কিরতে
হবে ! খাচ্ছন্ডোর চেয়ে প্রয়োজনটাই বড় হয়ে দেখা দিল ।

এক টাংগায় পাঁচজন ।

জনপথ পার হয়েই ভ্রাশাভাল পার্ক । বিশাল বাগান । ফুলগাছ দিয়ে মনোরম করে
সাজানো । ছোট ছোট জেলেমেয়েরা বেড়াচ্ছে-খেলছে । একদিকে একদল ছাত্র পিকনিক করছে ।
উজানের শেষ প্রান্তে একটি টিলা । টিলার মাথায় একটি গোল গৃধ্র রোদে ঝলমল করছে । সেটি
গাভিছীর স্মৃতিসৌধ । মনোরম স্মৃতিসৌধ । চারিশাশে ফুলের বাগানের স্নানোহর পরিবেশের মাঝে
স্মৃতিসৌধটি শাস্তিকামী মহাস্বাকীর বোণা স্মৃতিরক্ষায় ব্যবস্থা ।

চলান্ধাল পার্ক পার হয়েই
হুক হলো হল। ডেউ পেগানো
মি আ গাছের ডিড়। মাঝখান
দিয়ে পাঁকা মড়ক।

চলেছিলাম ভালই। হঠাৎ
পথের মাঝে গাড়ী গেল থেমে। পথ
সারানো হচ্ছে। কুলিরা বললো—
এই পথ দিয়ে আর গাড়ী যাবে না।

গাড়ী ঘুরিয়ে আমরা
জংগলের পথ ধরলাম। কাঁচা
প্রস্তরবহল পথ। সে পথ দিয়ে

এগিয়ে চলা সহজ নয়। মনে হয় কাঁকাসি লেগে দেহের হাড়গুলি বুঝি গুঁড়া হয়ে যাবে। দেহরক্ষা
করার জন্য আমরা টাংগা থেকে নেমে পড়লাম। সে পথ দিয়ে পায়ে ঠাঁটাও সহজ নয়, মাইল
দুয়েক পথ পদভরে যেতে আমাদের ঘণ্টাখানেক লাগলো। তারপর আবার আমরা এসে পড়লাম
পাঁকা রাস্তায়।

একটি পার্বত্য নদীর পুল পার হয়েই ঢালু পথ উপরে উঠে গেছে। সামনেই পাহাড়। সেই
পথে ঘোড়া বেন্দুীর গাড়ী টানতে পারলো না। আমাদের নামতে হলো।

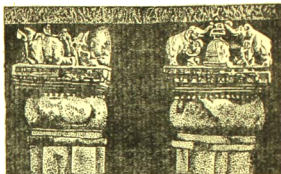
আট মাইল আন্দাজ অগ্রসর হয়েই সামনে ডাকবাংলোর পিছনেই পুরাতত্ত্বের অফিস।
তারপরেই হুক হলো সিঁড়ি।

সামান্য কয়েকটা সিঁড়ি উপরে উঠেই বিন্মিত হলাম। এক কালি টালের মত পাহাড়।
পাহাড়ের গায় উপর-নীচে শুধুই গুহার সারি। গুহা আর গুহা। এ যেন এক গুহা-নগরী।

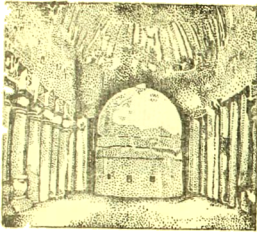
১৩২টি গুহা নিয়ে এই কান্দেরী পাহাড়। এর আসল নাম কুম্ভারি, লোকমুখে হয়েছে
কান্দেরী।

সাধারণতঃ গুহা বলতে আমরা বুঝি পাহাড়ের গায়ে কোন গর্ত। যেখানে ঝানোঝার থাকে
বা সাধু-সন্ন্যাসীরা কোন রকমে বিন কাটার। এদব গুহা কিন্তু সে জাতের নয়। এ হোল, পাহাড়
কেটে দৃক তক্ষণ শিল্পীর এক একখানি বাড়ী তৈরী করেছেন। এ সব গৃহের কোন দ্বার নেই।
জল বড় এর কোন ক্ষতি করতে পারে না, ভূকম্পনে পাহাড় ধসে না পড়লে এ গৃহগুলি চিরস্থায়ী।

গুহাগুলির তিনদিকেই পাহাড়ের দেয়াল, শুধু সামনের দিকটাই খোলা। সবগুলিই একতলা



কান্দেরি গুহাঃ দুটি গৃহের দৃশ্য



স্থূপ ও হল

(কানিংহাম—১ম গুহার মধ্যে)

একটি গুহাগুপ্ত। প্রতিটি গুহার ধারে পুণ্ডিত্য বিভাগ নহর বসিয়ে তিরেছেন, এক গুহা থেকে আরেক গুহার দাবার পথটাও বধাসম্ভব সরল করে দিয়েছেন।

অনেক গুহার মধ্যে নানা ধরনের কারুকার্য করা আছে। অধিকাংশেই বুদ্ধের নানা ধরনের মূর্তি খোদাই করা। গুহাগুলির মধ্যে ১, ২, ৬৭, ২০ ও ১০১ নং গুহাই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১, ৩ ও ১০১ নং গুহা তিনটি চৈত্যা। বৌদ্ধ ভিক্ষুরা এখানে ধর্মসভার অধিবেশন করতেন। মধ্যে বড় হলঘর, কেন্দ্রে বুদ্ধমূর্তি। ৩নং গুহার মধ্যে একটি স্তূপ আছে। স্তূপের চারিপাশে বুদ্ধমূর্তি ও নানা কারুকার্য খোদাই করা, স্তম্ভগুলির শীর্ষে যে সব কারুকার্য আছে তা দেখবার মত। একটি বগায়মান বুদ্ধমূর্তি আছে। এই গুহাটি তিনতলা।

১১নং গুহাটি মহারাজ বা মংবার-গুহা নামে খ্যাত। ভিতরে সত্তবড় হলঘর। গুহাটি সোতলা।

৬৭নং গুহাটির নামের দৃষ্ট এমন সুন্দর যে কে বলবে এটি তেরোশো বছর আগে তৈরী হয়েছে। এ বেশ অতি আধুনিক কোন পল্লীবাগ। এর ভিতরের হলঘরে বুদ্ধের ধর্মপ্রচারের বহু ভঙ্গী খোদাই করা আছে।

২০নং গুহাগুলোও বুদ্ধের নানা ভঙ্গী খোদাই করা।

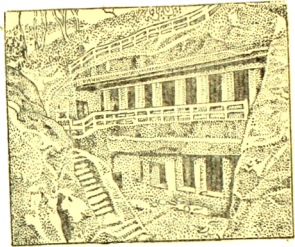
নর, দোতলা, তিনতলাও আছে। দাখনে বারান্দা, খাম, ভিতরে হলঘর, খাম দিয়ে ছাদ রক্ষা করা হয়েছে। হলঘরের মধ্যে এ একটি স্তূপ বা বুদ্ধমূর্তি। খোদা কোন হলঘরের দু'পাশে ছোট ছোট অনেকগুলি ঘর, থাকার মত। ঘর দোতলা বা তিনতলা আছে, তার বারান্দার একপাশ দিয়ে উপরে ওঠার সিঁড়ি উঠে গেছে। উপরেও ঠিক সেই ব্যবস্থা।

একটি পাহাড়ের আগা-পোড়া পটিল গজ, জিন গজ কি পকাশ গজ, ঘুরে ঘুরে এমনি এক

এই শেষ দুটি গুহার চিত্রগুলি এখনও সমৃদ্ধ ও অদিকৃত আছে।

অনেকগুলি গুহা শুধুই পাথর। যেখানেই বোকা যায় এগুলি বৌদ্ধ সম্রাটদের বাসগৃহ হিসাবেই ব্যবহৃত হতো।

এই গুহাগুলি দেখতে দেখতে একটি কণাই শুধু মনে হয়—বৌদ্ধদ্বংস আমাদের স্থাপত্য-বিদ্যা ও তৎকালীন চরম উৎকর্ষতা লাভ করেছিল। অনেকে মনে করেন বৌদ্ধ সম্রাটদের ধর্মচর্চার সঙ্গে শিল্প



মহারাষ্ট্রের নরবার-গুহার সমুদয়

(কান্‌হেরি—১১ম ও ১২ম)

চর্চাও করতেন। তথাগতের নাম নিয়েই বৌদ্ধ ভিক্ষুরা মংসার ত্যাগ করতেন, তথাগতই ছিলেন তাঁদের ধ্যান ও ধারণা। অঙ্গুর সময় সেই তথাগতেরই করুণাময় মূর্তি তাঁরা খোঁচাই করতেন গুহাপাশ্রে। তাতে মনের একাগ্রতা বাড়তো, উন্নয়ন আসতো। শিল্পীরা হুশী হাতই শুধু কাজ করতো না, ভক্তি-আগ্নুত মনও কাজ করতো। শিল্প-রসিক ছাডেল সাহেব এই দিকটার উপরেই ঘোর দিয়েছেন, তিনি বলেছেন—“বৌদ্ধ ভিক্ষুরা অনেক সময় শিল্পচর্চা করতেন, তাঁরা শিল্পকে শুধু আয়োগ বা উদ্যোগ বলেই মনে করতেন না, শিল্পকে তাঁরা লোকের মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতিবিধানের উপায় করে তুলেছিলেন।”

কান্‌হেরির এই গুহাগুলির একটি বড় বিশেষত্ব হলো জলাধার। প্রতিটি গুহার ঘরের পাশেই একটি করে কূপ আছে। কূপ বসার চেয়ে এক একটি ছোট চৌবাচ্চা বলাই ভাল। তিন-চার হাত নীচেই জল। নীচ থেকে চূড়া অবধি প্রতিটি গুহার পাশেই এই জলাধার। এই জল কোথা থেকে আসছে, সে এক বিস্ময়। অস্তঃশলিলা কোন উৎস থেকে সব ক’টি জলাধারে এই ভাবে জল সঞ্চিত হয়। কিন্তু কোন জলাধার থেকে জল উপচে পড়ে না। এখনও সেই সব জলাধার জলে পূর্ণ হয়ে আছে। অস্তঃশলী উৎসের সন্ধান করে ধারা এই জলাধারগুলি তৈরী করেছিলেন, তাদের স্থাপত্যজ্ঞান এখনকার চেয়ে কম উন্নত ছিল না। এই জলাধার থাকার একটা বড় সুবিধা হলো যে, গুহাবাসীকে

কখনো ঘরের ভিত্ত কোথাও যেতে হইবে না। কলাধারগুলির পাশে হাতমুখ খোয়ার স্থান ও মল নিষ্কাশিত হবার নর্মা কাটা আছে। ধর্মের নামে মানুষদের প্রাতিহিক প্রয়োজনকে উপেক্ষা করা হয়নি।

কানহেরী গুহাবাসগুলি বৌদ্ধযুগের এক বিরাট কীর্তি। বুদ্ধের তিরোধানের প্রায় দু'শো বছর পরে সম্রাট অশোক বৌদ্ধ ধর্মচক্র ধর্মবিজয়ের পথে পরিচালিত করেন। সম্রা ভারত জুড়ে চুরাশি হাজার বৌদ্ধ-মঠ, ভূপ ও তত্ত্ব স্থাপিত হয়। সেই সময়েই পশ্চিম ভারতে এই কানহেরী গুহার স্থাপত্য হয়েছিল কিনা বলা শক্ত। তবে পরবর্তীকালে এই কক্ষহরি পাহাড় যে বৌদ্ধ-ধর্মের এক বিরাট কেন্দ্র হয়েছিল সে সম্পর্কে সম্বন্ধের কোন অবকাশ নেই। শত শত বৌদ্ধভিক্ষু এখানে বাস করতেন, তাঁদেরই প্রয়োজনে এখানে এই ১৩২টি গুহাগৃহ তৈরী হয়েছিল। শুধু বাস করার ভিত্ত সাধারণ গুহা নয়, উপাসনা করার মন্দির, সন্তা করার মন্দির দরবার কক্ষও নির্মিত হয়েছিল। এই সমস্ত গুহা অষ্টম শতকের আগেই তৈরী হয়েছিল বলে পণ্ডিতেরা মনে করেন। কারণ তার পরেই বৌদ্ধধর্মের পতন শুরু হয় এদেশে, আবার হিন্দুধর্মীরা ধীরে ধীরে মাথা তুলতে শুরু করে। সেই সময় ভারতের অনেক বৌদ্ধ কেন্দ্রের ধ্বংসাপ্ত হয়ে যায়, নানা স্থানের বৌদ্ধ ভিক্ষুরা এলে সমবেত হন কানহেরিতে। অষ্টম ও নবম শতকে কানহেরীই ছিল ভারতের বৌদ্ধদের অন্ততম ধর্ম ও কর্মকেন্দ্র। কিন্তু আচাৰ্য শঙ্কর বা আচাৰ্য রামানুজের মত অনন্তসাধারণ কোন ধর্মমাত্র বৌদ্ধদের মধ্যে আর দেখা দিল না, বৌদ্ধধর্ম তাই আবার নতুন করে সমস্ত ঐতিহাসিক মূহুর্তি দিয়ে নতুন করে জাগ্রত হইল। ভারতের বাইরে তিব্বত, চীন, জাপান, ব্রহ্মদেশ এবং মধ্য এশিয়ায় তখন বৌদ্ধধর্মের পূর্ণ গৌরবের কাল। অনেক বৌদ্ধ-সন্ন্যাসী সেই সব দেশ থেকে আমন্ত্রণ পেয়ে একে একে ভারতভূমি ছেড়ে যান। এঁদের মধ্যে বোধিসেনের নাম পাওয়া যায়। তিনি একজন মহা-সন্ন্যাসীকে নিয়ে জাপানে চলে যান এবং সেখানে নতুনভাবে বৌদ্ধশাস্ত্র ও ধর্ম আলোচনার পন্থা করেন। সে ৭৩৬ খৃষ্টাব্দের কথা। মান ধর্মকেন্দ্রের চরম বিপর্যয় ঘটে পাঠান আক্রমণে। সেই সময় এই বিরাট সংস্কৃতিকেন্দ্র একেবারে পরিত্যক্ত হয়।

মহাকাল এক দিন সবই মুছে দেয়, কিন্তু আমাদের দেশে এইসব অতীত ঐতিহ্যের পরিচয় ধ্বংস হয়েছে বিবেচ্য হাতে। মহাযুগের বিধর্মীর অন্ধ মূঢ়তায়। তারা ভেঙেছে, ভেবেছে নিশ্চিহ্ন করে বিলাস। কিন্তু সত্য কি একেবারে মুছে বেগুয়া যায়? তাহলে কত শতাব্দী পরে আজকের মানুষ কিসের মন্দির এই নির্জন পরিত্যক্ত গুহাগুলির সামনে এসে দাঁড়ায়, প্রায় অন্ধকার এই গুহা-চৈতন্যগুলির মাঝে শত শত মুণ্ডিত মস্তক ভিক্ষুর ছায়া ভেসে ওঠে তার চোখের সামনে, দূর অতীত থেকে সমবেত কর্তের উদাত্ত স্বর ভেসে আসে—বুঙ্ শরণং গচ্ছামি! দর্শকও জ্ঞানী দীর্ঘকণ্ঠে উচ্চারণ করেন—বুঙ্ শরণং গচ্ছামি!

এ ঐতিহ্যের আকর্ষণ, এ জ্ঞানের আলো যুগ থেকে যুগান্তের রোগ ও শোক, হিংসা ও লোভ, আশা ও ব্যর্থতাস্রিষ্ট মাহুতের অলৌকিকে আলোকিত করে, আকর্ষণ করে। সেই মৌন স্বর, ধ্যান-স্তব্ব হয়ে আছে এই স্বল্প-আলোকিত গুহাইচ্ছ্যগুলির মধ্যে।—

‘তমসো মা জ্যোতির্গময়,

মৃত্যো র্মা অমৃতগময় !

অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে আমাকে জ্ঞানের আলোকে নিয়ে চল, আমাকে অমৃতের সন্ধান দাও—চিরস্থান আনন্দের সন্ধান দাও !

মানব মনের এই আকৃতি তো মুছে যাবার নয় ! এই আকৃতি থেকেই ঐতিহ্যের জন্ম। সে ঐতিহ্য শাসনত।

খোকনবাবু

শ্রীরণজিৎকুমার সেন

খোকনবাবু খোকনবাবু

করছে। তুমি কি ?

এই দেখনা তোমার অন্তে

নিয়ন্ত্রে এলায় কি !

হাতী আনুলাম ঘোড়া আনুলাম,

আর আনুলাম কড়িং,

সঙ্গে বে তার নিয়ে এলায়

গাও চাংক হরিণ !

সাগর থেকে নিয়ে এলায়

গাং-শালিকের ছানা,

বর্ধমানের সীতাভোগ আর

রাব্‌ড়ী বিহিধানা।

এবার থেকে কখনো ধের

করবে যদি আড়ি,

লাগিয়ে দেবো গালে তোমার

বুড়োর মত দাড়ি।

খোকনবাবু খোকনবাবু

ভাবছে। তুমি কি ?

এই দেখনা তোমার অন্তে

এনেছি আর কী ?

সাপ এনেছি, ব্যাঙ, এনেছি,

এনেছি কুম্ভুখি,

আর এনেছি দম-দেওয়া এক

গাড়ী বে টুমটুমি !

এই গাড়ীতে চড়ে তুমি

আগবে ঘুরে বিশ্ব,

জানবে সবাই হাজার হলেও

খোকন তো নয় নিঃশ্ব।

অনেক হলো, এবার তুমি

ঘুমাও তাড়াতাড়ি,

নইলে গালে লাগিয়ে দেবো

বুড়োর মত দাড়ি।

মাধুর্য্যমের মাদুলী

[অগ্নিবুড়ো]

ছেলে মহলে সেদিন ছলোড় লেগে গেল !

দুই বছর পর আমাদের সেই মাধুর্য্যম কিরে এসেছে ।

আমরা তখন ঈতলপাটি হাইস্কুলের বোডিং-এ থেকে মনের আনন্দে লেখাপড়া করছি । দশ মাইলের মধ্যে এই ইটলপাটি ছাড়া আর কোনো শিক্ষাকেন্দ্র নেই ; তাই আসে পানের গ্রাম থেকে সব ছেলে বেঁটিয়ে এখানে এসে উপস্থিত হয় । কাজেই ভালো ছেলে আর দুটো ছেলে মিলে এই ঈতলপাটি বোডিং হাউসে এক চমৎকার নরম-গরম খিচুড়ি তৈরী হয় । বোডিং হাউসের সামনেই অব্যবহৃত মাঠ । যেমিকে চোখ পড়বে—গুধু ধু-ধু করছে ধান ক্ষেত । একদিকে বিশাল এক সরোবর আর তার ওপারে স্কুলের বাগান । স্থানীয় জমিদারের বাগান এটা । বড় রকম কল আছে—তার বেন প্রদর্শনী খোলা হয়েছে এখানে ।

জমিদার থাকেন দূরে স্বপ্নর অঞ্চলে । তাই বিভিন্ন স্বত্বের পাকা ফলগুলি—বোডিং-এর ছাত্রদের পেটেই নিঃশাপদে বিজ্ঞান লাভ করে ।

দুই বছর আগের কথা মনে পড়ছে । সামনের ওই বিশাল সরোবরে ছাত্রদের সন্তরণ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে । স্বয়ং হেডমাষ্টার মশাই এর উদ্বোধনী । সব জ্যেষ্ঠ ছেলেরাই যোগ দিয়েছে । আমাদের মাধুর্য্যমের মতো কেউ সাঁতরাতে পারতো না । সেরা পদকটা যে ওর বুকই ছলবে—সে বিষয়ে আমাদের কারো মনে কোনো সন্দেহ ছিল না । সরোবরের ওপারে গিয়ে আবার কিরে এসে বাঁধানো ঘাট ছুঁতে হবে ।

বাঁধানো ঘাট লোকে লোকারণ্য । হেডমাষ্টার মশাই বাঁধি বাড়িয়ে দিলেন । সঙ্গে সঙ্গে ছেলের দল অগ্নিগ্নে পড়ল জলে । গোটা সরোবর পার হয়ে ওরা যখন সবাই আবার কিরে এলো তখন দেখা গেল, মাধুর্য্যম তার ভেতর নেই !

খোঁজ—খোঁজ—খোঁজ ।

মাধুর্য্যমের টিকিটি পর্যন্ত আর দেখা গেল না ।

ছেলে-মহলে সেদিন সে কী উত্তেজনা ! হেডমাষ্টার মশাই প্রতিযোগিতা বন্ধ করে দিলেন । তারই নির্দেশে সরোবরের বিভিন্ন অঞ্চলে জাল ফেলা হ'ল ! কিন্তু মাধুর্য্যম বেন হাওয়ার সঙ্গে মিলে গেল ! তার আর কোনো হমিশাই পাওয়া গেল না ।

ইঞ্চল থেকে কাগজে-কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হ'ল, পুস্তকার ঘোষণা করা হ'ল... কিন্তু মাধুরাম সবাইকার চোখে খুলো দিয়ে কোথায় যে পালিয়ে গেল,—কেউ তার সন্ধান বিতে পারলে না !

সেই মাধুরাম ফিরে এলো দুটি বছর পর। মাথার জটা, গলার কল্যাণের মালা, পরনে গৈরিক বগন। কপালে রক্তচন্দ্রের ফোঁটা। অনেকেই আমাদের সেই মাধুরামকে মেখে চিনতে পারেনি। কিন্তু আমার চোখকে সে ফাঁকি দিতে পারেনি !

আমি বললাম, মাধুরাম, তুই !

মাধুরাম মুচকি হাসতে লাগলো।

তারপর চোখ বড় করে—ভাম হাটটা তুলে অন্তর জানালো।

ধবর পেয়ে ছুটে এলেন হেডমাস্টার মশাই, আর সেই সঙ্গে আর সব মাস্টার মশায়ের দল।

প্রথমে ত' সে কোনো কথাই বললে না। মৌনীবারা হয়ে রইল, তারপর হেডমাস্টার মশায়ের বহু প্রশ্নের উত্তরে জানালো, হিমালয়ের কোন এক মন্ড্রাঙ্গী নাকি তাকে সম্বোধন করে এক স্তম্ভায় নিয়ে যায়। সেইখানেই সে মন্ড্রাঙ্গীর কাছ থেকে দীক্ষা নেয়।

হেডমাস্টার মশাই বললেন, আচ্ছা, এখন তুমি বিজ্ঞান করো। পরে তোমার কাছ থেকে সব কথা শুনবো। আমি আর মাধুরাম একই ঘরে থাকতাম। আজও সেই ব্যবস্থাই হ'ল।

ঘরে ঘরে ছেলেদের ভিড় পাতলা হয়ে গেল। মাধুরাম তখন আমার হাত ধরে ফিল্কিস্ করে বললে, শোন ল্যাংচা, আমার গুরুদেবের কাছ থেকে এক অদ্ভুত বিজ্ঞা শিখে এসেছি—আর তোদের কোনো ভয় নেই।

আমি ছুই চোখ বড় বড় করে জবাব দিলাম, কি বিত্তে রে ?—আমার শেখাবি ?

মাধুরাম একবার তার ডানসিকের জটাটা নাড়িয়ে দিয়ে বললে, অত সহজে কি আর এ বিত্তে লাভ করা যায় ? আমি ছ'বছর তপস্বী করে সিদ্ধিলাভ করেছি—।

আমি উত্তর দিলাম, বিষয়টা কি—তাই আগে খুলে বল না ! আমি জানলেই ত তোমার বিত্তে আর কর্পরের মতো উবে যাবে না !

মাধুরামের ঠোঁটে তখন বিস্ময়কর হাসি !

বেশ খানিকটা চুপ করে থেকে সে বললে, আমি এমন একটি মাছলী তৈরী করতে পারি—যা ধারণ করলে কোনো ছেলে আর পরীক্ষায় ফেল করবে না ! কিন্তু খবরদার ল্যাংচা, খবরটা কাউকে জানাবি নে !

আমাকে জানানো যানই—গোটা ইমুলকে ব্যবরটা জানিয়ে দেওয়া। আর সে ব্যাপারটা মাধুরাম ভালো করেই জানতো।

ফল, তার পরদিন থেকেই সব ঘরে মাধুরামের ডাক পড়তে লাগলো।

মাধুরাম কিন্তু হিমাতলের মতো অচল শুধু গভীরভাবে সবাইকে জানিয়ে দিলে, যে মাদুলী তৈরী করতে পাঁচ টাকা করে খরচ পড়বে।

পরীক্ষার পাশ করা—ছেলেদের কাছে জীবন-মরণ সমতা। না হয় একমাস জলখাবার খাবো না, তবু পরীক্ষার পাশ হলে ইমুলে মান বাড়বে—বাড়িতে মুখ থাকবে।

কাছেই সবাই তৎপর হয়ে উঠল। গোপনে-গোপনে সকলেই পাঁচটা করে টাকা মাধুরামের হাতে তুলে দিতে লাগলো। ওর নিজের কোনো টাটি-বাটি নেই। কাছেই সেই অমীচাকা আমার ট্রাকের তলায় জমতে লাগলো।

একদিন মাধুরাম আমার ডেকে বললে, স্কাব ল্যাংচা, তুই ত পর পর দু'বছর ফেল করেছিল। এইবার আমি তোকে মাদুলী দিয়ে পাশ করিয়ে দেবো—

ব্যবরটা শুনে আমিও খুশী হয়ে উঠি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে পাঁচটা টাকার কথা। মুখ ভার করে বলি, আমাকেও পাঁচটা টাকা দিতে হবে ত ?

এইবার মাধুরাম হেসে ফেললে। বললে, হ্যাঁ! তোকে আমি এমনিতেই একটি মাদুলী তৈরী করে দেবো। কিন্তু আমার সাক্ষরনী করতে হবে তোকে।

আমি খুশী হয়ে উত্তর দিলাম, নিশ্চয়! নিশ্চয়! কিন্তু তোর সাক্ষরন হয়ে আমার কি করতে হবে, তাই বল!

মাধুরাম আমার কানে কাছের মুখ এনে ভিগভিগ করে কয়েকটা কথা বললে।

প্রথমটা আমি ভারী অস্বস্তি হয়ে গেলাম। তারপর মিজেন্স করলাম, বলি কি রে? যে সব ছেলে পরীক্ষার ফেল করে তাদের চুল দিয়ে মাদুলী তৈরী হয় ?

মাধুরাম গভীর গলায় উত্তর দিলে, নিশ্চয়। বিবে বিবক্ষয় হয়—একথা কি তোরা জানিস নে? শুকনোদেবের কাছে এই মন্ত্রই ত আমি লাভ করেছি। হ্যাঁ, মনে থাকে যেন,—তোকেই সব ব্যবস্থা করতে হবে। ওই চুল নিয়ে কালো বেড়ালের চোখের আরকে জিঞ্জিয়ে রাখতে হবে।

শুনে আমি ত একবারে হাঁ!

এর পরদিন থেকে বোড়িং-এ এক মজার কাণ্ড ঘটতে লাগলো। দু' তিনটি করে ছেলের

কার্তিক, ১৩৬৫]

মাধুরামের মাদুলী

মাধার চুল—ঠিক টাধি কাছে নেই! কে যেন এবড়ো-খেবড়ো করে তুলে নিয়েছে। বাবলে নিয়েছে বললেই বৃষ্টি ঠিক বলা হয়।

ছেলেরা হেবে ঠিক করতে পারে না—কে এই কাণ্ড করে!

কেউ বললে, ইদুর বড় বেশী হয়েছে—বোড়িং-এ। ছোট ছোট মোটি ইদুর এগে ছেলেদের মাধার চুল তাদের ধারালো দাঁত দিয়ে কেটে নিয়ে যাচ্ছে। আবার কোনো মাস্টারমশাই মন্তব্য করলেন, অনেক সময় আবতলা এগে মাধার চুল বাবলে যায়।

ঘটনা বাইহোক না কেন—ইদুর ধরবার ক্ষেত্রে কার্টের কল পাতা হ'ল; আর সমস্ত আবতলা বালকে ধ্বংস করা হ'ল—কিছু কাটা পেটা করে, কিছুটা ডি-ডি-টি ছড়িয়ে।

কিন্তু কিছুতেই কিছু না। ছেলেদের মাধার চুল চুরি—একই ভাবে চলতে লাগলো।

অবশেষে একদিন মাধুরামের পরামর্শে আমি গভীর রাত্রে হেডমাস্টার মশায়ের ঘরে গিয়ে হাজির হলাম। তিনি তাঁর ছেলেকে নিয়ে ওই ঘরেই থাকেন। হেডমাস্টার মশায়ের ছেলে ছোবল পরশর তিন বছর পরীক্ষায় ফেল করেছে। তার চুল কেটে নিতে পারলে নাকি খুব জোরালো মাদুলী তৈরী হবে—বাকি বলে একেবারে অব্যর্থ ফলপ্রসঙ্গ।

ঠানির চুল কাটা প্রায় হয়েই গিয়েছিল। কিন্তু ছোবলচন্দ্র হঠাৎ মাথাটা নাড়তেই ভৌতা কাচির খোঁচায়—উঃ বলে চীৎকার করে উঠল।

সঙ্গে সঙ্গে হেডমাস্টার মশায়ের ঘুম গেল ভেঙে।

এদিক-ওদিক আশে-পাশের ঘর থেকে শুধু—চোর-চোর চীৎকার।

মাধুরাম দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছিল। সেও ছুট লাগলো আমার সঙ্গে সঙ্গে।

কিন্তু বোড়ি-এর চাকর বাহ্যাবাম যে ওতপেতে বসেছিল—সে কথা ত আগে জানা ছিল না।

সবাই মিলে আমাদের দু'জনকে ধরে নিয়ে এলো হেডমাস্টারের ঘরে।

মাধুরামের মটা কাটা গেল। আমার গেল আধ-মাথা চুল। ট্রাকে যে টীকাগুলো এতদিন ধরে জমা হয়েছিল—তাও এক ট্রাকে নিয়ে আসবার সুবসং পেলাম না! কী কপালের গেলো!

অন্ধকারে সরোবরের ধারে বসে জল্পনা-কল্পনা করছি,—হিমাচল প্রদেশে—মাধুরামের গুরুদেবের গুহার দু'ধনে এই রাত্তিরেই চুপি চুপি চলে যাবো কিনা!

সকাল হলে যে আর মুখ দেখাবার জোটি থাকবে না!

হায় রে মাধুরামের মাদুলী!

পারস্যের সভ্যতা

শ্রীবিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

বর্তমানে আমরা থাকে ইরান বলি, প্রাচীন কালে সেই দেশেই নাম ছিল পারস্য। এখন ইরান একটি স্বাধীন মুসলিম রাজ্য। কিন্তু মুসলিম বিজয়ের আগে এখানে বাস করত প্রাচীন পারসীক জাতি। বোধাই অকালে যে পাশি সম্রাট থাকেন, তাঁরা সেই প্রাচীন পারসীক জাতিরই বংশধর। ইরান হ'ল এশিয়ার মধ্যমণি, তার প্রাকৃতিক দৌলত হ'ল অশ্ব—বুলবুল আর বাগিচার বেশ, যেখানে কাব্য-শিল্প জন্ম ও পুষ্টলাভ করেছে। চিরকালই পারস্য তার স্বাভাব্য এবং স্বাধীনতা বজায় রেখেছে, কিন্তু সভ্যতার ইতিহাসে তাকে গুণক করে দেখা চলে না।

এশিয়ার মত প্রকাণ্ড মহাদেশে কত প্রাচীন সভ্যতার জন্ম হয়েছে। চীন, ভারত, পারস্য ও আরব—সেই বিশাল সভ্যতারই এক একটি কেন্দ্রস্থল। তাই জগতের প্রাচীনতম দেশগুলির সভ্যতা এবং ঐতিহ্য বুঝতে হলে, পারস্যের ইতিহাস শ্রদ্ধার সংগেই আলোচনা করতে হবে। একদিকে অ্যাসিরিয়ান ও বাবিলনীয় সভ্যতা, আর একদিকে ভারতীয় সভ্যতা। এই দুয়ের মাঝখানে পারস্য তার বিপুল ঐতিহ্য-গৌরব নিয়ে দাঁড়িয়েছে এবং বহুদিন ধরে তার নিজস্ব সংস্কৃতির আলো বিতরণ করেছে।

বড় হয়ে তোমরা পারসীক সভ্যতার বিশদ বিবরণ জানতে পারবে। স্তার পাশি সাইক্স, ভেনিসন রস এবং অগাস্থাস ব্রাউন প্রকৃতি ব্যাচনারা পণ্ডিত পারস্যের সভ্যতা ও ইতিহাস নিয়ে যে সাধনা ও গবেষণা করে গেছেন, তার প্রত্যক্ষ পরিচয় তোমরা পের পাবে। এখানে সংক্ষেপে জানাচ্ছি—বিভিন্ন যুগে পারসীক সভ্যতার বিবর্তন কেমন করে সম্ভব হয়েছে এবং মানব-সভ্যতার ইতিহাসে পারসীক জাতির স্থান কতখানি।

পারসীক জাতি প্রাচীন আৰ্যজাতিরই একটি শাখা। কয়েকই তার ধর্ম, সমাজ, ভাষা ও সাহিত্য আৰ্য-বংশীয়। পরবর্তীকালে এই প্রাচীন হুসভ্য জাতির চিন্তা ও কর্ম অন্তান্ত প্রতিবেশী সভ্যতাকে অনেক পরিমাণে প্রভাবিত করেছে। তার রাষ্ট্র-ইতিহাসও কিছু কম গৌরবময় নয়। একদিন অ্যাক্বেমিনিয়ন রাজবংশের জগৎবিখ্যাত কাইরাস, ক্যামবাইসিস ও ডেরিয়শের নেতৃত্বে পারসীক দানবাজ্য বিভিন্ন ও লিভিয়া জয় করে নিয়ে, পশ্চিমে যুরোপের সীমান্ত আর পূর্বে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল এবং বাহুবলে পারসীক শক্তি এককালে অপ্রতিষেধী ছিল। যে দেশের শাশন-পদ্ধতি ছিল হৃদয়লব্ধ, রাজ্য-চালনা ছিল হৃদয়বৃত্ত, সেনা-বাহিনী ছিল বিপুল ও সংঘবদ্ধ, শিল্পে ও ধর্মে যার খ্যাতি ছিল অসামান্য, সে দেশের ইতিহাস মানব-সভ্যতার একটি উজ্জলতম অধ্যায়।

একদিন ঈজিপ্টন সমুদ্রের উপকূল ও খাঁপগুলি অধিকার করে নিয়ে পারদীক সম্রাট গ্রীস আক্রমণ করেছিলেন এবং সেন্যবাহিনীকে যথেষ্ট পরিমাণে বিপর্যস্ত করেছিলেন। হেরোডটাস প্রকৃতি প্রাচীন গ্রীক ঐতিহাসিক-দল পারদীক শক্তির পরাজয় বর্ণনায় গ্রীকদের রণ-কৌশল, বদেগ প্রেমিকতা ও হুমত্যা বীতি-নীতির প্রশংসা করেছেন। বলেছেন, প্রাচ্য বর্বরতার কবল থেকে গ্রীসই প্রতীচ্য সভ্যতাকে মুক্ত করেছে, তার পরমাণু বৃদ্ধি করে। তোমরা বৎ হয়ে পক্ষপাতহীন দৃষ্টি নিয়ে বুঝতে শিখবে—পারদীকরা মোটেই বর্বর, অত্যাচারী রাজতন্ত্রের অমুচয় ছিল না। সভ্যতার বাস্তবত্বই হ'ল প্রাচ্য কৃষক এবং প্রাচীন সভ্যতার একটি উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা ছিল পারস্তই হাত। পারস্তের রাষ্ট্র-ইতিহাস তাহের ধর্ম, আচার এবং সভ্যতার সংগে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। আর তার কাহিনী অতি প্রাচীন। খৃঃ পূঃ তিন হাজার বছর আগে পারদীক সভ্যতার জন্ম।

পারস্ত ইতিহাসের প্রথম পর্বটাই পৌরাণিক। তবে এটুকু নিশ্চিত করে বলা যায় যে, মিশর আর আর্মেনিয়ার মধ্যবর্তী পারদীক সংস্কৃতি নিজেই আর বাবিলনের জন্মস্থান থেকে জন্মগ্রহণ করেছিল। তারপর প্রকৃত ইতিহাস শুরু হয় অ্যামেনিয়ান রাজবংশ থেকে। এই বংশের রাজাদের কীতিকলাপ ইতিহাস প্রসিদ্ধ। এই বংশের কাইরাস, তেরিয়স প্রভৃতি বীর রাজাদের কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। এর পরবর্তীকালে যখন আলেকজান্ডার সিংহাসন থেকে নামেন, তখন পারস্ত মাসিডন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

কিন্তু তার এই পরাজয় সাময়িক। তারপরে পার্শ্ববর্তী যুগ, যে সময় থেকে ইরানের নব-গৌরবের সূত্রপাত। পশ্চিমে গ্রীক ও রোমান সাম্রাজ্য আর পূর্বে ভারতীয় রাজাদের সংগে পার্শ্ববর্তী বোণাবোণ ঘটে। কিন্তু প্রাচীন ইরানের সবচেয়ে গৌরবময় যুগ হ'ল সাসানিডন সম্রাটের রাজত্বকাল। এ সময়ে ইরান শুধুই তার সাম্রাজ্যের আয়তন বিস্তার করেনি, সভ্যতার প্রভাবও বিস্তার করেছে এবং প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সংস্কৃতির মধ্যে ঘটকতার কাজ করেছে। পারস্ত সাসানিডন সভ্যতা সেকালের সভ্যজগতের গুণের আপনায় শির-সংস্কৃতির হুমুস্ট ছাপ রেখে গিয়েছে। সুদূর চীন থেকে আরম্ভ করে ভারতীয়, রোমান, বাইজানটাইন এবং মধ্য এশিয়ার শিল্প সাসানিডন সংস্কৃতির কাছে ঝুঁকি।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতক পর্যন্ত ইরানে প্রাচীন পারদীক সভ্যতার ধরা অক্ষর ছিল। তারপর কালক্রমে মুসলিম ধর্ম-বিস্তারের সংগে সংগে প্রাচীন ধর্ম ও সভ্যতার সীলানুস্মি, বিখ্যাত ধর্ম-প্রবর্তক করণুত্তর বিচরণ-ক্ষেত্র ইরান বেশ আরবজাতির দ্বারা অধিকৃত হয়। এই সময়ে প্রাচীন ইরান বিলুপ্ত হ'ল। মুসলিম অধিবাসী মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করে, কিন্তু ছোট ছোট সাম্রাজ্যগুলি বেশজাগ

করে, বর্ধমান ব্রহ্মার ভক্ত বিশেষে আশ্রয় নেয়। পবিত্র ধর্মগ্রন্থ 'আবেস্তা'র আত্মবান, হৃদ ও অগ্নির উপাসক আর্ধাংশোদ্ধর প্রাচীন পারসীকদের ইতিহাস ও সংস্কৃতির এইখানেই সমাপ্তি।

কিন্তু ইরানের সূর্য অন্তর্মিত হলেও, বলিষ্ঠাদের অধীনে ইরানে নবীন চন্ডের উদয় হ'ল। তারপর, ওমায়ের এবং আব্বাসদাইন রাষ্ট্রব্যবস্থার যুগে আরব ও পারসীক সভ্যতার সমন্বয় ঘটে। কিন্তু আবার সূর্য হ'ল ভাগ্যবিপর্যয়। মোঙ্গলদের আক্রমণে, চেঙ্গিস খাঁ, তৈমুরলঙ্গ প্রভৃতি বিদেশী হানাদারের অভিযানে পারস্তদেশ বিলম্ব হ'ল। তারপর কিছুদিন শান্তি। আবার এলেন নাদির শাহিনি ভেরিয়ন্স এবং নশের ওরানের সিংহাসনে আসীন হলেন, আর নিয়ে গেলেন ভারত থেকে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ মহম্মদ-কাজ। কাবীর-বংশের পতনের পর পেলুভিরাই এখন ইরানের বাদশা। ইরান স্বাধীন দেশ, এটা সত্য। কিন্তু ইংরেজ ও আমেরিকান রাজনীতির পাকচক্রে ইরানের আজাদরূপ অবস্থায় শান্তি ও শৃঙ্খলা অনেকখানি নষ্ট হয়েছে।

এই হ'ল ইরানের সংক্ষিপ্ত রাষ্ট্র ইতিহাস। কিন্তু তার চেয়ে বেশি চিন্তাকর্ষক হ'ল তার সভ্যতার ইতিহাস। জ্ঞানে-বিজ্ঞানে ধর্ম-আচারে এবং শিল্প-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রাচীন পারস্তের দান চিরকালই প্রভাব সংগে স্বীকৃত হবে। পারস্তের সাহিত্য ও ধর্ম হ'ল তার অপূর্ণ সম্পদ। 'আবেস্তা' এবং পল্লবী-সাহিত্যের মধ্যে এই প্রাচীন দেশের গৌরব ধরা পড়েছে। কিয়ানিয়ন্স এবং আব্বাসেমিনিয়ন্স যুগে পারস্তের সভ্যতা যে ক্ষয়ে উঠেছিল, তার পরিচয় পেলে বিস্মিত হতে হয়। শুধু ভরখুস্ত-প্রচারিত ধর্ম-বাহ্যেস্তে নয়। যুক্তবিচার বাহ্যাদেশনে, শিল্পরূপে প্রাচ্য ও প্রাচ্য সভ্যতার সমন্বয়ে প্রাচীন ইরান দেখিয়েছে আশ্চর্য নৈপুণ্য।

এরপর সামানিয়ন্স যুগে আইন ও বিচার বিভাগের যথেষ্ট উন্নতি হয়। চিকিৎসা-বিজ্ঞানে, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য-শিল্পে ও দর্শনে এই সময়ে ইরান আপনার সভ্যতার আলোকে চীন, জাপান, ভারত ও প্রাচ্য জগৎকেও উদ্ভাসিত করেছে। মধ্যযুগে পারস্তের মুসলিম অধিবাসরা এই প্রাচীন ঐতিহ্যের সংগে নিম্ন শ্রেণিগত ঐতিহ্যকে জুড় করে। বিখ্যাত কবি ওমর, হাফিজ ও শাদি সেই ঐতিহ্যকে আরও সমৃদ্ধ করে গেছেন। কার্দোস্তার শাহ-নামার প্রাচীন ইরানের ঐতিহ্য-গৌরব সবচেয়ে রক্ষিত হয়েছে।

বেহিস্তন শিলালিপি, পাদিশিপিসের অপভ্রংশ স্থাপত্য-নমুনা, গাথা-সাহিত্য, 'আবেস্তার' ধর্ম-দর্শন এককালে যেমন প্রাচীন ভারত মিশর গ্রীস রোম পর্যন্ত ব্যাভিলাভ করেছিল, মুসলিম যুগেও তেমনি আরব-নাগনের সময়ে পারস্তের চিত্র-শিল্প, বিজ্ঞান, উপকথা, বাণিজ্য-সমৃদ্ধি, আর সব চেয়ে তার শ্রেষ্ঠ সম্পদ—কাব্য-সাহিত্য এবং ইতিহাস-কাহিনীর গৌরব চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল।

ধারা ভাষাতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব এবং তুলনামূলক ধর্ম ও ইতিহাসের ছাত্র, তাঁরাই জানেন, কত দিক

থেকে প্রাচীন ইরানের স্থান কোথায়। বহু পারসীক শব্দ যেমন—পেতা, পীড, প্যারাডাইস, জেসমিন প্রভৃতি কথাগুলি হুরাণীর ভাষায় প্রবেশ করেছে। আর ইরানের সভ্যতার অল্পপ্রাণিত হয়েই, আরব ও মুর বিজেতার সঙ্গে এগদিন পশ্চিমে সেন পর্বত তাদের প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়।

সব শেষে যখন রাস্তাতে হুই যে, ইরানের ওপর দিয়ে নানা বড় বয়ে গেছে, কিন্তু তার সংস্কৃতির আলোক কখনও দান হয়নি। প্রাচ্য জগৎ হ'ল প্রাচীন সভ্যতার জগৎ। প্রাচীন ইরান তারই এক বৃহৎ অংশ অধিকার করে আছে। আর ভারতের পশ্চিম প্রতিবেশী ইরানের সঙ্গে আমাদের দেশের সভ্যতা ও ইতিহাসের একাধিক সংস্পর্শ ঘটেছে।

আজব শহর

ঐগোপাল ভৌমিক

আজব শহর, আজব শহর,
নাছটি তার নাই তুললে
শোন শুধু গুণের বহর।
লম্বাতে সে মাইল দশ
এছরে পাঁচ মাইলটাক,
মাহুব-ঠামা উচ্চ বাড়ি
একটুখানি নাইকো ঠাক।
পথগুলি তার সজ সজ
একই সাথে মাহুব গজ
চলতে গিয়ে যথায় গোল,
হিষ্টি লাগে এক সাথে কি
লানাই এবং ঢাকের বোল?

টাম বাস ও মোটর গাড়ি
টাকগুলি সব ভারী ভারী
ঠেলাগাড়ি হিম্মাওরালা
একই পথে যায় বেতলা।
হাতের মাঝে প্রাণটি নিয়ে
কোনও মতে দুকপুকিরে
জীবন কাটাই, বলি বাঁচা,
শহর নয়, শাখীর খাঁচা।
নানারকম শব্দ উঠে
আঘাত করে কর্ণপুটে

দিন-রাত্রি সমান তালে।
হাত দিয়ে তাই বলি গালে;
সময় পেলে তখন ভাবি
সকল সময় খেয়ে খাবি
প্রাণটা যদি হারায় কান
মিথ্যা হবে সকল গান।

ছাঁদের পরে ছোট আঁকান
সেখা যদি যায় বায়ে মাস
খোঁয়া মগিন তার সে রূপ
মেখে মনকে শাঁসাই, চূপ!
বৃষ্টি নামে তলি না হর
বাক্সে যদি শরীর নুপুর,
বিহীন-জালা রাতের বুক
পিঁড়ার দিন রাতকে কুণে।
আজব শহর তবু থাকে
জড়ায় সেহু হুজীগকে,
ছড়ায় তার ডাল ও পালা
দূরে এ কাছে; নদী ও নালা
গুকার। একটি মরা পাছে
খব্বনাটি কেমন নাচে!
না যদি পাই সেখানে তব
শহর মাতে মহোৎসবে।



শ্রী প্রবোধ কুমার সান্যাল

পাখীটা পালিয়ে গেছে।—

তারের খাঁচাটা নতুন। ঘরগুলো মাঝারি, কিন্তু গৃহের একটি ঘরার মধ্যে দিয়ে গলে' বেরিয়ে
যাবার উপায় নেই। মাঝে মাঝে রয়েছে ঘোটা তারের ডাঁটি। ছাড়ু দেওয়া ছিল ছোট একটি
বাটিতে, অস্ত্র বাটিতে অল। খাঁচার দরজাটা তেমনি বন্ধ।

আন্ধাৰ্ধ, ছা'তুটু' নব খেয়ে গেছে। কিন্তু পালিয়েছে কি সত্যি? বিড়ালে খায়নি ত?
কিন্তু বিড়ালেই যদি ধরবে, দরজাটা বন্ধ থাকবে কেন?

তবে কি মেজলা তার ওপর রাগ করেছে? তাই বা কেন হবে? বারো আনা দিয়ে মেজদাই
ত বাজার থেকে খাঁচাটা এনে দিয়েছিল!

পাখীটা পালিয়েই গেছে।

বইখাতাগুলো একবারে রেখে মিঠু এসে দাঁড়াল খাঁচার পাশে। আন্ধাকাল সে একটু বড়
হয়েছে। পাখীর অন্তে সে যদি কীদতে বসে, তাহলে সবাই তাকে তাহাশা করবে। কুড়ি দিন ছিল
পাখীটা, মিঠু তার ক্যালেগারের তারিখে দাগ দিয়ে রেখেছে। রাজে তার ঘুম আসেনি, অন্ধ কববার
দিকে তার মন ছিল না, বিকালে বল্‌ বেলতে সে বেরোয়নি কতদিন,— শুধু পানী নিয়ে ছিল। ওই
পাখীর চোখের তিত্তর দিয়ে মিঠু 'স্বন্দর-কানন'কে দেখে এসেছে, ওর ওই ছোট ছোট কটি ডানায়
ভর দিয়ে সে নিজেও কেন কতবার আকাশে উড়ে গিয়েছে। পাখীটা ভেঙেছে কতদিন মিঠু গলায়—

বখন সেটা একা একা থাকত। কাছে গেলেই পাখী ভয় পেত, আবার দূরে গেলেই ডাক দিত। চড়াই পাখী নয়, বুলবুলি নয়,—ও পাখীটার নাম কেউ জানে না। চোখে কাল, মাথাটি কালো, পেটটা হলুদ, ডানার ডিঙরে একটু শাদা, আর পা ছুটির তাই রং। কে জানে ওর নাম। নাম বাই হোক, ডাকড ডারি মিষ্টি।

আচ্ছা, দেখি ত!—মিঠু খাচটা মারিয়ে বসে গেল। পাখীর পায়ে হুতো বেঁধে খাচার ভাঁটির লগ্নে আটকানো ছিল। আ—সাবাস! হুতোটা রয়েছে ডিঙরে। হুতো কেটেই পালিয়েছে। বন্ধ খাচার মধ্যে ব'সে-ব'সে ঠোঁটটি দিয়ে একটু একটু ক'রে হুতোটা কেটেছে সবাইকে লুকিয়ে,—কেউ দেখেনি। মিঠু গুকে ভালবেসেছিল, সকাল-সন্ধ্যায় লেখাপড়া ছেড়ে ওর কাছে সে এতদিন কাটিয়েছে, কাক-শালিক-বিড়াল—কারোকে ওর কাছেও বেঁধেতে দেখেনি, নিজের হাট আর কলা থেকে গুকে ভাগ দিয়েছে, জল দিয়েছে, ছাতু মেখে দিয়েছে,—কিন্তু অকৃতজ্ঞ পাখী! ঘিদি বলেছিল, শুধু ছাতু নয়, ওরা যে কত পোকা খায় রে? পোকা বাঁওরালে দেখবি খুব পোষ মানবে।

মিঠু ভেও-শি'গড়ে এনেছে, কড়িং ধরে দিয়েছে, কাচপোকা ধরেছে,—কিন্তু কই, এত বড় সবুও পাখীটা থাকল না ত? কুহুর হলো থাকত, বিড়াল হলো পারে পারে ঘুবত, পায়রা হলোও কোথাও বেত না, টিকটিকি হলোও ঘোয়ালে ঘোয়ালে ঘুরে এ-বাড়িতেই থাকত। কিন্তু ওই ছোট পাখী—বার বা-বাগ কোথাও কেউ নেই,—গুকে কেন পোষ মানানো গেল না? তবে কি ছোট প্রাণীরা কেউই পোষ মানে না? পোকা মাকড় কড়িং আরগোলা ব্যাঙ মেংটি ইঁদুর—এদের কি পোষ মানানো যায় না? ওরা কি তবে ভালবাসাও চায় না?

অনেক পরীক্ষা ক'রে মিঠু বেশল, খাচার মধ্যে একটামাত্র ঘরা একটু বেশ বড়। পাখীর চোখ ভীষণ ধারালো। ওই ছোট ছোট চোখে সে দেখেছে, এই ঘরাটা আর-সবগুলোর চেয়ে একটুখানি বড়, এবই মধ্যে দিয়ে তার শরীর গলে' যেতে পারবে! হুতরাও তখন থেকে সে ঠোঁট দিয়ে পারের হুতো কাটতে আরম্ভ করেছে। একটু-একটু হুতো হুঁকরেছে, একটু একটু করে কেটেছে! ওর মধ্যেই ছাতু আর পোকা আর জল খেয়েছে, ওর মধ্যেই থেকে-থেকে গান গেয়েছে,—আবার ওর মধ্যেই নিজের পলাবার পথ আবিষ্কার করেছে। ছোট পাখী বাহুব'কে বিশ্বাস করে না, ভালবাসা চায় না, খাচার মধ্যে স্থগে থাকতেও সে ভয় পায়। সে একা-একা থাকতে চায় তার নিজের জগতে,—যেদিকে ঘন নীল সবুজ হৃদয় বন, যেদিকে শাহাড় পর্বতের উপত্যকা, যেদিকে সমুদ্র নদী আকাশ প্রান্তর,—পাখী তাই পালিয়ে গেছে নিজের দেশে! পাখী আর আসবে না, আর কোন পাখীকে মিঠু এমন ক'রে আর ভালবাসবে না।

মিঠুর চোখ দুটো জলে ভ'রে উঠল। শূন্য খাচাটা খোলানই রইল।

হঠাৎ পেনসিন ভোরবেলা দিদি শুকে ডাকল,—মিঠু, শীগগির ওঠ, শীগগির,—পাখীটা এসে খাঁচার মধ্যেছে। শীগগির—

বিছানা ছেড়ে ধড়মড়িয়ে উঠে গেল মিঠু।

ছুটে বাক্সের ছানের দিকে ঘুর চোখে। না, ছানে নয়—নারান্দার, নোড়ে বাঁবে বারান্দার দিকে,—না, নোড়ে নয়—আগে আগে। বড় বাঁধা পেয়েছিল মিঠু, এবার কিরোছে পাখী, কিরোছে তার ভালবাসা! যেহেতু দাদা দিদি না টুটল—সবাই ছুটে দেখতে বাক্সের, কিন্তু মিঠু বাঁধা ছিল,—না, কেউ যেহেতু না, খুলে রেখেছি খাঁচার দরজা, আপে শুক ভিতরে ঢুকতে দাও। না, কেউ কাছে যেহেতু না।

বেউ গেল না কাছে। ঘরের থেকে উকি-ঝুঁকি বারছে সবাই। মিঠু গেল এগিয়ে পা টিপে টিপে। সবাই ভাল খেদছিল ওই পাখীকে, পাখী কিন্তু সবাইকে ঝুঁকি দিয়েছে। তবে কি আজ ভোরে মিঠুর সঙ্গে ওর মন-কেমন করেছে? মনের মনের পথ দিয়ে পাহাড়-প্রান্তর পেরিয়ে সমুদ্র নদী ভিত্তিরে তবে কি সে মিঠুর ছোট্ট খাঁচার লোভে কিরে এসেছে?

দরজার ঠাক দিয়ে একটি চোখ বাঁর করে মিঠু পাখীর দিকে তাকিয়েছিল। পাখী নাচছে খাঁচার ওপর তার নিজের আনন্দে, ডাকছে মাঝে মাঝে মধুর কর্কে। সেই হলুদ রং, সেই বালোবর্ণ মাথাটি, সেই তামা-রংয়ের পা,—মিঠুর একান্ত চোখে জল এসে পড়ল। পাখী নাচছে, বেকছে, তুলছে, ল্যাঙ্গ ঘোরাচ্ছে, ডাকছে,—ছোট পাখী সব বাহুধকে হার মানিরে খাঁচাটাকে কলা পেয়ে পালিয়েছে। আজ এসেছে যেন বিজয়ীর চেহারা নিয়ে,—সবাইকে যেন বিজয় করবার জন্ত এসেছে।

আরেকটু, আরেকটু,—যদি খাঁচার একবারটি ঢোকে। হ্যাঁ, খোলাই আছে খাঁচার দরজা! আছে ভিতরে ছাতুর সেই শুকনো বাট, একটু একটু ছাতু বাটটার গায়ে লেগে আছে—সেই লোভে যদি একবারটি ভিতরে ঢোকে।

পিছন থেকে পা টিপে দিদি চুপি চুপি বললে, ওই ঝাধ—ওই ঝাধ ঢুকছে! ঢুকছে। দরজাটার কাছে এসেছে! ওই—ওই—ওই ঢুকল। শীগগির—

বিহ্বল গতিতে মিঠু ছুটে গেল খাঁচার দিকে। বা! জুড়ু ক'রে বেরিয়ে পালান। বাবার লোভ ছিল, কিন্তু পালানোর পথের দিকে চোখ ছিল তার প্রথর।

পালান উত্তর দিকে। কিন্তু একটি পলকমাত্র। তৎক্ষণাৎ মিঠু ছুটল। বারান্দা ছাড়িয়ে দাঁড়িয়ে লাফ দিয়ে নীচের তলায় দরজা পেরিয়ে পথে নেমে মিঠু ছুটল। জামপাচটা ভিত্তিরে পেরানো গাছটার ভিতর দিয়ে ইত্থল বাড়ির ছাদ পেরিয়ে পাখী উড়ে গেছে বকশিদের বাগানের দিকে। মিঠু ছুটল। ঘড়ি কেটে গেলে যেমন সেইদিকে চোখ রেখে ছুটতে হয়, মিঠু তেমনি ছুটল।

অনেকক্ষণ ছুটতে ছুটতে অনেক দূর গিয়ে মিঠু বা হাতে নিজের চোখের জল মুহূল। পাখীকে সে কেমন করে ধরবে? তা'র কি ডানা আছে? কেন সে এতক্ষণ ছুটছিল অসম্ভবের পিছনে? লোকে যে তাকে পাগল বলবে! সে তা'র গায়ের জোরে ছুটে এইটুকু ম'জ্ঞ এসে হাঁপাচ্ছে, আর পাখী যে সমস্ত আকাশের মালিক! এত বড় যে এরোপ্লেন, তা'র জোরই বা কতটুকু? একটি ছোট পাখীর ডানার তা'র চেয়ে অনেক বেশি জোর! হাতের মুঠোর মধ্যে টিপলে যে-পাখী দম আটকে মরে যায়, সেই পাখী যে সমস্ত আকাশকে দখল করে রয়েছে!

মিঠু ধমকে পাড়াল। চোখ বেয়ে তার জল পড়ছে, কপাল বেয়ে তার ঘাস করছে। পাখী তাকে হার মানিয়ে চলে গেছে। কিন্তু কোথায় যে গেল, আর দেখা বাচ্ছে না। মিঠু চারিদিক তাকাতে তাকাতে এবার বাড়ির পথ ধরল।

তার চেয়ে ভাল, পাখী যদি নিজের থেকে আবার আসে। খাঁচার দরজা খোলা থাক,—যদি এনে আবার ছাড়ু যায়। বনের পাখীকে খাঁচার বেঁধে লাভ কি? যার চোখ থাকবে বনের দিকে, মন পড়ে থাকবে আকাশে,—তাকে গায়ের জোরে বেঁধে রাখলে খাঁচার মধ্যে সে শুকিয়ে মরবে, কিন্তু কোনদিন পোষ মানবে না।

পায়রাহা স্বপ্ন চায় বলেই লোকের বাড়ির কোঠারে থাকে আর বকবকম করে, ছোট পাখীরা চায় মুক্তি আর স্বাধীনতার আনন্দ।

ছোট পাখীই ভাল। হামিমুখে মিঠু বাড়ি ফিরে এল।

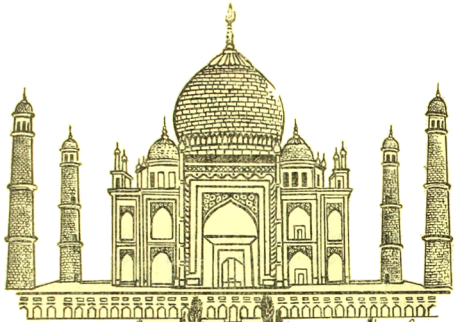
ভোমল

ঐশ্বর্যসুখ চট্টোপাধ্যায়.

ও বাড়ির বাগী তিনি
বান বড় কানী-চিনি,
গন্ধেশও বাসি তিনি
খেতে বড় পোক্ত।
খাওয়া আর কেল। তাঁর
সারাদিন খেলা তাঁর,
রাঁধতে যে বেলা তার
জুড়ি তাঁর হুজো।

সেবারে আধিনে
গন্ধের হাট চিনে
আনলেন আর কিনে
করবেন অফল,
এলো তাঁর নাভনীরা
মায়া-মীমা মন্দিরা
আর এল সঙ্গেতে
ইরা কালো ভোমল।

ভোমল কেউ নয়
এক যে সুকুর হয়,
জানা গেল সেটা নাকি
নিরামিষ শুভ্র,
একদিন খেতে খুঁচে
পড়ল ছুঁচোখ বুঁজে
খেয়েছিল নাকি খুঁজে
বাগীমার হুজো!



গড়মহলের রহস্যলকার

শ্রীহেমেন্দ্র কুমার রায়

সমুদ্র বে এক অসাধারণ দৃষ্ট, তাকে স্বচক্ষে দেখাবার আগেও তার ছবি দেখে ও বর্ণনা পড়ে বুঝতে গেরেছিলুম অনায়াসেই। মনে মনে শোষণ করতুম এক বিরাটের কল্পনা।

কিন্তু প্রথম যৌনে যেদিন সমুদ্রকে স্বচক্ষে দেখবার সুযোগ লাভ করলুম, সেদিন ছোট হয়ে গেল আমার কল্পনার বিগাটও। চমৎকৃত মন বললে, বিরাটও যার কাছে ক্ষুদ্র হয়ে যায় সমুদ্র হচ্ছে তাই। হার মানলে আমার কল্পনাও।

তবে সমুদ্র হচ্ছে অসাধারণ প্রাকৃতিক দৃষ্ট। ক্ষুদ্র মাহুকের হাত নেই এর মধ্যে। তার কাছে যে কল্পনাও থই পাবে না, এটা কিছু আশ্চর্য কথা নয়।

কিন্তু তাজমহল? সে তো অসম্ভব করেছে ক্ষুদ্র মাহুকের হাতেই। ছেলেবেলা থেকেই

তার ছবি দেখেছি, কেভাবে তার কথা পড়েছি, লোকমুখে তার কাহিনী শুনেছি। এই সব যথেষ্টমাত্র তাকে নিয়েও আমার মন অনেক কিছু কল্পনা করত।

সবাই বলে কল্পনার গতি অপ্রতিবন্ধ। কিন্তু যেনি গোখের সামনে এই তাজমহলকে, এই অস্বাভাবিক ভাৱে যৌন বহোৎসবকে, আকাশনীলিমার তলায় একটি স্বপ্নলব্ধ রূপোদ্ভূত বস্তু হুটে উঠতে দেখলুম, সেদিনও হাত না বেঁধে পারিনি আমার সঙ্গীত কল্পনা। তার লঘুতার মধ্যে পাওয়া যায় এক বায়বীয় শিল্পনৈপুণ্য, তার শিলাপটে হাত রেখেও বিশ্বাস হয় না তাকে স্পর্শ করছি।

তাজমহলকে নিয়ে অনেক লেখালেখি, অনেক তর্কাতর্কি হয়ে গিয়েছে। এদিকের কোন বাহাদুরি যেখানেই ঘরোয়া মাঝি ক'রে বসে তার উপরে। এক্ষেত্রেও সেই চেষ্টা হয়েছে ব্যর্থব্যর্থ।

কিন্তু সেই সব কচকচানি নিয়ে আমাদের আলকের আলোচনা নয়। তাহলে স্থপতি ও পরিকল্পক কে—তুর্কী এনা এক্কেমী, কিংবা অন্য কেউ? এখানে সে প্রশ্নও অব্যাহত।

তাহলে প্রধান পৌরব হচ্ছে তার স্থাপত্যশিল্প। কিন্তু তা ছাড়াও তাহলে আর এক পৌরব আছে এবং তা হচ্ছে তার মণ্ডন-শিল্পতা অলঙ্কারণ।

একটা কিছু ভিতরে আর একটা কিছু খচিত বা বিস্তৃত করে শিল্পীরা নিজেদের স্থপতি হাতের কাঁজ দেখান। যেমন মুক্তাখচিত স্বর্ণালঙ্কার। এই প্রেণীর কাছকে ইংরেজিতে "inlay work" বলা হয়। প্রকৃতির মধ্যেও এর স্বাভাবিক দৃষ্টান্ত দেখা যায়—যেমন তাবকাখচিত আকাশ।

তাজমহল স্থপতির অনেককাল আগে থেকেই ভারতীয় শিল্পীরা যেতপাথরের ভিতরে মূল্যবান বস্তুরাজী বসিয়ে নতুন করে শিল্পকৌশল আহ্বিত করত। এ প্রেণীর শিল্পপদ্ধতি পারস্যদেশে থেকে ভারতে এসেছিল এবং প্রাচ্যের অন্তান্ত দেশেও ঐ পদ্ধতির চলন ও জনপ্রিয়তার প্রমাণ আছে।

তাজমহলও এই প্রেণীর খচিত বা অধনিবদ্ধ শিল্পকর্মে অস্ত্রে বিখ্যাত। কেবল তাজমহলে নয়, সাক্ষাহানের আমলে আগ্রা ও শিল্পীর জুর্গপ্রাসাদের মর্মর-গাত্রেও ঐ খচিত-শিল্পের অঙ্গন নমুনা দেখা যায়। কিন্তু ভারতে প্রচলিত পূর্বতন খচিত-শিল্পের সঙ্গে তাজমহল প্রকৃতির অলঙ্কারণের বিশেষ কোন মিল নেই, কারণ সেখানে কেবল শিল্পের পরিবর্তন কেবল বিভিন্ন নমুনা, নিশ্চিতরূপে উন্নততর।

বিশেষজ্ঞগণ প্রমাণ করেছেন, মধ্যযুগের প্রখ্যাত শিল্পনগরী ফোরেন্স থেকে ভারতে এসেছে এই বিশেষ প্রেণীর মাজিত পরিকল্পনা।

ফোরেন্স হচ্ছে এক বিশ্বকর শিল্পনগর। কেবল শিল্পে নয়, সাহিত্যে ও লক্ষ্যভেদে তার অবদান পৌরবয় এবং পাশ্চাত্য-সাহিত্য ও ললিতকলা নবজন্ম লাভ করেছিল প্রধানতঃ তারই কোলে। তাই ইংরেজ কবি শেলী তাকে "স্বাভাবের পরিভাষ্য পৌরবের পালকিত্রী ধাত্রী" বলে বর্ণনা করেছেন। এবং এ বিষয়ে সব বিক গিয়ে সাহায্য ক'রে ইতিহাসে অমর হয়ে আছে মেডিচি পরিবার।

বংশাশ্রমে সাহিত্য, সংস্কৃতি ও বিভিন্ন ললিতকলার অহুয়ানী ও পৃষ্ঠপোষক এমন পরিবার পৃথিবীতে আর দেখা যায়নি। তাঁরা প্রথমে ছিলেন ধনপতি এবং ক্রমে হন স্কোরেলের শাসন-সম্ভাষণ ও দর্শনে যে দার্বৈচৌম নৃপতি। তাঁদের মধ্যে ভালোমনা, হুচরিত্র ও সুচরিত্র এবং প্রজা-পালক ও প্রজাপীড়ক দুই শ্রেণীর লোকই দেখা নিয়েছেন বটে, কিন্তু এক বিষয়ে দেখা গিয়েছে তাঁদের সকলেরই একমত্যা ও প্রকৃতিগত দাদৃত্ব। তাঁদের প্রত্যেকেই ছিলেন ললিতকলার একান্ত অহুয়ানী ও শিল্পীরাবীর পৃষ্ঠপোষক। আজ তাঁদের বংশ বিলুপ্ত হয়েছে, কিন্তু তাঁদের প্রাণাঙ্গ হয়ে আছে শিল্পীরাবীদের তীর্থের মত। যেতিহিরের গ্রানাদার পায়ে এই কথাগুলি উৎকীর্ণ আছে :

“পথিক! একদিন যেতিহিরা বাস করতেন এই ভবনে। এ কেবল শ্রেষ্ঠ মনীষীরাবীরই নয়, এ ছিল জ্ঞানবিজ্ঞানের নিজস্ব বসতি। এ ছিল তাবৎ বিজ্ঞান ধাত্রীর মত এবং এখানেই পুনরুজ্জীবিত হয়েছে শিক্ষা-ব্রত। মাক্তব সনুদ্বির অন্তে প্রখ্যাত এই ভবন এবং এ হচ্ছে পুরাতত্ত্বাণার ও চাককলার ভাণ্ডার।”

যেতিহিরেশ্বর দ্বিতীয় ফাদিনান্স (১৬২০-১৬৭০ খ্রীঃ) যখন স্কোরেলের রাজা, তখন ঐ বংশের পতন শুরু হয়েছে বটে, কিন্তু তার শিল্পচর্চা চরছে পূর্ণোৎসাহে। নানা শ্রেণীর উচ্চযের শিল্পী ফাদিনান্সের কাছে আশ্রয়লাভ করেছিলেন। তাঁদেরই মধ্যে অস্ট্রিন ভি-বোভিয়ার্স নামে এক ফরাসী শিল্পী ছিলেন, খচিত বা অঙ্কনবিদ শিল্পকর্মে বিনি অল্পম গুণপনা প্রকাশ করতেন। যারা এই শ্রেণীর কাজ করেন ইতালীতে তাঁদের *pietra dura* শিল্পী বলে ডাকা হয়। বোভিয়ার্স ঐরকম অঙ্কনবিদ শিল্পকর্মে রীতিমত দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। বৈদূর্ঘ্যমণি বা নীলোৎপল, রক্ত-পীত ও কপিশবর্ণ ফটিকমণি, গোমেথ বা পদ্মকর্মণি, মুহুরতিম ও রক্তাভ্যবল নীলমণি, গাঢ় হরিণা রক্তপাষণ, কণোভরক্তবর্ণের পদ্মরাগ, নীলকান্তমণি ও গোখরাজ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের মহামুগ্ধ প্রস্তর ছিল তাঁর কাছে গহুয়ার বিবিধ রঙের মত। পুষ্পগতার যেখানে বা স্বাভাবিক বর্ণ, মর্মরশিলা বা অস্ত্র কুচুর উপরে সেখানে গেই রঙের স্থান্যবান প্রস্তরখণ্ড বসিয়ে (বা খচিত করে) তিনি নিজের পরিকল্পনা কুটিলে ভুগতেন।

১৬৪৮ খ্রীঃ স্কোরেলের রাজকীয় শিল্পশালার প্রযোজনে ফাদিনান্স কয়েকজন বিভিন্ন শিল্পীকে সারতবর্ষে প্রেরণ করেছিলেন এবং তাঁদের মধ্যে ছিলেন ফরাসী শিল্প বোভিয়ার্সও। যোগলদারাজা তখন উন্নতির চরম পিথরে উঠেছে এবং স্থাপত্যভগ্নপটে বিশ্ববিস্তৃত সম্রাট লাক্সান টিক সেই সময়টিতে নিজের কবিত্বময় বিরাট কল্পনাকে সঙ্কটিক-মিয়ে নিখুঁত ও শ্রীমন্ত ক’রে তুলে বাস্তবে পরিণত করার অন্তে নানা শ্রেণীর ওস্তাদ-শিল্পীর সন্ধান করছিলেন বেশখিমেমে। কোন্‌ হুন্নে ও কার দ্বারা টিক জানা বেই, সম্রাট উক্ত ফরাসী শিল্পীর সঙ্গে পরিচিত হলেন এবং তাঁর কৃতিত্বের পরিচয় পেয়ে তাঁরই হাতে মিলেন নির্মাণ কাজবহলকে অলঙ্কৃত করার ভার। এই

অপূর্ব বোণাবোণের ফলেই অবিভীত বৃত্তিসৌধ তাঁহের অমান শুভতার অঙ্গ:পূরে দিকে দিকে ছুটে ওঠে বর্ণবৈচিত্র্য ও দীপ্তিমান ঈশ্বরচিত পুষ্পলতার আভরণ।

শিল্পনৈতিক স্ফাট এই ফরাসী শিল্পীর কাজ দেখে এতটা মুগ্ধ হ'লেন যে, আর তাঁকে ছেড়ে যিলেন না এবং প্রকৃত পারিশ্রমিকের বিনিময়ে নিজের কাজই নিযুক্ত রাখলেন। মনের মত আদর, অত্যাশ্রয় ও দক্ষিণা পেয়ে শিল্পীও সাগরশাষের কথা ভুলে গেলেন এবং মুক্তহস্ত সম্রাটের ইচ্ছা বা আদেশ অহুসারে আগ্রা ও দিল্লীর দুর্গপ্রাসাদে ও কক্ষে কক্ষে ভিত্তিগোজে দরাজ হাতে ছড়িয়ে দিতে লাগলেন রক্তে গ্রথিত ফুল-ফুলহার—চারিদিকে জগতে লাগল নিঃশব্দ মর্মরের ঠাণ্ডা সিত্তিমার বৃক্ক নয়ন ভুলানো নিখর রঙের আগুন।

তাজ এবং আগ্রা ও দিল্লীর স্থাপত্য-সৌন্দর্যই কেবল চিত্তকে অতিক্রম করে না, সেই সঙ্গে স্বেচ্ছা শিল্পীর হাতে গড়া এই ফুলদার আভরণ দেখেও নয়নমন হয় চমৎকৃত। কিন্তু কয়েক শতাব্দী পরে আজ তার পূর্বসৌন্দর্য কতখানি বজায় আছে তা বলা যায় না, কারণ আগে যা ছিল ঐশ্বর্যপূর্ণ সৌন্দর্যের দুর্লভ রত্নাভরণ, আজ তা ঘরে পড়েছে শুধুই সাধারণ আভরণ! মোগল রাজশক্তি বধন অংশভিত্ত, তখন তার চরম অসহায়তার হযোগ এহণ করেছে লোভী দস্যুর বল—বাদের চক্রে কোমলিন দেখে না রূপের স্বপ্ন। এসেছে জাঠ, এসেছে পাশী, এসেছে আকগান এবং আরো অনেকই। দিল্লী ও আগ্রায় বার বার চলেছে তাদের নিষ্ঠুর লুণ্ঠনকার্য এবং সেইসঙ্গে নৃশিঙিত হয়েছে সৌধমালার সমস্ত মহার্ঘ্য রত্নালঙ্কার। তারপর বহুদিন পর্যন্ত তাজমহলে ও ঐ দুই দুর্গপ্রাসাদে ফুলদার রত্নহারের চিত্রমালা ছিল না। অবশেষে ইংরেজরাজের আমলে লর্ডকার্জনের ইচ্ছা ও অহুসাহে রত্নাহকারী সম্রাটের টুকরো বসিয়ে অভুলনীর শিল্পীর রত্নময়ী পরিকল্পনাকে বখাশস্তব পুনরুদ্ধার করবার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু মকল দিয়ে কি আগলকে ঠিকমত ধোঁয়ানো যায়?

কেবল দিল্লী ও আগ্রার দুর্গপ্রাসাদের অলঙ্করণ নয়, সম্রাটের নির্দেশে বোভিভান্স আর এক অসামান্য শিল্পকৃতি নিয়ে নিজেকে নিয়োজিত রাখলেন। তা হচ্ছে পৃথিবী বিখ্যাত ময়ূর সিংহাসন। তার সমগ্র পরিকল্পনা ই ফরাসী শিল্পীর। রাশি রাশি হীরার মরকত, পোখরাজ ও পদ্মরাজ দিয়ে গঠিত হয়ে সেই অনন্তসাধারণ সিংহাসনটি একসঙ্গে প্রকাশ করত অদ্ভুত সৌন্দর্য ও প্রকৃত ঐশ্বর্য। সিংহাসনের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল যে জীবাশ্মের মত দেখতে ময়ূরমূল। তাদের সমস্তটাই বচিত হয়েছিল বহুবর্ণবিশিষ্ট রত্নামূল্য প্রস্তর দ্বারা। কিন্তু সে সিংহাসন কেড়ে নিয়ে গেছে পাশী লুটেরা নাদির শাহ এবং তারপর অস্ত্র দ্রুতকারীদের কবলে পড়ে লুপ্ত হয়েছে তার অস্তিত্ব পর্যন্ত। কেবল ফরাসী চিকিৎসক বানিয়ার অচক্ষে দেখে তার সুদীর্ঘ এক বর্ণনা রেখে গিয়েছেন।

বোভিভান্সের শেখ-জীবন সুখের হয়নি। সম্রাটের প্রিয়পাত্র বলে তিনি হয়েছিলেন কোন কোন হিংস্র লোকের চক্ষুশূল। বিধগ্নরোগে তাঁকে হত্যা করা হয়। তেমন রক্ত-রঙে চিত্রলেখার নবীর তারপর আর নম্বরে পড়েনি।

খেলোয়াড়দের খবর

মেরুডে

আই. এফ. এ. শীল্ড কাইনালে
মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল।

সারা ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ ফুটবল প্রতিযোগিতা আই. এফ. এ. শীল্ডের কাইনাল খেলা গত ২৬ সেপ্টেম্বর মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের এম্বাসী মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। দীর্ঘ সাত বছর পরে আই. এফ. এ. শীল্ড কাইনালে এই চির প্রতিদ্বন্দী মল দুটি আবার মিলিত হয়, সুতরাং সেদিন মাঠে কী রকম দর্শক জমায়েত হয়েছিল তা কাউকে বুঝিয়ে বলার দরকার হয় না। এর আগে আরো চারবার এই মল দুটি শীল্ড কাইনালে মিলিত হয়েছিল, কিন্তু এবারকার খেলা সম্পর্কে উল্লিখিত মল দুটির সমর্থকদের ভেতর যে রকম আগ্রহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছিল এরকম উৎসাহ ও উল্লাসের তাৎপর্য আগে দেখা যায়নি। খেলা শুরু হবার বহু আগে থেকেই দর্শকদের বহু ভর্তি হয়ে যায়। খেলাটি শেষ হয়েছে অদ্বিতীয়ভাবে। উভয় পক্ষই একটি করে গোল দেয়। ভারতব্যবহার বিচারে সেদিন মোহনবাগান মলই ভালো খেলে এবং এ দিনের খেলায় মোহনবাগানই সব প্রথম গোল দেয়। ফুটি মিনিটের সময় চুনী গোখরায্য পাশ থেকে এম. ব্যানার্জি তৎপরতার সঙ্গে কোণাকুনি সট দিয়ে গোলটি দেন। গোলের আনন্দক্ষণি বেলাতে না বেলাতে হাসান হু থেকে গোলের মুখে বল পাঠান। কেম্পিরা ভেলির সাহায্যে বল কেহাতে গিরে আশ্বাঘাতী গোল করেন। এরপর উভয় পক্ষই আরো গোল দেবার স্বযোগ পেয়েছিল, কিন্তু সে স্বযোগ তারা কেউই নিতে পারেনি।

শীল্ড কাইনালে অদ্বিতীয়ভাবে খেলা

আই. এফ. এ. কর্তৃপক্ষ শীল্ডের কাইনাল খেলা

কবে হবে তার দিন স্থির করতে না পারার জন্য ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সম্পাদক শ্রী জে. সি. গুহ পত্রিকা মাধ্যমে জানিয়েছেন যে, ডি. সি. এর কাপে খেলার ক্ষেত্রে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব আগামী ৮ অক্টোবর মিলি রওনা হবে। মিলি থেকে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব রোটার্স কাপ খেলার ক্ষেত্রে বোম্বাই যাবে এবং বোম্বাই-এ রোটার্স কাপের খেলার শেষে ডুরাও কাপে খেলার ক্ষেত্রে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব আবার মিলিতে যিরে আসবে। সুতরাং আগামী ডিসেম্বরের আগে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের পক্ষে আই. এফ. এ. শীল্ডের কাইনালে খেলা কোনো হতেই সম্ভব হবে না।

মিহির সেনের ইংলিশ চ্যানেল অভিক্রম

পাঁচবার ব্যর্থ হবার পর কলকাতার সাতাশ বছরের আইনজীবী শ্রীমিহির সেন গত ২৭ সেপ্টেম্বর ইংলও থেকে ফ্রান্স অভিমুখে ইংলিশ চ্যানেল সমুদ্রপথে সফর করেছেন। এবছর আরো দু'বার এবং তার আগে আবার তিনবার চ্যানেল সমুদ্রপথে শ্রীসেন ব্যর্থকায় হয়েছিলেন। চ্যানেল পার হতে শ্রীসেনের ১৪ ঘ. ৪৪ মিনিট সময় লেগেছিল। ভারতবাসীর মধ্যে শ্রীমিহির সেনই সর্বপ্রথম চ্যানেল অভিক্রমে সফর হলেন। সীতারুদ্রা সাধারণতঃ ফ্রান্সের উপকূল থেকে ইংলওর উপকূল পর্যন্ত ইংলিশ চ্যানেল সমুদ্রপথে ব্রতী হন। ইংলও থেকে ফ্রান্স পর্যন্ত চ্যানেল অভিক্রম কঠিন। এর আগে ভারত তথা এশিয়ার কোনো সীতারুদ্র ইংলও থেকে ফ্রান্স পর্যন্ত চ্যানেল অভিক্রম করেননি। অধ্যবসায়ী শ্রীসেনের এ সাফল্যে সমস্ত ভারতবাসীই গৌরব বোধ করবেন। শ্রীমিহির সেনকে আশাধের অন্তরের লজ্জা জানাই।

চ্যানেল সুইমিং-এর প্রস্তুতি

চ্যানেল সুইমিং-এর প্রস্তুতি নইশেবে ভারতের অলিম্পিক দাঁড়াক ডাঃ বিমল চন্দ্র আত্মা হিন্দু বাগে তাঁর অংশীদার শুরু করেছেন। প্রথম দিন ডাঃ চন্দ্র একটানা ৬ ঘ. ৫৫ মিনিট দাঁড়িয়ে ১১ মাইল অতিক্রম করতে সমর্থ হন। আত্মা হিন্দু বাগের সেন্টাল সুইমিং ক্লাবের সীমানাটি তিনি ৩০ বার অতিক্রম করেছিলেন। তিনি প্রথম মাইল ৩১, দ্বিতীয় মাইল ৩২, তৃতীয় মাইল ৩৩ মিনিটে এবং শেষ ৫০ মিটার ৩১ সেকেন্ডেও অতিক্রম করেন।

ইলিয়ট শীল্ড বিজয়ী সুরেন্দ্রনাথ কলেজ

গত ১৫ সেপ্টেম্বর ইস্টবেঙ্গল মাঠে গত বছরের ইলিয়ট শীল্ড বিজয়ী আন্তোভাথ কলেজকে সহজেই ৩-০ গোলে হারিয়ে দিয়ে সুরেন্দ্রনাথ কলেজ এই বছর ইলিয়ট শীল্ড লাভ করেছে। এই দিনের ফাইনাল খেলায় সুরেন্দ্রনাথ কলেজ প্রথমার্ধেই তিনটি গোল দেয়। বিস্তারের পর একটানা আক্রমণ চালিয়েও সুরেন্দ্রনাথ কলেজ আর কোনো গোল দিতে পারেনি। বিজয়ী দলের সেন্টার ফরওয়ার্ড এল. রাই একাই তিনটি গোলের দ্বিটি গোল দেন।

হেরাথ মৈত্র শীল্ড বিজয়ী

বিজ্ঞানাগর কলেজ

গত বছরের অধ্যক্ষ হেরাথ মৈত্র শীল্ড বিজয়ী আন্তোভাথ কলেজকে এক গোলে হারিয়ে দিয়ে বিজ্ঞানাগর কলেজ ছ-বছর পর আবার হেরাথ মৈত্র শীল্ড লাভ করল। গত ২২ সেপ্টেম্বর বিবিডাল মাঠে আন্তোভাথ বনাম বিজ্ঞানাগরের ফাইনাল খেলা অহুষ্ঠিত হয়। খেলা শেষ হবার সাত মিনিট আগে বিজ্ঞানাগর কলেজের এল. নন্দী ফরওয়ার্ড গোলটি করেন।

ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড

ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের বার্ষিক সাধারণ সভার শ্রী আর. প্যাটেল ও শ্রীমালী অমরনাথ বধাক্রমে বোর্ডের নতুন সভাপতি ও নির্বাচন কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন।

শিক্ষার্থীদের সম্মুখে ডাঃ পেলজারের উদ্দেশ্য

কর্মসূচী আর্থলেটিক কোচ ডঃ অটো পেলজার ভারতীয় ছাত্র এ্যাথলেটদের সম্মুখে মন্তব্য করেছেন যে, পাঠ্যক্রমের ছাত্র মহলের কয়েকজনকে তিনি প্রকৃত সভাবনাময় এ্যাথলেট বলে মনে করেন। রাজকুমারী ক্রীড়া-শিক্ষণ কমিটি নিম্নলিখিত কোচ ডঃ পেলজার আট মাসের অল্পে কোচ হিসেবে নিযুক্ত হয়ে ভারতে এসেছেন। ইতিমধ্যে তিনি দিল্লী ও পাঠ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের অল্পে শিক্ষা কেন্দ্র পরিচালনা করেছেন। তিনি কলকাতা ও আদিলগড়ে কলেজের ছাত্রদের এবং দিল্লিতে কেন্দ্রীয় শিক্ষা শিবিরে বাছাই এ্যাথলেটদের শিক্ষা দেবেন।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট দলের

ভারত সফরের ক্রীড়া-সূচী

ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের ভারত সফরের ক্রীড়া-সূচী সম্প্রতি আমাদের হাতে এসেছে। বিজ্ঞান সফর-তালিকা নীচে দেওয়া হল—

প্রথম টেস্ট। বোম্বাই। ২৮—৩০ নভেম্বর ও ২—৩ ডিসেম্বর।

দ্বিতীয় টেস্ট। কানপুর। ১২—১৪ ও ১৬—১৬ ডিসেম্বর।

তৃতীয় টেস্ট। কলকাতা। ৩১ ডিসেম্বর, ১ ও ৩—৫ জানুয়ারী।

চতুর্থ টেস্ট। মাদ্রাজ। ২১—২২ ও ২৪—২৬ জানুয়ারী।

পঞ্চম টেস্ট। দিল্লী। ৬—৮ ও ১০—১১ ফেব্রুয়ারী।



নতুন বই



(নবালোচনার অন্তর্ভুক্ত বই পাঠ্যবসন)

প্রাণী ও প্রকৃতি—ঐবিমলাপ্রদায় মুখো-
পাধ্যায়। বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ,
১৪ বরিশ চাট্‌জো স্ট্রিট, কলিকাতা ১২ হইতে
ঐশীপ্রদায় মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত।
মূল্য ২।০

প্রাণী ও প্রকৃতি নিয়েই আমাদের পৃথিবী।
যেমন বৈচিত্র্যে ভরা এই প্রাণীজগৎ, তেমনি
প্রকৃতির মধ্যেও বিশ্বের অব্যবহিত নেই। নানা
ধরনের লেখায় সিদ্ধান্ত বিমলাপ্রদায় কয়েকটি
প্রাণীর জীবন নিয়ে ও কিছুটা প্রকৃতি সম্বন্ধে
গল্পগুলে হৃদয় করে এই বইখানি লিখেছেন। সব-
স্বচ্ছ আটটি বিভিন্ন ধরনের প্রবন্ধ আছে এর মধ্যে।
প্রথম 'প্রকৃতির বিস্ফোরণ', তারপর পর পর
আছে—'অতল তলে', 'প্রাণীদের অস্ত্রশস্ত্র',
'জীবের চন্দ্রবেশ', 'সম্মুখ', 'সাপের লড়াই',
'ডিনোসোর্স', ও 'প্রায়-মানব' প্রভৃতিগুলি।
প্রত্যেকটি প্রবন্ধই বিজ্ঞানসম্মত এবং প্রত্যেকটির
সঙ্গে ছবি থাকার ব্যবস্থাগুলি আরও স্পষ্ট ও
আকর্ষণীয় হয়েছে। ছাপা, কাগজ ও বীথাই
মনোহর।

—

লাল জুতো ইত্যাদি গল্প—চাল আওয়ার-
দন। ঐবিমলাপ্রদায় মুখোপাধ্যায় অনূদিত। চরন,
১৪৩ রাণবিহারী এডিনিউ, কলিকাতা ২০ হইতে
ঐরজন রায় কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ২।০

হাল ক্রিস্টিয়ান আওয়ারদন রসকথার রাজ্যে
পৃথিবী বিখ্যাত। তার লেখা মৌলিক গল্পগুলির

মধ্যে অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়ে
গেছেন তিনি। অন্তান্ত লেখা, যথা—নাটক
কবিতা ও উপন্যাসও লিখেছেন বটে আওয়ারদন,
কিন্তু ছোটদের জন্য লেখাগুলিই তাঁকে চির-
স্মরণীয় করে রেখেছে। এই গল্পগুলি থেকে বাছা
বাছা গল্প নিয়ে এই অল্পবয়স-গ্রন্থ প্রকাশ
করেছেন লেখক। এর লেখার হাত মিষ্টি এবং
ভাষা পরিষ্কার। ছাপা ও কাগজ ভাল; কয়েক-
খানি ছবিও আছে ভিতরে। গল্পগুলি পড়ে
তোমরা সকলেই খুশি হবে।

—

গ্রিম-এর রূপ কথো—ঐবিমলাপ্রদায়
চৌধুরী। ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, ১ স্কটল্যান্ড
স্ট্রিট, কলিকাতা ১২। মূল্য ২।০

জার্মান গ্রিম ভ্রাতৃদ্বয়ের নাম ছেলেবুড়ো
সকলেরই মুখে মুখে। এই দুই ভাইয়ের মধ্যে
বড়োর নাম ছিল জেকব গ্রিম, এবং ছোটের নাম
উইলহেম গ্রিম। অল্পবয়স থেকেই তাঁরা রসকথার
গল্প সংগ্রহ করতেন। এই গ্রিম ভাইদের গল্পের
সংগ্রহ থেকে মটি গল্প নিয়ে প্রথম খণ্ড প্রকাশিত
হয়েছে, পর পর আরও কতকগুলি খণ্ড প্রকাশিত
হবে। ছোটদের লেখার যে লেখকের হাত আছে
তা অল্পবয়স এই গল্পগুলি পড়লেই ধরা যায়।
হৃদয় লেখার সঙ্গে বিখ্যাত শিল্পী পূর্ণ চক্রবর্তীর
আঁকা ছবিগুলি মিশে রান্ধবোটক হয়েছে।

—



প্রাথমিক পাঠ্য

শ্রীননীগোপাল চক্রবর্তী

খুঁজে বের করতে পার ?



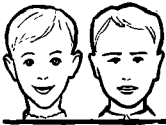
হাল খুঁড়ো

(১) হাল খুঁড়োর মাথায় আছে বরফির মত দাগকাটা এক মঝার টুপি। মুখখানা তাঁর গভীর। গলায় গলা বন্ধ, দু'দিকে কান থেকে গলা পর্যন্ত ঢাকা, দুটি নিচের দিকে ছবি একে দেওয়া হ'ল একটা। এর মধ্যে তাঁকে খুঁজে বের করতে পার ?

কেমন লোক বলতে পার ?

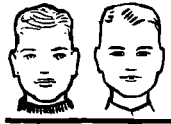
(চেহারা থেকে প্রকৃতি)

(২) গণ্ডিতেরা মাঁহুকের মাথা, চুল ও মুখের আকৃতি দেখে অনেক সময় তাদের প্রকৃতি কেমন তা বলতে পারেন।



(১)

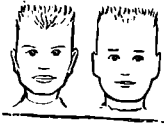
(২)



(৩)

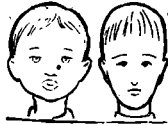
(৪)

এখানে আট জন বিভিন্ন বয়সের লোকের মাথা ও মুখের আকৃতি দেখানো হয়েছে।



(৫)

(৬)



(৭)

(৮)

তোমরা আনাজ ক'রে বলতে পার কি না দেখ তাদের কেমন স্বভাব। উত্তরটা পরের পাতার দেওয়া গেল। এবার মিলিয়ে দেখ, তোমাদের ধারণা ঠিক হ'ল কিনা।

উত্তর

(১) ছবিটাকে উল্টিয়ে ধরলেই হাকখড়োকে পাওয়া যায়।

(২) ১ম ব্যক্তির স্নায়ুহর্বগতা আছে। ইংরেজিতে শুকে 'নার্ভাস' বলা যায়। কোনও কঠিন কাজ কি গোলমালে ব্যাপারে পড়লে এ ঘাবড়ে যেতে পারে।

২য় ব্যক্তি ভাবপ্রবণ। ইংরেজিতে শুকে 'সেন্টিমেন্টাল' বলা যায়। হঠাৎ কোন কিছুতে গুর আঁতে বা লাগতে পারে। হঠাৎ উদ্বেজিতও হ'য়ে উঠতে পারে সে।

৩য় ব্যক্তি বিশ্বাসপ্রবণ। কোন কিছু হবে কিনা বা করা যাবে কিনা সে বিষয়ে তার সন্দেহ নেই। ইংরেজিতে শুকে বলা হয় 'ভাস্‌ইন'। সব কিছুতেই তার বিশ্বাস—করা যাবে বা ঘটবে।

৪র্থ ব্যক্তি কাজে চটপটে নয় মোটেই। এ ব্যক্তি কাজ করে, কিন্তু একদিনের কাজ তিন দিনে।

৫ম ব্যক্তি রাগী। এ ব্যক্তি গিটেগিটে এবং অল্প কিছুতেই ইনি চটে যান।

৬ষ্ঠ ব্যক্তি বিলাসী। খানা-পিনা ও বাবুয়ানায়েই ইনি ওস্তাদ। ইংরেজিতে শুকে 'প্যাম্পনেট' বলা হয়।

৭ম ব্যক্তি উদাসীন। কোন কাজে এর মন যেন না কাজ করেন, কিন্তু ভাণ্ডা-ভাণ্ডা। বাগার করতে গিয়ে ইনি হিদাব তুল করতে পারেন।

৮ম ব্যক্তি বেশ দীর স্থির। হঠাৎ ইনি বেজাজ খারাপ করেন না, অকারণ হৈ চৈ বা টোঁচায়েচি এর নেই। ধীরে-স্থিরে ইনি কাজ করেন ও লোকের কথা শোনেন।

ত্রিভূদীরচন সরকার কর্তৃক ১৪ বঙ্কিম চাট্টোয়া স্ট্রিট, কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত

ও তৎকর্তৃক প্রভু প্রেস, ৩০ কর্নওয়ালিস স্ট্রিট, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত

মূল্য : চল্লিশ নয়া পয়সা





৩৯ বর্ষ]

অগ্রহায়ণ—১৩৬৫

[৮ম সংখ্যা]

রাজা ও জ্ঞানী

ত্রিমুরারীমোহন মুখোপাধ্যায়



গরীব গৃহস্থ প্রজা অভিযোগ করে—
অন্ন নাই, বস্ত্র নাই, অর্থ নাই ঘরে।
রাজার টনক নড়ে—রাজা তব লন—
শ্রম, শিল্প, শিক্ষা, কৃষি, আইন-শাসন
সকল বিভাগে যন্ত্রী কৃত্তী কর্মচারী—
মোট-মোট মাহিনার—তবু দিকদারী।
অকসি হাজিরা দেয় নিত্য বড়ি ধরে
কোথাও না ঘটে গোল—চলিছে সফরে।
রিপোর্ট করিছে পেশ—কোথাও না ফাট
আটুট রাজার সর্ব-ব্যবস্থার ঠাট।

রাজ্যের সীমান্তে গিরি—সেথা থাকে জ্ঞানী
সম্মানে রাজা তাঁরে আনেন আত্মানি—
আপন গোপনকক্ষে,—কহিলেন তাঁরে—
চিন্ত মোর ক্ষুদ্র অতি সমস্তার ভারে।
আত্মস্থে নহে মোর ঐশ্বর্য-বিভব
অকপট সত্য কহি আপনারে সব—
প্রজার কল্যাণ আর রাজ্যের মঙ্গল
এর লাগি এত করি—তবু কোলাহল।
প্রজাদের অসন্তোষ গেল নাকো তবু—
ব্যবস্থার ত্রুটি মোর কোথা—কহ প্রভু।

জ্ঞানী কন মৃদু হেসে—মোটা মাহিনার
 মোটা-পেট কর্মচারী স্বার্থ দেখে তার ।
 খাণ্ড-অংশ বহু চাই তার মোটা পেটে ।
 সেইমতো আগেভাগে লয় মোটা রেটে ।
 চাল-ডাল ঘৃত দুগ্ধ নিজের তো হোক—
 খুদ-কুঁড়া উচ্ছিষ্ট যা—পাবে বাকি লোক !
 অর্থ বলো, বস্ত্র বলো—তাদের ইজেরা—
 মান আর ইজ্জত রক্ষা করিবে নিজেরা ।
 উদ্বৃত্ত থাকিলে কিছু, গরীব-গৃহস্থে—
 না থাকে, বুনিয়া তার! দিবে না স্বহস্তে !

রাজ্যের, প্রজার হিতে রাজার নফর
 করে না নোকরি, খেটে করে না সফর !
 চাচা চায় চিরদিন বাঁচাতে আপনা—
 বাঁচা দায়, যদি ভাবে পরের ভাবনা ।
 চাকরিটি যতদিন, বেতনের টাকা
 টাইমে মিলিবে ঠিক—তারপরে ফাঁকা ।
 কাজেই ছু-হাতে টাকা লুটিবারে মন—
 রাজ্যের মঙ্গল-চিন্তা করিবে কখন ?
 বাড়াবে বিভাগ যত কর্মচারীসহ
 প্রজার পড়িবে টান—জীবন দুর্বহ ।

টাকার উপরে হলে মানুষের দাম—
 তবে রাজা হতে পারে অযোধ্যার রাম ।

বীৰেশ্বর বিবেকানন্দ



অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

‘একটি ছেলে কাজ করে যা উপার্জন করেছিল তার কিছু অংশ তার মাকে এনে দিলে, ছেলেবেলার ইংরেজি নীতিশিক্ষার বইয়ে পড়েছিলাম তার প্রশংসা।’ বলছেন স্বামীজি। ‘এর মধ্যে প্রশংসার কি আছে, নীতিশিক্ষাই বা কি। পরে বুঝেছিলাম পশ্চিমে বাবা-মাকে খাওয়ানোই একটা বড় কথা, সাংঘাতিক কথা। আমাদের ভারতবর্ষে ছেলের ব্যবহার সম্বন্ধে কোনো দ্বৈধ নেই। সে তার রোজগারের সবটাই তার মাকে এনে দিত। এ মাকে উপকার নয় নিজেকে উপকার।’

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর যজ্ঞ করছে পঞ্চপাণ্ডব। বিরাট যজ্ঞ, এমনটি কেউ দেখেনি, চমকে-জমকে অভূতপূর্ব। উথলে উঠেছে দানসাগর—ধনরত্নের ছড়াছড়ি। সে যজ্ঞে এক অদ্বুতদর্শন বেজি এসে উপস্থিত। তার গায়ের আদ্যেক সোনা, আদ্যেক পাঁশুটে। সে এসে বললে এ কি, এই যজ্ঞ ? ছি ছি, এ একটা যজ্ঞই নয়।

বলো কি, এত যেখানে দান, দানের পর্বতস্তূপ, সে যজ্ঞ নয় ?

না, যজ্ঞ দেখেছিলাম সেই এক গাঁয়ে, এক গরিব ব্রাহ্মণের কুটিরে। কুটিরে ব্রাহ্মণ আর তার স্ত্রী, তাদের ছেলে আর ছেলের বউ। ধর্মের উপদেশ দিয়ে যা ভিক্ষে পেত তাই দিয়েই ব্রাহ্মণ নির্বাহ কত জীবিকা। সে গাঁয়ে সেবার দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হল। লোকে খেতে পাচ্ছে না, শুকনো উপদেশ কে শোনে ? অনাহারের মধ্যে এসে দাঁড়াল সেই দরিত্রের পরিবার। পাঁচ-পাঁচ দিন ধরে সমানে সকলের উপবাস—এই বৃষ্টি মৃত্যু এসে হানা দিল ছুয়ারে। ছ দিনের দিন কিছু ছাত্ত্র যোগাড় করল ব্রাহ্মণ। ক মুষ্টি ছাত্ত্র,

মনে হল বশুন্ধরার উজাড়করা ধন। সমান ভাগ করে বসেছে চারজন, এমন সময় দরজায় ঘা পড়ল। কে? আমি অতিথি। অতিথি? তুমি নারায়ণ। ব্রাহ্মণ উঠে দরজা খুলে দিল। অতিথি বললে, আমি ক্ষুধার্ত, দীর্ঘ দশদিন ধরে উপবাসী, কিছু খেতে দাও আমাকে। ব্রাহ্মণ তার নিজেই ভাগ তুলে দিল অতিথিকে। হু গ্রাসে সেই ভাগ নিঃশেষ করে অতিথি বললে, এটুকু খেয়ে আমার খিদে আরো বেড়ে গেল, আরো ভাগ দাও। এ কি সর্বনাস্তী ক্ষুধা! ব্রাহ্মণ চোখে অঙ্ককার দেখল। ব্রাহ্মণী তখন স্বামীকে বললে, আমার ভাগও দাও এই পীড়িতকে। ব্রাহ্মণ প্রতিবাদ করে উঠল, বললে, না, তোমাকে বিপন্ন করতে পারবনা। তখন স্ত্রী বললে, না, আমাকে স্ত্রীর কর্তব্য করতে দাও। স্ত্রীর কর্তব্য হচ্ছে স্বামীর নারায়ণসেবায় সাহায্য করা। ব্রাহ্মণী দিয়ে দিল তার ছাতুর ভাগ। এবং এই ভাবে ছেলে আর ছেলের বউও তাদের ভাগ দিয়ে দিল অতিথিকে। তখন সর্বগ্রাস করে সেই অতিথি তৃপ্ত হল। সেই কুটির ঘরের মেঝেতে কিছু ছাতুর গুঁড়ো ছিল, আমি সেই মেঝেতে যখন এসে গড়াগড়ি দিলাম আমার অদ্ভুত শরীর সোনা হয়ে গেল। সেই থেকে আমি আরেকটা এমন যন্ত্র খুঁজে বেড়াচ্ছি—যেখানে আমার শরীরের বাকি অদ্ভুতও সোনা হয়ে যাবে। সমগ্র জগৎ ঘুরে বেড়াচ্ছি, আজও এমন আরেকটা যন্ত্রের দেখা পেলামনা। আমার দেহের বাকি অদ্ভুতটা পাণ্ডুটেই থেকে গেল—

কেন, এই যন্ত্র?

এ কি একটা যন্ত্র? এটা একটা অহঙ্কারের রাজসূয়। এতে দান আছে নিঃসন্দেহ, কিন্তু আত্মদান কই?

আরেকটা বক্তৃতা দিলেন সালেমে। বিষয়, হিন্দুদের জাতিভেদ; ভারতীয় নারীদের সামাজিক দুর্গতি; ভারতবর্ষের নিদারুণ দারিদ্র্য।

জাতিভেদ সামাজিক কর্মবিভাগ থেকে, ধর্ম থেকে নয়। আর নারীদের দুর্গতি তাদের আমরা শুধু দেবী বলে পূজা করেছি বলে, অন্তঃপুরের মন্দিরবেদীতে বন্দিনী রেখেছি বলে। কিন্তু এ সব দুর্গতি-দুর্দশার একদিন অবসান হবে কিন্তু দারিদ্র্য? এ নাগপাশের মোচন হবে কবে? এ যে দেশের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তীর্ণ।

‘বুদ্ধ থেকে রামমোহন রায় সকলেই এই ভুল করেছিলেন যে জাতিভেদ ধর্মবিধান, তাই তাঁরা ধর্ম ও জাতি দুটোকেই ভাঙতে চেয়েছিলেন একসঙ্গে।’ শিকাগো থেকে লিখছেন স্বামীজি : ‘হিন্দু ধর্মনেতারা যাই বলুন, জাতি একটা সামাজিক বিধান মাত্র। ‘এ দূর হতে পারে যদি লোকের সামাজিক স্ববুদ্ধিকে জাগ্রত করা যায়। এখানে যে কেউ জন্মায় সে জানে সে একজন মানুষ। ভারতে যে কেউ জন্মায় সে জানে সে সমাজের একজন কৃতদাস মাত্র। স্বাধীনতাই উৎখাত করতে পারে এই মনোভাব। স্বাধীনতা হরণ করে নাও, অধোগতি ছাড়া আর কিছু নেই চতুর্দিকে। আধুনিক প্রতিযোগিতা ও সংঘর্ষেই উঠে যাচ্ছে জাতিভেদ। ব্রাহ্মণ জুতোব্যবসায়ী বা ব্রাহ্মণ গুঁড়ি তুলে কি আজকাল?’

আরো লিখছেন : ‘হিন্দু যেন কখনো তার ধর্ম না ছাড়ে। ভারতের সকল সংস্কারক ভুল করে ধর্মকেই পৌরোহিত্যের সমস্ত অত্যাচার ও অবনতির জগ্রে দায়ী করেছেন। তাই তাঁরা হিন্দুধর্মের অবিদ্যমান হুর্গকে ভাঙতে উদ্বৃত্ত হলেন। ফল কী হল? ফল হল তাঁরা সকলেই ব্যর্থ হলেন।’

পর্দা উঠে যাবে, নারীদের অশিক্ষাও দূরীভূত হবে একদিন।

লিখছেন স্বামীজি : ‘সংপুরুষ আমাদের দেশেও অনেক কিন্তু এদেশের মেয়েদের মত মেয়ে কই? যাত্রী: স্বয়ং সূকৃতিনাং ভবনেষু—যে দেবী সূকৃতি পুরুষের গৃহে স্বয়ং শ্রীকূপে বিরাজমান। চণ্ডীকথিত কোথায় আমাদের সেই গৃহশ্রী? বাবাজী, শাক্ত শব্দের অর্থ জানো? শাক্ত মানে মদভাঙ নয়, শাক্ত মানে যিনি সমগ্র জ্ঞী-জাতিতে মহাশক্তির বিকাশ দেখেন। এদেশের পুরুষেরা তাই দেখে। মমু মহারাজ বলেছেন, যত্র নারীযন্ত পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতা:। যে গৃহে জ্রীলোক সম্মানিত সেই গৃহের উপরেই ঈশ্বর সুপ্রসন্ন। এখানে তাই এরা সুখী, বিদ্বান, স্বাধীন, উদ্যোগী। আর আমরা জ্রীলোককে নীচ হয়ে অধম অপবিত্র বলি। তার ফল—আমরা পশু, দাস, নিরুপদ্রব, দরিদ্র।

আর এদের মেয়েরা কি পবিত্র। তুহারের মত শুভ্র। পঁচিশ-তিরিশ বছরের কম কাল বিয়ে হয় না। আকাশে পাখির মত স্বাধীন। বাজার-হাট রোজকার দোকান, কলেজ, প্রোফেসর, সব কাজ করে—অথচ কি পবিত্র। স্কুল-

কলেজ মেয়েতে ভরা। আমাদের পোড়া দেশে মেয়েছেলের পথ চলবার জো নেই। আবার মেয়ে এগারো বছরে বিয়ে না হলে খারাপ হয়ে যাবে। আমরা কি মানুষ বাবাজী? মম্ব বলেছেন, কতাপোবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াত্যন্ততঃ। ছেলেদের মত মেয়েদেরও ত্রিশ বছর পর্যন্ত ব্রহ্মচর্য করে বিজ্ঞানশিক্ষা করতে হবে। কিন্তু আমরা কী করছি? মেয়েদের যদি উন্নত করতে পারি তবেই আমাদের আশা আছে। নইলে ঘুচবে না পশুজন্ম।’

কিন্তু তোমাদের সেই বর্বরপ্রথা সত্যিদাহ কী? সভার মধ্য থেকে প্রশ্ন করল কে একজন।

সে-প্রথা উঠে গেছে। কিন্তু সে-প্রথার জন্য স্বামীর প্রতি স্ত্রীর অজ্ঞেয় অনুরক্তি থেকে, কোনো একটা বর্বর অনুশাসন থেকে নয়। বিবাহে স্বামী-স্ত্রী এক ছিল, মৃত্যুতেও স্বামী-স্ত্রী এক—এই আদর্শই ধরতে চেয়েছিল সমাজে। কিন্তু সে যখন গেছে তখন তা নিয়ে আর কথা কেন?

কিন্তু তোমাদের পৌত্তলিকতা? আবার এ প্রশ্নবাণ নিক্ষিপ্ত হয়।

আমরা কি পুতুলকে পূজা করি? আমরা পূজা করি প্রতিমাকে, ঈশ্বরের প্রতিচ্ছায়াকে। অনন্তকে ধরি কি করে যদি তার একটি অবয়ব না কল্পনা করি? তাই আমার সৌম্যবদ্ধ ঘরের শূন্যতাই মহাকাশের প্রতীকের কাজ করে। কিন্তু জিগগেস করি পৌত্তলিক কে নয়? বহু ভক্ত বৃষ্টানকে জিগগেস করেছি, সত্যি করে বলা, উপাসনার সময় কী ভাবো? কেউ বলেছে চার্চ ভাবি, কেউ বলেছে ক্রশ, কেউ বলেছে স্বয়ং বীণ। বৃদ্ধ ঈশ্বর মানলেন না কিন্তু নিজে ঈশ্বর হয়ে বসলেন। সাধারণ মানুষ মূর্তি ছাড়া ধরবে কাকে? অন্ধরের সাহায্য ছাড়া কার পাঠোচ্ছার করবে?

কিন্তু এত যে মিশনারি যাচ্ছে তোমাদের দেশে তারা করছে কি?

দয়া করে তাদের কথা আর বোলো না। তারা কি ধর্ম শেখাচ্ছে? তারা শুধু দলের খাতায় নাম বাড়াচ্ছে। দেশের ধর্ম দিয়ে কী হবে যদি দেশের আহ্বারের না সংস্থান হয়? পেটে খিদে রেখে ঈশ্বরের নাম চলে না। এখন থেকে আর মিশনারি পাঠিও না, এঞ্জিনিয়ার পাঠিও। ধর্মবিস্তারে কি হবে, কর্মবিস্তারের

সুবিধে করে দাও। কলকারখানা বসাও, জীবিকার ক্ষেত্রে ডাক দাও উপবাসীকে। তা যদি না পারো পরের দেশে গিয়ে ধর্মের ধ্বজা আর তুলতে চেও না।

সমস্ত কুসংস্কার দূর হুবে একদিন দেশ থেকে, সমস্ত অনাচার, সমস্ত বিকৃতি-বিচ্যুতি। কিন্তু এই পর্বতভার দারিদ্র্যের উচ্ছেদ হবে কি করে? শ্রমশানে দক্ষ অঙ্গারের অন্ধরে কবে লেখা হবে সূক্ষ্মালের কবিতা?

শিকাগো থেকে লিখছেন স্বামীজি: ‘গড়ে ভারতবাসী মাসিক আয় দু টাকা। সকলে চোঁচাচ্ছেন আমরা বড় গরিব, কিন্তু ভারতের দরিদ্রের সহায়তা করার কটা প্রতিষ্ঠান আছে? লক্ষ লক্ষ অনাথের জন্তে কজন প্রাণ কাঁদে? হে ভগবান আমরা কি মানুষ? ঐ যে পশুবৎ হাড়ি-ডোম তোমার বাড়ির চারদিকে, তাদের উন্নতির জন্তে, তাদের মুখে একগ্রাস অন্ন দেবার জন্তে তোমরা কি করেছ বলতে পারো? তোমরা তাঁদের ছোঁও না, শুধু দূর-দূর কর। আমরা কি মানুষ? এখন ধর্ম কোথায়? এখন খালি ছুঁৎমার্গ—আমার ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না। মনে রাখবে দরিদ্রের কুটিরেই আমাদের জাতির জীবন। আর আমাদের কান্ধের মূল কথা, কারু ধর্মে একবিন্দু আঘাত না করে জনসাধারণের উন্নতি। আমাদের আধুনিক সংস্কারকেরা বিধবাবিবাহ নিয়েই বেশি ব্যস্ত। সকল সংস্কারকর্মই আমার সহায়কুতি আছে, কিন্তু বিধবাদের স্বামীর সংখ্যার উপরে কোনো জাতির অদৃষ্ট নির্ভর করে না। জাতির অদৃষ্ট নির্ভর করে জনসাধারণের অবস্থার উপর। তার উন্নতি করতে পারো?’

দুজন পাত্রী, ডক্টর গার্ডনার আর রেভারেণ্ড নব্‌স্‌, প্রতি সভায়ই স্বামীজিকে বিরক্ত করছে। প্রশ্নের পর প্রশ্ন তুলে যাচ্ছে বিভ্রান্ত করতে। কিন্তু পরাস্ত হবার পাত্র স্বামীজি নন। শাস্তভাবে দৃঢ়কণ্ঠে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন। তবু তারা নিরস্ত হচ্ছে না, গির্জায় গিয়ে বেদীর থেকে অপভাষণ করছে। তার চেয়ে প্রকাশ্য সভায় পাত্রীদের সঙ্গে হোক একটা সাক্ষাৎকার। টানাট উডস সালেমের সমস্ত পাত্রীবংশকে নিমন্ত্রণ করে আনলেন, শোনো সনাতন ভারতবর্ষের নবীন প্রাণের প্রতীক বীরোত্তম সন্ন্যাসীকে, বোঝো যদি বুঝতে পারো হিন্দুধর্মের উদার তত্ত্ব। সেই সভায় পাত্রীর দল তীব্র কদর্য ভাষায় আক্রমণ করল স্বামীজিকে, যত পারল

বর্ণন করতে লাগল কটুক্তি, কিন্তু কি আশ্চর্য, স্বামীজির শাস্তিতে বা দৃঢ়তায় এতটুকুও রেখা পড়লনা। তাঁর ভদ্রতা ও প্রসন্নতা অক্ষুণ্ণ রইল। তাঁর বক্তব্য তাঁর প্রতিপাদন থেকে তিনি এতটুকু ভ্রষ্ট হলেন না। নিরপেক্ষর দল মুগ্ধ হয়ে গেল স্বামীজির ব্যবহারে—মোনই যে মহান উত্তর তার উচ্চারণে।

পাত্রীদের সঙ্গে এই স্বামীজির প্রথম সন্মুখ। পরে আরো আছে।

কিণ্ড স্বামীজি বিগতভৌঃ, ব্রাহ্ম-শ্রীসম্পন্ন। দিবাকর কখনো পূর্বদিক ত্যাগ করে না, স্বামীজিও তেমনি ত্যাগ করেননা তাঁর ধর্মকে। ধর্মই একমাত্র শ্রেয়, ক্ষমাই একমাত্র শাস্তি, বিজ্ঞাই একমাত্র তৃপ্তি, আর অহিংসাই একমাত্র সুখনিদান।

লিখছেন স্বামীজি : 'ভ্রাতৃগণ, কোনো ভালো কাজই বিনা বাধায় সম্পন্ন হয় না। শুধু যারা শেষ পর্যন্ত অধ্যবসায়ের সঙ্গে লেগে থাকে তারাই কৃতকার্য হয়। সনাতন হিন্দুধর্মের জয় হোক। মিথ্যাবাদী ও পাষণ্ডদের পরাভব হোক। ওঠো, আমরা নিশ্চিত জয়ী হব।' (ক্রমশঃ)

বচনে নন্দ

পরিমল রায়



তুমি ভাবছো মীমুর বয়স বোল
আমি বলছি কক্ষনো তা নয়,
এইতো সেদিন অন্নপ্রাশন হ'ল
বরস হবে দশ কিম্বা নয়।
তবে কেন কথায় অমন পাকা ?
সেটা বাপু শরু নহে বোঝা,
ওটা নইলে সংসারেতে থাক
ছেলেবেলায় নয়তো বড় সোজা।

ছোটবেলায় ছোটই যদি থাকো
মানুষ বলে গণ্য নাহি হবে,
কপাল খুঁড়ে যতই কাঁদো নাকো
কাঁকি দিয়ে সিন্মা যাবে সবে।
ছোট বলেই ছোট থাকতে হবে
নিতান্ত এ মিথ্যা নয়তো কি ?
নয়তো যদি গরীব যারা তবে
তাঁরা কেন করেন বড়লোকী ?



বছর তিরিশের আগের কথা। তখনকার দিনের একটি পূজার গল্প তোমাদের বলছি। আমাদের গাঁয়ের পূজা। এখন যেমন কলকাতা শহরে কি আশেপাশের সবখানে সার্বজনীন দুর্গোৎসব হয়, তখন তা ছিল না। তখন শুধু বড় বড় লোকের বাড়িতে দুর্গাপূজা হত। গাঁয়ের চাষী—দুগলমানেরা তাকে বলত বড় পূজা। ধনী কি অচ্ছল অবস্থার লোকের বাড়িতে পূজা হলেও বিনা টানার গ্রামের সাধারণ গহীবরাও সেই উৎসবের ভাগ পেত। পূজা উপলক্ষে বাতী থিয়েটার হলে দেখতে যেত, বটী থেকে দশমী পর্যন্ত রোজ ছেলেপুলে নিয়ে প্রাতিমাঙ্গল্য করে আসত। দুপুরের সিকে পাঠা বলি দেখত, সন্ধ্যার দেখত দীপারতি। বাইরে চুপীরা ঢাক ঢোল কীসর ঘণ্টা বাজাত আর পূজামণ্ডপের মধ্যে পঞ্চপ্রদীপে দেবীকে আরতি করতো পুরোহিত। সব অবস্থার সব বয়সের মানুষই সেই উৎসবের ভাগ নিত।

আর ছেলেপুলেদের তো কথাই নেই। আমাদের পূজা আরম্ভ হবে যেত অনেক আগে থেকে! চৈত্র সংক্রান্তির দিন গ্রামে মীলপূজার মেলা বদত। অনেক সব দুর্গত্ব জিনিসপত্রের সঙ্গে সেই মেলায় বিক্রি হত 'নতুন পকেট পত্রিকা'। এক পরশা দিয়ে সেই পত্রিকা কিনে সব চেয়ে আগে দেখতাম দুর্গাপূজার তারিখটি কবে। পাতা উলটে উলটে সম্ভা রকে ছাণা অশ্মট সেই দশকৃষ্ণার ছবিব সিকে উৎসুক চোখে তাকিয়ে থাকতাম।

আবাড় প্রাণ মাস থেকে সেই রকের ছবি বখন আস্তে আস্তে মূর্যরূপ নিত, আমাদের আনন্দের আর সীমা থাকত না। চৌধুরী বাড়ি আমাদের এম. ই. স্কুলের বাতারাভের পথে পড়ত।

দুই ছুটির পর এগে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতাম কারিগররা প্রতিমা গড়ছে। শন দিয়ে বড় গিরে অড়ানো, তার উপর ভূষমাটির কাঁজ; তারপর মো-খাটির প্রলেপ, তারপর রং। পূজা আরম্ভ হওয়ার দিন করেক আগে প্রতিমার গায়ে বন রং লাগত, শুখন আমাদের চোখে সারা দুনিয়াই রঙে ভরে উঠত। তরা পুত্রের মত মনের আনন্দ কানায় কানায় টলটল করত, নদী আর খালের মত তীর ডুবিয়ে উপচে পড়ত।

ঢাক ঢোলের বাজে, নতুন জুতো জামা কাপড়ে, আলতার শাড়িতে ছেলেমেয়ে বউ-ঝি সবাইর মুখে হাসি ফুটিয়ে পূজা আসত, হাসিমুখে দেবী আসতেন। সারা গায়ে তিন-চারখানা পূজা হলো গোড়ার দিকে চৌধুরী বাড়িতে মাজ একখানা পূজা হত। চৌধুরীরা গরের বাবদাশী। চাল ভেল হুন কেরোদিনের কারবার করে তাঁরা বড়লোক হয়েছেন। বড় বড় পোতলা পাকা বাড়ি করেছেন। অনেক ধানী-জমি কিনেছেন মাঠে। প্রাঙ্গা পাইক লোকজনের অভাব নেই।

বংশবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের বাড়িটা বাড়তে বাড়তে ছড়াতে ছড়াতে আশে একটা গ্রাম হয়ে গেছে। আর চৌধুরীরাও ভাগ-ভিন্ন হয়ে অনেক শরিক হয়ে পড়েছেন। তবু গোড়ার দিকে শুনেছি আমাদের জন্মেও আগে সব শরিক একসঙ্গে মিলে পূজো করতেন। বঞ্জীর দিনে যে খরচ হয়, কেউ সেই খরচ দিতেন; সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী দশমীর খরচ এক এক বছর এক এক শরিকের ওপর পড়ত, আবার পালা করে ঘুরেও আসত। এ বছর বার ভাগে বঞ্জীর তার পড়ল তিনিই হয়তো পরের বছর সপ্তমী কি অষ্টমী, নবমী কি বিজয়া দশমীর তার পেলেন।

কিন্তু এ ব্যবস্থা আতে আতে বদলে গেল। চৌধুরীরা বয়েক তাই পরামর্শ করে দু'জারগার দু'খানা পূজার বন্দোবস্ত করলেন। পুরোন মন্দিরে বড় তরকের আর নতুন মন্দিরে ছোট তরকের পূজো হতে লাগল।

প্রথম প্রথম দুই শরিকে দুই মন্দিরে প্রায় শান্তিতেই পূজো করতেন। একই কারিগর দুই শরিকের প্রতিমা গড়ে দিত। একই পুজতের বংশ দুই ভাগে ভাগ হয়ে দু'জারগার পূজো করতেন। একই ঢুলীর বংশ দুই দলে ভাগ হয়ে ঢাক ঢোল বাজাত। ছোট শরিক গোষ্ঠীবর্গ নিয়ে বড় শরিকের বাড়িতে সপ্তমীর দিন নিমন্ত্রণ যেতেন। বড় শরিক ছোট শরিকের বাড়িতে যেতেন অষ্টমীর দিন।

কিন্তু এ ব্যবস্থাও রইল না। এই পূজো নিয়ে দুই শরিকের মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি হল। সে বিরোধ আর সহজে মিটল না। এই বিরোধ রগড়া ক্রমে আশাপাত পর্যন্ত গড়াত। পুজোর ছুটির পরে আদালত বখন পলত, চৌধুরীদের দুই তরকের শব্দ থেকেই দু'চার নম্বর নতুন দেওয়ানী দোষদারী দায়ের হয়ে যেত।

দে বছর আমি ক্লান্ত সিন্ধে পড়ি। আমাদের সঙ্গে শড়ে ছোট তরফের গৌর চৌধুরী। গৌরের কাছে আমি যোগ বোঝানিভাম, 'কি রে তোদের প্রতিমা কেমন হচ্ছে ?'

গৌর সগর্বে বলত, 'কেমন হচ্ছে—দে-দে-দে দেখে আর না গিয়ে।'

একটু তোতলা ছিল গৌর। আনন্দেই হোক আর উৎসাহেই হোক মনে একটু উত্তেজনা হলেই দে তো-তো করত।

আমি তাকে মাঝে মাঝে চটাবার জন্যে বলতাম, 'তোদের অন্নটা নাকি বড় তরফের চেয়ে এবার ছোট হচ্ছে ?'

গৌর আরো রেগে গিয়ে বলত, 'ভাদু, তুই একটা গাধা। ওদের কতটুকু মণ্ড শে অণ্ড বড় হবে ওদের ?'

শুধু অন্ন কেন, সিংহ কাতিক গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী, দুর্গা ঠাকরণ সব ওদের পুতুলের মত। ওদের মণ্ডপঘর ছোট। বড় প্রতিমা ওরা গড়ে রাখবে কোথায় ? 'আচ্ছা মজ !'

তা ঠিক। পুরোন ছোট মণ্ডপটা বড় তরফের ভাগে পড়েছে। দু' বানা প্রতিমা তো আর এক মণ্ডপে ধরে না ; তাই মণ্ডপের অংশ বাবদ বড় তরফ ছোট তরফকে কিছু টাকা ধরে দিয়েছেন। আর তার চতুর্গুণ টাকা খরচ করে ছোট তরফে ওই একই উঠানের ওপর নতুন বড় একটা পাক। মণ্ডপ তৈরী করে দিয়েছেন। তাই ছোট তরফের প্রতিমা বছর বছরই অনেক বড় হয়। আর তাই নিয়ে ছোট তরফের ছেলেরা বড় তরফের সমবয়সী ছেলের কাছ থেকে বুক জুলিয়ে গর্ব করে, 'তোদের সিংহটা আমাদের গণেশের পায়ে তলার ইত্থরে মত। তোদের সিংহটা একটা মেড়ী কুকুরের চেয়েও ছোট। আর আমাদের বড় বড় লক্ষ্মী তোদের দুর্গা ঠাকরণ ঠিক ততটুকু। তোদের প্রতিমার কথা তোরা আর বলিলনে।'

ছোট তরফের ছেলেরা অবশ্য বাড়িয়েই বলে। কিন্তু বড় তরফের ছেলেরা বেশি প্রতিবাদ করতে পারেনা। সত্যিই তো পূর্বপুরুষ চিরদিনের জন্যে তাদের মূণ মিচু করে রেখে গেছেন। তাদের প্রতিমার আর বড় হবার উপায় নেই। কিন্তু বড় তরফ অনুভাবে এর শোধ নেয়। বড় তরফের পুজো আরম্ভ হওয়ার আগে ছোট তরফের পুজো আরম্ভ হতে পারে না। বিসর্জনের বেলাতেও তাই হয়। এক মিনিট আগে হলেও নোকো থেকে নদীর মধ্যে বড় তরফের প্রতিমা আগে নামবে। তারপর ছোট তরফের পালা। পূর্বপুরুষের এই বিধানটুকু ছোট তরফকে মানতেই হবে।

কিন্তু পুজোর পাঁচ দিন ধরে দুই তরফের মধ্যে নানা ভাবে প্রতিবোধিতা চলে। কোন বার বড় তরফ ঢোলের বাজে ছোট তরফের কাছে হেরে যান, কোন বার হাবেন বলির পাঠাগুলির সংখ্যা আর আকারে। কোন কোন বার যাত্রার সময় ছোট তরফের ভীমের গোঁফের বাহার,

গদার আকার, আর হাজারের জোরের কাছে বড় তরফের ভীম হয়ে যায় ম্যালেরিয়া রোগীর মত রোগা পটকা, ধরন-ধারণ হয় পাণ্ডবদের বড় ভাই যুধিষ্ঠিরের মত শান্ত-শিষ্ট, গলাটাও তারই মত চিঁচিঁ চিঁচিঁ করে। তা দেখে ছোট তরফের দলের লোক হাসে, টিটকিরি, মেয়ে একবার তো বড় তরফের কর্ণার্জুন পাগাটা ছোট তরফের ভাড়াটে শুত্তারা ছুটেশব মাটিই করে দিয়েছিল। এই সব কাণ্ড দেখে বড় তরফের কর্তারা, ঘুবক ছেলেরা অলতে থাকেন। ‘হু’ একবার হাতাহাতিও যে না হয় তা নয়। তার ফলে আদালতে মামলা মকদ্দমার পরিমাণ আরো বাড়ে।

সেবারও গোড়া থেকেই প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছিল। আমাদের পাড়ার লোক জটলা করা আরম্ভ করেছিল, ‘এবার একটা কুকক্ষেত্র হবে।’

অবশ্য গাঁওর লোকের তাতে স্তরের কিছু নেই। আমাদের ছেলের দলও তাতে খুব খুশি। মণগ্রহরথখারিগী দুর্গার পূজো তো বোষ্টমের কীর্তন নয়। এতে খানিকটা হৈ হৈ, রৈ রৈ, মারামারি, রক্তারক্তি কাণ্ড না হলে কি আর মজা লাগে? দুর্গা পূজো তো শুধু লক্ষ্মী সরস্বতীর পূজো নয়, এতে যে অহুর আর সিংহের মল্লযুদ্ধও আছে।

আমরা বাজার দলের ভীম আর দুর্গোৎসবের রোখারোখি দেখে যেমন খুশি হতাম, বড় তরফের বড় ছেলে বতীববাবু আর তাঁর ভাইদের সঙ্গে ছোট তরফের কুস্তিগীর শালোয়ান হোয়ান জোয়ান সব ছেলে কানাইবাবু নিভাইবাবুর রোখারোখির গল্প শুনেও তেমনি আনন্দ পেতাম। কেউ রামদা নিয়ে খেরোডেন, কেউ বা রাইকেল নিয়ে। এ পক্ষের কেউ যদি লাঠি নিয়ে খেরোন, ও পক্ষের জোয়ান ছেলেরা বর্শা হাতে লাকিখে পড়েন। মল্লযো অষ্টমী নবমীর গভীর রাতে এই সব হৈ-হাজার চলে। অত রাতে তো আমাদের সেখানে থাকবার দৌড়াগা হয় না। আমরা ভোরে উঠে বাবা কাকা কি বড়দা বেজদার মুখে কৌরব পাণ্ডবের বৃদ্ধের বিবরণ শুনি। দূতরাষ্ট্রের সঙ্গ ছিলেন যাত্র একজন। আমাদের সঙ্গের অভাব নেই।

সেবার গোড়া থেকেই আড়া-আড়িটা বেশ জোর শুরু হয়েছিল।

বড় তরফ পাঠা বলি গিলেন। কিন্তু ছোট তরফ অষ্টমীর দিন নিয়ে এলেন বোথ।

বড় তরফের বড় কর্তা তখন পঞ্চাননবাবু। বছর পঞ্চাশ হবে বয়স। বেশ লম্বা-চওড়া চেহারা। তিনি এসে ছোট তরফের কর্তা নিবারণবাবুকে বললেন, ‘কাজটা কি ভালো হল মিবু?’

নিবারণবাবুর বয়সও বছর পঞ্চাশেক। তিনি দেখতে অনেক বেঁটে। শরীরটাও রোগা। অঘলের দোষ আছে। খেয়ে কিছু হজম করতে পারেন না। কিন্তু কাবরারের অবস্থা তাঁরই বেশি ভালো। গৌক জোড়াও যেমন লম্বা তেমনি চওড়া। গৌয়ের বাবাকে তাঁর এই গৌকের সঙ্গে আমরা গোপনে গোপনে বলতাম পুলিশ ইনস্পেক্টর।

নিবারণবাবু বললেন, 'কেন মোষ এনে দোষটা কি হয়েছে রাঙালা ?'

শকাননবাবু বললেন, 'আমাদের বংশে মোষ বলি দেওয়ার রীতি নেই।'

নিবারণবাবু বললেন, 'আমি পুস্তক ঠাকুরের কাছে থেকে অশ্রুতি নিয়েছি। আমার নকলী বছরের ঠাকুরমাও না কখনোনি। তিনিও মত দিয়েছেন। তাছাড়া দুর্গার আর এক নাম বহিষাস্ত্রমদিনী। তাঁর পুণ্যের তো মোষ বলি হবেই।'

সাঁড়খরে ঢাক ঢোল শিটিয়ে মোষ বলি হয়ে গেল ছোট তরকের।

বড় তরকের ছেলেরা বহিও মনে মনে অনেক কাকুতি মিনতি করেছিল, 'মা দুর্গা ওদের মোষ যেন এক কোশে না নামে। মোষের মাংস তো কেউ খায় না মা, তোমার প্রদান তো কেউ পাবে না। এই কথা বলি তুমি নিও না মা।'

বড় তরকের প্রতিমার হানি হানি মুখ দেখে মনে হল ওদের প্রার্থনা তিনি শুনেছেন। কিন্তু ছোট তরকের মা শত্রুপঙ্কজ আবেগমনে কানে আঙুল গিঁড়েছিলেন। তাই মোষ এক কোশে নিবিবাহেই নেমে গেল। গায়েব সমস্ত লোক ছোট তরকের উঠানে জেড়ে পড়ল সেই মোষ বলি দেখতে। জন দশ পনের লোক সেই বাড়ি মোষটার চার পায়ে মোটা দড়ি বেঁধে টান করে ধরে রাখল। তার আগে কয়েক ঘণ্টা ধরে মোষের ঘাড়ে ঘি মাশিণ করে তার চামড়াটা মসৃণ আর পাতলা করে দেওয়া হল। তারপর লালরঙের কাপড় পরে ঝাঁকড়া চুলওয়ালা যাত্রার দলের ছোটো ভীষের মহান আমাদের ভূবন করাতী থিরাট এক রাম দা দিয়ে সেই মোষের ঘাড়ে দিল কোপ। হাড়িকাঠ থেকে সঙ্গে সঙ্গে শিংহুদু মাথাটা দুয়ে ছিটকে পড়ে গেল। চারটে ঢাক ভূমূল শব্দে জরধ্বনি করতে লাগল। খাল বিল পেরিয়ে দশ গ্রামে ছড়িয়ে পড়ল সেই ঢাকের শব্দ। বিশ গ্রামের লোক জানতে পাবল ছোট তরকের মোষ বলি হয়েছে। আর সেই সঙ্গে বলি পড়েছে বড় তরকের হান-মহাদা সব। বড় তরকের লোকজন ঘটাতে লাগল ছোট তরকের মোষ এক কোশে নামেনি। ভূবন করাতী গুকে করাত দিয়ে ফেড়ে ফেড়ে নামিয়েছে।

এই মিথ্যা অপবাদ শুনে নিবারণবাবু আশ্বস্ত হয়ে গেলেন। আর তাঁর ছেলে ভাইপোর দল অগ্নিশূলিকের মত এখানে ওখানে জলতে লাগল।

আমাদের গৌরব অরি অবতার কখন নয়। সে আমাদের ডেকে হাত ধরে বলল, 'দে-দে-দে দেখলি ওদের কাণ্ড ? একেবারে পা-পা-পা পাকা মিথোবাদী। ঝাড়হুদু ছোঁছোর। আর আমাদের ওই জ্যাঠামশাই অমনিতে গরদের কাপড় পরে খুব জপতপ করেন, কিন্তু মিথো কথার বেলার'।—

আরি বললাম, 'ছিঃ, ছাছার হলেন শকাননবাবু, তোর গুরুজন গৌর। তাকে ওঁরা খুব ভালোও বাসেন। তুই ওঁর কোন নিম্নাঃকরিলেন।'

গৌর লজ্জিত হয়ে চুপ করল।

গৌর আর পকাননবাবুর ছোট ছেলে বিনোদ একই দিনে হয়েছিল। একই দিনে ঘট। করে তাদের অগ্রপ্রাণন হয়। ক্লাস ফোর অবধি তারা একই সঙ্গে পড়েছে। তারপর বারাপ ধরনের বসন্ত রোগে বিনোদ মারা যায়। এত শত্রুতা রামলা যেতক্ষণ সন্তেও গৌরকে পকানবাবু মাঝে মাঝে নিজের কাছে ডেকে নেন। গিঠে হাত বুলিয়ে আসর করেন। নিজস্ব করেন পড়াশুনোর কথা। পরলা বৈশাখে আর পুজোর সময় বছরে দু'বার নতুন জামা জুতো কিনে দেন। বিনোদের চেহার। অনেকটা গৌরের মতই ছিল। এদব কথা আমি ক্লাসে বসে গৌরের মুখেই শুনেছি।

নবমীর দিন বাড়ি ভালোয় ভালোয় কাটল। দশমীর দিন সকালে নদীর বাধা ঘাটে বড় বড় নৌকো এসে ভিড়ল। সেই নৌকোর প্রতিমা বিসর্জন হবে।

বড় ছোট দুই তরকের নৌকোই সমান। মাঝি মাল্লাগাও সংখ্যার প্রায় এক রকম। গায়ের লোকেরা বলাবলি করল, এবার বড় রকমের কিছু একটা হবার আশঙ্কা আছে। দুই পক্ষই নাকি গোপনে গোপনে লাঠিঘাল ঢাল বর্শ। সড়কি রাখ দা নিয়ে তৈরী রয়েছে। প্রতিমার বড় নৌকোর অংশেপাশে ছোট মাঝারি অনেক ভিড়ি-নৌকো থাকবে। প্রতিবারই থাকে। তবে এবার সংখ্যার বেশি। দুইপক্ষই তাঁদের প্রজা, পাইক আর লাঠিঘাল জোড়ান জোড়ান সব নমঃপূত্র মুসলমানদের খবর দিয়ে এনে দুপুর বেলা থেকেই নৌকোর নৌকোর জড় করে রেখেছেন।

বিকেল বেলা থেকেই নদীতে 'আরং' মিলল। আহাদের গায়ে তখন পাঁচখানা দুর্গা পুরো হস্ত। বড় বড় নৌকোর চৌধুরীদের দুই তরকের প্রতিমা বেশল। দক্ষিণ পাড়ার প্রতিমার নৌকো-গুলিও এসে পড়ল। আশেপাশের আরো চার-পাঁচখানা গ্রামের প্রতিমার নৌকোও এসে জুটল। আর দর্শকদের অসংখ্য ছোট বড় নৌকোর তো কথাই নেই। নদীতে একবিশু জল আর দেখা যায় না। শুধু নৌকো আর নৌকো। আর নৌকোর ওপরে কালো কালো সব মাথা। আমরা এক খানা বড় গালি নৌকো ভাড়া করে তার ছইয়ের ওপর বসে 'আরং' দেখতে লাগলাম। আর মনে মনে কামনা করতে লাগলাম কৃষ্ণক্షত্রট। এবনি লেগে থাক। কিন্তু সন্ধ্যা পর্যন্ত কিছুই হল না। প্রতিমার নৌকাগুলি আর দর্শকদের নৌকাগুলি উত্তরে দেড় মাইল আর দক্ষিণে দেড়মাইল পথ বাচ দিয়ে বেড়াতে লাগল। দাঁড় আর বৈঠার শব্দ ঝপ ঝপ ঝপ ঝপ ঢাক আর ঢোলের শব্দে তলিয়ে পেল। নদীর তীরে তীরে চাবী বউঝিরা ঘোমটা তুলে সেই প্রতিমার ভাসান আর নৌকা বাচ দেখতে লাগল। পাছে গোলমাল হয় লাল পাগড়ী পুলিশের নৌকোও খানা থেকে এসে পড়ল দু'খানা।

ধানিক বাসে আমরা দেখলাম বড় তরক আর ছোট তরক দুই তরকের দু'খানা প্রতিমার নৌকাই পাশাপাশি চলেছে। আর কী সর্বনাশ, আমাদের গৌর লুকিয়ে লুকিয়ে কি করে ঘেন উঠে

পড়েছে ওদের প্রতিমার নৌকোর। আমাকে দূর থেকে দেখে সে হাসল। তার পরনে নতুন দামী জামা কাপড়। ওদের পাড়ামোঞ্চড় কাতিকের মতই ওর চেহারা। গোলমালের আশঙ্কায় ছোট ছেলেদের প্রতিমার নৌকোর ওঠা বারণ ছিল। কিন্তু গৌর হর সে বারণ মানেনি, আর না হর লুকিয়ে লুকিয়ে এসেছে।

দুই নৌকা কাছাকাছি আসতে ছোট তরফের নৌকা থেকে কে একজন বলল, 'তোমাদের নৌকোর গলুই আমাদের নৌকোর ওপর তুলে দিয়েছ কেন? এ কি অশ্রদ্ধ!' বড় তরফের নৌকা থেকে মাজারা জবাব দিল, 'মোটেই না। আমাদের নৌকোর গলুই ঠিক লোম্বাই আছে। তোমাদের চোখগুলিই ঝাঁক।'।

কথায় কথায় বিবাদ লাগে লাগে। বড় তরফের পুরোহিত, নামাবলী গায়ে মধু চক্রবর্তী নৌকোর ওপর উঠে পাড়িয়ে এসিয়ে গেলেন শাসিনী করতে, 'আ বে তোমরা গোলমাল কোরো না। থামো থামো। ছি ছি ছি, এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে —'

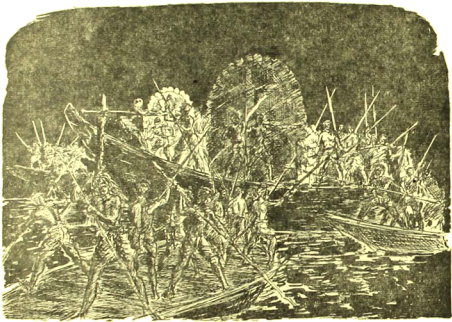
কিন্তু অদাব্যানে তিনি একটা খালি জায়গায় পা দিয়ে পিছলে পড়ে গেলেন নৌকোর খালের মধ্যে। পুরোহিতের টিকি আর ছুঁড়ি দুইই বড়। বং কালো কুচকুচে। ঘেন বিরাট আকারের এক ডাবা হুঁকে নৌকোর মধ্যে গড়িয়ে পড়েছে। বড় তরফের লোকজন পুরোহিত মশাইকে জাপটে ধরে টেনে তুলল। ছোট তরফের লোকেরা ভাই দেখে হো হো করে হাসতে লাগল। পুরোহিত মশাইর হিতোপদেশের ভোরে নয়, আকস্মিক এই হাস্ত রসের ঝোঁকায় তখনকার মত বিবাদের আশঙ্কাটা ভেসে গেল।

কিন্তু বিবাহ লাগল প্রতিমা বিদর্ভনের সময়। আরও একটু রাত বাড়বার পর। ভিন্ন গাঁয়ের প্রতিমার নৌকোগুলি ফিরে গেছে। মন্দির পাড়ার নৌকোগুলিও তাদের ঘাটের দিকে চলল।

ছোট তরফের প্রতিমার নৌকা থেকে আলাদা নৌকায় গৌর আর তার বরদী ছেলেদের নামিয়ে দেওয়া হল। বড় তরফের নৌকাতেও শুধু জোয়ান জোয়ান লোক বইল যারা প্রতিমা বিদর্ভন হবে।

প্রতিমাকে পরানো দামী দামী সব শাড়ি খুলে নেওয়া হল। কাঠামোর পিছনে বড় বড় সব ইটের বস্তা ঝাঁপ হতে লাগল। দুই তরফের নৌকাই একই ঘাটে ভিড়েছে। দুই তরফ থেকেই ভোর ঢাক ঢোল বেজে চলেছে। হঠাৎ শোনা গেল ছোট তরফের নিবারণবাথুই আগে প্রতিমা বিদর্ভন দেওয়ার মতলব করেছেন। কয়েক মিনিট আগে তাঁদের প্রতিমাই বিদর্ভন দেওয়া হবে

এই রটনা শুনে বড় ভরকের নোকোগুলি এগিয়ে এল ; যুগোমুখি হল ছোট ভরকের লাঠিঘালের নোকোগুলি । নিবারণবাবু তাঁর দাঁপার অমুহুরতি না নিয়ে যেই নিকৈনের প্রতিমার বিপর্যয় দেখায় হতুম সিলেন, অমনি হৈ হৈ আরম্ভ হয়ে গেল । শোনা গেল পিছনের দু'খানি নোকোর মধ্যে লাঠালাঠি নাকি তরু হয়েছে ।



চুঠাৎ সমস্ত গোলমাল ঢাক ঢোলের বাজনা ডুবিয়ে দিয়ে একটি ছেলের তীব্র চীৎকার শোনা গেল, 'বাবা বাবা !'

একখানা খালি নোকোর ছইয়েও ওপর থেকে গৌরই টেঁচিয়ে টেঁচিয়ে ডাকছে । সবাই চমকে উঠল দমিত হয়ে উঠল । কী ব্যাপার । এই গোলমালের মধ্যে লাঠির ঘা গিয়ে পড়ল নাকি ওর মাথায়, নাকি বর্শার ফলাটাই নুকে বিঁধেছে ! যা একসঙ্গে ভেদী বেপরোয়া আত্মরে ছেলে নিবারণবাবু । কারো কথা শোনা কারো দাশন যানা ওর কোম্পিতে নেই । উত্তিত শান্তিই হয়েছে বোধ হয় ।

সবাই ওর কাছে এসিয়ে গেল।

কিন্তু গৌর তখন ছইয়ের ওপর ঝাড়িয়ে গলা কাটিয়ে চীৎকার করে বলছে, 'বাবা, ভোঠা-বশাইকে আগে প্রতিমা বিসর্জন দিতে দাও। নইলে আমাদের ঘোর অমৃত্য হয়ে যাবে। আর তাতে বজ্রারক্তি কাণ্ড বাধবে কারোই ভালো হবে না।' আশ্চর্য সেই মুহূর্তে গৌর নাকি একটুও ভোতলায়নি।

একথা শুনে প্রতিমার নৌকোর ওপর নিবারণবাবু ধমকে ঝড়ালেন। লাঠিঘালরা আর লাঠি তুলল না; কিছুক্ষণের মধ্যে সব স্তব্ব হয়ে গেল। সকলের মনে হল দেবীই যেন এক বংশরের কস্তে বিদায় নেওয়ার আগে বালকের মুখে ওই কথা বলে গেলেন।

পকাননবাবু নিজের নৌকো থেকে সেই খালি নৌকোর সিয়ে গৌরকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'বাবা আজ তুইই সব রক্ষা করলি। না হ'লে আজ এই নদীর মধ্যে কত বে ঘোব পাঠা বলি হয়ে যেত তার আর ঠিক ছিল না।

ছড়া

শ্রীবীর চট্টোপাধ্যায়

বক-বক্ পায়রা তেকে দেব টায়রা,
নাকে নাকছাবি।

কাকা করা কাক্রে দূরে সরে থাকরে,
নয় হার খাবি।

চোখ গেল পাখী ভাই স্বরে ভোব জুড়ি নাই,
(ভোকে) কত ভালবাসি।

কিঙে নাচে দিনদিন এক দুই, দুইতিন,
মুখে ফোটে হাসি।

জল চাই জল চাই চাতকের গলাটাই
বুঝি ফেটে যাবে।

মাছ রাঙা পাখীবে ভারি লাল আখিরে
কত জল খাবে!

হাঁস ডাকে প্যাক প্যাক দেখ ওরে চেয়ে দেখ
লাল চোঁট নড়ে।

হুম্ হুম্ প্যাচাটা বে বাধা দেয় সব কাজে
বুক কাঁপে ডরে।

চাঁদের নিজের কোন আলো নেই। সূর্যের প্রতিফলিত আলোর এ ঝলমল করে ওঠে। বলা বাহুল্য, সূর্য একসময়ে চাঁদের অর্ধেকটা মাত্র আলোকিত করতে পারবে। পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরছে, চাঁদ পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে; ঘুরতে ঘুরতে একসময় এমন এক অবস্থা হয় যখন চাঁদ, পৃথিবী, সূর্য একটি সরলরেখায় পড়ে, চাঁদ পড়ল মাঝে। চাঁদের বেনিকটা* আলোকোজ্জ্বল বেনিকটা সূর্যের দিকে, অঙ্ককার দিকটা পৃথিবীর দিকে। এক্ষণ পৃথিবী থেকে তখন চাঁদকে দেখা যায় না। কিন্তু আকাশেই থাকে, সূর্যের আলোয় আড়াল দিয়ে থাকে। তারপর ঘুরতে ঘুরতে চাঁদ সরে যায় (পৃথিবীও সরে, সূর্যই সরে না), তখন ক্রমশঃ চাঁদের উজ্জ্বল দিকটা একটু একটু ক'রে চোখে পড়ে—এক এক “কলা” ক'রে। তখন সন্ধ্যার আকাশে চাঁদ হয় “কান্তে”।

ভাল ক'রে লক্ষ্য করলে চাঁদের অঙ্ককার দিকটাও আবছা আবছা দেখা যায়; কিন্তু সূর্যের আলোতে নয়, পৃথিবীর আলোতে। পৃথিবীর ওপর চাঁদের আলোর চাইতে চাঁদের ওপর পৃথিবীর আলো অনেক বেশী ছোরাগো; এর এক কারণ চাঁদের চাইতে পৃথিবী অনেক বড়; দ্বিতীয় কারণ, প্রতিফলনের মাধ্যম হিসাবেও ভাল। কাজেই এর উজ্জ্বল অঙ্ককারাঙ্কর দিকটা আলোকিত করে। চাঁদ ক্রমে ঘুরে এমন জায়গায় এসে পড়ে যেখান থেকে ওর উজ্জ্বল দিকের অর্ধেকটা দেখা যায়। তারপর চাঁদ আরও ঘুরতে থাকে, আর ওর আবরণ ক্রমেই খুলে পড়তে থাকে; তারপর পৃথিবীকে মাঝখানে রেখে সূর্য ও চাঁদ—তিনটিই—এক সরল রেখায় পড়ে। এই সময় চাঁদের অঙ্ককার দিকটা সম্পূর্ণ আড়ালে পড়ে যায়; এই হ'ল পূর্ণচন্দ্র!

কিন্তু চাঁদও খেমে নেই, আমরাও খেমে নেই। তাই আবার চাঁদের উজ্জ্বল দিক আড়ালে পড়তে থাকে, অঙ্ককার দিকটা পৃথিবীর “চোখে” পড়ে, পূর্ণচন্দ্র আবার অর্ধচন্দ্র হ'তে হ'তে কলার কলার অমাবস্তার অঙ্ককারে বিলীন হ'য়ে যায়। ২৯শ দিনে সে কিরে আসে সেই জায়গায় যে-জায়গা থেকে এই “লুকাচুরি” শুরু হয়েছিল।

জন্ম-রহস্য

চোখ দিয়ে বসে আছি, কখন অন্ধর কাটি
বাহিরবে প্রথম পল্লব;
একমনে আছি চেয়ে, ধরা যদি পড়ে তাহে
নিখিলের আদি কথা সব।

সারাদিন বসে বসে, তবু চোখে এসে শেষে
চরাচর ডুবিল তিমিরে;
প্রভাতে দেখিহু ঝেগে নয়নে কিরণ লেগে—
কচিপাতা কাঁপিছে সমীরে।



হৃদয়ী শ্রুত

[উপন্যাস]

ঘোষাচার্য

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

দীপহামার সঙ্গে কলকাতার ফিরে পিনাকী আর একদিন ছুটিও নষ্ট করতে চায় না। তার সমস্ত মনটা কেন জানি চলে গিয়েছে মায়ের কাছে। যা, যা, মাকে কি করে ভুলেছিল এতদিন ? মায়ের অন্তরের কথা শুনেও পিনাকীর কিশোর মনে তেমন উৎকণ্ঠা জাগেনি, কারণ ম্যালেরিয়া-জ্বর পাড়াগায়ে সবায়েরই হয়ে থাকে মাঝে মাঝে, সবাই জানে। এর আগেও তো কতবার মায় জ্বর হয়েছে, আবার গেরে গিয়েছে। বগল কবিরাজের পাচমেও যদি কাজ না হয়, তখন বাবা বনমালী-ডাক্তারকে ডাকেন, ডাক্তার এসে ওষুধ মেন করেক লাগ। ভি. গুপ্ত, এডওয়ার্ডের টনিক, আরো কতরকমের ওষুধ আছে ম্যালেরিয়া জ্বরের। একবার বনমালী-ডাক্তার কিছুদিনের জন্য অস্থগ্নস্থিত ছিলেন গ্রামে—কি একটা কাজে, লোকে বলে, বাপমায়ের আত্মার কল্যাণের জন্য পিতৃ সিতে গিয়েছেন ডাক্তার গম্বাতে—পিনাকীর ভেড়ে জ্বর এল। উঃ, কি জ্বরের মানি ! বাবা শেষে জ্বর-ডাক্তারকে ডাকলেন। জ্বর-ডাক্তার বৃকে, পেটে, গিঠে বল লাগিয়ে গম্ভীরভাবে কিছুক্ষণ পরীক্ষা করে বললেন—বেনিগ্যান ম্যালেরিয়া হইছে—যেক্টার খালি কুমে জাবেনে। পাঠায় মেবেন ওষুধের শিশি—ভরের কিছু দেখ্‌তিছি নে।...

ভয়, ভয় করে বৈ কি। ছেলে দিন দিন বিছানার মিশে যাচ্ছে, জ্বর কিছুতেই ছাড়ছে না। যা ঠাকুরঘরের দরজায় মাথা কোটেন। মায়ের মনে দাহস আর ক'মিনই বা থাকে ? শালগ্রাম শিলার দিকে ডাকিয়ে বার বার প্রার্থনা জানান, ঠাকুরঘরের দরজায় পাড়িয়ে, অন্ত লোকের

অহুপহিতিতে চোখের জল ফেলেন। কতবার যে কিরে-ঘুরে মায়ের আঁচল মিনতি দেবতার চরণে লুটিয়ে পড়েছে তার হিসেব এক দেবতাই জানেন। অংশবে পল্লোগ দেবতাও মুখ ভুলে চান। সাব-ডিসিন থেকে আসেন বৃদ্ধ-ডাক্তার। লোকে বলে কালীসিদ্ধ বোগী ডাক্তার। হোমিওপ্যাথি মতে চিকিৎসা করেন, কিন্তু কি আশ্রয়! শুধু একবার রুগীর স্ট্রিক্তাকিরেই ধরে ফেলেন অহু, নাড়ীও টেপেন না, লক্ষণও রিগোস করেন না। তাঁর মতে রোগের লক্ষণ তো রুগীর চাউনি থেকেই ধরা যায়। কি ধরা যায়, কি ধরা যায় না তা নিয়ে তর্ক বুধা, তবে একথা সত্য বৃদ্ধ-ডাক্তারের অহুমানাই শেষ পর্যন্ত সত্য হয়ে দাঁড়ায় এবং শেষ পর্যন্ত তাঁরই ওষুধে শিনাকী সেরে ওঠে। শিনাকীর অহু শেষ পর্যন্ত টাইফয়েডে ধাঁড়িয়েছিল। আটশ দিন পর জ্বর ছাড়ল, অরুণ্য করল শিনাকী, কিন্তু সম্পূর্ণভাবে সুস্থ হয়ে উঠতে আরও অনেক সময় লেগেছিল।...

বেলার বাবা রজন কাকার সঙ্গে বাড়ী বাবে শিনাকী। রজন কাকা পাতিপুত্রে থাকেন। রেলওয়ে গার্ড, তাঁর সঙ্গে গেলে ভাড়া লাগবে না, সেটা অবশ্য কোন কারণ নহ, সঙ্গে বাবার লোক নেই আর। দীহু-মামা যেতে পারবে না, কি একটা বিশেষ কাজে আটকে পড়ে গিয়েছে। শিনাকী অচল ওঠাগলে রজন কাকার সাহায্যে একটি নড়বড়ে চেয়ারে বসে ভাবছিল অনেক কথা, অনেক পুরনো স্মৃতির ডিড় ভরেছিল তার মনে। রজন কাকার ভাকে চমক ভাবে শিনাকীর। ছোট্ট পুঁটলিট হাতে নিয়ে নেমে যায় শিনাকী। মালগাড়ীর ইঞ্জিন ধোঁয়া চাড়ে, প্রকাণ্ড গাড়ী, ভ্যানের পর ভ্যান জুড়ে দিয়েছে—গার্ডের গাড়ীটাও আবার একবারে শিচ্ছে। গার্ডের কামরা, ছোট্ট ঘর, বলবার জায়গা মাত্র একটি ছোট টুল।

রজন কাকা হটমিল বাতান, নীল পতাকা নাড়তে থাকেন, গাড়ী চলতে শুরু করে। ক'লে রঙের গার্ডের হাতের বাতিটা কি অদ্ভুত! অন্ধকার রাত্রিতে আব্বা আব্বা শুধু দেখা যাচ্ছে মালগাড়ীর বহর। গাড়ীর পর গাড়ী, লোহার রেলপাড়া, কত যে লাইন দরজার ঠাক দিয়ে দেখা যায়। লাইনগুলোর উপর মাঝে মাঝে আশপাশ থেকে আলো পড়েছে, আবার কোথাও একেবারে অন্ধকার। কিছুদূর পর্যন্ত চোখে দেখা যায়, তারপর সব একাকার। ঝিক্, ঝিক্, ঝিক্, কি আস্তে আস্তে চলে মালগাড়ী! অলস, মদ্যবগতি অথবা ভায়াক্রান্ত, ভরাগ্রন্থ বৃদ্ধ যেমন পদরা নিয়ে চলতে পারে না তাড়াতাড়ি, অনেক পেছিয়ে থাকে। হন্ হন্ ক'রে এগিয়ে যায় লণ্ণপচাবী যুগের বল—হাটের দিনে, শিনাকীসের গ্রামের শেষে খালের বাঁকে—একমাইল ঘুরে। তেমনি সাঁ করে চলে যায় প্যালেঞ্জার ট্রেন। কোন ট্রেন, কি নাম, কোথায় বাবে শেষে? রজন কাকা বলেন—ওটা এক্সপ্রেস—ভোর রাতেই পৌঁছে বাবে থলনা।

—কখন বাড়ী পৌঁছবে আমরা?...

লাকটুগী, সাহেবী পোশাকে পাড়িয়ে আছেন রজন কাকা। গাড়ীর দরজায়—আটা ধরে। রাশভারী লোক, তাই বোধহয় উত্তর দিলেন না?—কানে কি কম শোনে? কি জানি! পিনাকী আর প্রশ্ন করতে সাহস করে না। রজন কাকার কি ক্ষমতা!—বানী বাজালেন, আর অমনি এতবড় গাড়ীটা চলতে শুরু করল! পিনাকী মনে মনে ভাবে, নীলরতন সরকার হবে, না রজন কাকার মতন রেলওয়ের গার্ড হবে? সমস্তা বটে। স্তার নীলরতনের বাড়ী গেছে নি পিনাকী, কিন্তু সেখান রজন কাকার কোঠাবাড়ী মোতলা, অনেক ঘাঘগা-ম্মিও কিনেছেন। না, পিনাকী রেলওয়ে গার্ডই হবে।...

পরদিন খুলনায় যখন মালগাড়ী এসে পৌঁছায় তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। অচেনা ঘাঘগা, যদিও নাম শুনেছে কস্তুরী, আচ্ছন্ন মতন পিনাকী চলতে থাকে রজন কাকার পিছনে পিছনে। রজন কাকার সমস্ত পিনাকীর ঘরবাড়ি বদলে গিয়েছে। কালো কুচুচে রঙ, কিন্তু মূগের মধ্যে কেমন লাগে, বড় যদি কর্ণা হোত তা'হলে রজন কাকাকে সুপুরুষই বলা চলতো। রাশভারী তেমন কৈ, বেশ তো হেঁদে হেঁদে কথা বললেন খুলনায় পৌঁছবার পর পিনাকীকে যে একটু বিশেষভাবে স্নেহের চোখে দেখেন, সে কথা পিনাকী কি জানে না?

কতলোক ব্যতির করে, রাস্তায় দেখতে পেলেই নমস্কার করে এগিয়ে আসে—রজন কাকার সঙ্গে রাস্তায় চলাও ফাশাদ। চল্লিশ হাত বাঁধা যেতে দশবার রাস্তার ধোঁস বাঁধা। কিন্তু ভারী বিরক্তিকর। পুটুলি হাতে রাস্তার পাড়িয়ে পিনাকী ভাবে কখন যে ষ্ট্রিমারে গিয়ে উঠবো, ড্যানা একেবারে ব্যথা হয়ে গেল যে। শুধু কি ড্যানা ব্যথা, সারাদিন স্নানাহার হয়নি, ঘুমে চোখ চুলচুল—ব্রাহ্মণের ছেলে, হোটেলের ভাত খাওয়া চলবে না।...

—বাঁধা একনো সময় আছে, মত করো তো। গরম গরম ভাত, আর অড়হংকা ডাল, বেগুন ভাজা, কইমারের কোল—খেয়ে নাও, কাজে লাগবে। সারাদিন ভাত পেটে পড়েনি। শুধু সন্ধ্যা খেয়ে কি থাকে যায়?

পিনাকীর তস্তা ছুটে যায়, কিন্তু মত বদলাতে সাহস করে না। বাস্ রে, বাবা যদি কোনকসমে টের পান, তা'হলে কি রক্ষে আছে? সাহেবরা কি সব মেয় পাউকটিতে, তাই পাউকটি পর্যন্ত খেতে নিষেধ করে দিয়েছেন বাবা। পিনাকী অক্ষরে অক্ষরে পিতার নিষেধ পালন করে এসেছে।

নীলিমার মা একবার নিজহাতে সুন্দর পুড়িয়ে বানিয়েছিলেন, কত সাধাসাধনা করেও পিনাকীকে খাওয়াতে পারেননি। পিনাকীর মনে আশঙ্কা জাগে, যদি মূগীর ভিন্ন বা অন্য কোন নিষিদ্ধ ব্রব্য ঐ বিলিতি বাবারের মধ্যে থাকে তাহলে তো আর আচার থাকলো না। বাবারের নাম যখন পুড়িয়ে তখন পাউকটি জাতীয় নিচর কিছু সোযের বস্তুর মধ্যে আছেই আছে। লোভ হয়

থেতে—নীলিমা মুখের কাছে তুলে ধরে, বলে খাও, খাও, সাহেবদের জোর দেখেছ, পুড়িং খেলে তোমারও সেরকম জোর হবে। হাঁসের ডিমে ভৈরী, কোন দোষ নেই এতে।

কিন্তু তবুও পিনাকী যায় না। পিতার নিবেদ, কলকাতার আসবার আগের দিন কাছে তেকে বলেছিলেন—তুমি যে বাপের ছেলে, সে বাপের মহাদা রেখেই, অন্যায় হ'তো না। আত্মা শুকণাং হুবিচারনীয়া—কথাটা বারবার বাবার মুখে শুনতে শুনতে পিনাকীও কঠর। নিজের মনের বিব্রোহী কৌতূহলকে শাসন করে পিনাকী। না, না—বাবা তখন বারণ করেছেন, তখন না হয় একদিন নাই খেলায়। কেনই বা নিয়ম ভাঙি? নিয়ম, আচার, অহুষ্ঠান—এসব মানলে কি লাভ? বাবা বলেন—মাতৃষের চরম লক্ষ ব্রহ্মলাভ। ব্রহ্মলাভ করতে হোলে আচার চাই। আচারভঙ্গির পরে চিত্তশুদ্ধি, চিত্তশুদ্ধির উপরেই ধর্মের উন্নতি নির্ভর করে। যেখানে দেখানে খেলে শরীরও খারাপ হোতে পারে, মনও অপবিত্র হয়ে যায়। বতই নিজেকে শাসনে রাখবে, ততই মনের জোর বাড়বে, এবং তোমার কথাও অপর শুনবে জেনো। শিশুর বিশ্বাস ও বিশ্বাস নিয়ে পিনাকী অনেকদিন আগে একবার বাবাকে জিজ্ঞেস করেছিল—ব্রহ্ম কে বাবা? ব্রহ্ম ঠাকুর একটু বুঝে মোড়ায় বলে হ'কো বাচ্ছিলেন, পিনাকীর প্রশ্নে হেসে ওঠেন। কিন্তু সর্বশ্বর চক্রবর্তী পুত্রের প্রশ্নের উত্তর গভীরভাবেই দিয়েছিলেন—ব্রহ্ম মানে ঈশ্বর। ঈশ্বরের চেয়ে বড় আর কেউ নেই, তাই তাকে লাভ করলে সব চেয়ে বড় জিনিষ লাভ করা যায়। আর তা পেতে হোলে সদাচারী, নিষ্ঠাধার হওয়া উচিত। আমাদের পূর্বপুরুষ ধারা বোগবলে বিবাক্জান লাভ করেছিলেন, তাঁদের নিরিষ্ট আত্মা পালন করার নামই সদাচার, বুঝলে।

পিনাকীর মনে তখন প্রশান্ত মহাসাগরের উপর জাহাজে করে যে সাহেবরা নতুন দেশ আবিষ্কার করতে অভিযান চালিয়ে চলেছিল অস্ট্রেলিয়া ছাড়িয়ে—সেই সাহেবদের তবিত্ত্ব লক্ষ্যে ধৈর্য কৌতূহল। ব্রহ্মলাভ না হলেও তার ক্ষতি নেই। আলোচনা হাতে আর না বাড়ে তাই সার দিয়ে বলেছিল—বাবা, সেই গল্পটা আপনি এখনও শেখ করেননি।

আর একদিন পিনাকী জিজ্ঞেস করেছিল বাবাকে—সাহেবদেরও তো ব্রহ্মাই বানিয়েছেন, তাহলে সাহেবী খাবার খেলে কেন আমাদের দোষ হবে বাবা? মুসলমানরাও তো মাঝাঝ পড়ে, ওদেরও তো ভগবান আছেন—তা হলে?

সর্বশ্বর চক্রবর্তী দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন, ব্রহ্ম ঠাকুরের দিকে মুখ করিয়ে বলেন—অদৃষ্টের লেখা, কে খণ্ডন করবে? পিনাকী বুঝতে পারেনি সেদিন কেন বাবা ও কথা বলেন? বাবা কি রাগ করলেন? বাই হোক, পিনাকী আর বাবাকে খাটায়নি, বাবাই একদিন তেকে বললেন—তখন পিনাকী, তাকে একটা কথা বলে রাধি। তোর মধ্যে তোর বাঁহর রক্তের জোর বেশী কিনা,

তুই স্নেহভাবাপন্ন হয়ে পড়বি এবিষয়ে আমার আশঙ্কা চিরকালই আছে—তোরা কোণ্ঠীর ফল আমি বিচার করে দেখেছি—অনেক কথা বাবা বলে বান, শিনাকী অবাক হয়ে গোনো। তা'হলে দাদুর সঙ্গে বাবার মতের মিল নেই মোটেই। দাদু ইংরাজি লেখাপড়া না শিখেও চিকিৎসা ব্যবসায়ী হিসাবে বৎ আধুনিক কৃষ্টির লোকের সংস্পর্শে এসেছেন, তাই কি তিনি মাংসানী? পেরান্না খেতে আপত্তি নেই তাঁর, এমন কি মূল্যমান, ক্রীস্টনে ছুঁয়েও মান করেন না? শস্তর ও জামাতার মধ্যে ভাবধারার বিরোধের ফলে শিনাকীর মায়ের অনেক দুর্গতি হয়েছে—শিনাকী কিছু কিছু স্তনেছিল বাবার ছাত্র অনাধবন্ধুদার কাছ থেকে একদিন।

বাবার সেই একটি কথা আর বলা হয়নি। দৈব রায় এসেই হাকডাক জুড়ে দেন। খেঁদা-নাক অভিন্ন্য দস্তগ সেদিন দৈব রায়ের সঙ্গে এসেছে। অক্ষর পোদ্দার, ব্রজ ঠাকুর, বড় বোস, তারক পালিত—গোটা দাবাড়ের দলটাই এসে গিয়েছে। শুকু হয় দাবা খেলা। বটী পর বকু। শিনাকীও খুঁকে পড়ে দাবার চাল দেখে, ছ'একটা চালও বলে দেয় ব্রজ ঠাকুরকে। ব্রজ ঠাকুর তারিফ করেন।

অক্ষর পোদ্দার বন্থনে আঙঠায়ে তবিস্তদ্বাণী করে—এইটা কথা করে রাখলাম—মেহে নেবেন আপনাদা—খোকা ঠাউর একদিন অর হবেন—না হ'য়ে আর জাজ্জেন না। কি মাথা, আমরা বুড়ো মাহুথ—এতদিন ধরে মেহে আস্তিছি—

(ক্রমশঃ)

পুজোর বাস্তি

ঐঅনিলেন্স চৌধুরী

নাক-চড়া-চড়, নাক-চড়া-চড়

বাজল পুজোর ঢাক,

ঘুমের কঁাকে অমনি ডাকে

ঠাকুরদাদার নাক।

কাই-না-না-কাই কাই-না-না-কাই

তান ধরেছে কাঁসি

ঠিক ছপুরে অমনি শুরে

চোঁচায় কেলোর মাসী।

প্যা-পো-পো প্যা-পো-পো

মানাই তোলে পো,

একনাগাড়ে অমনি বাড়ে

খোকনমণির গৌ।

তাক-ছুমা-ছুম তাক-ছুমা-ছুম

উঠল ঢোলের বোল,

ডাকলে কুকুর ছোট কাকুর

বাড়ে ভুঁড়ির দোল।

তিরুপতি বালাজী

ত্রিরাশপদ মুখোপাধ্যায়

দক্ষিণ ভারতের প্রথম প্রান্তে রয়েছে একটি প্রসিদ্ধ তীর্থভূমি। উড়িষ্যার যেমন নীলাচল, উত্তর ভারতে যেমন প্রয়াগ বারাণসী, আর বাংলার যেমন কালীঘাট তারকেশ্বর—জাবিড়ে তেমন তিরুপতি বালাজী। তীর্থকাষীরা এগুলি একবার না একবার দর্শন করবেনই। পুরাণের মতে তিরুপতি হ'ল আদি বরাহকেশ্বর। এখানে বালাজী দর্শনে আসেননি এমন তক্তিম্যান হিন্দু দক্ষিণ দেশে আছেন কিনা সন্দেহ। তিরুপতি বালাজীর আর একটি নাম হ'ল ত্রিভেঙ্কটেশ্বর। জাগ্রত দেবতা তে। বটেই, বে প্রকৃতি-পরিবেশে তিনি বিরাজিত—তার আকর্ষণও বড় কম নয়। সমতল-ভূমি থেকে অনেক উঁচুতে তিরুমালায় পাহাড়ে (মতান্তরে তেঙ্কটাল বা শেবাচল) এই স্থানিৎ। বৃষভাঙ্গি, নীলাঙ্গি, অন্নভাঙ্গি, আনন্দ্যাজ প্রকৃতি সাতটি পাহাড় তিনিয়ে এগারো মাইল পথ ভেঙ্গে ত্রিভেঙ্কটেশ্বরকে দর্শন করতে হয়। পথ এককালে দুর্গম ছিল—পায়ে হেটে শেবাচলে পৌঁছতে লাগত পুরো একটি বেলা। ভোর বেলায় যাত্রা করে—সন্ধ্যার ক্ষিরে আলত হাজীরা। এখন বাসের কল্যাণে পথ হয়েছে সুগম—যাত্র একটি ঘণ্টায় বালাজী ক্ষেত্রে পৌঁছানো যায়।

রেলের পথটা কিন্তু কলকাতা থেকে সোজা নয়। ঝাঁক কন্ডাক্টমারী বা রামেশ্বর দান—ঠায়াও তিরুপতিকে পাশ কাটান, কেন না কলকাতা থেকে মাদ্রাজ এই পথের মধ্যে তিরুপতি পড়ে না। মাদ্রাজের আশি মাইল আগে শুভুর বলে একটা বড় জংশন স্টেশন আছে, সেখানে গাড়ী বদল করে প্রায় বাট মাইল গেলে তিরুপতি ইস্ট স্টেশন। লাইনটি সম্প্রতি ব্রড গেজ হয়েছে; শুভুর থেকে রেনিগুটার য়িগেছে। এই রেনিগুটার আর একবার গাড়ী বদল করে—মিটার গেজে মাত্র সাত মাইল পথ তিরুপতি বালাজী। স্টেশনের গায়েই প্রকাণ্ড ধর্মশালা—বাকবার বন্দোবস্ত চরংকার। নিখরচার এমন আরাধনার্থক বাসস্থান ভারতবর্ষের কোথাও মিলবে না। ধর্মশালায় পিছনেই তিরুপতিগামী বাস-স্টেশন। যেমন অসংখ্য হাজী তেমন বাসের সংখ্যাও বেশি। প্রতি আশ্বিনী অম্বর বাস ছাড়ছে।

তিরুপতি শহর কিন্তু দু'টি। স্টেশন আর ধর্মশালা হ'ল নিম্ন তিরুপতিতে, উর্ধ্ব তিরুপতিতে অ'ছেন ত্রিভেঙ্কটেশ্বর—শৈলপুত্রীর মহিমাযুক্ত দেবতা। নীচের তিরুপতি থেকে এর দূরত্ব তেরো মাইল। সমতল ভূমিতে মাত্র দু'মাইল, বাকিটা পাহাড় বেয়ে উঠতে হয়। এই যাত্রাপথটি যেমন হুম্মর—চারিদিনের দৃশ্যপটও তেমনি মনোরম। অক্টোবরের শেষেও বদন্তকালের স্পর্শ মিলবে—বহিও এসময়ে এখানে বর্ষাকালের মেঘর আকাশ ভাসে মাথার উপরে। ঝুটি নামলে একটু বিব্রত হতে হবেই, কিন্তু যাত্রাপথের চরংকারিয়ে তা নিয়ে মনে অতিযোগ উঠবে না।

নিম্ন-ভিক্রপতিও ভাল শহর। মন্দিরও আছে কয়েকটি। তার মধ্যে বালাজীর ভ্যেঠ মহোদর গোবিন্দজীর মন্দির প্রধান। শ্বেতপুর আর দেউল মিসিয়ে দক্ষিণী-রীতিটা বজায় রেখেছে। মহালক্ষ্মীর মন্দির একটু দূরে—এক বাইলেরও উপরে। পাহাড়ের কোলে কপিল-তীর্থ—ওই হ' বাইলের মধ্যে। ইনিই সেই সাংবাদ্যর্শন প্রণেতা কপিল—যার কথা ইন্সল পাঠ্যে সংক্ষিপ্ত ভাবেই আছে। ভিক্রপতির এগুলি দ্রষ্টব্য জায়গা। এখান থেকে বাসে করে কাল হস্তীতে বাওয়া যায়—সে অনেক দূরের পথ। এখানে বায়ুযুক্তিতে আছেন মহাদেব।

ভিক্রপতিতে ব্রিস্তেবটেশ্বরের মূর্তি মাঝি ছুই দেবতার সম্মিলিত মূর্তি। পালনকর্তা বিষ্ণু আর সংহারকণী মহাদেব একই গেছে বিরাজমান। এটি কল্পনা বা অহুমানের বিষয় নয়—মূর্তির চারটি হাতের প্রত্যেক চিহ্ন দেখে এই সিদ্ধান্তে পৌছেছেন পণ্ডিতরা। উপরের হাত দুটিতে চক্র আর গদা—নীচের দুটি হাতে ভূতঙ্ক-বলয়। সর্বাঙ্গে প্রচুর অলঙ্কার—অসংখ্য ভক্তির-অর্থ্য—মানত শোধের চিহ্ন।

মানত শোধ কথাটি আমাদের দেশে নতুন নয়। কালীঘাটে মানত শোধ দেওয়া কে না প্রত্যক্ষ করেছে? পাঠাবলি দেওয়া থেকে—লোনার মিড, মাখার মুহুট, গায়ের হাতের পায়ের গলার গহনা, সবই তো মানত শোধের ব্যাপার। শুধু সঙ্কট-মুক্তির অস্ত্রই দেবদ্বারায়ে মানত করে না—মাহুৎ—অন্নপ্রাশন উপনয়ন বিবাহ প্রভৃতি মানসিক কর্মের অহুষ্ঠানও এখানে হুমুস্পন্ন হয়। তাই প্রতিদিন যাত্রীর ভিড় কালীঘাটে। দক্ষিণ ভারতে তেমনি মানত শোধের ক্ষেত্র ভিক্রপতি বালাজী। এখানে কেশদান, উপনয়ন, বিবাহ প্রভৃতি নিত্য ও নৈমিত্তিক অহুষ্ঠান। প্রতিদিনই যাত্রী আসে দলে দলে। জীবনে একবার-না-একবার ভিক্রপতি দর্শন করা চাই-ই। সংসারে বিপদ এড়িয়ে থাক। যার না—আবার উৎসব-আনন্দে আত্মীয় ফুটবের সঙ্গে দেবতাকে টেনে না নিলে মন ভরে না। আবার সঙ্কটজ্ঞানে যে দেবতার সাহায্য বড় অধিক—তারই চরণে ভক্তি-অর্থ্য আর প্রণাম প্রার্থনার ফুলগুলি এসে অব।

এই আদি বরাহকৃষ্ণকে কেন বৈহুষ্ঠধার বলা হয়েছে—তার একাই পৌরাণিক কাহিনী আছে। একদিন মহাবি ভূগু...পত্নীকী করতে বার হয়েছিলেন—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর—সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়-ত্রয়ী তিন দেবতার মধ্যে প্রধান কে? সেই উদ্দেশ্যে প্রথমে তিনি সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার কাছে গান। ব্রহ্মা তখন ধ্যান করছিলেন। ভূগুর উপস্থিতিতে তাঁর মন বিচলিত হওয়ায় ক্রুদ্ধ মুষ্টিপাত করেন। ভূগু অত্যন্তের দান কৈলাসে দেব দেব মহাদেবের কাছে। মহাদেব পার্বতীর সঙ্গে নিভৃত আলাপে মগ্ন ছিলেন—ভূগুকে তিনিও সম্ব করতে পারলেন না। বিভ্রান্তিত হয়ে ভূগু চললেন বৈহুষ্ঠ-ধামে। সেখানে কীরোদ সমুদ্রে অনন্তশয্যায় শুয়েছিলেন বিষ্ণু, লক্ষ্মী করছিলেন পদসেবা।

দু'ভায়গার উপেক্ষার জ্বালা...ভৃগু ঢেলে দিলেন নারায়ণের বুকে একাই পদাঘাত করে। উঠে বললেন নারায়ণ একটুও ক্রোধ প্রকাশ করলেন না—উঠে নানা হতে লক্ষ্য আর সমাদর জানালেন। সম্রাট হলেন ভৃগু—তিনি মুকুটধারী জানালেন—তিনিই তিন শক্তির মূলধার।

ভৃগু সম্রাট হলেন—লক্ষ্মী কিন্তু ক্রুদ্ধ হয়ে বৈকুণ্ঠ ছেড়ে মর্ত্যলোকে চলে এলেন। তিনি জানিয়ে এলেন—যে দপরে তাঁর বাস—সেই ক্ষেত্রটিতে পদাঘাত করেছেন ব্রাহ্মণ, হুতরাং বৈকুণ্ঠে তাঁর স্থান নাই। লক্ষ্মী যদি মর্ত্যে এলেন—তাঁর অবস্থানে ত্রিনিবাসও এলেন মর্ত্যে। এবং বৈকুণ্ঠপুরীর মত পবিত্র একটি জায়গা বেছে নিয়ে সেখানে বাস করতে লাগলেন। সেই স্থানটি হ'ল নেবাচল—আদি বরাহক্ষেত্র। একটি ভেঁতুল গাছের ডগাধ বিরাট একটি বন্যাক শূণ্ ছিল—তারই মধ্যে আশ্রয় নিলেন নারায়ণ। তারপর চোল রাজাকে নতি স্বীকার করিয়ে তাঁর মহিমার প্রকাশ। সে বিজুত কাহিনী এখানে থাক। পরে লক্ষ্মী অবশ্য এখানে এসেছিলেন—কিন্তু নেবাচলের পারশ্বদেশেই তিনি রয়ে গেলেন। এইখানেই মহালক্ষ্মীর মন্দির।

পাহাড়ের উপর তিরুপতি শহরটি বেহাং ছোট নয়, মন্দিরটিও সামান্য নয়। শহরে বড় বড় অট্টালিকা, লোকান পসার, ধর্মশালা, হৈদুল, হাসপাতাল, হোটেল, জলের কল, প্রকাশ্য সরোবর কি না রয়েছে! পথঘাটও উচু-নীচু নয়—সমতলক্ষেত্রেই রয়েছে বলে মনে হয়। ..

ইতিহাসের কথাটাও নির্ভ্রাণ নয়। অনেকের মতে চোলরাজ ভোগমন চক্রবর্তী নির্মাণ করেন এই মন্দির। এর গোপুরগুলি বিরাট না হলেও চেয়ে দেখবার মত। তার পায়ে উৎকীর্ণ রয়েছে অসংখ্য পৌরাণিক কাহিনী। একটু এলোমেলো ভাবে থাকলেও ধীরে প্রাণপাশি জানা আছে, মূর্তিগুলি দেখলেই পল্লটা তিনি ধরতে পারবেন। এমনি হু'টি গোপুরম পার হয়ে দেউলের সীমানা। বৃহৎ দ্ব্যস্তা দিয়ে তিতরে প্রবেশ করলেই স্বর্ণস্তম্ভ চোখে পড়বে। মন্দির মত দেখতে বলেই ওটা খাটি মন্দির নয়—হরভো বা পিতলের। কিন্তু দেবতার সামনে এমনি একটি শুভ বাধা বক্ষণ দেশের রীতি। উড়িষ্যাও লগ্নাত্ম দেবের মন্দিরের সামনে অরুণস্তম্ভের কথা মনে পড়বে এটি দেখলে। স্তম্ভের বা ধারে অনেকগুলি প্রাণত মণ্ডপ দেখা যায়। কোনটা সম্ভ্রামণ্ডপ—কোনটা ভোগমণ্ডপ—কোনটা বা নটমণ্ডপ। এগুলি নির্মাণে শিল্পীদের কৃতিত্ব যথেষ্ট। পাথরের খামের গারে...হালুহ হাতী খোঁড়া মূর্তি প্রভৃতি উৎকীর্ণ। ছোটখাটো নয় মণ্ডপগুলি—দু'পাশেও লোক এক একটি মণ্ডপে অনাধানে স্থান পেতে প'রে। নীচের থেকে মালমশলা হয়ে এনে এই বিরাট মেউল গড়ে তোলার কথা ভাবলে অবাকই লাগে। সেকালে ক্ষুদ্রগামী স্থানবাহন ছিল না—ক্রোণ প্রভৃতি ভার-উত্তোলক আধুনিক যন্ত্রপাতিও ছিল না, অথচ দৌধ বা মন্দির নির্মাণে ভারি ভারি পাথরের ব্যবহার যত্নতর দেখা যায়।

কতদিনে কত শিল্পীর সমবেত চেষ্টায় শৈলশিখরের এই বিরাট বেব-মেউল বে গড়ে উঠেছে!

পাহাড় ভিকোতে ভিকোতে বাস যখন দেবচলের দিকে ছুটে আসে...তখন সারা দেহমন আনন্দে নেচে ওঠে। ধারা গাউলিং-এ গেছেন, তাঁরা খানিকটা অস্থির করতে পারবেন এই রমণীয় স্থানের আনন্দকে। পাগড়ে পথগুলি থাকে থাকে সান্নানো—তারই উপর দিয়ে জিন্স্‌ডাগ্‌ কাহনায় বাস দৌড়লে কার মন না খেলান্ন নেশায় যেতে ওঠে। উপর থেকে নীচের তাকালে একসঙ্গে মন বারোটা ঝাঁক করা পথ দেখা যাবে, চোপে পড়বে পাহাড়ের গায়ে গড়ানে ঢালু ভূমিটা—সব নীচের মত একফালি সিঁড়ির মত রাজপথ, খেলান্নর ঘরবাড়ী হিন্দির হানবাগন, ছবির মত পুকুর নদী গাছপালা আর পুতুলের মত হাহব জীবজন্তু। উপরে যেথেকে ধরতে আমরা ছুটেছি বাসে চেপে। শব্দ করে হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে বাস উঠছে আকাশের নাগাল পেতে। মনে হচ্ছে এই বৃষ্টি শেষ হ'ল পাহাড়—বাক ঘুরে আসছে আর একটি। যতই উঠছি উপরে খেলার নেশায় যেতে আকাশ উঠছে আরও উপরে। এক ঘণ্টার পথ অপ্রের মতই ছুরিয়ে যায়।

হিন্দির এলে আর এক অদ্ভুত। এই বিরাট বিশ্বকে কেমন কার সৃষ্টি করল মানুষ? এমন হৃদয় কচিচ্ছান তারা শেল কোথা থেকে? অদীম বৈধ আর অননুভবীয় শিল্প-প্রতিভা?

সভ্যতাপে রয়েছে সিংহাসন পাড়ী—নানা ধরনের পুতুল—শোভাযাত্রার নানাবিধ সাম-সরঞ্জাম। উৎসব দিনে এগুলিকে পুরোভাগে রেখে ভোগমুতিকে বাইরে আনা হয়। বিনা উৎসবে হাজার হাজার এসেছেন দেখদর্শনে—উৎসব দিনের কথাটা ভাবতেই পাতা যায় না। এত যে ভিড় দেখদর্শনে একটুও অস্থিবিধা হয় না। ঘাটীরা লাইন দেয়—ঘাটীরা মুখলাবিধান করে—একটু একটু করে সেই লাইন এগিয়ে যায় হিন্দির দিকে। প্রথম প্রাঙ্গণ শেষ হল—আর একটি বিরাট দরজা দিয়ে দ্বিতীয় প্রাঙ্গণে প্রবেশ করতে হয়। তারপর নাটহিন্দির। দে-ও চারিদিকে ঘেঁরা। নাটহিন্দির গেরিয়ে আবার শক্ত শালার দরজা। একটি ছুটি—কিংবা তিনটিই হবে। হিন্দির তো নয়—যেন দুর্ভেদ্য দুর্গে প্রবেশ করছি। হবে না,—অনেক সোনা হিনিমুক্তা হীরা-জহরতের গহনা—অনেক দাবী দাবী আদবাবগজ বালান্ধীর। দেগুলিকে লোভীর দৃষ্টি থেকে রক্ষা করার জন্যই এই ব্যবস্থা। এ ছাড়া সকালে বিধবীরা হিন্দির আক্রমণ করে খননর লুণ্ঠন করত—দেব বিগ্রহ ভেঙে দিত, অপবিত্র করত দেবস্থান। তাদের অত্যাচার থেকে দেব-দেউল আর দেবতাকে ও খন-ঐশ্বর্যকে বাঁচাবার জন্য এত আয়োজন।

হিন্দির গর্ভগৃহ অদ্ভুত। বাইরে বিদ্যুৎবাতির ব্যবহার থাকলেও—এখানে তার প্রবেশ নিষেধ। এখানে বড় ডেলের প্রাণীপ জলছে। লালচে আলোর অদ্ভুতর দূর হচ্ছে না—তেল-সলতে পোড়া একটি পদ্ম বাঁস হচ্ছে। তার সঙ্গে মিশেছে কর্পূরের গন্ধ। এই পদ্ম দেব-হিন্দিয়ার পরিপোষক।

অদৃষ্টত্ত্ব ময় উচ্চারণ করতে করতে বাতীরা এগিয়ে আসে বালাজীর সামনে। রাধ-
রাজেশ্বর মূর্তি বালাজীর। ছ'মণ্ড চেয়ে থাকতে ইচ্ছা হয়—কিন্তু পিছুনে অনেক দর্শনাধী। তাঁকে
প্রণাম করে অত্র পথে বাইরে আসতে আসতে মাঝ পথে—সেবতার প্রদান ভোগ পায় বাতীরা।
প্রণামী আসারের প্রথা নাই—পূরোহিতরাও হাত পাতেন না। বালাজী সকলের উপরেই প্রদান
দৃষ্টিপাত করেন।

বালাজী মূর্তির একটি বৈশিষ্ট্য হ'ল তাঁর ললাটের হৃৎকম্প তিলক। এই তিলক ভ্রুর উপর
থেকে উঠে সারা ললাট ঢেকে দিয়েছে—সেখলেই মনে হবে—তিলকের সুখোশ পরে মুক ঢেকেছেন
বালাজী। ইনি বৈষ্ণবের ঠাকুর হলেও নীচের দু'টি হাতে সর্পভূষণ পরিয়ে দুই ধর্মকে মিলিয়ে দেবার
চেষ্টাও দেখা যায়।

উৎসব-দিনে যে মূর্তিকে শোভাযাত্রা করিয়ে বাইরে আনা হয়—সে হ'ল ভোগমূর্তি।
মন্দিরের বাইরেই রয়েছে প্রকান্ত এক সর্বোবর—নাথ স্বামী পুষ্করিণী। এর ভলে স্থান করে দেবদর্শন
করা বিধি। এই পুষ্করিণীর মাঝখানে আছে ছোট একটি মন্দির। ভোগমূর্তিকে এই মন্দিরে
এনে রাখা হয় পর্ব-দিনে। এখানে স্থান, পুণ্য, ভোগ, আরাতি ইত্যাদি সারা হলে ভোগমূর্তি
মিরে যায় মন্দিরে। বালাজীকে ঘিরে সারা বছরই শহরটি থাকে ভ্রমরমাটা।

বালাজী আছেন শেবাচল নৈলে—ইটিই কিন্তু শেষ পাহাড় নয়। কথিত আছে এই
বরাহেশ্বর ৮৬৬য় ৬০ মাইল—লম্বায় ৬০০ মাইল। পূর্বানের কথা বাদ দিলেও, ডিকরালাই নৈল-
শ্রেণী বহুদূর পর্যন্ত চলে গেছে—তামিলনাথ ছাড়িয়ে মহারাষ্ট্রের সীমানা পর্যন্ত।

এই পাগড়ের গায়ে গায়ে আরও অনেক দেবতার ভাষণ আছে। আট-দশ-বারো মাইল
কি তার চেয়েও বেশি ইটলে ওড়লি দেখা যায়। আকাশগঙ্গা, চক্রতীর্থ, জাবালিতীর্থ, কুরুতীর্থ,
অন্তিতীর্থ, নাগতীর্থ প্রভৃতি বহুতীর্থ আছে।

এসব দেখতে হলে উর্ধ্বতিক্ষিপতিতে দু'একদিন বাস করতে হয়। বাসের অহবিধা কিছুমাত্র
নাই। দেবস্থান বর্ষালা আছে—তার সংলগ্ন হোটেল আছে—রেটে'রেটে আছে ; দোকানে ভাব
কলা নারিকেল প্রভৃতি ফল পাওয়া যায়। দুখও মিলবে। চা না মিলুক—কফির অভাব নাই।
বীনের স্বপাকে রুচি—ঠাণ্ডাও নিত্য প্রয়োজনীয় আনাগপাতি চাল ভাল মশলা প্রভৃতি পেয়ে যাবেন।
বেশভ্রমণে এসে দু'একদিন থেকে গেলে ভালই লাগবে। দেশের সঙ্গে পরিচয় হবে—রাষ্ট্রের সঙ্গে
পরিচয় হবে—আর তটস্থ জিনিষগুলিও দেখা হবে ভাল করে। খণ্ড ভারতবর্ষের মধ্যে অখণ্ড
একটি রূপকে প্রত্যক্ষ করার যে আনন্দ—তাও মিলবে প্রচুর পরিমাণে।



কণিকাকে বুঝিয়ে বললুম, “দেখ, তুই আমার একটিমাত্র ভাতী, আমিও তোরা একটিমাত্র মামা, বৃত্তি, কিন্তু চাকরি তো বজায় রাখতে হবে! – জন্মদিনের সবই তো হ’ল, এখন আমার ছেড়ে দে। অল্প সন্ধ্যার ট্রেনে আমার বেতেই হবে, কাল বয়নিং-ডেট, আর এমন কাছের দায়িত্ব যে না গেলে মহা হুলস্থূল পড়ে যাবে!”

কণিকা মাথা নেড়ে বলে, “না-না—না মামা, আমি তোমার কোন কথাই শুনব না, রাত ন’টার ট্রেন, আমাদের থিয়েটার রাত আটটার মধ্যে শেষ হয়ে যাবে, তুমি যাবে তারপর!”

মিটি কখন ঘরজার পেছনে এসে দাঁড়িয়ে হাসছিলেন, আমার অসহায় অবস্থা দেখে বললেন, “দেখ অমু, ও যখন আবার ধরেছে এ ক’ঘণ্টা থেকেই বা, কতকাল পরে এলি, আবার কবে আসবি—তার তো ঠিক নেই! ন’টার গাড়ী যদি ফেলও হুঁ, রাত একটার আর একথানা ট্রেন আছে।”

আমি বললুম, “তা তো আছে, কিন্তু একেবারে নিরে-সংক্রান্তি করে যাওয়া উচিত কি? আর সে ট্রেন তো রাত একটার পর! বা তোমাদের আজন্ম সেশ বাপু—না ট্যান্ডি, না বাস-ট্রাম”...

সময়টা জীবন মাপ। সব সময়ে আকাশ মেঘে ঢাকা। মাঝে মাঝে এক পললা করে বৃষ্টি হচ্ছে, কখন যে কমানকম জীবনের ধারা নামবে তার ঠিক নেই।

বাড়ীতে গারাদিন হৈঁচৈ হ’ল কণিকার জন্মদিন উপলক্ষে।

যথাদমরে রাতে কণিকাঘরের থিয়েটার হুক হ’ল। যেহেতু এত জন্মর নাচ-গান করল যে, না দেখে গেলে ক্ষোভ থেকে যেত। কিন্তু হঠাৎ ঘড়ির দিকে চেয়েই চমকে উঠলুম। সর্বনাশ! আটটা

বেঙ্গে গেছে। লাফিয়ে উঠে গিয়ে দিমিকে ডেকে বললুম, “আমি চললুম, আর একটিও কথা নয়!” তারপর ওয়াটারফ্রন্ট, ছাতি আর এ্যাটাচিকেসটা হাতে জুলে একেবারে বেরিয়ে পড়লুম রাস্তায়।

টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে—কাদার প্যাচ-প্যাচ করছে রাস্তা—জোরে হাঁটবার উপায় নেই। সাইকেল-রিস্তর খোঁজে দেখতে দেখতে এগিয়ে চললুম।

চলেছি তো চলেছি—একটাও সাইকেল-রিস্তর চোখে পড়ল না। বৃষ্টির বেগও হঠাৎ বেড়ে গেল। রাস্তার দু’চার জন লোক দাড়া চলেছিল, তারা সবাই তাড়াতাড়ি যে দার বাড়ীর মধ্যে গিয়ে ঢুকে পড়ল।

প্রায় আধঘণ্টা পরে একজন ভজ্রলোককে জিজ্ঞাসা করলুম, “হাঁ মশায়, ষ্টেশন কোন দিকে আর কত দূরে বলতে পারেন?”

তিনি বললেন, “আপনি ভুল পথে এগেছেন, এই পথটা পেরিয়ে তারপর বাঁ দিকে কয়েক মিনিট হাঁটলেই ষ্টেশন পাবেন।”

তার নির্দেশ মত, এবার বেশ একটু হনহনিয়ে এগিয়ে চললুম। দু’পাশে জঙ্গল—ঝাঝঝাঝ দিয়ে চলেছি; বৃষ্টিও কমে এগেছে, কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি হাঁটতে বেন আর পাচ্ছি না। টর্চ জ্বলে ঘড়ি দেখে তো চমকস্থির—না’টা বাজে! নাঃ, এ ট্রেন ধরা বাবে না। কিন্তু এখন ষ্টেশনে পৌঁছতে পারলে ধাঁচি! একটা ছোট মাঠের ধারে, একটা গাছের নীচে উঁচু মত একটা টিবি; দেইখানে বসে পড়লুম। পা দুটো টনটন করছে। একটু স্থিরিয়ে নেওয়া দাক মনে করে, একটা সিগারেট ধরিয়ে ভাবতে লাগলুম, এ কোথায় এসুম যে বাবা! কোথাও জনমানবিত্তির চিহ্ন নেই, কি’খি পোকাকর ভাঙ ছাড়া আর কিছু নোনা বাচ্ছে না। দূরে কোথায় একটা শেরাল ডেকে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে আমার সাঁরা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। যে দিকে চাই নিশ্চয় নিবৃত্ত রাত রিমঝিম করছে। শুধু শুভগ্রহের মধ্যে আকাশটা কর্ণা হয়ে স্তরপঙ্কের চাঁদ দেখা দিয়েছে এই দা।

কি করব ভাবছি আর চারিদিক চেয়ে চেয়ে দেখছি এমন সময় হঠাৎ চোখে পড়ল—কে যেন একজন এইদিকেই আসছে।

আদার্জটা ঠিকই। একটা লোক নিমেষে আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েই প্রশ্ন করল, “কোন দ্বার!”

লোকটার যেমন অদ্ভুত গলার স্বর, তেমনি ট্যান্ড-কিরিঙ্গীর মত সাঅ-শোশাক। মাথা থেকে পা পর্যন্ত একটা কালো ওড়ারকোটে ঢাকা; শুধু লম্বা নাকটা ছাড়া অন্ধকারে মুখের আর বিশেষ কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

আমি তো জনমানবশূন্য এই অচেনা জায়গায় পথের হদিশ না পেয়ে খুব অলম্বার বোধ

করছিলাম, তবু লোকটিকে দেখে খুশী হয়ে দাঁড়িয়ে উঠে বললুম, “ওঃ, কি বিপদেই না পড়েছি শশী ! ঠেগনটা কোনদিকে হলু তো ?”

লোকটা বাড়লা কথা বুঝল না—একটা বিস্তী শব্দ করে হিন্দীতে বলল, “কি বলছ ?”

তখন আমি আবার হিন্দীতেই ব্যাপারটা তাকে বুঝে বললুম।

লোকটি বলল, “Oh I see ! তাই বলি এমন সময় এখানে আবার কে এল ! তা তুমি এখন আর কোথায় যাবে, চলো আমার সঙ্গে, আমার হোটেলের বাকী রাতটুকু কাটিয়ে সকালে ঠেগনে যোয়ো।”

আমি লোকটির কথা যেন লুকে নিলুম। তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করলুম, “হোটেল ! এখানে আবার হোটেল কোথায় ?”

লোকটি ভান দিকে জঙ্গলের দিকে দেখিয়ে বললে, “ঐ তো পাঁচ মিনিটের পথ—তাঁহলে চল—মিছে আর এখানে কষ্ট পাও কেন।”

আমি আর ঝিক্‌স্তি না করে তার সঙ্গে হোটেল খাবার জঙ্গ পা বাড়ালুম।

আঁতরাঁকা পথ—কোণ-জঙ্গল-পুকুর-ডোবা পেরিয়ে, লোকটি সত্যিই একখানা বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়াল। কিন্তু বাড়ীতে জনমানবের চিহ্ন আছে বলে মনে হ'ল না। ভাবলুম, এত রাত্রে সকলেই বোধ হয় গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। কিন্তু একটাও আলো জ্বলছে না কেন বে বাবা ! বাই হোক কোন রকমে টর্চ লেলে বাড়ীর ভিতরে লোকটির পেছন পেছন মোতলায় গিয়ে উঠলুম।

লোকটি একটা ঘরের দরজা খুলে দিয়ে বলল, “Here you are !”

আমি খুব বিনোদভাবে তাঁকে খজুরান আনিয়ে, ঘরে ঢুকে চামড়ার বাসন্তী মাটিতে রাখালুম। কিন্তু ঘরে কি দুর্গন্ধ—কতকাল বন্ধ হয় পড়ে আছে কে জানে—ঘরের মধ্যে চামড়াকে আর ইঁদুরের ডাঙি। একটা চেয়ার টেনে বললুম,—বেমনই হোক বাড়ী তো ! কোথায় মাঠে পড়ে যারা যেতুম, তার চেয়ে এই যথেষ্ট। বসেই রাতটুকু না হয় কাটিয়ে দেওয়া যাবে।

বসেই আছি, সাহেবের কোন পাতা নেই। হঠাৎ বাইরের বারান্দা থেকে সাহেব বলে উঠল, “ছালা মিটার, ঘুমোলে নাকি !”

আমি উঠে বারান্দায় বেরিয়ে দেখি—দুটুটে অন্ধকারের মধ্যে সাহেব ইজিচেয়ারে বসে।

আমি বললুম, “ঘুমোব কি সাহেব, ঘরের মধ্যে এমন দুর্গন্ধ বসাই যাচ্ছে না। আমিও বোধ বারান্দায় চেয়ারটা এনে বসি।”

সাহেব উৎসাহিত হয়ে বললে, “বেশ, বেশ, গল্প করা বাক্ এগো। আমি বড়ই ‘লোনলি’ কিল করি—আজকাল কেউই আসে না আর !”

সাহেব আরও কি সব বিড়বিড় কবে বলে যেতে লাগল। আমি নিঃশব্দে চেয়ারটা ঘর থেকে টেনে এনে বারান্দায় বসলুম।

তখন প্রায় তোর হয়ে এসেছে ; আকাশে ফিকে আলো দেখা দিয়েছে। এতক্ষণে কিছুটা দেখতে পেলুম চারিদিকের কোণ-কান্ড-জনল।

সাহেব সেই কাল কোটটা আগাগোড়া ঢেকে ব'স আছে।

সাহেব এবার আমার দিকে একটু মুখ ফিরিয়ে বললে, “একটা সিগার খাবে?”

আমি বললুম, “ব্যাকদ—নিই।”

সাহেব উঠল না, কোট থেকে একটা লম্বা হাত বাড়িয়ে দিলে চার হাত দূরে জানলার ভেতর। আর সেখান থেকে মূহূর্তে একটা সিগার নিয়ে আমার দিকে এগিয়ে দিলে। আমি সিগার নেবো না সাহেবকে দেখব—একেবারে কাটা হয়ে গেলাম, ভয়ে সর্বাক আমার হিম হয়ে গেল! সাহেবের হাতে একখিনী রক্ত-মাংসের চিহ্ন নেই, শুধু একখানা কতাল—আর মুখখানা সে কি ভয়ঙ্কর!

চোখের সামনে আমার সব ঘেন ঘুরতে ঘুরতে অন্ধকার হয়ে গেল। জ্ঞান হতে চেয়ে দেখি, আমি চেয়ার থেকে মেঝের পড়ে আছি।

একটা বিহারী বুড়ো কাছে দাঁড়িয়ে বলছে, “আরে বাবু হিঁস্যা কেই স্ত্রে আয়া?”

উঠে বসে গোধ রগড়ে আমি বললুম, “তোমাদের সাহেব আমার ঐ মাঠ থেকে নিয়ে এল। বললে, আমার হোটেল চলে।”

আমার কথা শেষ করতে না দিয়েই হিন্দুস্থানীটি বললে, “তাজব ছায়!”

আমি হাঁ হয়ে রইলুম।

সে বললে যে, “এট সাহেবের হোটেল ছিল বটে পাঁচবছর আগে। এখন এখানে আমি ছাড়া আর কেউ থাকে না। আমিই এই বাগানের কোণের ঘরটার ছেলপুলে নিয়ে থাকি। সকালে গেট ও দরজা খোলা দেখে উপরে উঠে এলুম। তা আপনি কি এখানে থাকবেন নাকি?”

আমি ততক্ষণে উঠে পড়েছি। বললুম, “না না, আমি এখনি বাচ্ছি।” বললই আমার হোট চামড়ার বাস্ফটা ভুলে নিলুম।

বেকবার মুখে বুড়ো হিন্দীতে বললে, “বাবু আপনি খুব বেঁচে গেছেন, কিন্তু সাহেব কি করে যে আপনাকে অনস এখানে তাই তো ভাবছি। সে তো মরে গেছে আজ প্রায় চার বছর হ’ল—আর এই মাঠেই গুকে কবর দেওয়া হয়েছিল—

তার কথা শেষ হতে না হতে আমি বিরক্ত হয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বললুম, “আচ্ছা হ্যাঁ।”

ভাষার গল্প

ত্রিষুধীভূষণ ভট্টাচার্য

পূর্বকালে ভারতবর্ষের 'পূর্বাঞ্চলকে বলা হ'ত মগধ। মাগধী ভাষার বিস্তার দেখে মনে হয়, তখন উত্তর প্রদেশের পূর্বভাগ, বিহার, উড়িষ্যা, বাংলা ও আশাম—এই বিস্তৃত ক্ষেত্রই ছিল মগধ দেশ। ভারতবর্ষের ইতিহাসে মগধের কথা সোনার অক্ষরে লেখা আছে। খৃষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে এই অঞ্চলেই রাষ্ট্রশক্তি প্রথমে প্রতিষ্ঠালাভ করে। তা ছাড়া, ভারতের দু'জন শ্রেষ্ঠ রাজা, চন্দ্রগুপ্ত ও অশোক, এই মগধ রাজ্যেই সিংহাসন অলঙ্কৃত করেছিলেন।

প্রায় হাজার-বারশ' বছর আগে মগধ অঞ্চলের লোকেরা যে-ভাষার কথা বলতো, তার নাম মাগধী অপভ্রংশ। খৃষ্টীয় ১২-১৩শ শতকে এই মাগধী অপভ্রংশ থেকে অনেক নতুন নতুন আঞ্চলিক ভাষা উৎপন্ন হয়। বাংলা তাদের মধ্যে একটা। আশামী, ওড়িয়া, মৈথিলী, মগধী, ভোজপুরিয়া অবধী, ছত্তিশগড়ী, প্রভৃতি ভাষাও পূর্বাঞ্চলের আর্ব-ভাষারই অন্তর্ভুক্ত থায।

এই হ'ল বাংলা ভাষার জন্ম-বৃত্তান্ত। এই ভাষার নামকরণ কি ভাবে হ'ল, দেখা এখন সংক্ষেপে বলছি। বাংলা ভাষার যেমন ইতিহাস আছে, 'বাংলা' এই শব্দটারও তেমনি একটা ইতিহাস আছে। পূর্বাঞ্চলের যে অংশে এখন বাংলা ভাষা বলা হয়, পূর্বকালে সেই অংশ তিন ভাগে বিভক্ত ছিল,—রাঢ়, গৌড় ও বঙ্গ। রাঢ় হ'ল পশ্চিম বঙ্গ, গৌড় উত্তর বঙ্গ, আর বঙ্গ হ'ল পূর্ব বঙ্গ। বঙ্গ নামে এক জাতি আদিমকালে পূর্বাঞ্চলে বাস করতো বলেই ঐ অঞ্চলের নাম হয়েছিল বঙ্গ। বঙ্গের কোন রাজা রাঢ় ও গৌড় জয় ক'রে নিলে তিনি সমগ্র দেশটাকেই বলতেন বঙ্গ, ও লোকে তাঁকে বলতো বঙ্গেশ্বর। আবার গৌড়ের কোন রাজা রাঢ় দখল ক'রে নিলে, এই গোটা দেশটাকেই বলা হ'ত গৌড় ও রাজা খেতাব পেতেন গৌড়েশ্বর। এই ভাবে বঙ্গ ও গৌড় শব্দ দুটো ক্রমে ক্রমে গোটা দেশটার নাম হিলায়েই ব্যবহার হ'তে লাগলো। পরে মোগল আমলে দিল্লীর ঐতিহাসিকেরা ও রাজ-পুস্তকধারা এই দেশকে শুধু বাংলা বা বঙ্গাল নামে ডাকতে লাগলেন, ফলে প্রভিবোগিতায় স্ফোড় শব্দ পেছিয়ে যেতে লাগলো। পরে ইংরেজরাও এই দেশের নাম দিলেন Bengal। এই ভাবে দেশটার নাম পাড়িয়ে গেল বাংলা দেশ ও এখানকার ভাষার নাম হ'ল বাংলা ভাষা। অবশ্য একশ' বছর আগেও 'বাংলা' শব্দ এতটা অপ্রতিদ্বন্দ্বী হ'য়ে উঠতে পারেনি। প্রায় সওয়া শ' বছর আগে রাজা রায়মোহন রায় বাংলা ভাষার একখানা ব্যাকরণ লেখেন, কিন্তু বইটার নাম তিনি দিয়েছিলেন 'গৌড়ীয় ভাষার ব্যাকরণ'। এতে বোকা বার, তখনও এই দেশকে গৌড় ও এখানকার ভাষাকে গৌড়ীয় ভাষা বলার রেওয়াজ ছিল।

বাংলা ভাষার কতকগুলো বৈশিষ্ট্য আছে। এই সব বৈশিষ্ট্য অল্প কোনও ভাষায় একত্র পাওয়া যাবে না। এদের সম্বন্ধে বাংলা ভাষার একটা নিম্নরূপ গুঁড় উঠেছে। এই সব বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে দুই একট কথা সংক্ষেপে বলছি।

যেহা, আমরা বাঙালীরা যে-ভাবে 'অ'—এই স্বর ধ্বনিটা উচ্চারণ করি, এর তুলনা বাংলার আশপাশের ক'একটা ভাষা ছাড়া সারা ভারতবর্ষে আর কোথাও যেমী পাওয়া যাবে না। আমাদের 'অ' হ'ল ইংরেজী call, ball প্রভৃতি শব্দের 'a' হরফটার উচ্চারণের মত। কিন্তু হিন্দীতে ও উত্তর ও পশ্চিম ভারতের অধিকাংশ ভাষাতেই 'অ'-এর উচ্চারণ অল্প রকম। 'বাসু, আর বসন্তে হবে না'—এখানে বাসু-এর 'অ'-কার বা ইংরেজী out, but, put, প্রভৃতি শব্দের 'u' অক্ষরের উচ্চারণের মত হ'ল হিন্দী ও উত্তর ভারতের আর সব ভাষার অ-কারের উচ্চারণ। বাংলার এই ধ্বনিটা নেই বলে ইংরেজী out put-কে আমাদের অনেকেই উচ্চারণ করেন কা-ট, না-ট, এই ভাবে। আবার বাংলা অ-কারের উচ্চারণ হিন্দী-ভাষীরা করতে পারেন না, ফলে বাঙালী গদাধরকে তাঁরা ভাকবেন 'গাদাধর' বলে, আবার ইংরেজী call, ball-কে ঐ অক্ষরে অনেক কা-ল, হা-ল উচ্চারণ করতে বাধ্য হন। দক্ষিণ ভারতে তামিল, তেলুগু, প্রভৃতি ভাষার অ-কারের উচ্চারণ আবার আর এক রকম।

বাংলা ভাষার আর একটা ধ্বনি হ'ল 'ঞ'। এই নতুন ধ্বনি ও 'এ'—এই দুটি ধ্বনিই আমরা লিখি একাধারে। যেমন, দেগা, দেধি; নেকা, নেকা; দেবা, দেবু। আবার দেখ, 'ছেলেবেলা'—এই শব্দে তিনটে একাধারে আছে—প্রথম দুটো উচ্চারণ করতে হবে এ, কিন্তু শেষটা হবে ঞ। অবাসাণী অনেকের পক্ষেই এখানে তুল হওয়া স্বাভাবিক। বাংলা 'অ' ও 'আ'—এই দুটো ধ্বনি সংস্কৃত ছিল না।

বাংলার এই রকম আরও অনেক নতুন নতুন ধ্বনি ও উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য আছে, যার ফলে সংস্কৃত শব্দ ভেঙ্গে বাংলার হ'ল এক রকম ও আর সব ভাষার হ'ল অল্প রকম। তাছাড়া, এক এক ভাষায় এক এক রকম সংস্কৃত শব্দের প্রচলন হ'তে লাগলো। আমরা ব্যবহার করি বল, কিন্তু হিন্দী অক্ষরে যেমীর ভাগ কেবল 'পানি' ব্যবহার করা হয়। উত্তর ভারতে আমরা দুধ ব্যবহার করি, কিন্তু মধ্য ভারতে কোন কোনও ভাষায় 'গোবদ' ব্যবহার হ'তে শুনেছি। আবার শুধু সংস্কৃত নয়, আরবী, ফার্সী, ত্রাবিড়, কোল প্রভৃতি ভাষা থেকেও নানা ভাষায় নানা রকম শব্দ নেওয়া হ'তে লাগলো। এতেও বিভিন্ন ভাষায় শব্দের প্রভেদ পেল বেড়ে। একই বস্তু বোঝাতে তিন তিন ভাষায় তিন তিন শব্দ ব্যবহার করা হয়। এক ভাষার সঙ্গে আর এক ভাষার পার্থক্য হবার এটা একটা বড় কারণ।

কিন্তু শব্দ তো ভাষা নয়। শব্দের কাজ হ'ল ইটের মতো। আমরা এদের একটার পর একটা সাজিয়ে ভাষার ইमारত গড়ি। এখানে বাংলা ভাষায় কতকগুলো বৈশিষ্ট্য আছে, যা অন্ত ভাষার পাওয়া যাবে না। যেমন, বাংলাতে আমরা বলি, খাব না, খাব না, ক'রো না, দেখতে পাচ্ছি না। অর্থাৎ 'না' আমাদের ডাক্ষর বলে কিয়ার পরে। খুব কম ভাষাতেই এটা পাওয়া যাবে। হিন্দীতে এই 'না' বসে কিয়ার আগে। যেমন, নহি কিয়া, নহি খায়ে গা, মত্ করো, বোল নহি শকতা। অবশ্য বাংলাতেও কোন কোন ক্ষেত্রে 'না' গৌণ কিয়ার আগে বসানো হয়। যেমন, তুমি না এলে আমি খাব না। বাংলা ভাষায় শব্দ সাজানোর আরও অনেক বৈশিষ্ট্য আছে।

কিন্তু ইমারত তৈরী করার সময় নিয়ম-মতো ইট সাজালেই শুধু চলে না। ইটের মাঝে মাঝে গাঁথনী দিতে হয়। ভাষার বেলাতেও বিস্তৃতি বা প্রত্যয়ের গাঁথনী দিয়ে শব্দের সঙ্গে শব্দ জোড়া হ'য়ে থাকে। এখানেও বাংলা, হিন্দী, প্রভৃতি সব ভাষারই কতকগুলো বৈশিষ্ট্য আছে। যেমন 'আমি' ও 'বাংবা'—এই শব্দ দুটো পর পর বদলে তার কোন অর্থ হয় না। কিন্তু বাংলা ৬ষ্ঠ বিস্তৃতি ছুড়ে বদি বলি, 'আমার বাংবা', অমনি শব্দ দুটো প্রাণবন্ত হ'য়ে চলার আনন্দে নেচে ওঠে। হিন্দীতেও 'হবে হ'মারা বাপ'। এখানে এই দুই ভাষার বড় রকম কোন প্রভেদ -ই বাটে, কিন্তু এই দুই ভাষার একটা বড় পার্থক্য ধরা পড়বে, যখন আমরা বলবো, 'আমার মা'। এটা হ'ল বাংলা। হিন্দীতে কিন্তু 'হমারা মা' চলবে না, বলতে হবে 'হামারী মা'।

লিঙ্গ অঙ্গণারে পদের পরিবর্তন সাগদী অকলের বাইরের সব ভাষাতেই প্রায় কিছু কিছু পাওয়া যায়। পুরানো বাংলাতেও এই বীতির প্রচলন পাই। যেমন, হাজার বছর আগে লেখা বাংলা চর্চা-গানে পাওয়া যায়—'নগর বাহিরে ডোবী তোহোরী কুড়িয়া'। 'তোহোরী কুড়িয়া', আধুনিক বাংলায় হবে তোর কুড়ে। তেমনি সে সময় বাঙালীরা বলতেন 'হাড়েরী মাগী', এখন আমরা বলি হাড়ের মালা। পাঁচল বছর আগে রচিত 'ঐক্যকীর্তন' নামে বাংলা কাব্যটিতে লিঙ্গ অঙ্গণারে কিয়ার পরিবর্তন পাওয়া যায়, যা এখনও হিন্দীতে দেখতে পাই। যেমন, ঐক্যকীর্তনে আছে, 'চলিনী রাহী'। আধুনিক বাংলায় আমরা বলবো, রাধা চললো, বা রাধা গেল এবং কৃষ্ণও গেল। হিন্দীতে কিন্তু লিঙ্গ অঙ্গণারে কিয়ার রূপ এখনও বদলায়। তাঁরা বলবেন, 'রাধা গই, ঔর কৃষ্ণ গয়া'।

এই রকম প্রত্যেক ভাষারই আরও কত শত বৈশিষ্ট্য আছে, আর খুঁটিনাটি বিশ্লেষণ করাই হ'ল ভাষা বিজ্ঞানীদের কাজ।

বহুরূপী

ত্রিবিমল দত্ত

একছিল বহুরূপী শহরে সে থাকতো
দিনরাত গায়ে মুখে নানা রং মাখতো।
কখনো বা কেঁদো বাঘ, কখনো বা ভেড়া সে
লাফিয়ে ডিঙিয়ে যেতো বাগানের বেড়া সে।
কখনো বা মেম সেজে টুক টুক আসতো
কাউকে দেখলে পথে টুপি তুলে হাসতো।

এই ক'রে জোটে বেশ টাকা সিকে আধূলি
সাজ তার ছোট-কোট-টাই টিকি মাহূলি।
গলা তার মোটা মিহি আধো আধো ঝাঁঝালো
কখনো সেতার সিঙে যা খুলি সে বাজালো।
কখনো বা হেলেছলে কখনো বা লাফিয়ে
চলা তার ছপ্পাপ ভিটেমাটি কাঁপিয়ে।

এই ভাবে কেটে যায় দিন মাস বর্ষ
নানা সাজে জোগালো সে সবাকার হর্ষ।
একদিন পথে যেতে বললে কে, 'কিহে বাঘ ?
জলে ধুয়ে ধোবড়ে যে গেছে গায়ে নীল দাগ ?'
ঘরে এসে রেগে-মেগে খুলে ফেলে দিয়ে সাজ
বললে সে, 'গুধু আমি ঘোষোদের গুপী আজ।'

তবু যেই পথে নামে ছাথে সব হাসচে
কেউ বলে, এই, ওই বুড়ো শিব আসচে।
কেউ বলে হুম্মান, কেউ বলে নাচালী,
কেউ বলে হিটলার গৌফ কেন চাঁচালি ?
মুখ ছাথে আয়নায় ফিরে চুপি চুপি সে
সববাই তুলে গেছে ঘোষোদের গুপী সে।

গতিই জীবন

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দত্ত

কথায় আছে বটে, এই সংসারে সদৃষ্টের চাকা আন্তে আন্তে ঘোরে। কিন্তু যেথা বায়, প্রাকৃতিক ভগতে কোন কোমো ক্ষেত্রে গতির বেগ ক্ষত। ভীষণ ক্ষত। এই যেমন, আলোর গতি প্রতি সেকেন্ডে ১০৬০০০ মাইল। আমাদের কল্পনার বাইরে। আকাশে বিদ্যুৎ চমকানো সেবেছ; তার গতিও ঐ একই রকম।



পাখি

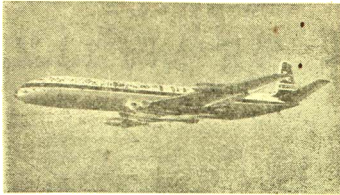


আলো



বিদ্যুৎ

জীব ভগতে এবং প্রাকৃতিক ভগতে এমন অনেক কিছু আছে, যার গতি অতিশয় ক্ষত। উপরে দেওয়া ছবিগুলি থেকে ভোমরা ক্ষত-গতিবীল অনেক মিনিস দেখতে পাবে।



এর'মেন



এর'মেন হৈন

নাকি এক ধরনের চম্বী বিমান তৈরি করেছে যার গতি ঘণ্টায় ১২৪২ মাইল।



হাউই



কামানের গোল

বাস্তবিক, বিজ্ঞানের গোলতে মানুষ এভাবে বস্তু বস্তু জিনিস আবিষ্কার করেছে, গতিবিধি থেকে সে সমস্ত চিন্তা করলে বা হিসাব করতে বসলে অত্যন্ত অবিদ্যমান বলে মনে হয়।

এই তো সেদিন সোভিয়েট রাশিয়া এক নতুন ধরনের রকেট উদ্ভাবন করেছে। ওটা পৃথিবীর প্রায় শ'পাঁচেক মাইল উপর দিয়ে গিয়ে অতি অল্প সময়ের মধ্যে—ঘণ্টায় ১৫ হাজার মাইল বেগে ছুটে পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে একেটা হাইড্রো-জেন বোমা নিক্ষেপ করতে পারে। এর নাম আন্তর্গহাদেশীয় বক্রগতি রকেট (Inter continental Ballistic missile)। একটা চাক-হীন অস্ত্র।

কিন্তু গতিবেগের দিক থেকে এই রকেটই শেষ বখান নয়। এর পরের ধাপ কৃত্রিম উপগ্রহ। এটাই সব শেষে আসবে নেমেছে। গতির দিক থেকে বিচার করলে এই উপগ্রহ সর্বাঙ্গোপাঙ্গি-শালী; জন্তগাহী বিমানের গতি এর তুলনায় শূন্যকদম্ব।

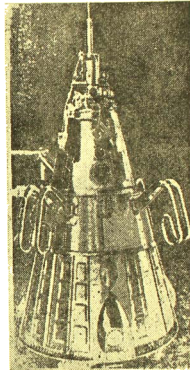
আমেরিকা যে উপগ্রহটি—এক্সপ্লোরার—মহাশূন্যে প্রেরণ করেছে, তার গতি ঘণ্টায় ১০ হাজার মাইল।

আর রাশিয়ার তৃতীয় উপগ্রহ—স্পুটনিক—প্রতি ১০৬ মিনিটে, অর্থাৎ ১ ঘণ্টা ৪৬ মিনিটে একবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করছে।

গতিই জীবন।

শূন্য বা শামুক তোমরা দেখেছ নিশ্চয়। কী রকম আন্তে আন্তে চলে, নয়? আবারেই এই শূন্যকদম্ব গতির চ'ল ছিল বহুদিন ধরে। এই ধরনের গড়িমসি চালচলনে জীবনে যে সকলতা লাভ করা যায় না, তা আজ আমরা বুঝতে শিখেছি। যে দিনকাল পড়েছে, তাতে সময়ের গতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলতে না পারলে, জীবনযুদ্ধে টিকে থাকা যে যায় হবে তা তোমরাও নিশ্চয় বুঝতে পারছ।

সম্প্রতি ভারতবর্ষও প্রচেষ্টা চলেছে গতির সঙ্গে পাল্লা দেবার। মহাশূন্যে অবস্থিত ভারতীয় এট্রোনটিক্যাল সোসাইটি গত ৩রা নবেম্বর একটি টেষ্ট রকেট ছেড়েছেন মহাশূন্যে। সেটি নাকি মুহূর্তের মধ্যে প্রায় ৩৫ হাজার ফুট উঠেছে বলে কণ্ঠস্বররা অস্বাভাবিক করেছেন। যে রকেটটি ছাড়া হয়েছে তার আয়তন নিম্নোক্তরূপ :—দৈর্ঘ্য প্রথম ধাপ ৪'৫ ফুট, দ্বিতীয় ধাপ ৩'৮ ফুট। প্রায় প্রথম ধাপ ০'৫ ফুট, দ্বিতীয় ধাপ ০'৩ ফুট, ওজন যথাক্রমে ৫১ ও ৩৪ পাউণ্ড। জ্বালানীর সময় যথাক্রমে ১৮ ও ১৫ সেকেন্ড।



স্পুটনিক

আজি এই শরতে

শ্রীরমেন চৌধুরী

১

আজি এই শরতে
ভুলে নদী থৈ থৈ
শিশিরের বিন্দু
কি বিন্দু জ্বল জ্বল
ফুলে ফুলে ফুল
কী যে শোভা মরতে

কী যে শোভা মরতে...
চকলি চলে ওই
যেন শত ইন্দু
হাওয়া বর হৃদয়
যত বাধা ভুললো
আজি এই শরতে...

জানি না তা জানি না,
বলে : 'কিছু জানি না' !
ঘাসে ঘাসে ছড়ানো,
মধু-মায়া ছড়ানো ;
আমাদের আত্মনা !
জানি না তা জানি না !

২

শালা মেঘ ছেয়ে যায়
ছুটে চলে যে তাবে
সকালের হাসিতে
মনে বলে : আর নয়,
অবহলে চলিব
মেঘ ধার যে তাবে

আকাশের ঝোড়ানায়
মনে হয় ও বাবে
রাখালের বাসিতে
এসে গেছে হৃদয়
বাধা যত দলিব
মনে হয় ও বাবে

ঢেকে যায় রোদধূর,
দূর দূর—কন্দূর !
মেই কোন ভাবনা,
তবে কেন পাবো না ?
হোক পথ বন্ধুর !
দূর দূর কন্দূর !

৩

মাটি আর আকাশে
ধাকা নয় সম্ভব
যেখানেই থাকি না
মাটি-মা'র বৃকতে
ধস্ত রে, ধস্ত
মাটি আর আকাশে

অহরাগে মাথা দে
কেলে মা'র এ-বিস্তব
কোনো কাণ রাখি না
সে যে কতো স্বখেতে
শরতের অন্ত
অহরাগ মাথা দে

কতোদিন পরে যে,
কিছুতেই ঘরে রে !
শুধু ছুটি—ছুটি গো :
খাই লুটোপুটি গো !
হুশি নাহি ধরে রে !
কতোদিন পারে রে...



৯। একটি চার হাত লম্বা, তিন হাত চওড়া এবং দু'হাত বাড়াই গর্তে ঝাটি আছে কতখানি ?

১০। একখানি আঁহাণের ডেক থেকে জলের উপর পর্যন্ত একটা নড়ির মই আছে। এই মইতে দু'কিট অস্তর একটা করে ধাপ আছে। মোট ধাপ পাঁচটা এবং শেষ ধাপ একেবারে জলের উপর। সমুদ্রের জল বড়োয় এক ছুট করে বাড়লে ছ'ঘণ্টায় এই মইয়ের ক'টা ধাপ ডুববে ?

উত্তর

১। চারদিন। যদি সে ৩০ দিনই কাজ করত তা'হলে পঁচত্রিশ টাকা ; কিন্তু সেখানে পাচ্ছে ২৭ সে পাচ্ছে না ৬, কারণ একদিন কামাই করলে তার কাটা যায় ১, ও অরিমানা আট আনা = ১৪০। ৬ টাকার মধ্যে ১৪০ তার বার আছে, অতএব তার কামাই চার দিন। ৬ কম পেয়েছে বলে প্রতিদিন আট আনা হিচাবে ১২ দিন কামাই নয়।

২। পাঁচ বছর আগে উছাদের বয়সের সমষ্টি ছিল চল্লিশ। পঞ্চাশ থেকে পাঁচ বাদ দিয়ে ৪৫ বৎসর নয়, কারণ পাঁচ বছর আগে পিতার বয়সও পাঁচ বছর কম ছিল, পুত্রেরও পাঁচ বছর কম ছিল।

৩। একখানির দাম একত্রিশ পয়সা বা পোনে আট আনা এবং অপরখানির দাম তেত্রিশ বা সওয়া আট আনা। একখানির দাম মাড়ে দাত আনা ও অপরখানির দাম মাড়ে আট আনা নয় ; কারণ তা হ'লে একখানির দাম অপরখানি থেকে চার পয়সা বেশি হয়।

৪। হুড়ি হাণ্ডার। হিশ মিনেব মাইনেকে পাঁচ দিয়ে ভাগ করলে ছয় দিনের মাইনে পাওয়া যাবে। এক লাখ = একর পর পাঁচটি শূন্য ; তাকে পাঁচ দিয়ে মনে মনে ভাগ করা দোজা।

৫। একদিনে। চারদিনে নয়। কারণ রাম ২ দিনে পারে অতএব ১ দিনে অর্ধেক পারে ; ভামও ১ দিন অর্ধেক পারে। দু'জনে অর্ধেক অর্ধেক করলে ১ দিনে পারেবে।

৬। বোল পয়সা বা চার আনা। দু'আনা নয়। কারণ, সেড়টার দাম সেড় পয়সা হ'লে একটার দাম এক পয়সা হয়। এইরকম বোলটার দাম বোল পয়সা। একটার দাম সেড় পয়সা হ'লে বোলটার দাম দু'আনা হ'ত।

৭। ৩ বার হয় ; তিন টাকা নয়। কারণ পনের টাকার মধ্যে পাঁচ টাকা তিনবার আছে—তিন টাকা বার নয়। পনের টাকাকে পাঁচ টাকা দিয়ে গুণ করা যায় না ; উত্তর ৭৫ টাকা নয়। কারণ, গুণ যোগেরই সংক্ষিপ্ত নিয়ম। পনের টাকাকে পাঁচবার রেখে যোগ করা যায় ; পাঁচ টাকা বার রাখার অর্থ হয় না।

৮। ভাগ করলে ১ হয়, বিয়োগ করলে শূন্য হয়। কারণ তেরের মধ্যে তের একবার আছে এবং তের থেকে তের নিয়ে গেলে কিছুই থাকে না।

৯। মাটি কিছুই নেই ; কারণ গর্তে আবার মাটি থাকবে কি করে ?

১০। একটাও ডুববে না ; কারণ জল বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আঁহাণও ভেসে উঠবে উপরে।

খেলোয়াড়দের খবর

মেঠুড়ে

সম্মানিত মুস্তাক আলি

আই. এক এ শীল্ডের অমীমাংসিত খেলা

গত ১২ অক্টোবর মধ্যাহ্ন অ্যালিকাপ ক্রিকেট প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ অহুষ্ঠানে মধ্য-প্রদেশ ক্রিকেট এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে প্রাক্তন টেস্ট পেলোয়াড় মুস্তাক আলির হাতে সাড়ে চোদ্দ হাজার টাকার একটি চোড়ো দেওয়া হয়। কিছুদিন আগে এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে এক খেলার ব্যবস্থা করে এই টাকার কিছু অংশ সংগ্রহ করা হয়েছিল। বাকী টাকা আসে মুস্তাক আলির গুণমুহুরের কাছ থেকে। অর্ধ উপহারের জন্তে সংশ্লিষ্ট পক্ষদের ধন্যবাদ জানিয়ে মুস্তাক আলি বলেন যে, আনুষ্ঠানিকভাবে প্রথম শ্রেণীর খেলা থেকে তিনি অবসর গ্রহণ করছেন বটে, তবে ভবিষ্যতে তত্ত্বাবধানে কিশোরদের শিক্ষা দেবার জন্তে তিনি সব সময় প্রস্তুত থাকবেন।

আই. এক এ শীল্ডের অমীমাংসিত ফাইনাল খেলাটি বোহনবাগান ক্লাবের পক্ষে বর্তমানে নিম্নোক্তদের মাঠে খেলা সম্ভব হবে না। বোহন-বাগান ক্লাবের কার্যকরী সমিতির সমস্তবৃন্দ এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, তাঁদের মাঠে এখন ক্রিকেট 'পিচ' তৈরি হচ্ছে এবং 'পিচ' তৈরি হলেই ক্রিকেট খেলা শুরু হবে। আই. এক এ-এর পক্ষ থেকে এ পর্যন্ত অন্ত কোনো মাঠে খেলা আয়োজনের প্রস্তাব বোহনবাগান ক্লাবের কাছে করা হয় নি। কোনো প্রস্তাব এলে বোহনবাগান ক্লাব সে সম্পর্কে বিবেচনা করে দেখবেন বলে জানা গিয়েছে। হুতবাং আই. এক এ শীল্ড ফাইনালের অমীমাংসিত খেলা যে কবে হবে বলা বেশ কঠিন।

ভারত সরকারের ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল

ভারতীয় ক্রিকেট দলের ইংলও সরকার

ভারত সরকার ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রথম খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে। সার্ভিসেস একাদশের উনিশ বছরের সাময়িক শিক্ষার্থী ক্রীড়ামণ্ডল ব্যক্তিগতভাবে একশ রাণ করার কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। মূলতঃ তাঁর সাফল্যেই ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল চেষ্টা করেও ভারত সরকারের প্রথম খেলার জয় হতে পারেন নি। ক্রীড়ামণ্ডল একশ রাণ করে অপরাধিত থাকার সময় সেনাদল দ্বিতীয় ইনিংস (চার উইকেটে ২০৭ রাণ) ডিক্লেয়ার্ড করেন এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজ আবার ব্যাট করতে নেমে বিনা উইকেটে ৪২ রাণ করেন।

আগামী মরগুয়ে ইংলও সরকার ভারতীয় ক্রিকেট দল পাঁচটি টেস্ট মাঠ খেলবে বলে ঠিক হয়েছে। টেস্ট মাঠগুলো নাটিংহাম, লর্ডস, লীডস, ব্যাংকস্টার এবং ওডাল মাঠে অনুষ্ঠিত হবে। ১৯৫২ সালের ইংলও সরকার ভারতীয় দল চারটে টেস্ট মাঠ খেলে তিনটেতে হেরে যান এবং একটি অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়।

ভারতীয় দল ২৫ এপ্রিল তারিখে আকরণডলে (সামেশ) নরফোকের ডিউকের একাদশের সঙ্গে পূর্বে একদিন ম্যাচ খেলে সরকারের উদ্বোধন করবে। ১২ সেপ্টেম্বর ভারতীয় দলের বিরুদ্ধে তাঁরা সরকারের শেষ ম্যাচ খেলবে।

মহিলার হাইজাম্প

প্রথম ছ-ফুট উচ্চতা অতিক্রম

বুথারস্টে রেডিও প্রচারিত সংবাদে জানা গেছে যে, কমানিচার ইওলাণ্ডা বালাস ১৮৩ মিটার বা পুরো ছ-ফুট হাইজাম্প করেছেন। মহিলা এ্যাথলেটদের ভেতর ইওলাণ্ডা বালাসই সব প্রথম ছ-ফুটের বাধা অতিক্রমের কৃতিত্ব প্রদর্শন করলেন। মহিলাদের হাইজাম্পে সীমিত বালসের ৫ ফুট, ১০ ইঞ্চি ইতি বিখ্যাত কের্ড হিসেবে অচ্যোতিত হয়ে আছে। শেষে তিনি যে ছ-ফুট উচ্চতা অতিক্রম করেছেন তা আন্তর্জাতিক সংস্থার অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে।

প্রদর্শনী টেনিস ম্যাচ

পুণ্ডার সময় উডবার্ণ পার্কস্থ দাউথ ক্লাব লনে অচ্যুত প্রদর্শনী টেনিস ম্যাচে ক্যালিফোর্নিয়ার মার্কিন টেনিস খেলোয়াড় বাজ প্যাটিকে হারিয়ে দিয়ে ভারতের ডেভিদ কাপ গলের অধিনায়ক নরেশকুমার বিশেষ বিশ্বস্তের স্বষ্টি করেন। টেনিস ম্যাচের ধারা কিছুটা পথ রাখেন, তাঁরা প্যাটিকে এই পরাজয়ে খুবই আশ্চর্যিত হয়েছেন। মাত্র সাতাসত্তর মিনিটে আলোচ্য খেলাটির জয়-পরাজয় নিশ্চিত হয়। দ্বিতীয় হ্রস্বোপেও বাজ প্যাট তাঁর স্থান অক্ষুণ্ণ রাখতে পারেন নি। শনিবারের পরাজয়ের পর আবার রোববার অপরাহ্নে তিনি প্রদর্শনী সিঙ্গলস ও ডাবলস খেলা উপলক্ষে আবির্ভূত হলে দুটো খেলাতেই তাঁকে হার বীকার করতে হয়।

গিবস্-ডেষ্টিফ্রিস

চিত্র-প্রতিযোগিতা

পুরস্কার-প্রাপ্ত ছেলেমেয়েদের
নাম ও ঠিকানা

প্রাণ ও ভাস্কর্য মাসের কাগজে তোমরা গিবস্ ডেষ্টিফ্রিস চিত্র-প্রতিযোগিতার যে খবর পেয়েছিলে, আজ এখান তার ফলাফল ও পুরস্কার-প্রাপ্ত ছেলেমেয়েদের নাম ঘোষিত হ'ল। অল্পবয়সী বালক-বালিকাদের জন্য এটি গিবস্-এর ৩য় চিত্র-প্রতিযোগিতা হাজার হাজার ছেলেমেয়ে যোগ দিয়েছিল এই প্রতিযোগিতায়।

বিচারকদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নিম্নলিখিত তিনজনকে ১ম, ২য় ও ৩য় পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।

প্রথম পুরস্কার

মাস্টার কে. প্রিন্সাস (বয়স ১৩)
শ্রী রা ম পু রা ম, বাল্মোরে। স্ক্যালে
বাই সাইবেল।

দ্বিতীয় পুরস্কার

মাস্টার কে. বি. এম. মোহন (বয়স ১৪)
শ্রীকারুলাম, অন্ন প্রদেশ। এইচ. এম. ভি.
গ্রামোকোন।

তৃতীয় পুরস্কার

মাস্টার গৌতম ভোরা (বয়স ১১)
চাপকাপুরী, নিউ দিল্লী। ডিউ মাস্টার
প্রোমোটার সেট।

এছাড়া একশত জন প্রতিযোগীকে
কর্তৃপক্ষ সাধনা-পুরস্কার হিসাবে শ্রেষ্ঠ ও বন্ধ
ও শ্রেষ্ঠ বন্ধ প্রদত্তি দিয়েছেন।



শ্রোতৃ মহিলাদের লেখা

শরৎ এসেছে

শরৎ এসেছে আজ—শোভনা শরৎ
আকাশের নীলে তার ঝাঁড়লখানি,
হিম-খোয়া কিশলয়ে লিখেছে শরৎ
দেখনি কি চেরে সেই সবুজ-বাগী ?

শরৎ এসেছে আঁহা—মধুর শরৎ
দোয়েল ভ্রামার মিটে অবুঝ বোলে,
দীর্ঘ-বিলে কমলের বদলেছে মেলা—
কাশবনে সমীরণে চায়ের দোলে ।

শরৎ এসেছে সে যে—দোনার শরৎ
পুলকের ঢেউ মোনা ধানের শিথ,
শিশিরের আলপনা ঘাসের উগার
ঝলমলে লত হৌও মুক্তো কি দে !

শরৎ এসেছে বনে—রঙিন শরৎ
বাঁধা ফুলে বাঁধহ এসেছে উড়ে,
প্রাণপতি পথ ফুলে ফুলেদেও স্বনে—
বোটা-খদা শিউলিগা পড়ছে ফুবে ।

আলোকে পুলকে, আঁহা—মধুর শরৎ
আগমনী গান-তগা ধরণী হাদে,
বাখালের বেগুণে শরৎ-ভারের
মিষ্টি-মধুর অধ হাওরায় ডাসে ।
ক্রিকিরগলছুর রায়



মা দুর্গা

শিল্পী : ঈশবিন্দু চক্রবর্তী

আমাদের স্কুল

(প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা)

টাম থেকে নেমে মিডলটন বো, তারপর ঘন
গাছে ছাওয়া ক্যামাক স্ট্রীট—পার হয়েই শর্ট
স্ট্রীট। তার মোড় থেকেই দেখা যায় আমাদের
প্রাইমারী স্কুল—সেন্ট রেভিয়ার্স। ছাই বড় আর
প্রবাল-লাল বড় দিয়ে তৈরী এই চারতলা
বাড়িটার অংক আরম্ভ পড়ি নি। তখন ছিল
পুখোন হলধে বড়, বড় বড় খাম লাগান বাড়ি—
তার আদে পাশে ছোট ছোট একতলা ঘর।

গেটের ধারে ছিল লছমন দাবোরানের কুঠি আর মস্ত এঘটা বটগাছ মার হাত ধরে প্রথমদিন এখানে এসে দাঁড়িয়েছিলুম, আমার এখনো মনে পড়ে। কত ছেলে, কত হৈ হৈ, কত গাড়ি। কেউ মার্বেল খেলছে, কেউ বক্সিং লড়ছে—দুরের দ্বাটে একদল হকি খেলছে। টং টং করে ঘণ্টা পড়ল মিল পেরাবা এসে আমাদের মার কাছে থেকে নিয়ে ক্লাসে এনে বসালেন। সেটা প্রাইমারী ক্লাস। কত বকম ছেলে চীনে, মুল-মান, এংলো-ইণ্ডিয়ান, মাড়োয়াড়ী যেন মহা-মানবের সাগরতীর।

তাৎপর্য ভিন্ন বছর এ খুলে আমরা পড়েছি, খেলেছি—একতলা থেকে দোতলার প্রোমোশন পেতে পেতে পৌছে গেছি দেকেরা দেকমনে। আর সেইবারই আমাদের পুরোন হলসে বাড়িটা ভেঙে এই বাড়িটা স্থল হোল। হায়, সেই বটগাছটিও আর নেই বার তলার আমরা আইসক্রীম চুচুচু, হাউয়ের সঙ্গে বক্সিং লড়ুচু, দেনের সঙ্গে গুলতি দিয়ে বাদর তড়াচুচু। বটগাছটায় বাদর ছিল গোটা তিনেক। গাছটা এখন কাটা পড়ল তারা কোথায় চলে গেল কে জানে! সেন বলে তাগা নাকি এখন মিউজিয়মের বাগানে আছে।

বার্ড স্ট্যাণ্ডার্ডে উঠে আমরা স্ট্রীটের স্থল ছেড়ে পার্ক স্ট্রীটের স্থলে এলুম। এখন আমরা বড় স্থলের ডায়, তাই গভীর হতে শিখলুম। মার্বেল-টার্বেল আর খেলি না, হকি, ক্রিকেট, টেবল টেনিস কি বাস্কেট বলে বোগ মিই। সকাল নটার এল দেখা বাবে সারা মাঠ জুড়ে বিভিন্ন টিম খেলছে। পড়াশুনার দায়িত্ব বেড়ে গেছে। আরো বেশি পড়তে হয়। এখন আমরা এংল-জেনারার সি.সি.এম. ও এল.সি.এম.কবি। আমাদের হিন্দী, সংস্কৃত, বাংলা, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞানও পড়ানো হয়। আগে আমাদের নিদ্রা পড়াতো

এখন পড়ান স্ত্রীর ও দাসীররা। মাড়ে ন'টার ঘণ্টা পড়বার সঙ্গে সঙ্গে স্থল বসে। তখন দেখা বাবে খেলুড়েরা খেলা শেষ না হতেই, ছবি আঁকিয়েবা ছবি শেষ না করেই ক্লাসের দিকে ছুটছে। ক্লাসের আগে আমাদের একটা ড্রিং ক্লাস হয় তাতে শিল্পী ছাত্ররা বোগ দিতে পারে।

একটা খাটালিগন বা লেগুনলের মত আখরা ক্লাসে প্রবেশ করি—এবার আর এক যুগ জয় করতে হবে—সংগ্রাম করতে হবে চোখের বলআর কঠিন-কঠিন প্রশ্নের সঙ্গে। আজ বুধবার প্রথম শিরিয়তে হিন্দী, তারপর ইংরেজী ব্যাকরণ অর্থাৎ চল্লিশ মিনিট আনালিসিস—কমপ্লিমেন্ট—এন্ড-জাঙ্ক ইত্যাদি। অঙ্কের ক্লাসটা সবচেয়ে বিরতস্থল। পাশের বেকে বসে হটবল চ্যাম্পিয়ান হাউ সমস্ত-কণ পেলিস চিবোর। (হাউ) "Have you finished?"—"Yes sir"। হাউ উঠে পাড়ায় সমস্ত হাত ভর্তি করে ছবি আঁকা। ক্লাস ময় হাসির বোল উঠল। স্ত্রীর কটমট করে তাকালেন—জানো এখুনি তোমাকে কাবার প্রিকেক্টের ঘরে বেতে হবে স্ট্রাপ খাবার জঙ্গ।" টিকিনের ঘণ্টা প'ড়ে হাউকে দেবারের মত বাঁচাল। সেনের পেটে বরণা স্থল হয়েছে। আমরা খরাখরি করে নিয়ে গেলুম প্রিকেক্টের ঘরে, সেখানে চলেছে অজস্র ছাত্রের অজস্র বক্তব্য। বাই হোক বলার পর তাকে পৌছে দিলুম দোতলার দিক-কয়ে। লাইব্রেরী থেকে বই এনে বদা গেল ক্লাসে। এবার ভূগোল—উত্তর আমেরিকার ম্যাপে আমরা বদাই ওয়াশিংটন, নিউইয়র্ক, শিকাগো। ঘণ্টার পর ঘণ্টা যেমন বাড়ে, আমাদের নোটের পরিমাণও বাড়ে। তারপর বাংলা ক্লাস—এ ক্লাসে আমরা রাজা। তারপর আখণ্টা স্টাডি অর্থাৎ নিজস্ব পড়াশুনা—স্বপিতারেরা গভীর মুখে নাম টোকে দুই ছেলেদের। হাউয়ের নাম টুকে সবাই ক্লাস। সে ইতিমধ্যে পাশের ছাত্রদের গাঁঠা খেরেছে।

উইকলির নোটশ এসে গেল এবার ইংরেজী পরীক্ষা। তার এসে আলোচনা শুরু করলেন। তারপর ড্রিল—অর্থাৎ Heels raise, deep knee bend।

কিন্তু রোজই যে পড়াশুনো হয় তা নয়। শীতকালে হয় স্পোর্টস, সেদিন নানা রকম দৌড়-ঝাঁপ হয়। এবারকার চ্যাম্পিয়ন হোল রাইকেল ফোর্ড। সে সেদিন রাবার রত সম্মান পেল। আর হয় গ্রাইন্ড-তে আলোর রঙে সেদিন সাজান হয় আমাদের হল। বারো গ্রাইন্ড পায় না তারাও নাটক, গান করবার সুযোগ পায়। গ্রাইন্ড পেতে গিয়ে করতালি ধরনির সঙ্গে যেন হয় কোনদিন তুলব না আমাদের যুগের আদর্শ—মটো—Nihil Ultra, অর্থাৎ যা হবে তা সবচেয়ে ভাল হবে।

শ্রীঅমিতাভ ত্রিপাঠী

বিষ্টবাবুর শিক্ষা

এ পাড়ার বিষ্টবাবু যেনে সদাই ভয়, কেউ বুকি বা তাহাব নামে কোন কথাই কয়। নাগাটা দিন টো-টো করে ঘোরে লোকের বাড়ি, কোন কথা কয় যদি কেউ শোনে পেতে আড়ি। রাস্তাঘাটে কোন কথা বলে যদি লোকে, এক লাফেতে বিষ্টবাবু সেখান গিয়ে ঢোকে। “আমার নামে বললে বুকি?” বলবে ধরে তাকে। এমনখার বিষ্টবাবু সদাই ভয়ে থাকে। পুলিশের এক কর্তা সেদিন বসে বাতের বেলা, কাকে জানি ভীষণ রেগে গালি দিলেন মেলা। বিষ্ট সেখান আসছিল তার লাঠি হাতে নিয়ে; শুনে সে-সব কথা সে যে দৌড়ে বলে গিয়ে, “আমার নামে বললে কি সব? আমার লাঠি ঘাড়ে?” কর্তা শুধন চোঁচিয়ে উঠে বলেন, “বাবা, মা রে।”

হাকেন তিনি, “পুলিশ, পুলিশ, ডাকাত আমার ঘরে।” ক’জন পুলিশ দৌড়ে গিয়ে ফেলল তাকে ধরে। এত দিনে বিষ্টবাবু শিক্ষা হলো আজ, প্রতিজ্ঞা দে করল ভীষণ, “করবো না এই কাজ!” সেদিন থেকে বিষ্টবাবু আগের মতো রোজ তার নামেতে কে কী বলে রাখে না আর ধোঁষ।

শ্রীঅশোককুমার দাশগুপ্ত



তুলি

শিল্পী: শ্রীহলদা দত্ত



বর না কেনে ?

ছড়া : ই বনিলেন চৌধুরী

কবিতা : শ্রীকীর্তনারায়ণ চৌধুরী

সোনা আমার সোনা,
সোনা চাঁদের কণা,
সোনা মুখের সোনা হাসি,
সোনার যায় না কেনা ।

বাদলদিনের খেলা

• কুম্-কুম্-কুম্ বৃষ্টি পড়ে
• জলে একাকার
ঠাণ্ডা হ'ল তপ্তধরা
সিঁড়ি চারিধার ।
এমন দিনে ভিজে শুধু
কাল কাল কাক
তাদের সাথে ভিজে মোরাও
খুঁজছি শুধু ফাঁক ।
বামলা দিনে আকাশ ঘিরে
বেশ জমে বার বধন
ব্যাকুল মনে ইচ্ছে যতো
বাইরে বাব কখন ।
চার বেগুনের আবরণে
মন কি কতু টেকে
ছপর ছপর জলের মধ্যে
খেলব হৈকে-ভেঁকে ।
হাটুর উপর কাপড় তুলে
নামব মাঠের 'পরে
ছপ্, ছপাছপ্, জল ছোটাব
পড়ব হড়াম্ ক'রে ।
এমন দিনে এমন খেলায়
দিও না কেউ বাধা
যত্নে বসে তারাই থাকে
যারা শুধুই হাঁসা ।
শ্রীকল্যাণী চক্রবর্তী



বই



(সমালোচনার অন্তর্গত বই পাঠ্যবস্তু)

চায় করি আলম্বে—আলম্বে মুনতত।
অহুবাণ—ঐইন্দিরা দেবী। প্রকাশক—কে,
গাঙ্গুলী এণ্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড, ৮ বি
লালবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১। মূল্য ৫/-

গ্রামের পরিবেশে রাখণ সান্ধা কনসাকর,
হাসা রাক্ষিত্তি প্রভৃতি আরও কয়েকটি ছেলে-
মেয়ে—অনাবিল আনন্দময় তাদের প্রভৃতি। গ্রাম
থেকে গোল্ড বায় ইকুলে, সারাদিন কাটে লেখা-
পড়ার আর খেলাধুলার—ছুটির পরে আবার ফিরে
আসে নিজেদের ঘরে। সান্ধার বাবা গেছে বৃদ্ধে ;
গ্রামের আরও অনেক গেছে। বিদেশীদের আক্রমণ
থেকে দেশকে রক্ষা করতে। দেশকে রক্ষা করতে
গেলে বৃদ্ধ করতেই হবে—ভাত্রে চাই অনেক কিছু
অস্ত্রশস্ত্র, সান্ধ-সরভাস, খাঞ্চশস্ত্র। গ্রামে যাওয়া
আছে তাদের চিন্তা কি করে ফল বাড়ানো
যায়। প্রাণপণে তারা চেষ্টা করে—সেই চেষ্টার
বোগ সেধ ছোটরাও মনের আনন্দে। সান্ধা,
হাসা প্রভৃতি ছেলেমেয়েরাও এগিয়ে যায় ফল
ফলানোর খেলা খেলতে। ফলের প্রাচুর্যে
তাদেরও মেহমান থৈ থৈ করে আনন্দে। মূল এই

কাহিনীকে কেন্দ্র করেই বইখানি লেখা। আলিন
পূর্বস্তারপ্রাপ্ত কন ভাষায় রচিত এই গ্রন্থখানি
অহুবাণ ক'রে ঐইন্দিরা দেবী বাংলার কিশোর-
সাহিত্যে একটি নূতন সম্পদ যোগনা করলেন
মনেহ নেই। অহুবাণের ভাষা এবং ভঙ্গী বেশ
সহজ এবং প্রাচল। এই অহুবাণ গ্রন্থখানি
পড়লে ছোট কেন বড়দেরও আনন্দ হবে।

—

সোনার পুতুল হীরের চোখ—
ঐবিশনাথ দে। আর্ট ইউনিয়ন, ৫৫৭ গ্রে স্ট্রীট,
কলিকাতা ৬ হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১৮০ ন, প
খুব ছোটদের অন্ত্রে লেখা, বড় টাইপে ছাপা,
বড়ন ছবিতে ছবিতে স্তব্ধ কথার কাহিনী।
ছোটরা খুবই খুশি হবে এ বই পড়ে, এবং তারা
চেয়েও বেশী খুশি হবে শিল্পী শৈল চক্রবর্তীর
আঁকা রঙার ও হস্তর ছবিগুলি দেখে। এছাড়া
উপরের কভারটি দেখে ছেলেমেয়েরা কেন বড়রাও
মুগ্ধ হবে।

—

মহাকালের পূজারী—ঐশীয়েন্দ্রলাল ধর।
কিশোর ভারত, ২ ককিরটাস মিড্র ষ্টীট,
কলিকাতা ২ হইতে প্রকাশিত। মূল্য ২২

ঐতিহাসিক ঘটনাকে আশ্রয় করে উপভাস
রচনা করার উপাধান প্রচুর আছে ভারতবর্ষে।
কিন্তু তা থেকে উপদ্রুত কাহিনী নির্বাচন করার
মধ্যেই আছে বিচার-বুদ্ধির পরিচয়। আর সেই
নির্বাচিত কাহিনীকে অবিকৃত ও সর্বকালের
পাঠকের তৃপ্তিগরক করে তোলার মধ্যে আছে
লেখকের কৃতিত্ব। কাহিনী-নির্বাচন এবং সেই
কাহিনীকে রসোত্তীর্ণ করে তোলার দিক থেকে
'মহাকালের পূজারী' একটি সার্থক নির্বাচন ও
রচনা। নন্দবংশের পতন ও মৌর্যবংশের
অনুপ্রাণনের কাহিনী নিয়ে লেখা এই উপভাস।
পড়তে পড়তে তখনকার হাফুজান, রাজা-
রাজকন্যার রাত্রে গিয়ে পড়ি আমরা এক ঘটনা-
গুলির স্পষ্টতা সহজেই আমাদের চোখের সামনে
ভেসে ওঠে। বীরেন্দ্রলাল ধরের ভাষা সাবলীল
এবং ঘটনাক্রমে সাজাবার কৌশল তাঁর জানা
আছে। বইখানি প্রধানতঃ ছোটদের জন্য লেখা
হলেও, বড়রা এই বই পড়ে আনন্দ পাবে।
ছাপা, বাণাট, কাগজ হুম্বর এবং উপরের
প্রচ্ছদপত্রটিও আকর্ষণীয়।

—

এগুয়ারসেনের রূপকথা—অহুবারক
শ্রীভাষণ রহা। প্রকাশক—আন্তোভ
লাইব্রেরী, ৫ বন্দিম চার্ট্রুয়ে ষ্টীট, কলিকাতা ১২।
মূল্য ২-৭৫ ন, প

ডেনমার্কের রূপকথার ভাদুকের ছাপ
ক্রিস্টিয়ান এগুয়ারসেনের নাম সারা পৃথিবীতে
পরিচিত—তাঁর রূপকথাগুলির ভিত্তে। অসংখ্য
রূপকথা তিনি লিখে গেছেন। আর, পৃথিবীর
প্রায় সব ভাষাতেই দেশগুলির অহুবার হয়েচে
কিশোর পাঠক-পাঠিকারের মনোরঞ্জনের জন্য।
শ্রীভাষণ রহাংর 'এগুয়ারসেনের রূপকথা' সেই-
রকম একটি অহুবারের বই। এ-বইতে তিনি
এগুয়ারসেনের সাতটি রূপকথার বাংলা-অহুবার
উপহার দিয়েছেন। প্রত্যেকটিই সুনির্বাচিত
এবং অহুবারের সরলতার উপভোগ্য। বাসের
জন্ত এ বই, তারা প'ড়ে খুশিই হবে। অনেক-
গুলি ছবি আছে এ-বইয়ে। মলাটের রঙীন
ছবিটিও সহজে দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

—

শ্রীচরণেশু (মাসিক পত্রিকা)—
ঐননীপোশাল দত্ত সম্পাদিত। ৪ বি, রাজা
কালীকাল লেন, কলিকাতা ৫ হইতে প্রকাশিত।
বার্ষিক মূল্য ৩/- প্রতি সংখ্যা ১/-

এই মাসিক পত্রিকাখানি দ্বিতীয় বর্ষের ১ম
সংখ্যা (আশ্বিন) পূজা-সংখ্যা হিসাবে প্রকাশিত
হয়েছে। এই সংখ্যায় ছোটদের জন্য থারা নাম-
করা লেখক, তাঁদের অনেকেই গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা
প্রভৃতি লিখেছেন। নবাগত লেখকরাও আছেন
অনেকে। সাক্ষীগোলের দিকে কর্তৃপক্ষের যে
বিশেষ নজর আছে তা কাগজটি হাতে
পড়লেই বোকা যায়।

—

হাসির টেকা—শ্রীমৎশ্রীকুমার রিড-মজুমদার। দ্বারকানাথ সাহিত্য-সংসদ, ২৮৮এ বিডিন রো, কলিকাতা ৬ হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১০।

ছোটদের মজার কবিতার বই। সর্বসম্মত বোলটি কবিতা আছে এর মধ্যে এবং প্রত্যেকটির মধ্যেই আছে হাসি-হজার খোরাক। নগেন্দ্র-কুমারের ছেলেদের লেখায়, বিশেষ করে কবিতা লেখার যে হাত আছে তাতে আর সন্দেহ নেই। রেবতীস্বপ্নের ছবিগুলি এই হাসির যাত্রাকে বহুগুণ বর্ধিত করছে। আগাগোড়া হুঁরঙে ছাপা। চারটি ভাসের টেকা দিয়ে আঁকা প্রচ্ছদপটটিও মনোমম।

—

ঘুরে এলাম সুন্দরবন—শ্রীমতীগোপাল চক্রবর্তী। বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লি., ১৪ বক্স চাট্‌জো স্ট্রিট, কলিকাতা ১২। মূল্য '৭৫ ন, প

আমাদের কাছে-পিঠেই এমন অনেক জায়গা আছে, যাদের কাহিনী হৃদয় করে লিখতে পারলে উপভোগ্য হয় ছোট-বড় সবার কাছেই। 'সুন্দরবনের কাহিনী' এমনি একটি হৃদয় ভ্রমণ-কাহিনী। ননীগোপাল বাবু ছোটদের অল্প নানা ধরনের লেখায় সিদ্ধহস্ত। তাঁর এই সচিত্র ছোট ভ্রমণ-কাহিনীটির মধ্যে অনেক তথ্য তিনি দিয়েছেন, সহজ ও সরল ভাষায়। নানা ধরনের জীবজন্তুতে ভরা সুন্দরবন সত্যিকার কাছে-পিঠের

আড়ডেকারের জায়গা যে তাতে আর সন্দেহ নেই। শিকারারা এখানে জলস্থলে কুমীর, বাঘ, হরিণ, পাখী শিকার করে থাকে। অনেক রোমাঞ্চকর জ্ঞানবার জিনিসও আছে এই বনের মধ্যে। শেষের দিকে 'সুন্দরবনের দেবতা' পরিচ্ছেদটি এই বইয়ের অভ্যন্তর আকর্ষণীয় একটি অংশ। এ বই পড়ে তোমরা সকলেই খুশি হবে। বেশ বড় টাইপে ছাপা।

—

গুণতে শেখা—শ্রীমৎশ্রীকুমার ভট্টাচার্য। চণ্ডীচরণ দাস এণ্ড কোং প্রাইভেট লি., ১০০নং ধর্মতলা স্ট্রিট, কলিকাতা ১০। মূল্য ১৮

'গুণতে শেখা' অক্ষরগুণে ছাপা, বহু রঙের ছবিতে ভরা, বড় সাইজের একখানি সুন্দর গণিত শেখার বই। ছোটদের প্রাথমিক ধারা-পাত-শিক্ষা হিসাবে ১, ২, ৩, ৪ থেকে ১০ পর্যন্ত ছড়ার সাহায্যে যোগ দিয়ে এর মধ্যে যেমন দেখান হয়েছে, তেমনি ১০ থেকে এক-এক করে কমিয়ে বিরোধ করও দেখান হয়েছে ছড়ার মাধ্যমে। ছড়াগুলি ভারী সুন্দর। এখানে একটু নমুনা দিই :

'নীল আকাশে পাঁচটি পাখি

উড়ছে এলোয়ালো,

একটি গেল ব্যাধের হাতে

চারটি কিংবদন্তি এলো।'

এর সুন্দর সুন্দর ছবিগুলি একেছেন বিখ্যাত শিল্পী শ্রীপ্রভু চট্টোপাধ্যায়।

—



পূজার পর তোমাদের সঙ্গে এই প্রথম দেখা, তাই সকলকেই আমার আনন্দিক ভালবাসা ও শুভেচ্ছা জানালুম। ইতিমধ্যে তোমাদের অনেকেরই অভিধান-জানানো চিঠি পৌছে গেছে। তাদেরও ভালবাসা ও শুভেচ্ছা-জানানো চিঠির জবাব রইল এই সঙ্গে।

মা দুর্গা থেকে আরম্ভ করে কালী, লক্ষ্মী, কান্তিক, জগদ্ধামী প্রভৃতি প্রায় সবই একরকম শেষ হয়ে গেল, এখন রইলেন বাকী শুধু মা সরস্বতী। তিনি তো তোমাদের একরকম নিজস্ব। কি ঠিক বলিনি? ফুলে, কলোজে, ক্রাবে, লাইব্রেরীতে—যেখানে বিস্তার একটু চর্চা আছে, সেখানেই মা সরস্বতীর আবির্ভাব তো হবেই, তাছাড়া আরও কত কত বাড়িতে যে হবে তার ঠিক নেই। আর তার সঙ্গে হবে তোমাদের নাচন-কৌদন। একটা কিছু উপলক্ষ্য পেলেই তো আর তোমাদের সঙ্গে নেই! থাক, সে এখনও প্রায় মাস দুই দূরে, অতএব এখন একটু পড়াশোনার মন পাও। বই-পস্তর তো নিশ্চয়ই এতদিন শিকের তোলা ছিল, কাজেই এখন পড়ানুসার মন না দিলে ক্ষতি হবে নিশ্চয়ই।

হ্যাঁ, আর এক কথা—তোমাদের সঙ্গে তোমাদের বাবা-মা এবং অভিভাবকদেরও আমার বিজয়ার অভিবাদন জানালাম।

এবার তোমাদের ব্যক্তিগত চিঠির আর উত্তর দেওয়া হ'ল না, আগামীবার সকলের চিঠির উত্তর পাবে। ভাল আছে তো সকলে? ইতি—

তোমাদের মধুচন্দ্র

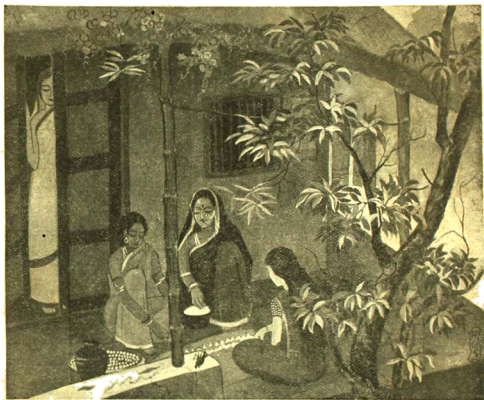
আগামী মাঘ-সংখ্যার মৌচাক 'গ্রাহক-গ্রাহিকা সংখ্যা' হিসাবে বেবলমাত্র গ্রাহক-গ্রাহিকাদের লেখা নিয়েই প্রকাশিত হবে। তোমরা যারা এই সংখ্যার অন্তর্গত গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা, জীবনী, ধাঁধা বা ছবি পাঠাতে গাও, তারা ১০ই শোভের মধ্যে দেগুলি মৌচাক অফিসের ঠিকানার পাঠাবে, এবং প্রত্যেক খামের উপরে লিখে দেবে 'গ্রাহক-গ্রাহিকা সংখ্যা' ব'লে।

ঐশ্বরীচন্দ্র সরকার কর্তৃক ১৪ বক্স চাট্‌জো স্ট্রিট, কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত

ও তৎকর্তৃক প্রাপ্ত প্রেস, ৩০ কর্নওয়ালিস স্ট্রিট, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

মূল্য : চল্লিশ নয়া পয়সা

মোচাক—পৌষ. ১৩৬৫



পৌষসার্কর্ন

শিল্পী : ঐসতীজনাথ লাহা



৩৯ বর্ষ]

পৌষ-১৩৬৫

[৯ম সংখ্যা

কোঙ্গী-বিচার

বন্মে আলী মিয়া

সারসচরণ বেছাড়া রকম লোক
পঞ্জিকা দেখে প্রতি কান করা তাহার কেমন
বোঁক ।
পূর্ব্বিমা মিনে পুঁই খেতে বানা-বঘার বারণ নশা
অমাবস্তাতে বেগুন ভক্ষ্য-প্রতিপদে গুজদশা ।
'যাজ্ঞা নাস্তি' দ্বিতীয়ায় ঋতে-তৃতীয়ায় শুভযোগ
পঞ্চমী মিনে ব্যবসায় হুত-বষ্টিতে দুর্ভোগ ।
এমনি করিয়া প্রতিদিন তার বাঁধা পঞ্জিকা সনে
শাস্ত্র-বিধান করে সে পালন পরম তুষ্ট মনে ।

এমন ঘে-জন সারসচরণ-তাহার কন্ঠাসায়
খুঁজিয়া পাতিয়া একটি পাত্রে পেয়েছে সে
কালনাথ ।

দেখিতে গুলিতে পাত্রটি বেশ-অভিজাত উচুঘর
দান-ঘোতুকে নাই কোনো দাবী-কাজ চাই তৎপর ।
সারসচরণ অতি খুশী মনে হুক করে আয়োজন
কর্ণ করিছে বেধা আছে বস্ত আস্থায় প্রিয়জন ।
সব কার শেষে বাহির হইল কোঙ্গী-বিচার তরে
ঘুঘুভাঙা থেকে লিলুয়া অবধি জ্যোতিষীর খোঁজ করে
সহসা সেখিল বাগবান্নারের বড় দাস্তার পাশে
কে এক জ্যোতিষী রয়েছে সেখার-বহলোক দ্বায়
আসে ।

সারদা ভাবিল, এইবার সে পেয়েছে সঠিক ঠাই
ইহার গণনা হবে নিতুল কোনো সন্দেহ নাই ।
ঘরেতে ঢুকিয়া এক কোণে সে চুপটি করিয়া বসে
জ্যোতিষী তখন ব্যস্ত খুবই-একমনে আঁক কষে ।

কাজ শেষ করি একে একে বস্তু চলে গেল লোকজন
সারাদি এবারে ঠিকুজী মেলিয়া কহে নিজ বিবরণ :
“বর আর বর অতি পছন্দ—বিবাহের দেরি নাই
শতটাকা লহে। প্রণামী বাবদ—গণনা এখন
চাই।”

জ্যোতিষী হাসিয়া টাকা ভুলে রাখি ঠিকুজী
খুলিয়া লয়
তারপর ধীরে দাগ টেনে চলে দারাদি কাগজ ময় ।
কত যে রকম হিসাব করিছে—কত না রকম লেখা
সহসা একটি বিধবা রমণী দ্বার-পথে দিল দেখা ।
কহিল ভাকিয়া, “বেলা হলো বাবা, রাত্রা হয়েছে
শেষ।”

জ্যোতিষী কহেন, “সেরি হবে কিছু, নাহি অবসর
লেশ।”
কথা শুনি নারী চলে গেল ধীরে অন্তর আড়িনায়—
জ্যোতিষী মশাহ ডুবে গেল পুনঃ ঠিকুজীর
গণনায় ।

কাগজের 'পরে আঁক কহে আর দাগ টানে
হিজিবিজি
দারাদি গরম—ঘামেতে তাহার সারাদেহ ওঠে
ভিজি।

দেখিতে দেখিতে বেলা বেড়ে ওঠে—গ্রহর
কাটিয়া যায়
কিছু পরে এক বিধবা রমণী বাবে আসে পুনরায় ।
কহিল তাহারে, “বেলা গেল বাবা, চানের সময়
নাই।”

জ্যোতিষী কহিল, “বোসো কিছুকাল—কাজ শেষ
হলে যাই।”

চলে গেল নারী জ্যোতিষী আবার ডুবে গেল
নিজ কাজে
গ্রহরেক বেলা কেটে যায় ধীরে—ঘড়িতে তিনটা
বাজে ।

অপর একটি বিধবা তরুণী আসিয়া দাঁড়ালো দ্বারে
পিতারে কহিল, “বেলা গেল বাবা, বলি তোমা
বারে বারে ।
তবু হ'ল নাই—ওঠো স্বরা করি—চান করিবারে
যাও।”

জ্যোতিষী কহিল, “বাইমা এবার, গামছা ও
ভেল দাও।”

চলে গেল নারী। সারাদি এবারে শুধাইল
জ্যোতিষীরে,
“তিনটি মহিলা কস্তা কি তব, জেক বার গেল
ফিরে ?”
জ্যোতিষী কহিল, “হতভাগী ওরা, তিনজন
পতিহীন,

বুড় বয়সে তাবনাতে তাই কাটেনাকে। যোর
দিন।”
সারাদি কহিল, “কোঞ্জি-বিচার করে নাই কিগো
কতু !

করেছিলে যদি, অকালে কেমনে বিধবা হইল তবু !”
নিজের মেয়ের ঠিকুজী বাহার নিতুল হয় নাই
যোর কস্তার কোঞ্জি গণিবে চিন্তা করিছি তাই ।
“নাও কিরাইয়া—চলে বাই আমি, বিবাস
নাই আর

স্বয়ং জ্যোতিষী পরাজিত বেবা—আমি সেখা
কোন ছানু।”

এতক বলিয়া সারদাচরণ ঠিকুজী লইয়া করে,
যীর পদ ফেলি নিরাশ মনেতে ফিরিয়া চলিল ঘরে ।



(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

৬৪

শিকাগোর ট্রেন ধরলেন স্বামীজি ।

রাইটের ব্যবস্থায়ুযায়ী টিটি এসেছে স্বামীজির কাছে । কোথায় গিয়ে উঠতে হবে থাকতে হবে তারও নির্দেশ দিয়ে দিয়েছে রাইট । নিজের পয়সায় টিকিটও কিনে দিয়েছে একথানা ।

এ সব কি করে হয় ? কার কৃপায় ?

‘জীবন ঋণস্থায়ী স্বপ্নমাত্র, যৌবন ও সৌন্দর্য বসে থাকে না—’ লিখছেন স্বামীজি : ‘দিবারাত্র বসে, তুমি আমার পিতা, মাতা, স্বামী, দয়িত, প্রভু, ঈশ্বর—তোমাকে ছাড়া আমি আর কিছুই চাই না, আর কিছুই না, আর কিছুই না । তুমি আমাতে, আমি তোমাতে—আমি তুমি, তুমি আমি । ধন চলে যায়, সৌন্দর্য চলে যায়, শক্তি চলে যায়, জীবন নিবে যায় এক সূঁয়ে, কিন্তু প্রভু চিরদিন থাকেন, প্রেমও অম্লান-অক্ষয় । যদি দেহকে সুস্থ রাখতে পারায় কিছু গৌরব থাকে তবে দেহের অন্ত্রের সঙ্গে আত্মাতে অন্ত্রের ভাব আসতে না দেওয়ায় আরও গৌরব । জড়ের সম্পর্ক না রাখাই একমাত্র প্রমাণ যে তুমি জড় নও । সুতরাং ঈশ্বরে লেগে থাকো, দেহে বা অন্ত্র কোথায় কি হচ্ছে কে গ্রাহ্য করে ? যখন বিপদ আর দুঃখ এসে বিচিত্র ভয় দেখাতে শুরু করে তখন বসে হে আমার ভগবান, হে আমার প্রিয় ; যখন মৃত্যুর ভীষণ যন্ত্রণার মধ্যে এসে পড়েছ তখনো বসে হে আমার ভগবান, হে আমার প্রিয় । তুমি তো এখানেই, আমার সঙ্গেই আছ, আমি তোমাকে দেখছি, তোমাকে অনুভব

করছি। আমি এই জগতের নই, আমি তোমার, তুমি আমাকে ত্যাগ কোরো না। হীয়ার খনি ছেড়ে কাচখণ্ডের অন্বেষণে নিয়ে যেও না। এই জীবন একটা মস্ত সুযোগ, তোমরা কি এই সুযোগ অবহেলা করে বসে থাকবে? যিনি সকল আনন্দের প্রস্রবণ তাকে খুঁজবেনা?’

যদি ধর্মসভায় ঢুকতে পাই কি না জানি বলা হবে সেখানে। কোনো বক্তৃতা হই তৈরি নেই, কিছু লিখে নিয়ে আসিনি সঙ্গে করে। তিনি যেমন বলান তেমনি বলব।

শিকাগোতে রঙনা হবার আগে স্বামীজি সালেম থেকে গিয়েছিলেন সারা-টোগায়। সেখানে আমেরিকান সোশ্যাল সায়াল স্যাসোসিয়েশন তাঁকে ডেকেছিল বক্তৃতা দিতে। সে প্রতিষ্ঠানে ধর্ম-আলোচনা চলবে না, সামাজিক সাংস্কৃতিক বা ঐতিহাসিক বিষয় নিয়ে বলতে হবে। তাই সই। যে বিষয় চাও সেই বিষয়ে বলব। সর্ব ব্যাপারে আমি প্রস্তুত। স্বামীজিকে প্রথম বিষয় দেওয়া হল, ভারতে মুসলমানী শাসন; দ্বিতীয় বিষয়, ভারতে রোপ্যের ব্যবহার; তৃতীয়, ভারতীয়দের রীতি-নীতি সংস্কার-বিশ্বাস। সমস্ত বিষয় নখাঞ্চে, নখাঞ্চে শুধু নয় জিহ্বাঞ্চে। যে শোনে সে শুধু শোনেই না, দেখে। বিষয় যাই হোক না কেন দেখে এক বিষয়াতীত বিশ্বয়। লৌকিক ছাড়া কিছু চলেনা সেই সমাবেশে কিন্তু এঁর আবির্ভাবই যেন অলৌকিকের স্বাক্ষর।

ট্রেনে এক গণ্যমান্ত্রের সঙ্গে দেখা। খুব একজন বড় ব্যবসাদার বলে মনে হচ্ছে।

‘কোথায় চলেছেন?’ জিগগেস করল স্বামীজিকে।

‘শিকাগোর ধর্মসভায় যোগ দিতে।’

‘উঠবেন কোথায়?’

‘জেনারেল কমিটির চেয়ারম্যান রেভারেণ্ড জন হেনরি ব্যারোজ-এর ওখানে।’

‘ডক্টর ব্যারোজ?’

‘হ্যাঁ, তাই। দেখুন দেখি এ ঠিকানাটা কোথায় হবে?’ স্বামীজি পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বের করে দেখালেন সেই ভদ্রলোককে।

কাগজের উপর একবার চোখ বুলিয়েই ভদ্রলোক বললেন, ‘আমিও যাচ্ছি ওদিকে। আমি আপনাকে ঠিক পৌঁছে দেব ঠিক জায়গায়।’

ঈশ্বরের কৃপা অহেতুক।

তার রঙ্গও অকারণ।

প্রকাণ্ড স্টেশন শিকাগো। ছর্দাস্ত জনসমুদ্র। উত্তাল ব্যস্ততা চতুর্দিকে। ভিড়ের ঢেউয়ের মধ্যে সেই সদাচার ভদ্রলোক কখন যে কোথায় তলিয়ে গেলেন টের পেলেন না স্বামীজি। গলা বাড়িয়ে এদিক-ওদিক খুঁজতে লাগলেন টিকিরও সন্ধান মিলল না। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, নিজেই তবে খুঁজে-পেতে বার করতে হয় ব্যারোজের আস্তানা। ঠিকানাটার জগ্গে পকেটে হাত ঢোকালেন স্বামীজি। কই, কই সেই কাগজের টুকরোটা?

সেই ঠিকানা-লেখা কাগজের টুকরোটাও অস্তহিত।

এখন উপায়? কাউকে জিগগেস করি।

পথচারীদের সম্মুখীন হলেন স্বামীজি। বলতে পারো ধর্মহাসভার অফিসটা কোথায়? ডক্টর ব্যারোজের নাম শুনেছ? বলতে পারো কোনদিকে তাঁর বাড়ি?

সবাই মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। 'হুঁ' শব্দটিও করে না। কেউ-কেউ বা সটান অগ্রাহ্য করে, পাশ কাটিয়ে চলে যায়। বিন্দুমাত্র সাহায্য করবারও কারু মন নেই।

প্রথমত এটা কর্মানদের পাড়া, দ্বিতীয়ত এ লোকটা কান্ধি না নিগ্রো তার ঠিক কি।

‘অস্তুত দিতে পারো একটা হোটেলের ঠিকানা?’

কেউ গ্রাহ্যও করে না। যার পথে যে, সরে পড়ে।

সন্ধ্যা হয়ে এল। চারদিকে অন্ধকার দেখলেন স্বামীজি। ফিরলেন স্টেশনের দিকে, উঠলেন এসে মালগাড়ির বোলা ইয়ার্ডে। দেখতে পেলেন কতগুলি খালি কাঠের বাস পড়ে আছে এদিক-ওদিক। বড় দেখে বাছলেন একটা। আর তার মধ্যেই নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে শুয়ে পড়লেন কুঁকড়িসুঁকড়ি হয়ে।

আশ্রয় নেই আহা! নেই—তাই বলে ভয় বা নৈরাশ্য বলেও কিছু নেই স্বামীজির। যিনি সমস্ত অন্ধকারে দীপপ্রদ উপস্থিতি সেই জীৱামকৃষ্ণ আছেন তাঁর শিয়রে, তাঁর হৃদয়ের মধ্যে। সমস্ত বিপদে যিনি আশ্বাস, সমস্ত ব্যাধিতে যিনি ওষধি, সমস্ত প্রত্য্যাখ্যানেও যিনি অপরাধুখ। হুশিস্তার কুয়াশার রেখাটিও কোথাও রইল না, পরম আরামে ঘুম এল স্বামীজির।

পথ চলতে চলতে যেখানেই সন্ধ্যা হয় সেখানেই সন্ন্যাসীর রাত্রির শয্যা, তা সে রাস্তার ফুটপাথই হোক বা রেলইয়ার্ডের কাঠের বাগ্নই হোক।

অক্রিয়াই পরাপূজা, মৌনই পরম জপ, অচিন্তাই পরম যোগ, অনিচ্ছাই পরম সূখ। শাস্তির মত আর মন্ত্র নেই, নিজের মত আর দেবতাই নেই, আত্মমুগ্ধতার মত আর অর্চনা নেই, তৃপ্তির মতো আর ফল নেই। আমি ভবাব্দে মজ্জমান বলেই তো তুমি আমার উপযুক্ত কুল। আর তুমি কৃপা দিতে অকৃপণ বলেই তো আমি তোমার উপযুক্ত পাত্র।

ভোর হতেই উঠে পড়লেন স্বামীজি। হাওয়াতে যেন জলের আঁণ পেলেন। খানিক এগিয়ে দেখতে পেলেন হৃদয় আর তার পাড় বেয়ে প্রশস্ত রাস্তা, যে রাস্তায় বিলাসী ধনীদেবই বসবাস। রাস্তার মতই মনও যদি তাদের প্রশস্ত হত। নিদারুণ বিষে পেয়েছে স্বামীজির, কে তাঁকে ছুঁকরো রুটি দেবে, গ্রাসে দেবে একটু আচ্ছাদন। ভিক্ষে করলে কেমন হয়। আমি সন্ন্যাসী, আমার ভিক্ষে করতে কি দোষ? সন্ন্যাসী তো চিরকালে ভিক্ষুক।

দ্বারে-দ্বারে ভিক্ষে চেয়ে ফিরতে লাগলেন স্বামীজি। যতটুকু দিয়ে আমার এ বেলার ক্ষুধার নিবৃত্তি, শুধু ততটুকুই আমার ভিক্ষে। অতিরিক্ত আমার স্পৃহা নেই কণামাত্র।

অপমান করে তাড়িয়ে দিল দ্বারীরা। পরনে ময়লা কাপড়, সমস্ত গায়ে-পায়ে ধুলো, এ কে কিস্তিকিমাকার! আর কি স্পর্ধা, খেতে চায় একমুঠো। খাওয়াবার কেউ ভিক্ষে করে নাকি?

কেউ-কেউ মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দেয় সজোরে।

‘ভিক্ষে না দাও ধর্মমহাসভার ঠিকানাটা বলে দাও।’

কেউ কর্ণপাতও করে না।

কোথায় গেলে বা শহরের ডিরেক্টরি বা টেলিফোন-গাইড পাবে তারও হৃদয় জানা নেই স্বামীজির। কি করি কোথায় যাই কাকে ধরি।

যতক্ষণ পাবে শক্তি আছে হাঁট, যেখানেই শ্রান্ত হয়ে বসে পড়ব সে তোমারই কোল আর তুমি ছাড়া কে আছে আমার হাত ধরবে।

হে জগদীশ্বর, তুমি আমাকে বিভাঙিত করলেও আমি তোমার পাদপদ্ম ছাড়ব না। রোষহেতু, মাতার দ্বারা নিরস্ত হলেও স্তন্যাক্ত শিশু মায়ের চরণ ছাড়ে না কিছুতেই। তুমি থাকতে আমি নিজেকে অসহায় ভাবব? আমি আর কিছুই চাই না, আমাকে *ঐর্ষ্য দাও, তোমার অনন্তশক্তিই আমার রক্ষক আমার এই বিশ্বাসকেই আরো দৃঢ় কর, এই বিপদ-বাধা তোমারই মঙ্গলেচ্ছা, দাও সেই অভয়-আশ্বাস। আমার অহঙ্কারকে চূর্ণ করবার জন্তে আমাকে দীন করো, কিন্তু তোমার আনন্দ থেকে আমাকে বিচ্যুত কোনো না। যে ভয়গ্রস্ত সেই নিরানন্দ। আমাকে সর্বসংসার কর। যেন চিন্তা-বিলাপ-বর্জিত হয়ে থাকতে পারি শেষ পর্যন্ত।

অবসন্ন হয়ে পথপ্রান্তে বসে পড়লেন স্বামীজি।

যা হবার তাই হোক। উত্তীর্ণ হই কি না হই, চরম পরীক্ষার শেষ, উত্তর দিয়ে যাই।

‘আপনি কি ধর্মমহাসভার প্রতিনিধি?’ কে একজন জিগগেস করল কাছে এসে।

ভদ্র, মার্জিত, কোমল কণ্ঠ। চোখ চাইলেন স্বামীজি। রানীর মত দেখতে, স্বরে ও দৃষ্টিতে প্রবীড়িত দাক্ষিণ্য।

আশ্চর্য, কি করে চিনতে পারল? কে পরিচয় দিয়ে দিল কানে-কানে?

‘হ্যাঁ, সেখানে যাব বলেই বেরিয়েছি।’

‘কিন্তু এখানে কেন—এ অবস্থায়?’

স্বামীজি আত্মপূর্বিক বললেন তার চূর্মশার কথা।

‘আপনি আমার সঙ্গে আসুন।’ ভদ্রমহিলা মমতাভরা ঔদার্যে আহ্বান করলেন স্বামীজিকে : ‘রাস্তার ওপারে ঐ আমার বাসা। আমার সঙ্গে চলুন। আপনি আমার অতিথি।’

এ কি সম্ভব? নাকি এ ইন্দ্রজাল?

যে মাকে মেনেছে নরেন এ কি সেই আত্মস্তুরাখা জননী। করুণার কল্লতা। পীযুষবাদিনী স্নেহস্বর্গদা।

‘আপনি কে জানতে পারি?’ ভদ্রর পায়ে উঠে দাঁড়লেন স্বামীজি।

‘আমি মিসেস জর্জ হেল।’

শালীন, বদাম্ত ভঙ্গি। স্বামীজি উঠে পড়লেন। অমুগমন করলেন।

‘তিনি কি সারাজীবন তাঁর কোলে আশ্রয় দিয়ে এখন পরিত্যাগ করবেন ? কখনো করবেন ?’ লিখছেন স্বামীজি : ‘হিংস্র বাঘের মধ্যেও তিনি, মৃগশিশুর মধ্যেও তিনি। ভগবানের যদি কৃপাদৃষ্টি না থাকে, সমুদ্রে এককোঁটাও জল থাকে না, গভীর জঙ্গলেও এক টুকরো কাঠ পাওয়া যায় না, আর কুবেরের ভাণ্ডারেও মেলেনা এক মুঠো অন্ন। আর যদি তাঁর কৃপা হয়, মরুভূমিতে নির্মলজল স্রোতস্বতী বইতে থাকে আর ভিখারী ভিক্ষকেরও জুটে যায় অটল দৌলত। একটা চুড়ই পাখি কোথায় উড়ে যাচ্ছে, কোথায় বা ঝরে পড়ছে একটা শুকনো পাতা তাও তিনি দেখতে পান।

প্রহু, আমার শিব, তুমিই আমার ভালো তুমিই আমার মন্দ। তুমিই আমার গতি আমার নিয়ন্তা, আমার শরণ, আমার সখা, আমার গুরু, আমার ঈশ্বর, আমার ষড়ার্থ স্বরূপ। আমি কখনো-কখনো একলা প্রবল বাধাবিপ্লবের সঙ্গে যুদ্ধ করতে-করতে দুর্বল হয়ে পড়ি, তখন মাহুকের সাহায্য পাবার জন্য ব্যগ্র হই। আমার চিরদিনের জ্ঞাত এ সব দুর্বলতা থেকে মুক্ত করে দাও, যেন আমি তোমা ছাড়া কখনো কারু কাছে সাহায্য প্রার্থনা না করি। যদি কোনো লোক কোনো ভালো লোকের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে সে কখনো তাকে ত্যাগ করেনা বা তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেনা। তুমি প্রহু, সকল ভালোর সৃষ্টিকর্তা, তুমি কি আমায় ত্যাগ করবে ? তুমি তো জানো সারা জীবন আমি কেবল তোমারই দাস। তুমি কি আমাকে ত্যাগ করবে যাতে অপরে আমাকে প্রবঞ্চনা করবে বা আমি অন্তঃকর দিকে চলে পড়ব ?’

মিসেস হেল স্বামীজিকে বাড়ির মধ্যে নিয়ে গিয়ে প্রচুর সেবাসুজ্ঞা আপ্যায়ন করলেন। শুধু তাই নয় ধর্মমহাসভার কার্যালয়ে নিয়ে গেলেন, পরিচয় করিয়ে দিলেন কর্মাধ্যক্ষদের সঙ্গে, যারা প্রতিনিধিত্ব করতে এসেছেন নিমন্ত্রিত হয়ে তাঁদের সঙ্গে। যত সব বিধিনিয়মের বাধা ছিল সব অপসৃত হয়ে গেল। এখন শুধু ছজন, আকাশে ঈশ্বর আর মাটিতে ভারতবর্ষের সনাতন হিন্দুধর্মের এক ব্যাখ্যাতা।

(ক্রমশঃ)

চিত্র

শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

শ্রীচরণেশ্বর মা,

ক্যালেন্ডার অনুযায়ী শীত শেষ হয়েছে। এখন বসন্তকাল। কিন্তু ক্যালেন্ডারের কথা মস্তকের আবহাওয়া শোনে না। এখন যদিও কয়েক দিন বরফ পড়েনি, তবে ঠাণ্ডা বেশ রয়েছে। সকালে সন্ধ্যায় টেম্পারেচার— 8° সি/— 10° সি থাকে। বাড়ির বাইরে বেরতে হলেই সেই কার-কোট আর ধাবতীয় গরম জামা-কাপড় পরতে হয়। বাড়ির ছাতে-ছাতে এখনো বরফ জমে রয়েছে। পথ পরিষ্কার করে দু'পাশে যে-বরফ ভাঁই করা হয়েছে তাও গলেনি। কিন্তু বরফের রঙ পেছে বললে। সেই হুম্বর শাশি রঙ আর নেই। চেহারাটা হয়েছে রোঁয়া-গঠা বেড়ালের মতো। বিল্লী লাগে। গলে গেলে বাঁচি।

তোমাদের নিশ্চয়ই জানতে ইচ্ছে করে শীতটা কেমন কাটলো। যদি বলি শীতকালে গরমে কষ্ট পেয়েছি তাহলে কথাটা হয়তো অস্বস্ত শোনাবে। কিন্তু সত্যিই তাই। বাড়ির মধ্যে Central heating-এর দরুন বরফলো ভারি গরম থাকে। জানলাগুলোর তো ডবল শাশি, ভেতরে তুলো দেওয়া। শুধু ওপরের একটু জায়গা খোলা যায়। বাইরের বাঘাটে ঠাণ্ডার ভল্টে রাতে সেটা খোলার ভরসা হয় না। ফলে বারবার তেঠা পায়ে, গলা শুকিয়ে যায়, ভালো ঘুম হয় না। সকালে কপুকে ইঞ্চলে পৌঁছে দেওয়া আমার একটা বাড়তি চাকরি। তাকে নিয়ে যখন বাইরে বেরকই তখন বাইরেরকার ভাঙ্গা ঠাণ্ডা বাতাস এতো ভালো লাগে কী বলবো।

মাঝে সমস্ত ইঞ্চলে ১২ দিনের ছুটি গেলো। বসন্তকালের ছুটি। এ-সময়টা ছেলেমেয়েরা বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়ায়। পড়াভনো বিশেষ করে না।

এখন আকাশ পরিষ্কার বাজে। যোজাই রোদ উঠছে। কিন্তু ঠাণ্ডা কনকনে রোদ তাতে বরফ গলে না।

গতকাল রাত ৮-১০-তে দ্বিতীয় স্পুটনিক দেখলাম। উত্তর-পশ্চিম কোণ থেকে দক্ষিণ-পূর্ব কোণে চলে গেলো। কাগজে আগে থেকেই দেখা যাবার খবর বেরিয়েছিলো। অনেকে রাস্তার ভিড় করেছিলো। আকাশটা টলটলে নীল। চাঁদ উঠেছে। চূপচাপ আকাশের নিকে ডাকিয়ে আছি—হঠাৎ ঐ, ঐ—ছোট্ট একটা লাল তারা। আকাশের এক কোণে দেখা দিলো। দেখতে দেখতে চলে গেলো আকাশের অন্য কোণে বেড় ঘড়ায় পৃথিবী ঘুরে আসছে।

দ্বিতীয়কালে মহাবই বাইরে যায়। আমরাও কোথাও যাবো। তবে কোথায় যাবো এখনো ঠিক করতে পারছি না। যাবার অনেক জায়গা—কৃষ্ণদাগর, ক্রাইমিয়া, ককেশাস, যকো নদী ধরে

দিন হুড়ি একটানা ঘুরে আশা। আরও কত কী। আমাদের তো নদী-পথে ঘুরে আসতে খুব ইচ্ছে। তাতে বিশ্রাম হয়, মাপিয়ার নানা গ্রাম, ছোটো ছোটো শহর, অনেক রকম প্রাকৃতিক দৃশ্য বার দেখা। কোনো দেশকে ভালো করে চিনতে হলে বড় বড় শহরের চেয়ে ছোটোপাটো গ্রামে বেড়ালে সত্যি গারের অভিজ্ঞতা হয়। তোমার কী মনে হয়?

শৈতকালে দিনগুলো বেশায় ছোটো ছিলো। এখন খুব বড় হয়ে উঠেছে। সকাল সাড়ে পাঁচটাতে ফর্সা হয়ে যায়। রাত ৮টা পর্যন্ত আকাশে আলো থাকে। আরও বড় হবে। জুলাই মাসে রাতের অন্ধকার চার ঘণ্টাও থাকে না।

এখনো গাছে পাতা নেই। মাঠে ঘাস নেই। কিন্তু আর কিছুদিনের মধ্যেই এই সব গাছ মাঠ ফুল-পাতার-বালে ঝলঝল করে উঠবে। এখনো দে-কথা বিবাহই হয় না।

আমাদের বাড়ির কাছে একটি 'পেডাগকিক ইন্সটিটিউট' আছে। সেখানকার ছেলেমেয়েরা কিছুদিন আগে এখানকার অনেক ভারতীয়দের নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন। 'ভারতীয় সন্থা'র ব্যবস্থা করেছিলেন। অনেক কশী বাংলা হিন্দী গান ও বক্তৃতা গেলো। অনেকের সঙ্গে আলাপ হোলো। সবচেয়ে ভালো লাগলো এখানকার সবাইকার আমাদের দেশ সম্বন্ধে আন্তরিক উৎসাহ ও ভালোবাসা দেখে। সবাইকারই আন্তরিক আগ্রহ আমাদের দেশে ঘুরে আসার। আগ্রহ নয়, স্বপ্ন বললেই ঠিক হয়।

মধ্যেতে অনেক বড় বড় পার্ক আছে। ঠিক পার্ক নয়, খেম ছোটো-ছোটো শহর। তাদের মধ্যে সিনেমা, থিয়েটার থেকে শুরু করে হরেকরকম ব্যবস্থা। একটার মধ্যে দুকলে কোথা দিয়ে যে দিনটা কেটে যায় বোকা যায় না। শৈতকালে এই সব পার্ক বন্ধ থাকে। গরম কালে খোলে। যে মাসে খুলবে। আমাদের বাড়ির খুব কাছে, রুগুর ইন্ডলের পাশেই বিরাট একটি প্রদর্শনী আছে—কৃষি-শিল্প প্রদর্শনী। জায়গাটা এতো বড় যে তার ভিতরে ঘুরে বেড়াবার অল্প বাস আছে। অদ্ভুত চমৎকার জায়গা। দিনের পর দিন ধরে দেখা যায়। এখন বন্ধ। পেটা খোলায় দ্রুত উৎসাহ হয়ে রয়েছে। আগে অনেকবার গিয়েছি। কিন্তু মনে হয় যেন কিছুই দেখা হয়নি। পরে ঐ এগজিবিশন সম্বন্ধে বড় করে লিখবো।

আমাদের বাড়ির কাছেই নতুন একটি মেট্রো স্টেশন তৈরী হচ্ছে। চারিমিকেই হেঁটে করে তৈরী হচ্ছে পথ-ঘাট বাড়ি। কত তাড়াতাড়ি এরা এগিরে চলেছে! কত সন্মরণভাবে এগুচ্ছে! কী রকম উৎসাহের সঙ্গে এগুচ্ছে। এই অগগতি ভাবি ছোঁরাচে। ইচ্ছে হয় তাড়াতাড়ি কিরে গিয়ে আমাদের দেশকেও নতুন করে গড়ে তোলার কাজে কোমর বেঁধে লেগে বাই।

তুলু প্রথম হয়েছে ভেনে আমরা সবাই খুব খুশি হয়েছে। প্রণাম মেনো।* ইতি—

* এই এপ্রিল ১৯৯৮, বাক্যে যেতিমতে গঠিত।



হৃদয়ী শূন্য

[উপস্থাপন]

ধোবার্চ

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

...স্বীমার চলেছে দুই ডানা মেলে। ঈশ্বরবের বুক চিরে। দুই পাশে ঘনপত্রিত আম গাছ, আমগাছ; বাঁশের ঝাড়—চয়ে আছে কোথাও, নদীর বাক-বাক। কোথাও বাগানের এক অংশ ভেঙে পড়েছে নদীর গর্ভে। মাটির চাপ এখনও জলের তলার বাধ নি।—সর্বাঙ্গে শাপ বদন্তরোস্ত্রের মতন মাগার গাছ কাত হয়ে আছে তার উপর। শূণ্যরি গাছের বাগানের পাশ দিয়ে পুরোনো কাঁটাতারের বেড়া খুলে পড়েছে। ঘাটে-ঘাটে বউ-ঝিরের ভিড়। ছেলেমেয়ের কাঁপাকাঁপি—স্বীমারের ঢেউ, ভেঙে ভেঙে আছড়ে পড়েছে কূলের উপর। ঢেউয়ের মধ্যে সীতার আসতে চায় গামছা মুখে—ওরা কারা?—কালো কালো চুল মাথায়, তারি মতন বয়সের ছেলের দল—এ কোন্ গ্রাম—ওরা কোন্ ক্রাসে পড়ে?

আঁকসি হাতে ফুল তুলছেন সর্বেশ্বর চক্রবর্তী। বড়ম পায়ে এগিয়ে যান, একটার পর একটা জবা ফুলের গাছ শেষ করে, টগর ফুলের ডাল আঁকসি দিয়ে নাড়িয়ে আনমন তিনি। অক্ষয় পোদ্দারের কথাটাই কি মনে পড়েছে তাঁর? ব্রহ্মাচীর আর একটু হোলে মাত হয়েছিলেন মৈব রায়ের কাছে, শিনাকীর চালেতেই শামলে যান দে-বাত্রা। খেলা ঘুরে গেল। অক্ষয় পোদ্দারের কথা কেউ বিশেষ গ্রাহ্য করে নি। অল্প কথা হন দিয়ে শোনার অবস্থাও ছিল না কাকুর তখন। সর্বেশ্বর ছেলেকে ধমক দিয়েছিলেন, বা-বা,—বুড়োদের খেলার মধ্যে তোকে আর জ্যাঠামি করতে হবে না। কিন্তু মনে মনে অসন্তুষ্ট হন নি তিনি মোটেই। সত্যি ছেলেটার বুদ্ধি প্রবর, প্রতিভাও

ধাকবাব কথা। ছেলে জন্মাবার আগে স্বামী ও স্ত্রী দু'জনেই গৃহদেবতার কাছে প্রার্থনা করেছিলেন—হে মাধব! এমন ছেলে হোক আমাদের, যার ডহু সৌন্দর্য অতুল্য করতে পারি আমরা—মাথা হেঁট করতে যেন না হয় কোনদিন। পিনাকী কি সত্যি মাধব হবে?...যে আবহাওয়া ওর দাঁতুর বাসায়—ভরসা শুধু অরুণতী আছে...। মাধব কি তাদের আন্তরিক নিবেদন শুনেছেন?...হুল্লর চোখে চাউনি কিন্তু ছেলেটার...। গায়ে একটা ছেঁড়া গেঞ্জী, পরনে আধময়লা কাপড়, অলঙ্কার সর্বস্বর ঠাঁতুর দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।...

যে সোয়েভা স্ত্রীহার পিনাকীর কাছে ভক্তি ও কোতূহলের বস্তু ছিল, সেই সোয়েভা স্ত্রীহারেই পিনাকী বাঁড়ী দ্বিষ্ট। লোডলা স্ত্রীহার, স্ত্রীহারের কেরানীবাবুর সঙ্গে রক্তনাকার ঘনিষ্ঠ পরিচয়। একেবারে ফাটল্লাসের কেবিনে স্থান পেয়েছে পিনাকী। রক্তনাকা আরামে বিজানার শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন। গুটি গুটি পা বাড়িয়ে সামনের ডেকে এনে দাঁড়াল পিনাকী।

দৌনামুতি, পাড়ীওয়ালো পোট্র সারেঙ, কেবিনের আবেইনীর আবরণে পশ্চিম মুখ হয়ে এতক্ষণ নামাজ পড়ছিল। নামাজ শেষ করে উঠে দাঁড়ায়। পিনাকীর মুখের দিকে হাসিমুখে চেয়ে দেখে একবার, তারপর বলে—খোকাবাবুর কী খবর?

পিনাকী হৃৎকিয়ে যায়। সারেঙ, সমস্ত তার ধারণা অতিশয় অস্পষ্ট। সে কথা বলতে যায়,—কি বলবে জানে না—কথা জড়িয়ে যায়। শুধু বলে—আমি, আমি—রক্তনাকা।...

সামনের চেয়ারটার উপর এক হাত রেখে যেন একটু ভরসা পায় অবশেষে, পরক্ষণেই আবার সহজ হয়ে পড়ে। কার চেয়ার কে জানে? কেরানী হিন্দু, কিন্তু সারেঙ, মুসলমান, নামাজ পড়ে। জাহাজের মধ্যে যেমন কাপ্তেন সব চেয়ে বড়, স্ত্রীহারের মধ্যেও তেমনি সারেঙ, শ্রেষ্ঠ পদের অবিকারী। পিনাকী মনে মনে চিন্তা করে তৎক্ষণাৎ। সারেঙ, বোধ হয় ধরে ফেলেছে, এখনি টিকিট চেয়ে বলে যদি!

—চেয়ারে বসবে, বোদ না কেন—সেখো যেন রেলিঙের উপর হুকো না। পরিষ্কার কলকাতার ভাবার কথা বলে দারেঙ। ক্যানিং অফলে আগি নিবাস—পিনাকীর সম্বন্ধে একটি স্বাক্ষর ছেলে তার। কলকাতার শাস্ত্রীর কাছে থাকে ছেলে, স্থলে পড়ে। পিনাকীকে দেখে সারেঙের মনে ছেলের মৃতিটি ভেঙ্গে ওঠে অকস্মাৎ এক মুহূর্তের জ্ঞান। লুই-পরা সারেঙ মুহূর্তে এগিয়ে যায়। দুই কেবিনের স্বাক্ষর দিয়ে। সব পথ অতিক্রম করে। রেলিঙের উপরে হুকো বীচের দিকে তাকিয়ে কর্তরত একটি খালানীকে কি যেন আদেশ দেয়। তারপর পিছন ফিরে চেয়ে দেখে, পিনাকী চেয়ার একটু টেনে সরিয়ে বসেছে। হঠাৎ মুখ ফেরাতেই সারেঙের সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে যায় আবার।...

...খলিল, হ্যাঁ, এই ছেলটার মতনই তো খলিলের বয়স। বড়টা বোধ হয় একটু কাল—না—প্রায় একবকমেরই হবে। খলিলের মামারা সব মূল-কলেজে পড়ছে। জয়হুল সারেঙের আশা, ছেলে তার একদিন পুলিশ সাহেব হবে। পুলিশ সাহেবের চেয়েও তো ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বড়—ঠিক তাহলে ম্যাজিস্ট্রেটই হবে খলিল। হজ্ব করে এসেছে সারেঙ, অনেকে হাজী সাহেব বলে ডাকে। খাতিরও করে সবাই এলাইনে জয়হুল সারেঙকে। জাহাজ থেকে নেমে মক্তার রাস্তার যেতে একদিন একজন মিলর দেশের পীর গলির উপর দাগ কেটে বিচার করেছিলেন জয়হুলের ভবিষ্যৎ। বলেছিলেন—তোমার একটি মাত্র ছেলে—তার ছায়া তুমি কষ্ট পাবে। কিন্তু সে মস্ত ধনী ও প্রতিগতিশীল লোক হবে, বহু লোককে হুকুম দেবে সে। প্রথম প্রথম অহুলের ধারণা হয়েছিল—ছেলে হয়তো দারোগা হবে, ঘুব নেবে, তাই তার মনে কষ্ট হতে পারে; কিন্তু ছেলের মামাসের নজর অনেক উচুতে। দারোগার পদকে মোটেই লোভনীয় মনে করে না তারা। বলে—খলিলের যেমন লেখাপড়ায় মাথা ও আই. এ. এস. হয়ে বাবে অনার্বাসে। —কি জানি, হোলেও হোতে পারে। জয়হুল দাড়িতে হাত নুলায়, ভাবে খোঁষার স্বর্জী—খুলনার পুলিশ সাহেবের জীমকে পুরো এক বছর সারেঙ ছিল জয়হুল মিক্রা।...

স্বীমারে হইমিল বেছে ওঠে ডোঁ-উ-উ-উ—দীর্ঘায়ত বংশধর থেকে শোনা যায়। নদীর দু'পারের লোকেরা আওরাঙ্গের তারতম্য বুঝে নেয় বেলা কতখানি বেড়েছে। বাজার বাবার অস্ত্র তৈরী হয় গৃহস্থেরা। আপ-স্বীমারের আওরাঙ্গে বাজার বসে, ডাউন স্বীমারের শলে বাজার ভাঙতে শুরু হয়। পিনাকী চকল দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে সামনের দিকে।

স্বীমার বাক ঘুরে এগিয়ে চলে। ঝপ্ ঝপ্ ছই কেলছে খালানীরা নদীর মলে। কই, খালের উপর বাশের সাকো দেখা বাজে কি? ঐ তো! ঐ কি? ই্যা, ই্যা—রক্তের মধ্যে ঢেউ ওঠে, ছদ্মগিত উজাড় হয়ে বাবে বুঝি। দীর্ঘ প্রতীকার পর অস্বাভ, দ্ব্যর্থ পিনাকী ফিরছে নিম্নের গ্রামে। নিম্নের গ্রাম, তাপের গ্রাম—যে গ্রামের ছোট প্রাঙ্গণের এক পাশে পাটখড়ির বেড়ার ঘরে জয় নিয়েছিল শিশু। তাপপাতা কেটে চাল বানিয়েছিল ছহুরায় মঙল। কি দরকার বড় দিয়ে তৈরী ঘরের? অগ্রহায়ণ মাসে বৃষ্টি সন্তানবাণ ছিল না, কিন্তু তবু বৃষ্টি এলো। ঝম্-ঝম্—কী বৃষ্টি! যেন বর্ষাকাল। দীছ মাসা গল্প করে, জানিস শিশু—তুই যেদিন জন্মালি সেদিন কী বৃষ্টি! আতড়-ঘর ভেসে বাব আর কি, দিদির গায়ে জর, তুই কিন্তু কাঁদছিলি না মোটেই—আমরা ভাবলাম তুই বুঝি আর নেই।...

পিনাকীর ভাল লাগে শুনতে—কি আশ্চর্য, সে এত বড় হ'য়ে গিয়েছে, সীতার দিয়ে নদী পার হয়ে যেতে পারে—মাঝের কাঁধ সমান লম্বা। সে কি ক'রে মায়ের শরীরের মধ্যে ছিল?...কুর্ঘ

অবতারের পেটের মধ্যে গোটা ছনিঘাটাই বা ছিল কি করে? ইলিশ মাছের পেটে ডিম, সেই ডিম থেকে কত বড় বড় মাছ হয়? কি মজা!

—বড় বড় মানকচুর পাচ ছিল পশ্চিমের ঘরটার পিছন দিকে। সে সময় একটা পাতিলেবুর গাছও ছিল শুইখানটার। তোর বাবা কেটে কেসেছেন গাছটা—দাঁপের আড্ডা হয়েছিল কিনা। রাত্রাঘরে ভাতের হাড়িতে জল ঢালতে ঢালতে গল্প বলেছিল মা একদিন—তুই তখন খুব ছোট ছিলি, একটা সাপ—গোথরো সাপ এসে উঠেছিল বারান্দায় কি করে যেন। বেঁধে হয় মানকচুর পাতার উপর দিয়ে এসেছিল। সাপটা এগে খোয়াড়ের মধ্যে ফণা তুলে ভুলছিল—মাগো, ভাবতেও গা সির-সির করে ওঠে এখনও।

—তারপর কি হোল?

—তারপর আর একটু হোলেই তুই ধরতে গিয়েছিলি সাপটাকে হাত বাড়িয়ে। ভাগ্যিস দস্ত জোঠা এগে পড়েছিলেন সেই সময়, তাই রক্ষে। পালিয়ে গেল সাপটা। নেবু বাগানের দিকে।...

এর আগেও পিনাকী এই গল্প শুনেছে ঠাকুরমার কাছে, দস্ত বড়ীর কাছে, কিন্তু মায়ের মুখ থেকে শোনে নি। পিনাকীর সব চেয়ে ভাল লাগে মায়ের মুখ থেকে গল্প শুনতে। শৈশবের স্বতি কাটা কাটা—দরজীর দোকানের টুকরো হাট-কাপড়ের মতন জমে ওঠে গল্প পিনাকীর মনে। স্নিহার জল কেটে চলে। পাঁচ ছিল ছোট মেবে পুঁটি মাছ মুখে বসেছে কাশবনের পাশে—বাংলা গাছের ডালে, একপাল গরু-বাছুর নিয়ে নামছে ঘাটে রাখাল দল। শুধু জল খাওয়াবে, না স্নানও করাবে—কে জানে?...

জল মধ্যাহ্নে হাটুরের উপর পা বিছিয়ে বলেছেন মা। মায়ের ঠোঁটটা খুব লাল হয় পানি বেলে। ঠাকুরমা বলে, বউদের ঠোঁট লাল হওয়াই ভাল, বউও সুখী হয়, ছেলেও সুখী হয়। পিনাকী ভাবে, গ্রামের মধ্যে ভাব মা'ই সব চেয়ে সুখী। বেলা, পাকল, খুঁট, বুঁটা, ফটক, হাজারী, নেপাল দস্ত, নির্মল রাস্তা—কাকুর মায়ের ঠোঁট তো এত লাল হয় না। বার বার পানি খেলেও হয় না।

—মা, সাপের ভয়ে নাকি তুমি বেজী পুবেছিলি? ঠাকুরমা বলেছে।

সলসল হাসি হেসে মা উত্তর দেন—তোর ঠাকুরমা বুঝি তাই বলেছেন তোরা কাছে? আমি কেন পুবেত বাব, তোরা ঠাকুরমাই বললেন কিনা দুখ খাওয়াতে। একদিন দেখি কি, ঢেঁকি ঘরে—ভোলের মধ্যে তুই নিতে গিয়েছি—ওমা দেই ভোলের মধ্যে একটা বেজীর ঢামা! কি করে বে এল ওখানে তা জানি না—বেজী পুথলে সাপের ভয় বায়—তোরা ঠাকুরমা প্রায়ই বলতেন, আমায়ও ইচ্ছে ছিল একটা বেজী পুথি। সব সময় চোখে চোখে কে রাখে তোকে? উনি তো বাড়ীর বাইরে থাকতে পারলেই বাঁচেন। আমি রাসাঘরে, তোরা ঠাকুরমা ঠাকুর ঘরে জগে বসেছেন—শুধু

মলের আশ্রয় ভ্রমণেই ব্রহ্মাণ্ড তুই ঠিক আছিল। তোর অকমালী তোর অস্ত্র হুঁজোড়া রূপের মল পাঠিয়ে দিয়েছিল। অমৃতম ক'রে হাটুভিন তুই খোয়াড়ের মধ্যে।

পিনাকী বাধা দিয়ে বলে—বেজী, বেজীটাকে ধরলে কি করে?

—ধরতে হয় নি রে, এক বাটি দুধ রাখলাম ঢেঁকির মাথায় তোর ঠাকুরমার কথা মতো। আশ্চর্য, বেজীটা পোষ মেনে গেল এমন। আবার পিছনে পিছনে ঘুরত প্রায়ই। একটা লোহার শিকল বানিয়ে দিয়েছিল প্রিয় কর্মকার, তা শিকল খুলে দিয়েও দেখেছি, গালিয়ে বেত প্রথম দিকটা বাগানের দিকে, কিছুক্ষণ পর আবার ফিরে আসতো ঘরে।

—কি হোল বেজীটার শেষে? বেজী বুঝি বেশী দিন বাঁচে না? জানো মা, জানো—হাতী বাঁচে একশো বছর—বেলার শিশুভৃত্তো দায়া—ঐ বে বোগিন্দা কালকে এসেছে—তার বইতে লেখা আছে।

শিশুর কোঁতুল, প্রদেবের পর প্রদেব বলে যায় মুহূর্তে মুহূর্তে। কত কথা, কত বৃত্তি এসে ভিড় করে এক মলে। সমস্ত অতীত বিদ্যুৎ-ঝলকানির আলোয় যেন ভেসে ওঠে পিনাকীর মনে এক নিমেষে।...

নদীর পথ বেয়ে চলেছে রজনকাকা ও পিনাকী। ঘাটে ঘাটে ঘোমটার আড়ালে কোঁতুলসী দুল্লি—কে যায়? পিতৃ ঠাকুর আর বেলার বাবা থাকে। রজনকাকা চলতে চলতে বলেন, বাঃ! যোৎসেদের জামগাছটার এবার জাম ধরেছে তো খুব। আবেদন কলন এবার মোটেই ভাল নয় দেখছি।

—ও ছোটোকর্তা, কেমন আছেন? ইস্টীমারে আসলেন বুঝি? নন্দ বৈরাগী ছোট ভিজি বেয়ে বেঁচে বেঁচে টেঁচিয়ে বলে। রজনকাকা মুহূর্তে হেসে মাথা নাড়েন, বলেন—হ্যাঁ, স্টীমারেই এসেছি—ভাল আছি—তোমরা ভাল তো?

পুটিরাং হৃদয়সম হয়ে হেঁটে চলেছে বিপরীত দিকে থেকে। কি সোমাহার? ছোটো করতা নেহি। এই বে পিতৃ ঠাকুর—কখনে আসেন? জান আপনাবা, আহি আসতিছি—বাক্সের এটটু দরজার পড়িছে। ফিরে আ-মে শোনবানে সব।

—কি দরকার, এত ব্যস্তভাবে ছুটেছে কেন পুটিরাং?

ব্যস্ত—ব্যস্ত না হয়ে পুটিরাংয়ের উপায় নেই। আফিং-এর দোকানদার অগবদু দাভ, উড়ে—বাঁকালী হয়ে গিয়েছে, অনেকদিন এদেশে থেকে—পরিষ্কার বাংলা বলে, খবর পাঠিয়েছে একটু আগে—আফিং যা নেবে এই সময় নিয়ে থাক পুটিরাং, ডাউন স্টীমারেই চবে বাবে অগবদু দেশে, অনেকদিন যায় নি। আসল কারণ খুশীবাবুরা শহর থেকে আসছেন, আমকেই বাক্সের হাতায়

মিটিং। মগরাধ ভাবে মাল বডটা কাটিয়ে ফেলি ততই ভাল, কে জানে আর ব্যঙ্গা চলবে কিনা ভবিষ্যতে। মহাত্মা গান্ধীর নির্দেশ দেশবাসীর নিকট—মানকত্ব ব্যা বর্জন করো, বিলিতি কাপড় ছাড়া, ধন্দর পরো, চরকা কাটো।

পুঁটিরাম বৃত্তে পাবে না মহাত্মা গান্ধীকে। মহাত্মা, মহাত্মা না আরো কিছু। সে মরছে খুল বেদনায়, আফিং না হলে এক বেলাও চলে না তার। কই, দিক দেখি মস্তর, খুল বেদনা দূর করুক মহাত্মা, অসৈবাবুদের কথা শুনবে পুঁটিরাম। চরকা কাটবে সে। চরকা কাটলেই যদি ইংরেজ পলায় যায়, ক্যান কাটপোনা! দশবার কাটপো, চোদ্দবার কাটপো—সারারাত ধবেই কাটপোনে।—

(ক্রমশঃ)

হ-জ-ব-র-ন

শ্রীআশুতোষ সাহা

ওপাড়ার হুটু ডাক্তার—

বিলাত হইতে পেয়েছে খেলাত,—

তাই বুঝি এতো ঘাঁক তার ?

পটলার মাসী রেগে গেল কান্দি,

হারুর হয়েছে অর আর কান্দি,

জানেন মশাই, মদন গৌসাই—

দাতগুলো বড়ো ঠাঁক তার !

ভূতাদের হেড্‌মাস্টার,—

এক হাতে তার বই আর খাতা,

আর হাতে চক্-ভাস্টার।

টেবিলের পাশে টুলছে কে রানী,

কোরিয়া ঘীণের বলতো কে রানী ?

বঘুদের উড়ে রামধন মালী,—

বড়শির মতো ঠাঁক তার !

নাটোরের চুহু মোক্তার—

কাচাগোমার অকচি তাহার,—

ভক্ত কালিয়া-কোণ্ডার !

সন্তু এবার পাপ দিবে যি. এ.

কাল সন্ধ্যায় মটুর বিয়ে,

নন্দুর তাই একদম ইয়ে—

গুণার মতো ঠাঁক তার !

হাবড়ার রাম পোদ্দার,—

রাত আর দিন, মাস আর কালো—

নেই কোনো কিছু বোধ তার

বেঁটে আর মোটা ভ্রামের শব্দর,

জাপানীরা কতু বায় কি মন্ত্র ?

উঠে গেছে চুপ রমেশ বহুর,—

মাধায় আঙু টাক তার !

স্মৃতিস্মরণ

শ্রীঅবনীনাথ রায়

ইংরাজেরা ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে গেছে। কিন্তু আমরা সঙ্গে সঙ্গে তাদের গুণগুলি ভুলি নি। মাঝে মাঝে তাদের গুণগুলির কথা স্মরণ করলে আমাদের মনঃস্থ হয়। কারণ তাঁর থেকে গুণগুলি আমাদের জাতীয় চরিত্রে সংক্রান্ত হতে পারে।

এই রকম একটা ঘটনা বলি।

আমরা তখন করাচীতে চাকরি করি। করাচীর কন্টোলার ছিলেন সিদ্ধ এবং রাহপুতানা ডিষ্ট্রিক্টের কন্টোলার অব মিলিটারি একাউন্টস্। তাঁর উপরওয়াল ছিলেন ওয়েস্টার্ন কম্যান্ডের কমান্ড কন্টোলার—তাঁর আশিস ছিল কোয়েটার। আর সমস্ত ডিপার্টমেন্টের কর্তা ছিলেন মিলিটারি একাউন্ট্যান্ট জেনারেল—তাঁর আশিস দিল্লী-সিমলা। নিয়ম ছিল যে কোন রিপোর্ট যদি করাচী থেকে মিলিটারি একাউন্ট্যান্ট জেনারেলের কাছে পাঠাতে হয়, তবে সেটা সব সময়ই কোয়েটার কমান্ড কন্টোলারের আশিস হয়ে যাবে, কখনো সোম্বা দিল্লী বা সিমলায় চলে যাবে না।

এই সময় আমাদের ডিষ্ট্রিক্ট কন্টোলার ছিলেন মি: জি. আর. ও. ডাউড (Mr. G. R. O. Dowd)। নাম শুনেই বুঝতে পারছি বোধহয় তিনি আইরিশম্যান ছিলেন। শুদ্ধ শাস্ত চেহারা—আঙুলে আঙুলে কাছে এসে কথা বলতেন—কোন দিন কোন কারণেই চোঁচাতে শুনি নি। এই সময় কয়েকখানি রিপোর্ট অনবধানবশতঃ সোম্বা দিল্লী চলে গেল—নিয়ম মত কোয়েটার পাঠানো হয়নি। মিলিটারি একাউন্ট্যান্ট জেনারেল এই রকম ভুল দেখে বিলম্ব চটে গেলেন এবং ডিষ্ট্রিক্ট কন্টোলারকে লিখে পাঠালেন যে, যে-ব্যক্তি এই রকম ভুল করেছে তাকে চার্জ শীট (charge sheet) দেবে এবং তাঁর কৈফিয়ৎ আবার কাছে বিচারের জন্য দাখিল করবে। এই লব্ধ বিচারের ফল জানাই ছিল—এক তরফা, কাজির বিচারের মত। শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যেই কৈফিয়ৎ তলব করা হত। সুতরাং যেদিন মিলিটারি একাউন্ট্যান্ট জেনারেলের কাছে থেকে এই চিঠিখানি এসে পৌঁছলো, সেইদিন ডেসপ্যাচার বাবু আমাদের কাছে এসে প্রায় বৈশেষ বললেন, দাদা, এইবার আমার এতদিনের চাকরিটা গেল। চিঠি পাঠানো বা ডেসপ্যাচ করা তাঁরই কাজ—সুতরাং ভুল তাঁরই হয়েছিল।

সমস্ত আশিসময় একটা স্মরণ্য ভাব—কখন যেন লাগেব ডেকে পাঠান এবং চার্জ শীটের কুটার মুহূর্ত মাথায় পরিবে দেন। দুই তিন দিন এইভাবে কেটে গেল—এ বিষয়ে কোন উচ্চবাচ্য শোনা গেল না। সকলেই ভাবলো, ব্যাপার কি? দিন তিনেক পরে মিলিটারি একাউন্ট্যান্ট জেনারেলের নামে একখানি চিঠি ডেসপ্যাচ হওয়ার জন্য সেখানে এল। তাতে ও'ডাউড সাহেব

নিজেই মিনিটারি একাউন্টাণ্ট জেনারেলকে লিখছেন, যেদব চিঠি আপনার নিকট পাঠানো হয় তাতে আমি একখানি করে স্লিপ এঁটে দিই—তাতে এই মর্মে সাবধানতাসূচক নির্দেশ থাকে যে চিঠিখানি যেন ভুলক্রমে গিল্লী বা সিমলা চলে না যায়—যেন বামীও কটে লারের কাছে কোর্ডেটর পাঠানো হয়। কিন্তু এই কেসে (case) মনে হচ্ছে আমি অগ্রহণ্য হ'য়ে এই স্লিপ এঁটে দিতে ভুলে গেছি। সেই কারণে চিঠিখানি কোর্ডেটর না গিয়ে সরাসরি আপনার কাছে চলে গেছে। অতএব এই ভুলের ব্যাপারে আমারও দান ভর নহয়। (I have also contributed to a certain extent to this error). বলাগছা কটে লার নিজের ঘাড়ে সমস্ত দোষ তুলে নেওয়ার কলে উপর থেকে আর কোন হুমকি এল না। সেদিন ডেন্স্যাটার বাবুর চোখে জল দেখেছিলাম। তিনি বলতে লাগলেন, সাথে একবার ডেকে পাঠালেন না, চোখ রাঙালেন না, কৈফিয়ৎ চাইলেন না, এমন কি আমার নামটা পর্যন্ত জানতে চাইলেন না। একবারে চিঠি ডিক্টেট (dictate) ক'রে নিজের উপর সমস্ত দোষ অপবাদ টেনে নিলেন। এঁরা ধস্ত!

এর আবার একটা উল্টো দিকও আছে। আমাদের সহকর্মী এক ডব্রলোক ইংরাজীও ভুল বলতেন, বাংলাও ভুল বলতেন। তিনি বলতেন, অমুক বাবু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঁচ হাজার ডিনোট (denote) করে দিয়েছেন। কখনো বলতেন, বৈঠকখানা ঘরে গিয়ে দেখি আমার ছেলে বইপত্র টেবিলের উপর স্তপাকৃত করে রেখেছে। আবার কখনো বলতেন, অমুক বাবু লোক সুবিধের নয়—মনের মধ্যে অনেক ডুপ্লিকাসি (duplicacy) আছে। অথচ এই ডব্রলোক চাকরিতে জীবনে তর তর করে প্রমোশন পেয়ে গেলেন। তার মানে, চাকরিতে উন্নতির ক্ষত্র যে বস্ত্র দরকার হয়, তার নাম দক্ষতা নয়—তার নাম খোশামুদী। সেই খোশামুদিতেও ভুলতেন অনেক সাহেব,—স্ট্রাবিচার বা কাজের গুরুত্বকে আবার তাচ্ছিল্য করতেন ঠা'রা।

চীংকার

শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

বহু চীংকার করিয়া পড়িহু এগুণামিনের পড়া,
পানের বাড়ির নয়ন হইতে নিস্তা কাড়িহু শেষে।
সখাই ভারি, নখর দুকি কী ভীষণই পাব চড়া,
নিজেও ভাবিহু, না জানি ফিরিব পদ করে

কিবা হেসে।

কিন্তু বহু কে জানিবে হায় শেষে হবে এই দশা,
কোনচেন পেরে ঘুলিল ভোঁ বাধা,
অবাব সেওয়াই তার!
কড়িকাঠ গুনে দিয়ে এহু খাটা—

টিকিলে খেলাশ দশা,
মুখস্থ আর কত মনে থাকে—চীংকারই হল সার।



শট্কাট্

ত্রিবিবরাম চক্রবর্তী

আমার ছোট্ট ভাই ছোটবেলায় শট্কে বলত শাট্। শট্কাট্ ছিল তার কাছে শাট্কাট্। কিছুতেই আর এই উচ্চারণ শোধরানো যেত না।

‘শাট্ কাট্ ? তার মানে ?’ জানতে চাইতাম আমি : ‘এর কি কোনো মানে হয় ?’

মানে বলতে পারত না সে। বলত, কী মানে কে জানে ! কিন্তু সত্যি বলতে, এর মানে হয়েছিল। একদিন এর মানে ভালোভাবেই আমি টের পেয়েছিলাম।

কিন্তু আমার ভাইয়ের শাট্ কাটের টের আগেই পাশের বাড়ির ছেলের সিন্ধের শাট্ এমন এক কাট্ দিলো আমার, এমন দাঁগ বসিয়ে দিলো আমার মনে—মনের মধ্যে কেটে বসলো বেন। চকচকে স্বকৃৎকে সিন্ধের শাট্খানা তার সকালের দৌলানী রোদে এমন ঝলঝল করত, চোখ ঝলসে যেত আমার।

‘আমি একটা সিন্ধের শাট্ চাই।’ বললাম আমার ভাইকে।—‘ঠিক অমনি।’

‘আমারো চাই।’ সবার দিল আমার ভাই।

‘তাহলে বাবার কাছে চাইগে বা।’ আমি বললাম।

‘তুমি চাও পে।’ বলল আমার ভাই। ‘তুমি আমার আগে অয়েছ, আমার চেয়ে বড়। বাবার কাছে আছো আমার চেয়ে বেশি দিন। তুমিই বাবাকে ভালো জানো।’

‘আর তুই বাবাকে জানিসনে ?’

‘তাই কি বলেছি ? আমি বলেছি যে বাবার সঙ্গে তোমার পরিচয় আমার চেয়ে বেশি-
দিনের ।’

‘তাহলে মার কাছে গিয়ে চাওয়া থাক ।’ আমি বলি—‘আমরা দুজনেই একসঙ্গে চাইব,
কেমন ?’

‘মা আমাদের একটা দিকশার্ট দাও না ।’ রাস্তাঘরে বায়না ধরলাম গিয়ে : ‘এবার
পুল্লোর আমরা দিক শার্ট পরবো ।’

কথা শুনে তো মা কপালে চোখ তুললেন ।—‘তোরা কি রাস্তাপুল্লুর নাকি ? রাস্তাপুল্লুরবাই
দিক শার্ট পরে ।’

‘কেন, পানের বাড়ির ছেলেটা পরেছে যে ।’ আমি বললাম, ‘আহা কী হুম্মর শার্ট ! রোস
লাগলে কেমন ঝক্‌ঝক্‌ করে……’

‘এমন তো পুল্লোর তের দেরি । কিন্তু এখন থেকেই পরেছে সে ।’ আমার ভাই জানায় ।

‘সে হচ্ছে নবাবপুল্লুর । তার শোভা পায় । রাস্তাপুল্লুর নবাবপুল্লুরবাই……’

‘আমার বাবা অবশিষ্ট রাজা নয়, তা ঠিক ।’ আমি বলতে চাই : ‘কিন্তু বাবুর বাবা তার
বাবা তার বাবা কেউ যে কখনো রাজা ছিল না তার কি কোনো প্রমাণ আছে ? তাহলে আমাদের
রাজবংশে সন্দেহ তো । তোমার পায়ে পড়ি, দাও না মা আমাদের দিকের জামা ।’

মা কপালে চোখ তুলেছিলেন, এবার খুসি তুললেন । খুসিটা আমাদের কপালেই আছে
মনে করে, সেখানে পৌছবার আগেই, আমরা তিন লাফে রাস্তাঘর পার ।

বাইরে গিয়ে দু’ভায়ে পরামর্শ করি চ বাই, বাবার কাছে গিয়ে চাইগে, কিন্তু দু’জনে চাইলে
হবে না । দু’জনকে একসঙ্গে সেবে না বাবা । দিকের শার্টের দাম আছে বেশ । শুধু আমি চাইব,
কেমন ? আমি তো বড়ো, আমারই আগে পাওয়া উচিত, স্বেযে দেখলে ।’

‘বা ! আমি ছোট, আমি কেন পাব না ? ছোটবাই তো আগে পায় ।’ আমার ভাই
ভেবে ভাবে ।

‘বেশ, আমি চাই গে । একজনকে দিলেই হবে ডেবে বাবা আমাকে দিতে রাগি হবে
গেলেই তখন তোর সঙ্গে চাইবি । তোরও একটা না হবে যাবে না তখন ।’

‘বাবা, একটা কথা বলব ?’ বাবার কাছে গিয়ে কথা পাড়লাম ।

বাবা তখন একটা লম্বা চোড়া কাগজ, ‘হিতবাদী’ নাকী বেন নাম, তার ওপর শুয়ে পড়ছিলেন ।
মানে, শুয়ে শুয়ে কাগজটা পড়ছিলেন । ‘হিতবাদী’ শেয়ালের এমন এক বিরাট কাগজ ছিল বার

আখ্যানার শুয়ে বাকী আখ্যানা পড়া যেত।—‘কি কথা?’ কাগজ থেকে গা না তুলেই জানতে চাইলেন।

বাবা তেমন গা না দেখলেনও গাইতে হোলো আমাকে—

‘পাশের বাড়ির ছেলেটা একটা সিন্ধের মাঝা পরেছে।’

‘সে একটা গাধা।’

‘আমরাও অবনি পরবো।’

‘তোমরাও দুটি গাধা।’

‘দাঁও না বাবা, আমাকে একটা সিন্ধের শাট।’ আমি বিনতি করি।

‘আমাকে যদি শাট না দাঁও তাহলে একটা পাঞ্জাবি দাঁও।’ আমার ভাইয়ের আবেদন : ‘পাঞ্জাবি হলেও আমার হবে।’

‘পাঞ্জাবি নিবি? এই যে পাঞ্জাবি—আমার হাতেই রয়েছে।’ বলে বাবা কাগজের থেকে উঠে বসে নিজের হাতের পাঞ্জাবি দেখান। সেটা ক্রমেই ঘূষির আকার নিচ্ছে দেখে—তার পরিণতি দেখার লগ্ন বৈশ্বকর্ষ আর না থেকে—পাঞ্জাবি এলাকা ছেড়ে পালাই। পাঞ্জাবির লগ্ন দাঁড়াই না।

‘এরা আমাদের বাবা বা না।’ আমার দৃঢ় বিশ্বাস ব্যক্ত করি; ‘নিজের বাপ মা হলে কি আর নিজের ছেলেকে একটা সিন্ধের শাট দেয় না। আমাদের নিশ্চয় কোণ্ থেকে কুড়িয়ে এনেছে।’

‘কোনো রাজবাড়ির থেকে, তুমি বলতে চাও?’ আমার ভাই শুধায়।

‘তা কি করে বলব? আমি কি তা দেখতে গেছি আমাকে তো খেলার মধ্যে পুরে এনেছিল।’

‘তাহলে আর কী হবে!’ বলে আমার ভাই হাস ছেড়ে দেয়। ডিটেক্টিভ বইয়ের ছোঁক সে, অল্পদৃষ্টির কোনো স্বত্র না পেয়ে হতাশ হয়।

শাটের কথা তবে ভেবেই কিনা জানি না আমার জর হোলো। জরটা বৈকে গিয়ে চাইকয়েতে দাঁড়ালো।

জরলড়িত হয়ে আমি বিছানার শুয়ে রইলাম।

আমার বিছানার পাশে হয় বাবাকে নয় মাকে ঠায় বসে থাকতে দেখতাম। কি রকম যে চেহারা হয়ে গেছিল দুজনের। পনের দিন অস্থির ক্রমে আমার বা না হয়েছিল আমার বাবা মার চেহারা তার চেয়েও দেখতে খারাপ হয়েছিল। না খেয়ে না ঘুমিয়ে কী যে হয়ে গেছিল।

সেরে উঠে পথ্য করে আমি বললাম—‘মা বাবা! এবার তোমরা দু’জনেই নিজের নিকের নজর দাঁও। নইলে তোমরা বনি কের অস্থির পড়ো তো...’

আমার কথার বাবা যেন গলে গেলেন।

বললেন, 'তোমাকে একটা অঙ্কের দিই শিবু! তুমি যা চেয়েছিলে সেই দিচ্ছে শার্ট তুমি পাবে।' *

'দিচ্ছে শার্ট।' বিছানার ওপরেই যেন আমি লাফিয়ে উঠি।

'ক'দিন হোলো দন্ডির কাছে অর্ডার চলে গেছে, এবার এসে পড়বে তোমার শার্ট!'

'হ্যাঁ, তুমি কী ভালো কী ভালো যে... এর বেশি আর কোনো কথা আমার মুখ দিয়ে বেরলো না।

'তোমার অঙ্কের সময় তোমাকে ভালো করে দেবার জন্য তোমার মা কালীবাঁটে মানত করেছেন আর আমি তোমার মায়ের কাছে শপথ করেছি সেবে উঠলে তোমাকে দিচ্ছে শার্ট দেব।'

'শার্টটা এখন আমার গায় ফিট করলে হয়।'

'করবে বই কি! অঙ্কের সময় বিছানার ওবে থাকতে তো গায়ের মাঁপ নিতে নেই তাই ছোট্ট তোমার হুতির শার্টখানা দন্ডিকে দিয়ে এসেছে—অবিকল সেই মাঁপের জামা হবে, তুমি কিছু ভেব না।'

'আমার ভাই? আমার ভাইও তো পাবে একটা শার্ট।'

'একখানা দিচ্ছে শার্ট অনেকদিন দায়। আর এখন তো তোমাদের বাড়িবার বয়েশ।' আসছে বছরই তুমি এত বেড়ে উঠবে যে ও জামা তোমার গায় হবে না। আর ছোট্ট তার মধ্যে বড় হয়ে তোমার মতন হয়ে দাঁড়াবে। তখন তার গায়ে এটা ফিট করবে। তখন সে এটা পরতে পাবে। দাদার জামাই তো ছোট্ট ভাইরা পাবে। আমরাও তাই পরেছি তুমি কিছু ভেব না।'

'আমি একলা পরবো দিচ্ছে শার্ট। ও-ও চাইছিল তো।' আমার মন খুঁতখুঁত করে। আমার মনে পড়ে যায়...

মনে পড়ে যায় ওর চাইবার অজুত ধরনটা...

টাইফয়েড বলে আমার কাছে ঘেঁষার ওর কারণ ছিল কিন্তু অঙ্কের মধ্যেও আমার বেশ মনে আছে ও আমার বিছানার এসে বসেছিল।

আমি ঘুমিয়ে পড়েছি মনে করে ও আমার পাশে শুয়ে পড়ল আর বিড় বিড় করে কী যেন বলতে লাগল...

এখন আমার মনে পড়ে আমার ভাইও মা কালীর কাছে মানত করছিল—আমার জন্য নয়—ওর নিজের জন্য। বলছিল, হে মা কালী, আমাকে অঙ্ক দাও। আমরাও টাইফয়েড করে দাও। আর যদি নিতান্তই তোমার টাইফয়েড না থাকে তাহলে আমাকে বলন্ত দাও। বলন্ত না পারো তো

হাম দাঁও—হাম্দ দাঁও। মোটের ওপর অস্থ করে আমি বিছানায় পড়ে থাকতে চাই তাহলে আমিও একটা সিঁকের জামা পাবো।

সেই প্রার্থনার জোরে পাঁচের ওর অস্থ করে ভেবে আমার মন খারাপ হোলো।

‘সিঁকের কাপড়ের—গরুর—দাম বেজায়।’ বাবা বললেন—‘তা’হলে একটা জামা করতেই পচিশ-ত্রিশ টাকা বেড়িয়ে যায়। দু’জনের জামা একসঙ্গে এখন তো দিতে পারা আমার পক্ষে...’

বাবাকে আমি আব বলতে দিই না—‘ওতেই দুজনের হবে, আমিও পরিষো ও-ও পরবে। ও না হয় হাতাটা একটু শুটিয়ে নিয়ে পরবে।’

‘এই তো বেশ কথা।’ খুঁসি হয়ে উঠলেন বাবা : ‘তুমি একদিন পোরো ও একদিন পকক, কেমন ?’

অবশেষে শাটটা এলো একদিন। দজিই নিয়ে এলো নিজে।

তুম্বুনি আমি শাটটা আমার গায় চড়ালোম।

‘ওমা। একি শাট!’ শাটটা আমার গায়ে বেশ দাঁতে দাঁতে চেপে বসলো—সীতকালের উলেন দোহেটোর যেমন ফিট করে—তেমনি ফিট করে আমার গায়ের মধ্যে এঁটে রইলো একেবারে।

‘শাট এতো আটো-দীটো কেন মা!’ আমি প্রায় কঁদে ফেলি : ‘শাট তো এমন খারাপ হয় না।’

মা বললেন—‘তুমি কেমন খারাপ দজি গা? শাট বানাতে জানো না? শাট করতে গিয়ে বালিশের ওয়াড় বানিয়েছে? সিঁকের ওয়াড় একখানা?’

ওয়াড়ই বটে! গা থেকে শাট খুলতে তো আরেক দফা war! বীতিমত হুঙ্কারই বলতে হয়।

‘শাট বানিয়ে বানিয়ে মাখার চুল পাকালো মা।’ বললো দজি : ‘আজ্ঞা, ছোট খোকা পকক তো দেখি।’

আমার ভায়ের গায়ে শাটটা চরৎকার ফিট করলো।

‘এর গায়ে তো বেশ মানিয়েছে। তুল হলে আপনাদের দিকেই হয়ে থাকবে গিটীমা। আপনারা যে-জামা আমার পাঠিয়েছিলেন হবত তার মাপেই আমার বানানো নইলে, জামা বানাতে বানাতে বুড়ো হয়ে গেলাম, শাটের কাট-ছাঁট আমার কখনো তুল হয়?’...এই বলে দজি মাপের অন্ত পাঠানো জামাটা মায়ের গায়েব কাছে—‘এই তো সেই জামা—আপনারাই মিলিয়ে বিন।’

দেখা গেল সেটা, আমার জামা নয়, আমার ভাইয়ের গায়ের।

আর দেখা গেল তার শাট পাবার শর্টকাট্! তার এতদিনের উচ্চারণের মানেও টের পেলোম।

বিত্রোহী কিশোর

ত্ৰীপ্ৰভাকৰ মাৰি

তোমাৰ কিশোৰ অগ্ৰ পথিক চিৰ বিত্ৰোহী বীৰ ।

দুঃসাহসিক জয়-বাহ্যৰ গৰ্বোন্নত শিৱ ।

শিশু-দৰ্বেৰ লাষণ্য আজ

বিত্ৰোহ কৰে ধৰণীৰ মাঝ—

অদীম আকাশে ডান। মেলে সেছ চুপিয়া জ্বিলিৰ,

প্ৰাণ-প্ৰাচুৰ্বে নিত্য-নিৰন্ত উদ্ধাৰ অহিৰ ।

নৱনিঃস্ৰৱ বাহু তোমাৰ দুবস্ত চকল,

নবদৃষ্টিৰ সম্ভাবনাৰ বোঁবন উজ্জল ।

সংগঠনেৰ সংঘ গড়িয়া

ঘেৰে ঘেৰে বাবে পুলকিত-হিয়া,

চক্ৰেৰ কোণে বিজ্ঞান-শিখা, বন্ধে অদীম বল ।

সৱল-সহ্য পুত-পৰিত্ৰ মম্বাকিনীৰ জল ।

বেধা অস্ত্ৰায় অসত্য পাপ হস্ত বেধানে ৱয়,

বস্ত্ৰেৰ মতো গৰ্জে উঠেৰে সেইখানে দুৰ্জয় ।

ৱস্ত্ৰে সবার প্ৰাণয়েৰ নেশ।

ৱণ-ভূৱন ধন্তেছে যে হুয়া

অমিত বীৰে অন্ধকাৰেৰ পৰ্দা কৰেৰে লয় ।

হৃদয় কোড়, আঁৰাম-শয্যা তোমাদেৰ ওবে নয় ।

কৰ্মী কোবিং কৃপাণ শ্মশিক বিত্ৰোহী কুহিয়ায়,

ঘেৰেৰ বাৰ্ধে বয়স কৰেৰে হুঁৱাৰ পৰিণাম ।

অনাগত কাল তোমাদেৰ ওবে

দাগ কেটে বাবে লাল অন্ধৰে—

অচলায়তন স্তেঙে চুৰে মেৰে নিৰীক উদ্ধাৰ ।

দুই গোপাল নিমাই নৱেন যুগে যুগে কত নাম ।

তোমাৰ গড়বে নৃতন অগণ, নৃতন মাহুৰ লবে,

ব্যথাৰ বেধন জুড়াবে সকলে অনন্দ-কলৱে ।

জাতি-ধৰ্মেৰ কোন ভেদ নাই

অশাপবিদ্ধ তোমাৰা সবাই,

প্ৰেমের মন্ত্ৰে গণ-মানৱেৰ রাবীৰত্বন হবে ।

এনো বিত্ৰোহী তৰুণ কিশোৰ ব্যথা-অৰ্জৱ ভবে ।

ভ্রমের সন্ধানে

বিজ্ঞানপ্রিয়

সাত আট বছরের ছোট্ট একটি ছেলে। বড়দিনে তার বাবার কাছ থেকে একটি বই উপহার পেয়েছে। সেই বইয়ের একখানা ছবি একমনে দেখতে দেখতে অবাক হয়ে প্রশ্ন করলো—“বাবা, নগরটা বুঝি দেখতে এই রকম ছিল?”

তার বাবা মাথা নেড়ে জানালেন—বোধ হয়।

“এখন তার কোনো চিহ্ন নাই, কেউ জানে না কোথায় সেটা ছিল?” তার বাবা বললেন—“সত্যিই তাই।”

কিন্তু সেই ছোট্ট ছেলেটি রীতিমত জোর গলায় বললে—“আমি সে-কথা বিশ্বাস করি না, বাবা। আমি যখন বড়ো হবো তখন সেখানে গিয়ে নগরটা খুঁজে বার করবো, আর বার করবো রাজার ধনভাণ্ডার।” কথার সঙ্গে সঙ্গে জল জল করে উঠলো তার চোখ দুটো, দৃষ্টিতে তার দৃঢ়তার দীপ্তি। -মনে হলো, অদৃষ্ট-হরে ষাওয়া সেই নগর তার চোখের সামনে ভেসে উঠেছে; যেন সে দেখতে পাচ্ছে প্রাচীর-ঘেরা, প্রাসাদ-স্তম্ভ, ঐশ্বর্যময়ী সেই নগরী; তার কল-কোলাহলও বুঝি শুনতে পাচ্ছে সে।

হো হো করে হেসে উঠলেন তার বাবা, তার কথা শুনে।

ছেলেটির নাম হেন্রিখ স্লিম্যান (Heinrich Schliemann)। উত্তর জার্মানির মেক্লেমবুর্গ (Mecklenburg) প্রদেশের ছোট্ট গ্রামে তাঁর জন্ম ১৮২২ খ্রিস্টাব্দে। ছেলেবেলা রূপকথা পড়তে পড়তে তাঁর মন চলে যেতো সেই রূপকথার রাজ্যে; প্রাচীন কাহিনী পড়তে পড়তেও নিঃশব্দে হারিয়ে ফেলতেন তারই মধ্যে। কতো কাল আগেকার লেখা, হয়তো তারও কতোকাল আগেকার ঘটনা উইয়ের যুদ্ধ, ওডিসি (Odysseus) আর অ্যাগামেম্মনের (Agamemnon) অভিযান, সবই সজীব হয়ে উঠতো তাঁর মনের পর্দায়। তাদের রণক্ষেত্র, তাদের দুর্গ-প্রাসাদ, তাদের ফেলে যাওয়া জিনিষপত্র খুঁজে বার করবার জন্যে ব্যাকুল হ’তো বালকের সন্ধানী মন।

ছেলেবেলাকার কল্পনা কিছু থাকে, কিছু হারিয়ে যায় মন থেকে; কিছু বা যায় বদলে বাস্তবের ঘাত-প্রতিঘাতে। বাবার কাছে শোনা ইলিয়াডের (Iliad) কাহিনী বালক হেন্রিখ তুলতে পারেন নি। ইত্বলের পড়া শেষ করে তাঁর জীবিকা অর্জনের পালা শুরু হলো এক মুনিখানায় কাজ নিয়ে। যয়ন তখন পনের। ভোর পাঁচটা থেকে রাত্রি এগারটা পর্যন্ত জুতের মত খাটুনি; সোকান

খোলা থেকে রাত্রে মালপত্র সাজিয়ে শুছিয়ে হিঙ্গাব বুকিয়ে কাঁট দিয়ে দরজা বন্ধ করলে তবে ছুটি। মনের কল্পনা ক্রমশঃ মূসড়ে গেল; চোখের অশ্রুও এলো কাপসু হুয়ে। সংই বেন হারিয়ে গেল মুসিখানার বেচা-কেনার হট্টগোলে। কিন্তু তাও কি হয়! একদিন এক মাতাল জাঁতাওয়ালার মুখে ইলিয়াডের কাব্যের অপরূপ আগ্রহ শুনে মুগ্ধ হ'লো হেনরিখের মন। গ্রীক ভাষার এক বর্ণও বুঝতে না পারলেও ছন্দের সোনার মন উঠলো নেচে। নিম্নের পঙ্‌চায় তাকে বাইয়ে খুঁই করে বার বার শুন্‌লেন সেই ছন্দে-গাঁথা অমর কাহিনীর অংকটুকু। আবার নৃতন করে ভেসে উঠলো মনে ট্রয়ের ছবিগুলো—র্যাখিলিস্ (Achilles), হেক্টর (Hector), প্যারিস (Paris), হেলেনের (Helen) কথা।

ইলিয়াডের কাহিনী তোমরা হয়ত পড়ে থাকবে। মহাকাবি হোমারের (Homer) লেখা মহাকাব্য। যেমন আমাদের আদি কবি বাম্বীকির লেখা রামায়ণ। ইলিয়াডের কাহিনীর সঙ্গে রামায়ণের ঘটনার বেশ একটা মিল আছে। লব্ধার রাজা রাবণ সীতাকে চুরি করে নিয়ে যায়, তার ফলে রামচন্দ্রের সঙ্গে রাবণের যুদ্ধ—লঙ্কাকাণ্ড—সবংশে নিহত হলো রাবণ-রাজা, সোনার লতা হলো ছারখার। ইলিয়াডের ঘটনাও সেই রকমের। ট্রয়ের রাজপুত্র প্যারিস মাইসেনির (Mycenae) রাজা মেনেলপের (Menelaus) স্ত্রী হেলেনকে চুরি করে নিয়ে যায়; তার ফলে বাঘে যুদ্ধ—গ্রীক আর টোয়ানদের মধ্যে; শেষ পর্যন্ত ট্রয় ধ্বংস হয়ে যায়। রামায়ণের যুগের কতকগুলো আয়ণার নাম ছাড়া কোনো চিহ্নই যেমন আমরা এখন আমাদের দেশের বুক দেখতে পাই না, সব গেছে লুপ্ত হয়ে; হোমারের মহাকাব্যের যুগও তেমনি নিশ্চিহ্ন। আমাদের দেশেও সমালোচকদের খেউ কেউ যেমন রামায়ণ মহাকাব্যের ঘটনাবলীকে কাল্পনিক বলে থাকেন, তেমনি অধিকাংশ সমালোচক হোমারের মহাকাব্যকে সম্পূর্ণ কাল্পনিক বলে থাকেন। অবশ্য কারণও আছে তার; স্বর্ণের দেব-দেবীদের সঙ্গে মর্ত্যের মানুষের বোণাবোণ, তাঁদের অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ—এ সব তাঁরা বাস্তব বলে মনে করেন না। তাই, অনেকে ইলিয়াডকে উপকথা বা পৌরাণিক গ্রন্থের শ্রেণীতে ফেলে দিয়েছেন; থাকে ইতিহাসও বলা চলে না, যার মধ্যে বাস্তব নেই বলেই মনে হয়। হোমার তাঁর কাব্যে গ্রীস দেশের বা বর্ণনা করেছেন তা পড়লে মনে হয়—কত উন্নত, কত সুসভ্য দেশ ছিল সেটা, কত কাল আগে; কি পরাক্রমশালী বীর জাতি ছিল গ্রীকরা, কত ছিল তাদের শক্তিসম্পদ! কিন্তু গ্রীসের লিখিত ইতিহাস যেখানে আরম্ভ হয়েছে সেখানে তাদের সে পরিচয় নেই, এই অন্তেও হোমারের গ্রীসকে কবি-কল্পিত গ্রীস বলে অনেকে মনে করেন। কত যে তর্ক-বিতর্ক যুক্তি-প্রমাণ তার ইয়ত্তা নাই, এই কাব্যের বাস্তবতা নিয়ে; অর্থাৎ সত্যি কোনো কালে ঐ সব রাজা বা বীরপুরুষ আদৌ ছিল কিনা, অথবা সত্যিই কোনোদিন ঐ রকম যুদ্ধ হয়েছিল কিনা ট্রয়ের সঙ্গে গ্রীসের—এই নিয়ে।

ইলিয়াড যে মহাকাব্য এবং অধিতীর গ্রন্থ এ-কথা সকলে স্বীকার করলেও তাঁর কাহিনী যে সত্যি সে-কথা সম্ভবতঃ কেইই স্বীকার করতে চান নি।

হেনরিখ সিম্যানের কাছে কিছু তা ছিল স্বর্গের কিংবদন্ত মত বাক্যবল। কোনো ঐতিহ্যূল সমালোচনা, কোনো বিরুদ্ধ বুদ্ধিই তাঁর সে বিশ্বাসকে বদলাতে পারে নি। সাত আট বছর বয়সে ঐয়ের নগর প্রাচীরের বহির্ভিত্ত ছবি দেখে তাঁর মনে যে-ধারণা জন্মেছিল, তাঁর চল্লিশ বছর পরেও তিনি সেই ধারণাকেই সত্যি-বলে মনে করেন। সেই অগণ্ড বিশ্বাসই একদিন সিম্যানকে করলো ঘরছাড়া। বাউল বৈরাগী যেমন বেহিমে পড়ে হাতে একতারা আর কণ্ঠে গান নিয়ে আনন্দমগ্নের সন্ধান, ঠিক তেমনি বেহিয়ে পড়লেন সিম্যান ঐয়ের অতীত ঐশ্বৰ্যের নিদর্শনের সন্ধান, সঙ্গে নিলেন জ্ঞানের পুঞ্জি আর পিছনে সহায় রইল তাঁর বিপুল বিত্ত। চিরদিনের মত অবসর গ্রহণ করলেন তাঁর অর্থ উপার্জনের বহুবিধৃত কর্মক্ষেত্র থেকে; শুক হলো নৃতন কর্মজীবন—তাঁর ছেলেবেলাকার স্বপ্নকে সফল করতে।

আগেই বলেছি, মুদিখানায় শুক হর সিম্যানের কর্মজীবন। অক্সফোর্ড পরিভ্রম, অসম্মান্য অধ্যবসায় আর একাগ্র নির্ভীক ত্রিবিধ যে কেবল ব্যবসায়ের দ্বারা বিপুল বিত্তের অধিকারী হয়েছিলেন তা নয়, বিবিধ জ্ঞানেরও অধিকারী হয়েছিলেন তিনি। বিজ্ঞানী ও ঐতিহাসিক হিগাবেও তাঁর খ্যাতি সর্বজনবিদিত বহু গ্রন্থ আছে তাঁর আর্কিওলজি (Archæology) বা ঐতিহ্যবাহী সম্বন্ধে। ইউরোপের সকল দেশের ভাষা ছিল তাঁর দখলে, গ্রীক, ল্যাটিনও। যখন যে দেশে তিনি যেতেন তখন তাঁর দৈনিকী (diary) লিখতেন সেইখানকার ভাষায়।

ইউরোপের মানচিত্রের সঙ্গে নিজের ভ্রমণের পরিচয় আছে। সেটা খুললেই দেখবে তার একেবারে দক্ষিণে, পূর্ব দিক ঘেঁষে ছড়িয়ে রয়েছে ছোট বড় অসংখ্য দ্বীপ ভূমধ্যসাগর আর ইজিপ্তান সাগরে। বুলগেরিয়া, যুগোস্লাভিয়া আর গ্রীসবিশিষ্ট দক্ষিণে একফালি দেশ আর কতকগুলো দ্বীপ নিয়ে গ্রীস; তার পূর্ব দিকে তুরস্ক, আরো ঐজিপ্তান সাগর। গ্রীস দেশের দক্ষিণে ছিল মাইসেনি (Mycenae), যেখানকার রাষ্ট্র হেলেনকে চুরি কবে নিয়ে গিছলো ঐয়ের রাজপুত্র প্যারিস। ঐয় ছিল বর্তমানের তুরস্কের যে অংশ ইউরোপে সেই অংশে, উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে, ইজিপ্তান সাগরের তীরে।

ঐয়ের বৃত্ত, সে প্রায় তিন হাজার বছর আগেকার ঘটনা। কোন চিহ্ন নেই প্রাচ্যদের (Priam) রাজপুত্র; প্যারিসের বাবা ছিলেন রাজা প্রোয়াস, ঐয়ের অধীশ্বর। কাছে নেমে সিম্যানের প্রথম সমস্তা হলো খুঁজে বার করা—বর্তমানের মুক্ত প্রান্তরে অতীতের সেই আড়ম্বরময়ী নগরকে। বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতেরা অধ্যয়ন করেন, ঐয় নামে আসে কোনো নগর থাকলে সেটা ছিল

ঐ তুরস্কের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে বাস্তারখাশি (Bunnarbaschi) নামক অধুনিক একটি ছোট গ্রামের নিকট। সেই অস্থানের উপর নির্ভর করে সিয়ান পৌঁছলেন ঐ গ্রামে। গ্রাম পার হয়ে বতদুর চৌখ বাঘ বিদ্যুত প্রান্তর। আনন্দে নেচে উঠলো তাঁর মন; বিপুল আবেগে হলেন আত্মহারা— ট্রয়ের রণক্ষেত্র তাঁর সামনে! কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি বিশেষজ্ঞদের ঐই অস্থানের উপর নির্ভর করতে পারলেন না। কারণ, ঘোড়ার চ'ড়ে গেলে সে গ্রামটা সমুদ্রতীর থেকে প্রায় তিন ঘণ্টার পথ। হোমারের যা বর্ণনা তা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় ট্রয় ছিল সমুদ্র তট থেকে খুব কাছে। হোমারের দেওয়া বিবরণ অবলম্বন করে অনেক রকম পরীক্ষা করলেন সিয়ান। কখনও এক হাতে হোমারের গ্রন্থ আর এক হাতে ঘড়ি নিয়ে হেঁটে চললেন কবির বর্ণনা মত দুই পাহাড়ের মাঝের দূরত্ব এখানে মেনে কিনা দেখবার জন্তে; কখনও বা ঘোড়ার চড়ে অস্বস্তি নগরীকে প্রায়ক্ষিপ করলেন; কখনও বা বাস্তারখাশির নিকটের সর্গাগুলো গুণে দেখে ভাবলেন—হোমার লিখেছেন মাত্র ছটি কলনারিনী প্রহরবনের কথা, কিন্তু এ যে প্রায় ছোট-বড়ো মিলিয়ে চল্লিশটা। কোনো মতেই মিল খুঁজে পেলেন না সিয়ান এই জায়গার সঙ্গে সেই ট্রয়ের—মন তাঁর সায় দিল না বিশেষজ্ঞদের অস্থানে।

এতেও গমে যান নি সিয়ান। পরীক্ষকের দৃষ্টি আর গবেষকের মন নিয়ে তিনি ঘুরে বেড়াতে লাগলেন সেই জায়গারই আশেপাশে, ক্যাপার মত পরশ পাথরের খোঁজে—হারিয়ে-খণ্ডরা সেই নগরীর অঙ্গদস্থানে। এই ভাবে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে তিনি একদিন এসে পৌঁছলেন ছোট্ট একটি শহরে, হিসারলিক্ (Hisarlik) তাঁর নাম, বাস্তারখাশির উত্তরে সমুদ্রতীর থেকে এক ঘণ্টার পথ। এইখানে ছিল ইলিয়াস (Ilium), প্রাচীনকালের বিখ্যাত দেবস্থান 'হিসারলিক' শব্দটার মানে প্রাণাঙ্গ। হিসারলিকের খুব নিকটে একটা বিরাট মাটির টিপি দেখে ভাল ভাবে পরীক্ষা করলেন সিয়ান। মনে হলো, খুঁজে পেয়েছেন হয়তো সেই ট্রয়। তাঁর এই অস্থানের সমর্থনও পেলেন আধুনিক পুরাতত্ত্ববিদদের কয়েকজনের কাছ থেকে। প্রমাণও মিললো কিছু কিছু। অ্যাখিলিস্ (Achilles), গ্রীক পক্ষের বীর সেনাপতি আর প্যারিসের ভাই হেক্টর (Hector), এই দুই জনের যুদ্ধের যে বর্ণনা দিয়েছেন হোমার, সেটা এইখানেই সম্ভব বলে মনে হলো সিয়ানের। আধুনিক বিশেষজ্ঞ ছাড়া তিনি প্রাচীন গ্রীক ঐতিহাসিকদের কাছ থেকেও সাড়া পেলেন। হেরোডোটাস্ (Herodotus) লিখে গেছেন যে, পারস্ত রাজ খেরাক্সেস্ (Xerxes) এক সময়ে ইলিয়াসে এসেছিলেন প্রায়ামের বিশ্বয়কর রাজপুত্রীর ধ্বংসাবশেষ দেখবার জন্তে এবং দেব মন্দিরে হাজির পশু বলি দেবার জন্তেও। জেনোফন (Xenophon) উল্লেখ করেছেন আর এক সেনাপতির কথা, তিনিও বলি দেবার জন্তে এখানে এসেছিলেন। অ্যারিয়ান (Arrian) এক জায়গায় লিখেছেন—বহাভব অলেক্সান্ডার (Alexdner the Great) ইলিয়াসে পূজা দিয়ে তাঁর

সেহরক্ষীকে আদেশ দিলেন তাঁর অস্ত্রশস্ত্র হৃৎকেন্দ্রে বহন করে নিয়ে যাবার জন্তে, যাতে জয় অনিবার্য হয়। জুলিয়াস সীসারের (Caesar) নামও জড়িত আছে ইলিডামের সঙ্গে। ইলিডাম এখন নিউ ইলিডাম নামেও পরিচিত। প্রাচীনকালের এই সকল ঐতিহাসিকদের কথা কি একেবারে অবাস্তব! না, তা হতেই পারে না। হিসারলিকের ঐ বিশাল মাটির স্তূপের নিচেই চাপা পড়ে আছে ট্রয়—এই দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে খননের কাজ শুরু করলেন স্নিঘ্যান ১৮৭০ খৃস্টাব্দে। তাঁর পত্নী মোকিয়া ছিলেন গ্রীস দেশীয় রমণী। তিনিও স্বামীর ভাবে অগ্রপ্রাণিত হয়ে তাঁর সঙ্গে যোগ দিলেন—তাঁর পরিশ্রম, তাঁর উৎসাহ, তাঁর আনন্দ, তাঁর ক্লান্তি ও তাঁর উৎকর্ষার সমান অংশ গ্রহণ করলেন মোকিয়া; যেন তাঁরও বালিকা বয়সের স্বপ্ন ছিল সেই একই, তাঁর ধ্যানও ছিল একই রকমের।

খননের কাজ চলেছে বাসের পর মাস। কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না মাটি ছাড়া। ভাতের হতাশা নাই স্নিঘ্যানের; স্বাধীনতার জয়ের বিরত করতে পারেনা না তাঁকে; পানীয় জলের অভাব, শ্রমিকদের বিক্ষোভ ও স্বকীয়মনা বিশেষজ্ঞদের উপহাস, কিছুতেই নিরুৎসাহ হনেন না তিনি। বোকা লোকটা পয়সা মট করছে—এমন কথাও কানে আসে, কিন্তু কান দেন না তিনি। খুঁড়েই চলছেন স্নিঘ্যান। টিপির মাঝ বরাবর এসে দেখতে পেলেন পুরাণে দেওয়ালের চিহ্ন; অসুস্থমান করেছিলেন—এই জায়গাতেই বোধ হয় এথেনার (Athens) মন্দির ছিল। গীতি কোমল চলেছে অধিবাসী। মাটির সঙ্গে উঠে এসে অস্ত্রশস্ত্র, ঘর সংসারের জিনিসপত্রের টুকরো টাকরা, গয়না, নানা রকমের পাত্র,— আরও কত কি, একটা সম্পদশালী নগরীর নিদর্শন স্বরূপ। এই সঙ্গে স্নিঘ্যান বা আবিষ্কার করলেন তাঁর ফলে তাঁর নাম সারা পৃথিবীর গুণী সমাজে ছড়িয়ে পড়লো। নিউ ইলিডামের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে রয়েছে পেরাজের খোদার মত এক একটা নগরীর ধ্বংসাবশেষের স্তর পরের পর। প্রত্যেকটি স্তর দেখলে মনে হবে বিভিন্ন সময়ে গড়ে উঠেছিল এক একটা শহর; নৃত নগরীর চিত্তার উপর মাথা উচু করে গাঁড়িয়েছিল আর এক নগর; দেও মরেছিল, তার কবরের উপর ভিত গড়া হয়েছিল আর একটার; তাও ধ্বংস হয়েছিল—এই ভাবে সাত-সাতটা নগরীর উদ্ভব আর বিলোপের চিহ্ন রয়েছে সেখানে। ট্রয়কে খুঁড়ে বার করতে গিয়ে এ কি ব্যাপার! বিশ্বের সীমা নেই স্নিঘ্যানের; সাত-সাতটা শহরের দেহ এই মাটির টিপির তলায় এতকাল চাপা পড়েছিল—প্রত্যেকের দেহাবশেষ যেন তাঁকে ডেকে বসছে—‘ওগো, এই যে আমি; আমার প্রকাশ করো; তুলে ধরো আমার থেকে আসলোয়; আমারও রূপ ছিল, ঐশ্বর্য ছিল, খ্যাতি ছিল।’ সাত-সাতটা মাটি চাপা অজানা শহর তাঁর চোখের সামনে জেস উঠলো, আরও দুটোর আভাস পেলেন তাদের তলায়—কোন দূর অতীতের তা কে জানে; ইতিহাসে যাদের নেই কোনো ইঙ্গিত। এতগুলোর মধ্যে

কোনটা টর, এই হলো সমস্যা। এ যেন কলগাসের ভারতবর্ষ আবিষ্কার করতে গিয়ে আমেরিকায় পৌঁছানো। চিহ্নায় পড়লেও খননের কাজ চাড়লেন না সিম্যান।

পুত্রো নামে চলতে লাগলো গাঁতি, কোদাল, শাবল। তৃতীয় স্তরে গিয়ে এক ভাগ্যবান দেখতে পেলেন ঝিট স্কুট একটা। তোরণের ধ্বংসাবশেষ। সকল দিক বিচার করে তাঁর মনে হলো—প্রায়শ্যের রাজধানীর সম্ভাবনাই তিনি পেয়েছেন, বিখ্যাত স্ক্রিয়ান তোরণেই (Scraen Gate) এসে পৌঁছেছেন নিশ্চয়; দুর্ভেদ্য প্রাচীর-ঘেরা ট্রয় নগরীর প্রধান প্রবেশ পথ স্ক্রিয়ান তোরণ। গবেষণার যোগ্য। এবং যুগের নিদর্শন স্বতন্ত্র উপকরণ যা পেলেন সংগ্রহ করে তিনি পাঠিয়ে দিলেন বিশেষজ্ঞদের পরীক্ষার জন্যে। দিকবিদিকে ছড়িয়ে পড়লো হেনরিখ সিম্যানের নাম, হোমারের অমর কাব্যের বাস্তব নিদর্শন বুঝি তিনি অগতের লোকের চোখের সামনে ভুলে ধরলেন। লাড়া পড়ে গেল পণ্ডিত, পুরাতত্ত্ববিদ, প্রত্নতাত্ত্বিক আর ঐতিহাসিকদের মহলে।

দীর্ঘ তিন বছর খননের কাজ চালিয়ে প্রায় সত্তর তিন লক্ষ ঘনফুট মাটি সরিয়ে সিম্যান যেন একটু সোয়াস্তির নিঃশ্বাস কেলবার সময় পেলেন। তিনি ঠিক করলেন খোঁড়ার কাজ এবারকার মত শেষ করবেন জুন মাসের পনের তারিখে—সেটা ছিল ১৮৭৩ খৃস্টাব্দ।

কাজ শেষ করবার ঠিক আগের দিন। সে এক নাটকীয় ব্যাপার ঘটে গেল। হঠাৎ তিনি যা পেয়ে গেলেন তাতেই তাঁর এতদিনের শ্রম হলো সার্থক—সোনার ফসলে। অন্ত্যস্ত দিনের মত খুঁড়ে চলেছে তাঁর শ্রমিকরা। তাদের প্রতি পদক্ষেপ, কোদালের প্রত্যেকটি কোপে মাটি তোলা লক্ষ্য করে চলেছেন তিনি, যেমন বরাবর করেন। আর বিশেষ কিছু পাওয়া বাবে বলে তিনি মনে করেন না, তবুও লক্ষ্য করছেন। যে জায়গাটার প্রায়শ্যের প্রাঙ্গণ ছিল বলে তিনি অহুমান করেছিলেন, তার প্রায় আটশ ফুট নিচে চলেছে খোঁড়ার কাজ। দেখে চলেছেন তিনি; খননকা খুঁড়ে বেগমারের পাশ দিয়ে। হঠাৎ তাঁর দৃষ্টি স্থির হয়ে গেল এক জায়গায়। তিনি যে এক-দৃষ্টিতে কিছু অস্বৃত্ত ভিনিস দেখেছেন, এটা তাঁর শ্রমিকদের কারণে নতবে পড়ে নি। গ্রীক বর্ণনিক এবং গণিতজ্ঞ আর্কিমিডিস (Archimedes) যেমন তাঁর স্নানের জল-পাত্রের ভিতর থেকে উঠে 'ইউরেকা' (পেয়েছি) বলে চোঁচিয়ে উঠেছিলেন, ঠিক তেমনি হঠাৎ-খুঁড়ে-পাওয়ার আনন্দের অহম্মা উজ্জ্বল নিখে সিম্যান তাঁর শ্রীর হাত ধরে কাছে টেনে এনে, চোঁচিয়ে নয়, কানে কানে বললেন—'সোনা'। জী অবাক হয়ে তাঁর দিকে চাইলেন। তিনি বললেন—'এখন শ্রমিকদের ছুটি দিয়ে দাও। যা ইচ্ছে বলে ছুটি দিয়ে দাও। যা মনে আসে তাই বলে। বলা, আজ আমার জন্মদিন, সেটা ভুলে গিছলে, এই স্বাক্ষর মনে পড়লো। তাড়াতাড়ি ওদের বিদায় করো।'

শ্রমিকরা ছুটি পেয়ে চলে গেল। সিম্যান তাঁর শ্রীর গায়ে শালটা আনতে বলে খানের মনো

ছবি দিয়ে খুঁড়তে লাগলেন উন্মাদের মত। চারদিকে খুলছে হাজার হাজার বছরের প্রাচীন স্বর্ণ দেওয়ালের ইট-পাথর। খসে পড়লে জীবন্ত সমাধি নিশ্চয়। কোনো দিকে জ্ঞাপন নেই তাঁর। খুঁড়ে বার করলেন রাজার ঐশ্বর্য—প্রাচ্যবাহুর ধনাগারই বৃথি এই! তাঁর দ্বীপ শালখানা ভতি করলেন নানা রকমের প্রাচীন স্বর্ণালঙ্কারে। তিনি হাজার বছরেরও আগেকার সূন্যবান অলঙ্কার—সেংদুর্ভত সম্পদ—মুহূট, ব্রোচ, হার, বক্ষাবরণ, বোতাম, ব্রেসলেট, নোনার তার, আরও কত কি! তাঁর দৃঢ় ধারণা হলো তিনি প্রাচ্যবাহুরই গুপ্ত ধনাগারের সন্ধান পেলেন। প্রশান্ত তৃপ্তি আর সাফল্যের আনন্দে ভরে উঠলো তাঁর মন। তাঁর জীবনের শেষ প্রান্তে এসে অবশ্য তাঁর এই ধারণাকে বদলাতে হয়েছিল। কারণ বিশেষজ্ঞদের মতে শেষ পর্যন্ত স্থির হলো—নিম্যান যে সম্পদ আবিষ্কার করেছেন, সেটা যে রাজার, তিনি ছিলেন প্রাচ্যবাহুর হাজার বছরেরও পরে। নিম্যান অস্বপ্ন করেছিলেন ট্রয় নগরীর ধ্বংসাবশেষ ছিল ধ্বংস স্তূপের তৃতীয় স্তরে, কিন্তু তা ছিল বর্ষান্তরে। ট্রয়ের সন্ধান না পেলেও নিম্যান তাঁর পথ করে গিয়ে গেলেন। নিজের অজিত অমিত ঐশ্বর্যকে আবিষ্কারের মেনার পিছনে ব্যয় করার সাফল্য কেবল তাঁকেই গৌরবান্বিত করে নি, নানা উপকরণে সম্পন্ন করেছে প্রত্নতত্ত্ব-বিজ্ঞার আয়োজনকে।

“হিতোপদেশ”-এর উপদেশ

দিবাকর অন্ধকার করে নিরাকৃত,
কৃতঘ্নতা নাশ করে যতক শূন্যত;
বাহিত্ত বিঘ্ন লাতে দুঃখ দূর হয়,
সুনীতি হরণ করে বিপদের ভয়;
থাকিলেও সুবিপুল অতুল বিভব,
আপন দুর্নীতি দোষে নষ্ট হয় সব।

এক কড়া কড়ি যদি অকার্যেতে যায়,
কোটি স্বর্ণ জ্ঞান করি যে তাহা বাঁচায়;
কিন্তু কোটি কোটি স্বর্ণ কার্যেতে তাজিতে
অণু মাত্র মমতা না হয় যার চিতে;
সেই তো নৃপতিসিংহ জানিবে নিশ্চয়,
কমলা অচলা হয়ে তারি কাছে রয়।

ভবিষ্যৎ-বাণী

ইন্দিরা দেবী

সকাল বেলাই বোঝা যায় মিনটি কেমন যাবে। আবহাওয়া অফিসের বিজ্ঞপ্তির ঘোষণা শুনে বা পড়ে এমন একটা ধারণা আমাদের বহুমূল হয়ে গেছে যে, ঐ কথাটি মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। কিন্তু এ কথাটি যে অনেক সময় সত্যি হতে পারে তার বহু প্রমাণ পাওয়া গেছে। আবহাওয়ার ক্ষেত্রে না হোক স্বাস্থ্যের ইতিহাসে।

ঔরঙ্গজেব বাহাদুর কথা আমরা সবাই জানি। অনেক বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে তিনি সিংহাসন লাভ করেছিলেন আর তাঁর আমলে মোগল সাম্রাজ্য সবচেয়ে বিস্তৃতি লাভ করেছিল। এটা মোটেই আকস্মিক ব্যাপার নয়। তাঁর ছেলেবেলা থেকেই তিনি ভবিষ্যৎ সম্ভবনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

তখন তাঁর বয়স মাত্র চৌদ্দ। কিছুদিন আগে হুবে বাংলা থেকে বাহাদুর শাহজাহানকে চল্লিশটি লড়াইয়ে হাতী উপঢৌকন পাঠানো হয়েছিল। হুবেদার বলে পাঠিয়েছেন যে, এদের মধ্যে বিশেষ করে দু'টি হাতী লড়াই করতে ভারী গুস্তান, আসারের জল থেকে বহুদূরে এদের ধরে আনা হয়েছে। হুবেদার দাঁতওয়ালা হাতীটিকে নাম দিয়েছেন হুধাকর। বেটির দাঁত নেই তার নাম হুয়তহুম্মর—দাঁত না থাকলে কি হুবে তার ডেজও বড় কম নয়। আগরা দুর্গের দোতলায় বাহাদুর শাহজাহান বলে আছেন—তাঁর দু'পাশে বড় বড় আর্মীর গুয়রাহ। নিচে প্রশস্ত প্রাঙ্গণে একটি দ্বান নির্মিত করা হয়েছে হাতীর লড়াই-এর জন্য। প্রাঙ্গণের চারিদিক ঘিরে বিরাট জনতা। আগরা শহরের কোনো লোক আসতে ব্যক্তি নেই। শাহজাহানের জন্তুও স্থান নির্দিষ্ট হয়েছে প্রাঙ্গণে। তাঁরা ঘোড়ায় চড়ে অপেক্ষা করছেন। কিছুক্ষণের মধ্যে লড়াই শুরু হলো। হাতীর লড়াই এর আগেও কয়েকবার রাজধানীতে হয়ে গেছে, কিন্তু আজকের লড়াই-এর সঙ্গে সে সব লড়াই-এর তুলনা হয় না। দু'টি হাতীর অক্রমণ ও প্রতি-অক্রমণের দাপটে সমস্ত মাটি কেঁপে কেঁপে উঠছিল। এদের দু'টিকে ক্ষেপিয়ে তুলবার জন্য কোনো ব্যবস্থারই ক্রটি করা ছিল না। মাঝে মাঝে বাজী পটকা ছোড়া হচ্ছিল। তাতে তারা আরো দিশেহারা হয়ে অক্রমণ চালাচ্ছিল। কোনো পক্ষেরই হার মানার লক্ষণ নেই। দু'দিকেই অল্পবিস্তর জবম হয়েছিল। এঁরা হঠাৎ হুধাকর এমনি প্রচণ্ড অক্রমণ করলো যে তার প্রতিদ্বন্দ্বীর পক্ষে তা প্রতিরোধ করা সম্ভব হলো না। অবশেষে হার মানলো হুয়তহুম্মর। দর্শকরা হাতডালি দিয়ে উঠলো, বাজীকরেরা আকাশে একসঙ্গে ছুড়লো অনেকগুলো বাজী। হুয়তহুম্মর হেরে গিয়ে মুহূর্তকাল দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু দর্শকদের কোলাহল আর বাজীর প্রচণ্ড আওয়াজে চমকে হঠাৎ অন্তর মাতঙ্গান দিয়ে বিদ্রোহেণ্ড এসিয়ে চললো। দর্শকরা যে বেদিকে পারলো ছিটকে গেল। শুধু একজন তাঁর নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে রইলেন—তিনি

বাসশার তৃতীয় পুত্র। দূর থেকে অনেকই হায় হায় করে উঠলেন। স্বরত্নসুন্দর তাঁকে আক্রমণ না করে শোকা চলে গেল। সবাই ভাবলে যাক শাহজাদা বেঁচে গেলেন খুব। কিন্তু পরক্ষণেই ছুটে এলো হৃদ্যাকর। সে দোষাহুজি আক্রমণ করলো ঘোড়া মনেত শাহজাদাকে। শাহজাদার হাতে ছিল বর্ধা—তিনি তাই দিয়ে ঠেকাতে চাইলেন আক্রমণ। কিন্তু তাতে হৃদ্যাকরের রাগ আরো বেড়ে গেল। সমস্ত শক্তি নিয়ে আক্রমণ করলো শত্রুকে। শাহজাদা বিশম বৃক্ষে ঘোড়া থেকে লাফিয়ে পড়লেন। পরমুহুর্তে ধরাশায়ী হলো তাঁর ঘোড়া। শাহজাদা পালাবার কোনো চেষ্টা করলেন না আর তা সম্ভবও ছিল না। হাতে একটি মাত্র বর্ধা, তাই দিয়ে তিনি আবার আক্রমণ করলেন বস্ত্র হাতীকে। বাসশাহ উপর থেকে ঐশ্বর্য-বাস্ত হয়ে ছুটে এলেন নিচে। আত্মীয়-গুরুদ্বারাও প্রাণপণের দিকে এগিয়ে গেলেন। কিন্তু হাতীর কাছে এগোতে পারলেন না কেউ। ঘুরে দাঁড়িয়ে ছিলেন—তাঁরা ভাবলেন এ-যাত্রা শাহজাদার কিছুতেই তার রক্ষা নেই। এমনি সময় স্বরত্নসুন্দর আবার ফিরে এলো রত্নমণ্ডপে। হয়তো আবার শক্তিপরীক্ষা করতে চেয়েছিলো। প্রতিদ্বন্দ্বীকে ফিরে আসতে দেখে হৃদ্যাকর শাহজাদাকে ছেড়ে আক্রমণ করলো স্বরত্নসুন্দরকে। সেই অবসরে দেহরক্ষীরা ঔরঙ্গজেবকে নিরাপত্তা স্থানে কিরিয়ে নিয়ে এলো। শাহজাদার হাবভাব দেখে মনে হচ্ছিল বেন কিছুই হয়নি তাঁর। দীর ময়ূরগতিতে এক'পা দু'পা করে এগিয়ে আসছিলেন তিনি। বাসশার প্রধান মন্ত্রী ছুটে গিয়ে বজ্রেন, শাহজাদা, মন্ত্রী এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন, আর তুমি এত দীর গতিতে অগ্রসর হচ্ছে।

হেসে বজ্রেন শাহজাদা : কি করবো বলুন, এখন তো আর পিছনে ওরা কেউ তাকা করে আসছে না।

মন্ত্রীর কাছে যাওয়া মাত্র তিনি তাঁকে দু'হাতে বৃক জড়িয়ে ধরে বলেন : আম্মার দয়্যার বেঁচে পেচ, কিন্তু যদি একটা কিছু অবটন ঘটতো, তাহলে লজ্জার আর অবশি থাকতো না।

ঔরঙ্গজেব সমস্থানে কুণ্ণ করে বজ্রেন : ধাঁহাপনা লজ্জার কথা যদি বলেন তাহলে আম্মকের এই ঘটনার পর লজ্জা বোধ করা বাসের উচিত, তাদের কাউকে তো দেখতে পাচ্ছি না।

মন্ত্রী বজ্রেন : কাদের কথা বলছো ? ঔরঙ্গজেব বজ্রেন : কেন আমার ভাইদের, আম্মাকে রক্ষা করতে তাঁদের কেউই এগিয়ে এলেন না। সবাই তো দার দার প্রাণ বাঁচাতে ব্যস্ত। কথাটা ঠিক বিখ্যা নয়, বাসশার জবাব দেবার মত কিছুই খুঁজে পেলেন না। দেদিনকার সভা শেষ হল। রাজপ্রাসাদে ফিরে যেতে যেতে বাসশাহ প্রধান মন্ত্রীর কাছে বজ্রেন : আমি ভবিষ্যৎবাণী করছি, মনে রেখো দিল্লীর সিংহাসনে একদিন বসবেন ঔরঙ্গজেব। পরবর্তী জীবনে বাসশাহ হয়তো ভুলে গিয়েছিলেন, কিন্তু ইতিহাসের পাতা থেকে আমরা জানি যে তাঁর এই ভবিষ্যৎবাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়েছিল।

জগদীশচন্দ্র

ত্রিযোগেশচন্দ্র বাগল

প্রায় পঞ্চাশ বছর আগেকার কথা কলকাতা থেকে বহুদূরে এক অল্প পাড়া গাঁয়ে আমাদের বাস ছিল। মনে পড়ে, ঐ সময়েই লোকে বলাবলি করত জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কারের কথা। তখনই শুনেছি, জগদীশ বহু প্রমাণ করেছেন গাছেরও প্রাণ আছে। মানুষের প্রাণ আছে, জীবজন্তুর প্রাণ আছে, কিন্তু গাছেরও প্রাণ আছে এ কেমনভর কথা? আমাদের মনে এ কথাই যেন তাক লেগে যেত। আর কিন্তু এ কথাটা নিতান্তই স্বাভাবিক বলে মনে হয়। হয়ত তোমরাও এসব স্বাভাবিক বলেই মনে করবে।

আমাদের বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জগদীশচন্দ্র সম্বন্ধে আরও কত কথা শুনেতে লাগলাম। করিমপুরের রাজবাড়ীতে একটা গেজুর গাছ সন্ধ্যার শুরু পড়ে, রাত্রি অন্তে সূর্য উঠবার সঙ্গে সঙ্গে আবার হেলান ভাবে উঠতে থাকে, ক্রমে হেলান-গাছটা অনেকখানি খাড়া হয়ে উঠেছে। খবর রটে গেল, জগদীশচন্দ্র গাছটাকে পরীক্ষা করার জন্য সেখানে গিয়েছেন। নানা যন্ত্রপাতির দ্বারা পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন গাছের প্রাণ বা চেতনা তথা বোধশক্তি আছে। তখন অন্তত কিছু বুঝতাম না। শুনতাম, শুনে বিস্ময় মানতাম, আর জগদীশ বহু প্রতী প্রদ্বার কেমন যেন মন ভরে যেত। খুলে বসে, কলকাতায় শিক্ষিত মাষ্টার মশাইদের মুখে, কখনও কখনও দূরগত আত্মীয়দের মুখেও ক্রমে ক্রমে তার সম্পর্কে কত কথা শুনেতে পেলাম। গাছের প্রাণ আছে—কথাটি তখন আমাদের কাছে পুংনো হয়ে গেছে; এবারে নতুন করে শুনলাম—জড়েরও প্রাণ আছে, অর্থাৎ কিনা সোনা রূপা লোহা এসব ধাতুর—কোন কিছুই নিষ্প্রাণ বা প্রাণহীন নয়। কি আশ্চর্য কথা! আবার শুনি, তিনি এমন সব যন্ত্রপাতি দেশী মিথ্রিদের দিয়ে তৈরী করিয়েছেন যার দ্বারা এককল পরীক্ষা করা সম্ভব হয়েছে। শুধু আবিষ্কার নয়, এসব যন্ত্রপাতি দেখেও যিসেদ্বারা পর্বন্ত বিস্ময় যেনেছে। সেই সময়েই এই আশ্চর্য লোকটিকে দেখবার বড় বাসনা জাগত মনে মনে।

কলকাতায় এসাম কলেজে পড়তে। আমাদের কলেজ বহু-বিজ্ঞান মন্দিরের কাছেই। আবার এই কলেজের সঙ্গেও তাঁর নানা বন্ধন যোগ রয়েছে শুনলাম। বহু বছরের কথা মনের সাধ পূর্ণ হবার সুযোগ ঘটল। প্রতি বছর ৩০শে নবেম্বর বহু-বিজ্ঞান মন্দিরে জগদীশচন্দ্র একটি করে বক্তৃতা দেন। এটি প্রকান্ত সত্য। প্রকান্ত হলেও কিন্তু আগে-ভাগে টিকিট সংগ্রহ করা চাই। ফটকে টিকিট দেখিয়ে তবে ঢুকতে হবে। একদিন বিকেলে ‘কলেজের ছাত্র’ এই পরিচয় নিয়ে একখানি টিকিট নিয়ে এসাম। হলঘরটি প্রায় ভর্তি—উপরের গ্যালারিও তদন্তরূপ। মধ্য

অহুসারে নীচে পিছনের দিকে বসবার আসন পেলাম। বতস্বর মনে পড়ে, ১৯২৫ সনের ৩০শে নবেম্বর ছিল ঐ দিনটি। ঠিক কাঁটার কাঁটাঘ ৬টার সময়ে জগদীশচন্দ্র এলেন—পুরো একঘণ্টা ধরে ব্যথাতি ও আলোকচিত্রের সাহায্যে পরীক্ষা দেখালেন। ইংরেজীতে বক্তৃতা—হাতে পরীক্ষা চলছে, মুখে অনর্গল বল যাচ্ছেন। একটি গাছ—বোধহয় লজ্জাবতী, ঔষধ প্রয়োগে কিরূপ চঞ্চল হয়ে উঠছে, আবার ঔষধ বিধানে কেমন কাতর হয়ে পড়ছে—সব কিছু আমরা দেখলাম। কি প্রগাঢ় নিষ্ঠুরতা, একটা ‘টু’ শব্দ পর্যন্ত নেই—একটি ছুঁচ পড়লেও যেন আগুয়ান পাওয়া যেত—এই বকম নিষ্ঠুরতা! এই প্রথম দিনের অহুসৃতি কখনও ভুলব না—সে অহুসৃতির শতাব্দও বোধহয় ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। এর পর আরও দু’বার তাঁর বক্তৃতা শুনেছি, কিন্তু সে কথা এখন থাক।

আচার্য জগদীশচন্দ্র বহু আর্থ থেকে একশ বছর আগে জন্মেছিলেন। তাঁর এই শতবর্ষ পূর্ব উপলক্ষেও স্বদেশবাসীরা বিশেষ উৎসব-অহুসৃতির আয়োজন করেছেন। এই সময়ে আমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ অহুসৃতি ও অভিজ্ঞতার কথা শ্রবণ ক’রে ধন্ত হই। আমার তরুণ বন্ধুদের কাছে তাঁর ছেলেবেলাকার কথা নিশ্চয়ই ভাল লাগবে। জগদীশচন্দ্রের পিতা ভগবানচন্দ্র ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট বা জেলায় অল্পতম প্রশাসক। তিনি যেমন জ্বররক্ত শাসক ছিলেন, তেমনি ছিলেন দরদী মানুষ। দেশের উন্নতির জন্য তাঁর প্রাণ খুবই কাঁপত। এক ভাকাতকে তিনি এক সময় বিচারে জেলে পাঠান। করেক বছর চলে গেল, ভাকাত খালাস হয়ে এলো। এই সময়ের ভিতরে তাঁর মনের চের পরিবর্তন হয়েছে। একদিন সে এসে ভগবানচন্দ্রকে বললে—‘বাবু সাহেব, আমি কি ক’রে ধাব!’ এই কথাটুকুতেই ভগবানচন্দ্রের হৃদয় গলে গেল। তিনি তাকে তৎক্ষণাত তাঁর ছেলের তত্তাবধায়ক ও বাড়ীর তৃত্য নিযুক্ত করলেন। জগদীশচন্দ্র বলেছেন, এই ভাকাত-বন্ধুর মুখে তিনি কত অনমনোহরিত কাছের কথা শুনেছেন। এই সব গল্প শুনে শুনে তাঁর মনেও খুব সাহসের সঞ্চার হয়। জগদীশচন্দ্র পরবর্তী জীবনে অনেক বিপদের মুখে পড়েছেন। কিন্তু নৈশবে ঐ ভাকাত-বন্ধুর মুখে গল্প শুনে শুনে তাঁর মনে যে সাহসের সঞ্চার হয়েছিল তা ক্রমেই বেড়ে চলে।

তোমরা কেউ কেউ হয়ত জগদীশচন্দ্রের ‘ভাগীরথীর উৎস সন্ধান’ রচনাটি পড়েছ। এই রচনার ভেতরেই তাঁর স্মৃতির কথা আছে। পদ্মার তীরে রাড়িখাল গ্রামে তাঁর শিশু-নিবাস। নিজের পল্লীটিকে তিনি খুবই ভালবাসতেন। এই পল্লী-প্ৰীতি থেকেই তো দেশ-প্ৰীতি, দেশ-ভক্তি। পিতা ভগবানচন্দ্র ময়মনসিংহ জেলা স্কুলের হেড মাস্টার। তিনি ঢাকা কলেজের কৃতী ছাত্র, বেথুন সাহেবের দ্বারা বিশেষ প্রশংসিত। এই জেলা স্কুলে তাঁর ছাত্র ছিলেন ব্রাহ্ম নেতা আনন্দমোহন বহু। আনন্দমোহনের সঙ্গে তিনি পরে তাঁর বড় মেয়ে স্বর্ণপ্রভার বিবাহ দেন। জগদীশচন্দ্রের জ্যেষ্ঠা ভগিনী এই স্বর্ণপ্রভা। ঐ ময়মনসিংহতেই ভগবানচন্দ্র প্রথম ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটী হক করেন।

জগদীশচন্দ্র তখন মাত্র দু'বছরের শিশু। এখান থেকে ভগবানচন্দ্র যান ফরিদপুরে। এই জেলা-সরকারে তিনি একক্রমে ছ-সাত বছর ছিলেন। এই সময় প্রকৃতপক্ষে জগদীশচন্দ্রের জীবনের শিক্ষার মুহূর্ত। ডাকাত-ভৃত্যের কথা আগে বলেছি। এখানকার বাংলা ছুঁলে তিনি ভাল ক'রে বাংলা শিখেছিলেন। জগদীশচন্দ্র বাংলা লিখতেনও সুন্দর। এ তাঁর ছেলেবেলারই শিক্ষাশ্রুতি সম্ভব হয়েছে। তিনি বাংলা ছুলের পণ্ডিত মশায়কে কখনও ভুলতে পারেন নি। বহুশরে তিনি যখন ফরিদপুরে যান তখনও পণ্ডিতমশাই জীবিত। দেশ-বিদেশে সুবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক-শ্রেষ্ঠ জগদীশচন্দ্র পণ্ডিত মশাইয়ের বাড়ী গিয়ে তাঁর পদ্মলি নিলেন। কি গভীর শ্রদ্ধা, শিক্ষক মশাইয়ের প্রতি কি প্রগাঢ় ভক্তি! পণ্ডিত মশায়ের মত ফরিদপুরের স্থিতিও তাঁর মনে বরাবর জাগরুক ছিল। যখনই কোন শুভক'ক্ষে তাঁর ডাক আসত তখনই তিনি সেখানে যেতেন। ফরিদপুরের প্রতি জগদীশচন্দ্রের স্বাভাবিক আকর্ষণের কথা ওখানকার জেলা-কবি-অফিসার শ্রীযুক্ত মেবেজনাথ মিত্রের মুখে কতই না শুনেছি!

জগদীশচন্দ্রের উচ্চতর শিক্ষা হর কলকাতায়—হেয়ার স্কুলে ও সেন্টমেরিয়ার্স কলেজে। তিনি হেয়ার স্কুলে পড়েছিলেন মাত্র তিন মাস। সেন্টমেরিয়ার্স কলেজ ও স্কুল প্রকৃতপক্ষে তাঁর ইংরেজী পাঠ্যস্থল হয়। কাদার লার্কো ছিলেন তখন ওখানকার বিজ্ঞানের অধ্যাপক। পদার্থবিজ্ঞা তাঁর-বিষয়, তাই বলে অন্ত্যস্ত বিজ্ঞা—যেমন রাগারান, জ্যোতিষ প্রভৃতিও তিনি সহ্যে চর্চা করতেন। এখানে তিনি বিজ্ঞানের গবেষণাগার স্থাপন করেন, এবং বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা করতেন। জগদীশচন্দ্র তাঁর নিকট থেকে যে কত প্রেরণা পেয়েছেন তা বলে শেষ করা যায় না। আর একজন বাঙালী ছেলেও লার্কোর শিক্ষার বিশেষ অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন—তিনি জগদীশচন্দ্রের কিছু আগেকার, তাঁর নাম প্রমথনাথ বসু। তিনি ছিলেন একজন প্রথম শ্রেণীর ক্ষুদ্রস্থবিদ।

জগদীশচন্দ্র সেন্টমেরিয়ার্স কলেজ থেকে বি-এ পাস করলেন। তাঁর বড় ইচ্ছা ছিল বিলাত যান। তখনকার দিনে আই-পি-এস হওয়া এক লোভনীয় ব্যাপার ছিল। তিনি এই পরীক্ষা দিবার বাগনা ব্যক্ত করেন তাঁর শিষ্যদের কাছে। কিন্তু শিষ্য জগদীশচন্দ্র নিজে সরকারী কর্মচারী, আবার পুরুষে এই শর গ্রহণ করতে দিতে আপত্তি তুললেন। স্থির হ'ল, জগদীশচন্দ্র বিলেত গিয়ে ডাক্তারি পড়বেন, কিন্তু তাতেও বাধা অনেক—জগদীশচন্দ্র তখন খুবই নিঃস্ব হয়ে পড়েছেন। তিনি ভেগুটি ম্যাগিষ্ট্রেট, তখনকার দিনের তুলনায় তাঁর আয় কম নয়, কিন্তু স্বদেশের কৃষি-শিল্পের উন্নতিমূলক কতকগুলি কাজে হাত দিয়ে তিনি অনেক লোকশান দিয়েছিলেন এই সময়ে। তথাপি জগদীশচন্দ্র—মিলেব করে তাঁর স্ত্রী, ছেলের ঐকান্তিক আগ্রহ দেখে তাঁকে নিরস্ত করতে পারলেন না। তাঁরা কোন রকমে অর্থ সংগ্রহ করে ১৮৭২ সনে জগদীশচন্দ্রকে বিলাত পাঠালেন।

জগদীশচন্দ্রের বিলাত-প্রবাসের কাহিনী—সেও বেশ বিচিত্র। লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন মেডিক্যাল কলেজে তিনি ভর্তি হন। কিন্তু বেশে থাকতেই তাঁর মাঝে মাঝে জ্বর হত, বিলেতে গিয়েও ঐ জ্বর তাঁকে ছাড়ল না। স্বাস্থ্য ঠারাপ হয়ে পড়ল, ডাক্তারি পড়ার পরিচয় তাঁর সহ হ'ল না। জগদীশচন্দ্র অগত্যা ডাক্তারি পড়া ছেড়ে নিলেন। গেলেন কেম্ব্রিজে। এখানকার তিনি বি-এ হলেন। কিন্তু তাঁর বিজ্ঞানী মন, লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি-এস-সি ডিগ্রী লাভ করল। পদার্থবিদ্যার তিনি কৃতৃশ্র দেখিয়েছেন। ভারতবাসীদের বিজ্ঞান-শিক্ষা তখন সবে স্বক হয়েছিল। বিশেষ করে ছেলেদের বিজ্ঞান গবেষণার বোধদায়ক ছিল না ও সময়ে। বিজ্ঞানের অধ্যাপক বা সরকারী অল্প উচ্চ পদগুলিতে ভারতবাসী খুব সীমাবদ্ধই নিম্ন হতেন।

জগদীশচন্দ্র ছেলেবেলা থেকেই ছিলেন স্বাধীনচেতা, কাউকে খোশামোদ করা তাঁর খাতে সইত না। ও সময় ভারতীয় নেতারা চাইলেম যাতে সরকারী উচ্চ বেতনের পদগুলিতে ভারতীয় প্রশিক্ষিত যুগবর্ণ অধিক সংখ্যায় নিয়োজিত হয়। তাঁদের আশা—এই ক'রে ভারতের উন্নতি স্বরাহিত হবে। জগদীশচন্দ্রের ত্রিগুনীপতি বারিষ্টার ও নেতা আনন্দমোহন বহু। তখন বিলাতে উদার-নৈতিক শিক্ষা ছাড়া ছিলেন আনন্দমোহন বহুর বন্ধু হেনরি কস্টেট। তিনি বড়লাট লর্ড রিপনের সঙ্গে বেশী পরিচয় জন্মে জগদীশচন্দ্রকে একখানা পরিচয়পত্র দিলেন। জগদীশচন্দ্র ফিরে এসে এই পরিচয়পত্র নিয়ে গেলেন নিম্নলিখিত রিপনের কাছে। বড়লাট রিপনের স্বপরিচয় ভারতীয় উচ্চতম শিক্ষা-বিভাগে তাঁর নিয়োগের কথা হয়। কিন্তু পথে কত বাধা; শিক্ষা-বিভাগের কতখানি কাব-নাজি। জগদীশচন্দ্র সাময়িকভাবে ভারতীয় উচ্চতম শিক্ষা-বিভাগের অধ্যক্ষ হ'য়ে প্রেসিডেন্সী কলেজে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক হলেন। কিন্তু এখানে জগদীশচন্দ্রকে লড়তে হয়েছে খুব। নিয়ম ছিল যে, সমুদয় ইউরোপীয় অধ্যাপকের বেতনের তিনভাগের দুইভাগ মাত্র পাবেন ভারতীয় অধ্যাপক। তিনি এ নিয়ম মানতে চাইলেন না, বললেন, “সমান বেতন না পেলে আমি এক পরশও নেবো না।” প্রতিজ্ঞা অটল—তিন-তিনটি বছর তিনি পরকার থেকে কানা কড়িটও নিলেন না। খুবই লেখালেখি ও আন্দোলন চলল। শেষে ১৮৮৭ সনের শেষের দিকে তিনি তিন বছরের মাইনে একসঙ্গে পেলেন। তিন বছর তাঁর কি কষ্টের মধ্যেই না কেটেছে। পিতা জগদানন্দ তখন অবসর গ্রহণ করেছেন, সামান্য মাত্র পেনশন তাঁর সখল। কিন্তু তখন যে বিপুল ঋণজালে তিনি জড়িয়ে পড়েছেন তার তুলনায় ও তো কিছুই নয়। তিনি তখন চমকনগরে বাস করছিলেন, জগদীশচন্দ্রও পরিবারের সাহায্য করতে পারেন না। এই অভাব ও কষ্টের ভিতরেই জগদীশচন্দ্র তাঁর জীবনদর্শনীয় অবলা বহুকে পেলেন। ১৮৮৭ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে তাঁদের বিবাহ হয়। অবলা বিখ্যাত উকিল ও ব্রাহ্ম-নেতা চূর্ণামোহন দাসের দ্বিতীয় কন্যা। চূর্ণামোহন জীশিক্ষার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। অবলা ঘেবী বেথুন স্কুল থেকে

এটা জ্ঞাপন করলে, দুর্গামোহন তাঁকে মাত্রাঞ্জে পাঠালেন। ভাস্করী পড়ার জন্য তখন কলকাতায় মেডিক্যাল কলেজে মেয়েদের ভর্তি করা হ'ত না। তিনি চার বছর ভাল করেই মাত্রাঞ্জে পড়াশুনা করেছিলেন। ১৮৮৬ সনে তাঁর কঠিন পীড়া হয়, শেষ পরীক্ষা নী দিয়েই পিতার আদেশে তিনি চলে আসতে বাধ্য হন। এই বিহীন মহিলার সঙ্গে জগদীশচন্দ্রের সংযোগ ঘন সোনার শোহাগ। স্বামীর তখন খুবই অসুস্থ চলেছে, অবলা বহু এমব মোটেই গ্রাহ্য না করে স্বামীর সকল কাজে সাহায্য হলেন। বিবাহের পর পিতার বসন্তবাটীর নিকটেই জগদীশচন্দ্র বাড়ীভাড়া করেছেন—পিতামাতার দেখা শুনাও চলবে, আবার সম্ব-বিবাহিতা স্ত্রীর ঘরকন্নার কামও স্বাধীনভাবে চলবে এই আশায়। লেডী বহু অবলা—পরে লেডী অবলা বহু বা লেডী বহু নামে পরিচিত হন। এক সময় তিনি আমাকে বলেছিলেন—“ঘরকন্নার তখন আমি কি বুঝি! আমার স্বামী নূতন বাগা করেছেন, আমায় হাতে ধরে সব শিখিয়েছেন। ছিরে, হসুদ, খনে, মরিচ—সব তিনি কোটোয় লেবেল যেরে দিতেন। আর আমি দেওলিকে আমার দরকার মত কাজে লাগাতাম। ও-সময় খুবই অভাবের ভেতর আমাদের চলেছিল। আমার স্বামী কলেজ-ফেরতা রোজ তাঁকে দেখে আসতেন।”

এমনি ছিলেন বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র। তিন বছরের বেতন এক সময়ে শেষে পিতার স্বর্ণ চারভাগের তিন ভাগ একেবারেই শোধ দিলেন। পাণ্ডনাদাররা তেঁাে অবাক! বাকি চারু আনা তারা ছেড়ে দিতে প্রস্তুত, কিন্তু জগদীশচন্দ্র ছাড়বার পাত্র নন। তিনি পিতার জীবদ্দশাতেই চার-পাঁচ বছরের মধ্যে কিছু কিছু ক'রে সমস্ত ঋণই পরিশোধ করলেন। এমন শিত্তান্তি কহিৎ দেখা যায়।

জগদীশচন্দ্রের ছাত্র-প্রীতিও ছিল অসাধারণ। চন্দ্রনগরের বাসায় তিনি কত ছাত্রকে নিয়ে যেতেন। কলকাতায় বাসকালে তাঁর বাড়ীটি ছিল তাদের গুঞ্জে মুখর। কত বকবে ছাত্রদের মনে তিনি উৎসাহ উদীপনা জাগাতেন। অনেক সময় মরল ক'রে বিজ্ঞানের জটিল বিষয়গুলি বুঝিয়ে দিতেন। এমনি ক'বে তিনি অল্পকালের মধ্যে ছাত্রদের চিত্ত অধ ক'রে নিলেন। তখন তাঁর জয়-যাত্রা—বিজয়-অভিযানও শুরু হয়ে গেছে। বেতার নিয়ে তাঁর পদার্থবিজ্ঞানের গবেষণা আরম্ভ। এই গবেষণা করতে গিয়ে ধাতুস্রব্যে তিনি চেতনার সন্ধান পেলেন। কিন্তু জড়ের কি প্রাণ আছে বা চেতনা আছে? গবেষণাগারে পরীক্ষা দ্বারা এর অস্তিত্ব প্রমাণ করলেন। দেখে বিশ্বের সীমা রইল না। কিন্তু বিদেশের বৈজ্ঞানিকদের একথা বোঝাতে তাঁকে অনেক বেগ পেতে হয়েছিল। তিনি এতন্তে অত্যন্ত অসুস্থ সব বয়সপাতি দেশী মিস্ত্রিদের দিয়ে তৈরী করিয়েছিলেন। ক্রমে ক্রমে তরুলতার প্রাণ-স্পন্দনও তিনি নিজের নির্দেশে তৈরী যন্ত্রে সাহায্যে দেখাতে সমর্থ হন। জীবের সঙ্গে তুলনা-মূলকভাবে জড় ও উদ্ভিদের প্রাণ-স্পন্দন দেখিয়ে তিনি জগৎবাসীকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন। উদ্ভিদ ও জীবের, একটি মাছের বা ব্যাঙের তুলনামূলক প্রাণ-স্পন্দন দ্বয়-সাহায্যে তিনি নানাভাবে

যেতন হেঁদিয়েছিলেন, তা প্রত্যক্ষ ক'রে মুগ্ধ হয়েছি। এই বয়সপাতির প্রদর্শন দেখতে আজও এই শতবর্ষ অরতিবি-উৎসবে বহু-বিজ্ঞান-মন্দিরে কি ভিড়! জগদীশচন্দ্র বার কয়েক বিশেষ যাত্রা করে ইউরোপ ও আমেরিকার তাঁর গুরুবৎসালক তথ্যগুলি বিজ্ঞানীদের সভার দেখিয়ে দেন। প্রথমে কেউ কেউ বাদ সাধলেও, শেষ পর্যন্ত সকলেই এই অদ্ভুত আবিষ্কারের কাছে নতি জানিয়েছেন। দত্ত জগদীশ, দত্ত জননী ভারতবর্ষ! রবীন্দ্রনাথ সত্যাই বলেছেন, “বিশ্ব-দরবারে জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কারের নরুণ ভারতমাতার মুখ উজ্জ্বল হয়ে আছে।”

জগদীশচন্দ্র প্রেসিডেন্সী কলেজে থেকে অবসর নিয়ে বহু-বিজ্ঞান-মন্দির স্থাপন করেন। এটি বিভিন্ন বিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণা-প্রতিষ্ঠান। জগদীশচন্দ্র আনুত্যা (১৯০৭) এখানে গবেষণাকার্যে লিপ্ত ছিলেন। বিজ্ঞানীগণ এই মন্দিরে গবেষণা করে দেশ-বিদেশে খ্যাতিলাভ করেছেনও খুব। এখনও কত বিজ্ঞানী গবেষণায় লিপ্ত রয়েছেন।

লেডী অবলা বহু আজীবন জগদীশচন্দ্রের সকল কাজে সহায় হয়েছিলেন। স্বামী ঘাতে নিরাপদে গবেষণার কাজ করে যেতে পারেন, তার অন্তে লেডী বহুর কতই-না প্রযত্ন ছিল। তাঁর ছাত্র ও শিষ্যদেবও তিনি কতই-না আদর-আপ্যায়ন করতেন। তিনি নিজেও সেবাকার্যে বিশেষ আগ্রহী হয়েছিলেন। তাঁর মূখে শুনেছি, তিনি প্যারিসে স্বামী বিবেকানন্দের সংস্পর্শে আসেন, এবং স্বামীজী তাঁকে গান গেয়ে শোনান। খ্রীষ্টমার (দারদামনি দেবী) পদপ্রান্তে বসে তিনি কতই-না উপদেশ পেয়েছেন। তগিনী নিবেদিতা ছিলেন তাঁর পরম বান্ধবী। জগদীশচন্দ্রের বহু-বিজ্ঞান-মন্দিরের পরিকল্পনায় তগিনী নিবেদিতার অনেকখানি হাত ছিল। খ্রীষ্টমার উপদেশ এবং নিবেদিতার সেবা-পরায়ণতা লেডী বহুকে অতিশয় মুগ্ধ করেছিল। তিনি ‘ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়’ এবং স্ব-প্রতিষ্ঠিত ‘নারী-শিক্ষা সমিতির’ মধ্যে গিয়ে মহাজ্ঞ সেবার চূড়ান্ত দেখিয়ে গিয়েছেন। জগদীশচন্দ্রের প্রতিটি কাজে তিনি ছিলেন যেমন খুব সহায়, তেমনি তাঁর প্রতিটি কাজেও স্বামীর পেয়েছেন সম্মতি ও সহযোগিতা। জগদীশচন্দ্রের স্বাশৈলিকতা, বিজ্ঞান-সাধনা, শিল্প-শ্রীতি, সাহিত্য-সেবা, আরও কত কি—সহধর্মীটির সেবাপরায়ণতার সঙ্গে মিশে গিয়ে কেমন এক অপূর্ণ পরিবেশের সৃষ্টি করেছিল।

জগদীশচন্দ্র মৃত্যুকালেও দেখিয়ে গিয়েছেন—তিনি ছিলেন কত মহীয়ান। জীবনে তিনি প্রচুর সঞ্চয় করেছিলেন। কিন্তু তাঁর সমস্ত সঞ্চয়ই জাতির উদ্দেশ্যে দান করে গিয়েছেন। বহু-বিজ্ঞান-মন্দির ছিল তাঁর প্রাণের চেয়ে প্রিয়। সম্পত্তির প্রায় সর্বস্ব তিনি এতে দান করেছেন। এছাড়া বহু সাহিত্য-পরিষদ ও অন্তর্গত কোন কোন প্রতিষ্ঠানেও তিনি অর্থ দান করেছেন। বাঙ্গালী বিদ্যারী মধ্যে সম্প্রতি স্থাপনের অন্তে তিনি লক্ষ টাকা দান করেছেন। জীবনে যেমন মরণেও তেমনি তিনি ছিলেন মহত্তর।

বিপিনচন্দ্র

শ্রীঅশোক গুহ

বিপিন পাল আসছেন।

চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে খবর।

কুনাল শুধায় তার সঙ্গীসাবীদের, খেলুড়াদের—

বিপিন পাল কে রে ?

কালু জানেনা, জানেনা আবহুল ; শুধু সবজাঙ্কি সুবোধ বলে—

মত্ত স্বদেশী। উনি আসছেন। আমাদের গাঁয়ের বাঙারে হবে মিটিং।

মিটিং কথাটা সকলের জানা। ১৯২১ খ্রষ্টাব্দ। গান্ধীজী দিয়েছেন সংগ্রামের ডাক, আর নগরে, শহরে, গ্রামে চলছে আন্দোলন। বসছে মিটিং। মিটিং হলেও বিজ্ঞাপন বিলি হয়, ঢোল দিয়ে বাজ। একজন টেঁচিয়ে বলে—আজ অমুক প্রাঙ্গণে অপরাহ্ন সাড়ে পাঁচ ঘটিকার সত্তা হইবে—আর সঙ্গে সঙ্গে ঢোল ডুম্ ডুম্ করে বাজে।

কিন্তু এবারে একটু আলাশ। এখনো ঢোল বাজেনি। তবে বিজ্ঞাপন বিলি হয়েছে বটে। তাতে আছে চারদিন পরে বাঙারে বসবে সত্তা। আর তাতে বক্তৃতা দেবেন বিপিনচন্দ্র পাল।

লোকের মুখে শুধু তাই এক কথা—বিপিন পাল আসছেন।

কুনাল নাম জানলে, কিন্তু তাতে সে খুশী নয়। তাই সে ছুটে এল রাঙা দিগির কাছে।

অনেক বই আর কাগজ পড়েন, রাঙা দিগির। আর কত জানেন! কুনালের তাই তাঁর কাছে বসত গল্প শোনার বাহন। সে এবারও এগে রাঙাদিগির কাছে বাহন ধরল—

বিপিন পাল কে রাঙাদিগির, বল ? উনি এখানে আসছেন জান তো ?

রাঙাদিগির হেসে বললেন, না জেনে উপায় কি বল ! সকলের মুখেই তো এই এক কথা। জানিস—উনি মত্ত বড় লোক। সারা দেশে দু'জন লোক ভাল বক্তৃতা দিতে পারেন—একজন বিপিনচন্দ্র, আর একজন তাঁর গুরু হরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বিপিনচন্দ্র আবার লিখতেও দক্ষ। ইংরেজী আর বাংলা দুই-ই ভাল লেখেন—কলমের মুখে যেন আগুন বারে। উনি চান ইংরেজ বেশ খেঁচে চলে যাক, আর ভারতের মানুষ ভারতকে শাসন করুক। সেই কথাই লেখেন, আর বক্তৃতায়ও বলেন। এর সঙ্গে ইংরেজরা ঠেকে জেল অর্থ দিয়েছে। দেশও ঠেকে ছাড়তে হয়েছে। উনি কিন্তু মনেননি—দেশের বাইরে ইংরেজদের সেবা শহর লগনে বসে কাগজ বার করেছেন, লিখেছেন ওদের বিরুদ্ধে।

এমনি মাহুৎ বেশে আরো দু'জন আছেন। একজন পাভাবের লাল লাজপৎ রায়, আর একজন মহাখাটের বালগঙ্গাধর ভিলক। এঁদের তিনজনকে লোকে আদর করে বলে—লাল, বাল আর পাল। কুনাল তো শুনে মহা হুঁশি। সে বন্ধুদের গিয়ে বললে, বিপিন পাল কে জানিস? তারগরে রাঁজামির কথাগুলো গড় গড় করে বলে গেল। সবজাভা হুঁসোখের মুখ চুন।

সেখতে-সেখতে এসে গেল সভার দিন। সেদিন ইত্থল ছুটি। সকাল থেকেই কুনাল ঘাবার জন্ত ব্যস্ত। এর-ওর কাছে ঘাব আর বলে—কখন বাবি—কায় সঙ্গে বাবি?

কেউ বলে বাব চারটের, বাবার সঙ্গে; কেউবা বলে বাবে কাকার সঙ্গে। কুনালের কেউ নেই—তাই সে মূৰ্ছে পড়ে। শেষে বালক-সমিতির হরেনদাকে গিয়ে ধরে। হরেনদা গুকে নিয়ে বাবেন কথা দেন। বলে দেন—টিক চারটের আগবি।

সারা হুপূর উলুপ করে কেটে যায়। ছোট্ট টাইমপীস ঘড়িটার কাটা খেন আব এংগায় না। কুনালের ডাকিয়ে-ডাকিয়ে সময় কাটে। শেষে ঘড়ির কাটা এল চারটের ঘরে। কুনাল অমনি হরেনদার বাড়ির দিকে সে ছুট!

সবাই জড়ো হয়েছে। হরেনদা আছে, কুনাল আছে, কালু—কালচাঁদ আছে। আর আছে হুঁসোখ। এবার জোর পা চালিয়ে ওরা ছুটে চলে।

ভিস্ত্রীষ্ট বোর্ডের সদর সড়কে পৌঁছে দেখে গলে গলে লোকের মিছিল চলেছে। ওরাও তাদের সঙ্গে ভিড়ে গেল।

বাজারের তরকারী-হাটার বাটানো হয়েছে সস্তা শামিহানা। আবার একেবারে এক কোণ ঘেঁষে তৈরী হয়েছে এক স্টেজ। সেই স্টেজের উপর রয়েছে বানকরেক চেয়ার আর একটা সস্তা টেবিল। সেখানে আবার ঝুঞ্জে দু-তিনটে পেটোম্যান্স বাতি। রাত হলেই আলিয়ে নেওয়া হবে।

চারিদিকে ভিড়ে ভিড়, তারই মধ্যে ওরা একটা শতরত্নির উপর কোনোরকমে বসে পড়ল। চারিদিকে হৈ-ঠে, গোলমাল। সভা বসতে এখনো দেরি আছে।

ওরা সবাই বসে আছে তো আছেই। এমন সময় কয়েকজন এসে উঠলো স্টেজের উপর।

কুনালরা সেখানে বসেছে, সেখান থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

হুঁসোখ শুধালে, ওঁদের মধ্যে পাল কে?

হরেনদা উত্তর দিলেন, কি জানি!

কুনালরা উলগ্রীব হয়ে রইল।

এবার গ্রামের একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক উঠে পরিচয় করিয়ে দিলেন।

ঐ বিপিনচন্দ্র! ধূতি-পাণ্ডারী পরা। পাকা তুল। কুনালের দূর থেকে মনে হ'ল—সে ঘেন ছবির বকিমস্রকে দেখছে। তবে ঐর চশমা চোখে, বকিমের ছবিতে চশমা নেই। থিকেলের আলোর চিক্‌চিক্‌ করে উঠছে চশমার সোনার ফ্রেম। ভারী ভাল লাগল কুনালের।

সভা শুরু হয়ে গেল। এক ডহলোক প্রথমেই গাইলেন :

বশেষ বশেষ করিস তোরা

এ বেশ তোদের নয়।...

গান শেষ হ'ল। এবার উঠলেন বিপিনচন্দ্র। কি তাঁর স্বর—সে স্বর সভার শেষ মহাবটির কানে গিয়ে পৌঁছয়। সে স্বরে ঘেন বাজের হাঁক শোনা যায়। মেঘের শুরু মেঘা ডাক শোনা যায়। কিন্তু স্বর স্নানও আছে, আছে মধুর্ণও। একবার শুনে ভোলা যায় না। রেকর্ডে শুনেছে সে অমর সন্তের স্বর—তাঁর চেয়েও ভাল—খুব ভাল। কুনাল অবাক হয়ে শুধু তাকিয়ে রইল আর শুন, বুঝতে পারল না। শুধু একটা কথা মনে রইল। বিপিনচন্দ্র ইংরেজদের ছাৎপেক করা নিয়ে ঠাট্টা করে বললেন, একবার বিলেতে এক ইংরেজ ডহলোক তাঁর হাত ধরে এমনি নেড়ে গিয়ে ছিলেন যে, সাতদিন হাতে ব্যাধা ছিল।

এক সময়ে শেষ হ'ল সভা। কিন্তু বিপিনচন্দ্রকে তুলতে পারলেনা কুনাল। তাঁর স্বর কানে বাজতে লাগল। আর তাঁর সেই হাত ব্যথার গরুটাও মনে রাখলে।

ক'মাস পরে—এপ্রিল মাসে—বরিশালে প্রাদেশিক কনফারেন্স। শোনা গেল বিপিন গাল আদাছেন সভাপতি হয়ে।

কুনাল তখন মাঘের সঙ্গে এসেছে বরিশালে মাদার বাড়ি। সে ছেলেমানুষ, কনফারেন্সের খবরও রাখেনা। হঠাৎ সেদিন সন্ধ্যায় তাঁর হেমনা এসে মাদার বাড়ি হাঝির।

হেমনা ঘোর স্বমেশী। তিনি এসে বাঙালিকে বললেন, জান আন্স কনফারেন্সে এক কাণ্ড হয়েছে। বিপিনচন্দ্র বক্তৃতা দিতে উঠেছিলেন, সবাই তাঁকে 'শেম, শেম' বলে বদিয়ে দিয়েছে। উনি সভা ছেড়ে চলে গেছেন। বাবার সময় মুখখানি বদা দেখতে!

কুনাল বদে-বদে শুনতিল হেমনার কথা। তাঁর মনে হ'ল—সে ঘেন স্পট বেথতে পাচ্ছে—তিনি বেগিয়ে আদাছেন সভা থেকে—তাঁর মুখখানি ভাল, সোনার চশমার ডিতরে চোখ দুটি থেকে ঝিকরে পড়ছে আগুন।

আর বিপিনচন্দ্রের নাম কোথাও শোনে না কুনাল। তখন শুধু মহাত্মা গান্ধীর নাম, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনর নাম। বালগঞ্জাধর তিলক তো মারা গেছেন, লালা লালপং রায়ের নাম শুধু শোনা

ঘর, কিন্তু 'পাল' দে একেবারে মিলিয়ে গেছেন। হেমনাকে জিজ্ঞেস করে কুনাল। তিনি বলেন—
 আমি না। কুনাল তবু জানতে চায়।

কুনাল এরই মধ্যে ম্যাট্রিক পাশ করল, এল কলকাতায় পড়তে। কলেজের কমন রুমে সে কাগজ আর পত্রিকা ঘাঁটে বসে-বসে। জানতে চায় বিপিনচন্দ্রের কথা। একদিন তার হাতে পড়ল 'প্রবাসী'। তাতে দে পড়ল বিপিনচন্দ্রের স্মৃতিকথা। সেকালের কথা জীবন্ত হয়ে উঠেছে তাঁর এই স্মৃতিকথায়। আয়ো নানা খবর দে জানলে। তিনি শুধু প্রবন্ধই লেখেননি, লিখেছেন একবারি উপন্যাস আর কয়েকটি গল্প। আবার চিত্ররঞ্জনের পত্রিকা 'নারায়ণের' পাতায় পাতায় আছে তাঁর নানা সাহিত্য সংক্ষেপ নানা লেখা। একদিন সে শুনল—তিনি নাকি 'ইংলিশম্যান' কাগজে লেখেন। সে একখানা 'ইংলিশম্যান' খোঁজাফু করে পড়লো তাঁর লেখা। প্রতি সপ্তাহে কত কিছু নিয়ে তিনি লেখেন। সেগুলি কি হুম্বরই হয়। সকলেই তাঁর লেখার কদর করেন—খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে আলোচনা চলে তাঁর লেখানুসারে।

কুনাল তাঁর লেখা পড়ে, পুথানো লেখা খুঁজে বার করে কলেজ লাইব্রেরী থেকে। পড়ে তাবে—মনে মার্সা জাগে। ঠর লেখায় আছে বাহু। বাহু মস্তুরে দেশের মাহুৎকে উনি জাগিয়ে দেন। অ্যাবার শুধু আবেগই নয়, ছত্রে ছত্রে থাকে যুক্তি। কিন্তু দেশে আসছে আমোলনের পর আমোলন, উনি চুপ করে বসে আছেন কেন! সেই বরিশাল কনফারেন্সের পরে তো আর ঠর নাম তেমন শোনা যায় না!

একদিন এক ছাত্র-কনফারেন্সে স্বামী বিবেকানন্দের ছোট ভাই ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথের সঙ্গে আলাপ হল। তাঁকে একথা বলতেই তিনি হেসে বললেন—তিনি আর কত করবেন। দেশকে তিনি জাগিয়ে তুলবেন তাঁর লেখায়, বক্তৃতায়। ইংরেজের অত্যাচার বিরুদ্ধে মাথা চাড়া দিয়ে দাঁড়িয়েছেন। দেশের স্বাক্ষরের ঘেঁষিয়ে দিয়েছেন স্বাধীনতার পথ। এখন তো তিনি বুড়ো মাহুৎ। কিন্তু এখনো আগুন তো নেবেনি। এই দৈনিকও বন্যে মাতব্বমকে যখন ঘৃণার গান (Song of hate) বলা হ'ল, তিনিই তাঁর প্রতিবাদ করলেন। তাঁর মতো লোক কে আছে।

তারপর এল ১৯৩১ খৃষ্টাব্দ। কুনাল একদিন দেখলে—বিপিনচন্দ্র আর বেঁচে নেই। সেদিন কুনালের বার বার মনে পড়ল সেই গাছের বাগানে দেখা চেহারা—সেই গুরুগম্ভীর স্বর, সেই আগুন-স্বর বক্তৃতা। সে বার বার প্রণাম করলে সেই বিহোহী আত্মার উদ্দেশে।

১৯৩২ থেকে ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দে তো এক যুগ—বা তারও বেশি। সেদিন কুনাল কাগজে দেখলে—বিপিনচন্দ্রের শতবার্ষিকী সম্মোহন্যব হচ্ছে দেশে। তাঁরই স্মরণে বেরিয়েছে ডাকটিকিট। ছেলের ডাকটিকিট সংগ্রহের খুব শখ। সে বিনে এনে দেখালে ডাকটিকিট। কুনালের মনে পড়ল বিপিন-

চক্রেই সেই চেহারা—সেই গ্রামের বাজারে দেখা ছবি। আর সে কানে শুনতে পেল সেই গুরু-
গম্ভীর স্বর :

...“এ ভগতে আশিয়া ভারতবর্ষে জন্মিয়াছি, ইহা দৌড়াগোল কথা। আবার যদি এই সংসারে
জন্মিতে হয় তাহা হইলে এই ভারতবর্ষেই জন্মিতে চাই, স্ব-স্বদ্বিশালী অস্ত্র কোনো দেশে জন্মিতে
চাই না।— এই ভারতবর্ষের মধ্যে এই বাংলা দেশে জন্মিয়াছি, ইহা আরও দৌড়াগোলের কথা।
সর্বোপরি এ বাংলা দেশে এতুগে জন্মিয়াছি, ইহা পরম দৌড়াগোলের কথা। যত জাতি কি করিয়া
নবজীবন প্রাপ্ত হয় এতুগে, এই বাংলা দেশে জন্মিয়া তাহা স্বচক্ষে অনেকটা দেখিয়াছি। এ পরম
দৌড়াগ্য সকলের ঘটে না।”...

দেখকে, বাংলাকে যিনি এখন করে ভালবেসেছিলেন, সেই বিপিনচন্দ্রের উদ্দেশ্যে বার বার সে
নমস্কার করলে।

শীত-দিদি

শ্রীশ্রদ্ধেশ্বরগুন দত্ত

রাত্রি এলে মাগো ঘরে

আগুন জ্বলে দিস্।

গুঠেনি খান গোলায় এবার

বুঝতে তো পারিস,

জল হয় নি, খান হয় নি

তাই জোটেনি জ্বাখা,

শীত-দিদি গো, এবারটি তোরা

ঠাণ্ডাটাক খাম।

দেখনা দাদুর ছুঁচোখ জ্বলে

করছে টলোমল,

শুভ পেটে কাপছে শীতে

ছুঁখ নে' মবল।

একটু আগেই বাপ রে ফিরে,—

আসছে বার আশিস্;

ছড়িয়ে দিয়ে এ ঘর ভরে

প্রচুর মেহাশিস্।

হয়নি যে খান, এবার মাঠে

বুঝতে তো পারিস।

রাত্রি হলে মাগো ঘরে

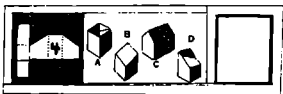
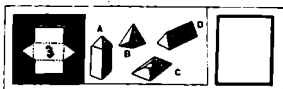
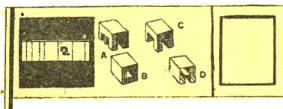
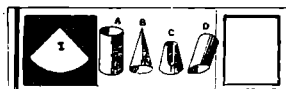
আগুন জ্বলে দিস্।



ধাঁধার পাতা

শ্রীনীগোপাল চক্রবর্তী

শক্ত-কাগজ বা ধাতুর পাতলা সিটের কাজে
সাধারণ-বুদ্ধির বিজ্ঞান

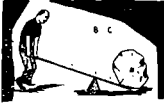


(১) আগে পাতের
ছবিগুলি ভাল করে দেখ।
এই ছবিগুলির বা-মিকে
এক থেকে চার নম্বর বিভিন্ন
আকারের চারটি শক্ত-কাগজ
বা পাতলা সিটের কাজের
নক্সা দেওয়া আছে।
প্রত্যেকটি নক্সার ডান দিকে
আবার A B C D লেখা
চারটি করে কাজের নমুনাও
দেওয়া আছে।

বলতে পার এক নম্বর
নক্সার সাহায্যে ঐ ঘরের A
B C D চারটি নমুনার
কোনটি করা যেতে পারে?
এইভাবে ২নং, ৩নং এবং ৪নং
ছবির নক্সায় প্রত্যেক ঘরের
A B C D-র মধ্যে কোন
ত্রিবিধটি করা যাবে বল।
তোমার উত্তর ডান দিকের
শূন্য ঘরে লিখে রাখবে।

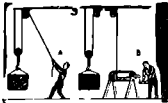
উত্তরগুলি ঠিক হ'ল
কিনা দেখতে পাবে 'ধাঁধার
পাতার' শেষ পৃষ্ঠায়।

সাধারণ বুদ্ধিতে ভারসাম্য ও শক্তি



(২) এক নম্বর ছবিতে একটা কাঠের লাঠির মাঝায় পাথর তোলা হচ্ছে। ওর ভার রক্ষার পা হচ্ছে D. এই পা দুটি যেখানে আছে ওখানে থাকলে রচটি (কাঠের লাঠি) ভাঙবে কি? A B ও C এই তিনটি বিন্দুর কোন ঠায়গায় ঐ পা-দুটি রাখলে ভারসাম্য রক্ষা হবে এবং রচটি ভাঙবে না?

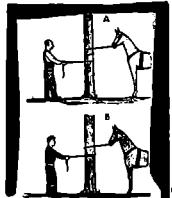
দুই নম্বর ছবিতে দু'জন লোক একটা লাঠির সাহায্যে একটা ভারী জিনিষ নিয়ে যাচ্ছে। কার কাঁধে চাপ পড়ছে বেশি? A না B-র?



তিন নম্বর ছবিতে দুটি বিভিন্ন পুলির সাহায্যে ভার উঠোলন করা হচ্ছে। কোন পুলিতে জোর কম লাগবে বলতে পারে? ভাল করে দেখে বলো—A না B?

শেষ চার নম্বর ছবিটি দেখ, এটি ভারী মজার। এই ছবিতে একটা ঘোড়াকে গাছের সঙ্গে দড়ি জড়িয়ে আটকানো হচ্ছে। ঘোড়াটি জোর দেখাতে পারবে না কোন অৱস্থায় কোন ভাবে আটকানোর জন্ত বলতে পারে? A না B?

উত্তরটা দেখতে শাবে পরের পৃষ্ঠায়।

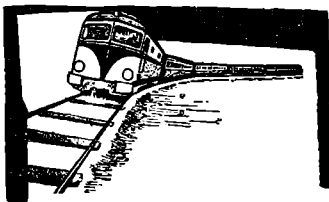


সাধারণ বুদ্ধির ধাঁধা



(৩) বায়ের ছবিটিতে দুটি কাচের গ্লাসে জল আছে। এই গ্লাসের মধ্যে বরফ দেওয়া আছে। একটায় দেওয়া আছে বরফের একটা টুকরা, আর একটায় বরফ গুঁড়া করে দেওয়া হয়েছে। বলতে পার, কোন্ গ্লাসের জল ঠাণ্ডা হবে আগে? A না B-র?

(৪) ডাইনের ছবিতে ট্রেন থাকছে লাইনের উপর দিয়ে। বলতে পার লাইনের লোহার রেলের পাতে (যেটা কাঠের উপর দিয়ে লম্বা করে বারাবার পাতা থাকে) জোড়ের মুখে খানিকটা ঝাঁক থাকে কেন এবং রেলের বাইরের দিকেই বা উচু করে বিট দেওয়া থাকে কেন?



• উত্তর •

(১) ১. নম্বর ছবির নম্বর তৈরি হ'তে পারে B আকারের নমুনাটি। ২. নম্বর ছবির নম্বর D। ৩. নম্বর ছবির নম্বর D এবং ৪. নম্বর ছবির নম্বরও তৈরি হবে D।

(২) এক নম্বর ছবির A হচ্ছে রক্তের মধ্যবিন্দু; হৃৎকোষ A বিন্দুতে ভারদাম্য বক্ষার পা দুটি রাখলে রক্তটি ভাঙবে না। যেখানে ভারদাম্যের পা দুটি আছে, ওখানে ওটা থাকলে রক্তটি ভেঙে যেতে পারে।

দুই নম্বর ছবির A ব্যক্তির কাঁধে বেশি ভার পড়ছে। তিন নম্বর ছবির B ব্যক্তির জোর কম লাগবে। চার নম্বর ছবির A অবস্থায় গোড়াটি জোর করতে পারবে কম এবং তাকে রক্ষা করা সহজ হবে।

(৩) প্রথম ছবি: বরফের টুকরো দেওয়া আছে যে গ্লাসে—অর্থাৎ B গ্লাসের জলই ঠাণ্ডা হবে আগে।

(৪) দ্বিতীয় ছবি: উত্তাপে লোহা বাড়ে। সেই জন্য রেলের জোড়ার মুখে ঝাঁক থাকে। তা না হলে লোহা উত্তাপ পেলে দুমড়ে বাড়ে।

রেলের বাইরের দিকে উচু করা হয় এইজন্য যাতে ট্রেনের চাকা পিছলে বাইরে চলে না যায়।

খেলাধুলার খবর

মেরুড়ে

রোভার্স কাপ ফাইনাল

১৮ নভেম্বর কলকাতার মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব দলকে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর ৩-২ গোলে হারিয়ে দিয়ে বোম্বাই-এর ক্যালটেক্স স্পোর্টস ক্লাব এ বছর রোভার্স কাপ জয়ী হয়েছে। রোভার্স কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার দীর্ঘ তেইটি বছরের ইতিহাসে স্থানীয় দলের এটাই সর্বপ্রথম সাফল্য। ক্যালটেক্স দলের অলিম্পিক সেন্টার ফরওয়ার্ড নেভিল ডি হুজা একাই দলের তিনটে গোল দিয়ে 'হাটট্রিক' লাভের গৌরব অর্জন করেন। মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের শকে গোল সেন লতিফ (আকুয়াডা) এবং সেন্টার ফরওয়ার্ড ওমর। মহামেডান স্পোর্টিং দল এইবার নিয়ে পর পর চারবার রোভার্স কাপে রাণীর্ণ আপ হল।

—

ভারতের দীর্ঘতম সম্ভরণ প্রতিযোগিতা

আনন্দ স্পোর্টিং ক্লাবের পরিচালনায় গঙ্গার তীরে যে দীর্ঘতম সাত-মাইল সম্ভরণ প্রতিযোগিতা হয়, তাতে দু'পক্ষের অত্রতম শ্রেষ্ঠ গাঁতাক লক্ষ্মীনারায়ণ ভৌমিক তাঁর সতীর্থ কানীকীন্দর মণ্ডলকে দশ গজের ব্যবধানে পরাসিত করে পূর্ব-পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। গত বছর এই দু'জন প্রতিযোগীর ভিতর ত্রিমণ্ডল প্রথম এবং ত্রিতোমিক

দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। লক্ষ্মীনারায়ণ ভৌমিকের সাত মাইল সাতরাতে ১৫.৪৫মি. ৪৬ সেকেন্ডে লেগেছিল।

—

প্রদর্শনী টেনিস খেলা

বিশ্বের সেরা খেলোয়াড়দের প্রদর্শিত টেনিস খেলার মান আজ কোথায় গিয়ে পৌঁচেছে, কলকাতার টেনিস অস্থায়ীরা আর একবার তা দেখবার সুযোগ পেয়েছিলেন গত ২২-২৩ নভেম্বর অপরাহ্নে। এই দু'দিন উডবার্ন পার্কস্থ সাউথ ক্লাবের লনে জ্যাক ক্রেমারের দলহুজু বিশ্ব-বিস্তৃত পাফো সেগুরা (ইকোয়েডর), কেন রোজওয়াল (আষ্ট্রেলিয়া), টনি ট্র্যাবার্ট (আমেরিকা) ও জ্যাক সেলম্যান (আষ্ট্রেলিয়া) এই চারজন টেনিস খেলোয়াড় পরস্পরের সঙ্গে ক্রীতি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অংশীর্ণ হন এবং তাঁদের ক্রীড়া-ধারার বিশিষ্ট পরিচয় উপহার দিয়ে দর্শকদের আনন্দবর্ধন করেন। উল্লেখিত চারজন খেলোয়াড়ের প্রথম দু'জনকে দেখার সুযোগ গত বছর অনেকের ঘটেছিল, শেষের দু'জনকে এ বছর প্রথম দেখা গেল।

খেলার ফলাফল: ২২. ১২. ৪৮। বিশ্লেষণে কেন রোজওয়াল ৭-৫ ও ৬-৩ সেটে পাফো সেগুরাকে ও জ্যাক সেলম্যান ৬-১ ও ৬-২ সেটে টনি ট্র্যাবার্টকে এবং ডাবলসে জ্যাক সেলম্যান

ও কেন রোজগরাল ৭-৪ ও ৬-১ সেটে টনি ট্রাবার্ট ও পাকো সেত্তরাকে হারিয়ে দেন। ২৩. ১২. ৪৮। লিঙ্গেলসে^৪ কেন রোজগরাল ২-৭ ও ২-৭ সেটে টনি ট্রাবার্টকে জ্যাঙ্ক শেলমান ২-৬, ৬-৩ ও ৬-৪ সেটে পাকো সেত্তরাকে হারিয়ে দেন। ডবলসে টনি ট্রাবার্ট ও পাকো সেত্তরা ৬-৩, ... অসমাপ্ত।

—

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ও ভারত প্রথম টেস্ট ম্যাচ

পাঁচ দিন ধরে ব্যাটসম্যান ও বোলারদের মধ্যে উত্তেজনাপূর্ণ এবং উপভোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর বোম্বাইয়ের ত্রাবোর্ণ স্টেডিয়ানে ভারত বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজের প্রথম টেস্ট ম্যাচ অসমাপ্তভাবে শেষ হয়েছে।

পক্ষ ২৮শে নভেম্বর ত্রাবোর্ণ স্টেডিয়ানে ভারতের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট ক্রিকেট ম্যাচের প্রথম দিনে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল প্রথমে ব্যাট করতে নামে এবং মধ্যাহ্ন ভোজের বিরতির আগেই মাত্র ৫০ রানে প্রথম তিনজন ব্যাটসম্যানকে হারিয়ে আংশিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। চতুর্থ উইকেটে রোহন কানহাই ও কলি স্মিথের দৃঢ়তায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল আংশিকভাবে বিপর্যয় রোধে সমর্থ হয় এবং খেলা শেষ হবার চার মিনিট আগে মোট ২২৭ রানে তারা প্রথম ইনিংসের খেলা শেষ করে। দ্বিতীয় গুণ্ডে ৮৬ রানে ৪টি এবং রাসটান ও নাদকাসি যথাক্রমে ৩১ ও ৪০ রানে ২টি করে উইকেট পান।

প্রথম টেস্ট ম্যাচ খেলার দ্বিতীয় দিনে ফাস্ট বোলিংয়ের বিপক্ষে ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের দুর্বলতা নিষ্কণভাবে ফুটে ওঠে। দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষ হবার দু' মিনিট আগে মোট ১৪২ রানে ভারতের প্রথম ইনিংসের খেলা শেষ হয়ে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল ৭৫ রানে এগিয়ে থাকে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের ফাস্ট বোলার রয় গিলক্রাইস্ট ৩২ রানে ৪টি এবং হিভিয়াম পেন বোলার ওয়েদলি হল ও এরিক অ্যাটকিনসন যথাক্রমে ৩৫ রানে ৩টি ও ২১ রানে ২টি উইকেট পান।

চতুর্থ দিনে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল মধ্যাহ্ন ভোজের বিরতির ৪৫ মিনিট আগে ৪ উইকেটে ৩২৩ রানে দ্বিতীয় ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করলে ভারতীয় দল দিনের শেষে শেষ পর্যন্ত খেলে দ্বিতীয় ইনিংসে ২ উইকেট হারিয়ে ১১৭ রান করে। এদিন খেলা আরম্ভ হবার পনেরো মিনিটের ভেতর গারকিন্ড সোবার্ন নিজস্ব একশ রান করেন এবং শেষ পর্যন্ত ১৪২ রানে অপরাজিত থাকেন। আগের দিনের অপর নট-আউট ব্যাটসম্যান বেসিল বুচার ৬৪ রানে অপরাজিত থাকেন। ভারতীয় দলের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় উদ্বিগ্ন গিলক্রাইস্টের বলে বাউন্ডারী করে দলের অধঃপতন এবং নিজস্ব ১৬ রান করলে, টেস্ট খেলার তীর্থ নিজস্ব দু'হাজার রান পূর্ণ হয়।

পঞ্চম দিনে রায় গিলক্রাইস্ট এবং ওয়েদলি দলের বোলিং-এর বিরুদ্ধে পঞ্চম রায় ও বিজয় মজরেকার ভারতের অসমাপ্ত দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা (২ উইকেট ১১৭ রান) শুরু করেন। এ

দিন পঙ্কজ রায় মোট ৭ ঘ. ২৪ মিনিট খেলে
সাতটি বাউণ্ডারী করেন এবং দশ রানের ক্ষত্রে
সেতুঠা থেকে বঞ্চিত হন। এ দিনের আরেক
উল্লেখযোগ্য খবর, রামচাঁদের হাজার রান পূর্ণ
হতে মাত্র ৩০ রান বাকী ছিল, এবার তা পূর্ণ
হয়। দিনের শেষে ভারতের বিতীয় ইনিংসের ৪
উইকেটের বিমিস্ত্রে ২৮২ রান হলে প্রথম টেস্ট
ক্রিকেট ম্যাচ অসমাপিত ভাবে শেষ হয়।

—

কৃতী স্বপনকুমার

মাত্র ছ-বছরের ছেলে স্বপনকুমার মিত্র
দম্পতি আন্তর্জাতিক স্পোর্টিং ক্লাব (বাগখাজার)
আয়োজিত ভ্রমণ প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়ে
একাধিক্রমে ১৪ ঘ. ১৪ মিনিট ভ্রমণ করার কৃতিত্ব
প্রদর্শন করেছে।

—

লেক অঞ্চলে ক্রীড়া স্টেডিয়াম

ক্রীড়ামোহীরা জেনে হুগী হবেন যে, লেক
এলাকার কলকাতা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের প্রস্তাবিত
স্টেডিয়াম তৈরির ক্ষেত্রে পশ্চিম বঙ্গ সরকার যে-
ক'টি শর্ত আরোপ করেছিলেন, তা তাঁরা
প্রত্যাহার করে নিয়েছেন বলে খবর পাওয়া
গেছে। আরো ভানা গেছে, কাজের সূচনা
দ্বিমাসে ট্রাস্ট ভূমি তৈরি ও ট্রাক তৈরির ক্ষেত্রে
ইতোমধ্যেই আদেশ দিয়েছেন। কটকের বরষাটি
স্টেডিয়ামের অধরূপই স্টেডিয়াম লেক অঞ্চলে
তৈরি হবে।

—

নতুন রেকর্ড

বরষা টিফি ক্রিকেট প্রতিযোগিতায়
দক্ষিণাঙ্গলের লীগ খেলার বিতীয় দিনে মাদ্রাজের
অধিনায়ক মি. ডি. গোপীনাথ মোট ৫৪৮ মিনিট
খেলে ব্যক্তিগত ২৩৪ রান করে বরষা টিফিতে
মাদ্রাজ রাজ্যের পক্ষে নতুন রেকর্ড স্থাপন করেন।
বরষা টিফি প্রতিযোগিতায় গোপীনাথ এবার
নিরে পাঁচবার সেতুঠা করলেন। এর আগে
তিনি বাঙলা, হোলকার, অজের বিশেষ পয়সর
তিনটি সেতুঠা এবং মহীশূরের বিশেষ সেতুঠা
করেছেন।

—

শুভাষ গুপ্তের শত উইকেট

ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও ভারতের প্রথম টেস্ট
ম্যাচের বিতীয় ইনিংসে কানহাইয়ের উইকেট
পাহার পর শুভাষ গুপ্ত টেস্ট খেলায় শত উইকেট
লাভ করেছেন। ত্রিগু মানকড়ও ত্রাবোর্ণ
স্টেডিয়ামেই ১২৪২-৪৩ সালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে
টেস্ট ম্যাচে শত উইকেট লাভ করেছিলেন। গুপ্ত
তাঁর ত্রয়োবিংশতিতম টেস্ট ম্যাচে শততম উইকেট
লাভ করেছেন। ওরিসি-ই সবচেয়ে কম সংখ্যক
টেস্ট ম্যাচে মাত্র ১২টি খেলায় শততম উইকেট
লাভ করেছিলেন। সাত বছরের টেস্ট ম্যাচ
খেলায় গুপ্তে যে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, তাঁর
ক্ষেত্রে আরো ভারতবাসী মাজেই পৌরবোধ
করতে পারি।

—

স্বাধীনতা সরকার কর্তৃক ১৪ বন্ধন চ্যাট্লে প্লট, কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত

ও তৎকর্তৃক প্রকৃত প্রেস, ৩০ কর্নওয়ালিস প্লট, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

মূল্য : চল্লিশ নয়া পয়সা



দেবী সরস্বতী

শিল্পী : অসিতকুমার হালদার।

হৃদয়ী হৃদয়ী মুখোপাধ্যায়ের দৌজতে।



৩৯ বর্ষ]

মাঘ—১৩৬৫

[১০ম সংখ্যা]

টোপাকুল

শ্রীদীনেশ গঙ্গোপাধ্যায়



টোপাকুল, টোপাকুল, টপ্ টপ্ টপ্ টপ্, পড়োনা করে'

ছহাতে কুড়াই সুখে কোচড় ভ'রে'।

পকেটেতে রেখে আহা, মুন মেখে বাই,

টোপাকুল, টোপাকুল, কথা শোনো ভাই।

টোপাকুল, টোপাকুল এমন চেহারাখানি কোথা পেল বলো।

এমন নিটোল দেহ রসে টলো টলো।

কাঁচা, ভাঙ্গা, আধ-পাকা, রূপ ধরো কত,

জ্বিতে আসে জল গাছে দোলো তুমি যত।

টোপাকুল, টোপাকুল, অত উচু মগডালে আছো কেন ভাই ?

একটু নামো না নীচে ছিঁড়ে ছিঁড়ে বাই।

পকেটেতে মুন কাঁদে, নিস্পিস্ হাত,
মুখে জল, চোখে লোভ, শিরশির্ দাঁত ।

টোপাকুল, টোপাকুল, নিজেই বিরেছে। কেন কাঁটা দিয়ে খালি ?
ডাল ধরে ঝাঁকি দেবো সে গুড়োতে বালি :
কোচড় পেতেছি নীচে, যেখানেই থাকে।
লাফিয়ে পড়োনা ভাই ব্যথা পাবে নাকো ।

টোপাকুল, টোপাকুল, বকবোনা, মারবোনা, ভয় কিছু নেই :
ভালোবেসে মুখে পুরে' এক কামড়েই
রসটুকু চুষে নেবো : খানিকটা বাদে
দেখবে মাটিতে শুধু আঁঠিটাই কাঁদে ।

টোপাকুল, টোপাকুল, কচি কচি ছেলের দাঁতের ডরে
তুমি কি ঝুলছো দূর ডালের পরে ?
একবার নেমে এসো, কথা শোনো ভাই—
দাঁতে যদি এতো ভয়, এসো মেখে খাই ।

কাকাতুল্য

শ্রীবিভূষণলাল বসু

গড়নটি বেশ ভারিকি আর বড়
ধবধবে রঙ শাদা—
খানিক এবার কিস্টো-রাধা পড়,
(অত) চৈচাও কেন দাদা ?

ধ্যাবড়া বাঁকা ঠোঁটটি ঈষৎ লাল—
খাবে মটর ছোলা ?
বাগিয়ে বুঁটি দেখাও কি এ চাল—
দাঁড়ে বসে দোলা ।



(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

নিজের কথা ভাবছেন স্বামীজি। ব্যক্তিগত সাফল্য তাঁর লক্ষ্য নয়। তাঁর লক্ষ্য হিন্দুধর্মের জয়, ভারতবর্ষের জয়। সমস্ত বিশ্ব বুকু তার উদার মন্ত্র, তার মিলন মন্ত্র। সমস্ত বিশ্ব বুকু অীরামকৃষ্ণের বাণী।

হেলদের বাড়ির সামনেই লিঙ্কন পার্ক। সেখানে মাঝে মাঝে রৌদ্রে হাওয়ায় বসেন এসে স্বামীজি। একটি তরুণী মা তার ছ বছরের ছোট একটি মেয়ে নিয়ে বাজারে যায় স্বামীজির সামনে দিয়ে। স্বামীজি দেখেও দেখেন না। কিন্তু তরুণী মা দেখে সেই উজ্জল স্নিগ্ধ সন্ন্যাসীকে, কি দয়ালুতা চোখ কি বিশ্বাসব্যঞ্জক দীপ্তি। একদিন তরুণী এসে বললে, ‘আমার এই ছুট্ট মেয়েটিকে একটু দেখবেন? আমি বাজারটা সেরে আসি। বাড়ি ফেরবার সময় নিয়ে যাব।’

খুশি হয়ে স্বামীজি মেয়েটির ভার নিলেন। এমনি এক দিন নয়, কয়েক দিন।

মেয়েটির যখন ষোলবছর বয়স তাকে তার মা স্বামীজির একখানি ফোটে। দেখাল। বললে, ‘এঁকে চিনিস?’

‘চিনি মা চিনি। কোথায় তিনি?’ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল মেয়ে।

সেই ছ বছর বয়সে কয়েক মুহূর্তের জন্মে দেখা সেই ভাস্বর স্নেহমূর্তি অন্তরে গাঁথা হয়ে আছে সেই মেয়ের। সেই মেয়ে আজ ভক্তির সরোবরে খেত শতদল।

মিসেস হেল মহাসভার আপিসে নিয়ে গেল স্বামীজীকে। দেখুন, প্রাচ্যধর্মের এ আরেকজন প্রতিনিধি। এই এর পরিচয়পত্র।

আর কথা কি। নির্বাচিত হলেন স্বামীজি। আর আর প্রাচ্য প্রতিনিধিদের সঙ্গে একত্র বাসা পেলেন। সমস্ত শুলভ ও সুগম হয়ে গেল।

আপনি কোন্ ধর্মের ?

‘হিন্দুধর্মের।’ গৌরবগাঢ় কণ্ঠে বললেন স্বামীজি।

আপনি ?

‘আমি ব্রাহ্মধর্মের।’ বললেন প্রতাপ মজুমদার। ‘আর ইনিও আছেন আমার সঙ্গে। দেখিয়ে দিলেন বিশ্বের নাগারকারকে।

আপনি ?

‘আমি খ্রিস্টধর্মের।’ বললেন চক্রবর্তী। ‘আর ইনিও আমার দলে।’ এনি বেসাটকে দেখিয়ে দিলেন।

ব্রাহ্মধর্ম আর খ্রিস্টধর্ম তো হিন্দুধর্মেরই শাখা। তা কে না জানে। তবু এঁরা মজুমদার আর চক্রবর্তী, যখন স্বতন্ত্র হতে চাচ্ছেন তখন তাই হোন। আমি সকলকে নিয়ে, আমিই সনাতন। আমার ধর্মের কোনো প্রবর্তন নেই, কোনো পরিবর্তনও নেই। আমি সর্বব্যাপী, অপরিণামী। আমি সেই এক সত্তা, আমরা সকলে সেই এক সত্তা—এই আমার ধর্ম, হিন্দুধর্ম। শাস্ত্রত ধর্ম।

মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েও বলো, আমিই সেই। এক সন্ন্যাসী ছিল, অমুক্ণ শিবোহং, শিবোহং আবৃত্তি করত। একদিন একটা বাঘ এসে তার উপর লাফিয়ে পড়ল ও তাকে টেনে নিয়ে গিয়ে ঘেরে ফেলল। যতক্ষণ বেঁচে ছিল ততক্ষণ শোনা গিয়েছিল সাধুর কণ্ঠস্বর : শিবোহং, শিবোহং। মৃত্যুর দ্বারে, ঘোরতর বিপদে, রণক্ষেত্রে, সমুদ্রতলে, পর্বতশিখরে, গভীরগহন অরণ্যে, যেখানেই পড়ো না কেন, সর্বদা বলতে থাকো, আমিই সেই, আমিই সেই। যতক্ষণ না প্রত্যেক শ্রায়, মাংসপেশী এমন কি প্রত্যেক রক্তবিন্দু পর্যন্ত এই ভাবে পূর্ণ হয়ে যায়, ততক্ষণ কানের মধ্য দিয়ে এই তবু ভিতরে প্রবেশ করাও। দিনরাত বলতে থাকো, আমিই সেই। কোথায় আমার ভয় কোথায় আমার পাপ কোথায় আমার দৌর্বল্য। আমি নিত্যযুক্ত, আমি কোনো-

কালে বন্ধ নই, আমি অনন্তকাল ধরে এই জগতের ঈশ্বর। আমাকে আবার পূর্ণ কে করবে? আমিই নিরবধি গগনভা, অতিবেলনিরুপম, আমি নিত্য পূর্ণস্বরূপ। আমি সেই তেজোময় স্বপ্রকাশ পুরুষ, আমি দেহ নই আমি আত্মা আমি ব্রহ্ম—এই ধর্মই আমার হিন্দুধর্ম।

‘হিন্দুধর্মের মত আর কোনো ধর্মই এত উচ্চতানে মানবাত্মার মহিমা প্রচার করেনা’, লিখছেন স্বামীজি, ‘আবার হিন্দুধর্ম যে সব পিশাচের মত গরিব ও পতিভের গলায় পা দেয় জগতে আর কোনো ধর্মে তেমন নেই। এতে ধর্মের কোনো দোষ নেই, শুধু কতগুলি আত্মাভিমানী ভণ্ড ভেদবুদ্ধির সাহায্যে এই আশুরিক অত্যাচারের ব্যবস্থা করে চলেছে সমাজের এই অবস্থাকে দূর করতে হবে, হিন্দু ধর্মকে ক্ষুণ্ণ করে নয়, হিন্দুধর্মের মহান উপদেশগুলি অম্লসরণ করে ও তার সঙ্গে হিন্দুধর্মের স্বাভাবিক পরিণতি যে বৌদ্ধধর্ম তার হৃদয়বস্তা মিশিয়ে। সুতরাং পবিত্রতার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হও, ভগবৎবিদ্যাসের বর্ম পরো, তারপর দরিদ্র, পতিত ও পরপদদলিতের প্রতি প্রেমে প্রেরিত হও। সিংহবিক্রমে বুক বেঁধে সমগ্র ভারত পরিভ্রমণ করে। সেবা ও সাহ্যের মঙ্গলময় বাণী প্রচার করো দ্বারে দ্বারে।’

ধর্মমহাসভা হচ্ছে কেন? কি উদ্দেশ্য?

পৃথিবীর যাবতীয় মহৎধর্মগুলিকে এক রঙ্গক্ষেত্রে একত্র করা। বিভিন্ন ধর্মে কি ঐক্য আছে তাই বিশ্বের সামনে স্পষ্ট করে তুলে ধরা। তার জগৎ প্রত্যেক ধর্মের শ্রেষ্ঠ প্রবক্তাকে নির্বাচন ও নিমন্ত্রণ করে আনা হয়েছে। কোন্ ধর্মের কি বৈশিষ্ট্য সত্যকে দেখবার ও পাবার কার কি পথ ও প্রণালী তার এবার বিচার-বিস্তার হবে। দেখা হবে এক ধর্ম আরেক ধর্মকে সাহায্য করতে পারে কিনা, পারলে কিভাবে পারে। ঐহিক সমস্যা, সামাজিক বৈষম্য, দারিদ্র্য ও অশিক্ষা, যাবতীয় অত্যাচার অব্যবস্থার অপনয়ন করতে ধর্মের কী শক্তি, কিংবা শক্তি তার আদৌ আছে কিনা। সর্বতম উদ্দেশ্য, আন্তর্জাতিক শান্তি আনতে পারে কিনা ধর্ম—তার পরীক্ষা। পারস্পরিক সৌভ্রাত্রে সম্ভব কিনা সহ-অবস্থান।

দেশ-দেশান্তর থেকে নিমন্ত্রিত হয়েছে মনোবীর। পরিচালক কমিটিতে প্রায়

তিন হাজার সভা। প্রায় দু বছরের উপর চলেছে এর তোড়জোড়। রাশি-রাশি পত্র, রাশি রাশি দলিল, স্তূপের পর স্তূপ, বাগুলের পর বাগুল। একটানা সত্তেরো দিন ধরে সভা চলবে, সকালে বিকেলে ও সন্ধ্যায় অবিচ্ছিন্ন বক্তৃতা। এলাহি কাণ্ড, পৃথিবীর ইতিহাসে এমন আর হয়নি কখনো! অগণন লোক কাজ করছে অফিসে। প্রায় দশ হাজারের উপর চিঠি, চল্লিশ হাজারের উপর দলিল। বক্তৃতা যে কত হবে তার অস্তু নেই। লিখিত, পঠিত, উদগীরিত। শুধু বাক্যের বৃদ্ধুদ। বাক্যের উৎপাত।

কমিটীতে ভারতীয় পাঁচজন। হিন্দু পত্রিকার সম্পাদক আয়ার, নাগারকার প্রতাপ মজুমদার, মহাবোধি সোসাইটির সেক্রেটারি ধর্মপাল আর জৈনদের প্রতিনিধি মুনি আশ্বারাম। স্বামীজি? স্বামীজি কেউ নন। তিনি উপর-পড়া। তিনি রবাহৃত। ঢাল নেই তরোয়াল নেই, নিধিরাম সর্দার।

কিন্তু একবার যখন মনোনীত হয়েছি, পেয়েছি প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার, দৃঢ় করে পতাকা তুলে ধরব উর্ধ্বে। প্রভু, শক্তি দাও। আমাকে তোমার হাতের শব্দ করে তোলো। আমি যেন হতে পারি হিন্দুদের যোগ্য ভাস্কর, হতে পারি তোমারই যোগ্য বার্তাবহ।

এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্ত্র ছাড়া আর কিছু নেই সংসারে। রজ্জুতে সর্পের শ্বাস, শুক্লিতে রজতের শ্বাস, মরীচিকার জলভাস্তি নেই যাঁতে জগৎ ভাসমান সেই মহাকল্প সভ্যত্বরূপের শরণাপন্ন হই।

পর দিন, এগারোই সেপ্টেম্বর, সভার প্রথম দিন।

সারারাত ধ্যানে ও প্রার্থনায় কাটালেন স্বামীজি।

হে মন! নিভেকে কখনো পরাকৃত মনে কোরো না। সর্বদা তোমার মাথা উচুতে রাখে। কারণ তুমি যে ঈশ্বরের বাহক। তুমিই যে গুরুস্থান বেদ। তুমি মহতো মহীয়ান। তুমি ধর্মরূপী বৃষভ, খাণ্ড বেদান্ত যা মানুষকে বলবান বীর্যবান ও ওজস্বী করে। তোমার জ্ঞানে সর্বাস্তিত্বের প্রমাণ, তাই সর্ববিধানের প্রতিষ্ঠাই তোমার ধর্ম।

তোমার মন্ত্র সম্বয়। তোমার শুধু সঙ্গতির সঙ্গীত।

আঠারোশ ভিরানকষ্ট সালের এগারোই সেপ্টেম্বর, সোমবার, বেলা দশটায় গঙ্গীরনাদে ঘণ্টা বেজে উঠল। একে-একে দশবার। পৃথিবীর প্রধানতম দশ ধর্মকে আহ্বান করা হচ্ছে।

হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, জুডা, তাও, কনফুসিয়ান, শিষ্টো, জোরোয়াস্ট্রিয়ান, ক্যাথলিক, গ্রীক চার্চ আর প্রটেস্ট্যান্ট। তালিকা প্রস্তুত করেছেন প্রেসিডেন্ট বনি। কিছু বলবার-কইবার নেই। আমার দেশে তোমাদের নিমন্ত্রণ।

বৃষ্টান দেশে অখ্রীষ্টীয়দের যে ডাকা হয়েছে তাই যথেষ্ট। শুধু ঐ অতিকায় দশ-জনই নয়, লঘুদেহ আরো অনেকেই পাত পেয়েছে। উজ্জ্বালার মনে গোড়ায় এক ভাব এসেছিল, অত হাজার হাজার কি, শুধু খ্রীষ্টধর্মের গুণগান করবার জন্মই সত্যের আয়োজন হোক। আর সব ধর্ম খ্রীষ্টধর্মের চেয়ে নিস্তেজ ও নিস্ত্রুত তাই প্রতিপন্ন করা হোক ঢাকেঢোলে। শেষ পর্যন্ত অনেক তর্কবিতর্কের পর ঠিক হল অম্লন কাঠখোঁটা গোঁয়ারতুমি প্রত্যক্ষে না করাই শোভন হবে। বস্তুত সত্য যখন একমাত্র খ্রীষ্টধর্মে, উজ্জ্বালার আশ্রয় হলেন। অজ্ঞান ধর্ম তো এমনিতেই হেরে যাবে। আশুক না যত সব আচার-অনুষ্ঠানের খুলি নিয়ে, কুসংস্কারের পুঁটলি বেঁধে। দেখি না কার কত দৌড়। সত্যের সঙ্গে সত্যের সঙ্গে কে কবে পেরেছে? সুতরাং খ্রীষ্টধর্মের জয় অবধারিত।

তাই ব্যারোজ অব্যাহত হতে পারলেন নিমন্ত্রণে। অভাগ্য অভাগীদের এমন আশ্বাসও দিলেন, ভয় নেই, কোনো কলহ বা তিক্ততার প্রভ্রয় দেওয়া হবে না, সর্বক্ষণ বইবে বজ্রতার প্রফুল্ল হাওয়া।

অন্যকে খণ্ডন নয় শুধু নিজের কীর্তন। অন্তর্কে পতন নয় শুধু নিজের স্থাপন।

তাই ঘণ্টা বাজল মন্দিরে।

উজ্জ্বালার পুরোহিতেরা কিন্তু মুখ লুকিয়ে হাসল। খ্রিষ্টিয়ানিটির সামনে আবার স্থাপন-কীর্তন কি। কে দাঁড়াতে শক্ত পাবে। কে গাইবে গলা উচিয়ে।

মিটিগান এভিনিয়ুর পারে আর্ট ইনস্টিটিউট। তার বিরাটতম হল-ঘরে, হল অফ কলম্বাসে সভা হচ্ছে। হলের এক পাশে প্রকাণ্ড মঞ্চ, সামনে পর-পর গ্যালারির কাতার, লোকের পর লোক গাদি মেরে বসে। ছ থেকে সাত হাজারের মধ্যে। মঞ্চে দেয়ালের দিকে দু পাশে দুই গ্রীক দার্শনিকের মূর্তি, মাঝখানে বিজ্ঞার দেবী, হিন্দুদের সরস্বতীর অমুরূপ। হাতের মূর্তা অভয়ঙ্করী।

একটু এগিয়ে এসে মাঝখানে উঁচু এক সিংহাসন, তার দু দিকে সারবাধা কাঠের চেয়ার।

সিংহাসনে এসে বসল কার্ডিনাল গিবনস, আমেরিকার ক্যাথলিক চার্চের প্রধান বিশপ। আর কাঠের চেয়ারে আসন নিল দেশ-বিদেশের প্রতিনিধিরা, আর যারা সভার সঙ্গে উচ্চ তস্ত্রে যুক্ত কিংবা যারা বিশেষ অতিথি।

মঞ্চের উপর, চতুর্দিকে রঙের ডেউ উঠেছে।

চীনা বৌদ্ধদের শাদা পোশাক, গ্রীক চার্চের বিশপদের কালো। জাপানের রঙ রামধনুর, কাকুর বা শাদা আর হলুদের মিতালি। কেউ পরেছে উচ্চ লালের ধার ঘেঁষে। শুধু কি রঙ? আছে আবার ছাঁট-কাটের বৈচিত্র্য। কেউ আর্টসাঁট কেউ বা ঢিলেঢালা। প্রতাপ মজুমদারের তো চোস্ত সুট। আর ধর্মপাল শাদা একটি পশমের ঢিপি।

এরই মধ্যে একখানি চেয়ারে বসে আছেন বিবেকানন্দ, সকলের চেয়ে বয়সে ছোট, মোটে উনত্রিশ বছরের যুবক, গায়ে গেকুয়া আলখালা আর মাথায় গেকুয়া পাগড়ি—যেন আশার আকাশে আশ্বাসের সূর্য।

(ক্রমশঃ)



(ভূমিকা—কোন হৃদয় অতীতকাল থেকে বাংলাদেশে ঋতু হ্রস্বর রূপকথা, উপকথা চলে আসছে।

বাংলার ছায়া-ঘেরা জামল মাটির কুটারে শস্যার স্তিমিত প্রবীণের বিটমিটে আলোর বসে ঠাকুমা, দিদিমারা, নাতিনাতিনীদের ভোগাযার গুস্ত মূখে মূখে এই সব রূপকথা, উপকথা রচনা করেছিলেন। দীর্ঘকাল পর্যন্ত এইগুলি লেখা হয়নি। অনাথা ঠাকুমা, দিদিমার মূখে-মূখে এই কাহিনীগুলি যে কেমন করে আঁজও বেঁচে রয়েছে তা ভাবতে আশ্চর্য লাগে।

বাংলা দেশের ছেলেমেয়ের শৈশব সোনার স্বপ্নে ভরিয়ে তুলেছে এই সব রূপকথা আর উপকথা : 'বর্ষাদিনের ছোট পাখী' এমন একটি হ্রস্বর রূপকথা।)

ঘোর বর্ষা। ছোট্ট একটি চডুই পাখী ভিলতে ভিলতে উড়তে উড়তে তিত্তিবিরক্ত হয়ে বলছিল—“খাবার খোঁজার দায়ে এই বিকিভেঙে বাগা ছেড়ে বেহোতে হল। ঘেঁষি একবার রাজবাড়ীটার উপর দিয়ে উড়ে কিছু খাবার পাই কিনা।”—চডুই রাজার বাগানের উপর উড়ে এল।

এমন সময় হঠাৎ মেঘের ঠাক দিয়ে রোদ বলবল করে উঠল। আর রাজার বাগানের একটা কোণ অগচ্ছল করে উঠল।

“এত অলছে কেন? শুকলো আবার কি?”

বলে চডুই বাগানের সেই কোণে এসে দেখে রাজবাড়ীর সোনার টাকা রোদুয়ে শুকতে দেখা হয়েছে। রাজার এত টাকা বা ছাতা পড়ে বাচ্ছিল, তাই রোসে শুকতে দেখা হয়েছে। তাই দেখে চডুইয়ের খুব রাগ হল। তাবল—আমি বিকিভেঙে ভিলে খাবার খোঁগাড় করব, আর রাজা টাকার শুপের উপর বসে আছোসে দিন কাটাবে। কিছুতেই তা হতে দেব না। রাজাকে আমি জখ করব।

তার পরের দিন। রাজা, মহী ও অমাত্য-সামন্তদের নিয়ে রাজসভা জাঁকিয়ে বসেছেন, এমন সময় চডুই রাজা মশায়ের ঠিক কানের কাছে এসে গান ধরল—

“রাজার ভাগ্যে আছে

কিছু কিছু সোনা,



চডুইয়ের বাসার হীরা মানিক

বার না রে গোপা।”

চডুইয়ের গান শুনে রাজা মন্ত্রীকে বললেন—“দেখ পাখীটা যা বলছে সত্যি হতে পারে। হয়ত ওর বাসার হীরা-মানিক লুকান আছে। এবনি ওর বাসা পেড়ে এনে দেখ তার ভিতরে কি আছে। রাজার হুকুম শুনে রাজার লোকেরা চডুইয়ের বাসা ভেঙ্গে হাটিতে ফেলল। বাসার ভিতর থেকে বেরোল কাঠ-মুঠো, ছেঁড়া কাপড়ের টুকরো, ছোট ছেলেদের ভাড়া শেলিল। চডুইয়ের এই সব জিনিস-পত্র গুছিয়ে-গাছিয়ে রাজসভায় নিয়ে এসে

তারা রাজার সামনে খুলে ধরল। চডুই পাখীর সম্পত্তি দেখে রাজা, মন্ত্রী ও আমতারা হেসে লুটিয়ে পড়লেন।

চডুই তখনও রাজসভায় উড়ে বেড়াচ্ছে। তার বাসা ভেঙ্গে টুকরো-টুকরো করা হ'ল, আবার তাকে নিয়ে সবাই ঠাট্টা করছে যেহেতু আগে সে রাজার কানের কাছে এসে গান ধরল—

“রাজার তাগারে নেই

কিছু সোনা ভাই,

চডুইয়ের বাসা ভেঙ্গে

চুরি করে তাই।”

গান শুনে রাজা খুব রেগে উঠলেন—“মন্ত্রী, লোকজনদের হুকুম দাও পাখীটাকে ধরে আনুক। তারপর ওটাকে রাণীদের মহলে পাঠিয়ে দাও। রাণীদের বলবে—“খুব ভাল করে মশলা দিয়ে ওর মাংস রোধে রাখবে। আজ দুপুরে আমি ঐ মাংস খাব।”

যেমন হুকুম তেমনই কাজ। রাজার লোকেরা চডুইকে ধরে রাণীদের মহলে পাঠিয়ে দিল। রাজার হুকুম শুনিয়া এল। রাজার সাত রাণী। তারা সবাই চডুইকে হাতে ধরে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে লাগল। সবশেষে ছোটরাণীর হাতে এল চডুই। খোলা জানলার সামনে ঝাঁড়িয়ে চডুইয়ের গায়ে হাত বুলাতে বুলাতে ছোটরাণী যেই একটু অন্তমনস্ক হয়েছে, আর অমনি তার হাত কঁকে চডুই খোলা জানলার ঠাঁক দিয়ে উড়ে পালিয়ে গেল।

তাই বেধে অস্ত্র সব রাণীরা ভয়ে আঁতকে উঠল। বলতে লাগল—“ও ছুটকু, এ কি করলি! রাজা আমাদের সবাইয়ের মাথা কেটে ফেলবে।”

বড়রাণীর মাথায় খুব বৃদ্ধি। একটু ভেবে সে বলল—“এস, সবাই মিলে একটা বড় সেধে কোলা ব্যাঙ খেয়ে, তার মাংস খাওি। রাজা কিছুই বুঝতে পারবেন না। আমাদেরও গ্রাণ বাঁচবে।”

ছপুর বেলায় রাজা খেতে বসলেন। রাণীরা সোনার পায়ে চমৎকার করে রাজা করা মাংস এনে রাখল।

মনের আশ্বে রাজা খাচ্ছেন আর বলছেন—“আহা কি চমৎকার মাংস! কি স্বাদ!”

ঠিক এমনি সময় চডুই পাখী খোলা জানলা দিয়ে উড়ে এসে রাজার কানের কাছে উড়তে উড়তে আবার গান ধরল—

“বোকা রাজার কাণ্ড দেখ,
কোলা ব্যাঙের মাংস খায়।
চডুই পাখী মরল বলে
আনন্দে হাদে-গায়।”

রাজা চমকে চেয়ে সেখেন চডুই পাখী দ্বিবি গান পেয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। তবে তো ঠিক বলেছে ও।

“গম্বাক থুঃ!”—রাজা মাংস ফেলে দিলেন। তারপর উঠে মুখ ধুয়েই চাঁৎকার করলেন—
“সেনাপতি সেনাপতি।”

ছুটে ছুটে সেনাপতি এসে—“স্বাভাষ কি হুঃ।”

রাজা বললেন—“এখনি এই সাতরাণীর নাক কেটে দাও। এতবড় আশ্রাধা, আমাদের কোলা ব্যাঙের মাংস খাওয়ার।”

সেনাপতি সাত রাণীকে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে নাক কেটে দিল।

তার পর দিন। রাজা মহী ও পাত্র-মিষ নিয়ে সত্য বসেছেন, এমন সময় সেই চডুই রাজ-সত্য ঢুকে গান ধরল—

“ছুই রাজা কাটে
রাণীদের নাক,
সত্য মাঝে বসে
দেখায় কত ভাঁক।”

চডুইয়ের গান শুনে রাজসভার সব লোক রাজার কাণ্ড বুঝতে শেরে মুখ টিপে হাসতে লাগল।

তাই দেখে রাজা রেগে সিংহাসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে চীৎকার করে বললেন—“মন্ত্রী, এখনি সিপাই শাহীদেব হতুম দাও, চড়ুটাকে ধরে আছক।”

রাজার রাগ দেখে সিপাই শাহীর দল হৈ হৈ রৈ রৈ করে ছুটে চড়ুইকে ধরে রাজার কাছে নিয়ে এল। রাজার আনন্দ দেখে কে।—“ছটু শাহী, দেখ এবার তোকে কেমন লখ করি।” এই না বলে রাজা প্রকাণ্ড এক হাঁ করে চড়ুইকে মুখের ভিতর ফেলে কৌৎ করে গিলে ফেললেন।

কিন্তু চড়ুইও কম চালাক নয়। রাজার গলার নলীর কাছে বেই পৌঁচেছে অমনি খারাল ঠোটে দিয়ে গলার নলী প্রাণপণে টিপে ধরেছে।

রাজার অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠল। চোখ উন্টে গেল। প্রাণ বুকি দার।

রাজবৈজ্ঞ শ্যামনই ছিলেন। ডাড়াডাড়া একটা গুণ্ধের বড়ি রাজার দামনে ধরে বললেন—“রাজামশাই ধেরে ফেলুন। চড়ুই মুখের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে যাবে।” এত কষ্টতেও কিন্তু রাজার চড়ুইয়ের উপর রাগ দার না। হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন—“সেনাপতি, খোলা তরোয়াল হাতে দাঁড়াও। বেই চড়ুই বেরোবে অমনি তাকে কেটে ফেলবে।” “সেনাপতি তরোয়াল খুলে রাজার মুখের দামনে ধরে দাঁড়াল। রাজা গুণ্ধের বড়ি খেলেন। ‘গুয়া’ করে উঠলেন আর চড়ুই রাজার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল। বেই বেরোল অমনি সেনাপতি খোলা তরোয়াল বনান করে চড়ুইয়ের মাথার উপর ফেলল।

তারপরেই এক অঘটন ঘটল।

ছোট চড়ুই তার হাঁকা শরীর নিয়ে তরোয়ালের কোণ এড়িয়ে ছুৎ করে উড়ে পালাল। আর সেই খোলা তরোয়ালের চোট এসে লাগল রাজার নাকে। অর্ধেকটা নাক গেল উড়ে।

রাজা ঘরপাথ চীৎকার করে উঠলেন। ঠিক সেই সময় চড়ুই রাজদরায় এসে গান ধরল—

“ছটু রাজার শান্তি দেখে
হাসে সকল লোক,
ছোট চড়ুই মারতে গিয়ে
পেলেন নাকে কোণ।”

গাইতে গাইতে নীল আকাশের কোলে ছোট চড়ুই শাহী বিলিয়ে গেল।

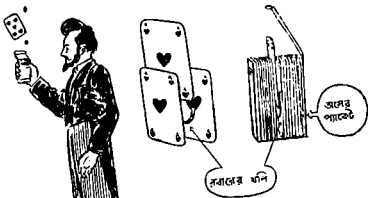
বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

বর্তমান সংখ্যায় ‘গ্রাহক-গ্রাহিকা সংখ্যা’ হিসাবে প্রকাশ করার কথা ছিল। কিন্তু রচনা নির্বাচন ও রচনার অন্ত ছবি প্রকৃতি আঁকার ব্যাপারে দেরি হওয়ার জন্য তা সম্ভব হয় নি। আগামী কাকন-সংখ্যা ‘গ্রাহক-গ্রাহিকা সংখ্যা’ হিসাবে প্রকাশিত হবে।

তাসের 'হাই-জাম্প'

বাহুরস্বাকর এ. সি. সরকার,

তাদের 'হাই-জাম্প' সে খেলে কখনো?—কিন্তুই যে অবাক হয়ে গেলে দেখছি। সত্যিই কিছু তাসকে দিয়ে 'হাই-জাম্প' হে ও যাতে পারা যায় একটুখানি বাহুর কৌশল খাটিয়ে। প্রথমে খেলাটার বিবরণ এখানে বলি মন দিয়ে শোন :



তাস সোজানোর সময়টা যেখানে হয়েছে ছবিতে। তাসটি প্যাকেট থেকে পাকিয়ে উঠে বাহুর হাত থেকে।

বাহুর এক প্যাকেট তাস নিয়ে আসেন রুমকে। আপন মনে ভাবল করে নিয়ে তিনি এগিয়ে যান একজন দর্শকের কাছে। প্যাকেটটা উপড় করে দিলে ধরেন তিনি এই দর্শকের সামনে, তারপর তাকে অহরোপ করেন, যে কোনও একটি তাস তুলে নেবার ভক্তে। বাহুরের অজান্তে একটি তাস উঠিয়ে নেন দর্শক মশাই। তাসের বাকী প্যাকেট হাতে নিয়ে বাহুর ফিরে যান টেবলে। এর পরে দর্শকমশাই অজান্তে দর্শকদের সেখান তাসটি। অবশিষ্ট তাসগুলি (৭) হাতে নিয়ে বাহুর আবার আসেন দর্শকদের মধ্যে। অহরোধে নির্বাচিত তাসটি দর্শকমশাই গুলে দেন এই তাসের মধ্যে। এইবার বাহুর টেবলে ফিরে গিয়ে আরম্ভ করেন বাগাড়ম্বর—'বন্ধুগণ, আপনাদের পছন্দ করা তাদের নাম আমার সম্পূর্ণ অজান্ত হলে কি হবে আমার বাহুরমুণ্ডে সেই তাসে আগুবে গ্রাণের লাড়া। আপনারা ভাল করে লক্ষ্য করুন কী ঘটে!' এই কথা বলে বাহুর একবার তাঁর বাহুর কাঠি ঘুরিয়ে নোবন প্যাকেটের চারপাশে। দর্শকদের চক্ষু ছানা-বড়া করে দিয়ে তাদের নির্বাচিত তাসটি প্যাকেট থেকে লাফিয়ে পড়বে তাদের চোখের সামনে! তাদের নির্বাচিত তাসের এ 'হাই-জাম্প' দেখে অবাক না হয়ে পারবেন না তারা।

এতে আছে দু'টো বিষয়। প্রথমতঃ দর্শকদের নির্বাচিত তাসের নাম বাহুর জানলেন কেমন করে? দ্বিতীয়তঃ তাসটি লাফিয়ে উঠল কেমন করে?

শোন এবার তোমাদের বলে মিছি কেমন করে এ ছু'টো বাণীর সম্ভব হ'ল :

বাড়ির গ্রন্থন যে তাদের প্যাকেটটি এনে ফ্রাঙ্ক করে নিয়ে দর্শকদের মধ্যে নিয়েছিলেন, তাতে ছিল এক আজব কারসাজি । এ প্যাকেটের প্রত্যেকটি তাসই ছিল এক রকম । বাড়িরদের তো জানাই ছিল যে কোন রকমের তাসের সেট সেটি, কাজেই এ প্যাকেট থেকে দর্শকমশাই যে তাসই পছন্দ করে উঠিয়ে নিল না কেন তা তো বাড়িরদের অজানা নয় ।

শোন এবার বলি তাদের 'হাই-জাম্পের' রহস্য । দর্শকেরা যখন তাস দেবার ব্যস্ত, সেই অবদরে বাড়িরদের মশাই হাতের তাসের প্যাকেটটা রেখে টেবিল থেকে তুলে নিয়েছিলেন অন্য একটি কৌশল করা প্যাকেট । এই প্যাকেটের ভেতরে ছু'টো তাসের স্বাক্ষরানে কৌশলে লাগানো ছিল এক ফালি স্তর রাবার (ছবি দেখ) । এই ফালি রাবারের উপরে চেপে বসানো ছিল একটি তাস — ঠিক সেই রকমের তাস যে রকমের তাসের সেট থেকে দর্শকেরা তাস নির্বাচন করেছেন । এই প্যাকেটের ভেতরেই বাড়িরদের নির্দেশে দর্শকেরা ঢুকিয়ে নিয়েছিলেন তাদের পছন্দ করা তাস । তাস দেবার জন্য বাড়ির যখন প্যাকেটটি দর্শকদের কাছে নিয়ে যান, তখন তিনি প্যাকেটের উণ্টো দিকটা খুলে রাখেন আর তারই ভেতরে গলিয়ে, সিতে বলেন তাসটাকে যে কোন জায়গাতে । এর পরে স্টেজে ফিরে এসে যখন তিনি বক্তৃতা করে প্যাকেট খোলেন, তখন তিনি খোলেন তাদের প্যাকেটের সোজা দিকটা । বলা বাহুল্য এই সোজা দিক দিয়েই তিনি আগে থেকেই নির্ধারিত তাস-এর মতন একটি তাস চেপে বসিয়ে রেখেছিলেন রবারের ফালিটার উপরে । এই কারণে প্যাকেটের মুখ খোলা মাত্রই রবারের টানে তাসটি ছিটকে বাইরে গিয়ে পড়ে । আর তার হাইজাম্প দেখে সবাই অবাক হন ।

একই রকমের ফৌটাওয়াল তাসের প্যাকেটের দরকার হলে আমার কাছে শোষ্ট বস্তু নং ১৬২১৪, কলিকাতা ২২—এই ঠিকানায় চিঠি লিখো ।

ছড়া

পরিমল রায়

পুতুলখির 'বোমা' ইনি বেজায় রকম কড়া

এক দৃষ্টে ভাকান হবে—কাপেন বহুদর ।

তখন আত্ম-পাখি খাঁচার

আর বন্দী থাকতে না চায়

কটপটিরে ছটপটিরে হবেই অপিরায় ।



বড়ই আশ্চর্য ব্যাপার। পর পর তিনদিন স্বপ্ন দেখলাম যে হরিণ এসে আমার বেন বলছে, তাই একটা সিনেমা দেখা। রোজ চোরে উঠেই স্বপ্নটা বেন পাঠ মনে পড়ে। ভারী অদ্ভুত ঠেকলো নিজের কাছেই স্বপ্ন-টপ্ন আমি তেমন বিবরণ করিনা কোনো কালেই, যদিও মা'র খুব গভীর বিশ্বাস এলব বিষয়ে। তিনি অনেকবার গল্প করেছেন কেমন করে দাণায়শ্যারের মরার খবর তিনি স্বপ্নে অনেক আগেই টের পেয়েছিলেন। বড়মামার মরার খবরও তিনি জেনেছিলেন এইভাবে। আমি কিন্তু এসব কথার তেমন বেশি গুরুত্ব দিইনি কোনো কালে। স্বপ্ন, সে তো শুধুমাত্র স্বপ্নই—আমারই অলস মস্তিষ্কের মাথাশূঁ ছাইতপ্প কল্পনা—তাছাড়া আর কি হবে! পৃথিবীর কোন্ কোণে কি ঘটেছে-না-ঘটেছে সে সব কী করে ধরা পড়বে আমার ঘুমন্ত মস্তিষ্কে? আমি তাই ও সব আধ্যাত্মিক স্বপ্নতত্ত্বকে আমল দিইনি কোনো কালে।

কিন্তু হরিণের স্বপ্ন; তাও আবার পর পর তিন রাত্তির—না, ব্যাপারটা আমার একটু ভাবিরে তুললো। হরিণ আমার এক পরলোকগত বন্ধু; মাত্র বছর বানেক হলো সে মারা গেছে। খুব রঙডে, আয়ুধে বদ্ধ ছিল সে আমার—শুধু আমার কেন আরো অনেকের। হঠাৎ কথা নেই বার্তা নেই যেমিঝাইটিং হয়ে মারা গেল! দু'দিন আগের অমন স্নগদ্যাস্ত মানুষটাকে অশানে নিজে নিজে হাতে বে পোড়াতে হবে তা ভাবিনি কখনো। মনটা ক'দিন ভারী খারাপ হয়ে গিয়েছিল। হরিণ সিনেমা দেখতেও খুব ভাল বাসতো। অনেকবার গেছি ওর সঙ্গে সিনেমা দেখতে। নিজেই এসে ডেকে নিয়ে যেতো আমার বাড়ী থেকে। সেই হরিণ ঘেন সিনেমা দেখতে চায়, এতমি খারা স্বপ্ন দেখলাম উপরো-উপর তিন রাত্তির। স্বপ্ন হলেও পর পর তিনদিন এরকম স্বপ্ন মনটাকে একটু নাড়া দেয়ই। সেদিন বিকেলে নিখিলকে বললাম ব্যাপারটা হাসতে হাসতে।

তখন আমরা রেষ্টুরেন্টে বসে চা খাচ্ছিলাম। নিখিল বললো, বেশ তো দেখানোই থাক না শুকে দিনা। আমি বললাম, কাকে সিনেমা দেখা। কেন হরিশকে, নিখিল বললো। হয়তো কিছুই নেই এতে, নিঃকম স্বপ্ন মাত্রই, তবু ধর যদি কিছু থাকে, বলা তো যায় না! আমেরিকাতেও এ নিয়ে অনেক গবেষণা হচ্ছে। কোনো কিছুর ওপরেই চূড়ান্ত মত তুমি পাস করতে পারো না। এখন সত্যিই যদি এমন কিছু থাকে যে আমরা টিকিট কেটে না দেখলে পরেও মরেও সিনেমা দেখার ব্যবস্থা করতে পারবে না, তবে হয়তো শুকে স্বপ্নেই তোমার কাছে আবেদন জানাতে হবে একথানা টিকিটের বন্টনো বন্টন করার অস্ত্র। ধোকা।

আমি বললাম, আরে মরার পরেও যদি সিনেমা দেখার শখ পুরো বজায় থাকে, তবে টিকিট কেনার যে কী নককার পেটা তো আমি বুঝতে পারছি না। আত্মা বলে যদি কিছু থাকেই তবে সে তো বিশেষই হয়েই থাকবে। সেহটিকে তো ঐ স্থানেই চোখের সামনে জালিয়ে দিয়ে এলুম।

আচ্ছা! মানবুয় তোমার সব কথা, সব বৃত্তি; বললো নিখিল। আমি তোমার কথাও উড়িয়ে দিতে চাইনা, আর অপর পক্ষীয়দেরও না। কেনাই থাক না একথানা বাড়তি টিকিট। আচ্ছা রাজ্বেব শোভেই চল। একথানা টিকিটের যামলা তো! এর পরে সে স্বপ্নের আর পুনরাবৃত্তি না হতেও পারে: অবিস্তি এর পরেও যদি হয় তখন তোমার টিকিটসার ব্যবস্থা করা যাবে'খন। সাইকো-এনালিস্টরা তো আছেনই—তাদের কাছেও যেতে পারো, নয়তো কোনো মৈবজ্ঞকে ধরে এর মীমাংসা করে নিও। কিছু শাস্তি-স্বপ্নায়নও হয়ত করতে হতে পারে।

তাই ঠিক হলো যে সেদিনই রাজ্বেব সেকেন্ড শো'তে সিনেমা যেতে হবে। নিখিলই এসে আমার ডেকে নিয়ে যাবে। একটা হাউসে ভাল একটা ইংরেজী ছবি ছিল *Lost Horizon*। দেখানোই গেল। হরিশও ইংরেজী ছবির স্তম্ভ ছিল। তিনখানা টিকিট কিনে ঢুকে পড়লাম সময় হতে। সেখতে সেখতে হল প্রায় ভরে গেল। ভালো ছবি, ভিড় হওয়া স্বাভাবিক। হঠাৎ আমার একটি কথা মনে হোল। চূপিচূপি বললাম, নিখিল এখানে তো সিনেমা নব্বদ দেওয়া নেই টিকিটে? তৃতীয় টিকিটখানার কোনো সার্বকতা দেখছো কি? নিখিল বললো, আং, মিছে বকো না; এই ছবি হুক হলো, দেখো চূপ করে।

হুকের ট্রেলার দেখানো হুক হোল তখন। হঠাৎ লক্ষ্য করলাম পাশের সিটখানা খালি। কে যেন বসেছিল! হী, টিকিট। সে হঠাৎ কখন হুট করে উঠে চলে গেছে, টের পাইনি। সে তো আর আসে না। আমি ছবি দেখা ছেড়ে দিয়ে এমিক-ওমিক তাকাতে লাগলুম। সে লোকটা গেল কোথায় আসে না কেন! নাং, কেউ তো এলো না। আর কেউই বা এসে বসছে না কেন। দিটটা তো খালি। হঠাৎ আমার দৃষ্টিগুটা একবার যেন বন্ধ হয়ে আবার ক্ষত তালে চলতে

লাগলো। পাশের সিটে কি তবে বসে আছে—? যে ভয়ঙ্কর প্রায় আমার সমস্ত দেহবস্ত্র বিকল করে দিয়েছিল, তাকে স্বীকার করে নেবার সাহসও যেন পাচ্ছিলাম না। পাশের সিটে কি তবে বসে আছে হরিণ? আমার ডান হাতি সিটটা। আমার ডানদিকটা শিরশির করতে লাগলো।

বাঁ-হাতে নিবিলকে টিপে বললাম কিন্‌কিন করে, ওহে আমার ডানদিকের সিটটা খালি। নিবিল বললে, এ্যা!...বলেই সে স্তম্ভনক গম্ভীর হয়ে গেল। কিন্তু আমার সমস্ত দক্ষিণ অঙ্গ অশরীরীর স্পর্শ-সাজিধ্যে যেন পাথর হয়ে যেতে লাগলো।

মনকে বোঝাতে লাগলাম, একি কখনো হতে পারে? যে অশরীরী তার বদার অস্ত্র চেয়ারের দরকার হবে কেন? যাব সিট সে হয়তো কোনো কাজে বাইরে আটকে পড়েছে, নয়তো আরো কোনো ভালো জায়গা পেয়েছে।

কিন্তু কেউ তো সিটখানা দখল করবার চেষ্টাটাও একবার করলো না। কতো লোক পরে এসে একিকে-ওদিক কতো খারাপ জায়গা—তাও, কতো কষ্টে জুটিয়ে নিয়ে বসলো দেখলাম, কিন্তু এটাকে কেউ তো দেখেও দেখলো না। এ সিটখানা অনেক যেন এড়িয়ে গেল। পেয়েও যেন বসলো না।

আমার ডানদিকটা যেন অবশ হয়ে গেছে, এমনি বোধ হতে লাগলো।

ইন্টারভ্যাল হোল। অনেকই উঠে গেল বাইরে চা-টা বেতে। আমি বললাম, নিবিল, না, এখানে আং বলা নয়; চল ওদিকটায় গিয়ে বসি।

সিনেমা দেখা আমার কাছে প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। কী যে অসম্ভবের ঠেকছিল। সমস্ত হল লোকে গিগ-গিগ, করছে, শুধু আমার পাশের সিটখানাই অত্যাস্তর্ধভাবে খালি। অথচ হলে ঢুকে আমিই বসেছিলাম; যে তৃতীয় টিকিটখানার দার্ককতা কতকটা বোকা যেত টিকিটে সিটের নম্বর দেখা থাকলে। একটা চেয়ার অস্ত্রত: খালি থাকতো তা'হলে।

একটু এগিয়ে গিয়ে বসে যেন হাঁক ছেড়ে ঝাটলাম। না, এইবার সিনেমাটা দেখা যাবে। নিবিল বললে, তুই যে ভয়ে একবারে জমে গেলি! অমন ধারা কতো সিট খালি থাকে, অনেকের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। বাক্ এইবার ছবিটা দেখতে চেষ্টা কর, বড় ভাল ছবি।

হল অন্ধকার হয়ে গেল। বিজ্ঞাপনের লাইভ শেখানো হচ্ছে। ঘাবা বাইরে গিয়েছিল সবাই এসে ঘাবা ঘাবা সিট খুঁজে নিয়ে বসতে লাগলো। অনেক কুল করে অন্তের জায়গায় বসলো, সিটের তো আর নম্বর নেই? কিন্তু এবারেও আমার ডান পাশের সিটটায় বসলো না কেউ! অস্ত্র অনেক জায়গা নিয়ে কাড়াকাড়ি হোল, কিন্তু এ সিটটা যেন সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে গেল।

আমি মনে মনে বললাম, হঁ। আমার কী এখন কর্তব্য বুকে উঠতে পাচ্ছিলাম না। উঠে বাড়ী চলে যাওয়া? নিবিল তাতে রাজি হবে না জানি, একলা যেতেও সাহস পেলুম না। তাছাড়া

নিখিলকে বাড়ী দাবার কথা বলিই বা কী করে। ছবি শুরু হয়ে গেছে। আমি শুধু কাঠ হয়ে বসে পানের পুস্তক স্টুটার ভরাবহ অস্থির সর্ব-ইন্দ্রিয় দিয়ে অহুস্তব করতে লাগলাম। পুস্তক স্টুটার বিরাট জীতি মিশ্রণে আমার শরীরকে যেন অনড় কবে দিয়েছে, এমনি বোধ হ'তে লাগলো। হাত নাড়তে পারছি না, পাছে ঐ পানের পুস্তক চেয়ারের অন্তরীণ পুস্তককে হাত দিয়ে স্পর্শ করে কেলি।

দিনেমা শেষ হলে কলের পুতুলের মতো ঘেরিয়ে এলাম। বেশ বড় আমার ভয়ও আমি পরিণাক করতে পারি। ইটার সামর্থ্য ছিল না। একটা রিকশ ভাড়া করলাম। পথে নিখিলকে বললাম, পানের স্টুটা শেষবারেও খানিই ছিল হে। নিখিল প্রায় হতভয়ভাবে বললো, তাই মাকি?...সম্ভবতঃ সে আর কিছু বলতে সাহস করলো না।

আমি এখনো ঠিক বুঝি না—যাপারটা হরিশেরই ঠাটা, না অস্ত কিছু?

সাগরপারের চিঠি

ঐদেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

এখন আমার দুধার জুড়ে
বিশাল বালিয়াড়ি ;
সকাল সন্ধ্যা আছি হেথায়—
ঘরের সঙ্গে আড়ি !

: সকাল :

ভোর না হ'তেই দিকবিদিকে
বুসার হোঁচা ঘেব কে লিখে,
মাথার ওপর আলোর মৌল—
উড়ছে ক'টা শঙ্খচিল।
সামনে সাগর ঝিলমিলিয়ে ;
চেঁটে তুলে ঘাস হুহাত দিয়ে ;
অনেক দূরের সাদা স্ফেন্ডার
হুলিহুলেদের নাও
নাচছে বালি চলচে ছুটে,
ফিরছে না একটাও।

: দুপুর :

তেউ বাঁচিয়ে নাইলিষে
ভর দুপুরে ঘরের খোঁজে।
নাওদার ব'সে আমিই বালি
দেখছি হাওয়ার উড়ছে বালি,
আপন মনে সমুদ্র
ছুটছে নেচে নিকট দূর !

: সন্ধ্যা :

হালকা সাদা মেঘের ভেলা
একটি ছ'য়ে উড়িয়ে
হিমকরানো সস্তি হাওয়া
শরীর দিল জুড়িয়ে।
উঠলো কুলে সাগরমল,
আঁধার জায়গা নামলো ঢল,

চেঁড়ের মাথার হীরের বাতি :
রঙমহলার কার বেশাতি,—
কালনাগিনীর ফণায় ফণায়
ঝিকমিকিয়ে জলে ;—
আকাশ জোড়া তারার আলো
ব্যাপ দিল সেই জলে।

এখন আমার দুধার জুড়ে
বিশাল বালিয়াড়ি ;
সকাল সন্ধ্যা আছি হেথায়
ঘরের সঙ্গে আড়ি।
মনে হচ্ছে সামনে থেকে
সারাটা দিন ডাকছে যে কে,
একটু যদি নৌকা পেতাম
দিতাম সাগরপাড়ি!



হস্তরী মুদ্রা

[উপভাস]

দেবাচার্য

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

বাড়ীটা কি একটু বেশী নিস্তব্ধ মনে হচ্ছে ? যা কোথায় ? জ্বর নিস্তব্ধ ছেড়ে গিয়েছে এতদিনে । বোধ হয় রাশা ঘরে যা । ঠাকুরমা কৈ ? ঠাকুরমা তো এই সময় ঠাকুর ঘরের বারান্দায় বসে মাটির শিব গড়েন । রূপোর ছোট্ট বাক্সে খুলে পাথরের বিব্রনাথকে বের করেন । গোল প্রস্তরখণ্ড রূপোর শিবলিঙ্গের উপর বসিয়ে পুজোয় বসেন । অনেক ফুল, বেলপাতা, চন্দন চাই, না হলে ঠাকুরমার পুজা হয় না । টোবড়ানো লালচে গালের উপর ববম্-ববম্ শব্দ করেন । পিনাকীর বড্ড হাসি পায় । মেয়েছেলেরা কেন ববম্-ববম্ করবে ? ববম্-ববম্ শব্দ শুধু গম্ভীর মিনাদী বাবার কণ্ঠেই শোভা পায় ।

ঠাকুর ঘরের দরজা খোলা । পিনাকী জুতো পরেই উঠেন দাঁড়িয়ে প্রণাম করে—খোলা বারান্দায় মাথা ঠেকিয়ে । সর্বেষবের চন্দন-চর্চিত কপাল । গম্ভীর মূখ । মনের কি ভাব ধরতে পারে না পিনাকী । সন্তুষ্ট হয় । বাবা কেন এত গম্ভীর ? এতদিন পর মেশে ফিরল, কৈ কোন কথা বলছেন না কেন ? হঠাৎ খেয়াল হয়, তাই তো অস্তায় হয়েছে—জুতো পরেই ঠাকুর ঘরে প্রণাম করলাম, বোধ হয় বাবা চটে গিয়েছেন দেই জগ্রে ।

লম্বের পুঁটলিটি বারান্দায় উপর রেখে জুতো হুলতে শুরু করে—নীচু হয়ে । ফিতেওয়ারা জুতো মহলে খোলা যায় না । পিনাকীর চোখ-কান লাল হয়ে ওঠে । বাবা নিস্তব্ধ ভাবছেন, পিনাকী কলকাতায় গিয়ে রেছে হয়ে গিয়েছে ।

বাবা ও দাদুর মধ্যে অনেক প্রভেদ। দু'জনের মধ্যে কেউই ইংরেজি লেখাপড়া শেখেন নি; তবু দাদু মোটেই গোড়া নন। কে একজন মুসলমানী যুগের নবাবের বংশধর—ঊঁর বাড়িতে দাদুর নিত্য বাতায়াত। অকশাহবিগ খনগোপাল চক্রবর্তী, আর মুড়ী, দাদু—কানির বন্ধু—তিনজন মিলে তিনটি বাঘের চামড়ার উপর বসে খেচরীমুত্রার অভ্যাস করেন—হরিণের মাংস রান্না হয়; পোলোটা, কোঠা, চণ অনেক রকম খাবার তৈরী করে রাখনা মানী। দাদু বলেন, বাও দাও, ভোগ কর—তারপর আশ্বে বৈরাগ্য। বৈরাগ্য যদি নাও আসে, কোন ক্ষতি নেই। মহামাত্রার লন্ডান আসরা, আমাদের ভাবনা কি।

যাত্রি আটটা বাজলেই দাদু যান পার্কে, অনেকবার চকর দেন, তারপর ফিরে আসেন—হাতে সন্দেশের ঠোঁক। বলেন—শালা, এখনো জেগে আসিস্—বই পড়িস্—বেশ, বেশ। এই তো চাই; বড় হতে হলে জোকের মতন লেগে থাকতে হয়।

দাদু কত কথা, কত গল্প বলেছেন পিনাকীর পাশে বসে। একদিন বলেছিলেন—জানো দাদু ডাই, আমার যখন বার বছর বয়েস, তখন আমার মা সতী হোলেন। পুলিশে ঘিরে বেথেছিল মাকে। মা বললেন তান করবো, গামছা দাও। মদীর স্রোতে দেই যে অঁপ মিলেন, আর উঠলেন না।...

তোর মায়ের চেহারার সঙ্গে আমার মায়ের চেহারার আশ্চর্য মিল—রমাকে দেবলেই আমার বুকটা ছাঁৎ করে ওঠে।...

দ্বিদিমা পূজোর ঘরে বসে আপন মনে চিন্তন ঘষে যান, কোন কথাই বলেন না। অক্ষমাদী, সাধনামাদী কেবল হাসে, বলে বাবা দ্বিদিকেই বেশি টানবে—আমরা তো মা নই—

ওগো আমার মা

দুখ ভাত খা—

মায়ের বোন মাদী

ক্যানি খাও খুঁশি।

...তাত্ত্বিক দাদু পারে হেঁটে গিয়েছিলেন কানীধার। সে অনেক দিনের কথা। রেল কোম্পানী তখনো সব জায়গায় রেল বসাতে পারে নি। দাদুর কি দাহন! বাবা, ব্রজঠাকুর, যৈব বায়—এরা দেশ ছেড়ে বড় একটা বিশেষে যেতে চান না কোন দিন। ব্রজঠাকুর বলেন—সম্মে খাচ্তে অন্ন, পরদেশে মিলিতঃ লাখি। শুধু ঘোরাঘুরি, স্নেহ-বন্ধুস্বামী—কোন ব্যাটাই ভেকে কথা বলে না যে—ব্রজঠাকুর সপ্তপত্রের নড়বড়ে বেঞ্চটা থেকে নেমে আসেন; জীর্ণ চিমটে দিয়ে

মালদার আগুন খোঁচাতে খোঁচাতে বলেন—জানো সর্বেশ্বর, একবার গিয়েছিলাম কলকাতার। তোমার খুড়ী আবার ঐ সেশেব ঘেঁষে কিনা, শ্রীরামপুরের দিকে আমার বস্তুরবাড়ী, তা জানো নিশ্চয়।

সর্বেশ্বর মাথা নেড়ে বলেন—হ্যাঁ, শুনেছি যটে।

অক্ষয় পোদ্দার কোণে বলে শূত্রের কলকে দুই হাতের মূঠোর মধ্যে রেখে, গাঁজাখোর যেমন গাঁজা টানে সেই ভঙ্গিতে ঈষৎ উর্ধ্বমুখী হয়ে ভামাক টানছিল। হঠাৎ বন্ধবন্ধু ক'রে কাশতে শুরু করে। কলকেটা বেড়ার কোণে উপস্থিত করে রেখে দেয়। এগিয়ে এসে হাতপা নেড়ে বলে—কোণলা ধাতের ঠাক দিয়ে কথাগুলো তীক্ষ্ণতীরের মতন পিনাকীকে বেঁধে—উঃ কর্তা, সে কি নাথি! এহনো বাস্তাটা টাটার ওঠে মাঝে মাঝে—অমরাবন্তে পুণ্যমেয়—দোলা গোরা গার্ডসাহেব—তা আমার দোষ কি—ঠাউরমা কলেন—পোদ্দার, এই গাড়ীডের গদীও নেই, বেশ ঝাড়া ঝাড়া মনে হচ্ছে—দুই পাশে তরকারির বুড়ি, তা থাক্গে মোনে, আমরা মাঝখানটার মা-কের পন্থ ব'লে জাযানে। দরজা খোলা দেহে গুঠলাম্।

সর্বেশ্বর হাসতে হাসতে বলেন—তারপর ?

তারপর আর কি ; গার্ডসাহেব—লালমুহো হুহুমান—এ্যাএয়ে আগুনি পোড়া লোহার মোতোন রোং মুহিব—আ-সে দোমাসোন্ নাথি। আমি আর ঠাউরমা—দুইজনে মড়াঅড়ি এসে কাশতি থাকি, আর ও বেটা কেবোলি নাথি মারতি আছে—জুতোর আগা দিয়ে ;—হু-বুহু-ভ্যাম্ ইস্টুপিড—কত কি করে যায়—আমরা বুঝতিও পারিনে, ক-অনে মোড়োর যাবো তাও জানিনে। ঠাউরমার পর চোটটা বেশী নাগে নি, আমিই গাম্‌নে ছেলাম্ কিনা !...

দাদু বলে, পিছুতাই, যদি লেখাপড়া শিখে ভাল ফল করতে পার তাহলে একদিন দি. আর. দাস, ডিলকের মত তোমার সমান হবে। লেখাপড়া করে বেই, পাড়ী বোড়া চড়ে সেই। পিনাকীও পাঠ্যপুস্তকে পড়েছে, অরণ হয়। কুপমণ্ডুক হয়ে থেকো না, তাহলে তোমার বাবার মতন—বলেই দাদু খেবে গিয়েছিলেন, নিশ্চয় জেবেছিলেন ছেলের নিকট বাবার নিম্নে করা উচিত নয়। পিনাকীর মনে সংশয় জাগে—দাদুর কথা কি ঠিক ? বাবা কি কুপমণ্ডুক ? বিলেত গিয়েছিল কালীগঞ্জের ভট্টচাঁদদের মেজো জামাই। সেই থেকে বাবা ছেড়ে গিয়েছেন ওবাড়ীর পৌরোহিত্য। ওবাড়ীর নকে আর কোন সংজ্ঞাবই রাখতে যেন নি গ্রামের সমাজকে। পিনাকীর বাবাই সমাজ-পতি। পিনাকী একবার ডরে ডরে বাবাকে অিগোপ ক'রবে জেবেছিল—বাবা, বিলেত গেলে ম্রাত যার কেন ? কিন্তু বাবার গম্ভীর মুখ দেখে আর সাহস করে নি।...

বাবা, বাবা যেন কি রকম অন্তত লোক—এমন যে পিনাকীর মা সাজতে, সাজাতে

ভালবাস্তেন, কতরকমের বিহুনী বানিয়ে দিতেন, পাড়ার মেয়েদের বউদের—কত শখ মার মনে। ঘর সাগিরে রাখবেন মনের মতন—হুন্দর করে—কিন্তু ঘরের দেওয়ালে ছবি টাঙাতেও বাবার আপত্তি। মায়ের ছেলেবেলাকার বন্ধু কে একজন একটা ফুলদানি উপহার দিয়েছি যাকে। হুন্দর ফুলদানিটা, দুটো সিংওয়াল হরিণের মাথায় গন্ধরাজ ফুল তুলে ফুলদানি সাগিরে মা রেপেছিলেন বাবার ঘরে, কুন্দুরীর উপর। সাধনা মাদীর কাছে গল্প শুনেছে পিনাকী, মা কিন্তু কিছু বলে নি। বাবা ফুলদানিকেও বিলিভী কারদা মনে ক'রলেন কেন, বুঝতে পাবে না পিনাকী। ফুলদানি—ফুলদানি আবিষ্কার করেছে কে? কোন্ দেশ?...

—মা, ওমা—তুমি কোথায়?

ঢেঁকি ঘরে মে বাড়ীর বউ, রাহাদের পিনী, দস্ত বাড়ীর জোঠী—চিঁড়ে কুটছে, পিনাকীকে দেখে কান্ন বন্ধ করেন। রাহাদের থেকে বেরিয়ে আসে হরিরাম ভট্টাচার্য্য বউ, পিনাকী তাকে সম্বোধন বলে ডাকে। একবার ছেলেবেলার পিনাকীকে সম্বোধন যেতে দিয়েছিলেন—মেই থেকে পিনাকীর সঙ্গে সম্বোধন'র ভাব—ক্রমশঃ আম, ভালশাস, আমসবের আখাদের মধ্য দিয়ে ভালবাসা বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রতিদানে পিনাকীর মা অবশ্য অনেক কিছু সাহায্য করতেন, সময়ে-অন্যসময়ে টাকাও দিয়ে সাহায্য করেছেন। বড় লোকের মেয়ে বলে পিনাকীর মার খ্যাতি ছিল গ্রামে, বিয়ের প্রথম বৎসর কি এসেছিল সঙ্গে। কত কি দানদায়গ্রহী; বড় কবিরাজ মেয়ের বিয়েতে খরচ করেছিলেন অনেক। অনেক বৎসর বাবত কন্ডাকে প্রতিভাহুন্দরী নিরমিত মাসোহারা পাঠাতেন। ভামাই ও শব্বরের মধ্যে ক্রমশঃ মতবিরোধ বেড়ে চললো। সর্বশব্বরের তীব্র বাহোক্তি সহ করতে না পেরে ওমা মাকে নিবেদন করে দিল মাসোহারা পাঠতে। বৃদ্ধিমত্তা কন্ডার নিবেদন অমান্ত করেন নি প্রতিভাহুন্দরী!

পিনাকীকে যে বড় ভামাই শব্বরের আশ্রয়ে পাঠাবে কোনদিন—প্রতিভাহুন্দরী তা আশা করেন নি। গোড়া সর্বশব্বর বিলিভীর নাম-গন্ধ সহ করতে পারেন না, তবু কেন জানি কি ভেবে ছেলের লেখাপড়ার ব্যাপারে নিজের মতটাকেই প্রাধান্য দেন না তিনি। টোলে-পড়া থিয়ে নিয়ে আর পেট-চলে না আজকাল। ইংরেজ দেশের রাজা, তাব ভাষা রাজভাষা—রাজভাষা! না শিখলে আর চলবে না। পিনাকীর মায়ের পোপন ইচ্ছাটাই সর্বশব্বর মেনে নিয়েছিলেন নিভান্ত অহুপায় ভাবে।

সম্বোধন'র মুখের দিকে চেয়ে পিনাকী প্রশ্ন করে—মা নেই রাহাদের? ঠাকুমা কোথায়? ঠাকুমাও নেই? কোথায় ওরা? তুমি—তুমি?...

—আমি আজকে তোমাদের ঠাকুরের যাত্রা করব। তোমার মায়ের অস্থ, বিছানা ছেড়ে উঠতে পারেন না, তোমার ঠাকুরারও আজ তিন দিন জ্বর। বাড়ীতে সানু জাল দেবার লোকও

নেই। তাই তোমার দাশ পাঠিয়ে দিলেন আমাকে। এ কয়দিন তোমার বাবা নিজেই হাত পুড়িয়ে রাখা করছিলেন কিনা। ব্যাটাগুলো কি রোগ রোগ হাঁড়ী ঠেসতে পারে? তাছাড়া তুমি আসবে, তাই তোমার মা—

মা কোন্ ঘরে শুয়ে? পিনাকী হতভম্ব হ'য়ে শুয়েছিল। মা, মা কতদিন বিছানায়? একমাসের উপর! কি অসুখ? অতদিন ধরে তো ম্যালেরিয়া জ্বর থাকে না। জ্বর, বিকলের দিকে জ্বর আসে, হাড়ের মধ্যে ব্যথা, পাঁজরের মধ্যে তীব্র বেদনা অসুস্থত্ব করেন। শরীর ক্রমশঃ শীর্ণ, কঙ্কালসার হ'য়ে আসছে। পাড়াগারের ঠাতুড়ে ডাক্তার কত আঁর জানে, শুধু বলে—বারাণ কোন রোগ হয়েছে, কলকাতায় নিয়ে যাওয়া দরকার। ঠিক যে কি রোগ বলতে পারে না কেউ এখনো। সম্বেশদি'র কাছ থেকে এক নিঃশ্বাসে সব কথা জানতে চায় পিনাকী। তারপর দৌড়ে উঠনের উপর দিয়ে উত্তরের ঘর লক্ষ্য করে। খেমে বার হঠাৎ সিঁড়ির কাছে এসে। মা যদি ঘুমিয়ে থাকে—না ওঠানই ভাল। আশ্বে—অতিশয় সন্তর্পণে—পা টিপে টিপে অগ্রসর হয় পিনাকী। (ক্রমশঃ)

তুমি আমার বন্ধবে কি মা?

শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

বাঘল হাওরায় কদম কোরক ফুলছে মাগো! গাছে,
পেখম তুলে পথের ধারে ময়ূরগুলো নাচে।

আকাশ পথে কামল মেঘে

কে যেন মা থাকে হেঁকে

শালের বনে সাঁওতালীদের হর্বে মালি বাজে।

বাঘল ধারায় বদছে কত কেরাকলের রেণু,
মাঠের পরে বাগছে দূরে রাখাল ছেলের খেণু।

তুফান আগে নদীর বৃকে,

ফুলছে তরী বাকের মুখে,

আল কিছুতে যায় না মন,—পড়তে মিছে পেস্ত।

তোমার খোঁকা বোকার মত চুপটি করে রয়,

মেঘের ডাকে উঠছে কৈশে ঢালাক চতুর নয়।

আমার মত বৃদ্ধি গোলে,

থাকতো নাকো তোমার কোলে,

ভিজতো জলে, দূর করে তার জুজু বৃড়ির ডর।

এমন দিনে ঘরের ভেতর কেমন করে থাকি,

ভাসিয়ে দেবো কলার তেলা শেতের জলে রাখি।

তুমি আমার বন্ধবে কি মা,

বারো নাকো ছাড়িয়ে সীমা,

আড়াল হোলে বদছে কেন আমার ডাকাডাকি।

ছোট্ট একটি ঘড়ি—

শ্রীসতীকুমার নাথ...

তোমার হাত ঘড়িটা বা-হাতের কবজির সঙ্গে জিতে দিয়ে বাঁধা। তুমি যেখানেই যাও, সেও তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকে। এ যেন ঠিক একজন সঙ্গী। সত্যিকার সঙ্গী বন্ধু মত। সে তোমাকে বলে দিচ্ছে, কখন কী করতে হবে, না হবে। ছোট্ট ঘড়ি হলে হবে কী? দেখ না, তার কত কেরামতি! সত্যি, অবাধ লাগে, অতটুকু ঘড়ি তার আবার একশ পকাশ রকমের কলকল। খালি চোখে এর কলকল সহজে ধরা পড়ে না। এক ধরনের কাচ আছে যা চোখে লাগিয়ে ওসব দেখা যায়।

ঘড়ি কী করে চলেছে? সম্মিলেই ঘড়ি চলে। সম্মিলন কুরিয়ে যায়, সে তখন অচল হয়ে পড়ে। ছোট্ট ঘড়িটা কোথায় তৈরী হয় জানো?

হুইজার ল্যাণ্ডে। এই দেশের জলহাওয়াতেই ছোট্ট ঘড়ির যন্ত্রপাতি তৈরী হতে পারে। বড় বড় ঘড়ির যন্ত্রপাতি সব দেশেই তৈরী হয়ে থাকে।

অনেকদিন আগের কথা—

একদিন বিখ্যাত বিজ্ঞানী গ্যালিলিও দেখলেন, এক গির্জার মাথার উপর একটি বাতি জ্বলছে। এই বাতির দোলনা দেখে তিনি আবিষ্কার করেন ঘড়ির পেণ্ডুলাম বা সোলক।

ঘড়ির সময়কে মিল রাখী স্বর্ষ গঠার সঙ্গে। সব জায়গায় স্বর্ষ কিন্তু একই সময় ওঠে না। তাই ঘড়ির সময়েরও অনেক অমিল থাকে। যেমন, জাপান এ দেশের অনেক পূবে। সেখানে স্বর্ষ ওঠে অনেক আগে। জাপানের ঘড়িতে যখন ছ'টা, তখন আমাদের ঘড়িতে ছ'টার অনেক কম। আবার তেমনি ভারতের পশ্চিমে যে-সব দেশ, সেখানে দেখা যাবে তখন রাত-দুপুর। এতে অহুবিধে বৈকি! এই কারণে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ের গতি বেঁধে দেওয়া হয়েছে। একে বলে 'টাইম-জোন'। সব দেশের সম্মতি নিয়ে একটি আন্তর্জাতিক সময়ের রেখা টানা হয়েছে। থাকে ইংরাজীতে বলে—ইন্টার্নাশনাল ডেটলাইন।

আজ যে ঘড়ি আমরা দেখি, আগের কালে কিন্তু তা ছিল না। তখনকার দিনের কয়েকটি নামকরা ঘড়ির নাম উল্লেখ করছি : চায়াঘড়ি, বইঘড়ি, জলঘড়ি, বালুঘড়ি, মোমবাতি ঘড়ি ও স্বর্ষঘড়ি। স্বর্ষের গঠা-নাচা নিয়ে এর সময় ধরা হত। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক নিউটন স্বর্ষঘড়ির প্রবর্তক। রেলওয়ে ইন্সট্রমেন্টে, বড় বড় কলকারখানায়, অফিসে যে ঘড়ি দেখি। সে ঘড়ি হ'ল বৈজ্ঞাতিক ঘড়ি। বিদ্যুতের সাহায্যে চলে বলে এর নাম বেওয়া হয়েছে বৈদ্যুতিক ঘড়ি। প্রথমে লণ্ডনে একদশে ১০৮টি বৈদ্যুতিক ঘড়ি প্রাথমিক পরীক্ষা করা হয়েছিল—১৮৭৮ খৃঃ অব্দে।

আমরা কালের হবিধার জন্ত ঘড়ির সময়কে ভাগ করে নিয়েছি। সব কিছু আমরা করছি ঘড়ির সময় বেধে।

ভাবতেও যেন কেমন মনে হয়, যেখানে অন্ত ঘড়ি আছে, সেখানে সব ঘনি ভাঙচুর হয়ে যায়, তবে কী হবে?

কী আর হবে! সব কিছু একাকার, তালগোল পাকিয়ে ভীষণ বিশৃঙ্খলা ঘটবে—যেন হু কাম্পের মত ওলট-পালট। কে কোথায় কখন কী করছে-না-করছে, তা কিছুই ঠিক থাকবে না—সব এলোমেলো, গোলমাল হৈ চৈ।

সব কিছু নির্ভর করছে ঐ ঘড়ির কাঁটার উপর নয়?

ঘড়ির কাঁটা একটু এদিক-ওদিক হলেই সব এলোমেলো হয়ে যায়।

আকারে ঘড়িটা ছোট্ট হ'লে হ'বে কী!

ফুলের মাঝে নিভু

নিরঙ্কুশ

শিউলি পড়ে ঝির-ঝিরিয়ে
কাঁপছে পাতা ধর-ধিরিয়ে;
উত্তল আছি চতুরদিক
গলা ছাড়ে গাঙ্‌শানিক।

গোলাপ তোমার গল্প আমি
অনেক শুনেছি
তাই তো আলাপ করতে হেথা
ছুটে এসেছি—

কওনা কথা চুপ্‌ কেন তাই
নাড়ছ মাথা, কথাই যে নাই
আলাপ কি হয় চুপ করে—
ও গোলাপ, ও গোলাপ রে।

হাসমুহানা, শুধু না-না
করছে সে—

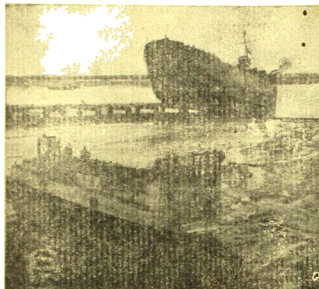
ভয় পেয়েছে, ছোট্ট যে;
সবুজ পাতার ফুলঝুরি,
ফুলের মাঝে ফুলপরী

ছলেছে কেবল দোহুল-ছল
ঝুম্‌কে! ঝুম্‌র সবুজ ফুল।

কাঁপছে চাঁপা ডালেতে
ঝিলিক্‌ দিল আলোতে
সোনার মুকুট মাথায় পরে
বৌ চলেছে স্বপ্নের ঘরে।

জোয়ার-ভাটার ইন্দ্রজাল

শ্রীনীগোপাল চক্রবর্তী



ইন্দ্রজাল বৈকি !

ইন্দ্রজাল হচ্ছে বাজুবিজ্ঞা,
ম্যাজিক—এই আছে, এই
নেই !

জোয়ার-ভাটাও বেন
আ না দে র ম্যাজিক
দেখায়। সমুদ্র থেকে বহু-
দূরে দাঁড়া বাস করে, তারা
এই ম্যাজিক দেখে অবাক
হ'য়ে থাকে। কালীঘাটের
আশি-গঙ্গার জোয়ার-
ভাটা দেখে অবাক হতে
আমি দেখেছি। জোয়া-
দের মধ্যে দাঁড়া স্তম্ভবন
অকলের নদীতে গিয়েছ

কোন দিন, তারা এই ইন্দ্রজাল দেখে থাকবে। তুমি নৌকার বাজু নদী দিয়ে শোভের টানে দক্ষিণ
দিকে। বেতে বেতে হঠাৎ দেখবে, তোমার সমুখে—দূরে নদী একেবারে জলন্ত। দেখানে
নৌকাগুলি পাকের উপর আটকে আছে। কোন নৌকা বা আটকে আছে গাছের ডালে !

তুমি একটা ঘুম দিয়ে নাও। ঘুম থেকে উঠে দেখবে, সে নদীই নয় বেন।—কুলে কুলে
ভরা জল, কত বড় বড় নৌকা চলছে গাল খাটিয়ে !

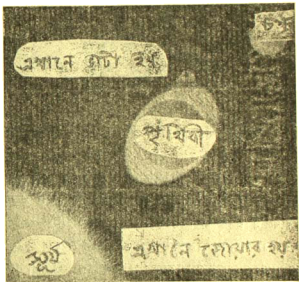
সমুদ্র জলে প্রতিদিনই কোন না কোন সময়ে এই ঘটনা ঘটেছে। সমুদ্রের কাছাকাছি
নদীগুলিতেও সেইজন্য ধরা-ছোঁয়ার এই লুকোচুরি খেলা চলে। কখনও কখনও জোয়ারের জল কয়েক
হাত উঠে ছুটে আসে। তখন লাখখানেক থাকতে হয়। নদীর কিনারায় কোন নৌকা থাকলে তা
স্তম্ভে চূরকার হ'য়ে যেতে পারে। কলকাতার নীচে গঙ্গায় এই জোয়ার-ভাটা নিয়মিত দেখা যায়।

ছবিতে জাহাজখানি ঘেঁষে মনে হতে পারে দুর্নিবাত্যার গুটিকে ঐ ভাবে কিনারায় এনে
কেলেছে। কিন্তু আসলে তা নয়। কয়েক বর্গটা আগেও এই জাহাজখানি গভীর জলে ছিল।

তখন ছিল জোয়ার, এখন ভাটা। তাই জাহাঙ্গখানি এখন একেবারে ডাঙ্গায়! আবার কয়েক ঘণ্টা পরে জোয়ার আসলে এই জাহাঙ্গখানিই ধুঁধা উড়িয়ে রওনা দেবে তার গন্তব্য-পথে।

শৌরমণ্ডলের ছবিটি দেখলে বুঝতে পারবে কি করে চন্দ্র ও সূর্য পৃথিবীর বৃকে জোয়ার-ভাটা ঘটায়। চন্দ্র-সূর্য উভয়েই যেন বিরাট চুষক। এরা পৃথিবীকে এবং পৃথিবীর বাবতীয় পরার্থকেই নিজের নিজের দিকে টানে। তার ফলে পৃথিবীর যে যে অংশ চন্দ্র ও সূর্যের কাছাকাছি, সেখানকার সমুদ্রের উপরিভাগ টেপে ওঠে, আর অন্ত্র অংশগুলির সমুদ্র-স্তর যায় নেমে। সূর্য পৃথিবী থেকে বহুদূরে আছে বলে তার আকর্ষণটা তত প্রবল নয়; কিন্তু চন্দ্র পৃথিবীর খুব কাছে বলে তার আকর্ষণ সূর্যের আকর্ষণ থেকে প্রায় দ্বিগুণ।

পতীর সমুদ্রে জোয়ারের জল তিন-চার ফুটের বেশি উঠে হয় না, কিন্তু উপস্থলের নিকটে ত্রিশ-চল্লিশ ফুট পর্যন্তও উঠে হ'তে দেখা যায়। জুম্বা সাগর আর কক্সাগরে জোয়ার হয় না। কখনও কখনও জোয়ারের জল নদী-মুখে প্রবেশ করবার সময় খুব উঠে হ'য়ে প্রবলবেগে অগ্রসর হয়। তখন তাকে 'বান ডাকা' বলে।



কেশবচন্দ্র : বালা রামমোহন রায়ের দুত্ব গ্রিক তিন বৎসর পরে ভারতের মহোচ্চলকারী বাখা, মহাজ্ঞা ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের ১১শে নভেম্বর কলিকাতার কলুটোলা নামক জায়গায় বিখ্যাত সেন বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম গ্যারিমোহন সেন। বঙ্গদ্বন্দ্ব, শিঙ্গা মথছে, নারীজাতির উন্নতিসাধনে সারা জীবন তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। ব্রহ্ম ধর্মবিশ্বাসের মতো, পত্রিকাগুলি পরিচালনা করে এবং অনেক বই লিখে তিনি আমাদের লম্বাঞ্জলিকদের বহু পরিচরিত্র এনে দিয়ে গেছেন। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই জানুয়ারী সকাল ১২টা ১০ মিনিটের সময় মাত্র হেডলিগ বয়সে তিনি দেহত্যাগ করেন।



হলঘরের টঙ-এর উপর থাকি—একদিন সন্ধ্যার বকুতা হচ্ছে : শুনে পেলাম একজন ভদ্রলোক 'জীবে দয়া' নামে ক'টি' স্বত্বকে কী সব বলছেন। জীবে দয়ার মধ্যে প্রথম জীব হচ্ছেন 'মাতৃঘ'—'সবার উপর মাতৃঘ বড় তাহার উপর নেই' এ কথাও শুনলাম। শুনে হাসি পেলো। যেমন হেসে ফেলেছি ইত্তরগুলো টের পেয়ে গেল আমি বাপটি মেয়ে বলে আছি। আমার বাবু পুখে রেখেছেন ইঁদুর মারা ও চড়াই তাড়াবার জন্ত। বলতে পারো—এটা আমার চাকরী ; কারণ সরকারী নথিপত্র, কিতাব, দস্তখত প্রভৃতি ইত্তরের কুটকুটে দাঁতের থেকে রক্ষা করবার জন্ত আমাদের দুপ দিয়ে শোবা হচ্ছে। তাহলে নিশ্চয়ই আমরা সরকারী চাকর। কারণ বাজেটে আমাদের দুধের বরাদ্দ আছে। তবে সবটাই কি আমরা পাই ? সে কথা থাক।

একদিন তো আমি হান্না দিলাম এক ইঁদুরের বাড়ি। প্রকাণ্ড একটা আলমারীর মধ্যে একটা তাকের উপর বেধি তাদের সংসার ; কাগজ কেটে রাপ করেছে। আমার গন্ধ পেয়ে বাপ-মা চম্পট দিয়েছে—গোটা পাঁচ ছয় ছেলেমেয়ে দেখানে ; কাগজ কেটে তাদের জন্ত খুব নরম তোনোক বানানো দেখলাম। লাল লাল পোকের মতো বাচ্চাগুলোর চোখ ফোটেনি তখনো ; ঝাড়ুদার এলে তাদের নিয়ে পেলো কোথায় তা জানিনে। খানিক পরে দেখি তাদের আলশেতে বসে কাকগুলো সেই বাচ্চাদের ঠোটে করে এনেছে ; পা দিয়ে চেপে ঠোট দিয়ে হিঁড়ছে। জীবে দয়া শিখাটা কেবল মাতৃঘের জন্ত !

তার পর দিন দেখি—ইহর স্বামী-স্ত্রী সেই জায়গাটার ঘর ঘুর করছে—তেড়ে বেতেই অদৃশ হয়ে গেল; মনে হলো ছেলেমেয়েদের খুঁজতে এসেছিল।

আমার ছোটবেলার কথা—মা-বাবাকে মনে পড়লো। আমার বাবার নাম হলো—কালোব-শামীর মেশানো তার চেহারা : 'মা ছিল সুন্দরী—শাদা ধবধবে মেহের উপর কালোর দুই একটা ছোপ। আমার তাই-বোনদের মধ্যে আমিই হলাম মিশ্র কালো—গায়ে শাদার ছিটে ফেটা নেই। মা আমাদের চারজনকে নিয়ে কি করবে, কোথায় বাবে ভেবেই পার না। মা শুনে এসেছে ছোটবেলা থেকে হলোরা বাক্সের মেরে ফেলে। বোধহয় খাণ্ডগমস্তার ভয়ে তারা এটা করে। কেন তোমাদের মাহবুবা তো বুড়ে লাখে লাখে লোক পাঠিয়ে কিছু ফালতু লোক শেষ করো—তা মা-হলে আরও খাণ্ডগমস্ত হতো। হলঘরে বাবুর কাগজ পড়েন শুভেত পাই তো। আবার দুই হবে শুনিছি, এই তো দশ-বার বছর আগে হয়ে গেলো; ফালতু লোক কিছু সাবড় কববার মস্ত আবার ব্যবস্থা হচ্ছে। হলোবাও বোধ হয় আমাদের জাতের মন-দংখ্যা কমাবার মস্ত বাক্সদের মেরে ফেলে।...মা তো ভয়ে অস্থির। এ-বাড়ি দে-বাড়ি করে আমাদের নিয়ে কোথাও তো রাস্তির থাকে না—বদি হলোরা সম্মান পায়। একটা বাড়িতে আশ্রয় পেলাম ঘুঁটের ঘরে। মা কোথা থেকে খাবার এনে এনে খাওয়ায়। চোখ ফুটলো, মগধটাকে দেখতে পেলাম। ঘুঁটের মধ্যে থেকে উকি মেরে দেখি জানলা দিয়ে আলো দেখা যায়। একটু একটু করে বের হই; ঘুর ঘুর করে এ-ঘর ও-ঘর করতে আরম্ভ করতাই—বাড়ির লোকদের চোখ গেল আমাদের উপর। ছোট একটা মেয়ে এসে আমার পে বোনটা দেখতে ধপ ধপে ফর্সা তাকে কোলে করে নিয়ে গেল কোথায়। আমি বেচারী কী করবো ভাবছি, এমন সময় বমদুত পানা একটা লোক এসে ঘাড়ের কাছে ধরে নিয়ে গেল বাবুর কাছে। বাবু দেখেই তো তেলেবেগুনে জলে উঠলেন—'আরে আরে কালো বিড়াল—অপয়া অপয়া ঘুর করে যে, ঘুর করে যে।' আমি কী করবো, কী বলবো ভেবে পাচ্ছিলাম। বমদুতপানা লোকটা আমার ঘাড় ধরে উঠ করে নিয়ে চললো—জানলা দিয়ে গলিয়ে ফেলে দিল। পড়লাম প্রায় দশ হাত নিচে বাগানের মধ্যে। আমাদের বডই ফেলে দাও—আমরা ঠিক চার হাত-পায়ে দাঁড়িয়ে বেতে পারি। বৈতে পেলাম, কিন্তু বাবো কোথায়। পাড়ার ছেলেদের কেউ কাকর ছোড়ে, কেউ ঢিল মারে। ছুট দিলাম, ঢুকলাম একজনদের বাড়ি। যেমন ঢোকা ছেলে-মেয়েদের দল ছুটে এলো—ধরলো আমাকে। দুখ দিল খেতে। একটি ছোট মেয়ে বললে, 'তুই আমাদের বাড়ি থাক।' আমি বললাম, 'তা থাকবো, কিন্তু আমি যে কালো বিড়াল—অপয়া; আমি থাকলে তোমাদের অমঙ্গল হবে।' এই কথা শুনে কলেম-পড়া বড় মেয়ে হেসেই খুন। 'কালো বিড়াল অপয়া কে বলেছে তোমাকে?' আমি বললাম, 'ঐ তোমাদের বি-ব্রকের এক বাড়ির

বাহু।' এমন সময় বাড়ির গিঁদী এসে হাজির। তিনি মেয়েদের ধমক দিয়ে বললেন, 'আঃ কালো বিড়াল, অপরাধে অপরাধ। বের করে বের।' একজন ছেলে পাশের ঘরে পড়ছিল, সে এসে বললে, 'মা তুমি বিখাদ করো? কালো বলে বিড়ালটাকে তুমি অপরাধ বলছো কেন? কিন্তু মা কালী তো কালো, কৃষ্ণ কালো; তাদের সেবলে বলা পুণ্য হয়—অপরাধ বলে না তো। মা দুর্গার কাছে শাদা পাঁটা তো বলি হয় না—সেখানে তো কালো মিশমিশে পাঁটা—চাই; আর বিড়ালের বেলায় কালো বলেই তোমাদের আশক্তি; খুকুর কোলে কেমন বসে গদ্ব গদ্ব করতে। রেখে দাও।' মা তঁাকিয়ে বলে উঠলেন 'বাপু, তো'রও বিদ্বে—আমরা কি বিড়ালকে ঘেঁষা করি? তা তো নয়—মা দ্বীপের বাহন বিড়াল—তবে তা কালো বিড়াল নয়।'।

কোথা থেকে পুরোনো কি এসে হাজির। সে বললে, 'হাম রাম! কালো বিড়ালের হাড় স্তন্যাক তিনিস। গাঁয়ে কারো সর্বনাশ করতে হলে কালো বিড়ালের হাড় ভিটের ঝেলে দেয়। ওদুং ডালো নয়।' কলছে-পড়া ছেলেটি বললে, 'এক সময়ে ঘুরোপে বিড়াল পোড়ানো হতো : পোড়া ধোঁয়ার মধ্যে দিয়ে ভেড়ার পাল নিয়ে গেলে তাদের রোগ হতো না, ভাইনীতে ধরতো না।'।

কথাটা শুনে আমি আন্তরিক উঠলাম—ভাষ্য পুড়িয়ে মারতো! ছেলেটা আবার বললে, 'ভাইনীরা বিড়াল মৃত্তি নিয়ে ঘুরে বেড়ায় জেবেও পোড়ানো হতো।' আমি ভাবছি, আমাকে কালো বিড়াল বলে এরাও তো তাড়াতাড়ি—এরাও তো ভাবে আমার অপরাধ। তবে বাই কোথা! হুনিয়ায় কি আমার স্থান কোথাও নেই!

এমন সময় কে এসে ঘাড় ধরলো :

আবার ঘাড় ধরে বের করে দিল, খুকুটা কানতে লাগলো। তার মা তাকে এক ধমক দিলেন, রাতদিন খুকুর বিড়াল নিয়ে টানাটানি। খুকুলাম বাড়িতে আছেন আমাদের ভাত শক্ত।

পথে বের হলাম—আনাচ-কানাচ দিয়ে বাজি—আত্মকুড় থেকে খাওয়া জুটলো, কিন্তু চারদিকে খুকুরের ডাকে প্রাণ কেঁপে উঠলো। হঠাৎ কয়েকজন ব্রহ্ম-পরা ছুটুফুটে বেয়ে ছুটে এসে আমার ধরে নিয়ে চললো। আমি ভাবছি এ আবার কী—আবার কত ঘরগা কপালে আছে—কালো বিড়াল আমি অপরাধ—আমার কারাকাটি কারো কানে গেলে, তার দিনটা হবে অন্তত। এরা আমাকে পোড়াবে না তো।

যেহেঁচকি টাংকার করে বলে উঠল, 'ওমা, মা, দেখো কি হৃদয় বিড়ল, মিশমিশে কালো। তুমি বলে ছিলে কালো বিড়াল খুব পয়হস্ত।' যেহেঁচকি হুব করে বললে, 'মা আমার একে পুনবো।—তুমি এসে দেখো না। একেবারে মিশ কালো—কোথাও শাদার বোঁটা নেই।' মা এসে পড়লেন : এসেই আমাকে কোলে তুলে নিয়ে বললেন, 'বাঃ বাঃ—পাদরী সাহেব খুব খুশি হবেন।' রয়ে গেলাম সেখানে।

আমার সঙ্গে একটা বেতের চেয়ার এককোণে দিয়ে বলে দিল যে, এখানে যেন শুই। গলায় লাগ কিতে বেঁধে দিল ; ঘেরে গা গা দু'ছিয়ে বুকশ করে দিল ! আমি ভাবলাম এ কী হলো—কোথায় ছিলাম—কী ভাবে জীবন কাটাচ্ছিলাম, আর এ কী পেলাম। কিন্তু সন্ধ্যার আগে আমাকে একটা খাঁচার মতো বড় ঘরে আটকে দেওয়া হলো। গুনতে পেলাম পাদরী সাহেব বসছেন, 'বিড়ালকে রাতে ছেড়ে রাখতে' নেই—তা হলেই তারা বুঝে যায়—ঘুরে ঘুরে বেড়ানোর অভ্যাস হয়। আমি ভাবলাম—তা বেশ, রাতটা এর মধ্যে থাকবো—তাতে আর কি হয়েছে। এতো আদাম, এতো আদর তো কখনো পাই নি।

ভাবলাম, 'জারামে দিবস বাবে।' কিন্তু অগস্ত্যর কশালে অনেক দুঃখ, পাদরী সাহেব বদলী হয়ে গেলেন দূর দেশে—জাহাজ কোম্পানির লোক কিছুতেই বিড়াল নিতে দেবে না। একদিন শুনিছি বাবার ঘরে কথাবার্তা হচ্ছে—সাহেব বললেন, 'এরা ভিণ্ডুবিয়ান রোগের বাহন' অফিস থেকে বললো, 'মশায় আপনারা Pet বলেন, ওরা তো Pest—মহামারীর বাহক। তাঁদের সঙ্গে তর্ক করলাম কিছু হলো না।' সকলেই খুব দুঃখিত—কি করবেন ভেবে পাচ্ছেন না। তারপর কি করে অফিসে চাকরী পেলাম সে কাহিনী আর একদিন শোনাব।

হাস্তাকর : কানাই খুঁড়া খুবই চালাক লোক। বাড়িতে চাষি দিয়ে এসে পাড়ায় হারাপবাবুর বাড়ি দাঁবা খেলছিলেন। একজন ছুটে এগে বললে, "খুঁড়া, খুঁড়া তোমার বাড়িতে যে আগুন লেগেছে।" খুঁড়া খেলায় মত্ত ছিলেন, ব'ড়োটা টিপে একটু হেসে বললেন, "ওহে. ঘরের চাষি আমার কাছে বেওয়া আছে ; তুঁরি আমাকে এমন ভোলা লোক মনে করো না—বলি, আগুন চুকবে কোথায় ?"

নৌকোর ঠালা মাল ও কিছু লোকজন চলেছিল নদী-পথে। কিছুদূর যেতে যেতে একটি আহাভের ডেউরে নৌকাটির অবস্থা এমন কাহিল হ'ল যে ডুবে যায় বুকি। এমন সময় একজন বললে, "বজ্র বেশী বোকাই হয়েছে, কিছু মাল না হয় এগে ফেল দেওয়া দাক।" এই কথা শুনে একটি বড় বোকার মালিক এক গোয়ালো বোকাটিকে মাথায় করে উঠে দাঁড়াল। লোকে কারুণ দ্বিজ্ঞান্য করায় সে বললে, "তবু যদি নৌকাখানা একটু কম ভারী হয়, তাই বোকাটা মাথায় করে নিলাম।"

গৌর খেজুরে ভাই

শ্রীরাজকুমার মুখোপাধ্যায়



ভগ্নিপাড়ার দীলিপকুমার
বাগের একটি ছেলে ।
পাড়ার পাড়ার বাড়িতে বাসী
বেড়ায় কেবল খেলে ।

পিতার মৃত্যু হলো
অনেক টাকা গেলো
দীলিপকুমার ঠিক করিলো
বাগের বাসী ফেলো ।
কুড়ুমীর পে করবে বেকর্ড
খেজুর গাছের তলে ।

খেজুর তলায় দীলিপকুমার
মাদুর পেতে শুয়ে
গানের পরে বসলে মাছি
তাড়ায় না পে ছুঁয়ে ।

ভাবলো পাড়ার লবে
হয়তো বা ভাই হবে
সেবতা এসে স্তর করেছে
ছেলের মেহের পরে
তক্তি করে পূজার থালা
সাবার ধরে ধরে ।

কেউ বা বাগরায় মশেন ছানা
কেউ বা বাগরায় সর ।
কেউ নিয়ে বা পায়ের ধুলো
মাঝার মাঝার পর ।

মুখের ছানা সর
থাকে ঠোঁটের পর
কষ্ট হ'বে দীলিপকুমার
নাড়বে না ভোঁ মূখ
(যদি) মুখটি নেড়ে খেতেই হ'বে
কুড়ুমীর কি মূখ !



কেউ থাকে না যখন পাশে
দীলিপকুমার চায় ।
কষ্টে অতি হাত বাঁড়ায়ে
খেজুর মূখে খায় ।

দীলিপ মা'কে দেখে
বললো নিতাই বৈকে
“দীলিপ মামার শিয় হ'বো”
বললো পিতার ডেকে :
কি হ'বে আর পাঠশালাতে
শেলেটে আঁক এঁকে ।



শিতা বলে, "বলি কিরে
তুই যে আমার ছেলে !

বন্ধ করি কামারশালা।
হুঘিয়া অন্ত গেলে
কামারশালে বসে পিটবি লোহা কবে
তোরাই ত'বে কামারশালা
মৃত্যু আমার হ'লো।
চলবে কি আর কামারশালা
খেজুরতলায় তলে ?"

মিণ্যে বলা, নিতাই বলে—
"সুনব না কো কথা
শিক্ত হব দীলিপ দাম'র,
রাগব পায়ে মাথা।"

গৌদার ছেলের কথা
ঘুরলো পিতার মাথা
"ত' তবো বাই" বললো তারে—
"করেন যদি দয়া—
কঠিন বড় এমন গুরু
প্রিয় শিক্ত হওয়া।"
নিতাইচরণ হাজির হ'লো।
দীলিপ বাবার পাশে।
চোখটি বুজে পড়লো শুয়ে
খেজুর তলার বাসে।

চোখ ছুটি না নড়ে— নিবেদ না পড়ে
নিতাইচরণ মৃতের মত
দেখায় পড়ে রয়,
ভাই দেখে তো পিতার মনে
লাগলো দারুণ ভয়।
সকাল গেল মধ্যাহ্ন হ'লো
আবার সকাল হ'লো,
কাটবিড়ালী খেজুর গাছে
খেজুর খেতে এলো।

পাকা খেজুর খাবে— তারের পাশে পড়ে
চোখ না চেয়ে হাত বাড়িয়ে
দীলিপ খেজুর খায়,
অবাক হয়ে নিতাই ভায়ের
মুখেও পানি চায়।
নিতাই গায়ের পৌষের পরে
একটি খেজুর পড়ে,
বরাভক্রমে মাটির পায়ে
পড়লো; না তা করে।

দীলিপ অবাক হয়ে— রইল কেবল চেয়ে
বুঝলো নিতাই ভায়ের সম
কেহই কুড়ে নাই,
আদর করে ডাকলো তারে
"গৌক খেজুরে ভাই।"



বিজ্ঞানের কথা

ত্রিবিজ্ঞানী

গাছের চোখ আছে !

তুমি ভোমরা হাসবে ; বলবে, গাছের আবার চোখ কি ! সে-চোখে গাছ কিছু দেখে নাকি ? কিন্তু ভাষাশার কথা নয় । গাছের চোখ আছে । ওয়াশিংটনের Science News Letter পত্রে ওখানকার ছদ্মন প্রসিদ্ধ উদ্ভিদতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত ডক্টর জ্যাকট এবং ডক্টর জনশন লিখেছেন,— চারা গাছের চোখ আছে—সে-চোখে তারা দেখতে পায় । দেখতে পায় বসেই রঙ আর আলো তারা ভালোবাসে এবং নানা গাছের কচিও নানা রকম । অর্থাৎ কোনো গাছ লাল রঙ চায়—কোনো গাছ চায় হলুদে রঙ । রোস চড়া হলে চারা গাছ রোসের নিকে মাথা হেলায় ।

এ সম্বন্ধে তাঁরা বহু পরীক্ষা করে তবে এ কথা প্রচার করেছেন । পরীক্ষার মন্ত্র তাঁরা ছোট একটি বস্তু ঘর তৈরী করিয়ে সে ঘরের দু-কোণে দুটি বাতি খাড়া করেন—ঘরে বাহিরের আলো-প্রবেশের এতটুকু রক্ত পর্যন্ত নেই । বাতি দুটি জ্বলে জ্বলন্ত বাতির সামনে টাঙালেন বকী দুখানি পর্দা—পর্দা স্তম্ভ করে বাতির যেটুকু আলো ঘরে প্রতিফলিত হয়—এমন অবস্থা ।

ঐ ঘরে দুটি বাতির মাঝখানে তাঁরা রাখলেন ছোট একটি চারা গাছ । যে চারা গাছ রাখা হলো, সেটি বেশ শিখা মাথা খাড়া-করা—চারাগাছের মাথা হেলে না, মোলে না । দুমিকের পর্দা দুটি এক রঙের নয়—বিভিন্ন রঙের আলো ফেলে তাঁরা দেখতে লাগলেন চারা গাছের খাড়া মাথা কোন-দিকে হেলে ! নানা রঙের আলো ফেলে তাঁরা দেখলেন, সবুজ-রঙের আলোর উপরেই চারাগাছের অচরাগ । সবুজ-আলো পেয়ে চারাগাছ শুধু সতেজ সজীব থাকা কি, সহজ প্রাকৃতিক আবহাওয়ার গাছ যেমন বাড়ে, তেমনি বেড়ে উঠলো ।

চারাগাছটি গায়ে লাল আলো, নীল আলো, হলুদে আলো ফেলা হয়েছিল,—কিন্তু এ রঙের আলোগুলির দিকে চারাগাছের মাথা আসবে হেলে নি । সবুজ আলো কেলবা মাত্র চারা গাছের মাথা সেই দিকে হেলে পড়লো ! আলো ছিল দুই—এবং দু-দিকে দু-রঙের আলো—তবু তার মধ্য থেকে চারাগাছের মাথা হেললো ঐ সবুজ আলোর দিকে ।

তাঁরা বলেন—গাছ শুধু আলোর স্পর্শ অনুভব করে না—আলো পেনে সজীব প্রাণী যেমন মুখ করিয়ে আলোর পানে তাকায়—সবুজ আলো পাবামাত্র চারাগাছের অহুত্ব প্রকাশ ঠিক সেই ভাবেই ঘটেছিল ।

আরো বলেন,—আলোর তাপ আছে,—লাল আলো, সবুজ আলো, হলদে আলো, নীল আলো—সব রঙের আলো থেকে তাপ পাওয়া যায়—এ থেকে চাষী গাছ চা-রঙের আলোর তাপ পেয়েছিল সমান মাত্রার কিন্তু লাল, নীল বা হলদে আলোর তাপ পেয়ে চাষীগাছের মাথা সেবার আলোর দিকে হেললো না—সবুজ আলো পাখা হাজ গাছের দিক থেকে মিললো নাড়া। এই থেকেই ঠাণ্ডা অনুমান করছেন—চাষীগাছের চোখ বা এমন কোনো বস্তু আছে চোখের অনুকরণ, যার সাহায্যে সবুজ আলো পাবামাত্র তাড়া তা উপলব্ধি করে এবং সঙ্গে সঙ্গে মাথা হেলায় সবুজ আলোর দিকে।

ভয়ে রক্ত হিম হয় ?

গল্প উপস্থানের কাহিনীতে আমরা একটা কথা পড়ি—ভয়ে রক্ত হিম হলো বা ভয়ে রক্ত শুকিয়ে গেল। এ কথা নেহাত গল্প-কথানয়। ইংরেজীতে একটা কথা আছে blood-curdling ঘটনা।

বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে ভয়ে বা উত্তেজনায় মানুষের রক্ত ঘন, পাত্ হুয়ে যায়। আমেরিকার Physiological Society-র এক অধিবেশনে প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক হামিলটন, ডকান এবং নেওগার্ড এ-সত্য প্রমাণ করে দেখিয়েছেন।

ঠায়া বলেন, বহু ঘরে হাওয়া গরম থাকে। বাহির থেকে হঠাৎ বহু ঘরে ঢুকলে আমাদের কেমন অবস্থি ধরে। এ-অবস্থির কারণ আমাদের শরীরে যে লবণ আর জল আছে, সেই লবণ আর জল শিরায় আসে, অমনি সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেহ হু হু ঘর্মাক্ত। রক্তের গভীরতা (density) পরিমাপকালে এ বৈলক্ষণ্য হুস্পষ্ট ধরা পড়ে।

নিজ প্রত্যক্ষ একটি ঘটনার ঠায়া উল্লেখ করেছেন। ধরুন দোতলার বারান্দা থেকে একটু ছেঁড়া কাগজ কিংবা একটা পাখীর পালক যদি আমাদের নীচে ফেলি, তাহলে সেটা নীচের মাটিতে পড়তে যতখানি সময় লাগবে, তার চেয়ে ঢের বেশী কম সময় লাগবে যদি ঐ বারান্দা থেকে একটা হুড়ি ফেলি নীচের মাটিতে। বহু ঘরের মধ্যে আমাদের শরীরের একবিন্দু রক্ত—আর বাহিরের বাহিরের শরীরের এক বিন্দু রক্ত—এই দুটি বিভিন্ন রক্তবিন্দু ডুপার দিয়ে নীচে নিক্ষেপ করে দেখা গিয়েছে বহু ঘরের বাহিরের শরীরের রক্ত বিন্দুই বাহিরের বাহিরের রক্তবিন্দুর চেয়ে ঘনতর। ঠারী হলে সব জিনিসই চট করে নীচে পড়ে এ পরীক্ষায় কয়েকেক হাজ সময় লাগে।

উক্ত পদ্ধতিতে দেখা গিয়েছে ঠাণ্ডা জলে আমাদের দেহে সঙ্কচন ঘটে—গরম জলে সঙ্কচন

ঘটে না। দু-রকম অবস্থাতেই রক্ত পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে, ঠাণ্ডা-ভলে দৃষ্টিত পরীক্ষার রক্ত ঘন-তম। এ পরিবর্তন অর্থাৎ রক্ত ঘন হওয়া পাঁচ মিনিটেই ঘটে। ভ্রূর্ত এবং উত্তেজিত ব্যক্তির রক্ত-পরীক্ষাতেও এই লক্ষণ দেখা গিয়েছে। রক্ত হিম হওয়ার অর্থ—রক্ত গাঢ় হওয়া। ঠাণ্ডা মলে রক্তের এ বৈলক্ষণ্য প্রত্যক্ষ হয়েছে।

কি থেকে কি না হতে পারে !

অনেকের এমন বদম্যভাব, পেঁহে ছোট ফুঁড়ি হলে নখ দিয়ে খোঁটেন। ‘মনি ফুঁড়ি খোঁটার ফলে বহু লোক দুঃস্থ ইরিসিপেলাস রোগে প্রাণ হারিয়েছেন।

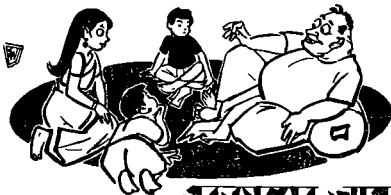
অনেকের স্বভাব ছুঁচহুতো নিয়ে সেলাই করতে করতে ছুঁচটি দাঁতে চেপে ধরলেন—ভার ফলে ছুঁচটি গিলে ফেলাও বিচিত্র নয়। দেদিন একজন মহিলা দেগাইয়ের কাজ দেবে ছুঁচটি আটকে রাখলেন তাঁর শাড়ীতে—দৈবাৎ ছুঁচ ফুটলো। তাঁর পাঁজরায় এবং সঙ্গে সঙ্গে দেহের মধ্যে অদ্ভুত ! ভক্তার ডাকিয়ে X-ray পরীক্ষা করিয়ে উক্তের নীচে অস্ত্র করে পে ছুঁচ বার করা হলো। ছুঁচ বা আলপিন যদি দেহের মধ্যে ঢোকে, তাহলে দেহের সবল রক্তস্রোতে ভেসে সে ছুঁচ দেহের মধ্যে কোন্‌খানে গিয়ে আটকাবে তার কোনো ঠিক ঠিকানা নেই। এ ছুঁচ গিয়ে যদি হাঁট বা লাভসে লাগে তাহলে তখুনি মৃত্যু।

এক কলোজের অধ্যক্ষকে কলোজের ছাত্রীরা অভিনন্দন জানিয়ে ফুলের তোড়া দেয়। অধ্যক্ষ সানন্দে নিলেন সে তোড়া—কিন্তু ফুলের বা পাতার কোথায় ছিল গোলাপের এতবড় একটি কাঁটা। অধ্যাপকের আঙুলে ফুটলো সে-কাঁটা—ফলে তাঁর সে আঙুলটি ভক্তার কেটে বাদ গিলেন।

এক অফিসের কেবানী দিগতে লিখতে লেখা হাতে হঠাৎ চেয়ার ঠেলে বেমন উঠে পাড়াবেন কলমের নিব ফুটলো তাঁর নাকে—তাঁর ফলে নাক পচে ত্রেন এ্যাবশ্যম হয়ে তাঁর মৃত্যু।

বিড়ি নামতে পা পিছলে পড়ে কিংবা কলতলায় পিছলে পড়ে হাত পা ভাঙ্গা মোটেই বিচিত্র নয়।

পথে মোটর গাড়ী, বাস গাড়ির ধাক্কায় কত কত মানুষের অপমৃত্যু ঘটেছে—তাঁর উপর উপরের যে কটি ঘটনার কথা বললাম এ থেকে আমাদের চলভে-কিরতে বসতে-পাড়াতে কতখানি সাবধান হওয়া দরকার—এইটুকু শুধু বুঝা—বুঝে মনে রেখো।



সবজাতীয় আঙ্গুর ...

বান্ধকোপে কার্টুন-ছবি

দিগ্গজ শর্মা

তোমাদের মধ্যে যারা ইংরাজী সিনেমা বেশী দেখ, তারা এখানে যাদের ছবি দেওয়া হোল পুটো, ডোনাল্ড ডাক ও ডাখোকে ভাগ করেই চেন। সিনেমা হলে বসে পর্দায় এদের নাম দেখলেই ছেলে-বুড়ো সকলেই এক সঙ্গে চকল ও উৎসাহিত হয়ে ওঠে। কার্টুন চিত্রে যিনি এই সব জন্তুদের



খুশি-বুড়ো



পুটো

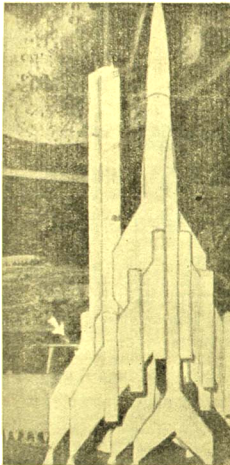


ডোনাল্ড ডাক



ডাখো

অবর করে রেখেছেন তাঁর নাম ওয়াণ্টে ডিসনে। 'কার্টুন' চিত্রে কি তা তোমরা অনেকেই জান। এই সব জন্তুদের নিয়ে যে মজার মজার হাসির ছবি তৈরী হয়, তাতে সত্যিকারের হাসি, হুসুর বা হাতী



নাথানের তৈরী নৃতন গ্রহ
(পর পৃষ্ঠায় উইবা)

নানা প্রকার বিপর্যয়ের মধ্যে গিয়ে শেষে তাঁর প্রতিভা প্রকাশের প্রকৃত কাজ তিনি পেলেন। সিনামার বিজ্ঞাপনের ক্ষত্র তিনি প্রথম কাটু'ন চিত্র করবার কাজ পেলেন। তিনি অবশ্য কাটু'ন চিত্রের আবিষ্কারক নন, কিন্তু এই চিত্র পদ্ধতির নানা প্রকার উন্নতি করে সিনেমার একটি অভ্যুদয় বিভাগ সৃষ্টি করলেন। কাটু'ন চিত্র তৈরী করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ও ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। সামান্য ছোট

অভিনয় করে না। এদের হাজার হাজার ছবি এঁকে গল্পের ভিতর দিয়ে বায়স্কোপের ছবি তোলা হয়। এই সব গল্পের ছবির সৃষ্টিকর্তা হচ্ছেন ওয়াণ্ট ভিসুনে। ভিসুনের জন্ম হয় আমেরিকার শিকাগো শহরে। তাঁর বাণ্যকাল নানা রকম দুঃখকষ্টের ভিতর দিয়ে কেটে ছিল। কিন্তু এই সময় উন্মুক্ত মাঠের মধ্যে কৃষিক্ষেত্রে তাঁকে কাজ করতে হোত বলে পাখী প্রভৃতি নানা রকম জীবজন্তুর সঙ্গে মেলা-মেশা করে এদের প্রতি তাঁর একটা আন্তরিক ভাল-বাসা জন্মে গিয়েছিল। সেই অল্পই বোধ হয় তিনি এই সব জীবজন্তু ও পশুপাখীর নানা রকম শাব্যাব এমন মন্দুর ভাবে চিত্রিত করতে পেরেছেন। সাত বৎসর বয়স থেকেই তিনি ছবি আঁকতে শুরু করেন। এই সময় একজন ডাক্তার তাঁকে তাঁর ঘোড়ার ছবি আঁকতে বলেন। ভিসুনের ঐকা ঘোড়ার ছবি দেখে ডাক্তার এতো সন্তুষ্ট হন যে এক পয়সা দিয়ে সেই ছবি তিনি কিনে নেন। ছবি এঁকে এই তাঁর প্রথম উপার্জন; এখন তো তিনি এই ছবির বায়স্কোপ করেই কোটি কোটি টাকা উপার্জন করছেন। ১৯২০ সালে

একটা হাসির গল্প তৈরী করতে হাজার হাজার ছবি তৈরী করতে হয়। এই কাজে হাত দিয়ে তিনি প্রথমে 'মিকি মাউস'র সৃষ্টি করলেন। তাঁর 'মিকি মাউস' ছবির পর্দায় দেখিনি এমন চিত্রায়োদী ছেলে-বুড়ো খুব কমই আছে।

ডিস্নের স্বভাব শিশুদের মত চকল প্রকৃতির। এই সব সৃষ্টি করে তিনি চুপ করে বসে থাকতে পারলেন না। এই ধরনের ছবির উন্নতির জন্যে নানা রকম হুতন পথ খুঁজে বের করতে আরম্ভ করলেন। জীবজন্তু নিয়ে ছোট ছোট হাসির গল্প ছাড়া, আড়াই ঘণ্টাব্যাপী পুরো গল্প কাটু'ন চিত্র তৈরী করতে আরম্ভ করলেন। এই ধরনের তাঁর প্রথম চিত্র Snow White and the Seven Dwarfs পৃথিবীর একটি শ্রেষ্ঠ চিত্র বলে পরিগণিত হোল। তারপর এলো এই ধরনের বড় বড় ছবি—যেমন পিপকিও, ডাথো, ঘোষী আরও অনেক ছবি। কিন্তু এখানেই তাঁর কাজ শেষ হলো না—আবার তিনি হুতন পথে চলতে আরম্ভ করলেন। তিনি এবারে মানুষের জীবন যাত্রা নিয়ে ও প্রাকৃতিক দৃশ্য নিয়ে কাটু'ন ছবি করতে শুরু করলেন। এদিকেও তাঁর প্রতিভার অদ্ভুত বিকাশ হল। তাই পরপর এলো তাঁর তৈরী—Living Deserts, Vanishing Prairie, Beaver Valley ইত্যাদি। এই কাটু'ন চিত্রগুলি প্রাকৃতিক দৃশ্য হিসাবে অদ্ভুত সৃষ্টি বলে সবাই স্বীকার করেন।

এরপর তাঁর চরম সৃষ্টি হচ্ছে আমেরিকার লস এঞ্জেলেস শহরে Disneyland স্থাপন। এটা একটা শিশুদের প্রকাণ্ড শহর। শিশুদের কেন, যে সব বুড়োদের এখনও শিশু মন আছে, তারা এই স্বপ্নরাজ্য দেখে অবাক হয়ে গেল। তাঁর কল্পনাওবা শিশু-মনে যা এনেছে তা তিনি three solid dimensions প্রণালীতে তৈরী করে রেখেছেন। ডিস্নে চিৎশিশু, তাই তাঁর শিশু-কোমল উদ্দাম-ভাবে এই ডিস্নেল্যান্ডে ছেড়ে গিয়েছেন। এখানে ভূমি দ্ব্যন্তে প্রকাণ্ড গুহার মধ্যে ঢুকে দেখতে পাঁবে সরণার ঘোড়ে পরীরা। হান কংকে, মেঘের উপর দিয়ে পক্ষীরাও ঘোড়ায় চড়ে রাশপুত্র ও রাশকুমারী উড়ে চলেছেন—এই রকম ডিস্নে কল্পনার অসূরত্ব ছবি—এই ডিস্নেল্যান্ডে এই সব আছে।

মানুষের তৈরী নুতন গ্রহ

এতদিন আমরা জানতে পেরেছি মানুষ চাঁদের চারদিকে ঘোরবার জন্য উপগ্রহ সৃষ্টি করেছে—যেমন কশিয়ার এক নবর, দুই নবর ও তিন নবর স্পুটনিক। আমেরিকাও সৃষ্টি করেছে—এই ধরনের বকেট উপগ্রহ। কিন্তু এবারে কশিয়ার সৃষ্টি করেছে উপগ্রহ নয়, গ্রহ। এর নাম 'লুনিক'। পৃথিবী যেমন সূর্যের চার দিকে ঘুরছে, এই 'লুনিক'ও সূর্যের চার দিকে ঘুরতে আরম্ভ করেছে।

২২ জানুয়ারীর ১৯৫২ রাতে এই মাদ্রাস-স্টেট গ্রহ সূর্যের দিকে খাড়া করে। রকেটটি ও তার যন্ত্র-পাতির মোট ওজন প্রায় ৫০ মন। রকেটের শেষ স্তরটির ওজন হোল প্রায় ৩৬ মন ১২ সের। এই রকেটে নানা রকম বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহ করবার জন্য নানা রকম যন্ত্র আছে। এই গ্রহ নিজের বেগে পৃথিবী ছাড়িয়ে চাঁদেরও মহাকর্ষ-টান উপেক্ষা করে সৌর-পরিবারের কক্ষে আসন গ্রহণ করেছে এবং পৃথিবী ও অন্তর্গত গ্রহের মত সূর্যের চারদিকে ঘুরছে। এই গ্রহের গতি হচ্ছে ঘণ্টায় ২৪,০০০ মাইল।

এঁকে চেন কি ?



মারেক্ট পাণ্ডা—চাই-চাই

যে চারটি পাণ্ডা দূর পড়েছে, তার মধ্যে এটি একটি। সাধারণতঃ হিমালয় প্রদেশের উচ্চ অঞ্চল বাস করার এমন জায়গায়, আশার বর্ষায় ও চীনের তুর্ঘাবান্ধু পার্বত্যঅঞ্চলে এরা বাস করেন।

ভাল্লকের জাঙভাই নাকি ?

তেমনিই তো দেখলে মনে হয়। চুবুচ্ছেন বাঁশের কৌড়া, ককির গোড়া। চেহারাটা বানিকটা ভাল্লকের মত দেখতে হলেও ভাল্লক নয় কিন্তু। ইনি হচ্ছেন পাণ্ডা সর্দার, অথবা অতিকায় পাণ্ডা—চাই-চাই। পাণ্ডার নাম তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ। আমাদের প্রধানমন্ত্রীর একটি ছোট্ট পাণ্ডা আছে, তাঁর শ্রিয় অন্ত্যন্ত জন্তু জানোয়ার-দের মধ্যে। এই পাণ্ডাটি সম্প্রতি লণ্ডন জুঁতে নতুন এসেছে, এবং এঁকে দেখতে হাজার হাজার লোক নিত্য এলে ভিড় করছে। চীন দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম পর্বত-মালা থেকে এঁকে আনা হয়। এরা সম্পূর্ণ নিরামিষাশী। এ পর্বত সারা পৃথিবীতে

খেলোয়াড়দের খবর

— খেতুড়ে

ওয়েস্ট ইন্ডিজ ওস্তারত

দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচ

কানপুরে, ভারত বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজের দ্বিতীয় ক্রিকেট টেস্ট ম্যাচে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল ১০০ রানে জয়ী হয়। ২৪০ রানে ভারত দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা শেষ করলে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের অধিনায়ক খেলাটির জয়-পরাজয়ের সীমাংসা হয়ে যায়। ভারত দ্বিতীয় ইনিংসের ব্যাটিং করার সময় ওয়েস্ট ইন্ডিজের ফাস্ট বোলার ওয়েমলি হল প্যাচিট ও টেলর তিনটি উইকেট পান। আগন্তুক দলের ফাস্ট বোলারদের একটানা পরিশ্রমই দ্বিতীয় টেস্টের সাক্ষ্যের কারণ।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ : ১ম ইনিংস : ২২২

(আলেকজান্ডার ৭০, সলোমন ৪৫। স্বভাব গুপ্ত ১০২ রাণে ২ উইকেট।)

ভারত : ১ম ইনিংস : ২২২

(উম্রিগড় ৫৭, পদ্ম রায় ৪৬; কট্টার ৪১। হল ৫০ রানে ৬, সোবার্ণ ৬২ রানে ২ উইকেট।)

ওয়েস্ট ইন্ডিজ : ২য় ইনিংস : ৭ উই : ৪৪৩
ডি: (সোবার্ণ ১২৮, সলোমন ৭৬, আলেকজান্ডার ৪৫ নট আউট, কানহাই ৪১। রায়চাঁদ ১১৪ রানে ২, উম্রিগড় ২৬ রানে ১, গুপ্ত ১২১ রাণে ১ উইকেট।)

ভারত : ২ ইনিংস : ২৪০

(পদ্ম রায় ৪৫, কট্টার ৫০, উম্রিগড় ৩৪, মনমথেকার ৩১। হল ৭৬ রানে ৫, টেলর ৬৮ রাণে ৩ উইকেট।)

ওয়েস্ট ইন্ডিজ-ভারত : ৩য় টেস্ট ম্যাচ

ইভেন উজানে ভারত বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজের তৃতীয় ক্রিকেট টেস্ট ম্যাচ আরম্ভ হলে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল প্রথমে ব্যাটিং শুরু করে একদিনে তিন উইকেটের বিনিময়ে ৩৫২ রান করে। রোহান কানহাই এই দিন নিজে ২০৩ রান করেন এবং বেবিল বুচার ৮৭ রান করে প্রথম দিনের শেষে নট আউট থেকে যান। দ্বিতীয় দিনে চা-পানের সময় পাঁচ উইকেটে ৬১৪ রান ওঠার পর ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। কানহাই ২৪৬ ও বুচার ১০৩ রান করে আউট হন এবং গাবরিন্ডি সোবার্ণ ১০৬ রান করে শেষ পর্যন্ত নট আউট থেকে যান। ভারতীয় দল ব্যাটিং শুরু করে দিনের শেষে দুই উইকেটে ২২ রান করেন। তৃতীয় দিনে ভারত 'ফলো অন'-এ বাধ্য হয়ে দিনের শেষে পরাজয়ের সম্মুখীন হয়ে পড়ে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের ৬১৪ রানের প্রত্যুত্তরে ভারত প্রথম ইনিংসে মাত্র ১২৪ রান করে এবং দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা শুরু করে পাঁচ উইকেটের

বিনিময়ে ৬২ রান কোরে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের হুগ্গন কাস্ট বোলার গিলক্রাইস্ট ও হলই ভারতীয় দলের বিপর্যয় ঘটয়েছেন। উম্রিগড় প্রথম ইনিংসে ৪৯ রান করে মট আউট ছিলেন, কিন্তু দ্বিতীয় ইনিংসে দু-রান করে বিপর্যয় নেন। চতুর্থ দিনে ভারতীয় দল মধ্যাহ্নভোজের বিরতির কুড়ি মিনিট আগে মোট ১৪০ রানে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা নির্ধারিত সময়ের ন-ঘণ্টা কুড়ি মিনিট আগেই শেষ হয়। ভারত দু-ইনিংসে মোট ২৭৮ রান করে।

আগের ছুটো টেস্ট পর্দায়ের খেলায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল ভারতের বিপক্ষে 'রাবার' পেয়েছিল। বর্তমান পর্দায়ের টেস্ট খেলায় বাকী দুটো ম্যাচে ভারত জয়ী হলেও, এই বারের 'রাবার' অমোঘান্বিত থাকায়, ওয়েস্ট ইন্ডিজ 'রাবার' বিজয়ী গৌরব অক্ষর থাকবে। খেলার চতুর্থ দিনে সর্বাধিক প্রশংসার দাবী রাখেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাস্ট বোলার গিলক্রাইস্ট একাই পাঁচটি উইকেট পান। গিলক্রাইস্টের সর্বশেষ বোলিং-এর হিসেব ছিল ২১-৭-৫৫-৬। তৃতীয় টেস্ট ম্যাচে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ইনিংস ও ৬৩৬ রানে জয়ী হয়।

—

নিঃ ভাঃ স্থল ক্রিকেট

গত ১৮ ডিসেম্বর রাজধানী মাঠে নিখিল ভারত স্থল ক্রিকেট প্রতিযোগিতার তৃতীয় দিনে পশ্চিমাঞ্চল দক্ষিণাঞ্চলকে সাত উইকেটে হারিয়ে

দিয়ে পরপর ছ-বার কোচবিহার ট্রফি লাভ করার গৌরব অর্জন করেছে।

দক্ষিণাঞ্চল : ১ম ইনিংস : ১২৭

পশ্চিমাঞ্চল : ১ম ইনিংস : ১৬০

দক্ষিণাঞ্চল : ২য় ইনিংস : ১৩৩

পশ্চিমাঞ্চল : ২য় ইনিংস : ১৬৬ (৩ উইকেট)

—

জাতীয় স্থলস্ ক্রীড়া

দিল্লীতে অনুষ্ঠিত জাতীয় স্থল ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় এবার পাঞ্জাবদল মোট ৪০ পয়েন্ট পেয়ে দলপতি চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করেছে। মহীশূর ও মধ্যপ্রদেশ দ্ব্যক্রে ২৩ ও ১১ পয়েন্ট পেয়ে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে। মহিলা এ্যাথলেটিক বিভাগে মহীশূর চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করে এবং বোম্বাই রানার্স আপ হয়।

চতুর্থ জাতীয় স্থল-চ্যাম্পিয়নশিপের পুরস্কার বিতরণ উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী ঐনেহেরু বলেন যে, স্থল পর্দায়েই খেলাধুলার প্রতি বেশী মন দেওয়া উচিত, কেন না অলিম্পিকে অংশগ্রহণকারী ডবিত্ত ও প্রতিযোগিতার বেশীরাগই এই স্থল-ক্ষেত্রে গড়ে ওঠে। ঐনেহেরু বলেন যে, দেশের যুগসের কর্মনিষ্ঠ রাধার পক্ষে এই ধরনের খেলাধুলো এবং যুব-উৎসবগুলির দরকারী। আন্তর্জাতিক পর্দায়ের খেলাধুলাতে ভারত সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছে। ভবিষ্যতে খেলাধুলার উন্নতি করতে হলে স্থল পর্দায়েই খেলাধুলার প্রতি তাঁদের আরো মন দিতে হবে।

ঐনেহেরু আরো বলেন যে, খেলাধুলার

অংশ গ্রহণকারী বালিকাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে
মেখে তিনি আনন্দিত। এতেই বোঝা যায় যে
কেবল হাড। কাজে নয়, খেলাধুলার মাঠেও
মেয়েরা ছেলেদের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে
চলতে পারে।

আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট

কলকাতা সল আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট
প্রতিযোগিতার প্রারম্ভ কাইনালে স্তম্ভী হয়েছে।
তিনদিন ব্যাপী এই কাইনালের বিপক্ষে ১০২
প্রত্যুত্তরে কলকাতা ৮১৭ রান করে নতুন রেকর্ড
সৃষ্টি করেছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের
প্রথম চারজন খেলোয়াড় এম. পি. বড়ুয়া,
দলিল ব্যানার্জি, সায়মহম্মদ মিজ ও চুনী গোস্বামী
ব্যক্তিগতভাবে শতাধিক রান করেছেন। এক
ইনিংসে এক মলের চারজনে গেকুরী করাতে
আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট খেলার নতুন
রেকর্ডের সৃষ্টি হয়েছে। ১২৪১ সালে
ওদমানিয়ার বিপক্ষে ৭২৭ রান করে বোম্বাই
বিশ্ববিদ্যালয় মোট যে রেকর্ড সৃষ্টি করেছিল,
তা এবার ভাঙলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮১৭ রান করতে
৫৬৬ মিনিট সময় লেগেছিল।

চীনা সীতারুর কৃতিত্ব

নিউ চায়না নিউজ এজেন্সীর এক খবর থেকে
জানা গেছে যে, পিকিংয়ে দু' সিংহা সিংহ বলে

সীতারুর ১মি. ১১৪ সেমি. ১৮৭ মিটার বুক
সীতারুর কেটেছেন। এর আগে এই পথ এত
অল্প সময়ে বিশ্বের আর কোনো সীতারুর অতিক্রম
করতে পেরেছেন বলে শোনা যায় নি।

নকলুই মাইল সাইকেল রেস

কারবালা স্পোর্টিং ক্লাবের পরিচালনায় যে
নকলুই মাইল সাইকেল রেস হয়েছে তাতে এন.
দি.-এর ডি. শর্মা ৪৫. ২১ সেকেন্ডে এই দীর্ঘ পথ
পার হয়ে প্রথমস্থান অধিকার করেন।

বিশ্ববিদ্যালয় এ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতা

দশম শ্রেণি নিম্নলিখিত ভারত আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয়
এ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতার প্রথম দিনে পুরুষদের
পোল ভন্টে পাকিস্তানের আজীব সিং এবং হাই-
জাম্পে মাস্তাজের ডোরাইরাজ গুজ বহুরে
প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয় রেকর্ড রান করেছেন
এ বছরের প্রতিযোগিতায় ছাত্রদলটি বিশ্ব-
বিদ্যালয়ের ১৮২ জন ছাত্র ও ৮০ জন ছাত্রী অংশ
গ্রহণ করেন। পোল ভন্টে আজীব সিং ১২ ফু.
৩ ইঞ্চি উচ্চতা এবং রানিং হাইজাম্পে
ডোরাইরাজ ৬ ফু. ২ ইঞ্চি উচ্চতা অতিক্রম
করেন। পুরুষ বিভাগে পাকিস্তান ৬৯ পয়েন্ট এবং
মহিলা বিভাগে মসৌর ৪০ পয়েন্ট অর্জন করে
দলগত চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করেছে।



গোহক গ্রাহিকদের লেখা

স্পুটনিক

আকাশের কোল দিয়ে রাশিয়ার স্পুটনিক
পৃথিবীকে বারবার পাক দেয় টিক্‌টিক্‌ ।
মাতৃঘের হাতে গড়া কৃত্রিম চাঁদ।
ধূপাক দিয়ে ঘর নেই কোন বাধা ।

মহাভাগতিক নামে আছে এক রশ্মি,
নিমেষতে করে দেয় সব কিছু তপ্তি,
স্পুটনিক কখনও ডুয়ার না ও-সবের
পৃথিবীর চারিপাশে নির্ভয়ে ঘোরে কের ।

সংবাদ দেয় কতু রেডিওতে করে
রেডিওর স্টেশনেতে তাই ধরা পড়ে ।
একখানি ছোটঘর স্পুটনিক মাঝে
বিখ্যাত লাত্বিকাই সেখানেতে রাখে ।

যাত্রিক ঘরপানি দেখতে কী অদ্ভুত
লোম-ভরা লাত্বিকার চাহনিটা কুৎসূত
কিছুদিন পরেতেই বোকাচাঁদ নামবে
দশেতে নৃত্যেং সংবাদ আনবে ।

শ্রীরজতকান্ত রায়

সেদিনের সেই মূর্খ ছোকরা

আজ থেকে বোল শ' বছর আগেকার কথা
—বিক্রমাদিত্য তখন মগধের রাজা ছিলেন ।

মগধ কাকে বলে জানতো? আজকাল
যাকে বিহার বলা হয়ে থাকে ।

রাজার এক মেয়ে ছিল। মেয়েটি বড়
পণ্ডিত ছিল। তাই তার নাম রাখা হয়
বিজ্ঞাবতী। রাজা একদিন ঘোষণা করলেন
বিজ্ঞাবতীকে যে পণ্ডিত তর্কে হারাতে পারবেন,
তারই সঙ্গে বিজ্ঞাবতীর বিয়ে দিবেন ।

রাজার এই বিজ্ঞাপন শুনে বড় বড় অনেক
পণ্ডিত রাজসভায় এসে হিড় করলেন, কিন্তু
সকলেই তাঁরা বিজ্ঞাবতীর কাছে তর্কে হার মেনে
গেলেন। এতে হ'ল পণ্ডিতদের অপমান। তাঁরা
এক নিরেট মূর্খের সঙ্গে বিজ্ঞাবতীর বিয়ের
যড়যন্ত্র করতে লাগলেন ।

একদিন এক ছোকরা রাস্তার ধারে গাছের
ডালের আগায় বসে সেই ডালের গোড়া
কাটছিল। পণ্ডিতরা দেখতে পেয়ে তাকে ধরে
নিয়ে এলেন। বইয়ের সঙ্গে এই ছোকরার কোন
সম্পর্ক ছিল না। তাঁরা সেই মূর্খ ছোকরাকে
পণ্ডিত সাক্ষিয়ে সন্তার নিয়ে গেলেন এবং সন্তার
কথা বলতে নিবেদন করে দিলেন ।

গম্বীর ভাবে সে সত্য বলল—মুখে কথাটি নেই। বিচ্যাবতী 'এক আঙুল' দেখিয়ে তাঁকে প্রমাণ করলেন। ছোকরাটি কিছুই না বুঝে, তাঁকে প্রথমে 'এক আঙুল' এবং পরে 'দুই আঙুল' দেখালেন। বিচ্যাবতী ছোকরার কাছে হার মানলেন। তিনি এক আঙুল দেখিয়ে প্রমাণ করেছিলেন—ঈশ্বর এক কি না? ছোকরার উত্তরদানে তিনি বুঝলেন—এক আঙুলে তিনি বলেছেন ঈশ্বর এক; পরে দুই আঙুলে জানালেন, তাঁর দুই আকার, পুরুষ ও প্রকৃতি। এই ছোকরার সঙ্গে বিচ্যাবতীর বিয়ে হয়ে গেল।

বাসরঘরে বিচ্যাবতী তাঁর স্বামীর সঙ্গে কথা বললেন। বলতে বলতে বিচ্যাবতী বুঝলেন তাঁর স্বামী একটা নীরেট মুখ। তখন তিনি স্বামীকে ত্যাগ করে দিলেন।

এই অপমানে বিচ্যাবতীর স্বামী নির্জন এক পুকুরে গিয়ে আত্মহত্যা করবেন স্থির করলেন। তখন দৈববাণী হ'ল—বিচ্যাবতী দেবী সরস্বতী তাঁকে বললেন, "যে বৎস! আত্মহত্যা করা মহা পাপ, তুই ঘরে ফিরে যা। লেখাপড়া কর গিয়ে। আমি বলছি, তুই একদিন পণ্ডিত হতে পারবি।"

বিচ্যাবতীর স্বামী গৃহে ফিরলেন। যত দিনে অধ্যয়ন করতে লাগলেন। তবে সত্যই কি পরে তিনি পণ্ডিত হলেন?

ইতিহাস তার সাক্ষ্য দেয়, দেবী সরস্বতীর দৈববাণী সম্পূর্ণ সত্য বলেই প্রমাণিত হয়েছে। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় কালিদাস পণ্ডিতের প্রথম জীবনের সেই ক্ষুদ্র ঘটনা স্মরণ লেখা আছে।

প্রাপ্ত বয়সে কালিদাস অনেক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে মেঘদূত, কুমারদম্ভব, রঘুবংশ, অশ্বিনীকান শতক্কাণ্ড প্রভৃতিগুলি বিখ্যাত।

শ্রীঅরুণকুমার দে

নাম শুনে

'রামচরণের' নাইক চরণ,
'পলাশলোচন, অন্ধ
'আজাদ আলী' স্বাধীন নহে—
রাষ্ট্রের জেলে বন্দ।
'আগতোষ' পেটটা মোটা
অঙ্গে নহে তুষ্ট
'স্ববোধ' বাবুর নাই কোন বোধ
শাস্ত এবং শিষ্ট,
দাড়কাঁকরা পালার শুনে
"মরনা মিকার" স্বরটা;
"নবাব মিকার" সারায় তাহার
হোগলা পাতার ঘরটা।
'অরুণবাবু' পেনিন পথে
হাতিয়ে এল কর্ণ
"কালিদাসের" যথায় নাহি
কবিতা এক বর্ণ।
"শীলারাজী" নরকো পাষণে;
আলোর মত মুক্ত
ফুলের মত কোমল এবং
মধুর স্বপ্নাম যুক্ত।
'দুর্গাচরণ' জন্মেও নয়
দুর্গাদেবীর ভক্ত ..
নাম শুনে আজ মাহুদ চেনা
হল বেজার শক্ত।

শ্রীরবীন্দ্রকুমার চক্রবর্তী

আমাদের স্কুল

(প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় পুরস্কার-
প্রাপ্ত রচনা)

“স্বাধায়ে শান্তিনিকেতন
আমাদের সব হতে আপন।”

এই গান দিয়েই কবি আমাদের মনের ভাব জানিয়েছেন। তবুও আমার শান্তিনিকেতনের কথা লিখতে আনন্দ লাগে। আমার এই শান্তিনিকেতন কোলকাতা থেকে ১০০ মাইল দূরে। কবি গুরু ববীন্দ্রনাথই এই শান্তিনিকেতনের প্রতিষ্ঠা করেন। কবির পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বহরিন আগে এই পথ দিয়ে বায়পুর গ্রামে তাঁর বন্ধুর বাড়ীতে থাকতেন। সেই সময় এই স্থানটি ধূসর প্রান্তর ছিল। এই ধূসর প্রান্তরের ভেতর একটি ছাতিস গাছ ছিল। সেটি আজও গাড়িয়ে আছে। এই গাছের নিচে গাড়িয়ে দিগন্ত বিস্তৃত খোলা মাঠ বেধে, তাঁর সে জায়গা খুব ভালো লাগে। এই খোলা আকাশের নিচেই তাঁর তপস্কার অথকুল জায়গা বলে মনে করেন। কিছুদিনের মধ্যেই বহু টাকা খরচ করে এই জমি কিনে ফেললেন, ও মস্তবড় একটি বাড়ী তৈরী করলেন। এই বাড়ীর নাম শান্তিনিকেতন দিলেন। তার চার পাশে আম, জাম, আমলকী, শাল সেগুন, মহুয়া গাছ লাগালেন। কত গাছই লাগালেন! মহর্ষি প্রায়ই হিমালয় পাহাড়ে চলে যেতেন সেই সময়ে এই জায়গাটি খুব বালি থাকত। এই সময়

ব্রাহ্মধর্মবিধাঙ্গী ব্যক্তিরা এই নির্জন জায়গায় উপাশনা করতে আসতেন। সেই সময় ববীন্দ্রনাথের কাছে ছেলেমেয়েদের শিক্ষা একটা সমস্যা রূপে দেখা দিল। তাঁর মনে আছে নিম্নের ছোটবেলার সাধারণ স্কুলের বিজীবিকা। বহু চিন্তার পর তাঁরতের পুরোনো আশ্রমিক পদ্ধতিতে এখানে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করলেন। এবং তিনি শান্তিনিকেতন জায়গাটি এই শিক্ষার উপযুক্ত জায়গা বলে মনে করলেন। মহর্ষির কাছ থেকে অর্থায়তি নিয়ে এই জায়গাতেই সেই বিদ্যালয় স্থাপন করলেন। গানই শান্তিনিকেতনের প্রাণ। গান দিয়ে আমাদের ক্লাস আরম্ভ হয়। সূর্যের আলো বখন অস্পষ্ট—তখন আমরা বৈতালিক করি। বৈতালিকের মত বেই উচ্চারিত হয় তখন যে যেখানে গাড়িয়ে থাকে—সেইখানে গাড়িয়েই মন্ত্র বলে। তারপর আমরা যে যার আসন নিয়ে গাছের তলায় ক্লাস করতে বাই। গাছের তলায় ক্লাস করতে এত ভাল লাগে তা লিখে বোঝাতে পারব না। গুরুদেবের সমস্ত শৈশব কেটেছে বড় ঘরে। আনন্দের ঝাঁক দিয়ে তিনি প্রকৃতিকে মেখেছিলেন। তাই তিনি বখন এই স্থল স্থাপন করেন তখন তাঁর মনে হয়েছিল যে প্রকৃতির মধ্যে দিয়ে, খোলাখুলার মধ্যে দিয়ে শিশুদের লেখা পড়া শেখাব। “মুক্ত আকাশের তলায় মুক্ত প্রাণ গড়ে উঠুক” এই তিনি সারা জীবন বলেছেন। তাঁর কথায় বলি—

“মোদের তরুণের মেলা,

স্বাধায়ে খোলা মাঠের খেলা

মোদের নীল গগনের লোহাগ মাথা
সকাল সন্ধ্যা বেলা।

ক্রাস করতে করতে “কোকিল”, “বৌ কথা
কণ”, “কটিক জল” এই সব পাখীর ডাক শুনি।
কতদিন আমাদের গায়ের উপর দিয়ে বিবহীন
সাপ চলে গেছে। কিন্তু আমরা তা দেখে ভয়
পাই না। দেশবিশেষের কত রকম লোক
আসেন, ক্রাসের ভেতর থেকে আধরা দেখি।
এরকম কোন্‌দিন লিঙ্কের কাছে বহুনি গাইনি।
আমি যখন প্রথম গুটি হই তখন এক মাস, এই
লোকের আনাগোনা দেখেছিলাম। পড়াশুনায়
মন দিতে পারিনি। এখানে নানা দেশের বহু
ছেলেমেয়েরা পড়তে আসে। চীন, রাশিয়া, আমে-
রিকান, ফরাসী, জাপানী নানা দেশীয় ছাত্রছাত্রী
নানা রকম বিষয় শিখতে আসে। তাই গুরুদেব
এর আর একটি নাম “বিশ্বভারতী” দিয়েছিলেন।
এখানে আমরা সব বিষয় পড়ি। আবার তেমনি
নাচ, গান, ছবি আঁকা শিখি। আমাদের এখান
থেকে দুই মাইল দূরে স্ট্রিনিকোতন আছে। সেখানে
দৈন্যে দুইদিন করে আমরা হাতের কাজ শিখতে
বাই। গালার কাজ, মাটির কাজ, বই বাঁধানো,
কাঠের কাজ, তাঁত চালানো প্রভৃতি নানা রকম
হাতের কাজ শেখান হয়। এক একটা ঘল এক
এক রকম কাজ করে। তার পর প্রতি বছর
এখানে একটা মেলা হয় সেই মেলায় এই হাতের
কাজের প্রদর্শনী হয়। তার পর আমাদের নিজস্ব
একটি লাইব্রেরী আছে। গুরুদেব, তার নাম

“সখা সংঘ” দিয়েছিলেন। এই সখা সংঘের কাজ
সব আমরাই করি। যারো ভালো আঁকে তারো
এই সখা সংঘের বোর্ডে স্থান করে আঁকে।
আমি কতদিন এই বোর্ডে আঁকেছি। বিকেল
হলেই ঘরে আর মন টিকতে চায় না। পেলায়
জন্ত মন ছুটপট করে। আমাদের খেলার জন্ত
মন্ত মাঠ আছে। ছেলেরা আলাদা রকম খেলা
খেলে আমরা মেয়েরা অন্য রকম খেলা খেলি।
এখানে আমাদের যেমন কাজের তাড়া তেমনি
খেলার তাড়া। তাই কবি বলেছেন “খেলেতে
খেলেতে ফুটেছে ফুল, খেলেতে খেলেতে কল খে
কোটে।” পেলায়ই টেট জলে স্থলে।

“ফুল যদি খেলেতে খেলেতে ফোটে তাহলে
আরুই বা কেন খেলেতে খেলেতে ফুটে উঠব
না?”

কবেব এই বলতে চেয়েছেন। প্রতি মাসে
আমাদের দুটো-তিনটে করে সাহিত্য সভা হয়।
এই সভার প্রত্যেক ছেলেমেয়েরা নিজের থেকে
কিছু না কিছু লেখে ও বহুলোকের সামনে পাড়িয়ে
পড়তে হয়। এই যে সভার সমানে পড়া তাতে
প্রত্যেকের জড়তা সংকোচ সব কেটে যায়।
সভাটি আমরা নিজের হাতে ফুল দিয়ে স্থান
করে সাজাই। প্রতিবছর রবীন্দ্রজন্মবার্ষিকীতে
আমাদের লেখা আঁকা ছাশা বই হিসাবে বিক্রি
হয়। আবার দুই মাস অন্তর হাতে লেখা
পত্রিকাও বের হয়। আমরা মাসে একবার বা
দুইবার গ্রামে বাই। গ্রামে বেয়ে দেখি দারো
গরীব তাদের জামা, কাপড়, টাকা, পরশা দিয়ে

সাধাঘা করি। এই টাকা আমরা টাকা তুলে বা আমাদের এই নিজেদের লেখা বিক্রি করে তুলি। এই আমাদের সেবাবিভাগ। তারপর বছরে একবার করে ভারতের প্রচেষ্টা জায়গাগুলি দেখবার চক্কর ঘাই। টেনে খুব হৈ চৈ করি। নানা রকম গান কহতে করতে রাত কাটে। আমাদের শিক্ষকদের বাড়ী আশ্রমের খুব কাছে। আমরা প্রায়ই তাঁদের বাড়ী ঘাই। কাগজেই তাঁদের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ খুব নিকট। তাঁদের সঙ্গে আমরা খেলাধুলা করি। এখানে আমরা ছেলেমেয়ে এক সঙ্গে হাসি করি। ওরা আমাদের নানা রকম নাম দেয় আমরাও নাম দিই। এই অবধি বেলাবেশাতে আমাদের সংকোচ কেটে যায়। এবার আমাদের উৎসবের কথা বলি। ঋতু যেমন হৃদয় ভাবে শান্তিনিকেতনে আসে তেমনই আমরাও তাকে হৃদয় করে গ্রহণ করবার আয়োজন করি। বৈশাখের দিন—চারিদিকে রক্ত ধূসর কোথাও একটু সবুজ রঙ দেখা যায় না। সেই সময় ১ লা বৈশাখে নববর্ষকে আহ্বান করি। আত্মকৃত্তে বহু গান ও কবিতা পড়া হয়। তারপর আসে বর্ধা-মঙ্গল। চারিদিক ঘনঘটা করে বৃষ্টিপাত। নব-বর্ষকে মাসের অন্ত্যর্ধনা জানাবার সস্ত্র বর্ধামঙ্গলের সন্ধ্যাবেলাকে গানে মাতিয়ে তুলি।

“ঐ আসে, ঐ অতি ভৈরব হরষে, হল সিক্ত ক্রিতি সৌরভ স্তরসে।”

তারপর আসে আমাদের ৭ই পৌষের মেলা। বহু লোক এই মেলায় কিনিস বিক্রি করতে আসে। দেশবিদেশ থেকেও নানা রকম লোক

আসে। বেগনা পুতুল কত আসে। গ্রাম্য লোকেরা বহু আসে। তাদের বাউলগান, তাদের কতকথা নাচ দেখতে আমাদের প্রাণমন ভরে ওঠে। আশ্রমকে তর্কন চেমা যায় না। আমাদের সামনে সে আর এক রকম রূপ নয়। পৌষমেলার পর আসে ঋতুরাজ বসন্ত। তাকে অভিনন্দন জানাবার সস্ত্র আমরা হলদে লাড়ী পরে, গলায় হাতে টগর ফুলের মালা পরে নাচতে নাচতে আত্মকৃত্তে ঘাই। এই বসন্তঋতু হৃদয় দোলার সময়। সারাদিন ধরে আত্মকৃত্তে নাচ গান হয়। আন্নির খেলা হয়। শান্তিনিকেতনে উৎসব, মেলা ও নাটকের শেষ নাই। কত মেধি কিস্ত মেধে মেখেও আর আস মেটে না। মনে হয় আবার কবে সেই দিনগুলো আসবে। এই আনন্দ পড়া-শুনোর মধ্যে নিজেই আমাদের সারা বছর কাটে।

“মোদের প্রাণের সঙ্গে প্রাণে,
সে যে মিলিয়েছে এক তানে।

মোদের ভাইয়ের সঙ্গে ভাইকে সে বে করেছে
এক মন। আমাদের শান্তিনিকেতন।” এত
থেকে ঘুরে গেলেও একে কোন দিন ফুলব না।
কবি কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে বসি

“আমরা যেখান বসি ঘুরে
দে যে যায় না করু ঘুরে।

মোদের মনের মাঝে প্রেমের সেতার
বীধা যে তার ঘুরে।”

শ্রীকাজলা সোম



নতুন বই



(সমালোচনার অস্তিত্ব বই পাঠ্যবই)

ডাকটিকিটের জন্মকথা—শ্রীশচীবিলাস
রায়চৌধুরী। প্রজ্ঞা প্রকাশনী, পত্রিকা ভবন,
কলিকাতা ৩ হইতে শ্রীহরমলকান্তি যোগ
কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ৬/-

তোমাদের মধ্যে অনেকেই হয়ত ডাকটিকিট
সংগ্রহ কর। এ 'হবি' শুধু তোমাদের কেন,
অভ্যন্তরীণ লোক থেকে রাজা-মহারাজার
মধ্যেও দেখা যায়। এর জন্ম ঘর ঘরমত অবস্থা
সেই মত সকলেই বেশকিছু খরচ করে থাকে।
এই বিরাট পৃথিবীর বিভিন্ন দেশগুলির নানা
কাহিনী ও চিত্র অঙ্কিত আছে এই
ডাকটিকিটের মধ্যে। তারপর আছে, এই
ব্যবহার করা ও ব্যবহার না-করা টিকিটদের নিয়ে
ব্যাপক এক ব্যবসার দিক। ব্যবহার করা
টিকিটেরও যে বিশ্বব্যাপক সব দাম আছে এবং
হতে পারে, তা আগেকার দিনে অজান্তেই ছিল
অনেকের কাছে। বিশেষ করে আধারের সেশে
এখনও এমন অনেক লোক আছে, দ্বারা
ব্যাপারটির মোটেই গুরুত্ব দেয় না এবং এ থেকে
একদিন রাতারাতি যে ভাগ্য ফিরিয়ে ফেলা
যায়, তাও বিশ্বাস করে না। কিন্তু তা হলেও
আজকাল অনেক শিক্ষিত লোক ও ছেলেমেয়েরা
ডাকটিকিট সংগ্রহের যথেষ্ট গুরুত্ব দেন এবং এর
মধ্যে ইতিহাস, ভূগোল প্রকৃতি অনেক কিছু
শেখবার বিষয়ও যে ছড়িয়ে আছে তা স্বীকার

করেন। কিন্তু ডাকটিকিট সংগ্রহ করতে গেলেও
যে যথেষ্ট শিক্ষার প্রয়োজন, এবং সে সম্বন্ধেও
বোঝবার ও জানবার যে অনেক কিছু আছে,
তা বাংলায় লেখা এই বইখানির গ্রন্থকার
শচীবিলাসবাবু পূর্বে আর কেউই তেমন ভাবে
চিন্তা করেন নি। বইখানির নাম "ডাকটিকিটের
জন্মকথা" হলেও, এটি ডাকটিকিট সম্বন্ধে একখানি
অভিধান বিশেষ। ডাকটিকিট আবিষ্কারের
ইতিহাস থেকে আরম্ভ করে, সে সম্বন্ধে নানা
বিশ্বব্যাপক কাহিনী ও সরকারি সমস্ত বিষয়
গল্পের মত করে ধরে দেওয়া হয়েছে এই বই-এর
মধ্যে। গ্রন্থকার নিজেকে একজন বিখ্যাত ডাকটিকিট
সংগ্রহকারী এবং এ সম্বন্ধে অনেক বই তিনি
পড়াশোনা করেছেন। অসংখ্য ছবি কাহিনী-
গুলিকে জীবন্ত করে তুলেছে। ছাপা, কাগজ
ও বাঁধাই অত্যন্ত সুন্দর। বারাই ডাকটিকিট
সংগ্রহ করে, তাদের প্রত্যেকেই এ বই পড়া
ও সংগ্রহ করা উচিত।

—

মহাবিজ্ঞানী নিউটন—শ্রীকমলনাথরায়
ভট্টাচার্য। গুরুদেব বুক কোম্পানী, ২ জামাচরণ
সে গ্লিট, কলিকাতা ১২ হইতে প্রকাশিত।
মূল্য ১০/-

নিউটন সত্যিই মহাবিজ্ঞানী এবং বৈজ্ঞানিক
পূর্বাচার্যদের অগ্রতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। তাঁর

জীবনের কাহিনী নানা দিক থেকে বিবরণ করণ। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে তিনি স্নায়ুগ্রন্থ করেন, ইংলণ্ডে। তাঁর আবিষ্কৃত মাধ্যাকর্ষণ, ডিফারেনশিয়াল ক্যালকুলাস, ক্রিকশনাল ইলেক্ট্রিটি প্রভৃতিগুলি বিখ্যাত। তাঁর জীবনে রাজনীতিও আছে এবং কবেকখানি গ্রন্থও তিনি প্রকাশ করে বান। এই জীবনীর মধ্যে কিতীহবাবু হুম্মর ভাবে নিউটনের সমস্ত কাহিনী বর্ণনা করেছেন। তেমনদের সকলেরই বইখানি পড়ে দেখা উচিত। 'নিউটনের জীবনের ঘটনাপঞ্জী'টি এই বইয়ের একটি বিশিষ্ট অংশ। এর সাহায্যে পাঠকরা এক দৃষ্টিতে তাঁর জন্ম ও বংশ-পরিচয়, শৈশব, বিজ্ঞান ও বাণ্যজীবন, কৈশোর-জীবন ও খুল ত্যাগ, বৈজ্ঞানিক গবেষণা হুক, কর্তৃত্বজীবন, মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব, গবেষণার বিবরণ, রচনা, রাজনীতিতে তাঁর দান, মানসিক রোগ, সম্মানলাভ, শেষ জীবন ও মৃত্যুর বিবরণ জানতে পারবে। বইখানির মধ্যে ছবিও আছে অনেকগুলি। 'বিজ্ঞান-মাধ্যক-চরিত-মালা'র এটি দ্বিতীয় গ্রন্থ।

—

এরাউণ্ড দি ওয়ার্ল্ড ইন্ এইটি ডেজ
— প্রিয়ানব্রহ্ম বন্দ্যোপাধ্যায় অঙ্কিত। অক্সফোর্ড প্রকাশন দ্বারা, ৬ বন্ধির চাট্‌মো স্ট্রীট, কলিকাতা ১২ হইতে প্রকাশিত। মূল্য ২৮

জুল ভার্নের বিখ্যাত বই 'এরাউণ্ড দি ওয়ার্ল্ড ইন্ এইটি ডেজ'। সন্ন্যাসী লেখক জুল

ভার্নেকে আভিষ্কার রচনার ক্ষেত্র বলা যায়। কল্পনার ঘোড় ছিল তাঁর অতুল। এই কল্পনাগুলি তখনকার দিনে আশ্চর্য্য বলা হলেও তাঁর মধ্যে যে বাস্তব সম্ভবতার ইঙ্গিত ছিল তা পরে প্রমাণিত হয়েছে। অনেক বই লিখেছেন জুল ভার্ন এবং প্রত্যেকখানিই ছোটো-বড়ো সকলকে সমান ভাবে আনন্দ দিয়ে থাকে। এই বইখানিও কাহিনী যেমন হুম্মর তেমনি অল্পবয়সে হয়েছে হুম্মর। সংকীর্ণ হলেও কোথাও অসঙ্গতি ঘটে ওঠে নি। কলিকাতা, এলাহাবাদ, বোম্বাই, প্রভৃতি নগরও আছে এই ভ্রমণের মধ্যে।

—

ফসলের রোগ ও তাঁর প্রতিকার—
শ্রীমতীসুখার নাগ। শ্রীমণ্ডল গোবিন্দী কর্তৃক ২ বি, নেবুতোলা রো, কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত। মূল্য ৮০

বাঙলার মাটিতে একটি-না-একটি ফসল বার বার হয় হয়ে থাকে। কিন্তু চাষীর বা গৃহস্থের বহু পরিশ্রমের ফল সেই ফসল যদি কী-পতলে নিমূল করে দেয়, তাহলে কতি ও দুঃখের গীতা থাকে না! এই ক্ষতির প্রতিকার ও রোগ প্রভৃতির হাত থেকে ফসলদের রক্ষা করার জন্যে বইখানি লেখা। গ্রামে-ঘরে থেকে দারুণ চাষবাস করে এই বই তাদের পুঁই উপকার করবে।

—

শ্রীমতীসুখার সরকার কর্তৃক ১৪ বন্ধির চাট্‌মো স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত

ও ৩৯ বর্ষক প্রবু প্রেস, ৩০ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

মূল্য : চল্লিশ নয়া পয়সা



জলকে চল (টেবল-টপ ফটোগ্রাফি)

ফটো : শ্রীহরঃ রায়



দলে দলে যাত্রী চলে

শিল্পী : শ্রীশিবানী রায়চৌধুরী



৩৯ বর্ষ]

ফাল্গুন—১৩৬৫

[১১শ সংখ্যা

গ্রাহক-গ্রাহিকা সংখ্যা

বর্তমান সংখ্যাদানি 'গ্রাহক-গ্রাহিকা সংখ্যা' হিসাবে প্রকাশিত হয়েছে। এই সংখ্যায় ধারাবাহিক লেখাগুলি ছাড়া আর সবই প্রায় গ্রাহক-গ্রাহিকাদের লেখা। অধিকাংশ ছবিগুলিও তাঁদেরই। এই সংখ্যার জন্ম গল্প, প্রবন্ধ বা অজ্ঞান রচনা অপেক্ষা কবিতাই এসেছিল অধিক। সে জন্ম সাধারণ সংখ্যার চেয়ে কিছু বেশী কবিতা এই সংখ্যায় ছাপতে হয়েছে। ভালমন্দ মিশিয়ে লেখা এসেছিল অনেক, কিন্তু স্থানাভাবে অনেক ভাল লেখাও ছেপে ওঠা সম্ভব হয়নি। উক্ত ভাল লেখাগুলির মধ্যে কতকগুলি ক্রমশঃ পরবর্তী সংখ্যায় গ্রাহক-গ্রাহিকাদের লেখার পাতায় ছাপা হবে।

এই অবসরে তোমাদের মধ্যে যাদের লেখক-লেখিকা হিসাবে নাম করার আগ্রহ আছে তাদের জন্তে দু'চারটি কথা বলি।

কবি ও সাহিত্যিকদের একটি স্বতন্ত্র মর্যাদা আছে, তাঁরা ঠিক অল্প উপজীবিকার সাধারণ মানুষের মত নন। অল্প পেশার মানুষরা লেখকদের চেয়ে

হয়ত অনেক বেশী উপার্জন করে থাকেন, তাঁদের উপার্জনের কাছে লেখকদের উপার্জন হয়ত খুবই কম, কিন্তু তাহলেও লেখকদের মর্যাদা অনেক বেশী এই কারণে যে,—তারা স্বাধীন, তাঁরা স্রষ্টা। এই সৃষ্টির আনন্দ অনেক সময় তাঁদের অর্থ উপার্জনের আনন্দকেও হান করে দেয়। তাই নানা ছুঃখ-কষ্টের মধ্যেও তাঁরা লিখে যান অক্লান্ত-ভাবে। লেখনীর শক্তিও অসীম। সেইজন্য ইংরেজীতে একটি কথা আছে, 'Pen is mightier than sword.' অর্থাৎ অসির চেয়ে লেখনী অধিকতর শক্তিশালী। সত্যিই রচনার সাহায্যে একটি জাতিকে, সমাজকে সহজেই প্রভাবিত করা যায়। ব্যক্তিগতভাবেও মানুষকে অমুপ্রাণিত করে উত্থারের সাহিত্য। এই সাহিত্য মানুষের মনে যেমন উচ্চ আদর্শের প্রেরণা যোগাতে পারে, তাকে আনন্দ দিতে পারে, তেমনি পারে ছুঃখ, ভীতি ও বিশ্বয়ের উদ্ভেক করতে। লেখার বিষয়বস্তুর ভারতম্য ও লেখকের রচনাশক্তির গুণে এইসব অবস্থাগুলি জীবন্ত হয়ে ফুটে ওঠে পাঠকের মনে এবং কাল্পনিক ঘটনাও সত্য বলে তাঁদের মনের উপর রেখাপাত করে।

কিন্তু এই লেখার জ্ঞানও অমূল্যলন চাই, শিক্ষা চাই, আর চাই ঐকান্তিক নিষ্ঠা। ভাল লেখক হতে হলে সবচেয়ে যা প্রাথমিক প্রয়োজন, তা হচ্ছে ভাল করে লেখাপড়া করা। পড়াশোনা না করলে কিছুতেই ভাল লেখক হওয়া যায় না। সেই জন্তে তোমাদের মধ্যে লেখক হবার আগ্রহ যাদের, তাদের আগে খুব ভাল করে পড়াশোনা করতে হবে। রবীন্দ্রনাথ একবার এই লেখার বিষয় কথা প্রসঙ্গে একটি ছেলেকে বলেছিলেন, "ছোটবেলায় প্রথম বিজ্ঞানস্তরের সময় আগে আমরা লিখি ব'লে, অর্থাৎ আমাদের 'হাতেখড়ি' হয় ব'লে, আমরা বলি 'লেখাপড়া'। কিন্তু লেখক হতে হ'লে তোমায় বাপু সবার আগে পড়তে হবে বেশী ক'রে, এবং সে ক্ষেত্রে 'লেখাপড়া' না হয়ে হবে 'পড়ালেখা'।"

কথাগুলি যে কত সত্যি তা তোমরা যখন ভালভাবে লেখাপড়া করে মানুষ হয়ে উঠবে তখন বুঝতে পারবে।



(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

সামনে বিশাল-বিপুল জনতা। শুধু একতাল নির্বিচার মানুষের পিণ্ড নয়, শিক্ষিত বিদগ্ধ বুদ্ধিজীবীদের ভিড়। তার মধ্যে যাজক-পুরোহিতও অসংখ্য। পৃথিবীর ইতিহাসে কন্ঠিনকালেও হয়নি এত বড় ধর্মসভা। একই মঞ্চে পৃথিবীর সমস্ত ধর্মের সম্মিলন। কি করে বলব এদের সামনে দাঁড়িয়ে? স্বামীজির গলা শুকিয়ে যাচ্ছে, বুক কাঁপছে টিপটিপ করে, হাতে-পায়ে বল-বশ কিছু নেই।

প্রথমেই বলতে উঠল গ্রীক চার্চের প্রতিনিধি, জ্ঞান্দের আর্কবিশপ। তারপরে প্রতাপ মজুমদার। তারপরে পুং কুয়াং ইউ, কনফুসিয়ানিজম-এর প্রবক্তা। তারপরে চক্রবর্তী। তারপরে বৌদ্ধ ধর্মপাল।

‘এবার আপনি।’ স্বামীজিকে চিহ্নিত করলেন সভাপতি।

‘আমার নম্বর তো একত্রিশ।’ বললেন স্বামীজি।

‘তা হোক। এখনই বলুন। এ সকালের পর্বেই।’

‘না, এখন না।’ গম্ভীর হলেন স্বামীজি। ‘পরে বলব।’

স্বামীজি দেখলেন সবাই কেমন লিখে এনেছে বক্তৃতা। কি বলবে সব শুছিয়ে-গাছিয়ে তৈরি করে এনেছে। নিজেকে বিচার দিতে লাগলেন স্বামীজি—তার কেন এমন বুদ্ধি হয়নি? এখন আর লেখবার সময় কোথায়? কোথায় বা মিলবে এখন গবেষণার মালমশলা?

কেমন সবাই সানন্দ হাততালি পাচ্ছে, তার বেলায় সবাই বোধহয় ছি-ছি করে

উঠবে, ছি-ছি না করুক হয়তো বসে থাকবে বিরসমুখে। সভায় কোনো দীপ্তি থাকবে না, স্বাদ থাকবে না, ক্ষুধা থাকবে না। সব বিবর্ণ নিশ্চয় হয়ে যাবে।

বিকেলের পর্বে প্রথমেই ডাক পড়ল স্বামীজির।

‘এখন না।’

লোকটা কি দেবেনা নাকি বক্তৃতা? বারে-বারে এড়িয়ে যাচ্ছে কেন? সমুদ্রের মত জনতা দেখে ঘাবড়ে গিয়েছে বুদ্ধি? ছুঁচর কথা বলবার মতও সাহস নেই?

আবার ইঙ্গিত এল স্বামীজির কাছে।

‘আরো পরে।’

এ কি অকরণ! যদি মুখ বৃক্ষে নিজিয় হয়েই থাকবে তবে এলে কেন? আসবার জন্তে, টিকিট পাবার জন্তে কত না লড়াই করেছিলে? ভেবেছিলে এ বুদ্ধি ক্লাবঘরে বক্তৃতা না কি মাঠের চীংকার! যে ধর্মের প্রতিনিধিই এমন ভীকু সে ধর্মের আবার আফালন কি।

চুপ করে আছ, তবে চুপ করেই থাকো।

আরো চার-চার জন প্রতিনিধি তাদের লিখিত বক্তৃতা পড়লেন। যথারীতি হাততালি পেলেন সকলে।

প্রার্থনার ভঙ্গিতে আত্মস্থের মত বসেছিলেন এতক্ষণ, এবার উঠে দাঁড়ালেন স্বামীজি। এবার স্বামীজির বলবার লগ্ন।

দেখ, দেখ, কে দাঁড়িয়েছে মঞ্চে। যৌবনোজ্জ্বল কি মহৎ মূর্তি। কি আশ্চর্য সুন্দর পোশাক। দেখ, দাঁড়াবার কি দৃঢ়দীপ্ত ভঙ্গি। আর চোখ দেখেছ? প্রেম আর প্রার্থনা একসঙ্গে। বীর্ষ আর মাধুর্যের সংযোগ। পবিত্রতার অলঙ্কার যেন আঙ্গুরের মত।

কী না জানি বলে। কী না জানি তার বলবার।

সরসভীকে মনে-মনে বন্দনা করলেন স্বামীজি। মঞ্চে যিনি অধিষ্ঠিতা সেই বিভাষিদেবীকে নমস্কার।

অধিনৃত্ত মনে পড়ল বোধহয়।

কেউ বাণীকে দেখেও দেখেনা, শুনেও শোনেনা। কিন্তু কারো-কারো কাছে তিনি আপন স্বরূপ প্রকট করেন যেমন সুবাসা স্ত্রী পতির নিকট প্রকাশিত।

যিনি ত্রিশ্রীর মধ্যে ত্রিরাজ্যমানা সেই সর্বশ্রেষ্ঠকান্তি সরস্বতী আমার মানসসরসে নিত্য বিহার করুন। হে দেবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠা, মাতার মধ্যে শ্রেষ্ঠা, নদীর মধ্যে শ্রেষ্ঠা, আমাকে বিভা দাও, প্রশস্তি দাও, দাও প্রতিভা-কল্পনা তোমার চারহাতে অক্ষশূত্র, অঙ্কন, পাশ আর পুস্তক। তুমি আমার জিহ্বাগ্রে বাস করো। তুমিই ব্রহ্মা, তুমিই মেধা, তুমিই ধারণা। তুমিই মধুচ্ছন্দা। হে স্মিতমুখী শ্রুতগে, তোমাকে নমস্কার। ‘মাতর্মাতর্মমন্তে দহ দহ জড়তাং দেহি বুদ্ধি প্রশস্তাং। শাস্ত্রে বাদে কবিত্বে প্রসরতু মমধীর্মাণ্ড কুণ্ডা কদাচিৎ।’

প্রথম কথা কী বললেন স্বামীজি ? কী তাঁর সম্ভাষণ ?

লেডিস গ্যাণ্ড জেন্টলম্যান নয়, বললেন, সিন্টার্স গ্যাণ্ড ব্রাদার্স অফ আমেরিকা। এ আর এমন কি নতুন বললেন ? মামুলি লেডিস গ্যাণ্ড জেন্টলম্যান-এর চেয়ে বেশি কি ‘অভিনব।’ এতক্ষণ ধরে ভাষণে-বক্তৃতায় ঘুরিয়ে-কিরিয়ে এই কথাই তো বারে-বারে বলা হয়েছে যে সবাই আমরা এক পিতার সন্তান, পরস্পর সবাই আমরা ভাই-বোন। তাই স্বামীজির এই সম্বোধনে এমন কি বাহাহুরি।

বাহাহুরি এইখানে যে, ও শুধু মুখের কথা নয় ও প্রাণের কথা, সত্যের স্পর্শে গদগদ। শুনেছ কি উদাস্ত কণ্ঠ, যেন মুক্তদ্বার মন্দিরের ঘণ্টা বাজছে, আর এ স্বর তাপে তেজে ছন্দে গন্ধে অপূরণ। যদি এমনি কথার কথা হত, যদি না থাকত এতে সারল্যের সম্পদ, অন্তরের অমৃত, তাহলে কে করত প্রতিধ্বনি। বায়ুতরঙ্গে আরো অনেক কথার মত মিলিয়ে যেত বৃদ্ধ হয়ে।

কিন্তু এ বলায় হল কি ? করতালিতে উদ্ভাল হয়ে উঠল জনতা। এ মামুলি করতালি নয়, এ রুদ্ধ হৃদয়ের উদঘাটন। উল্লাসের জলপ্রপাত। শেষের সমর্থন নয় আরম্ভের অভ্যর্থনা। আরম্ভের জয়ধ্বনি।

এক মিনিট, দু মিনিট, তিন মিনিট—ধামতে চায়না। এমন করে কে কবে বলেছে ! কণ্ঠস্বরে মিশিয়েছে এমন প্রগাঢ় আন্তরিকতা ! কার এমন তেজঃপূর্ণ ব্যক্তিত্ব ! কার এমন উদার-উজ্জল ভঙ্গি ! শুধু একটা ভাবানুভূতি

নয় কার এমন সত্যের স্পষ্টতা। আমেরিকাবাসীর মধ্য দিয়ে বিশ্ববাসীকে সাহায্যন।

উত্তরোল থামতে চায়না কিছুতেই। উৎসাহে ঝাড়িয়ে পড়েছে অনেকে। হাততালির শব্দে মনে হচ্ছে দেয়াল-ছাদ ভেঙে চৌচির হয়ে যাবে। সমুদ্র হয়ে যাবে মানুষের জনতা। মানুষের হৃদয়।

একটি শব্দের জাছুস্পর্শে এমন অঘটন ঘটবে কল্পনার অতীত ছিল স্বামীজির। তিনি কিছুক্ষণ বিমূঢ়ের মত থাকিয়ে রইলেন। বুঝলেন একেই বলে আত্মশক্তি, মাতৃশক্তির লীলা। একেই বলে কৃপাশক্তির বিফোরণ।

কিন্তু লোকজন একটু শাস্ত নাহলে আমার বক্তব্যটুকু পেশ করি কি করে? শাস্ত স্থির দৃষ্টিতে তাকালেন স্বামীজি। শাস্ত, স্থির হয়ে গেল জনতা।

বলতে শুরু করলেন স্বামীজি। প্রথমেই পৃথিবীর তরুণধর্মদের প্রাচীনতম ধর্মের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা করলেন। আর সব ধর্ম নতুন, হিন্দুধর্ম প্রাচীনতম। আর সবধর্ম প্রবর্তিত হয়েছে, হিন্দুধর্ম সনাতন। হিন্দুধর্মই সমস্ত ধর্মের জননী।

হিন্দুধর্ম ছোটো জিনিস লিখিয়েছে—সহনশীলতা আর বহনশীলতা। শুধু সহ্যনা, সঙ্গে করে বয়ে নিয়ে বেড়াব। পথ দিয়ে ভূমিও চলো আমিও চলি—হিন্দুধর্ম শুধু এটুকুই বলেনা, বলে, ভাই, কাছে এসে, হাতের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলো। হিন্দুধর্ম শুধু মেনে নেয়না, টেনে নেয়।

আর হিন্দুধর্ম এ শেখায়, সবধর্মই সমান মহান্। সবধর্মই পৌঁছেছে ঈশ্বরে। সবরাস্তাই রোমে। যে পথ দিয়েই হোক, সোজাই হোক আর আঁকাবাঁকাই হোক, সব নদীই যেমন পড়ছে গিয়ে সমুদ্রে, তেমনি সবধর্মই মিলছে গিয়ে সেই পরমবিরামে। ‘যথা নদীনাং বহবোহুবেগাঃ সমুদ্রমেবাভিমুখা অবস্তি।’ এ কথাই আমার গুরু, আমার দক্ষিণেশ্বর, জীৱাম্বকক পরমহংস নিজের জীবন দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। জাতীয়-বিজাতীয় হেন সাধন নেই তিনি করেননি, কিন্তু সব সাধনেরই শেষ স্বাদ ঈশ্বর। যত পথ আছে তিনি বিচরণ করেছেন, যত মত আছে আচরণ করেছেন, এবং বলেছেন, যত মত তত পথ। মতই আর ঈশ্বর নয়, পথই আর প্রাপ্তি নয়।

কিন্তু সব মতে সব পথেই সেই পরম সৎসোধি। পথ বিচিত্র কিন্তু প্রাপ্তি এক। মত বিচিত্র কিন্তু মানুষ এক, মানুষের ঈশ্বর এক।

মিনিট পাঁচেক বললেন স্বামীজি এবং বলার শেষে যখন বসলেন সমস্ত আমেরিকা তাঁর পায়ের কাছে দৃষ্টিতে পড়েছে।

আর কারো বক্তৃতা শুনতেই চায়না জনতা। এর পরে আর যেন কিছু বলবার নেই। গাইবার নেই। আমাদের ছেড়ে দাও। আমরা যাব ঐ ভারতীয় সাধু কাছ। আমরা তাঁকে আরো কাছে থেকে দেখব। আরো অন্তরঙ্গ হয়ে শুনব।
ধরব তাঁর ঐ গেরুয়া আলখাল্লা।

আর, দেখেছ, কি শূন্যের ইংরিজি বলছে। স্পষ্ট, দ্রুত ও সাধু ইংরিজি! এমন অবলীলায় বলছে এ যেন তাঁর মাতৃভাষা। কোথায় শিবল এমন বলবার নৈপুণ্য। জনতাকে দাবিয়ে রাখবার ক্ষমতা। বিদেশী ইঙ্কলে-কলেজে পড়েছে নাকি কোনো-দিন? মাঠে-পর্বতে ঘোরা সাধু, এদের আবার শিক্ষায় রুচি, তার আয়াস। তবে এর বেলায় এ অসাধ্য সম্ভব হয় কি করে? সন্দেহ কি, অর্থশক্তি নয়, আত্মশক্তি— অধ্যাত্মশক্তি।

‘দর্শন’ বলে কোনো কিছু জানতনা আমেরিকা, কিন্তু স্বামীজির দর্শন পাবার জন্তে সবাই খেপে উঠল।

কি স্তম্ভিত আয়তশাস্ত্র চোখ দেখেছ। যদি একবার মুখের দিকে তাকায় মনে হয় যেন প্রাণ জুড়িয়ে গেল। পবিত্র হল দেহ-মন। ভেসে উঠল যেন আরেক জগতের ইশারা। চলো চলো এগিয়ে চলো ভিড় ঠেলে। এমন নয়নের প্রসাদ নেবেনা?

‘দেশে তুমি থাকো কোথায়?’ কে একজন জিগগেস করলে।

‘কখনো পাহাড়ে পর্বতে কখনো বা বাজারেবন্দরে। কখনো বা শহরের স্ট্রটপাতে। আমি সর্বস্বাধীন। সর্বত্র আমার গতিবিধি। রাজপ্রাসাদ থেকে গরিবের কুটির, ভিথিরির গাছতলা।’

‘খাও কি?’

‘যখন যা জোটে। না জোটে তো খাইনা।’

‘করো কি?’

‘মাধুকরী ।’

‘পয়সা নেই ?’

‘একটা কপর্দকও না ।’

কে একজন পোশাকে আকৃষ্ট হয়েছে । বললে, ‘এই বুঝি তোমার দেশের সাধুদের পোশাক ?’

‘এ তো তোমাদের দেশের বিশেষ এ-অস্থিষ্ঠানের জন্তে । এ তো ভালো, ভদ্রতম পোশাক । দেশে আমার গায়ে হয় ছেঁড়া কানি, নয়তো চট কিংবা চামড়া ।’

‘জাত মানো ?’

‘মানিনা ।’ গম্ভীর হলেন স্বামীজি : ‘জাতটা আমাদের সামাজিক প্রথা, ধর্ম নয় ।’

‘বিয়ে করোনি কেন ?’ এ একটি তরুণীর প্রশ্ন ।

‘কাকে বিয়ে করব ? যে কোন মেয়ের দিকে তাকাই আমার মা, জগন্মাতাকে দেখি ।’

হোটেল ফিরে এসে কাঁদতে বসলেন স্বামীজি । ঈশ্বরের কৃপার কথা ভেবে নয়, মুক্কে বাচাল করেছেন সে কৃতজ্ঞতায় নয়, কাঁদতে বসলেন বঞ্চিত অধঃপতিত দেশ-বাসীদের দুঃখের কথা ভেবে । আমার দেশের লোকের যখন এত দুঃখ এত দারিদ্র্য তখন এই যশ ও সমাদর দিয়ে আমার কী হবে ! যদি দেশকে টেনে তুলতে পারি এই অভাবের পঙ্কবুও থেকে, তবেই আমার যশ তবেই আমার সমাদর । (ক্রমশঃ)

মৌচাকের বার্ষিক মূল্য

আগামী বৎসর ১৩৬৬ সাল হ’তে মৌচাকের বার্ষিক মূল্য ৪ টাকা ২৫ নয়া পয়সার হলে ৫ টাকা করা হোল । কাগজের মূল্য অসম্ভব বৃদ্ধি পেয়েছে । কাগজের মূল্য কেবল বৃদ্ধি নয়, কাগজ সংগ্রহ করাও এক বৃদ্ধি অসম্ভব হয়ে পড়েছে । এ জন্য ঠিক সময় কাগজ বের করাও সম্ভবপর হচ্ছে না । এর উপর আছে গভর্নমেন্টের বিক্রয় কর । মৌচাককে বাঁচিয়ে রাখতে হলে এই সামান্য দাম বাড়ানো জিহ্ন আর কোন উপায় নাই । সেজন্য আমরা সকল গ্রাহক-গ্রাহিকাকে ও তাঁদের অভিভাবকদের অনুরোধ করছি, তাঁরা যেন এই সামান্য বর্ধিত মূল্য দিয়ে আমাদের সাহায্য করবেন ।

বার্ষিক মূল্য—৫ টাকা, ছয় মাসের মূল্য—২’৫০ প্রতি সংখ্যা—১’৫০ নয়া পয়সা

এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স (পি) লিমিটেড

১৪ বঙ্কিম চাট্জো স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

বন্ধু • শ্রীমুশান্ত চন্দ্রবর্তী •

দুই বন্ধু। প্রদীপ আর শঙ্কর।
গলায়-গলায় ডাব ছ'জনে। জন্মাবধি
একই গ্রামে তারা বাস করত।
প্রদীপ বিস্তালা পিতার একমাত্র
সন্তান। তার বাবা বর্ধমানের এক-
জন নামকরা উকিল।

শঙ্কর চাষার ছেলে। চাষ করাই তার পূর্বপুরুষদের একমাত্র উপজীবিকা।

গ্রামের মাইনর স্কুলে পড়বার সময়েই ছ'জনের বন্ধুত্ব হয়। কিন্তু কি কোরে এক ধনীপুত্রের সঙ্গে চাষার ছেলের ডাব ঘনিষ্ঠ হোলো সে ইতিহাস আমাদের জানা নেই।- বাক্ সে কথা। হ্যাঁ, তারপর মাইনর স্কুলের পড়া শেষ কোরে প্রদীপ বর্ধমান থেকে ম্যাট্রিক ও আই-এসসি পাস কোরে কোলকাতায় ডাক্তারী পড়তে যায়।...

এদিকে শঙ্কর মাইনর স্কুলেই পাঠ শেষ কোরে চাহবাঁস আরম্ভ করে।...

প্রদীপ যখন ডাক্তারী পাস কোরে গ্রামে ফিরে এলো, তখন সবচেয়ে বেশী আনন্দ হোয়েছিলো শঙ্করের। প্রদীপ যখন গোকর গাড়ি থেকে নামলো নিজের বাড়ীর সামনে, তখন শঙ্কর কি কাজে সেখান দিয়ে যাচ্ছিলো, প্রদীপ গাড়ি থেকে নামতেই সে বাগ্যবন্ধুর কাঁধে হাত রেখে বললে,—‘কি রে, পুরোন বন্ধুকে ভুলে ঘাসনি তো?’ প্রদীপ কোনো কথা না বলে গম্ভীরভাবে তাক্সিলাভরে শঙ্করের হাতটা কাঁধ থেকে নামিয়ে নিলো। কিন্তু শঙ্কর তাতে একটুও ক্ষুব্ধ হোলো না। তাবলে, ও ভেততে-পুড়ে এসেছে তাই মেজাজটা একটু খারাপ হোয়েছে। একে উপেক্ষা বলে না।...

এ সব ঘটনার পরও প্রায় পাঁচ-ছ'বছর কেটে গেছে। প্রদীপ আর শঙ্কর দু'জনেই এখন বিবাহিত। প্রদীপের একটিমাত্র ছেলে, তার নাম আশিস। বয়স, বছর তিন। শঙ্করের দুই ছেলে, এক মেয়ে।

শঙ্কর সময় পেলেই বন্ধুর বাড়ী যায়, কিন্তু বেশীরভাগ দিনই প্রদীপের দেখা পায় না। যেদিন প্রদীপ বাড়ী থাকে, সেদিনও শঙ্করের দেখা পেলেই সে ছ'চারটে কথা বলেই প্রয়োজনের অছিলায় বাড়ী থেকে বেড়িয়ে যায়।

শঙ্কর ভাবে, আহা ওর এত ঋতুনি, যে, বেচারি নিঃশ্বাস ফেলবার সময় পায় না। ডাক্তার-মাস্ত্রদের গল্প করবার সময় কোথায়!

আসল ব্যাপার কিন্তু অন্তরকম।

প্রদীপ ভাবতো, আমি একজন বড় ডাক্তার, আমি কেন সমান খুঁয়ে ওই ছোটোলোক চাষার



‘শব্দর আর চোখের মল চাপতে পারলে না’

চন্দনাটিকে ‘সীতারাম’ পড়াচ্ছিলো। চাকরের কাঁধে আশিশকে ঘেঁষে ‘আশিশবাবু’ বোলে ছুটে গিয়ে চাকরের কাছ থেকে ঢিনিয়ে তাকে কোলে তুলে নিলো।

প্রদীপ গভীরভাবে বললে,—‘ওহে, ওর নতুন হুটটা বয়লা করে দিও না।’

আশিশ পাখীটাকে ঘেঁষেই তার কচি তুলতুলে হাত বাড়িয়ে—‘পাখীটা আমাকে দাও-দাও’ বোলে চেষ্টাতে লাগলো। শব্দর আশিশকে খাচার কাছে নিয়ে গেল। আশিশ খাচার ভেতর আঙুল চুকিয়ে পাখীটাকে আদর করতে লাগলো আর নানারকম কথা বোলতে লাগলো তার সঙ্গে। হঠাৎ কখন সে খাচার দরজাটা খুলে দিয়েছে শব্দর তা’ লক্ষ্য করেনি। পাখীটা এই স্বযোগ নষ্ট না করবে সেই

সঙ্গে গল্প করবে? ছোটো বেলার বহুত্ব হয়েছিলো বোলে এখনও তার মের টানতে হবে নাকি?

প্রদীপ শব্দরকে এড়িয়ে ধেলেও, প্রদীপের ছোটো ছেলে আশিশ শব্দরকে খুবই ভালো-বাসতো। শব্দর প্রায়ই তাদের বাড়ী গিয়ে আশিশকে কত রূপকথার গল্প শোনাতো, ছোটো ছেলে সেজে তার সঙ্গে খেলা করতো, কোনো কোনোদিন তাকে কাঁধে কোরে বেড়াতে নিয়ে যেত। প্রদীপ বেনীর-ভাগ মিনাই বাড়ী না থাকায় এ সময়ের কোনই অহুঁখি না হতো না। আশিশ তাই শব্দর কাছ বসতে অভ্যস্ত।

দৈনিক প্রদীপ আর ওদের চাকর ঘনাই-এর কাঁধে চেপে আশিশ কোথায় যেন হাচ্ছিলো, শব্দরের বাড়ীর সামনে দিয়ে। শব্দর তখন দাঁড়ায় পাড়িয়ে তার মাথের

মুহূর্তেই হুড়ুং করে আকাশে উড়ে গেল। শব্দর সেনিকে চেয়ে শুধু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে। খোকাকে পাখীর জন্তে কান্ডে দেখে প্রদীপ বললে,—‘হাঁ! হে শব্দর, পাখীটাকে আকাশে উড়িয়ে দিলে, তবুও আশিসকে দিতে পারলে না?’

শব্দর আর চোখের জল চাপতে পারলে না। কয়েক ফোটা চোখের জল তার গালে গড়িয়ে পড়ে অন্তঃস্রাবী স্বপ্নের আলোয় চির্কিচ্ক করতে লাগলো।

দিন চারেক পরের কথা। শব্দরের ছোটো ছেলের খুব অসুখ হোলো। গ্রামেই বন্ধু ডাক্তার, কান্ডেই শব্দর ছুটে গেল প্রদীপের কাছে। প্রদীপ এসে অবস্তা এবং এসেই দু’মিনিটে ছেলেটিকে পরীক্ষা করে প্রেসক্রিপশন্ লিখে দিয়ে, তারপর কিয়ের জন্তে হাত পাড়লে। শব্দর আশা করেছিলো প্রদীপ হরত কিয়ের টাকা নেবে না, কিন্তু তারপর ডাবলে, আঁহা, টাকা না নিলে ওর চলবে কি কোরে! সে দু’টাকা বের করে দিলে বাস্তব বেকে। প্রদীপ ‘অসফোচে তা’ পকেটে ফেল দিলে।...

দু’মাস পরের ঘটনা। শ্রাবণ মাসের এক বিকল। তিন দিন অবিশ্রান্ত বৃষ্টির পর সেদিনই সব আকাশটা ধরেছে। এই অবিশ্রান্ত বৃষ্টিতে গ্রামের আকাবাকা পথগুলো বড় বেশী পিছল হোয়ে গেছে।-ছোটবড় কোনো ডোবা পুকুরই খালি নেই, সবই জলে ভরা। রাস্তা, ঘাট, মাঠ, বাড়ীর কাঁচা উঠোন সব জায়গাতেই কচি কচি ঘাস গজিয়েছে।

বৃষ্টি থেমে যেতেই প্রদীপ আর বাড়ীতে থাকতে পারলে না। সে আশিসকে কোলে নিয়ে বেড়াতে বেরোল। কিছুদূর গিবে আশিস বায়না করতে লাগলো,—‘বাবা আমি হেঁটে যাবো।’ অগত্যা প্রদীপ তাকে কোল থেকে নামিয়ে দিলে। বেড়াতে বেড়াতে তারা খালের ধারে যেতেই দেখানো শব্দরের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল তাদের। শব্দর তখন গামছায় কোরে খাল থেকে কিছু মাছ ধরে বাড়ী বাবার পথে পা বাড়িয়েছিলো, ওদের দেখেই ছুটে এসে সে বললে,—‘কি খবর আশিসবাবু?’

আশিস হেসে বললে,—‘জালো।’

শব্দর তাকে কোলে নিতে গেল, কিন্তু আশিসের তা’ মনঃপূত হোলো না। কারণ, সে তখন দেখছিলো খালের ধারে একটা গাছে কিহন্দর কনক ফুল ফুটে আছে।

দেখে তার মোড় হওয়ায় সে আস্তে আস্তে এগুজিল ঐ গাছটার দিকে।

আশিস যে ফুল নিতে এসিয়েছে, শব্দর বা প্রদীপ কেউই তা’ লক্ষ্য করেনি। প্রদীপ শব্দরকে তখন বলছিলো,—‘ওহে, তোমার স্ত্রীকে সেদিন যে দেখেছিলাম তার কিটা দিয়ে দিও। হাতে একটাও—’

হঠাৎ শব্দর চিন্তার কোরে উঠলো। প্রদীপ মুখ ফিরিয়ে দেখলে আশিস না পিছলে খালের

জলে হাবডুবু খাচ্ছে, এখুনিই ডলিয়ে যাবে। প্রদীপ জলে লাফাতে গিয়েও ইতস্ততঃ করতে লাগলো, কারণ, সে ঘোটেই সীতার চানতো না। শব্দর এক মুহূর্ত্ত দিখা না কোরে জলে আঁশিয়ে পড়লো। তারপর সীতারে গিয়ে জল থেকে আশিষকে তুলে তাকে পিঠে ফেলে ডাঙার দিকে এগিয়ে আসতে লাগলো। ঠিক এমনি সময় হঠাৎ চিৎকার কোরে উঠে শব্দর আশিষকে ডাঙার দিকে ছুড়ে দিলো—প্রদীপ ধরে নিলো তাকে। শব্দরকে এসে তখন গ্রাস করেছে নিরতি—এই খালে ছিল ওরদ্বার সব কুমীরদের বাস। হিংস্র একটা কুমীর শব্দরকে টেনে নিয়ে গেল মুহূর্ত্তের মধ্যে জলের অভূতলে।

যে বন্ধু ধন-মানের গর্বে নিজের স্বহৃদকে কখনো আপন ভাবেনি, সব সময় থাকে উপেক্ষা করে এসেছে, সেই গ্রামা, সরল বন্ধু শব্দর বন্ধু-পুত্রের জন্তে কত সহজে নিজের প্রাণ বিপর্জনে দিলে!

বেলা শেষে

শ্রীঅমুরাধা বসু

খেয়াল খাতার হিজিবিজি

বন্ধ করো কবি।

দিন যে তোমার স্কুরিয়ে এল

নিবছে জীবন-রবি ॥

মৃত্যু এসে দাঁড়ায়ে আছে

তোমার আঙিনাতে।

সাঁঝের বাতি উঠছে কাদি

ব্যথা-করা রাতে ॥

দুঃখ তোমার সাজে নাকো

কাদছ কেন তুমি?

নীরব রাতে ঘুমিয়ে পড়

ধরার আঁচল চুমি ॥

যা লিখেছ এই জীবনে

তাঁই হয়েছে বেশ।

তুলির টানে উঠল ফুটে

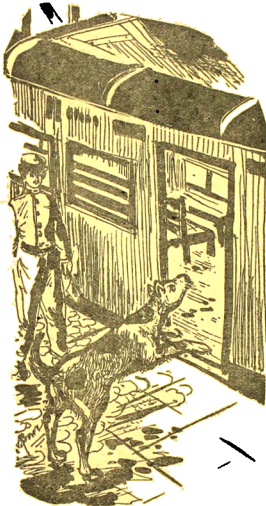
নতুন সুরের বেশ ॥

কবি, তোমার সাধের পূজা

হবে নাকো হারা।

তোমার গানই গাইছে দেখ

সন্ধ্যা রাতের তারা ॥



ট্রেনের কামরায় প্রভুকে খুঁজে বেড়াচ্ছে পিটার

প্রতীক্ষা

শ্রীপার্থ দত্ত ও শ্রীসিদ্ধার্থ দত্ত

বিলেতের কোন শহরের উপকণ্ঠে একটি ছোট গ্রাম। সেখানে এক ভদ্রলোক বাস করতেন। আপনার জন্ম বলতে তাঁর প্রায় কেউই ছিলো না। থাকবার মধ্যে ছিলো একটি কুকুর। তার নাম "পিটার"। প্রভুকে প্রাণভরে ভালবাসতো সে।

ভদ্রলোকটি রোজ সকালে ট্রেনে করে শহরে একটি কারখানায় কাজ করতে যেতেন এবং ফিরে আসতেন বিকেল পাঁচটার ট্রেনে। কুকুরটি রোজই সকালে প্রভুর সঙ্গে স্টেশনে আসতো। এবং যতক্ষণ না ট্রেন ছেড়ে যেত ভদ্রলোকের কান্না থেকে নড়তো না। যখন ট্রেনটি দৃষ্টির বাইরে চলে যেতো, তখন পিটার একাই বাসায় ফিরে আসতো। সারাদিন সে প্রভুর বাসা পাহারা দিতো, আবার বিকেল পাঁচটার আগেই স্টেশনে এসে হাজির হতো তার প্রভুকে আনবার জন্যে।

হুইসল বাজিয়ে ট্রেনটি স্টেশনে এসে ঢুকতো যখন, তখন পিটার ট্রেনের এ প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ঘোড়তো তাঃ প্রভুর খোঁজে। ভদ্রলোক যখন ট্রেন থেকে নামতেন, তখন পিটার কি করে যে তার আনন্দ প্রকাশ করবে ভেবে পেতো না। ভদ্রলোককে নিয়ে সে বাসায় ফিরে আসতো। তারপর সারা বিকেল, সার, সন্ধ্যা, তাই বন্ধুর মতো কাটাতে। এমনকি রাত্রেও পিটার তার প্রভুর খাটের উপর, তাঁর বিছানা উপর থাকতো। এমনভাবে তাদের অনেক দিন কেটে যায়।

এরপর হঠাৎ একদিন ভহলোক কর্মস্থলে তাঁর কারখানায় কি এক দুর্ঘটনায় মারা গেলেন। তাঁর দেহ এমন ভাবে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো যে, সংস্কারের জন্য যতদেহ গ্রামে আনা আর সম্ভব হলো না।

সেমিও পিটার স্টেশনে এসেছেলো। হইদিল বাড়িরে ট্রেনও যথাসময়ে প্রাটকর্ম চুকলো, কিন্তু ভহলোককে ট্রেন থেকে নামতে না লেখে পিটার অস্থির হয়ে উঠলো। তার আত্মল চৌৎকারে সারা প্রাটকর্ম সচকিত হয়ে উঠলো। প্রত্যেক কামরায় খুঁজতে লাগলো সে। কিন্তু কোথাও তাঁর প্রভুকে পেলো না। একে একে প্রত্যেকটি লোক ট্রেন থেকে নেমে গেলো। প্রাটকর্ম খালি হয়ে গেল। পিটার ক্রমে অশ্রদ্ধ হয়ে উঠতে লাগলো। তবে কি তার প্রভুর কোন বিশদ হয়েছে! ক্রান্ত হয়ে শেষে প্রাটকর্ম-এর একপ্রান্তে বসে রইলো পিটার। ঘণ্টা দুই পরে আরেকটি ট্রেন এলো। পিটার এবারও ট্রেনের সবগুলি কামরা খুঁজে এলো, কিন্তু প্রভুকে দেখে পেলো না। এইভাবে স্টেশনে যতগুলি ট্রেন আসতে লাগলো, পিটার সবগুলিই খুঁজতে লাগলো। ক্রমে রাত গভীর হলো, কিন্তু পিটার আর স্টেশন ছেড়ে বাড়ী গেল না। তার প্রভুকে নিয়ে তবে সে যাবে, আর তিনি তো এই পথেই আসবেন।

রাত ভোর হলো। নূতন ট্রেন আসার সঙ্গে আবার নূতন উত্তম খুঁজতে শুরু করলো পিটার। কিন্তু সবই বৃথা। খাওমাখাওয়া তুলে সে প্রত্যেকটি ট্রেনের প্রত্যেকটি কামরায় খুঁজে বেড়াতে লাগলো। এ ভাবে দিনের পর দিন পেরিয়ে সপ্তাহ গেলো, শেষে মাস এবং বছরও গড়িয়ে এলো।

শহরের সকলেই পিটারকে চিনতেন। তাঁরা তার এই অসীম প্রতীক্ষা দেখে চোখের জল আর আটকাতে পারতেন না। স্টেশনমাস্টার শুকে আদর-বহু করে বেতে দিতেন। এমনভাবে স্টেশনে প্রতীক্ষারত পিটারের প্রায় ন'শ বছর কেটে গেল। বুড়ো হয়ে গেল সে, কিন্তু তার প্রতীক্ষার আর শেষ নাই।

সেমিও শহরে বড়দিনের উৎসব। আকাশ থেকে অঝোরে পৌষা তুলোর মত বরফ পড়ছে। ঠাণ্ডা বড় বেশী। পিটারের ক্রান্ত শরীর এই ঠাণ্ডার প্রকোপ যেন আর সম্ব কয়েত পারছে না। শেষ ট্রেনটা প্রাটকর্ম এসে চুকলো। পিটার উঠে দাঁড়াতে গেল, কিন্তু আর পারলো না।

পরের দিন সকালে খাবার দিতে এসে স্টেশনমাস্টার দেখলেন পিটারের প্রাণহীন দেহ।

শহরের লোকেরা তখন চালা তুলে পিটারকে সমাধি দিলো আর তার উপর তুললো স্মরণ একটি সমাদিত্ত। পিটারের একটি ব্রোঞ্জের মূর্তিও তার উপরে বসিয়ে দিলো,—ঠিক যে ভাবে সে তার প্রভুর আশায় স্টেশনে হয়ে থাকতো সেই ভাবে, আর নীচে লিখে দিলো তার প্রতীক্ষার কাহিনী।

তোমরা যদি কেউ ঐ শহরে বেড়াতে যাও, তবে 'পিটারের' ঐ মূর্তিটি দেখে আসতে তুলো না যেন।



হাস্তরী

[উপন্যাস]

ষোড়ার্চ

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

মাটির ঘর, মেঘেটা উঠোন থেকে প্রায় তিন হাত উঁচু, চারিপাশে চওড়া ধারান্না মাটি দিয়ে গাঁথা। আটচালা ঘর, এক কোণে মাচার উপর নাচানো আছে ছোট ছোট মাটির জালা। পুখোন খবরের কাগজের উপর বালি, বালির উপর কয়েকটা গোল আলু ছড়ানো। জালার মুখ সবুজ দিয়ে ঢাকা। জালার মধ্যে বাটার চাল, দেখে আইশ, লাল আতপ, মৃগের ডাল, মটর কলাই আলাদা আলাদা রাখা আছে। ডালকাঠের কড়ি থেকে ঝুলোনো হাড়ির শিকে, তার মধ্যে কাঁথা। বিভিন্ন নম্বর কাঁথা, পর পর লাগানো। রঙ-বেরঙের পাড় দিয়ে সেলাই করা, ছুঁচের সেলাইয়ে নানা ধরনের ফুলপাতা আঁকা। রমা দেবীর ছুঁচের কাজের প্রশংসা করে সারা গাঁয়ের লোক। এমন কি, পাণের গ্রামের জমিদার গিন্নীও কাঁথা সেলাই-এর কৌশল শিখতে একদিন পাড়ী করে এসেছিলেন পিনাকীর মায়ের কাছে।

ঘরে ঢুকতেই পিনাকীর মনে পড়ে যায় কত কথা। মাচার তলায় কালো রঙের ডাঁড়, বাকের বলে ঢালান, সবধের তেল জেলে দেহ মা কুমাণদের হাতে। বাটার বোতলে রোঙ্গকার প্রয়োজন ঠিক করে নেওয়া এমন কিছুই কঠিন কাজ নয়, তবুও মা মাঝে মাঝে অসহন হয়ে যায়। খানিকটা বাটার সাবধান বাণী—গৃহস্থের সংসারে অপচয় পাণ...ঠাকুরমার তিরস্কার থেকেও রক্ষা নেই।—তিনি বলেন, ওগো বড়লোকের মেয়ে, চোখ বুজে কি বাণের বাড়ীর ধ্যান করছ? দেখতে পাচ্ছ না, বোতল উপচে তেল পড়ে যাচ্ছে, আমি বুড়ো মানুষ, আমি এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি।

অতীতের ভিন্নপত্র উড়ে চলে একটার পর একটা।...একদা পূর্ণবাস্যের অধিকাংশই মায়ের এই স্বাস্থ্যহানি, কঠিন বাধির কারণ কি? মা ঘুমিয়ে আছে, মায়ের উপর, ছেঁড়া ভোপকের তুলে বেরিয়ে এসেছে। ঠাকুরমার জর নেই আজ, বলে আছেন পুত্রবধূর পাশে, হাতপাখা দিয়ে বাতাস করছেন ঠাকুর মা। মায়ের মাথা শরীর চাপর ঘিয়ে ঢাকা। *পরিষ্কার কাপড়-চোপড়, বিছানা বালিস পছন্দ করেন মা। পুত্রবধূর সেবা করতে গিয়েই জর বাড়িয়েছে বুড়ী। এই বছরে কি এত কাঁচাকাচি, জল-খাটাবাটি লক্ষ্য হয়? আপনি কেন ওগুলো কাঁচতে গেলেন?—কীপ কঠে প্রতিবাদ জানিয়েছিল পুত্রবধূ। শাওড়ী উত্তর দেন নি, কাঁথা মুড়ি দিয়ে কৈশেছিলেন শুধু।

ঠাকুরমার বড় একটা জরজারি হয় না। পাশের গ্রামেই তাঁর জর। তাঁর জীবনের ইতিহাসে মাত্র একটিবার আর্থহাওয়ার পরিবর্তন হয়েছিল—যেবার তিনি গল্প বান করতে গিয়ে ওঠেন ক'লকাতার বেয়ানের বাগার। ভালই ছিলেন, শুধু কয়লার ধোঁয়ার একটু মাথা ঘরেছিল, এই বা।

রূপকহারীর রূপ ছিল, সম্ভেদ নেই। গোরবর্ণা, মুখ চোখ হৃদয়, কিন্তু রূপের সঙ্গে শরীরের ওজনও ছিল কম নয়। অনাপবান, বিয়ের পর বাড়ী ফিরবার পথে ঠাকুরমা ও ঠাকুরমা দু'জনে গলা ভড়াভড়ি করে পালকী ছিঁড়ে পড়ে বান ধনাসু করে খালের মধ্যে। দেওয়ান মারোর শুকনো খাল, ভাগ্যিস বালি ছিল, কাদার মধ্যে পড়লে বিয়ের বেনারসীটাই নষ্ট হয়ে যেতো ঠাকুরমার।

গল্প শুনে হি হি করে হেসেছিলো পিনাকী। গ্রীষ্মের উত্তাপে বুকের উপর কাপড় রাখতে পারতেনা ঠাকুরমা। শীতলপাটি নাওয়ার উপর বিছিয়ে গড়াগড়ি দিতেন। পিনাকী প্রশ্ন করেছিল ঠাকুরমাকে—আচ্ছা ঠাকুরা, ঠাকুরদী নাকি এক পোয়া ঘি হাতে করে নিয়ে চুমুক দিয়ে বেড়ে ফেলতেন?

ঠাকুরমার গল্প আর শেষ হতে চায় না।

এক পোয়া ঘি যিনি গুত্তরের তলীতে খেয়ে ফেলতেন বোজ, দু'চার সের দুধও যিনি অবলীলাক্রমে পান করে করে স্বহসেহে হেলতে হুলতে ক্রোশের পর ক্রোশ পথ অতিক্রম করে যেতেন বল্লমান ও শিঙবাড়ী, সেই পূর্ণপুঙ্খ অরিগণ স্বর্ণকান্তি বিরাট মেহের মালিক ঠাকুরদীকে কলনার চোখে দেখতে চেষ্টা করে পিনাকী।

ঠাকুরদী অন্ন বয়েদেই মাথা গেলেন কেন? রোগা রামচরণ ঠাকুর তো এখনো আশি বছর পার হয়ে বেঁচে আছেন!...

রাশি রাশি কৌকড়ানো চুল ছড়িয়ে আছে মায়ের মুখের চাষিপাশে। কিছুটা পড়েছিল মাটির উপর। পিনাকী এগিয়ে আসে। আলপোছে তুলে রাখবার চেষ্টা করে মায়ের কানের পাশ দিয়ে। পিনাকীর আঙুলের স্পর্শে রমা দেবীর তসসা ভেঙে যায়। একটু অগ্রদত্ত হয় পিনাকী।

মুহুর্তা ভাঙানো উচিত হয় নি; মায়ের পা ছুঁয়ে প্রণাম করবার জন্য হাত বাড়ান পিনাকী। বাবার কাছে শিক্ষা, অনেকদিনের পর দেখা হলে গুরুজনকে প্রণাম করতে হয়। জননী জয়কৃষ্ণিক স্বর্গাধিপ গরীমদী—দীহমামার বইতে লেখা আছে।

ঠাহুরমা হাঁ-হাঁ করে ওঠেন, করিদ কি, করিদ কি! শোয়া মাহু, রোগা মাহু, প্রণাম করতে নেই। অমঙ্গল হয়।

অমঙ্গল হয়! অমঙ্গল মানে মৃত্যু নয় তো? পিনাকীর বুকটা ছাঁৎ করে ওঠে। মৃত্যু, মৃত্যুর ছায়া কি দেখা যাচ্ছে মায়ের চোখের কোণের কানিমায়, পাতুর ওঠে, ক্লিষ্ট ভ্রূর আঁহুতনে? মৃত্যু, মৃত্যুর প্রকৃত অর্থ কি?

কিছু দিন আগেও মা ডাকতো, পিনাকী, পিছ, দোনামনি, বাছুমনি, লক্ষী আমার, খেয়ে নাও ছুটুছু...লালখাতা কিনে দেব, 'আরো গল্প' কিনে দেব, কলকাতা থেকে ট্রামগাড়ি আনিবে দেব, আলু পুতুল, ডলি পুতুল, মত্ত বড়, খেয়ে নাও। এখন আর ডলি পুতুল পাবার জন্য লালস্রিত নয় পিনাকী। 'আরো গল্প' নীলিমাদের বাড়ী থেকে আনিবে পড়ে ফেলেছে সে; কিন্তু...কিন্তু...বিবর্ণমুখে পিনাকী ভাবে অক্ষয় পোদ্দারের বউ-এর মতন মাও কি শেষে মিলিয়ে যাবে আকাশে? সবাইকে ছেড়ে চলে যাবে মা, আর দেখা যাবে না কোন দিন?...

মায়ের সঙ্গে ভাব ছিল পোদ্দারের বউ-এর। পোদ্দার নৌকো বেয়ে নিয়ে আসতো বউকে এপাশে, বলতো—ও কলকাতার ঠাট্টাবুদি, আসেন, বাইরি আসেন, স্কাহেনশেন কিডারে আনিছি। এটুই মেহার শোনায়, বুকের পেন দেখি।

বাড়ীতে নম্র শান্তি কেউ নেই, একা অক্ষয় পোদ্দার, আর তার নববিবাহিতা তের-চোদ্দ বছরের ফুটফুটে বউ। পোদ্দারের আশা, পিনাকীর মায়ের সংস্পর্শে এসে যদি বউটি চালাক-চতুর হয়, বুদ্ধিভক্তি বাড়বে, হাজার হোক কোলকাতার জন্ম, পাড়গাঁয়ের বউদের চেয়ে অনেক বেশী খোঁজ-খবর রাখেন। আরও কিছু উদ্বেগ ছিল হয়তো পোদ্দারের মনে। প্রদ্যমনের ব্যাপারে অনেক কিছু জানা আছে লহরের সেরেব। কর্ণা, টুকটুক বউ, এমন বউ—সাহা, পোদ্দার, কুণ্ড, তিলি, কালুর বাড়ীতেই নেই, কেউ স্মরণ করতে পারে না, ছিল কোন দিন।

পোদ্দারের বাড়ীর উত্তরে কালবন। কালবনের আরো খানিকটা ঘুরে নদীর বাঁক ঘুরে গিয়েছে। সেই বাঁকের মাথায় স্মরণ। এ অঞ্চলের স্মরণ। মাঝে মাঝে মৃত দেহ পুড়তে দেখা যায়। পিনাকীমের ঘাট থেকেই দেখা যায়—ভস্মীভূত দেহ ধোঁয়ার কুণ্ডলী হয়ে উড়ে চলেছে আকাশে। অনেকক্ষণ ধরে যদি ধোঁয়া থাকে তাহলে বুঝতে হবে এখনো আধিতোড়িত দেহের আকর্ষণ রয়ে গিয়েছে পৃথিবীর উপর।

অন্ধর পোন্ধারের দৃঢ় বিশ্বাস, তার বউ মরে অর্গে গিয়েছে। স্বপ্ন-ঘরে একদিন তামাক টানতে টানতে বলেছিল পোন্ধার, পিনাকী ঘরের কোণে ঝোড়ার বসে শুনে গিয়েছিল সব কথা।— জানেন ঠাউরদা, রাত্তির হলিই তেনারো দেখে যায়।

প্রজ্ঞাত্বরের গা শিরশির করে ওঠে, সর্বেশ্বরও গম্ভীর মুখে শুনে বান।

একখানা শাদা শাড়ী পরে আসে পোন্ধারের স্ত্রী। তেঁতুলগাছের উপর দিগে রথে চড়ে আসে অর্গ থেকে।

—কি কবে ঠাউরদা, মহালে উটে দেখি উঠানে আর ধুলো নেই, বাড়ী, ঘর দুয়ের, পাঁচদুয়ের সব ঘন পোমাই দিয়ে ল্যাগ। হুইছিল কি ব্যাপারভা তাহলি খুলেই বলি : কাল রাত্তিরি আ'সে গাড়ায় ছেলেন রাস্তাঘরের দরজার গোড়ায়। কলেন, ভালই আছি, সুখে আছি, দুখ'খ' বা জোয়ার ভক্তি। তুমি আর এটো দেখে-শুনে বিরা কবো।...সংখর জুড়ুং জুড়ুং তামাক টানেন, কোনো উত্তর দেন না। পিনাকীর মনে বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত চিন্তার ভিড়। অস্পষ্টভাবে পিনাকীর মনে পড়ে কোথায় ঘন দিদিমার বেতের কাঁপি থেকে কি একটা। বই বের করে সে পড়েছিল একদিন। পাণপুণ্ডার ফলারল, পূর্বজন্ম, পরজন্মের চমকনার কাহিনী, অনেক তথ্যকথা লেখা ছিল সেই পল্ল। দাবিত্রৈত্র্য পালন করে চলেছেন বৎসরের পর বৎসর ঠাকুরবা। আশা, পরজন্মে স্বামীর আগেই যেন বেতে পারেন তিনি। পুণ্যবতী মা—মায়ের কপালে বৈখ্যা নেই, কৃতীতে লেখা আছে, দিদিমার কাছে শুনেছে পিনাকী।...

না, না, মাকে ছেড়ে পিনাকী একদিনও থাকতে পারবে না। মায়ের সঙ্গে সেও অর্গে যাবে। ভগবান মধুবন হরি, ভগবান, গোবিন্দদেব, নারায়ণ—মাকে ভাল করে দাও।...

কারমনোবাক্যে ডাকলেই ভগবান শাড়া দেন, অস্বরোধ বন্ধ করেন। কি করে কারমনোবাক্যে ডাকি বার ভগবানকে ? কে শিখিয়ে দেবে ?...

ভগবান বহি আদেশ যেন—বমের মাথা নেই মাকে কেড়ে নিয়ে যাবে পাঁতালো। কাতর নরনে পিনাকী দরজার ঠাক দিগে আকাশের দিকে দৃষ্টি কেয়ার।

আকাশ, মহাশূন্তের উপরেই তো ভগবানের অবস্থান।

কি হয়ে ভগবানকে ডাকলে ব্যাধি থেকে মুক্তি পাবে মা ? আবার হাসি ফুটেবে মায়ের মুখে ? মা, মায়ের কি স্বপ্নের চেহারা ছিল, কিন্তু—

একি মৃতি হয়েছে আঁধ !

জুহু হাড় ক'খানি।

দরীয়ে আর কিছুই নেই।

মাঝের চোখের ইন্ধিতে পিনাকী কাছে এসে বুক ঘেঁষে বসে। রমা দেবী অভিকষ্টে নীরব বাজ তুলে পিনাকীর মূখের উপর হাত বুলিয়ে দেখে নেন। যেমনটি ছিল তেমনটি কি কি করে এসেছে?

বয়স বেড়েছে কৈ?

...শিখ—ঐতুড়ঘরের ছোট্ট সেই শিখ এইতো সেদিনকার কথা, কি বৃষ্টি হয়েছিল সেদিন!...

আকাশের ক্রান্তনের মধ্যে যে শিশুর জন্ম, সেই শিশুর ভবিষ্যৎ কি উজ্জল স্বর্ষের কিরণে ভরে উঠবে? অথবা কেবলি মেঘে মেঘে ঠোকাঠুকি, বিদ্রোহ রক্তে রক্তে ঘাবে আকাশ? শুধু বৃষ্টি, বৃষ্টির পর বৃষ্টি—বর্ষময়ী লিখেছে শিলং থেকে, চেরাপুঞ্জী বেড়াতে গিয়েছিল, বর্ণনা করে লিখেছে। পুঞ্জীকৃত মেঘ, মেঘের উপর মেঘ, বৃষ্টি লেগেই আছে। কাকীয়ার কাছে এখনো নিঃশব্দ চিঠি লেখে বর্ষময়ী। মাসের মধ্যে একবার অল্পতঃ একটা চিঠি লিখে দে সংবাস মেঘ। পিনাকী কেমন আছে, পিনাকী কি করছে, পিনাকীর কাছে চিঠি লিখলে সে চিঠির উত্তর নিতে ভরানক দেবি করে কেন। কাকীয়া তুমি কেন নিজ থেকে চিঠির উত্তর লেখ না, তিনবার চারবার চিঠি লেখার পর কয়েক লাইন লিখে ছেড়ে দাও।...তোমরা আমাকে তুলে গেছ একেবারে ইত্যানি, ইত্যানি।...যেহেঁতর এখনো ছেলেমেয়ে কিছুই হ'ল না—রমা দেবী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেন শুয়ে শুয়ে—কি আমি কেন!...যেহেঁতর তাই শিখকে কাছে রাখতে চায়। এতদিনে বুঝলাম।...

—শিখ, তুই কিছু খাস নি, আমি বেশ বৃত্ততে পারছি, জান করে গেলে নাওগে যাও। তোমার লক্ষ্যশক্তি তোমার অন্তঃকেন্দ্র চাপিয়েছেন, বলে দিয়েছিলাম, আয় ঘেরি করি নি।

পিনাকী মাঝের খাণ্ডাবিক কণ্ঠস্বরে ভরসা পায়। ছুঃখপের মতন সমস্ত দুষ্কিন্দা মিলিয়ে যায় অকস্মাৎ। উৎসাহের সঙ্গে বলে, হা, হা, জান তোমার অন্তঃকেন্দ্র কি এনেছি? দাঁড়াও দেখাচ্ছি।...

চকল বালক লাড়িয়ে চলে।

উঠন পার হয়ে যায় এক নিঃশ্বাসে।

বইয়ের ওজনে ভারী বোঁচকা। বুক সমান উঁচু বারান্দা। বৃষ্টির জল জমেছিল চালের নিচে। শিখলে পড়ে যায় পিনাকী। বোঁচকার বাঁধন আগে থেকেই আলগা হয়ে গিয়েছিল—বাঁধায় আসতে আসতে ছড়িয়ে পড়ে সমস্ত গিনিপ। বই, খাতা, পেনসিল, প্যাক্ট, জামা, খেল, মাঝের অন্তঃকেন্দ্র আনা শাড়ী এক ছোড়া। আরো টুকিটাকি কত কি সংগ্রহ করে এনেছে পিনাকী। রূপোর কোঁটাটা সিঁদুর-ভরা, সাখনা বাসী দিয়েছে মাঝের অন্তঃকেন্দ্র। ডালা খুলে পড়ে যায় সিঁদুর, সাড়ীর উপর।

ভিত্তি উঠন লাল হয়ে ওঠে।...

...“দাঁড়াও, আমি গুছিয়ে দিচ্ছি।” মিস্ট্রি খর ভেঙ্গে আসে কানে।

পিনাকী ঘাড় ফিরিয়ে দেখে।

বেলা, বেলা কখন এসে ? কোন পথ দিয়ে ?

—খুব লেগেছে, না পিছুনা ?

—না বে, বেশী লাগে নি।

অবাক হয়ে পিনাকী দেখে—বেলা, সেই ছোট বেলা, দাঁড়া কি করে অত ঢাঙা হয়ে গেল ?
বোসেমের বাড়ীর বেলা বলে, পিছুনা, তোমাকে সাহেবের মতন ফর্সা দেখাচ্ছে।

চলতে চলতে উত্তর দেয় পিনাকী—যাঃ, তুই ভারী বোকা। সাহেবরা আমার চেয়ে অনেক বেশী ফর্সা।

নদীর তীরে আগশেওড়ার বন। লোকে বলে আটেল বন। আটেলের ডাল ভেঙ্গে দাঁতন করে গায়ের লোক। নিমের দাঁতনের চেয়েও ডাল ত্রাশের কাজ হয় আটেল ডালে। লাল লাল ছোট ছোট কল, পাকলে খায় ছেলেমেয়ের।

লক্ষী চায়া গাছের গুড়ি পড়ে আছে, ছহুয়াম কুড়ুল দিয়ে তোলা করে। মাটি খুঁড়ে উঠিয়েছে গুড়িটাকে। তাতে আর একটা আমগাছের চায়া লাগানো হবে। কলম বেঁধে রেখেছে বতিকাস্ত। মালমাই গাছের ডালে খড় দিয়ে ঢাকা মাটির প্রলেপ। এর মধ্যেই প্রলেপকে আঁকড়ে ধরেছে নতুন শিকড়। শাখার মধ্যেও প্রাণ, প্রাণাখার বীজ। প্রাণ হতে প্রাণ, নবজীবনের সঞ্চার। খড় দিয়ে ঢাকা কলমের ছোট্ট শিকড়গুলি টেনে নেয় পিনাকীর মন।...

শেফালী গাছের তলাটা কি হৃদয়, পরিষ্কার—কীটি নিয়েছে কে ? বেলা বলে, জানো পিছুনা, ছোট্টমা একদিন স্বপ্নে দেখেছিলেন তুমি একজন ঘটাছুঁটারী মল্লোপীর সঙ্গে কথা বলছ। ঐখানটার বসে, এমন সময় একটা সাপ, মস্ত বড় সাপ, মাথায় মণি, বেরিয়ে এলো গর্ত থেকে, এসে মাথা দোলাতে লাগলো। ছোট্টমা ভাবলেন বুঝি তোমাকে ছোঁবল মিতে যাচ্ছে। চীৎকার করে উঠলেন। বেই না চীৎকার করেছেন, সাপটা অমনি গজরাতে শুরু করল। স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল।...

স্বপ্ন, ভোরের স্বপ্ন—ভালবার পর যদি আর ঘুমোনো না যায়, তা'হলে স্বপ্ন সত্যি হয়। স্বপ্ন দেখেছে পিনাকী—সে আর বেলা হেঁটে চলেছে নদীর ধার দিয়ে মহাকুমা শহর লক্ষ্য করে। কেন যে বাচ্ছে তারা, তার কোন মানে নেই। শুধু মনে আছে চলেছে তারা, শুধু হেঁটেই চলেছে। দেওয়ান-মারোর শুকনো খাল পূর হয়ে বেই মুচিপাড়া পর্যন্ত গিয়েছে তারা, অমনি কানে গেল ঢাকঢোল বাজিয়ে পূজো হচ্ছে। পূজো করছে কারা ? অলময়ে দুর্গাপূজো ? ওমা, একি, এ যে ঘোনা মুচি—আরতি কংছে...মা দুর্গার প্রতিমার সামনে। কোথায় মা দুর্গা ! নিমেষের মধ্যে মিলিয়ে গেলেন ! পিনাকীর মা। মা-ই কি তবে দুর্গাতিমাশিনী ? ঘোনা মুচি ঘটা নাড়া বন্ধ রেখে বলে পিনাকীর হায়ের দম্মাতেই তার রূপ, মৃতপ্রায় ছেলে বেঁচে উঠেছে।

—স্বপ্ন—কি আশ্চর্য। ঘোনা মূর্চির ছেলে—তোমাকে একটা হৃদয় লাগ-মুখো বেতের লাঠি উপহার দিয়েছিল, মনে নেই?—বেলা মিটিমিটি হাসে।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে আছে—বলনা, কি বলছিলি।

—ওর নাম মাহ। মাহ বেঁচে গেল শুধু জ্যোতিষার জন্তে।

—কি হয়েছিল রে?

—সে কি! তোমরা কেউ জানো না? এতবড় কাণ্ড হয়ে গেল, কোলকাতার কেউ তোমরা পোনো নি! ঘোনা মূর্চি তোমাদের গোলা থেকে খান চুরি করছিল, খরে ফেলল খলা চোকিলার—কি মার! জ্যোতিষা না থাকলে মার পেয়েই মরে যেতো ঘোনা। কি রোগা চেহারা, ম্যালেরিয়ার ভুগে ভুগে একটাও খাদ্য খানাতে পারে নি; ছেলের অস্থব, তাই চুরি করতে এসেছিল। ছেড়ে দাও গকে—বললেন জ্যোতিষা।

শিনাকী চূপ ক'রে শোনে, কোনো কথা বলে না। বেলা বলে—জানো শিশুদল, জ্যোতিষা গলার হারটা বেচে গিয়েছেন। হাতে টাকা ছিল না তাই। মাহর ডবল মিউমোনিয়া। বড় ডাক্তার এসেছিলেন যত্নসূচক। ঘোনা মূর্চির কি কান্না, জ্যোতিষার পায়ের উপর বাধা কুটছিল। কেবল বলছিল—মা বাঁচান আমার ছেলেকে বাঁচান। জ্যোতিষার বাড়ী ছিলেন না সেদিন। আমি এসেছিলাম কুলের আঁচর দিতে জ্যোতিষাকে।...

বেগা মনোনিবেশ লহকারে উঠনের কোণায় বাধা গোবরগোলা-ভর্তি ভাঙ্গা হাড়িটা তুলে নেয়। ঢেলে দেয় শেফালীগাছের ডলায়। গন্ধরাজের ঝাড়ের নিচেই পড়েছিল মুড়ো ঝাঁটা। বাটা হাতে কোমর বেকিয়ে দাঁড়ায় বেলা।

—গোবর গোলা নষ্ট করলি! এখুনি স্থবীর মা এসে চীৎকার করবে।

বেলা ভংগনার কান না দিয়ে বলে চলে—আরো অনেক ব্যাপার ঘটে গিয়েছে। তোমার ঠাট্টার মার কি রাগ! তোমার বাবা কিন্তু কিছু বলেন নি, শুধু মুখ গম্ভীর করেছিলেন।

—কি ব্যাপার, খুলে বল না—তুই কেবল কথা বাড়ান।

—হ, আমি কথা বাড়াই! আর তুমি খুব সোজা কথা বল—তোমার বাবাই তো বলেন শিনাকী কথার ইস্তিহার, খালি চাকা ঘুরছে, আর মুখের নাল কাটছে।

—খুব ইয়ারকি নিতে শিখেছ, না। এই বৃত্তি তোমার বৃত্তিমুখি হচ্ছে। দাঁড়াও বলে দেব কাকীমাঝে।

শিনাকীর অদ্ভুত মুখভঙ্গি ও ভাবার গাভীর্বে বেলা বিলম্বিত করে হেসে ওঠে।

হি, হি, হি, কিছুতেই সে হাসি থামাতে পারে না। পিনাকী অবশেষে বিরক্ত হয়ে বলে—
আমি চললাম। আমার অনেক কাজ আছে। তুমি হানো, যত পারো হানো।

অনেক কাজ, কি কাজ? পিহুগা, তুমি জারী হ'য়ে—বাক্যে বলে, ঐ যে ছহুয়াম কি যেন বলে।...

—কি যেন বলে!...পিনাকী মুখভ্যাংচি দেয়। বলে—যাব এক গাঁটা, তখন বুঝতে পারবি!

পিনাকীর বাগ দেখে বেলার ছেলেমাছবী আরো বেড়ে চলে। পিনাকী ভাড়া ক'রে বায়
বেলাকে ধরতে। বেলা ছুটে বায় ঝানিকটা, তারপর হাঁপাতে হাঁপাতে ধরা দেয়। পূর্বের মতন
মন আর নেই পিনাকীর। দোলানো বেগী ধরে টান দিতেই বেলা মুখ ঘুরিয়ে পিনাকীর দিকে চেয়ে
হেসে ফেলে আবার। বলে—বলবো না, কিছুতেই বলবো না। আগে বলো কেন চিঠির উত্তর
দাও নি—কেন—কেন? তোমার উপর এমন বাগ হয়েছিল তখন। পিছলে পড়ে গেলে তাই,
না হ'লে...

না হলে কি?

(আগামী বারে শেষ হবে)

এই সংসার স্বপ্ন নয়

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

উদ্বোধনগেতেই ভাগ্য গঠন

ভাগ্য নিজে বস্তু নয়,

আশা ও উৎসাহের কর্ম

সফল হবেই নেইকো ভয়।

অলস যারা এ সংসারে

ভাগ্য-দোহাই দেয় তারাই,

উৎসাহীরা কাজ করে যায়

দোহাই দেওয়ার নেই বালাই।

আশা ও বিশ্বাসের সাথে

কর্ম করো সর্বদা,

বৃথা সময় নষ্ট করাই

এই জীবনের মূর্ত্তা।

কর্ম করো সুনাম লভো

এই সংসার স্বপ্ন নয়,

মানুষ সত্য, জগত সত্য

সত্য ব্যাপ্ত বিশ্বময়।

এলিফ্যান্টা গুহা

— শ্রীউত্তরা সেন —

বোম্বাইতে থারাই আসেন, তাঁরা সকলেই অন্তান্ত শ্রেণীস্থানগুলি দেখার সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রের মাঝখানে এলিফ্যান্টা গুহাও দেখতে যান। আমরাও আর সকল শ্রেণীস্থানগুলি দেখে, একদিন এলিফ্যান্টাও উদ্দেশ্যে পাড়ি জমালাম।

বোম্বাইকে ঘিরে সমুদ্রের চারপাশে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ দূর থেকে আবছায়ায় রত দেখা যায়। এরই একটা দ্বীপের পাহাড়ের ভিতর এলিফ্যান্টার অতুল সৌন্দর্যরাজি লুকিয়ে আছে।

প্রায় বেড় হাজার বছর আগের সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীর এই গুহাগুলিতে এখনকার হিন্দুদের মত্যতা ও সংস্কৃতির ছাপ ফুটে উঠেছে।

নিরিবি বিনে আমরা 'গেটওয়ে অব ইন্ডিয়া' থেকে একটা লক ভাড়া করে এলিফ্যান্টার উদ্দেশ্যে পাড়ি জমালাম। সেরিন আকাশ ছিল ঘন নীল। আকাশের সেই ইন্দ্রনীল রঙ সমুদ্রের বুকেও কলকলানীলাত ছাড়া। দূরে দেখা যাচ্ছিল দূসর দ্বীপগুলিকে। আমাদের লক কিস্কিন্ধ করে জল কেটে ঐ দূসর দ্বীপগুলির মধ্যে একটা দ্বীপের উদ্দেশ্যে চলতে লাগল।

দেখতে দেখতে সমুদ্রের ঢেউ-এর দোলার হুলতে হুলতে এসে পৌঁছলাম এলিফ্যান্টা দ্বীপে। আমাদের লক এনে তীরে তিড়ল। আমরা একে একে নেমে পড়লাম। নির্জন দ্বীপের তীরের উপর সমুদ্রের ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে। সামনে পাছপাশের ঢাকা এলিফ্যান্টা পাহাড়। আমরা পাহাড় বেয়ে উঠে টিকিট ঘরের কাছে গিয়ে টিকিট কিনে ভিতরে ঢুকলাম।

ভিতরে ঢুকেই মনে হ'ল যেন শত শত যুগ শিখিয়ে, ইতিহাসের এক প্রাচীন যুগের মত্যতা ও সংস্কৃতির মাঝে এসে পৌঁছেছি। সামনে আমাদের বিরাট চম্বর ছ'পাশে তার বিরাট ভুটি গুহা। ঐতিহাসিক স্মৃতিমণ্ডিত সেই চম্বর হয়ে গুহার ঢুকলাম। গুহার সামনেই রয়েছে শিবের মটরাজ মূর্তি। সেই কাককর্ণ খোদিত মূর্তিটিকে দেবলে জীবন্ত বলে ভ্রম হয়।

গুহার পর গুহা। আর সেই সব গুহার খোদাই করা হয়েছে বেৎসিবেৎসি শিবের জীবনলীলার চিত্রাবলী। সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীর সেই মূর্তিগুলি তখনকার দিনের, শোশালক-পরিচ্ছদ, অলঙ্কার ও আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা দেয়।

সেই বিরাট গুহাগুলির মেঝালগায়ে রয়েছে নানা মূর্তি। কোথাও রয়েছে ধ্যানমগ্ন শিব,

আশার কোথাও রয়েছে রুহ্মতি শিব। শিবের অম্বর বধ, হর-পার্বতীর বিবাহ ইত্যাদি নানা বিষয়ের বৈচিত্র্যপূর্ণ মূর্তিগুলি দেখলে অভিভূত হয়ে পড়তে হয়।

প্রতিটি মূর্তির অপূর্ব কারুকার্য, লীলায়িত ভঙ্গী ও মুখের ভাবে তাদের প্রত্যয়মূর্তি বলে মনে হয় না। স্থানে স্থানে বিরাট মৌনকায় শিবলিঙ্গকে ঘিরে রয়েছে স্বন্দরী পাশাপকড়া। গুহাগুলি দেখতে দেখতে মনে হ'ল, যেন স্বপ্নকথার পড়া ঘুমন্তপুরীর মত গুহাগুলি বাহ্যমন্ত্রের ছোঁয়ায় পাশাপকায় নর-নারীদের নিয়ে নিঃসুম হয়ে রয়েছে।

আশেপাশে ছোট গুহাগুলি দেখার পর আমরা একটা মস্তবড় গুহার ভিতর ঢুকলাম। গুহার মাঝখানে আছে বিরাট এক ত্রিমূর্তি। মহেশ্বরের ত্রিমূর্তি ভাবে প্রতীক স্বরূপ এই মূর্তিটি। স্তম্ভ, পালক ও সংহারক। এই বিরাট মূর্তিটি প্রত্যেকটি মূখ্যমন্ত্রের রেখায় কুটে উঠেছে ভাবের বিচ্ছিন্ন খেলা।

আমাদের সঙ্গে একঘল চেক্‌ পুতুলনাচের দল সেই সময় এসেছিলেন এখানে। তাঁরা মূর্তিটির ছবি তুলে নিলেন। গাইড তাঁদের মূর্তিটির বিষয় ইংরাজিতে বর্ণনা করে শোনাল।

এইমত দেখতে দেখতে মনে হ'ল, এখুনি বৃষ্টি শব্দ ঘটা বেজে উঠবে, আর পুরোহিতের উদাত্ত মন্ত্রপাঠের সঙ্গে শুরু হবে দেবাদিদেব শিবের আরতি। একটু অপেক্ষা করলেই সেই আরতি দেবা যাবে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে অটুট এই মূর্তিগুলির শিরকার্ণ যে অতুলনীয় তাতে আর সন্দেহ নেই। সম্ভবতঃ গুপ্তযুগের পরে রাষ্ট্রকূট রাজাদের সময় এই মূর্তিগুলি খোদাই করা হয়। কালের উত্তানপতনের আঘাতে সেই রাজারা হারিয়ে গেছে। কিন্তু তাঁদের স্থিতি অক্ষয় হয়ে আছে এক নির্জন বীণের গুহাপাশে।

সন্ধ্যা হয়ে আসার কিছু আর বেধা বাড়িল না। আমরা বাইরে এসে দাঁড়ালাম। সূর্যদেব তখন সূর্য। আকাশে লাল আবীর ছড়িয়ে বিদ্যায় নিচ্ছেন। সমুদ্রের ডেউ-এর দাপাদাপিতে, গাছের পাতার মৃদু গুঞ্জনগণে চলছে তাঁর বিদায়-উৎসবের সমারোহ।

ক্রমঃ অন্ধকার গাঢ় হয়ে আসতে আমরা আবার লগে চেপে বোখাই-এর উদ্দেশ্যে রওনা হ'লাম। পিছনে পাহাড়ের বুক হারিয়ে বেতে লাগল এলিফ্যান্ট। গুহা, আর সামনে বোখাই-এর কুলরেখার সারবন্ধী আলোগুলি ক্রমশই স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। 'গেটওয়ে অব ইণ্ডিয়া'র উচ্চ মিনারগুলি মনে হ'ল আমাদের আহ্বান করছে। মনে হ'ল কালের গুহাশব্দ পার হয়ে আমরা অতীত যুগ থেকে বর্তমান যুগে এবার ফিরে এলাম।



পশ্চিমের-প্রায়স্কার আকাশে মিশে যায়
একাদশীর চাঁদ ।
পূর্বের বস্ত্রিম বিগল্ডে লাগে
প্রভাত-রবির আভাস ।

ব্রাহ্মমূর্ত্ত,—

জাগে ওঠে সামগান তপোবনে
শিপ্রানবী তটে ।

প্রভাতে সিদ্ধ-পবনের দীর্ঘশ্বাসে
আন্দোলিত হয় তরুণাধা ।
হরিণশাবক চোখ মেলে চায়,
পাশিয়া, দোয়েল শিব সেয় মধুর স্তবীক হয়ে ।
তপোবনে আসে প্রভাত ।

• •

প্রভাত হয় অনাৰ্ধ পরীতে ।
মাতা জনার কোলে চোখ মেলে চায়
শিশু-কানাই ।

শিশু-রবির কিরণ লাগে শিশু-কানাই-এর চোখে ।
তারও প্রভাত হয় ।

তপোবন-ধেমুগুলি নিয়ে
শিশির-ভেজা পথে নামে সে ।

তখন তপোবনে গুরুকে কেন্দ্র করে
ঋষিবালকেরা গ্রহণ করছে
নৃতন দিনের নৃতন পাঠ ।

কচি-কঠের স্মৃতি বেস আবৃত্তি
দোলা লাগায়—
কচি-কিশলয়পূর্ণ তমালের শাখায় ।

বৃক্ষতলে আনমনে বসে থাকে কানাই,
বোলের বাঁশি থাকে স্রবহাথা—মুক ।
আকাশে তপনদেবের অবস্থান
উচ্চ থেকে উচ্চতর হয় ।

বেদপাঠ হয় শুরু।

তবু বুঝি সেই সুরের অহরণ চল
শিশু-কানাই-এর হৃদয় মথিত করে।

এক সময়ে চেয়ে দেখে—

কাজলী গাই তার গভীর কালো—

বাধাতুর নয়নে চেয়ে আছে তার পানে।

কানাই জড়িয়ে ধরে কাজলীর কণ্ঠ

দুই বাধাতুর হৃদয় বুঝি মিলে

এক হয়ে যায়।

সাঁঝের আলোয় খেমে যায় মাঠের বাশী।

ঘরে কেবের সব রাখাল বালক।

ছুটে এসে জনা কোলে তুলে নেন

কানাইকে—সম্মেহে।

—‘মাগো’—উদ্বেল, অজিমানাহত, কাতর কণ্ঠ

ধমিত হয়—‘আরও কত বড় হলে

আমি পড়ব বেদ ?’

সদ্বার আজর আলোক

চাপা দেয় মাতার অশ্রুপূর্ণ ঝাঁপি।

সহস্র হৃদয় বলে গুটে—

গবে বাছা! তুই যে অনার্য সন্তান।

নেই যে তোর বেদ পাঠের অধিকার।

সেকথা কি করে বোঝাই তোকে!

কৈরে গুটে সমস্ত মাতৃহৃদয়।

আজাই হোক এই কঠোর সত্যের সাথে পরিচয়।

বালককে বুকে রেখে মাতা তাকে

বোঝান সব কথা।

শুভ বালক—

নীরব বিশ্বয়ে শোনে,

তার অবাধ চোখের ভাষা পড়েন শুধু যা

• • •

কালের হ্রোতের তরঙ্গে ভেসে যায়

অনার্য-পন্নীর নিস্তরঙ্গ দিনগুলি।

শিশু-কানাই পরিণত হয় বালক,

বালক থেকে কিশোরে।

তার মনের স্থল কামনা

কালের হ্রোতে হয় না লুপ্ত,

উঠে ক্রমশঃ বেড়ে, হয় বলবতী

শ্রুতিধর বালক—

দীর্ঘদিনের প্রবণের ফলে

সমগ্র বেদ কবে অধিগত।

এক দ্বিগ্ন নির্জন বিগ্রহ !

শিশ্রা মদীর, পড়ন্ত রৌদ্রের

উজ্জল আভা বিকীর্ণ তটে,

ছায়াছন্ন তরুশ্রেণী অর্ধশায়িত কানাই,

আপন মনে করে বেদ আবৃত্তি।

ঘূঘূর ক্রন্দন বুঝি শুভ হয়

তার উদাস্ত আবৃত্তিতে।

প্রান্তর পরিক্রমণরত

মহাভাগা, মার্তণ্ডভেজা মূনী কৌশিব

সহসা শুনলেন তার দীপ্ত উদগীত খর

আকৃষ্ট হয়ে এলেন তরুতলে,

ভিত্তাশিলেন—‘কে তুমি বালক’ ?

তমস্‌য়তা ছিন্ন হয়,

চকিতে মৃৎ ভোলে কানাই।

‘দেব!’ নতজাহ্ন হয়ে প্রণাম জানায় তাঁকে।

‘নির্জন মধ্যাহ্নে নদী-তীরে বেদপাঠে’ রত

‘কে তুমি?’

‘আমি জনা তনয়, অনাধাংলক, কানাই, দেব।’

‘অনার্ধ!’ শিহরে উঠেন ঋষি কৌশিক।

চক্ষে জলে অবিশ্বাসের অগ্নি।

‘এ অসম্ভব! কে তোমায় দিল এই

পবিত্র বেদ-মন্ত্র?’

‘আপনি দেব।’

‘আমি! তুমি কি বাতুল?’

‘ব্রাহ্মমূহুর্তে তপোবনছায়ে

আপনি দিতেম পাঠ ঋষি বালকদের’,

গাঢ় হয়ে আসে তার স্বর—‘দূরে—

অনার্ধ আমি একাগ্রচিত্তে শুনতাম

সেই পবিত্র বেদমন্ত্র।

এইতপে সমগ্র বেদ আশ্র আশ্রায় অবীত!’

‘পাণ্ডু, অনার্ধ-তনয়। এতদূর স্পর্ধা!

জান না এর ফল!’

ক্রোধে, বিশ্বয়ে সর্বদেহে ঋষির

কাপন লাগে।

‘জান এর শাস্তি! তবু-তবু আমি

তোমায় ক্ষমা প্রদর্শন করছি।

প্রতিজ্ঞা কর, জীবনে আর এ পবিত্র মন্ত্র

উচ্চারণে কলুষিত করবেনা—বেদ।’

‘তা হয় না প্রভু!’ নির্ভীক প্রতিবাদের

ভাষা তার বেদনা-ধ্বংসিত

বক্ষ হতে অগুণ্ণাতের মত ছুটে আসে:

‘সে প্রতীজ্ঞা করা আমার পক্ষে অসম্ভব।

বেদ কখনও কলুষিত হয় না।

আৰ্ধ-অনার্ধ উভয়ই তো দেবরের স্মৃতি,

তবে ভেদাত্মক কেন হবে প্রভু!

অনার্ধ পাবে না কেন বেদপাঠের অধিকার?’

‘স্বস্ত হও মূঢ়!’ গর্জন করে ওঠেন

মহাতপা ঋষি।

‘দুর্ধীনীত বালক, ক্ষমার যোগ্য-পাত্র নও তুমি।

শাস্তিই তোমার প্রয়োজন।’

তেজবিকীর্ণ ক’রে—সমর্পে স্থানত্যাগ করেন ঋষি।

গৃহে দুঃখে নিঃশ্রান্ত হয় জনায়,

দক্ষিণ অঙ্গ উঠে কৈপে, অমঙ্গল

আশঙ্কায় মুখে অঞ্চল চাপা দেন তিনি।

শাস্ত্রাকুর অস্ত-রবির রাগে

রাড়িরে বায় পশ্চিম দিগন্ত।

দূরন্ত হাওয়া ছুটে এলে

উড়িয়ে নিয়ে যায় শুকনো পাতা

আর আধ-ফোটা ফুল।

খেঁচ নিয়ে ঘরে ফেরে কানাই।

সংবাদ আসে

পকারেং বসেছে

কানাই ও মাতা জনার

উপস্থিতি প্রয়োজন।

ভীতা কন্দনরতা মাতা,

কানাই-সহ এলেন পকারেভের ঘারে ;

শুনলেন কানাই-এর অপরাধ—

অনার্হের বেদপাঠ অস্বাভীনীয় !

পবিত্র বেদমন্ত্র হয়েছে কলুষিত।

ক্ষমা নাই।

উন্মাদিনী মাতা,

প্রত্যেকের পায়ে পায়ে

মাথা কোটেন।

'বিধবার একমাত্র সম্বন্ধকে

এভাবে শাস্তি দিয়ে। না পো,

ক্ষমা করো !'

ভাবলেশহীন মুখে ইঞ্জিয়জরী কথিত।

বসে থাকেন।

বলেন—'ক্ষমা নেই।'

দোষবা হয় শাস্তির—

যে ক্ষিপ্রা বেদমন্ত্রকে করেছে

কলুষিত, সেই ক্ষিপ্রা, উৎপাটনই—

একমাত্র শাস্তি।

অচৈতন্ত জননী ভূমিতল আশ্রয় করেন।

আর এক ব্রাহ্মসম্মত,

জলে গুঠে সেনিহান চিতা

শিপ্রানদী তটে।

তীরে উপবিষ্ট একটি বাজ

পাষাণময়ী মূর্তি।

শিপ্রার নীল-জল ভেগ করে উদিত হন

রক্তাশ্রয়—ভগ্নমসেব।

ত্বিমিত্তশিখা চিতার উপরে বহিত হয়

আলোকের আশীর্বাদ—শতধারে।

যার কোন ভেদাভেদ নেই—

আর্হে ও অনাৰ্হে !



মণিঃ সন্ন্যাসী

শিল্পী : শ্রীমদার বাঘ চৌধুরী

কালো চোখো মেয়ে

শ্রীগোপা দত্ত

অনেক দিন, অ-নেক দিন হলো আর কোন খবর জানি না ওর। শুধু মনে পড়ে কালো ভ্রমরের মত চোখ দুটি তুলে বলছিলো, “তুসি না আমাকে।” তারপর ক্রন্দন আবেগে ঠোট দুটি একটু কঁপে উঠেছিলো। আর চোখ দুটো বেয়ে গড়িয়ে পড়েছিল শুধু দুই ফোটা জল। আর কিছুই না।

তারপর। তারপর কেটে গেছে অনেক দিন। কোন চিঠিপত্রও পাই নি। তুলে অবস্র ঘাই নি। তবে মনেও রাখি নি তেমন করে।

আজ আমার চমকে উঠলাম একটি কিশোরীর মুখে তারই প্রতিচ্ছবি দেখে। সত্যিই আশ্চর্য। অজুত মিল। সেই কালো কৃষ্ণকূটে রং, কৌকড়া-কৌকড়া একরাশ চুল আর ভ্রমরের মত দুটি চোখ। এই মেয়েটিও ঠিক তারই মত ভীতভ্রম পদে ঘরে ঢুকলো। যদিও সেদিনের সঙ্গে আজ আমার অনেক তফাত। সেদিন আমি ছিলাম একটি তেরো চোদ্দ বছরের কিশোরী আর আজ আমি একজন বিখ্যাত প্রাণাণ প্রদান শিক্ষিকা। আমার হৃদয়ের জন্ত আজ চারদিকের মেয়েরা পড়তে আসে এই স্থলে। কিন্তু ওকে দেখে আজও আমার বুকটা সেদিনের মতই তুলে উঠলো। কিন্তু উদ্বেগটা ছিল আমার সম্পূর্ণ অস্ত্র।

মাত্র দ্বাইশ্রাল পরীক্ষার ফল বেরিয়েছে। সুনাম এইট থেকে নাইনে উঠতে একটি মেয়ে প্রত্যেক বিষয়ে তিন চার পেয়ে ফেল করেছে। মেয়েটি নাকি মোতুন ভাত হয়েছিলো। ও নাকি আমার ফ্রি স্টুডেন্টশিপ চার। মনটা বড় বিগড়ে গেলো। ফেল করে আমার কিনা ফ্রি স্টুডেন্টশিপ চাওয়া! সঙ্গে সঙ্গে ডাকলাম মেয়েটিকে। ইচ্ছে ছিলো খুব শম্কে দেখা। কিন্তু যখন ঘরে ঢুকে কালো ভ্রমরের মত এক ছোড়া চোখ আমার মুখের ওপর তুলে দৃঢ় কণ্ঠে বললে, “আমি পড়তে চাই। আমার বা অহুহ। বাবা নেই। ফ্রি স্টুডেন্টশিপ না পেলে আমার পড়া হবে না। দয়া করে আমার জীবনটা নষ্ট করবেন না।” আর বলতে পারলো না। গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়লো ঝকঝকে দু’ ফোটা জল। আমার চোখ দুটোও ঝাপসা হয়ে এলো। আর মানসপটে ভেসে উঠলো ছাব্বিশ বছর আগের এ ধরনের হবহ আর একটি ঘটনা। তবে এইটুকু শুধু তফাত—সেদিনকার কালো মেয়ের ছিলো না আজকের মত দৃঢ় কণ্ঠ।

ছাব্বিশ বছর আগে এমনি একটি কালো মেয়ে তার কৌকড়া কৌকড়া চুল আর ভ্রমরের মত চোখ দুটো নিয়ে লাছুক পদে ঢুকছিলো রাস্তা। এক নজরেই কেন জানি ভালো লেগেছিলো মেয়েটাকে। কেমন যেন একটা শান্ত ভাব ছিলো মেয়েটার। আর আমরা সমস্ত রাস্তা জুড়ে ছিলাম

এরই বিপরীত। প্রথম দিন থেকেই ঘেরেরা শুরু করলো ওর সঙ্গে ঠাট্টা আর ইয়ারকী। কিন্তু দীর্ঘে দীর্ঘে আমার সঙ্গে ওর বন্ধুত্বের বন্ধন হলো দৃঢ়তর। মাঝে মাঝে জোর করে ও আমাকে নিয়ে যেতো ওদের বাড়ীতে। সেখানাম, পরীক্ষার সংসার যেমন হয় ওদেরও ঠিক তেমন। ওর মা ছিলেন শয্যাগত। ওকেই সংসারের সব কাজকর্ম করতে হতো। কিন্তু স্বাভাবিক ছিল ওর ভারী মিষ্টি। এতো কাজকর্ম করেও হুঁ শব্দটি করতো না। কিন্তু শ্বভাবের সঙ্গে পড়ানোর ওর এতোটুকুও মিল ছিল না। ক্রাশে ও একদিনও পড়া পারতো না। এর জন্য প্রত্যেক দিন শাস্তিও ছিলো নিয়ম-বান্ধা। আবার আড়ালে-আবতালে ঘেরেদের ঠাট্টা ইয়ারকীও তাকে সহ করতে হতো। মাঝে মাঝে চোখের কোণটা চিকচিক করে উঠতো। কিন্তু পরমুহূর্তেই নিঃশব্দে সামলে নিয়ে মুখে মিষ্ট হাসি ছুটিয়ে তুলতো। ফাইনাল পরীক্ষা এসিয়ে এলো। ফাস্ট পেকেও যদিও কোন দিন হইনি, তবুও সব দিন ভালো ভাবেই পাস করেছি। তাই হুনামটা বাতে নষ্ট না হয় তার জন্য পড়ানো ব্যাখ্যা শুরু করলাম। ~~জুনিয়রে~~ মাঝে মাঝে খুলে দেখা হতো। পরীক্ষার আগে প্রায়ই আমি খুলে না গিয়ে বাবার পড়ানো করতাম। এরপর পরীক্ষার কিছুদিন আগে খুলের ছুটি হয়ে গেলো। ওর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎও হলো একবারে বন্ধ। ওকে দেখতে আমার খুবই ইচ্ছে করতো, কিন্তু পরীক্ষার আগে বাড়ী থেকে কোথাও যাওয়ার নিষেধ ছিলো। তারপর পরীক্ষাও হয়ে গেলো আর রেজাল্টও আউট হলো। আমি আমার হুনাম জুনিয়র রেখেই পাস করেছিলাম, কিন্তু ও পাস করতে পারে নি। মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেলো। পাস করার কোন আনন্দই খেন পেলাম না। বললাম, "পড়বি তো?" বললে, "হ্যাঁ। ফ্রি স্টুডেন্টশিপের জন্য দরখাস্ত করেছি, দেখি কি হয়।" আমার একটু আলো চিকচিক করে উঠলো ওর চোখ দুটিতে। পড়বার ইচ্ছে ছিল ওর খুবই। কিন্তু বই কিনে ও যেমন গিয়ে পড়বার মত ক্ষমতা ছিল না।

তখনও ভালো করে ক্রাশ শুরু হয় নি। আমি আমার ভারী মন নিয়ে নোঁতুন ক্রাশের জানলায় ঠাঁড়িয়েছিলাম। একটি মিষ্টি ভাবে চোখ ফিরিয়ে দেখলাম ও ঠাঁড়িয়ে আছে। বললাম, "কি রে ভতি হয়েছিস?" মুখে একটা আশার হাসি ছুটিয়ে তুলে ও বললে, "এখনও হই নি। তবে হেডমিষ্ট্রেস ডেকে পাঠিয়েছেন। বোঝ হয় ফ্রি স্টুডেন্টশিপটা পেয়ে বাবো।" তারপর আরও একটু হেসে বললে, "এই কথাটাই তোকে বলতে এসেছি।" ও আমাকে জোর করে টেনে হেডমিষ্ট্রেসের অফিসরুম পর্যন্ত নিয়ে গেলো। তারপর দেখলাম ঠিক আবারের মেয়েটির মতই আশার হাসি মুখে নিয়ে ভীতভ্রান্ত গমে ঘরে গিয়ে ঢুকলো। বন্ধন খেরিয়ে এলো দেখলাম, মুখে আর সেই আশার বীজি নেই। তার বললে কেমন একটা হতাশার চিহ্ন ছুটে উঠেছে ওর মুখে-চোখে আর ঠাঁড়ানোর

ভঙ্গিতে। এসেই আমাকে জড়িয়ে ধরলো। বললে, “হলো না রে। সব ভেঙ্গে গেলো।” মনটা মোচড় দিয়ে উঠেছিলো। কেন জানি না হেজমিস্ট্রেসের ওপরই আমার রাগ হয়েছিলো বেশী। মনে হয়েছিলো, কেন তিনি একটু ডেবে দেখলেন না যে তাঁরই ওপর নির্ভর করেছে একটি মেয়ের ভবিষ্যৎ। এই হতাশার ভগ্নি নিয়ে ফিরে যাওয়ার পর গরু লগ্নে আর দেখা হয় নি।

মাঝে মাঝে উড়ো খবর পেতাম। স্তনেছিলার গরু মা মারা গেছেন। কাকা এসেছেন শুকে নিয়ে যেতে। একটি বৃদ্ধো পাত্রও নাকি ঠিক আছে। কিন্তু মাথা ঘামাই নি এ-সব নিয়ে। নোড়ুন রান নিয়ে তখন ব্যস্ত ছিলাম। কিন্তু তবু প্রায়ই চোখের সামনে ভেসে উঠতো এক জোড়া কালো ভ্রমরের মত চোখ।



‘তোকে দেখতে ভীষণ ইচ্ছে হ’ল তাই ছুটে গালিয়ে এলাম একবার’

দেদিন ছিলো রবিবার। ছপুয়ে গল্পের বই হাতে নিয়ে একটি লম্বা ঘুম দেবার চেষ্টা করছি, এমন সময় ছোট বোন এসে খবর দিলো একটি মেয়ে নাকি আমাকে ডাকছে। তাড়াতাড়ি বাইরে গিয়ে দেখলাম, গাড়ির কাছে সে-ই। মনে হলো যেন আরও কালো আর রোংগা হয়ে গেছে, চোখ দুটোও যেন বেরিয়ে গেছে অনেকখানি। মাথার চুলগুলো কন্দ। বাতাসে উড়ছে। দৌড়ে গিয়ে গরু হাত ধরলাম। বললাম, “ঘরে আয়।” বললো, “না ভাই। বাড়ীর কাউকে বলে আসি নি। এবুনি আবার আমাকে গাড়ী ধরতে হবে।” তারপর হাত দুটো জড়িয়ে ধরে বললো, “কেন জানি না তোকে দেখতে ভীষণ ইচ্ছে হলো, তাই ছুটে গালিয়ে এলাম একবার।”

আমার বকের ভেতরটা টনটন করে উঠলো। বললাম, “চলে যাচ্ছিস ?” বললে, “হ্যাঁ তাই।” তারপর শুধু কালো ভ্রমরের মত চোখ দুটো তুলে বলেছিল, “তুলিস নি আমাকে।” রুদ্ধ আবেগে ঠোট দুটো একটু কঁপে উঠেছিলো। আর চোখ দুটো বেয়ে গড়িয়ে পড়েছিল শুধু দু’ফোটা জল। আর কিছুই না। তারপর। তারপর কেটে গেছে অনেক দিন। কোন চিঠিপত্রও পাই নি। তুলে অবশ্য বাই নি। তবে মনেও রাখি নি তেমন করে। আজ আবার ঠিক তারই মূখের প্রতিচ্ছবি দেখে চমকে উঠলাম। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও দিতে পারিনি মেয়েটাকে ফ্রি টুয়েন্টশিপ। কারণ একমাত্র ভালো ছাত্রীরাই ছিলো তার অধিকাংশী। তাই ফিরিয়ে দিলাম মেয়েটিকে। বললাম, “হবে না।” শিউরে উঠলো মেয়েটি। ছাত্রিশ বছর আগে ঠিক আবারই মত একজন অধ্যয়ন করণ হবে যেভাবে শিউরে উঠেছিলো আর একটি কচি মন। ঠিক সেদিনের রঙিন খুশে-স্তর্য তিশেরী মেয়েটির মত এই মেয়েটিরও মূখ-চোখে দুটে উঠলো হতাশার ভাব। কিন্তু পরমুহূর্তেই মেয়েটি জোর করে ফিরিয়ে আনলো তার পূর্বের দৃঢ়তা। কিন্তু কালো ভ্রমরের মত চোখ দুটি ভরে গেলো জলে আর সেই জল-ভরা চোখে আমার মূখের দিকে তাকিয়ে চলে গেলো। মনে হলো, চোখ দুটো যেন আমায় বলে গেলো: “তুলে গেলি আমাকে ?” ছাত্রিশ বছর আগের মতই বকটা আমার টনটন করে উঠলো। কেন জানি না ছাত্রিশ বছর পরে আবার সেই কালো মেয়ের খবর জানবার অন্তে মনটা উদগ্রীব হয়ে উঠলো। কিন্তু কি করে পাবো ওর সন্ধান ? অনেক দিন। অনেক দিন হলো আর কোন খবর জানি না ওর। শুধু মনে পড়ে কালো ভ্রমরের মত চোখ দুটি তুলে বলেছিল, “তুলিস না আমার।” তারপর রুদ্ধ আবেগে ঠোট দুটি কঁপে উঠেছিলো। আর চোখ দুটো বেয়ে গড়িয়ে পড়েছিলো শুধু দু’ফোটা জল। আর কিছুই না।

তারপর। তারপর কেটে গেছে অনেক দিন। কেটে যাবেও। চিঠি পত্রও পাই নি, আর পাবেও না। তুলে অবশ্য বাধো না। তবে মনেও রাখাও না তেমন করে।

প্রার্থনা

শ্রীলা সরকার

আজি শুক্লা-পঞ্চমীর প্রাতে
সব মনোমন্দির মাথো—
করি নাগো তব আবাহন।
অন্ধারিমা দানি তব
সত্যজ্ঞানে তুমি মাগো
ভ’রে দাও সবাকার মন।

সু-মন্ত্রিত বীণার বন্ধার
খর্ব করুক সব অহঙ্কার,
সাম্যের গাক্ একতান ;
দূরে চলে যাক্ সব গ্রানি
সুন্দর সভ্যতারে জানি—
এক হয়ে যাক্ সব প্রাণ।

ব্যব-প্রশাস

শ্রীঅশোকা দাশগুপ্তা

ভাবুক তো নই—কিন্তু মানুষ তো ! মানব হৃদয় তো আছে ! তাই মাঝে মাঝে ভাবের তরঙ্গ মনের এক প্রান্ত থেকে, আর এক প্রান্তকে মন্থিত করে, তার প্রকাশ চায় । কোনো স্বর্ষভেদী গটনা দেখে ইচ্ছা করে হৃদয়, সজীব, ঝঙ্কন একটি রচনা লিখি । কিন্তু কলম হাতে নিয়ে বেশি ঠিক যে গতিতে ভাবের তরঙ্গ মনকে অহুপ্রাণিত করেছিল, ঠিক তার চারগুণ গতিতে তা বিলীন হয়ে গেছে মনের অন্তরে । মনে হয় ধাহুয বেয়ন কালকে কোনোদিন বেশে আনতে পারিনি, ঠিক তেমনি আমিও আমার ভাবকে বেশে এনে কোন কবিতা কোনদিন রচনা করতে পারবো না !

কলেজে গিয়ে দেখি Magazine-এ নিজেদের রচনা দেবার স্তর যেদেরা ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে । নিজের অকৃতকার্বে মনকে যিকৃত করতে করতে স্থির করলাম কবিতা লিখবই । কিন্তু বৃথা ৫-৬ বটাব্যাপী অথবা পরিশ্রমের পরে ঘেঁষি আমার খাতায় পাঁচটি অমিত্রাক্ষর লাইন—তার না আছে মিল, না আছে ছন্দ, না আছে ভাব—আর সব পাতা সালা । কালের গতি যেমন হাহুয়ের স্রষ্টিকে ধ্বংস করে অট্টহাস্ত করতে থাকে, ঠিক তেমনি আমার মনের হৃদয় ভাবধারা বাতায় পাতায় এসে ব্যস্তের হাসি হাসতে থাকে মুকে-মুকে ।...দ্বিতীয় পিরিয়ড ক্রী ছিল, গঙ্গার ধারে গিয়ে দাঁড়ালাম । ধীরে ধীরে মরালগতিতে ব'য়ে চলেছে গঙ্গা । সে গতিতে না ছিল উৎসেগ না ছিল চপলতা—শুধু একটা শান্ত সমাহিত ভাব । চারিদিকে প্রকৃতির হৃদয় শান্ত শিথিল রূপ । দূরে নৌকা থেকে ভেবে আগছে তরঙ্গ মাঝির গানের করেকটা কলি, আর দূরন্ত রাখাল বালকের বুদ্ধ মিস্ত্রি বংশীর ধ্বনি আসছে তীরকুমি থেকে—এই তো কাব্যরচনা করার পক্ষে উপযুক্ত পরিবেশ । হঠাৎ আমার একটা দৃষ্টের কথা মনে হ'ল—হৃদয়ের সাক্ষান রক্তমণ্ড, দর্শকগণ অথবা আগ্রহে বেগেছে—নারিকা বাগ্নকুমারী আকুল আগ্রহে প্রতীক্ষা করছে রাজপুত্র নায়কের সঙ্গ,—রাজকুমারীর হাতে ফুলের মালা, মুখে আসন্ন-মিলনের আভা । রাজপুত্র এল তার ভুবন আলো করা রূপ নিয়ে, পক্ষিরাগ যোড়ায় চড়ে । রাজকুমারী ছল-ছল চক্ষে দূর-দূর বন্ধে অপেক্ষা করছে রাজপুত্রের কাছ থেকে কোন শাস্ত্রনার বাণী শোনার স্তর, কিন্তু রাজপুত্র কথা বলে না কেন ? —আসলে, সে তার পাঠি ভুলে গেছে— । আমার ভুবন আলো করা মনের হৃদয় ভাবগুলিও এই রকম দর্শকদের সামনে নির্বাক মুক হয়ে যায়—তাকে তার লাহিত মুখ লুকোতে আবার সেই মনের গহনে ডগাতে হয় ।

পরিশ্রমে কী না হয় ? ভাবলাম, কবিতা নাই বা লিখতে পারলাম, কিন্তু নিজের কল্পনাকে গন্তে রূপ দিতে পারবো না কেন ? তাতে তো শুধু লিখে গেলেই হ'ল—ছন্দ মেলাতে স্বর্ণ-মর্ত্য বৃজতে হবে না ।

ঠিক করলাম গল্পই লিখব। কিন্তু Plot ? কোন Plot বাছব ? সমাজের বিঘ্নতা না বেকার সমস্যা ? স্বাস্থ্য সমস্যা না বাস্তবতার সমস্যা ? কখনো দুঃখী মাতাদের করুণ ক্রন্দন মনকে আকুল করে তুললো, কখনো অসহায় স্ত্রীপুত্র শিশুদের চীৎকার মনকে আকুল করে তুললো, কখনো গরিব বিধবাদের করুণ মুখ ব্যাখ্যায় রান করে দিল। মনকে শেষশ্ববধি দরিদ্রের আর্ত-চীৎকারে, লক্ষশতীসেব অট্টহাস্তে বিভ্রান্ত হয়ে কানে হাত ঢাপা দিয়ে গল্প লেখার সংকল্প ত্যাগ করতে হ'ল।

এইখানেই ইতির রেখা টানলো আমার সাহিত্যচর্চা। পাঁচদিনব্যাপী ব্যর্থ পথিক্রমের ফল হ'ল আমার সেই পাঁচটি অমিষ্টাঙ্কর লাইন।...তার পরের পিরিয়ডে আমার রান ছিল। কী গড়ান হয়েছিল সেদিন জানি না। নিজের অসাকল্যে, অকৃতকার্বে ক্ষুব্ধ মন নিজের প্রানিতেই মগ্ন ছিল, হঠাৎ কানে গেল অধ্যাপকের গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বর : "চেষ্টাঃ কী না নহ ? If there is a will, there is a way", আমার বিদ্রোহী মন চীৎকার করে উঠল : না না-না, সব পারে না—অন্ততঃ কবিতা লিখতে পারে না। তার মস্ত দরকার হয় ভগবানসত্ত্ব প্রস্তুতির। আমার সঙ্গে কবিতা লেখার এমনই পার্থক্য—বেমন, সত্যের সঙ্গে মিথ্যার, জমিনের সঙ্গে আদম্মানের—আর হৃদয়ের সঙ্গে অহৃদয়ের।

জোনাকি

শ্রীসন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায়

•

ঝিক্‌মিক্‌ ঝিক্‌মিক্‌ জলে জোনাকি
আধারে আলোর টিপ যায় গোনাকি ?
এই জলে, এই নেভে—

বারেক নেয় কি ভেবে
সাধের সাধীরা সব, আছে কিনা ঠিক
এই জলে, এই নেভে ঝিক্‌মিক্‌ ঝিক্‌ ॥

ওরে ও জোনাকি ভাই, শুনে যাওনা
তোমার খেলার দলে, মোরে নাওনা,
আলোর চুম্বিক্‌ জেলে—

আধারেতে ডানা মেলে
এলোমেলা নাচ কেন ? যাবে কোন দি
এই জলে, এই নেভে ঝিক্‌মিক্‌ ঝিক্‌ ॥

চিদাম্বরম

শ্রীঅমিতাভ ত্রিপাঠী

রাত নাড়ে ন'টায় আমাদের হৈন আসার কথা। কিন্তু রাজি নাড়ে মশটা বাজল তার দেখা নেই। গুনলুম রাজা লাইনে এমন হামেশাই হয়। মাজাজের হালচালই আলাদা। মাজাজীরা দেখলুম কেউ কেউ প্লাটফর্মে শুয়ে নাক ডাকাতে লাগল পর্যন্ত। ব্যাপার দেখে আমরা অবাক। শেষ পর্যন্ত এগারোটায় পর হৈন এল। আমাদের রাজা হল শুক।

সকাল বেলায় উঠেই দেখতে পেলাম চিদাম্বরম মন্দিরের চূড়া প্রভাত-রৌদ্রের আলোয় কলমল করছে। আমরা রাজা মুখিয়া চেষ্টিয়ারের অতিথি হয়ে আদামালাই বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলাম। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লোকেরা গাড়ী করে আম'দের নিতে এসেছিল। বিশ্ববিদ্যালয়টি খুব সুন্দর। চারদিকে কত ফুল ফুটে আছে। সুন্দর সুন্দর সব বাড়ী। কিছু প্রাতঃরাশ শেষ করেই আমরা চিদাম্বরমের মন্দির দেখতে চললাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী শ্রীসোমসুন্দরমের সঙ্গে। ইনি মন্দির-স্বাগত্য বিশেষজ্ঞও বটে। মন্দির প্রবেশের রীতি অসুদারে পূর্ব দিকের গোপুরম দিয়ে আমরা মন্দিরে প্রবেশ করলাম। গুনলুম, এই গোপুরমটি অতি প্রাচীন। এর স্তরে স্তরে সুন্দর ভাস্কর্য। কোথাও কোন গছব বান্ধরত, কোথায় বা অঙ্গণের নৃত্য করছে। ভরতনাট্যের অঙ্গারগুলি প্রাচীন শিল্পীর তত্ত্বগে সুন্দর ফুটে উঠেছে। শিবকে দেখলাম কত রূপে। কখনো তিনি আনন্দ-ভাও করছেন, কখনো উর্ধ্ব-ভাও। কখনো তিনি কাড়াল রূপে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে চলেছেন। গোপুরমের পর মহত্ব মণ্ডপ পার হয়ে দেখলাম দেব-মন্ডাপ। এখানে আরো চারটি মন্ডাপ আছে: কনকমন্ডাপ, চিত্রমন্ডাপ, লোকমন্ডাপ, রাজমন্ডাপ। এই মন্ডাপই নাকি শিবের এক নাম মন্ডাপতি। কনকমন্ডাপ মধ্যে গর্ভ-পৃথ; সেখানেই আছেন নটরাজ। গর্ভ-পৃথ থেকে নটরাজের অভিব্যক্তি দেখলাম। মহাদেব হচ্ছেন অভিব্যক্তি প্রিয়, আর বিষ্ণু হচ্ছেন অলঙ্কার প্রিয়। এজন্য মহাদেবকে বহু ভ্রম দিয়ে ভ্রান করান হয়। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তাঁকে ছয়বার ভ্রান করান হয়। আমরা সেখানুম একটি ঘোনার কোটা থেকে ফটকের শিবলিঙ্গ বার করা হোল, তারপর দুধ, জল, মধু, তেল ও ভাবের জল দিয়ে ভ্রান করানো হলো। এর পর গোলাপী ফটকের নটরাজকে ভ্রান করান হোল। এর নাম বহুভাবিব্যক্তি।

তারপর আমরা নটরাজকে দেখলুম। তাঁর অঙ্গে কত অমূল্য অলঙ্কার। মাথায় অর্ধচন্দ্র মণ্ডাপী হীরকবস্ত্রিত। শিব নাকি এখানে ব্যোম বা আকাশ রূপে আছেন। একটি পর্দা বার বার তুলে আর কেলে সেই পুস্তকপী শিবকে দেখান হয়। শ্রীসোমসুন্দরম আমাদের শিবের নামা গল্প বললেন। এখানের প্রসঙ্গ—নারকেল খণ্ড আর তাম্র এনে গিলেন। তারপর আমরা গোবিন্দ রাজাকে দেখলুম। রাজা

এসে আমরা আবার নটরাজার আরাতি দেখলুম। কত রকমের আলো দিয়ে আরাতি হোল— কখনো কর্পূর আরাতি, কখনো বিরাট প্রদীপের গাছা, কখনো মশালের মত আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে।

পরদিন বিকেলে আমরা পোটো নোভো দেখতে গেলাম। এটা একটা পর্জন্তীদের বন্দর ছিল। সেখানে সমুদ্র-বিজ্ঞানের অধ্যাপক ব্রিনেবারা আমাদের সাধর অভ্যর্থনা জানালেন। তিনি আমাদের মানারকম শামুক, বাছ, সাপ এমন কি বাচ্চা কুমড় পর্বত দেখালেন। তারপর তিনি আমাদের নৌকায় করে ভেলার নদী দিয়ে নিয়ে গেলেন বকোপসাগরের কাছ পর্বত। সে এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। একদিকে নদী অত্রদিকে সমুদ্র মধ্যে একটা বালির মত চড়া। সেখানে ব্রিনেবারা আর আমরা অনেক শামুক আর কিছুক বুড়োলুম। সন্ধ্যা হয়ে এল। যা তড়া লাগাচ্ছেন। আমরা নৌকায় উঠলুম। আকাশে একাদমীর চাঁদ। মিঃ শেবারা বললেন, অন্ধকার রাতে সমুদ্র নাকি বেশী হুম্বর হয়। তখন ফসফরাসের আলো ঢেউয়ে-ঢেউয়ে জ্বলতে থাকে। সমুদ্রকে মনে হয় অগ্নি-বুটি মেঘের নীলাবরী শাড়ী।

কিরে এলে তিনি আমাদের নিয়ে গেলেন তাঁর গবেষণাগারে পাণের মাঠে। সেখানে তারপর আলীর সঙ্গে ইংরেজদের যুদ্ধ হয়েছিল। তারপর তাঁর দূরবীন দিয়ে আমরা চাঁদ দেখলাম। দেহবার সময় তিনি আমার আর আমার বোন হৃদয়ঙ্গার হাতে অনেকগুলো কিছুক দিলেন।

পরদিন সকালে আমরা যাত্রা করলাম ভাতোরের পথে। বহুদূর পর্বত চিদাঘরম হিম্মিরের চূড়া আমাদের সঙ্গে সঙ্গে এল।

চাতক

শ্রীনির্মলকুমার চক্রবর্তী

নীল নভে উড়ে যায়, চাতক-চাতকী হয়
আশার পরশ লাগিয়া।
করণ কাতর রবে, উড়ে উড়ে বলে সবে,
নীল লাগি' রয়েছে লাগিয়া।
কাঁকে কাঁকে ওড়ে সেথা, কালো মেঘ আছে যেথা,
তোলে নানা বিবাদের স্র
এককোঁটা পেয়ে জল, করে সবে কলকল,
শুক প্রাণ হয় যে মধুর।

পার্সিসুসের কাহিনী

শ্রীরজতকান্ত রায়

প্রাচীন গ্রীসের আর্গল অঞ্চলে অ্যাক্রিসিয়ুস নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি কখনও স্বপ্নে থাকতে পারতেন না সব সময়ই তাঁর মনে একটা প্রবল দুশ্চিন্তা ছিল। তাঁর একমাত্র মেয়ে ড্যানিই ছিল তার কারণ। এক দৈবরাজ্য ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন—ড্যানির ছেলে অ্যাক্রিসিউসকে হত্যা করবে।

দিনে দিনে ড্যানি বাড়তে লাগলো এবং তার রূপগুণ চরিত্র বিকশিত হতে লাগলো। সে ছিল ভোরের পদ্মফুলের শেলবের মতই শবিত্র ও হৃদয়র। সঙ্গে সঙ্গে অ্যাক্রিসিয়ুস-এর দুশ্চিন্তাও বাড়তে লাগলো, ক্রমশঃ দৈবরাজ্যের ভবিষ্যৎবাণী তাঁর কাছে আস্তর হয়ে দাঁড়ালো। অনেক ভেবে চিন্তে তিনি একটি উপায় শেলেন। আর্গল রাজ্যের বড় বড় শিল্পীদের তিনি তাঁর আদেশ মানালেন। একটা দুর্গ তৈরী করতে হবে এবং সেটি এমন প্রস্তুত হবে যে শতচেষ্টারও কেউ সেখান থেকে পালাতে পারবে না। শিল্পীরা তাদের কাজ আরম্ভ করলো। কিছুদিনের মধ্যেই রাজার মনের মত একটা দুর্গ তৈরী হলো। একটি নির্জন সমুদ্রতীরে অবস্থিত, দরজা জানলা ছিল অতি অল্প এবং এত ছোট যে তার সাহায্যে পালানো কঠিন, এবং সেখান থেকে বাঁপ মিলে সমুদ্রের অন্তল গর্ভে তলিয়ে মৃত্যুবরণ করতে হবে। দরজা একটিই ছিল, এবং অনেক উঁচুতে, বই ছাড়া সেখানে যাওয়া সম্ভব নয়। ড্যানিকে রাজা এই ভয়াবহ দুর্গে বন্দী করলেন,—লোক নেই, জন নেই, নির্জন ভয়ঙ্কর সে জায়গা। দিনে একবার মাত্র মাহুকের মুখ দেখতে পার ড্যানি। একটি বোবা ক্রীতদাস খাবার দিয়ে বাঘ, তার সঙ্গেও কথা বলা যায় না, প্রকাশ করা যায় না মনের ভাব দুঃখ। এরকম কঠোর জারগার বৃত্তি নষ্ট হয়ে যায়, পাগল হয়ে যায় মাহুহ। ড্যানির সোভাগ্য যে তা হয় নি। নির্জন নিঃশব্দ অবস্থায় বছরের পর বছর কেটে গেল অশঙ্ক দুঃখকষ্টে। ড্যানি ক্রমশঃ পূর্ণবয়স্কা হলেন, কিন্তু পৃথিবী তাঁর কাছে অজানা রয়ে গেল। তার জ্ঞানের পরিধি হলো সূর্য, শুধু ছোট নিঃশব্দ এই দুর্গ ছাড়া বেশী কিছু তিনি জানতে পারলেন না। জানতে পারলেন না সুখ কাকে বলে। জানবার ধারে বসে সমুদ্রের দিকে চেয়ে তিনি দিনের পর দিন অল্প ফেলতে লাগলেন—শেষ পর্যন্ত তাও বৃত্তি ছুরিয়ে গেল, ড্যানি সেবে নিস্ত্রাণ পাথরের মত হয়ে গেলেন। কথা না বলে বলে হৃষের মধ্যে এসে গেল জড়তা। সমস্ত জীবনটাই বিধানময়, তারমধ্যে আনন্দের কথামাত্র নেই। জীবনের এই কঠোর পথে আর কতদূর চলতে হবে কে জানে। কোনও প্রগতি আর ইচ্ছা রইল না ড্যানির মনে। দিনের পর দিন তিনি শুধু মৃত্যুর স্তম্ভ অপেক্ষা করতে লাগলেন। একদিন বিকালে ড্যানি তাঁর সোনার বিছানার ওয়ে স্খাণ্ড দেখছিলেন, দিনের শেষে সূর্য আকাশের গায়ে আতীর মাথিয়ে ডুবে যাচ্ছে, যেন কাঁচা

সোনার বড় ভুলে গেছে; অপরাহ্নের সেই উজ্জল সোনালী আলো ধীরে ধীরে অন্ধকার হয়ে আসছে, সমুদ্রের দাঙ্গা-কালো সী গালরা দল বেঁধে ফিরে আসছে ডাক্তার নিকে, সমুদ্রের ডেউ গর্জন করে আছড়ে পড়ছে দুর্গের পাড়ের কাছে। উজ্জল সূর্য যেন পরশমণি—বা স্পর্শ করছে তাই সোনা হয়ে যাচ্ছে। একটা সোনালি রশ্মি জানলার মধ্যে দিয়ে ড্যানির মুখে এসে পড়লো। ঠিক সেই সময় ড্যানি একটি ভারী পতীর স্বরে নৈঃশব্দী স্তনতে পেলেন। “বংশে! কোন ভয় নেই। দেবরাজ রিউগ তোমার সহায়, তাঁর বরে তোমার একটি পুত্র হবে এই সূর্যের মতই বীর উজ্জল। তাঁর নাম রেখ পাসিয়ুস, সে তোমার দুঃখকে ঘূচাবে।” আনন্দে ড্যানির মন পরিপূর্ণ হয়ে গেল, তাহলে এই নিরাশায় জীবনও আছে আশার আলো। নিকিত্তে বাগিশে মাথা রেখে আর অনেকদিন পরে তিনি গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হলেন। রাত কয়েক পরে ড্যানির একটি দেবশিশুর মত হৃদয় ছেলে হোলো। স্বপ্নানন্দে এ ববর হাজার কাছে পৌঁছল। অ্যাক্রিনিস্‌দের আদেশে অতি নিষ্ঠুরের মত ড্যানি এবং তাঁর ছেলের মত দু’দিনের শিশুটিকে একটি বিরাট কাঠের সিঁদুক করে ড্যানির দেওয়া হোলো সমুদ্রে। ভয়ে যা জড়িয়ে ধরেন শিশুটিকে, কেঁসে গুঠেন তিনি। এখনই তাঁরা দুজন সমুদ্রের অন্তর্গতে তলিয়ে যাবেন। শিশুটির মুখেরপানে চেয়ে দুঃখ চাপতে পাবেন না ড্যানি,—আহা! কতই বা গর বয়েস, এতই মধ্যে ওকে মুড়াবরণ করতে হবে! নিষ্ঠুর জন্ত দুঃখ নেই, কিন্তু সন্তানের জন্ত কেঁসে গুঠে মায়ের গ্রাণ। এমিকে দেবরাজ জিউদের বরে সিঁদুক ডুবলো না, ভেসে চললো সমুদ্রের বক্ষের উপর দিয়ে। অবশেষে দুই তিন দিন পরে সিঁদুক এসে লাগলো সেরিক্স দ্বীপের তীরে। সেখানে এক ব্যক্তি তাঁদের দেখতে পেলেন, নাম তার ডিক্টিস্। তিনি সিঁদুকের ডালা খুলে বিস্মিত হয়ে দেখলেন ঘুমন্ত বা আর শিশুটিকে। ডিক্টিস্ দুজনকে নিয়ে গেলেন নিভের বাড়ীতে। ক্রমে দুজনে ডিক্টিসের ক্ষুদ্র সংসারের লোক হয়ে পড়ালো, ড্যানি ডিক্টিসের ঘরকরনা করতে লাগলেন। ডিক্টিস্ ছিগেন একজন স্যামান্ড জেলে, কিন্তু তাঁর জন্ম খুবই উচ্চ বংশে। সেরিক্স দ্বীপের রাজবাণের সন্তান তিনি, তাঁর তাই পলিডেকটিগ সে মেশের রাজা। ড্যানির গৌন্দর্বে মুগ্ধ হয়ে পলিডেকটিগ তাঁকে দিয়ে কয়েক চাইলেন, ডিক্টিগ রাজী হলেন না, বললেন, “ড্যানি দিয়ে করতে চায় না, একমাত্র নিভের ছেলে ও বাড়ী ছাড়া তার কোন আশ্রয় বা ইচ্ছা নেই।” তবুও পলিডেকটিগ হতাশ হলেন না, তিনি নতুন মতলব ঠাঁতে লাগলেন। এমিকে পাসিয়ুস দিনে দিনে বাড়তে লাগলো, তাঁর তেজ ও শক্তি সূর্যের মতই প্রবর হোলো এবং এইজন্য তিনি পলিডেকটিগের হিংসার কারণ হলেন। তিনি ভেবেছিলেন বিনাধায়া জোর করে ড্যানিকে দিয়ে করবেন, কিন্তু এখন পাসিয়ুসের মত তেজস্বী যুবক তাঁর মাকে রক্ষা করছেন। বাইহোক পলিডেকটিগ মুখে পাসিয়ুসের প্রতি খুব সৌজন্য দেখালেন। একদিন পাসিয়ুসকে তিনি তাঁর গ্রামে

নিঃসঙ্গ করলেন। গল্প করতে করতে পার্সিয়ান মশগুল হয়ে পড়েছিল, পলিডেকটিসের কোন বস মতলব আছে বলে তিনি ভাবতে পারেন নি। কথায় কথায় পলিডেকটিস পার্সিয়ানকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে, নিলেন যে পলিডেকটিসের কোন একটি ইচ্ছে পার্সিয়ান পূরণ করবেন। অতঃপর পলিডেকটিস বললেন “আমাকে গর্জন মেডুসার মাথা এনে দিতে হবে।” পার্সিয়ান ভাবলেন পলিডেকটিস তাঁর দৃষ্টি ঠাট্টা করছেন, কিন্তু দু’দিন পরেই তিনি এর গুরুত্ব অহুভব করলেন। তিনি জানেনও না কোথায় আছে মেডুসা। ভাবলেন খুঁজে বের করবেন, কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও সে সফলতা তিনি খুঁজে বের করতে পারলেন না। হতাশ হয়ে তিনি একদিন বিকালে বসেছিলেন সমুদ্রতীরে। সমুদ্র ছলছল রবে তাঁকে যেন বিজ্ঞপ্তি করছে। হঠাৎ তাঁর সামনে এক রৌপ্য বর্মমণ্ডিত দেবী আবিষ্কৃত হলেন। নাম আর্থেনা। পার্সিয়ান বিস্মিত হয়ে তাঁর দিকে চেয়ে বইলেন, সারা মুখে কি শিউলি স্বপ্না, চোখ দিয়ে আশার আলো ফুটে বের হচ্ছে। আর্থেনা বললেন, “বৎস! দেবরাজ জিউস আমাকে তোমার কাছে পাঠিয়েছেন তোমাকে সাহায্য করবার জন্যে। আমি তোমার বলে সেব গর্জন মেডুসার সন্ধান। তাকে হত্যা করা বড় কঠিন বৎস! তুমি এই চটি জোড়াটি নাও, এটি পরে তুমি শূন্য দিয়ে যেখানে খুশী উড়ে যেতে পারবে, তোমাকে এই হেলমেটটিও দিচ্ছি, এটি পরে তুমি অদৃশ্য হতে পারবে।” এ ছাড়াও আর্থেনা পার্সিয়ানকে দিলেন একটা আয়নার মত চক্চকে পদক, তাতে ছায়া পড়ে খুব স্বপ্নের আঁর দিলেন একটি ঝিকানো ছোঁরা। আর্থেনার কাছে বহু দরকারী কথা ও উপদেশ নিয়ে পার্সিয়ান বেরিয়ে পড়লেন এই ভীষণ বিপজ্জনক অভিযানে। তিনচার দিন ক্রমাগত তিনি উড়ে চললেন রাইন ও ডানিউব নদী পার হয়ে। অবশেষে এসে পড়লেন গ্রেগোইসের দেশে। তার চারদিকে সমুদ্র, কখনও এখানে সূর্য ঝুটে নি, চাঁদের মুখ দেখা যায় নি। সব সময় সন্ধ্যার একটা অতি মৃদু আলো, চিরবাত্তির দেশ সেটা। আঁধার, ঠাণ্ডা ধূসর বর্ণের রাত, বড় ভীষণ আনন্দহীন সে দেশ। সেখানে বাস করে গর্জনদের তিন বোন গ্রেগোইরা। বাই হোক পার্সিয়ান অগ্রসর হলেন অদৃশ্য হয়ে। অবশেষে এসে দাঁড়ালেন এক প্রাচীরের কাছে, এখানেই তাঁরা বাস করে। এই গ্রেগোইসের তিনবনের মাত্র একটি চোখ ও ঠাঁত, পরস্পর আদান-প্রদান করে প্রত্যেকে একটি নিদিষ্ট সময় পর্যন্ত পরে থাকে, তারপর অন্তঃস্রব করে। তাইই একমাত্র পৃথিবীতে জানতো গর্জনদের সন্ধান। পার্সিয়ানের আগমন বুঝতে পেরে ছুই গ্রেগোই চৌকিয়ে উঠলো চোখ দাও, চোখ দাও, কেউ একজন এসেছে। এক গ্রেগোই বধন অন্ত গ্রেগোইকে চোখ দিতে গেল, সেই সময়ে পার্সিয়ান আর্থেনার উপদেশ মত খপ করে চোখটি নিয়ে নিলেন। কিছুক্ষণ পরে একজন গ্রেগোই চৌকিয়ে উঠলো—“চোখ দিলে না যে এখনও?” “দিয়ে দিয়েছি ত।”—উত্তর দিল আর একজন। কিছুক্ষণ পরেই গ্রেগোইরা টের পেলে যে শত্রু তাঁদের একমাত্র চোখ হরণ করেছে। তারা কঁপে কঁপিয়ে বললো,—“চোখ ফিরে দাও দয়া করে।”

পাসিফ্‌ বললেন, “যদি গর্জন মেডুসার সন্ধান বলে দাও তবেই আমি চোখ ফিরিয়ে দেব, নতুবা তোমরা চিরকাল অন্ধ হয়ে থাকবে।” প্রথমে গ্রেয়াই বোনেরা রাণী হোলো না, তারা অনেক অতৃপ্ত-বিনয় করলে, ক্রোধ প্রকাশ করে মৃত্যুর ভয়ও দেখালে, কিন্তু পাসিফ্‌ তাঁর সন্ধানে অটল রইলেন। অনেক চেষ্টায়ও যখন গ্রেয়াইরা পাসিফ্‌য়ের মন গলাতে পারলো না, তখন তারা বিপদের দ্রুত উপলব্ধি করে গর্জনদের সন্ধান বলে দিল। পাসিফ্‌ তাদের চোখ ফিরিয়ে দিয়ে আবার উড়ে চললেন দক্ষিণ দিকে স্পেন পার হয়ে। অবশেষে তিনি এসে নামলেন গলোনাগ বীশে বেখানে থাকে ভদ্রাল গর্জনরা। এখানেও গ্রেয়াইদের বেশের মত অন্ধকার, চারদিকে পোড়া গাছপালার বড় বড় মোটা গুড়ি আর সমুদ্রের তীরে বিরাট গুহা, তাতেই বাস করে দানবী গর্জনরা।

মেডুসা! অদ্বুত নিষ্ঠুরতাপূর্ণ নাম এবং তেমনি নিষ্ঠুর তার চেহারা ও চরিত্র। ওর সাপের মত জুর মুখের দিকে যে তাকাবে সেই পাথর হয়ে যাবে। মেডুসা গর্জনদেরই একজন। বাকী দুজনের নাম হেনো এবং ইউরিয়াস, মেডুসাই বড়। সে কুংসিত নয়—দানবী হলেও মুখে তার একটা অদ্বুত অদ্বুত নিষ্ঠুর সৌন্দর্য। ওঠে পুরু, নাক তীক্ষ্ণ আর অদ্বুত বড় বড় জ্যাংড়াবো মর্পটস্‌, ঠাঁটের নিচে খুঁকীর রেখাটি যেন নিষ্ঠুরতায় ভৈরী, মাথার চুল সব সাপ, অদৃশ্য সাপ মাথা ঝড়িয়ে রয়েছে। মিথাসে গরম বাতাসের দফা বের হয়—তাতে পুড়ে যায় সব। এখানকার পানীজলাও অতি বিষাক্ত। তাদের চাঁৎকাও কর্কশ—সেখতে বিরাট ও কুংসিত। পাসিফ্‌ অদৃষ্ট হয়ে এখানে ঊপস্থিত হলেন। শেনো এবং ইউরিয়াস বৃহত্তর অবস্থায়। তারা অমর, মৃত্যু তাদের নেই; হুতরাং তাদের ছেড়ে পাসিফ্‌ মেডুসার দিকে নজর দিলেন। তিনি চুপি চুপি দেবী অ্যাথেনার বাকানো ছুরিটি নিয়ে তার পিছন দিয়ে এগোলেন—তাঁর উপদেশ মত মেডুসার দিকে তাকালেন না একবারও, তাকালেই পাথর হয়ে যাবেন। এইবার পদকটির উপর, মেডুসার মুখের ছায়া পড়লো, পাসিফ্‌ তার চোখ দুটো দেখে থমকে পড়ালেন। তার মনে একটা ভীতি ভেগে উঠলো, কিন্তু সে ভয় তিনি কেড়ে কেল আরো অগ্রসর হয়ে একবারে মেডুসার পিছনে এসে পদকের দিকে তাকিয়ে হোরা মারলেন সর্বশক্তি দিয়ে। পাসিফ্‌দের হাতের প্রচণ্ড আঘাতে মেডুসার মাথা ছিটকে মাটিতে পড়লো এবং মরবার আগে মেডুসা একটা অস্বাভাবিক ভীতকণ্ঠে মরণ-আর্তনাদ করে উঠলো। পাসিফ্‌ চোখ বুজে মুণ্ডি থলেতে পুরলেন। এদিকে বাকী দুই গর্জন ভেগে উঠলো। পাসিফ্‌ তাঁর ছুতোর সাহায্যে তীব্রবেগে উড়ে চললেন সেশের দিকে।

কয়েকদিন পরে তিনি এসে নামলেন ইথিওপিয়ায়। সেখানে সমুদ্রতীরে বেড়াতে গিয়ে তিনি দেখলেন এক অদ্বুত দৃশ্য। তখন অপরায় হয়ে এসেছে। হঠাৎ দেখলেন সমুদ্রের, উপর বিরাট পাথরের স্মৃশে আবদ্ধ একটি পরমাহুন্দরী মেরে। মুখ অভ্যস্ত বিষণ্ণ ও ভরাড। সেখানে অস্ত্র কোন সাহায্য

নেই। পার্সিয়ূস তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে হেলমেই খুলে দেয়া দিয়ে তাঁর এই অবস্থার কারণ
 বিভাণা করলেন। মেয়েটির মুখ আরও বিধ্বংস হয়ে গেল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে বসতে লাগলো :
 “আমিই রাজা মিকাসের মেয়ে এ্যানড্রোমিডা। আমার মা ক্যান্ডিওপিয়া গর্বভরে আমাকে দেবীসেব
 চেয়েও হুমকী বলেছিলেন তাই সমুদ্র দেবতা পসিডন ক্রুদ্ধ হয়ে আমাকে ভীষণ এক সাজা দিলেন।
 সমুদ্র রোবে ফুল ফেঁপে উঠে প্রবলবেগে দেশের উপর দিয়ে খেয়ে এলো সব ভাসিয়ে দিয়ে এবং সেই
 বানের চেয়ে ভীষণ এক দানব উঠে এলো সমুদ্র থেকে ইরিওপিয়াকে ছারখার করে দিতে। সমস্ত
 দেশে হাহাকার উঠলো। অবশেষে রাজা মিকাস বিপদ বুকে আমাকে পসিডনের কাছে উৎসর্গ করে
 এইখানে বেঁচে রেখেছেন—কিছুক্ষণ পরেই সেই দানবটা আমাকে খেয়ে ফেলবে।”—এই বলে
 এ্যানড্রোমিডা কঁদে উঠলো মুখ ঢেকে। পার্সিয়ূস ছোঁরা দিয়ে তাকে বন্ধনমুক্ত করে একটা পাহাড়ের
 শৃঙ্গে বেধে সেই পাথরের উপর এসে ঝাঁড়ালেন। ঠিক সেই সময় সমুদ্রে একটা বিরাট আলোড়ন
 দেখা গিল, পাহাড়ের মত উঁচু ঢেউ উঠলো এবং কিছুক্ষণ পরেই সমুদ্রের বুক থেকে মাথা তুলল এক
 বিশাল ভয়ঙ্কর ডাগন দ্বাতীয় দানব। নিঃশব্দে বেন বড় বইছে, চোখ দুটা ঘোলাটে, মুখের মধ্যে
 ভীষণ কয়েকঝোড়া ধারালো দাঁত। মুখের উপর ছুরির ফলার মত অনেক ঝাঁটা, হাঁটা ওহাগস্বরের
 মত বিরাট। ভীষণ একটা গ্যাঁ-ও-ও-ও গর্জন করে সে তেড়ে এসে পার্সিয়ূসের পানে। পার্সিয়ূস
 কিংবদন্তিতে পাশে সরে গিয়েই সর্বশক্তি দিয়ে ছোঁরা মারলেন তার গলায়। হঠাৎ কিস্কি দিয়ে
 কোম্বারার মত কালো রক্ত পঙ্গপলু করে বের হতে লাগলো। দানবটার ভীষণ গর্জনে আকার্ণ
 বাতাস বেন ধরধর করে কঁপে উঠলো। এইবার বিরাট হা করে পার্সিয়ূসকে গিলতে গেল সে।
 পার্সিয়ূস ভয় পেলেন না, আবার একটু সরে গিয়ে ছোঁরার আঘাত হানলেন বার বার, রক্তে সমুদ্রের
 রঙ কালো হয়ে গেল। অবশেষে দানবটা ওঁ-ওঁ হবে একটা করণ আর্তনার করে টলতে টলতে ঝপাং
 করে গিয়ে পড়লো সমুদ্রের জলে। এইবার পার্সিয়ূস উঠে এলেন এ্যানড্রোমিডার কাছে। হুজনেই
 হুজনের রূপ ও শোণে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। পার্সিয়ূস আর এ্যানড্রোমিডা অতঃপর মিকাসের রাজপ্রাসাদের
 দিকে চললেন। রাজা মিকাস তাঁর কন্যাকে জীবিত দেখে আনন্দে আত্মহারা হয়ে পার্সিয়ূসকে
 বললেন, “তুমি কী চাও?” পার্সিয়ূস একটু লজ্জিত হয়ে মেথি দিয়ে দিলেন এ্যানড্রোমিডাকে। মিকাস
 বুঝলেন পার্সিয়ূসের ইচ্ছা, স্বশীও হলেন, পার্সিয়ূসের মত বীর ভ্রাতাতা ক’জন পায়? শুভলগ্নে
 পার্সিয়ূস ও এ্যানড্রোমিডার বিয়ে হয়ে গেল। কয়েকদিন সেখানে মহা আনন্দে কাটিয়ে পার্সিয়ূস
 এ্যানড্রোমিডাকে নিয়ে দেশের দিকে চললেন। দেশে এসে তিনি দেখলেন, পলিভেকটিদের অত্যাচারে
 অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে তাঁর মা এবং পিতামহতুল্য ডিকটিস দেবরাজ জিউসের মন্দিরে আশ্রয়
 নিয়েছেন, কিন্তু নির্লজ্জ পলিভেকটিস দেবরাজ জিউসের মূর্তির সামনে প্রার্থনারত ভ্যানিকে ধরবার

জন্ত সৈন্যসংহতসহ অগ্রসর হইলেন। ভিকটিগ একাই ড্যানিকে রক্ষা করবার জন্ত অগ্র ধরেছেন। হঠাৎ পাসিফিকে জীবিত অবস্থায় কিরে আশতে দেখে পলিডেকটিগ মহা ক্রুদ্ধ হয়ে সৈন্যদের বললেন, "ওকে হত্যা কর।" সৈন্যদল হৈ হৈ করে তাঁর দিকে ভেড়ে এলো। তবু ভিকটিগ ও ড্যানি চোথ বুজলেন। সুযোগ বুঝে পাসিফিক চট করে মেডুসার কাটা মুণ্ড বেধ করে চোথ বুজে তা তুলে ধরলেন পলিডেকটিগ ও তাঁর অহুচরদের পানে। মেডুসার মুখের পানে তাকাতেই সকলে মুহূর্তের মধ্যে বে বে অবস্থায় ছিল সেই অবস্থায় পাড়িয়ে পাথর হয়ে গেল। ভিকটিগ ও ড্যানি বেঁচে গেলেন—মেডুসার মুখের পানে তাকান নি বলে। পাসিফিক তাড়াতাড়ি বিপজ্জনক সাম্রাটিকে ধরেতে পুরলেন। আজ বহুদিন পরে মা ও এ্যানড্রোমিডাকে নিয়ে পাসিফিক চলে গেলেন তাঁর নিজ দেশ, নিজ রাজ্যে আগমনে। এদিকে রাজ্যে অ্যান্ড্রোমিডা বৃদ্ধ হয়েছেন—অথচ রাজ্যের উত্তরাধিকারী পাসিফিক নেই। বহুদিন ড্যানিকে না দেখে তাঁর অহুতাপও হয়েছিল। তাই পাসিফিকের দেখে তিনি মহা আনন্দে তাঁদের সন্ধান করলেন। এর পর একদিন রাজা ও পাসিফিক ডিসকাস ছোড়ার প্রতিযোগিতা করছিলেন। পাসিফিক একবার তাঁর ডিসকাসটা প্রচণ্ড বেগে ছুড়ে দিলেন, কিন্তু দৈবক্রমে তা লেগে গেল বৃদ্ধ রাজার মাথায়। তিনি দেখানোই নিহত হলেন। এইভাবে হত্যা করবার জন্ত পাসিফিক ভীষণ অহুতাপ হয়ে রাজ্যভার নিয়ে গিলেন তাঁর এক খুড়তুতো ভাই বেগোপেনথিংকে এবং নিজে মিলিনা নগরী স্থগিত করে সৈন্যনে এ্যানড্রোমিডা ও মাকে নিয়ে স্থখে দিন অভিযান্ত্রিক করতে লাগলেন।*

* গ্রীক পুরাণ অবলম্বনে

শিয়াল রাজ্য

শ্রীমোহিনীমোহন গাঙ্গুলি

বনের ধারে শিয়াল রাজ্যর মস্ত বড় বাড়ি,
বাড়ির মাঝে আবার আছে ট্যান্সি

মোটর গাড়ি।

সিংহ মশায় সেনাপতি মন্ত্রী চিত্তা বাঘ,
হালুদ মামা বাবার এনে মাসে করে ভাগ।
ইছর, বিড়াল, গঙ্গাফড়িং ব্যাং ব্যাঙাচি তুলো,
কাছিম, বাছড়, সবাই আছে রাজ্য করি

আলো।

কোকিল, টিয়া, পাপিয়ারা সভায় করে গান,
মধুর নাচে পেখম তুলে, গাধা ধরে তান।

পেচক হলেন বিচারপতি, বানর দারোয়ান,
হাতির 'পরে চড়ি' রাজ্যে দিবিজয়ে বান।

কাকাভুয়া ময়না পাখী ছ'জন বডিগার্ড

ছ'জন ছুটো অস্ত্র নিয়ে যাচ্ছে চমৎকার।

শিয়ালরাজ্যে আচ্ছা ভাষা দিলদরিয়া প্রাণ,
নিভা নৃতন খেয়াল মত আদেশ করেন

দান।

এসব মজা দেখবে যদি একটা তুলে ঠ্যাং

মাদল এনে বাজাও জোরে, ড্যাড্যাং

ড্যাড্যাং ড্যাং।

শিক্ষার আদর্শ

শ্রীঅরুণকুমার দে

আজ আমি তোমাদের শিক্ষার আদর্শ সম্বন্ধে কিছু বলব।

শিক্ষার মধ্যে মোট চারটি H আছে। এই চারটি H হচ্ছে : ১। Head বা মস্তিষ্ক। ২। Health বা স্বাস্থ্য। ৩। Hand বা হাত। ৪। Heart বা হৃদয়। আগের দিনে যে শিক্ষার ব্যবস্থা চালু ছিল, তা ছিল শুধু Head, অর্থাৎ মস্তিষ্কের চালনা। অল্প তিনটি H কে তখন তুচ্ছ করা হোত। কিন্তু সামাজিকতা বা সমাজ সেবার প্রয়োজনে, অল্প তিনটি H এর আবশ্যিকতা অতি প্রয়োজন। Health বা স্বাস্থ্যের জ্ঞান শিক্ষা পেতে হবে—লেখাপড়া বা অগ্ন্যস্ত শারীরিক শিক্ষার মাধ্যমে। Hand বা হাতের কাজের জ্ঞান শিক্ষা লাভ করতে হবে—কোন প্রকার ব্যবহারিক শিল্প শিক্ষার মাধ্যমে। Heart বা হৃদয়ের উৎকর্ষতা শিক্ষা পেতে হবে—স্কুল ও কলেজের সমবেত ছাত্রদের সঙ্গে প্রাণের আদান-প্রদানে—স্কুল ও কলেজের প্রতিটি ছাত্রের পরস্পরের সঙ্গে সৌহার্দ্য-সহানুভূতি, বন্ধুতা, আন্তরিকতা ও কৃতজ্ঞতা বন্ধনের সূত্রে বাঁধা পড়তে হবে, তবেই হবে শিক্ষার পূর্ণতা।

মহাপুরুষ মহম্মদ

মুসল্লী অবেদা খাতুন

নিবিড় তমসা ঘিরিয়া রাখিছে আরবের	তোমার জন্মে উদিল আরবে সত্যের নবারণ,
মরুভূমি	মানবতা সেখা লভিল আলোক, শেখালে
দিগন্তে নাই আলোক-বিন্দু, নিঃসাড়	মহৎ গুণ।
বাগ্‌কা চুমি।	উৎপীড়িত যারা হ'ল নির্ভয়, স্ত্রীর ভরসা
হিংসার বিষ-বাতাসে পূর্ণ মানুষের অন্তর,	পেয়ে,
বিষে-বিষ, হানাহানি আর কুটিলতা,	আশার আলোকে জাগিল বিশ্ব, নবজীবনের
সহচর।	গান গেয়ে।
লোভ ও হৃদয়ে রক্তপ্রবাহ নিয়ত প্রাবিত সেখা,	সাম্যের বাণী কষুকণ্ঠে ধনিত দ্বিধাদিক,
অস্তায়, অসত্য-পূর্ণ চিন্তে ভরা নিতি	শত্রুমিত্র নাই ভেদাভেদ বন্ধে টানিয়া নিক।
কলুষতা।	প্রীতি ও প্রেমের আলিঙ্গনে মুক্ত করেছে।
বিলাসের শ্রোতে প্রাবিত হতেছে সত্যতার	সবে,
অবশেষ,	হে লোকগুরু, মানবের হিতে এসেছিলে
পাপের চলেছে তাণ্ডব নাচ ধর্মের নাই লেশ।	এই তবে।

জাগছে গাধার চেতন

কুমারী কল্যাণী চক্রবর্তী

সন্ধ্যাবেলা ধোপার মেলা
দড়ি হাতে ধরে
গাধার গায়ে বোঁচকা দিয়ে
ঘরের পানে ফেরে।
সেদিন দেখি কাণ্ড একি।
ধোপার পরিবার
কাঁধে পিঠে বোঁচকা নিয়ে
চলছে সারে সার।
শুধাই তাদের, “গাধা তোদের
গিয়েছে কি মারা?”
বলে সবাই, “তা নয় মশাই
টুটিক্ করে তারা।”
বলছি শোন, গল্প কোন
নয়কো যেমন-তেমন
শুনবে যখন বুঝবে তখন
জাগছে গাধার চেতন।
হ’চ্ছে তোফা গাধার সভা
প্রশ্ন মনে সবার :
মোদের পর্ব মোদের দর্প
কম কি অধিকার ?
না হয় মোরা বইছি বোরা
সব প্রাণীরই হেয়

তাই বু’লে কি ক’রব নাকি
সম্ম এমন কেহ ?
আর পারিনা মানতে মানা
গাবোই এবার গান
বইছে হাওয়া গাওনা ভায়া
গানের সাথে তান।
পাকা ধানে মইটি টেনে
করিনিজো ক্ষতি
কেন তবে বাধা দেবে
এমন কেন মতি।
সবাই তখন হ’ল মগন
করতে গানের রেওয়াজ
ঘ’্যাকো ঘোঁং ঘ’্যাকো ঘোঁং
বিচিহ্ন সে আওয়াজ।
হায়রে ধর্ম। গানের ধর্ম
বুঝলোনাকো কেউ
ছুটোছুটির পেটাপেটির
লাগল এসে ঢেউ।
মনের দুঃখে মুখটি বুজে
গাধারা হয় হাওয়া
তার পরেতে বোঁচকা নিতে
টুটিক্ হ’ল চাওয়া ?

খেলোয়ানদের খবর

মেঠুড়ে

পদ্মশ্রী

ভারতে সাধারণতঃ দিবসে খেলাব বিস্তরণ উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি ভারতের অলিম্পিক নৌড়বীর যিলধা সিং এবং ইংলিশ চ্যানেল দাতাক্রীষিহির সেনকে 'পদ্মশ্রী' আখ্যায় ভূষিত করেছেন।

ডন ব্র্যাডম্যানের বিশ্বরেকর্ড স্থান

পাকিস্তানের একশ বছরের টেস্ট খেলোয়াড় হানিফ মহম্মদ ৪২২ রান করে প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলায় ব্যক্তিগত রান সংখ্যার নতুন বিশ্বরেকর্ড স্থাপন করেছেন। রণজি ট্রফি প্রতিযোগিতার মতনই কয়েক-ই-আজার ট্রফির সত্ত বছরের বিজয়ী ভাওয়ালপুর দলের বিরুদ্ধে করাচীর পক্ষে খেলে হানিফ মহম্মদ দশ ঘণ্টা পর্যন্ত মিনিট ব্যাট করেন। কোনো চাপ মেন নি।

১২২০-৩০ সালে চল্লিশ বছর বয়সে ডন ব্র্যাডম্যান (নিউ সাউথ ওয়েলস) কুইন্সল্যান্ডের পক্ষে ৬৭. ৪৫ মিনিট গেলে অপরাধিত থাকেন। তিনি ৪৫২ রান করেন। প্রায় তিরিশ বছর ব্র্যাডম্যানের বিশ্বরেকর্ড কেউ ভাঙতে পারেন নি। প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলায় ধারা চারশোর ওপর রান করেছেন, হানিফ মহম্মদ তাঁদের চেতন পক্ষর। আর চারজনদের নাম : ১। ব্র্যাডম্যান : ৪৫২ নট আউট। নিউ সাউথ ওয়েলস বনাম কুইন্সল্যান্ড (১২২০-৩০)। ২। বি. বি. লিথলকার : ৪৪৩ নট আউট। মহারাষ্ট্র বনাম পশ্চিম ভারত (পূনা ১২৪০-৪২)। ৩। বিল পলকোর্ড (অস্ট্রেলিয়া) : ৪০৭। ভিক্টোরিয়া বনাম কুইন্সল্যান্ড (মেলবোর্ন ১২২৭-২৮)। ৪। বিল পলকোর্ড : ৪২২। ভিক্টোরিয়া বনাম

টাসমানিয়া (মেলবোর্ন ১২২২-২৩)। ৪। আর্টি ম্যাকলারেন (ইংল্যান্ড) : ৪২৪। ল্যান্ডশায়ার বনাম শারসেট (টর্নটন ১৮২৪)।

গত বছর জাহ্নঘারি রাশে ক্রিস্টমাসে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে পাকিস্তানের পক্ষে মোট ১৬৭. ১০ মিনিট ব্যাট করে হানিফ মহম্মদ প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলায় ব্যাট-এর দীর্ঘতম সময়ের রেকর্ড স্থাপন করেন। তাঁর ৩০৭ রান টেস্ট খ্যাতে তৃতীয় সর্বোচ্চ রান সংখ্যা।

আই. এফ. এ. সীল্ডের ফাইন্সাল

গত ২২ জাহ্নঘারি আই. এফ. এ. সীল্ডের বহু-দিনের প্রতীক্ষিত পুনরুদ্বিগত ক্রীড়া খেলায় ইস্টবেঙ্গল ক্লাব তাদের পুরনো প্রতিদ্বন্দ্বী বোহন-বাগান দলকে ১-০ গোলে হারিয়ে দিয়ে সাত বছর পরে আবার শীর্ষ জয়ের কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। ভারতমোহর বিচারে সেমিন ইস্টবেঙ্গল দল প্রতিপক্ষ দলের তুলনায় অনেকাংশে ভালো খেলেন। বিরতির পর বলরামের ফ্রি কিক থেকে নারায়ণকে বল মিলে শেখোক্ত খেলোয়াড় তাতে তীব্র স্ট করেন। বল বায়ে লাগার পর গোল-রক্ষক এ. বহুর গারে সেগে গোলে প্রবেশ করে (১-০)। ইস্টবেঙ্গল জয়ী হয়।

ফ্লাইট সার্জেট জগদীশ সা

সারমপুর শিবিরের পাঁচ নম্বর টুপের ফ্লাইট সার্জেট জগদীশ সা এ বছর দু'নম্বর বেঙ্গল এয়ার স্কোয়াড্রনের (এন. সি. সি-র বিমান শিক্ষার্থী বিভাগ) শ্রেষ্ঠ ক্রীড়ার্থী মনোনীত হয়ে দীপক সেন দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন। জিমান সা কলকাতার হিম্মি স্কুলের ছাত্র।

—

বুলগেরিয়া একাদশ বনাম আই. এক. এ.

গত ২৫ জানুয়ারি ক্যালকাটা রাতে বুলগেরিয়া একাদশ বনাম আই. এক. এ. একাদশের প্রদর্শনী ফুটবল খেলা অর্জিত হয়। ভারত সংঘের বুলগেরিয়া দলের এটাই ছিল প্রথম খেলা। বুলগেরিয়া দল মেলবোর্নে অলিম্পিক খেলার ভারতকে হারিয়ে দিয়ে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছিল। মেলবোর্নে অর্জিত অলিম্পিক খেলার অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়দের ভেতর যাত্রা একজন খেলোয়াড়ই ভারতে এসেছেন।

খেলা শুরু হবার দু'মিনিটের ভেতরই আই. এক. এ. দল এগিয়ে যায়। দামোদরবর্মা এই সময় একটি বল টেনে নিয়ে প্রদীপ ব্যানারিকে দেন। ব্যানারি দামোদরবর্মা থেকে বল ফেরত পাঠালে মেলবোর্ন খেলোয়াড় গোল লক্ষ্য করে তীব্র সট করেন। দামোদরবর্মার সটের পর বল গোলরক্ষকের হাত থেকে ফিরে গোলের কাছাকাছি ভাগেই ভেতর থাকার সময় সুযোগ সন্ধানী বলরাম মহম্ম সুযোগ পেয়ে বল গোলের ভেতর ঢুকে দেন (১-০)। বুলগেরিয়া এই গোল শোধ করে খেলা তাৎক্ষণিক হার করে মিহিট আগে। তাসিলত দুর থেকে একটি সট করলে বলদী এম. বরুণ বলটি টিকমত আয়ত্তে আনতে পারেন নি, ফলে বরুণের হাত থেকে বল ম্যালিসভের বলদী খেলোয়াড় ভূপেন্ডের কাছে দেওয়া হার তিনি গোল শোধ করে দেন (১-১)। এইভাবে বুলগেরিয়া দলের সঙ্গে আই. এক. এ-র প্রদর্শনী ফুটবল খেলা অসমাপিত ভাবে শেষ হয়।

ফুল ক্রিকেট লীগে বোলারদের প্রাধান্য

কলকাতা ফুল ক্রিকেট লীগে যে সময় খেলা হয়ে গেছে তাতে বোলারদের প্রাধান্য বিশেষভাবে দেখা গিয়েছে। ওরিয়েন্টাল দলের এ. ব্যানারি লাহা নগরের বিপক্ষে একটি 'হাট-টিক'-সম্মত

৬ রানে ৮ উইকেট লাভ করে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। এ ছাড়া চিত্তরঞ্জনবর্মা ইউ. বর্মণ (১২ রানে ৭) এবং অন্তরচরণের আর দে-ও (৭ রানে ৪) যথাক্রমে বামহাতি ও ডানহাতিদের বিপক্ষে ভালো খেলা করে নিজের নিজের দলকে জয়লাভে বিশেষ সাহায্য করেন।

সাঁতারে বিশ্বরেকর্ড

এশিয়ার ক্রীড়ার সম্ভরণ চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়ার বেভারলি বেনব্রিজ ২২০ গজ বাটারফ্লাই সাঁতারে মহিলাদের বিশ্ব রেকর্ড ভেঙেছেন। আন্তর্জাতিক সম্ভরণ লন্ডন ১৯৫৭ সালে এই দূরত্বের জন্যে সময় ঠিক করার পর মহিলাদের ভেতর বেনব্রিজই তা সর্বপ্রথম অতিক্রম করেন। বেনব্রিজ ২ মি. ৪৩৮ সেকেন্ডেও নির্দিষ্ট গজ অতিক্রম করেন। এই সময়ে আন্তর্জাতিক মানের চেয়ে ০.৬ সেকেন্ড কম।

ন' মিনিটে ৮৮০ গজ সাঁতার

অস্ট্রেলিয়ার তরুণ সাঁতার বিখ্যাত জন কনরাডস্ ৮৮০ গজ এবং ৮০০ মিটার ফ্রি স্টাইল সাঁতারে ন' মিনিটের 'গ'ও অতিক্রম করেন।

নিউ সাউথ ওয়েলস সম্ভরণ প্রতিযোগিতায় জন কনরাডস্ ৮ মি. ৫২.৬ সেকেন্ডে ৮৮০ গজ সাঁতার (ফ্রি স্টাইল) কেটে ৮০০ গজ ও ৮৮০ মিটার সাঁতারে নিজেই বিশ্বরেকর্ড ১৫.২ সেকেন্ডের চেয়েও কম করেন। খেলার লগতে কনরাডস্-এর এ কীর্তি অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। লোকে চার মিনিটে হাইল মোড়ের কথা বলে থাকে, কিন্তু এই দাম্ভ্য তার চেয়েও অনেক কঠিন।



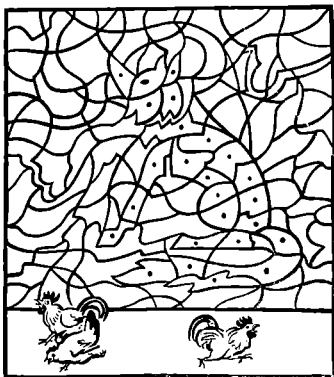
খাঁখাঁ পাণ্ডা

ত্রিমিনতি মুখোপাধ্যায়

কার ভয়ে ?

*

পান্ডের ছবিতে উপরে
হিজিবিজি আর নীচে
মুরগীর দৌড় দেখতে
পাচ্ছি। কিন্তু মুরগীরা অমন
দৌড়ছে কেন ? ভয়
পেলেই তো। এমন প্রাণ-
ভয়ে দৌড়র জীবজন্তুরা।
হ্যাঁ, ভয়ই পেয়েছে ওরা।
উপরের ঐ হিজিবিজির
মধ্যে তাদের হারান্য়ক
শত্রু কি একটু। লত
দেখতে পেয়েছে মুরগীরা।
লতটাকে ভোমরা অংগ
দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু
এখনি দেখতে পেতে



পারো, যদি ঐ হিজিবিজির মধ্যে যে ছুটুকিগুলি আছে, সেই ছুটুকি সমেত ঘরগুলি যদি রঙ দিয়ে
ভরিয়ে থাকে। লেড-শেলিল দিয়ে ঘষে ঘষে ভরাতেও লতটি বেরিয়ে আসবে এবং তখন লতটি কি তা
আর চিনতে থাকি থাকবে না কারো।

হরেক রকম

শ্রীপ্রণব শুভ

ভাতভাতা পুর পৌছে দেবার সবচেয়ে ভাল তিনটি উপায় কি ?

একটি গোলাকার বৃত্তের (circle) ক'টি দিক আছে ?

দাত একবার পড়ে আবার বেহোয়, কিন্তু সবচেয়ে শেষের দাত কখন দেখা দেয় ?

ইদুরের পক্ষে সবচেয়ে খারাপ সময় কোন্টো ?

এমন কি জিনিস যা প্রয়োজনে বাইরে ছুড়ে ফেল দাও এবং যখন প্রয়োজন থাকে

তখন তুলে রাখো ?

৩। বর্ষাকালে ব্যবহার করে আনন্দ সবচেয়ে কোন জিনিস ?

৭। এক ক সাধারণ প্রশ্ন দ্বারা উত্তর 'হ্যাঁ' অথচ তুমি কিছুতেই বলতে পার না ?

৮। এমন কি জিনিস যা দরজার মধ্যে দিয়ে গেছে, অথচ একেবারে ভেতরেও যায় নি ও
কখনো ফেরেও আসে নি ?

নতুন ধাঁধা

শ্রীদোনেনকুমার মল্লিক

ভালভাবে চলতে পারি অঙ্ককার দিয়ে

আরদোলা আর ইদুর আমি ধরতে পারি গিয়ে ।

চারপেয়ে জীব, লতা, বন্যী হয়ে ঘরে ।

পায়ে ঘোর জোরাকাটা পর নাহি ধরে ।

৩। একটা সিগারেটের টিনে ৫০টি সিগারেট ধরে । ঐ টিনে যদি আরও রাখার চ
করা যায় তবে কয় পক্ষে কত সিগারেট আটকে ।

উত্তর

হরেক রকম : ১। টেলিগ্রাফ, টেলিফোন ও মেয়েদের কাছে বলা । ২। ছ'টি—উপা
দিক ও নীচের দিক । ৩। আসল দাত সব পড়ে থাকার পর, বাঁধালে । ৪। বর্ষাকাল বা মূলদ
বখন বৃষ্টি হয় । ৫। লক্ষ্য ৩। ভাতা ৭। তুমি কি ঘুমিয়ে আছ ? ৮। দরজার ও
দেবার গর্ত ।

নতুন ধাঁধা : ১। বেড়াল । ২। জীরাফ (Giraffe) । ৩। ১টা টিনে ৫০টি সিগারেট ধরে, ছা
আর রাখলে সিগারেট ধরবে না ।



প্রাচ্য প্রতিবছরই আমরা তোমাদের মৃত্ত অর্থাৎ তোমাদের উৎসাহ দেখার জন্য গ্রাহক গ্রাহিকা সংখ্যা প্রকাশ করে থাকি। তোমরা যারা সাহিত্য-অনুশাস্তি তারা এতে লেখবার সুযোগ হাঁধা পাঁধে বলে আমরা সে কথা ভেবেই বিবেচন করে এই সংখ্যাটি প্রকাশ করে থাকি। অবশ্য সাধারণ সংখ্যাত্তেও মাঝে মাঝে তোমাদের লেখা প্রকাশ হয়। তবে এটা যেন তোমাদের সেই টেনের রিজার্ভ কামরা। তোমাদের কাছে থেকে বহু লেখা আসে কিন্তু সবই তো আমরা প্রকাশ করতে পারি না—কিন্তু তাঁর মানে এই নয় যে তোমাদের লেখা ঠিক হয়নি। স্থান সংকীর্ণ সেইজন্য সবগুলি প্রকাশ করা সম্ভব হয় না। এর জন্য তোমরা দুঃখিত হয়ো না। যাদের লেখা প্রকাশ করা গেল না তারা আবার পরে লিখে পাঠাবে, সম্পাদক মশাই নিশ্চই তাইবোনে তাদের লেখার কথা।

তবে তাই একটা কথা এইসঙ্গে মনে রাখতে হয় যে যেলেখা লিখবে তাই ছাপাও প্রকাশ করতে হবে তা ঠিক নয়। ধারা বড় সাহিত্যিক তাঁদের লেখনী যখন পরিপূর্ণ হয় তাঁরাও তাদের প্রথম জীবনের লেখাগুলি দেখে ভাবেন এগুলিও তিনি একদিন লিখেছিলেন। কথার আছে 'লিখতে লিখতেই মারে।' কাজেই লিখে যেতে হয়—দশটা লেখার মধ্যে একটি হয়তে প্রকাশ-যোগ্য হয়; কিন্তু তাই বলে লেখা বন্ধ করতেও নেই, বিরামদাঁহও হতে নেই।

করকমাস ধরে তোমাদের চিঠি পত্রের উত্তর নানা অন্তর্বিধার মৃত্ত ভালভাবে দেওয়া হয়নি। আশাকরি এবার নিয়মিত ভাবে উত্তর দিতে পারবো।

চিঠিপত্রের কথা বলতে গিয়ে মনে পড়লো সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী জীৱহরলাল নেহেরুকে লেখা পত্রাবলীর দফলন প্রকাশিত হয়েছে। এতে দেশ-বিদেশের যে সব মনীষী বিভিন্ন সময়ে তাঁর সঙ্গে পত্রালাপ করেছেন সেই সব পত্র এই মতলনে স্থান পেয়েছে। সামাজিক কর্তব্যের খাতিরে অথবা নেহাও পারিবারিক কারণে যে সব চিঠি পত্র লেখা হয় তাদের গুরুত্ব সাময়িক কাল অথবা পরিবারের গভী অভিক্রম করতে পারে না। কিন্তু এমন ধরনের চিঠিপত্র অনেক সময় লেখা হয়েছে বা সাহিত্যিক সৃষ্টি হিদাবে গুণু গণ্য হবার যোগ্য নয়—তাদের ব্যক্তি মনের প্রতিচ্ছবি বলে অনায়াসে গ্রহণ করা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তি সত্তাটি তাঁর পত্রাবলীর মধ্যে দিয়ে যেমন সহজ ও স্বন্দর ভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে সেটি হয়তো জীবনীকাররাও অন্ত সার্থকভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারেননি। তোমরা যখন আমাদের কাছে চিঠিপত্র লিখবে তখন তাকে অকারণ তথা কটকিত করে তুলো না—যে সম্পর্কে তোমাদের স্পষ্ট ধারণা নেই অথবা ধার সম্পর্কে কৌতুহল নিবৃত্তির সহজ উপায় তোমাদের নাগালের বাইরে,—সে সম্পর্কে তোমাদের কাছ থেকে প্রায় অবশ্যই আশা করবো—কিন্তু তার চেয়ে বেশী আশা করবো যে তোমাদের লেখার মধ্যে

বেন তোমাদের মনের পরিচয়ট পাই। একটা ঘটনা ঘটলো তার সম্পর্কে বা কিছু জানবার সব ভেদে নিলে কিন্তু তাতেই সব হয়ে গেল তা মনে করো না। এই ঘটনাটি তোমার মনে কিস্তাবে বর্ণাপাত করলে এটি জানবার পর থেকে কি প্রশ্ন তোমার দেহা দিল সেটি যদি আমাদের জানতে পাও তাহলে আমরা সন্তোষিত হই। শুধু জানা নিয়েই সন্তোষিত থেকে না—প্রত্যেক বিষয় সম্পর্কে নিজস্ব মতামত পৃষ্ঠনের চেষ্টা করো আর সে মতামতগুলো অব্যাহত কি না সেইটো জানবার জন্যে বড়ো সাহায্য নিও।

চিঠির উত্তর : প্রশান্তকুমার মিত্র (বড়গা, বীরভূম)—কই তোমার আগের চিঠি পাইনি আমি। গল্প কবিতা বা দেশ ও তার উত্তর যা কিছু সব-আলাদা সম্পাদক মশাই-এর নামে পাঠিও। সেদা অভ্যাস করছো ভেদে খুব খুশী হলাম। কিন্তু এখনই তুমি যা লিখবে তা প্রকাশ করতে হবে না। প্রকাশ না হলে মন খারাপও করো না তবে লিখে দেও। **সুবোধকুমার আমাল** (ভাঙ্গলগুপ্তাবার)—কোন সংখ্যা বা কোন কোন সংখ্যা মৌচাক পাওনি—সে সব বিস্তৃতভাবে লিখে সম্পাদক মশাইকে চিঠি দিও। কবিতাও ঠিকে পাঠিও যদি তিনি বিবেচনা করেন নিজস্বই চাপা হবে। **রুমেল মিত্র (পুর্নালিয়া)**—তোমার জন্মদিনে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। রাষ্ট্রপতি তোমাদের ওখানে গিয়েছিলেন আর সেই সম্পর্কে যা-যা খবর জানিয়েছ—তা পড়ে খুব খুশী হলাম। **ছবিরাণী গোস্বামী (ভানুসম্বরপুর)**—মহিলা আর মহিলামহল দুটি আলাদা পত্রিকা। প্রথম পত্রিকাটির সম্পর্কে বা প্রশ্ন করবে তার উত্তর হলো 'তালো করে দেখো।' **প্রদীপ মজুমদার (বাগড়া)**—অমনা কলম আবিষ্কার করেছিলেন ওয়াটারমান। ইনি একজন আমেরিকান ১৮৬৪ খৃস্টাব্দে আবিষ্কার করেছিলেন। মশ্ট আর পিন্টু বন্দ্যোপাধ্যায় (নবীকুশল সে খ্রীষ্ট কলিকাতা)—পৃথিবীর বড় বড় কৃষি—আফ্রিকার সাহারা—ওলক বর্গমাইল জুড়ে। **প্রদীপ ও শিখা রায় (হুইনহো স্ট্রিট)**—আই. এক. এ—এর পুরো নাম ইন্ডিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন। **INDIAN FOOTBALL ASSOCIATION**—তোমরা নিজস্ব ফুটবল খেলা দেখতে বা খেলতে ভালোবাসো? **দীপক দত্ত (পলাশী)**—লেখা চেরেছ? কাগজ এখনও চলছে তো? চলুক—পরে একসময় দেখো। **কল্যাণী চক্রবর্তী (মক্তঃকরপুর)**—লেখার বাণায়টা সবই সম্পাদক মশাই নিজে দেখেন—তার কাছে লেখা পাঠানো ভাল। কলকাতা নতুন ভিত্তি হয়েছে—ডাল লাগারই কথা। **চিত্রা চক্রবর্তী (আমানগোল)**—দুর্ভাগ্য দৃষ্টে ঠিক কি জানতে চেরেছ? হিন্দুদের বেদ, বৌদ্ধের ত্রিপিটক, মুসলমানদের কোরাণ, খৃষ্টানদের বাইবেল, শিবদের গ্রন্থসংগ্রহ ইত্যাদি—জানি না কি তুমি জানতে চাও। **সুচেতা ত্রিপাঠী (হেমিনীপুর)**, **চিত্রা রায় (কালীঘাট)**—কথা বলে দেখলে না কেন? **সুধাংশু ও মজু ঘোষ (টালিগঞ্জ)**, **হরিতোষ চট্টোপাধ্যায় (বালিগঞ্জ)**, **জিতেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায় (বেণীপুর)**, **শঙ্করভূষণ দাস (বালিগঞ্জ)**, **সীতাংশুকুমার ঘোষ (টালিগঞ্জ)**, **চন্দ্রা ও রত্না বন্দ্যোপাধ্যায় (কোলকাতা)**, **মালা ও পলা (হাওড়া)**—তোমাদের চিঠি পেয়েছি। সকলকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। তোমাদের—মধুদি।

প্রিয়বীরচন্দ্র সরকার কর্তৃক ১৪ বর্ষের চার্টার্ড স্ট্রিট, কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত

ও তৎকর্তৃক প্রত্ন প্রেস, ৩০ কর্নওয়ালিস স্ট্রিট, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

মূল্য : চল্লিশ নয়া পয়সা

মৌচাক—চৈত্র, ১৩৬৫



চৈত্র-বাড়ী
ছোটো : পাহা সেন



০১২/

৩৯ বর্ষ]

চৈত্র—১৩৬৫

[১২শ সংখ্যা

একলার কান্নার

খ্রীষ্টা রায়

ওয়ের ছেলে ঘরে

কেন—কেন এমন করে ?

কেন—এমন অধীর হ'য়ে

একলা কেঁদে মরে ?

লতার বৃকে ফুলটি দোলে

পাতার চুম্বায় পাপড়ি খোলে

পাখীরা ঐ ফুটল বনের

ছায়ায় নিটোলে ।

আহা—একলা এখন

কেউই তো নেই কোথাও

ঘতই—কাছে দেখে এবং

ঘতই দূরে বাও !

সন্ধ্যাতারার টিপটি প'রে

জড়িয়ে ঝাঁচলে

আকাশ কেমন ঠাণ্ড নিয়েছে কোলে ।

বাতাস কেমন বইছে ধীরে

সঙ্গে ফুলের গন্ধ কি রে ?

হু'একটি গান হু'একটি তান

কোথেকে সে পেলে ?

একলা শুধু কেঁদে মরে

ওয়ের ঘরের ছেলে ।

মা আছে ওর ? কোথায় গেছে ?

বলতে পারো ত। কি ?

আলোর দেশে হরের দেশে

উখাও হ'ল নাকি ?

আখেক আলো-ছায়—

শুন্ছে সে কি পরীসের গান

রূপালি পর্দায় !

যাঠের মধ্যে ব'সে

দেখছে সে কি উছা কেমন

আকাশ থেকে খসে ?

সুখার হাটে বিকায় দার। তাদের বেননার,

নামিয়ে নিতে গেছে বৃষ্টি একটুখানি ভার ?

কাঁদছে কেন মানিক আমার

একলা ঘরের কোণে,

কেমন মা সে ধুলায় কলে

গেছে বুকের ধনে ?

বাপ'মা হ'চোখ কলে আঁচুল

কিসের খোঁজে হ'হাস্ত ব্যাচুল—

মন বোঝেনা অবুঝ ছেলের কান্না ভেঙে পড়ে—

তরুণ তরু বৈহন করে একটুখানি কড়ে ।

জানিলা দিয়ে হাওগার শোহাগ

ছড়িয়ে গেল চুলে,

শিথ দিয়ে গান শুনিবে গেল

মরনা আর বুলবুলে ।

রাত্রি এলো নরম পায়ে

ঈজল করা হিমেল গায়ে

তুলিয়ে গেল বিশ্ববৃন অন্ধকারের তলে,

ঘুমের দিমে ধুলার শুধু একটি রাগিক জলে ।

কে আছে গো নাও তুলে নাও

বুকের পরে ওকে

এখনো ঠোট কাঁপছে দেখ

কাছা-ঝরা বৌকে ।

চুলগুলি ওর আঁচুল দিয়ে

সমান করে দাঁও বুলিয়ে—

গালের পাশে জড়িয়ে গেছে চোখের জলে ভিজে

মেঝের ধুলোয় সারা গায়ে মাখল কাঁসা নিজে ।

আঁচল দিয়ে গায়ের ধুলো

দুছিয়ে দিয়ে দাঁও—

একটু কালো কামল-রেখা

চোখের কোলে দাঁও ।

শুনশুনিয়ে গাও ছাঁটি গান,

স্বপ্নে ভরুক ঐটুকু প্রাণ—

বিছান। থাক ঘুমাক রাগিক বুকের নরমে—

একটি হরের রেশের মত গানের চরমে ।

ব্রহ্মের বিবেকানন্দ



অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

সাতাশে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত, টানা সাতেরো দিন চলেছে ধর্মমহাসভার অস্থগঠান—
সকালে-বিকালে, কখনো-কখনো ছুপরে। এবং প্রত্যাহই কিছু-না-কিছু বলতে হচ্ছে
স্বামীজিকে। না বলে উপায় কি! এমনি সব শুকনো জ্ঞানের কথা শুনে অতিষ্ঠ
হচ্ছে শ্রোতারা, খানিক পরে-পরেই উঠে-উঠে যাচ্ছে, তাদের ধরে রাখা কুঃসাধ্য।
তখন, সেই অবস্থায়, একটি মাত্র মন্ত্র আছে। বশীকরণের মন্ত্র। ‘এর পর বিবেকানন্দ
বলবে।’

এর পর বিবেকানন্দ বলবে। তবে আর কথা নেই। বসে যাও, যতক্ষণ না
এ যন্ত্রণাটা শেষ হয় অপেক্ষা করে।

পোষাবে অপেক্ষা করা। কষ্টকঠিনের পরেই মধুমাধবী।

কি আনন্দময় বিবেকানন্দ। কি উজ্জ্বল গভীরস্পর্শ চোখ, কি হৃদয়গলানো
গাঢ় কণ্ঠস্বর। মুখের হাসিটিতে বহুতার গন্ধ। আর কি শুভ্রশুভ্র ইংরিজি। হয়তো
বা কোথাও একটি পরিচ্ছন্ন আইরিশ স্মর।

বিবেকানন্দকে শোনা মানে দেবতাকে শোনা। যেন প্রার্থনার মন্দিরে স্তব-
মুগ্ধ হয়ে থাকা। আর কোনো দাবিতে নয়, বিবেকানন্দ যেন বলছে দৈবের দাবিতে।
না শুনে তুমি যাবে কোথায়? কে তোমাকে ছুটি দেবে?

যেই বিবেকানন্দের বলা শেষ, অমনি প্রায় হল খালি। আর বসে থেকে কি হবে? আর কি শোনবার আছে? বিবেকানন্দ যদি বন্ধ হল, বন্ধ হল আনন্দের জলপ্রপাত।

কর্তব্যাক্টিরা বিব্রত হলেন। বিবেকানন্দের বলার পরে সভায় যদি আর লোক না থাকে তা হলে বিবেকানন্দকে সকলের শেষে বসাতে বলা। আর সকলের বেলায় লোক থাকবেনা এ কেমনতরো কথা।

‘আপনারা বসুন। স্থির হোন। বলবেন বিবেকানন্দ।’ ঘোষণা করল কর্মকর্তারা।

‘বলবেন? কখন বলবেন?’

‘সকলের শেষে।’

‘কতক্ষণ বলবেন?’

‘পনেরো মিনিট।’

তাই সই। বসে যাও। পনেরো মিনিট শোনবার জেজ্ঞেই বসে যাব পাঁচ মন্টা। পোষাবে বসে থাক। পনেরো মিনিটই জীবনের রোমাঞ্চরচিত অভিজ্ঞতা। পনেরো

• বহর মনে থাকবে। যাবজ্জীবন মনে থাকবে।

সকলেই তো সত্য কথা বলছে, ধর্মের কথা আবার মিথো হয় কি করে? কিন্তু বিবেকানন্দ যা বলছে তা পুঁথির সত্য নয়, জীবনের সত্য। পরীক্ষিত সত্য, উপলব্ধ সত্য। সে সত্য যেন তার ব্যক্তিত্বে উচ্চারিত। আর তার বাণী যেমনি সরল তেমনি পবিত্র। তার সমস্ত উপস্থিতিই যেন মঙ্গলের আলো। সুহাস বাসিত আশীর্বাদ।

‘সমুদয় জগৎ ঈশ্বর দিয়ে আচ্ছাদন করে।। জগতে যে সব অশুভ ও দুঃখ আছে তা উপেক্ষা করে নয়, সবই মঙ্গলময় সবই সুখময় এ ভ্রান্ত অলস ভাব অবলম্বন করেও নয়, প্রত্যেক সুখ-দুঃখ মঙ্গল-অমঙ্গলের মধ্যে সজ্ঞান সন্ধানে ঈশ্বরকে দর্শন করে। এই ভাবেই ত্যাগ করতে হবে সংসার—আর যদি সংসার একবার ত্যাগ হয়, বাকি কী থাকে? বাকি থাকে ঈশ্বর। একমাত্র ঈশ্বর। এই উপদেশের তাৎপর্য কি?’ তাৎপর্য এই, তোমার স্ত্রী থাক তাতে কোনো ক্ষতি নেই, তাকে ছেড়ে চলে

যেতে হবে তার কোনো মানে নেই, কিন্তু ঐ জীব মধ্যে দর্শন করো ঈশ্বরকে। সন্তান-সন্ততিকে ত্যাগ করো তার অর্থ কি? ওদের কি রাস্তায় কেলে দিতে হবে? কখনোই না। ওদের মধ্যেও ঈশ্বরকে দেখ। অনন্তকাল ধরে প্রভুই একমাত্র বিজ্ঞান। তিনিই জীতে স্বামীতে সন্তানে, ভালোয় মন্দে, পাপে পাপীতে, হত্যাকারীতে। সবই সেই প্রভুর বস্তু। তোমার ভোগ্য ধনে তিনি, তোমার মনে যে বাসনা তাতেও তিনি। তুমি যদি তোমার বসনে ভুষণে তোমার বচনে মননে তোমার শরীরে ছায়ায় সর্বত্রব্যে ঈশ্বরকে স্থাপন করো তা হলে জগতে কোথায় ছঃখ কোথায় নূনতা কোথায় বিচ্যুতি? যে একদর্শী তার আর মোহ কোথায়?’

আত্মভ্যাগের উচ্ছ্বাসিত বহি। যৌবনের তেজস্বী উদ্যোষ। সমস্ত সংশয় ও সঙ্কীর্ণতার প্রত্যাখ্যান। কে প্রতিকূল্য করবে, দাঁড়াও সামনে, আমি সংগ্রামে অপরাধু। আমি একা আর সমস্ত পৃথিবী আমার বিরুদ্ধে। তাই সই, একাই লড়ে যাব খালি হাতে। ত্রিভুবনেশ্বরীর সম্মান হয়েও আমি পথের ভিখারী। আমার মরতে কী ভয়। আমি আমার প্রাণ উৎসর্গ করে যাব আমার ঈশ্বরের জন্তে, আমার পরাধীন দেশের নির্ধাতিত অজ্ঞানগৃহবাসী দরিদ্রদের জন্তে।

এই অকপট সত্য প্রতিষ্ঠার কীর্তিমান মূর্তি বিবেকানন্দ।

এত তেজ এত বিশ্বাস এত উন্মুক্ততা এর আগে দেখেনি যেন আমেরিকা। এত সরল এত নির্মল এত বলবীৰ্যদ্বন্দ্বও কেউ হয়।

পথে-বাটে চারদিকে ধ্রুনিত হতে লাগল—বিবেকানন্দ, বিবেকানন্দ। পত্র-পত্রিকায় শুধু বিবেকানন্দের ছবি। শুধু পত্র-পত্রিকায় নয়, রাস্তার মোড়ে-মোড়ে টাঙানো হল বিবেকানন্দের পূর্ণাবয়ব প্রতিকৃতি। বড়-বড় অক্ষরে পরিচয় লেখা—সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ। যে সামনে দিয়ে হেঁটে যায়, সে-ই স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ায় খানিকক্ষণ, মাথা নত করে ভক্তিতে। দেহমনোময় ঈশ্বরমূর্তির উচ্ছ্বাসে।

মনে সঙ্কল্প করবে, বাক্যে উচ্চারণ করবে, কর্মে সুসিদ্ধ করবে। এই সেই সুসিদ্ধ মূর্তি। দেখ দেখ তার বিজ্ঞাপ্রদীপ পৌরুষ। বিজ্ঞা কি? যার প্রভাবে ব্রহ্ম ও জীবের একত্ববিজ্ঞান অধিগত হয়, তাই বিজ্ঞা।

‘কতগুলো ভুলচুক হয়ে গেছে বলে একেবারে বলে পোড়ো না। তাদের কলও পরিণামে শুভই হবে। অস্তরূপ হতে পারেনা কেননা শিবই ও বিগুহ্য আমাদের প্রকৃতিসিদ্ধ ধর্ম। কোনো উপায়েই সেই প্রকৃতির ব্যত্যয় হয়না। আমাদের যথার্থ-রূপ সর্বদাই একরূপ।

জ্ঞানের আলো আলো, এক মুহূর্তে সব অস্তিত্ব চলে যাবে। নিজের প্রকৃত স্বরূপকে প্রকাশ করে। অতি জঘন্য মানুষ দেখলে তার বাইরের দুর্বলতাকে লক্ষ্য কোরোনা, লক্ষ্য কোরো তার ক্রময়নিহিত ভগবানকে, আর তার নিন্দা না করে বোলো, হে স্বপ্রকাশক, হে জ্যোতির্ময়, ওঠো। হে সদাশুদ্ধস্বরূপ, হে সর্বশক্তিমান, হে অজ্ঞ অবিনাশী, আত্মস্বরূপ প্রকাশ করে। তুমি যে ক্ষুদ্রতায় আবৃত আছ, আবৃত আছ এ তোমাতে সাজেনা। তোমার মধ্যে যে অমিতশক্তি দৈত্য প্রস্থাপ আছে তাকে জাগ্রত করো, শৃঙ্খলমুক্ত করো। অদ্বৈতবাদ এই শ্রেষ্ঠতম প্রার্থনারই উপদেশ। শুধু নিজরূপ স্মরণ করো, তার অর্থ শুধু সেই অস্তরস্থ ঈশ্বরকেই স্মরণ করো, সেই সদাশিব সদাশক্তি সদাশুদ্ধ পুরুষকে। যে মুহূর্তে আমি অদ্বৈতবাদী, সেই মুহূর্তে আমি মৃত। সেই মুহূর্তেই আমি আত্মা, আমি নিখিল বিশ্বের একেশ্বর - সম্রাট। যদি রাজা পাগল হয়ে আপন দেশে ‘রাজা কোথায়’, ‘রাজা কোথায়’ বলে খুঁজে বেড়ায়, সে কখনো তার উদ্দেশ্য পাবেনা যেহেতু সে নিজেই রাজা। নিজেকে রাজস্বরূপ বলে জানো। জানো তোমার এ দারিদ্র্য সত্য নয়, এ বদ্ধতা সত্য নয়, এ খণ্ডতা সত্য নয়। যদি ঈশ্বর বলে কেউ থাকে সে তুমিই। তুমি যদি ঈশ্বর না হও, তাহলে ঈশ্বর কোনোদিন নেই, কোনোদিন হবেও না। আর যদি পাপ বলে কিছু থাকে, তবে এরূপ বলাই একমাত্র পাপ যে আমি দুর্বল বা অপরে দুর্বল।’

এই বৃষ্টি হিন্দুর বেদান্ত। মুক্ত হয়ে বলাবলি করে সকলে। কি সুন্দর কথা। কি শান্ত সত্য কথা।

‘বেদান্ত জগৎকে উড়িয়ে দেয়না, জগৎকে ব্যাখ্যা করে। ব্যক্তিকে উড়িয়ে দেয়না, ব্যক্তিকে ব্যাখ্যা করে। আমিত্বকে বিনাশ করতে বলেনা, প্রকৃত আমিত্ব কি তাই বৃষ্টিয়ে দেয়। আপাতপ্রতীয়মানের মধ্য থেকে বার করে সত্য স্বরূপকে।’

‘আমরা আবার ভারতবর্ষে মিশনারী পাঠাই।’ বলাবলি করে শ্রোতার দল। ‘ভারতবর্ষই পাঠ্যক এখানে মিশনারী।’

ধর্ম নয়, রুটি—রুটিই ভারতবর্ষের একমাত্র প্রয়োজন। কী ধর্ম তুমি ভারতবর্ষকে শেখাতে পারো, কী তোমার স্পর্ধা, তোমরা কোথায় ছিলে, ভারতবর্ষ যখন বেদান্ত দিয়েছে, যখন দিয়েছে বৌদ্ধবাদ যা হিন্দুধর্মেরই স্বাভাবিক পরিণতি! কোথায় তোমরা ছিলে যখন হিন্দু বলেছে, শৃঙ্খল বিশেষ অমৃতস্ত পুত্রাঃ। সুতরাং ধর্মের কথা বোলো না, পারো তো তার কাছে রুটি নিয়ে যাও, নিয়ে যাও রুটি তৈরি করবার যন্ত্র, নিরস্ত্রকে খাদ্য দাও, দাও তাকে খাদ্য উৎপাদন করবার বৈজ্ঞানিক উপায়। পরশাসন তাকে অজ্ঞানে-দারিদ্র্যে জর্জর করে রেখেছে, দাও তাকে সেই শেকল-ভাঙার সামর্থ্য। তাকে মহৎ হতে পবিত্র হতে দয়াসু হতে শোনাতে যাবার দরকার নেই। সে এমনিতেই মহৎ ও পবিত্র আছে, দয়ার সে নিত্যনির্ধর। তাকে ক্ষুধা থেকে রোগ থেকে অশিক্ষা থেকে মুক্ত হবার মন্ত্র শোনাও—যদি সে মহত্ত্ব সে পবিত্রতা সে করুণা তোমার থাকে।

‘আপনি কোথায় আছেন? আমাদের বাড়িতে থাকবেন চলুন।’ কত লোক সন্তোষ অনুরোধ করতে লাগল।

‘আপনাকে যদি অতিথি রূপে পাই, আমরা ধন্য হই, আমাদের গৃহ ধন্য হয়।’

‘শুধু ধন্য? আমাদের গৃহ পুণ্যময় হয়ে ওঠে।’

‘মন্দির হয়ে ওঠে।—আপনি যাবেন?’

দেশে চিঠি লিখেছেন স্বামীজি : ‘আমেরিকানদের দয়ার কথা কী বলব। জানো, আমার আর এখন এক কপর্দক অভাব নেই। আমার বাড়ি ভাড়া বা খাইখরচার জন্তে এক পয়সাও লাগেনা। ভাবতে পারো? ইচ্ছে করলে এই শহরের যে কোনো সুন্দর বাড়িতে আমি থাকতে পারি। এ বাড়ি নয় তো ও বাড়ি, সব সময়েই কারু না কারু অতিথি হয়ে আছি। এত সুখ যেন কল্পনার অতীত ছিল। ইউরোপে যেতে যে আমার খরচ লাগবে, জানো, তাও আমি এখান থেকে পাব। ক্ষণে ক্ষণে বুঝছি প্রভু আমার সঙ্গে-সঙ্গে আছেন আর আমি তাঁর আদেশ পালন করবাই চেষ্টা করছি। জগতের লোকের ভালোবাসার বস্তু অনেক আছে—

তারা তাদের ভালো বাসুক—আমাদের প্রেমাস্পদ শুধু একজন—আর কেউ নয়, প্রভুই আমাদের একমাত্র প্রেমাস্পদ।’

ধর্মসভার প্রতিনিধিদের বাড়িতে রাখতে আগ্রহ দেখাচ্ছে অনেকে। শুধু আগ্রহ নয়, সভার কার্যালয়ে প্রত্যক্ষ আবেদন করেছে কেউ কেউ। আমি স্থান দিতে পারি একজনকে, আমি একাধিক। বেশ উল্লস স্বভাব দেখে কাউকে পাঠাবেন, কিংবা বড় ছোর একজন ঝুট্টান দেশের লোক।

মিসেস জন লিয়ন, ২৬২ মিচিগান এভিনিউতে থাকে, সেও একজন চেয়ে পাঠাল। কোনো শর্ত আরোপ করে দেয়নি। ধর্মের ব্যাখ্যাতা যখন তখন নিশ্চয়ই সাধারণের বাইরে।

খবর এল, তোমার বাড়িতে পাঠাচ্ছি একজনকে।

বাড়ি তখন অতিথিতে ভর্তি, শহর-মফস্বল থেকে আত্মীয়স্বজন অনেকে এসেছে এই ধর্মসভার আকর্ষণে, কোনো ঘরই আর খালি নেই। এখন এই প্রতিনিধিকে জায়গা দিই কোথায়? মিসেস লিয়ন ভাবনায় পড়লেন। দেরি নেই, আজ সন্ধ্যায়ই তো সে আসছে।

তোমার ঘরটা খালি করে দে। বললেন বড় ছেলেকে।

কে আসছে?

কই, নাম পাঠায়নি তো। যে আনুক, ঘর একখানা তাকে দিতে হবে। তুই কোনো বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নে।

কে এমন সে নবাবপুত্র। ছেলে গজগজ করতে লাগল কিন্তু মায়ের কথার আবাহ্য হলনা।

আসতে-আসতে সেই মধ্যরাত্রি।

ঘন্টা গুনে দরজা খুলে দিয়ে তো সবাই বাক্যহীন। এ কি। স্বামী বিবেকানন্দ।

(ক্রমশঃ)

গল্প নম্র !

ত্রিসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

১২০০ সাল, তারিখ ২৮ জুলাই।

ইতালীর রাজা প্রথম উমবার্টো তাঁর 'এভি' জেনারেল গোড়িয়ো ভগেলিয়ার সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়ে ছিলেন। মোতা গ্রামে এক রেস্তোরাঁয় তিনি বললেন তাঁর জেনারেলের সঙ্গে পানভোজন করতে।

রেস্তোরাঁর মালিক—তাঁর প্রোট বয়স—বেশ ভবিষ্যুক চেহারা—প্রকাণ্ড পাকা গৌড়—তিনি বেশ হুঁশিয়ার হয়ে ওয়েটারদের নির্দেশ দিচ্ছেন,—তাদের কামের উপর নজর রাখছেন।

তাঁর উপর দৃষ্টি পড়তে রাজা বললেন জেনারেলকে—লৌকটিকে কোথায় যেন দেখেছি—মুখখানা খুব চেনা-চেনা মনে হচ্ছে। ভাকো তো শুকে জিজ্ঞাসা করি।

মালিককে ভাকা হলো—মালিক এসে সেলাম করে দাঁড়ালো রাজার সামনে।

রাজা বললেন—তোমার মুখ খুব চেনা-চেনা মনে হচ্ছে। তোমাকে কোথায় দেখেছি বলো তো?

সেলাম করে মালিক বলল—বহি অপরাধ না নেন মহারাজ তাহলে বলবো, আপনার আয়নার আমার মুখ দেখেছেন। সকলে আমাকে বলে, মহারাজের মুখ চোখ চেহারার সঙ্গে আমার চেহারার আকর্ষণ মিল আছে নাকি!

জেনারেল বললেন—কথটা সত্য মহারাজ।

রাজা বললেন—হঁ। ঠিক কথা—তোমার চেহারা হুবহু আমার মতো—আকর্ষণ মিল! গৌড় আমার গৌড়ের মতো—মাথায় আমার সমান লথা—এক রকম গড়ন—মুখচোখ একই রকম। আচ্ছা তোমার নাম কি শুনি।

মালিক বলল—আমার নাম মহারাজ উমবার্টো। ১৮৫৪ সালের ১৪ মার্চ তারিখে সকাল বেলায় আমার জন্ম।

রাজা বললেন—বাঃ, আমিও তো জন্মেছি ঐ বছরের ঐ মার্চ মাসে এবং ১৪ তারিখে সকাল বেলায়। আচ্ছা কোথায় তোমার জন্ম?

—আজ্ঞে মহারাজ, তোরিনো গ্রামে।

রাজা বললেন—আমিও জন্মেছি তোরিনো গ্রামে। তোমার বিবাহ হয়েছে?

মালিক বললেন—আজ্ঞে হ্যাঁ। আমার বিবাহ হয়েছে ১৮৬৬ সালে ২ এপ্রিল তারিখে।
আমার স্ত্রীর নাম মার্গারিটা।

রাজা চমকে উঠলেন। বললেন—আমারো বিবাহ হয়েছে ১৮৬৬ সালের ২ এপ্রিল তারিখে।
এবং মহারানীর নাম হলো মার্গারিটা! তোমার ছেলেমেয়ে কটি?

মালিক বললে—একটি ছেলে মহারাজ। ছেলের নাম বিতোরিয়ো।

রাজার ভ্র হলো কুঞ্চিত। তিনি বললেন—যুবরাজের নামও বিতোরিয়ো।...ভালো কথা,
তোমার এ রক্ত'রা কবে থেকে চালাচ্ছে?

মালিক বললে—১৮৭৮ সালের ৯ জাছুয়ারি তারিখে আমি এ রক্ত'রা খুলেছি।

রাজা বললেন—বহৎ আচ্ছা! আমিও রাজা হয়ে সিংহাসনে বসেছি ১৮৭৮ সালের ৯
জাছুয়ারি তারিখে।

মালিক বললে—অপরোধ নেবেন না মহারাজ। আরো কিছু আমার বলবার আছে।

—বলো।

মালিক বললে—আগে দু'বার মহারাজের সঙ্গে দু'টি ব্যাপারে আমার দেখা হয়েছে। ১৮৬৬
সালে এবং ১৮৭০ সালে—দু'বারই আমরা দু'জনে মাত্র সাহসিকতার জন্য পদক-তুষণে ভূষিত
হয়েছিলাম।

রাজা দেখলেন, মালিকের জামার বুকে দু'খানি পদক। তিনি বললেন—কিন্তু তুমি দু'খানি
পদক পেয়েছো?

মালিক বললে—১৮৬৬ সালে আমি ছিলাম ফৌজে প্রাইভেট, ১৮৭০ সালে ছিলাম মার্শেণ্ট—
মহারাজ ছিলেন ১৮৬৬ সালে কর্নেল এবং ১৮৭০ সালে কমান্ডার।

রাজা খুশী হয়ে বললেন—আচ্ছা, আচ্ছা!

রাজার সোলাহ করে মালিক বললে—মহারাজের সেবার এ জীবন যেন কাটে—এমন আশা
আমি করতে পারি মহারাজ!

রাজা বললেন—যখন আমি যোগ্য আসবো তোমার রক্ত'রায় আমি পানভোজন করবো।
খেলাধুলা তোমার ভালো লাগে?

মালিক বললে—খুব ভালো লাগে মহারাজ। মহারাজ কাল এথলেটদের যেখানে পুরস্কার
দেবেন, আমি সেখানে নিশ্চয় হাজির থাকবো।

রাজা বললেন—বেশ আমি তোমাকে সেখানে দেখতে চাই। তোমাকে আমি বিশেষ পুরস্কার
দেবো। তুমি নিশ্চয় আসবে।

আমবো মহারাজ ।

রেজঁরা থেকে রাজা বললেন তাঁর জেনারেলকে—ও আমার মিতে—ওকে আমি কাল ইতালীয় ক্রাউন কান্ডালিয়ার করবো । ও যেন আসে—তুমি দেখো ।

পরের দিন পুরস্কার বিতরণের মাঠে বিরাট জনতা । রাজা অধীরভাবে প্রতীক্ষা করছেন কোথায় সেই রেজঁরার মালিক ? তার দেখা নেই এখনো—সময় বহে যায় ।

জেনারেল এলেন । রাজা বললেন—আমার মিতা ?

নিঃশ্বাস ফেলে জেনারেল বললেন—বড় দুঃখের কথা মহারাজ । আজ সকালে বন্দুকের গুলি বৃকে বিধে তার মৃত্যু হয়েছে । পুলিশের অহুমান সে আত্মহত্যা করেছে ।

কিন্তু—

রাজা নিঃশ্বাস ফেললেন, বললেন—বড় দুঃখের কথা । কখন তার বেহ কবরে দেওয়া হবে খবর নাও—আমি নিজে সে সময় সেখানে উপস্থিত থাকবো—তার সম্মানে ।

রাজার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ শিশুদের ছুটি শব্দ... গুড়ুম গুড়ুম । দু'টি গুলি লাগলো রাজার বৃকে—তিনি চিরনিঃশ্বাসে অভিভূত হলেন—তাঁর বেহ হলো কুলুভিত ।

পিণ্ডুবাবু

শ্রীবিভা সরকার

ছোট্ট ছেলে পিণ্ডুবাবু

পিপাড়ি দেখে বেজায় কাবু

ইঁদুর ছেনা আতঙ্ক তাঁর

লেজটি পাছে নাকে ঢোকায় ।

বেড়াল ঠেঙান কুকুর তাদেন

বাঘ ভালুক খোড়াই মানেন

আর সূর্য তেলাপোকায়

গবেষণার খোঁরাক যোগায় ?

বাগমানানো যায় না তাঁকে

ঠেঙান ধরে একে-তাকে

আস্ত কিছু নেইকো ঘরে

ওলটপালট ভুলভি মাঠ ।

টেবিল চেয়ার উণ্টে ফেলেন

ঘরেই গুলি ডাঙা বলেন

ভাঙল বৃখি আরশি ছবি

লেগেই আছে হাজার হাট ।



মহান বীর ।
এ ক্রিয়ালব্ধ বীর ।

(১)

এক যে আছে ঘোড়া,
ভাতের পাত্রে ওড়ায় সে রোজ
দশটি বেগুন পোড়া ।
পাক্সা রানার, ভীষণ গোয়ার
আরব দেশের ঘোড়া ॥

(২)

এক যে আছে উট,
চায়ের সাথে শেষ করে সে
তিনটোঙ্গা ডালমুট ।

কাবলা মুখো, পাটকিলে রং
ঠাণ্ডা মাথা উট ॥

(৩)

এক যে আছে জিরাফ,
রোজ ছপুরে খায় সে ক'য়ে
বোতল বোতল সিরাপ ।
জংলীদানা, লম্বা গলা
আস্ত বোবা জিরাফ ॥



টেস্ট ম্যাচে মেঝা বোলার দিনয় মুখোমুখি



দশ বছর পরে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট দল আবার ভারতবর্ষে খেলতে এসেছে। দেনাভল, বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভিন্ন অঞ্চলের বিক্ষিপ্ত অনেকগুলি খেলা হয়েছে। তা'ছাড়া ভারতীয় দলের সঙ্গে তারা চারটে টেস্ট ম্যাচও খেলেছে। এই লেখাটা ছাপা হওয়ার আগেই বোম্ব হ্র পক্ষ অর্থাৎ সবশেষ টেস্ট খেলাটাও দিল্লীতে শেষ হবে।

চারটে টেস্টের একটাত্তেও ভারতীয় দল জিততে পারেনি। বছের ড্রাবোর্ণ স্টেডিয়ামে প্রথম টেস্টে তবুও ঘাহোক তারা ড্র করেছিল। কানপুর, কলকাতা ও মাদ্রাজের টেস্টগুলিতে তাদের হারের একশেষ হয়েছে।

খেলায় হেরে গেলে কার না দুঃখ হয়? বিশেষত: আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায়—যেখানে খেলা হয় দুটো দেশের মধ্যে, সেখানে হার হলে দেশের প্রতিটি মানুষের মনেই আঘাত লাগে। কারণ সেখানে হার-জিতের সঙ্গে জড়িত থাকে দেশের সুনাম ও সম্মান।

কিন্তু পরাজয়েরও রকম ফের আছে। প্রতিপক্ষের সঙ্গে সমানে পালা দিয়ে হেরে গেলে মন খারাপ হলেও মাথা হেট হয় না। কারণ যদিও প্রতিযোগিতায় জেতাটা গৌরবের বিষয়, সাহস ও কৌশলের সঙ্গে যুগুতে পারাটাও কম কথা নয়। দুঃখের বিষয়, কানপুর, কলকাতা ও মাদ্রাজে ভারতীয় দল শুধু যে খেলায় হেরেছিল তা নয়, কিছুমানুষ দৃঢ়তা বা দক্ষতারও পরিচয় দেয়নি। সেইটেই সবচেয়ে পরিভাষের বিষয়। তাই তাদের পরাজয় কেবল দুঃখের নয় লজ্জারও কারণ।

ভারতীয় দলের এই শোচনীয় ব্যর্থতার মধ্যে শুধু একটি মাত্র কুতিবের চিহ্ন আছে। সেটা কানপুরে হুস্তাব গুপ্তের বোলিং। প্রথম ইনিংসে গুপ্তে একাই ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের ন'জন ব্যাটসম্যানকে আউট করেন। টেস্ট ম্যাচে এক ইনিংসে ন'টি উইকেট পাওয়ার গৌরব একজন ভারতীয় বোলাঘের পক্ষে এই প্রথম। এর আগে টেস্ট ম্যাচে যে ভারতীয় বোলার সবচেয়ে বেশী

উইকেট পেয়েছেন তাঁর নাম মানকান। আট বছরে আগে মাদ্রাজে ভারতীয় দল ইংলও দলকে এক ইনিংসে ও আট রাণে হারিয়ে দেয়। এন. ডি. হাওয়ার্ড ছিলেন ইংলও দলের ক্যাপ্টেন। ভারতীয় দলের অধিনায়ক বিজয় হাজারে। সে খেলায় মানকান প্রথম ইনিংসে একাই ইংলও দলের আটজনকে আউট করেন। পরের বছর পাকিস্তান ক্রিকেট দল খেলতে আসে ভারতে। মিল্লাতে যে প্রথম টেস্ট ম্যাচ হয়, সে খেলায়ও মানকান আটটি উইকেট নিয়েছিলেন। এবার শুধু মানকানের রেকর্ডকে ছাড়িয়ে গেলেন।

শুধু ভারতীয় নয়, যে-কোনো দেশের বোলারদের মধ্যেই শুধুর এই কতিপয় খুব অসাধারণ। আর একটি মাত্র উইকেট পেলেই শুধু ইংলন্ডের স্পিন বোলার জিম লেকারের সমান হতেন। লেকার ১৯৫৬ সালে মার্কেন্টারে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে টেস্ট খেলার এক ইনিংসে দশটি উইকেট নিয়েছেন। টেস্ট ম্যাচে বোলিং-এর ইতিহাসে সেই হলো বিশ্ব-রেকর্ড। সে-রেকর্ড কেউ কোনো দিন ভাঙতে পারবে না। এক ইনিংসে দশজনের বেশী তো আর আউট করা যায় না।

লেকারের রেকর্ড আরও একটি কারণে সবার উপরে। তিনি যে শুধু এক ইনিংসে দশটি উইকেট পেয়েছেন তা নয়, ঐ ম্যাচেরই প্রথম ইনিংসে তিনি ন’টি উইকেট নিয়েছেন। টেস্ট ম্যাচের দুই ইনিংসে হুড়িঙ্গনের মধ্যে ১৯ জনকে আউট করেছে একই বোলার—এমন ঘটনা এর আগে কোনো দিন ঘটেনি। ঘটা দূরে থাক কেউ কখনও ভাবেনি।

বিশ্ব-রেকর্ডের নীচে হলও টেস্টে এক ইনিংসে ন’টি উইকেট নেওয়া খুব সহজ কথা নয়। পৃথিবীতে টেস্ট খেলার গোড়াপত্তন হয়েছে ১৮৭৬ সালে। সে-বছর মার্চ মাসে ইংলও ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে যে খেলা হয়, সেই হলো প্রথম টেস্ট ম্যাচ। তার পরে গত ৮৩ বছর ধরে ইংলও, অস্ট্রেলিয়া, ভারতবর্ষ, দক্ষিণ আফ্রিকা, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, নিউজিল্যান্ড ও পাকিস্তান—এই সাতটি দেশের মধ্যে আজ পর্যন্ত চার শ’র উপরে টেস্ট খেলা হয়েছে। টেস্ট ম্যাচের এই স্বর্নীয় ইতিহাসে একই বোলার এক ইনিংসে ন’টি উইকেট নিয়েছে—এমন ঘটনা ঘটেছে মাত্র সাতবার।

প্রথম যে বোলার টেস্টে এক ইনিংসে ন’টি উইকেটের রেকর্ড সৃষ্টি করেন, তাঁর নাম জর্জ লোম্যান। লোম্যান টেস্ট খেলতে শুরু করেন একুশ বছর বয়সে, অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে। প্রথম টেস্টেই তিনি প্রথম ইনিংসে সাতটি ও দ্বিতীয় ইনিংসে পাঁচটি উইকেট নেন। ১৮৯৫ সালে যে ইংলও দল সাউথ আফ্রিকায় খেলতে যায়, লোম্যান ছিলেন তার ম্যানেজার। লর্ড হক ছিলেন দলের ক্যাপ্টেন। তিনি ম্যানেজারকে বোলার হিসাবে ব্যবহার করতে ছাড়লেন না। লোম্যান সেই সফরে ১৫৭টি উইকেট নিলেন গড়পড়তা মাত্র ছ’রানের বল দিয়ে। জোহেনসবার্গের টেস্টে প্রথম ইনিংসে ন’টি উইকেট নিলেন ১৪’২ ওভার বল দিয়ে। তার মধ্যে আবার ছ’টাই মেডেন। রান

দিয়েছিলেন কত? মাত্র ২৮। অর্থাৎ মাত্র তিন রানের বশে লোম্যান প্রতিটি উইকেট পেয়েছেন। পনের মিন আগে পেটি এলিভাবেথে বে টেস্ট খেলা হয়, তাতেও লোম্যানের কৃতিত্ব কম ছিল না। প্রথম ইনিংসে সাতটি উইকেট নিলেন। দ্বিতীয় ইনিংসে তাঁর বোলিং হলো আরও মারাত্মক। ন' ওভার বশ দিয়ে সাত রানের বশে নিলেন আটটি উইকেট। তাঁর মধ্যে ছ'টিই একেবারে শোভা স্টাম্প উপড়ে।

লোম্যানের মতো এত কম রানে এত বেশী উইকেট নেওয়ার কৃতিত্ব খুব কম বোলারই দেখাতে পেরেছে। কিন্তু এমন চৌকশ বোলারও বেশী দিন টেস্ট খেলতে পারেনি। প্রথমতঃ তাঁর স্বাস্থ্য ছিল খুব খারাপ। অসুখের জন্য মাঝে মাঝে টেস্টের জন্য নির্বাচিত হয়েও তিনি মাঠে নামতে পারে নি। তাছাড়া ক্রিকেট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিতে মন কষাকষিও কম ছিল না।

ষে-বছরে লোম্যান টেস্ট বোলিং-এ রেকর্ড স্থাপন করলেন ঠিক তাঁর পর বঙ্গের অস্ট্রেলিয়া ইংলণ্ডে খেলতে এসেছিল। ওভালের টেস্টে লোম্যান টিমে নির্বাচিত হলেন। কিন্তু তিনি ও আর চারজন খেলোয়াড় কর্মকর্তাদের চিঠি লিখে জানালেন, খেলার জন্য যে কি দেওয়া হয় তা বাড়িয়ে না দিলে তাঁরা টেস্ট খেলবেন না। দে-দয়রে প্রতি টেস্টে পেশাবার খেলোয়াড়কে দশ পাউণ্ড অর্থাৎ এখানকার হিসাবে প্রায় ১৩০ টাকার মতো দি দেওয়া হতো। লোম্যান চাইলেন হুড়ি পাউণ্ড। ডব্লিউ মি. গ্রেস ইংলণ্ড দলের ক্যাপ্টেন। খুব কড়া লোক। তিনি চটে আগুন। বললেন, “কী, ভয় দেখিয়ে টাকা আদায়? কিছুতেই নয়।” খেলার আগের মিন তিনজন খেলোয়াড় তাঁদের চিঠি ফিরিয়ে নিলেন। শুধু লোম্যান ও গান্ন তাদের দাবীতে অটল হয়ে রইলেন। ফলে এ-দুজনকে টেস্ট টিম থেকে বাদ দেওয়া হলো। তাঁর চার বছর পরেই বন্ধ। যোগে লোম্যানের মৃত্যু ঘটে।

লোম্যানের মৃত্যুর বারো বছর পরে টেস্ট ম্যাচে এক ইনিংসে ন'টি উইকেটের রেকর্ড ধরে ফেললেন এল. এফ. বার্নস। বক্ষিণ আফ্রিকার ঐ জোহেন্সবার্গের মাঠেই। লোম্যানের মতো বার্নস ছিলেন ইংলণ্ড দলের বোলার। লোম্যানের মতো তিনিও বল দিতেই সাধারণতঃ মিডিয়ম ফাস্ট।

বোলিং-এ বার্নসের নাম বিলেতে প্রায় চলতি প্রবাদের মতো। ক্রিকেট মহলে আজও তাঁর বোলিং-এর নাম গল্প শোনা যায়। সাউথ আফ্রিকার তো ক্রিকেট পণ্ডিতেরা এখনও কোনো নতুন বোলারের গুণ বিচার করতে বলে প্রশ্ন করেন—“ভালো বোলার? কতখানি ভালো? বার্নসের কাছাকাছি?”

ইংরেজী ১৯১৩ সালের ডিসেম্বর মাস। আর্মিনীর সম্রাট কাইজার উইলহেলম যে ছ'মাসের মধ্যেই পৃথিবীতে প্রথম মহাযুদ্ধের আগুন জ্বালাবেন সে-কথা কেউ ভাবতেও পারেনি। জোহেন্সবার্গের মাঠে হাজার হাজার লোক জড়ো হয়েছে ইংলণ্ড ও সাউথ আফ্রিকার টেস্ট ম্যাচ দেখতে।

প্রথম ইনিংসে সাউথ আফ্রিকা রান তুলল ১৬০। বার্নস একাই সাউথ আফ্রিকার আট জন ব্যাটসম্যানকে আউট করলেন মাত্র ৫৬ রানের বদলে।

ইংলণ্ড গেলের রান সংখ্যা হলো ৪০৩। দ্বিতীয় ইনিংসে সাউথ আফ্রিকার পক্ষে ইনিংস পরাজয় এড়াতে চাই ২৪০ রান। ম্যাচ জেতার কথা হবে তার পরে। সে ইনিংসে বার্নসের বলে সবচেয়ে আগে আউট হলেন সাউথ আফ্রিকার ক্যাপ্টেন টেইলার নিজে। তার পর একে একে ব্যাটসম্যানেরা দুখ কালো করে কিংর বেতে লাগলেন প্যাভিলিয়নে। একমাত্র বোমন্ট ছাড়া আর সবাই আউট হলেন বার্নসের বলে। কেউ কট কেউ, স্টাম্পড, কেউবা সোজা বোল্ড। এ যুগের সাউথ আফ্রিকার ক্যাপ্টেন ভাডলী হুয়সের বাবা ডাডে হুয়স ছিলেন সে সময়কার একজন নামজাদা খেলোয়াড়, ইংরেজীতে থাকে বলে স্টার ব্যাটসম্যান। ৫৬ রানের মাধ্যম বার্নসের বলে তিনি উইকেট কীপারের হাতে কট আউট হলেন। ইনিংস পরাজয় ঘটল সাউথ আফ্রিকার। টেস্ট ম্যাচে দুই ইনিংসে ১৭টি উইকেট নিয়েছে এক বোলার এমন দৃষ্টান্ত বহুকালের মাত্র ক্রিকেটের ইতিহাসে অদ্বিতীয় হয়ে রইল।

বার্নসের পরে টেস্টে এক ইনিংসে ন' উইকেটের গৌরবলাভ করলেন একজন অস্ট্রেলিয়ার বোলার। নাম,—আর্থার মেইলী।

মেইলীকে এ যুগের তরুণেরা বেশীরভাগই জানে একজন ক্রিকেট-লেখক হিসাবে। তাঁর লেখা ক্রিকেটের বই বা প্রবন্ধ এসেশেষে অনেকের পড়ে থাকবেন। তাঁরা শুনে হয়তো অবাক হবেন যে, এই লেখার মজাই মেইলীকে অকালে ক্রিকেট খেলা ছাড়তে হয়েছে। মেইলী একবার খবরের কাগজে অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট কর্তৃপক্ষ সম্পর্কে কয়েকটা কড়া কথা লিখেছিলেন। কর্তারা চটে গেলেন। তাঁরা মেইলীকে ক্রিকেট থেকে 'একঘরে' করে শাস্তি দিলেন।

টেস্টম্যাচে মেইলীকে প্রথম বেখা বার ১৯২০ দালের শেষের দিকে। সাউথ আফ্রিকার বার্নসের সেই বিখ্যেবর্ডের ছ' বছর পরে। অবশ্য এক হিসাবে সেটা সাউথ আফ্রিকার ঠিক পরবর্তী টেস্ট। কারণ প্রথম মহাদুর্ভেদ মাত্র ঐ ছ'বছর আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলা একবারেই বন্ধ ছিল। মেইলী তাঁর প্রথম টেস্ট খেলার বছরেই বার্নসের বেকর্ড ধরে ফেললেন। সে বছর ইংলণ্ড অস্ট্রেলিয়ার খেলতে এসেছে। চতুর্থ টেস্ট শুরু হলো মেলবোর্নে। প্রথম ইনিংসে মেইলী নিলেন চার উইকেট। দ্বিতীয় ইনিংসে তাঁর বলের মুখে ইংলণ্ডের কোনো ব্যাটসম্যানই ঝাঁড়াতে পারলেন না। মাত্র ১৩ রান তুলেই হবুস হলেন এল. বি। ম্যাকগীসেরও সেই দশা। তাঁরা মেইলীর গুলীকে ঠিক চিনতেই পারেননি। ক্যাপ্টেন ডগলসকে মেইলী লেগব্রেক দিয়ে টেনে আনলেন পপি ক্রীজের বাইরে। ফল,—স্টাম্পড। ঠিক একই কৌশলে ফ্রান্স উলীকে কিরিয়ে দিলেন প্যাভিলিয়নে। তাঁর রান সংখ্যা শূন্য। রোডস এবং পি. বি. এইচ. কেরার দু'জনেই কট আউট।

গ্যাটসি হেনড্রেনও ব্যাটের কিনারায় ছুঁয়ে ক্যাচ তুললেন মিত্র অনেক হাতে। হায়, মেইলীর দুর্ভাগ্য, ফিডার সে ক্যাচটা ফেলে দিল মাটিতে। হেনড্রেন বাস পড়লেন মেইলীর নিখন ডালিকা থেকে। তা মইলে লেকাবের ৩৫ বছর আগেই টেস্ট ম্যাচে এক ইনিংসে দশটি উইকেট নেওয়ার রেকর্ড স্থাপ্ত হতো আর্থার মেইলীর হাতে। •

এইখানে একটা মজার খবর মিচ্ছি। মেলবার্ণে যে মাঠে মেইলী এক ইনিংসে ন'টি উইকেট মিলেন, ঠিক সে মাঠেই মাত্র এক বাস আগে ইংলও-অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় টেস্ট খেলা হয়েছে। মেইলী অস্ট্রেলিয়ার টিমে ছিলেন। সে বেলার দু'ইনিংসে অস্ট্রেলিয়ান বল মোট ১৫৪ ওভার বল দিয়েছে। অথচ মেইলী বল সেননি একটুও। 'সেননি' না বলে 'মিতে পাননি' বলাই ঠিক। অস্ট্রেলিয়ার ক্যাপ্টেন ছিলেন আর্মিট্রং। তিনি ইংলও দলকে আউট করার চেষ্টায় একে একে শতধন বোলারকে বল মিতে দিয়েছেন। এমন কি ওপেনিং ব্যাটসম্যান কলিন ও পেলিউ—থারা ক্লাবের ম্যাচেও কোন দিন বল সেন না—উঁরাও দু'ভিন্ন ওভার বল দিয়েছেন। বাস শুধু মেইলী! এ যেন আমাদের দেশে টেস্ট খেলায় ওপেন ও গোলাম আমেরকে মাঠে পাড় করিয়ে রেখে শব্জ রায় ও নরী কট্টারকে দিয়ে বল বেওয়ানো।

(ক্রমশঃ)

কৃতজ্ঞতা

শ্রীদুর্গাদাস মুখোপাধ্যায়

মশা কয়, “তুন ওহে! মশারি মশাই
ছেড়ে দাও প্রাণ ভ'রে নর-রক্ত খাই।
বন্ধু তুমি, ভাই তুমি, হৃদি তুমি মোর
অনাহারে মরি যদি, প্রাণে সবে তোর?”

ঈশং হাসিয়া তারে কহিল মশারি
“বন্ধু-ভাই বল যারে, সে যে তব অরি।
মাহুষের দাস আমি—জেনো মহাশয়;
পীড়ন করিবে তারে, সে কি সহ্য হয়?”



(আফ্রিকার রূপকথা)

একবার হয়েছিল কি, কোয়াকু আনান্সির গ্রামে দারুণ অজন্মা দেখা দিয়েছিল। কারও ঘরেই সে বছর খাবার ছিল না। প্রতিদিন কোয়াকু আর তার ছেলে টিকুমা বনে বেত খাবার সংগ্রহের আশায়। একদিন খাবার খুঁজতে খুঁজতে টিকুমা বনের এমন একটা অকলে গিয়ে হাজির হলো যেখানে সে আগে কখনও যায় নি। কয়েক মাইল এক সঙ্গে হেটেও সে কিন্তু কোন খাণ্ডবস্ত পেল না। হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ সে বনের মধ্যে একটা খোলা জায়গায় এসে পড়ল এবং দেখল যে সেখানে বাজারের মত অনেকগুলি ছোট ছোট দোকান ঘর আছে।

টিকুমা ভাবল : “এ তো মজার ব্যাপার দেখি। আশেপাশে বখন কোন গ্রাম নাই তখন এখানে তো কোন বাজার বসতে পারে না।”

পর মুহূর্তে টিকুমা দেখতে পেল যে, একটা বিরাট ঝাঁটা নেমে এল আকাশ থেকে এবং প্রত্যেক দোকানের ভিতর দিয়ে সেটি আপনা-আপনি ঝাঁটি দিয়ে ধুলো ময়লা মাক করতে লাগল।

টিকুমা মনে মনে ভাবল : “আমি তো দেখছি নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারি না। জনশ্রুতি বাজার আর নিজে-নিজে ঝাঁটি-সেওয়া ঝাঁটা।”

এর পরে ষা ঘটল তা আরও বেশি বিস্ময়কর। আকাশ থেকে ঘীরে নেমে এল একটা বড় তেণায়। টুল আর তার পিছনে পিছনে নেমে এল এক বিরাটকার বুড়ী।

বুড়ী এসে সেই টুলের উপর বসেই দুটি হাত দিল তার গালে এবং হুতীক্ণ গলায় চীৎকার করে উঠল : “তোমরা সবাই বেরিয়ে এস।” বুড়ীর গলার স্বর এত তীক্ষ্ণ যে দে-ঘর শুনে টিকুমার দাঁতে দাঁত লেগে ঘাবার অবস্থা।

বুড়ীর ডাক শুনেই সেখানে অনেক লোক এসে হাজির হল, আর তারা সবাই বলে আনল

খাবার ভত্তি হুড়ি। প্রত্যেকে এক-
একটি দোকান দখল করে নিজেদের
মানপত্র বিছিয়ে বলল। টুকুমা
মনে মনে বলল : “কিন্তু খদ্দের
কোথায়?”

সে দৈর্ঘ্য ধরে অনেকক্ষণ
অপেক্ষা করেছে কোন খদ্দের
দেখতে পেল না।

অবশেষে টুকুমা আপন
মনেই বলল : “বেশ, কেউ যদি এই
দুব চমৎকার খাবার না কেনে,
তা হলে আমিই কেনার চেষ্টা করে
দেখি।” কাজেই সে সাহসে ভর
করে-বাছারে ঢুকল এবং হুন্সর
একটি কুটির দোকানে গেল। টুকুমা দোকানীকে নমস্কার জানিয়ে বলল : “আপনার কুটির
দাম কি আমি জিজ্ঞাসা করতে পারি?”

দোকানী বলল : “নিশ্চয়ই। একটি কুটি নিলে আপনার কিছু লাগবে না। আর যদি
পাঁচটা করে এক মনে কেনেন তা হলেও কোন দাম লাগবে না। দশটা কিনলে আরও দাম কমবে
—এ ভক্তও আপনাকে কিছু নিতে হবে না। দোকানের পিছনে রাখা বড় কুটিগুলির দাম একটু
বেশি—বিনামূল্যে তিনটি করে।”

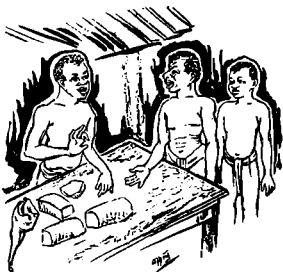
টুকুমা বলল : “কিন্তু এতো দেখছি অসম্ভব ব্যাপার!”

যে মেয়েটি কুটি বিক্রি করছিল সে বলল : “অবশ্য আপনার কাছে যদি দাম বেশি বলে মনে
হয়, আপনি কিনবেন না।”

টুকুমা তাড়াতাড়ি বলল : “আমি বরং উল্টো কথা ভাবছি—দামটা বড় বেশি সস্তা। আমি
হু’ডজন নেব।”

মেয়েটি হু’ডজন কুটি গুণে টুকুমাকে দিল, আর সে দেগুলি নিজের থলেতে ভরে পরের
দোকানটায় গেল। পরের দোকানটায় ছিল অনেক রকমের টাটকা মাংস।

এখানেও টুকুমা দোকানীকে বলল : “দয়া করে আমাকে মাংসের দামটা জানাবেন কি?”



দোকানে কুটি বিক্রি হচ্ছে

উত্তর এল : “দাম গভাকালের মতই ঠিক আছে। গরুর মাংস বিনামূল্যে এক পাউণ্ড, ভেড়ার বাচ্চার চপ বিনা পরসায় চারটি। অবশ্য ছোটোব বেশি একসঙ্গে কিনলে আরও কম হবে দাম।”

টিকুমা বলল : “আমি বারো পাউণ্ড গরুর মাংস নেব।”

দোকানী এক টুকরো খড়ি নিয়ে ত্যাঁড়াত্যাঁড়ি হিঁদাব করে বলল : “এর দ্বারা আপনাকে কিছুই দিতে হবে না।”

কাজেই টিকুমা বারো পাউণ্ড গরুর মাংস খলেতে ভক্তি করে পরের দোকানে গিয়ে হাজির হলো। সে দোকানে সে বিনামূল্যে ১০টা হিমেষে ২৫টি কল কিনল। তাকে কিছুটা দরদস্তুর করতে হল এখানে, কেন না দোকানী প্রথমটায় বিনামূল্যে ১২টা করে কল বেল বিক্রি করতে চাইল।

অল্প সময়ের মধ্যে বিনামূল্যে কেনা খাবার-দাবারে টিকুমার খলে গেল বোকাই হয়ে। কাজেই সে বাড়ির দিকে রওনা হল। কিন্তু সে ঝাঁকা জায়গাটার দ্রাক্ষে যেতে না যেতে বুড়ী সেই তীক্ষ্ণ চীৎকার শুনেতে গেল : “তোমরা সবাই ভিতরে চলে এসো।” সঙ্গে সঙ্গে তাদের জিনিসপত্র তুলে নিয়ে দোকানীরা অসুস্থ হল। বুড়ী তখন উপরে আকাশে উঠতে লাগল—পিছনে পিছনে উঠল তার টুল ও ঝাঁটাটা।

টিকুমা তারের গ্রামে কিরে এলে সবাই তার আন! খাবার যেখে বিহিত হয়ে গেল—ভায়া আরও বিম্বিত হল যখন শুনল যে, এত খাবারের দ্বন্দ্বে টিকুমাকে একটা পরদাও দিতে হয় নি।

কোয়াকু ছেলেকে বলল : “আগামী কাল তুমি আমাকে বুড়ীর বাজারে নিয়ে যাবে - আমি কিছু কেনাকাটা করব।”

টিকুমা বলল : “আমি তোমাকে নিয়ে যাবো—তবে তুমি অতি লোভ করবে না—এই প্রতিশ্রুতি আমাকে দিতে হবে।”

পরদিন সকালে কোয়াকু ও টিকুমা দুজনে সন্ধ্যার পথে রওনা হল। অনেক ঘণ্টা ধরে হেঁটে হেঁটে তারা বে ঝাঁকা জায়গাটার দোকান ঘরগুলি ছিল সেখানে এসে হাজির হল।

দোকান ঘরগুলি সেখাই কোয়াকু বলে উঠল : “কি স্বন্দর কাঠ দিয়ে এগুলি তৈরী। আমি বাড়ি স্বেচার সময় আমার নতুন গোলা বাড়িটার ছায়ে লাগাবার দ্বন্দ্বে এখান থেকে কিছু কাঠ নিয়ে যাব।”

এই কথা বলে কোয়াকু বাজারের মধ্যে দৌড়ে গেল এবং একটা দোকানকে টেনে-হিঁচড়ে ভেঙে ফেলল। কাঠের তক্তাগুলি সে কোণের মধ্যে টেনে এনে একটা গাছের তলায় রাখল।

এরপর আগের দিনের মতই সেই ঝাঁটাটা নেমে এল আকাশ থেকে এবং দোকান ঘরগুলি পরিভার করার কাজে লেগে গেলন কোয়াকু চীৎকার করে বলল : “আমি জীবনে বড় ঝাঁটা

মেখেছি এটা তো তার মধ্যে সব চেয়ে ভাল। বাড়ি কেনার সময় আমি বৌ-এর সঙ্গে এটাও নিয়ে যাবো। সে আবার বাজারে ঘোড়ো গিয়ে কাটাটিকে নিয়ে এলো।

এইবার বুড়ীর তেপায়া টুলটা ধীরে ধীরে আকাশ থেকে এল নেমে। কোয়াকু চীংকার চীংকার করে ছেলেকে বলল “বাছা, জীবনে এত বড় টুল কখনও মেখেছো? আমি এটা বাড়ি নিয়ে গিয়ে টেবিল হিসাবে ব্যবহার করব।”

এবার আকাশ থেকে নেমে এল বুড়ী নিজে এবং টুল না থাকায় মাটির উপর বলে চীংকার করে উঠল: “তোমরা সবাই বেরিয়ে এসো।” তৎক্ষণাৎ মালপত্র নিয়ে বেরিয়ে এলো সব মোকানী।

কোয়াকু সঙ্গে সঙ্গে বাজারে গিয়ে প্রথম দোকানটার ঢুকে পড়ল। কিন্তু সে দেখল যে, ডিমের মত ছোট ছোট পোকায় খাওয়া আর কয়েকটা কুট পড়ে আছে।

সে দোকানীকে বলল: “আজ দেখছি তোমার কুটিগুলি ভাল নয়। তবু এগুলি আমি নিতে পারি।”

দোকানী বলল: “এগুলি ছোট বটে, তবে খুব সস্তা। এই ধর, তোমার হাতের কুটিটার দাম—১৪ পাউণ্ড, ১০ শিলিং ২ পেন্স।”

কোয়াকু চীংকার করে উঠল: “কি বললে! কাল তো সব বিনামূল্যে বিক্রি করেছিলে।”

দোকানী বলল: “কাল বাজার তত খারাপ ছিল না। এখন আমাদের আবার নতুন ঝাঁটা কেনার ক্ষেত্রে পরস্রা বাঁচতে হবে। যে সব ঝাঁটা নিজে নিজে ঝাড় দেয় সেগুলোর দাম খুব বেশি।”

কাজেই কোয়াকু গেল পরের দোকানটিতে। সেখানে সে দেখতে পেল বাসি ও ছোট ছোটকরো মাংস।

কোয়াকু দোকানীকে বলল: “তোমার মাংস তো বেখছি খারাপ। এই কাজেই তুমি বিনা-পরস্রা মাংস বেচো।

দোকানী বিস্মিত হয়ে বলল: “কে বলল তোমাকে? এক আউন্স মাংসের দাম ২৫ পাউণ্ড ১৭ শিলিং ৬ পেন্স।”

হঠাৎ বুড়ী চীংকার করে উঠল: “তোমরা সবাই ভিতরে চলে এসো।” সঙ্গে সঙ্গে দোকানীরা সব গুছিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। এবার কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দোকানগুলিও অদৃশ্য হয়ে গেল। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে বাজারের আর কিছুই বাকি রইল না পড়ে থাকতে। তারপর বুড়ীও আকাশে উঠে গেল।

তারপর বুড়ীকে আর আফ্রিকায় দেখা যায়নি। লোকে বলে সে এখন ব্যবসা করছে প্রতিনিহন ইউরোপে যায়। অনেকের ধারণা সেই কাজেই বেতকায় মাহুধর। এত ধনী হয়েছে এবং হুম্বর হুম্বর বাড়িতে থাকতে পাচ্ছে।



কুন্দরী খণ্ড

[উপভাগ]

দেবাচার্গ

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

বাগ হ'বারই কথা। সত্যি পিনাকীর অন্ডায়। সেই রাতে ঠাকুরমার কোলের উপর মাথা রেখে গর শুনছিল অভিমানবশতঃ; কিন্তু মন ছিল অনেক দূরে। কি আশ্চর্য! বেলার কথা, শুধু বেলার কথা 'কেমন, কাকুর কথাই তো মনে থাকে না পিনাকীর। এমন কি মায়ের অস্থখ—তাও ভুলে যায় পিনাকী মাঝে মাঝে। ভোলানাথ, পিনাকীর আর এক নাম ভোলানাথ। নদীর ধার দিয়ে একলা চলেছে, বোসেন্দে পুরোনো বাগানের কাছাকাছি আসতেই নজরে পড়ে লাল কাঠাল গাছটার ডালের দিকে। মড়াক করে উঠে গেল একটা কাঠবেড়ালী। পাল বেয়ে চলেছে হাওয়ার মনো নৌকা নদীর কূল ঘেঁষে। ওপ টেনে চলেছে, বাশের চোড়া কাখে, বিদেশী নাবিক, বিদেশী নৌকা—সিহুমাঝ বলে—বন্দরে ঐ গাড়িয়ে আহাজ, বেরিয়ে পড়ো বহুরল। কোথায়, কোন্ বিশেষে উড়ে চলে পিনাকীর মন? কোলকাতার প্রিন্সেসপ্‌ ঘাটে অনেকগুলো আহাজ দেখেছিল একদিন। দাড়র সঙ্গে খোড়ার গাড়ীতে বেড়াতে বেরিয়েছিল, গড়ের মাঠ ঘুরে চলেছে গাড়ী। বিরাট রহস্য বোকাই আহাজ গাড়িয়ে আছে—একে একে সম্মীষ হ'য়ে গুঠে সব স্থিতি। গল্পের বইতে পড়া, চোখে দেখা, কল্পনায় গড়া স্রষ্টার বিপুল সমারোহ। আলিপূরের চিড়িয়াখানায় কত জানা-অজানা জীববস্তু। কলকাতার বাস্তায় কত কত জাতের, কত বিচিত্র শোশাকের, কত বিভিন্ন বর্ণের লোক। কলকাতার চেয়েও বড় শহর লণ্ডন, নিউ ইয়র্ক। ফরাসী দেশের রাজধানী প্যারিস সৌন্দর্যের ধনি—অদ্ভুত বরফের দেশ ল্যাপল্যাও, গ্রীণল্যাও, আর্টিক ওশান, একটাক—চিবুবারাবুত ভূখণ্ড—পৃথিবীর শেষ—অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা, আমেরিকা... না রেজিলেই যাবে সে।

ত্রেরিল, ত্রেরিল, বে ত্রেরিলের যুদ্ধে শাফল্য অর্জন ক'রে বাঙ্গালীর ছেলে স্বরেশ বিশ্বাস কর্ণেল হলেন... সেই স্বাধীন মেয়েই সে যেতে চায়। ভেলায় ভাসতে ভাসতে ভারত মহাদাগর পার হয়ে গেল!—দূর, বাঘে গল্প লিগেছে, ছেলেগুলোনা গল্প—পিনাকী আর ছেলেমাচুষ নয় এখন। সহজ পথই তো আছে। খালানী হয়ে কান্ন নেবে একটা—কোন ছাহাজে—তারপর আর কি—সমস্ত পৃথিবীটাই ঘুরে দেখবে সে। অসম্ভব একবারের অস্ত্র তো বটেই। মাতৃ পৃথিবীতেই কি আশা মিটবে তার? পৃথিবী ছেড়ে চন্দ্রলোক, তারকার রাজ্য, সেগুলো কি হবে? না, না, জীবিত অবস্থায় তো ওখানে যাওয়া সম্ভব নয়। জীবিত অবস্থায় পৃথিবী, জীবনশেষে তারকার রাজ্য, অর্থীষ স্বর্গ। স্বর্গের পর স্বর্গ—কত বে সৃষ্টি করেছে ব্রহ্মা! ব্রহ্মা!—বাবা বলেন, ব্রহ্মার চেয়ে বড় আর কেউ নেই।...

নীল আকাশের মাঝখান দিয়ে ভেসে চলেছে মেঘ। মেঘের উপর সূর্যের কিরণ। মনে হয় আগুন লেগেছে আকাশে। আগুনের রঙ কি লাল! কমলা লেবুকেও হার মানিয়ে দেয় অগ্নিবর্ণ আকাশ! পিনাকী কল্পনা করবার চেষ্টা করে পৃথিবীটা কমলালেবু। কমলা লেবুর মতন গোল, ঈষৎ চ্যাপ্টা, সূর্যের আলোর লাল হয়ে ঘুরছে বন্বন্ব ক'রে লাটমের মত। রত্নমাখবাবু বলেন, পৃথিবীটা কত জোরে ঘুরছে জানিনা,—ভীষণ শব্দে ঘুরছে, কিন্তু এমনি মজা, সেই শব্দ মাহুদের কান দিয়ে শোনা যায় না। শোনা গেলে সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কানের পর্দা ছিড়ে যেতো। শুধু কান কেন, শব্দের কাণুনিতেই সৃষ্টি ধ্বংস হয়ে যেতো। তাই শব্দময় হয়েও ভগবান এখনো নির্বাক, বৃকলি। প্রলয়ের রাত্রে শোনা বাবে ভগবানের ব্রহ্মাণ্ড হসার।

ট্যা, ট্যা, ট্যা—ওটা কি? চিল, চিল উড়ে চলেছে, আকাশপথে। ওটা বোধ হয় বাচ্চা চিল, বোধ হয় তার যা বাবা কাউকেই খুঁজে পাচ্ছে না, তাই ডাকছে! উড়তে চায়, আরো উচুতে উড়বে একদিন। সেও যদি মাহুদের খবর না জন্মে চিল হয়ে ভ্রম্মাতো, তা'হলে উড়ে বেত বীণ হতে বীণান্তরে! অনারাসেই পার হয়ে বেত বে অব বেকল। বে অব বেকল মানে বকোপদাগর। এই দেখ, গোটা বাংলা দেশটা এক সময় সমুদ্রের গহ্বরে ছিল, ক্রমশ: সমুদ্রের উপর ভেসে উঠেছে। প্রথমি তোমারে আমি নাগরোথিতে! বেতো মাদার কবিতার বইতে লেখা আছে। কে কবি? নারটা আর স্বরণ নেই পিনাকীর।...

ঘুম, কৈ ঘুম তো আসছে না আজ? পিড়লের পিলহুয়ের উপর রাধা মাটির প্রদীপে দরঘের তেল। তার মধ্যে ডুবানো সলতে অনেকক্ষণ ধরে জলে জলে পুড়ে স্থিমিত হয়ে এসেছে, মনে হয় পিনাকীর। বাহিরে ছোঁাছনার আলো অমাবস্তার তিথিতে ঢাকা। অন্ধকারে আসে ভূত-পেতী। চাঁদের আলোর আসে ফুলপরীরা। ফুলবাগানে পেফালী গাছের তলায় ফুলপরীরা বোধ হয় এর

মখোই নেমে এসে খেলা শুরু করে দিয়েছে। গম্বাণা, বাবার ছাত্র, একবার নয়, দু'বার, তিনবার দেখেছে খসকে। পিনাকীর ইচ্ছে হয় জুলপরীদের দেখবে।

গা ছম্ছম্ করছে কেন? খাট থেকে নেমে আসে পিনাকী। মাটির প্রদীপে পোড়া দেশলাই কাটি। কাটিটা ভুলে নিয়ে উদকে ঝেঁয় সলতেটাকে। প্রদীপের আলোর এবার অনেকখানি জোর বেড়েছে।

আলো-ছায়ার খেলা মায়ের মুখের উপর। কাত হয়ে শুয়ে আছেন মা। একদিকে আলো, অন্যদিকে ছায়া। ছট্‌কট্ করতে করতে মা ঘুমিয়ে পড়েছেন। কতবার পিনাকী কাছে এসে বাতাস করতে চেয়েছিল...কিন্তু...কিন্তু মা কেন ঝগ করে? দরকার নেই, দরকার নেই, বাতাস করতে হবে না তোকে।...কাজে ঘেঁবে বসতেও দেয় না মা। কেবল বলে, খোকা, খোকা, যাও বেলেগে বাও—খাক্, খাক্, বাতাস করতে হবে না আর,—তোর ঠাণ্ডুরমার কাছে শুবি রাত্রে, বুকলি।

ঠাণ্ডুরমা, সস্তা রোগমুক্তা ঠাণ্ডুরমাও দুর্বল। অনেক আগেই খাটের উপর ঘুমিয়ে পড়েছেন। একলা মা, এত বড় ঘরটার মেজের উপর দামাস্ত হেঁড়া তোনকের উপর শুয়ে আছে। শীর্ণ, কফালসার জমনীকে কি করে আরাম দেবে ভেবেই পাশ না পিনাকী। খাটে শুলে মায়ের কষ্ট হয়, গুঠা-নামা করতে ভীষণ হাঁক লেগে যায়। সেইমন্তেই, মায়ের নিজের ইচ্ছেতেই মেজের উপর বিছানা পাতা। কিছুই কববার নেই কি? অকস্মাৎ পিনাকী নিজেকে অত্যন্ত অসহায় মনে করে। সে কেন এত ছোট থেকে গেল? তাড়াতাড়ি কেন বড়দের মতন উঁচু লম্বা হয়ে উঠলো না? গৌকদাড়ি না বের হ'লে, ইংরেজিতে এল-এ, বি-এ পাশ না করলে, ভাল চাকরি পাওয়া যায় না। পিনাকীর যদি একটা ভাল চাকরি থাকত তা'হলে তো আর মাকে মাটির ঘরে শুতে হোত না। পাবীর পালকে তৈরী গদী সব চেয়ে মরম। একটা পালকের গদী কিনতো সে, মা আরামে পাশ ফিরতো। টাকা, অনেক টাকা চাই।...

যদি পিনাকী সাবালক হ'য়ে, অর্থাৎ বাবার মতন বড় হয়ে,—নিলীয়ার বাবা যেমন কণ্ট্রিস্টর দেই রকম কণ্ট্রিস্টর হয়...কণ্ট্রিস্টরি করতে পারলে কাড়ি-কাড়ি টাকা, দাবা ত্রিভেব কণ্ট্রিস্টর কি যেন বলছিলেন নিলীয়ার বাবা সেদিন...

সেই রাত্রে স্বপ্ন মেখে পিনাকী। মায়ের বিছানার তোনকের নীচে হেঁড়া মাদুর, হেঁড়া মাদুরের গা ঘেঁবে, খালি মাটির মেজের উপর ঢলে পড়েছিল কখন যেন সে। বাতাস করছিল মাকে। মায়ের নিবেশ শোনে নি। বাইরের বাতাসের শব্দনানি বেড়ে ওঠে ক্রমশঃ মেঘে মেঘে ঢেকে যায় আকাশ। ছিটে-ফোটা বৃষ্টি পড়ে। ঢেউখেলানো টিনের ছাউনির উপর শব্দ হয় পট, পট পটর। নারকোল

গাছগুলোর পাতার ঠাঁকে-ঠাঁকে টাবের আলো তখনো নিঃশেষে মিলিয়ে যায় নি। ঝাঁ ঝাঁ শোকার ডাক আর শোনা যায় না। এবার ডাক শুক হয়েছে ব্যাঙের। সোনা ব্যাঙ, কালো ব্যাঙ, কুনো ব্যাঙ,—ছোট, বড়, হাঙ্গারী, ডাকছে গ্যাঙ্‌র গ্যাং গ্যাঙ্‌র গ্যাং। ..

ঘোর কৃষ্ণ কালো মূর্তি—এই কি ঘমরাজ ?

অন্ধকারের চেয়েও কালো চোখ—একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মায়ের দিকে ?

কাঁরা ওরা ? বয়ে আনলো শব ? বৃষ্টি-ভেল্লা ঘাসের দল্ল রঙ আর চোখে পড়ে না। কাশবনের পাশে স্নাড়া অশখগাছের ডালগুলো ছুলে ওঠে। শত্নির পাখার ঝাপটানি শোনা যায়। শিরাল, হাঙ্গার হাঙ্গার শিরাল—থমকে আছে কেন ? শিনাকীর দিকে চেয়ে ? লোলুপ, পাশব দৃষ্টি, লেজ নাড়ছে কি ওরা ? ছায়া কালো, কালো—কদাল—প্রোতের মত অস্থিচর্মসার—বিষম, বুভুক্ষু।—

...কার কণ্ঠস্বর ?

...আগুন দাঁও।

...আগুন দাঁও। মায়ের মূখে আগুন। পীড়িতা, দারিদ্রক্লিষ্ট মায়ের অন্তিম আশা, আগুন জ্বলে পিনাকী।

সহসা জ্বলে ওঠে লেলিহানে আগুনের শিখা।

বাতাসের বেগ বেড়ে চলে। হ হ করে পুড়ে যায় পিনাকীর মা। কস্তুরী, কল্যাণময়ী রমা। কারা ম্লান পাঠ করছে আশানে ? কি আশ্চর্য ! এ বে অকুমাণীর প্রিয় স্তব, পিনাকীর কণ্ঠস্ব—

মাতা ধরিম্বী জননী দয়াজ হৃদয়া সতী।

ধেবী কুরমবী শ্রেষ্ঠা নির্দোষা দর্পদুঃখহা।

আরাধ্যা মাতা পরম দয়া শাস্তিঃ কমা গতিঃ।

বাহা স্বধা চ গৌরী মা পদ্মা চ বিজয়া জয়া।

চিত্তা ভন্মাবশেষ। বাজির অন্ধকারে চিত্রার প্রোতের মধ্যে ফেলে দিয়েছে পিনাকী। এবার প্রোতের সঙ্গে ভেসে চলবে পরমাণু। পাঁচ হয়ে যাবে কত গ্রাম, শহর, গহ। সব শেষে মিশে যাবে সাগরের নীলজলে। বে অব বেলল, তারপর ভারত মহাসাগর। ভারত মহাসাগর কোথায় যেন গিয়ে মিশেছে, পিনাকীর আর জানা নেই সে কথা।...

কাহিনী

শ্রীমন্নীলকুমার বসু

অতি পুরাতন স্মৃতি বিজড়িত
ডাকিনী বৃড়ীর চর,
মাটি যেথা আজ বালু ঢাকা আছে
ছিল সেথা বহু ঘর।

আর ছিল নদী, ছিল ছোট গ্রাম ;
নাম ভুলে গেছি তাই,
তোমরা সকলে শোন মন দিয়া
যে কথা বলিতে চাই।

একদা সেথায় দীপের শিখায়,
আলোকিত ছিল প্রাণ।
মাটির কুটীরে নিত্য ঠাকুরে,
ভারা যে শোনাভো গান।

বনের পাখীর কল-কাকলীতে
ঘুম ভেঙে যেত ভোরে,
গুরু হ'য়ে যেত কত শত কাজ
সারা দিনমান ধরে।

কৃষাণ চলিত বাহিরের কাজে
কৃষাণী থাকিত ঘরে,
অতি বৃড়া-বৃড়ী সন্ধ্যা থাকিত
ছোট শিশুদের তরে।

ফলে ফলে ভরা নদীর দু'ধারে
ছিল কত সুখ শাস্তি।
দূর হ'লো যবে মানুষের প্রেম
মুছে গেল সেই কান্তি।

গাঁয়ের মোড়ল ভাবিল যখন
সেই তো এখন রাজা,
তাই তো সেদিন বিনা দোষে পেল
ভিখারীর মেয়ে সাজা।

মোড়লের ছিল ভিন গাঁয়ে কোন
বিশেষ কাজের তাড়া,
তাহারি কুটীরে ভিখারিণী ছিল
ছয়ারের পাশে খাড়া।

ধাক্কা লাগিয়া পড়িল মাটিতে
ভিক্ষারি মৃৎ পাত্র।
তগুল কণা যা ছিল তাহাতে
রহিল না কিছু মাত্র।

সহসা রাগিয়া মোড়ল কহিল,
ওরে, ওরে হতভাগী !
কানা নাকি তুই, দূর'হ এখুনি ;
পাবি না ভিক্ষা মাগী।

মনে মনে বলে ভিখারিণী, প্রভু।

মোর কি মরণ নাই ?

ভীষণ প্লাবনে সারা গ্রামখানি

ভেসে গেল বুঝি তাই।

—



সেখানে •

• সেখানে

ত্রিশচীন্দ্রনাথ অধিকারী

চারিদিকে ধু ধু করছে বিশাল
মাঠ।

সেই বিশাল মাঠের মধ্যে ছোট্ট একটি রেল স্টেশন। কাছে-কিনারে লোকবসতি একেবারে
নাই; শুধু স্টেশনটির গায়ে ভোবার ধারে ছ'একটা ছোট্ট চিঁড়ে-মুড়কি আর পান-বিড়ির দোকান।
ছোট্ট স্টেশনটিতে এবেলা-ওবেলা চারপাঁচখানা মাত্র ট্রেন থাকে। এইমাত্র একখানা ট্রেন চলে
গেছে। পরের ট্রেন আসবে চারপাঁচ ঘণ্টা পরে। মিশ্রিত কর্মহীন স্টেশন!

দুপুর বেলা। কঁা কঁা করছে বোধ। এমন সময় একজন গ্রাম্য ভদ্রলোক দুপুর রোদ্দে গলদঘর্ম হ'য়ে
পৌঁছিলেন স্টেশনের বাতীঘের চালায়। রোদ্দে অনেকখানি পথ হেঁটে এসে খুব আঁস্ত-কাঁস্ত-বেহে আঁস্ত
পেলেন স্টেশনের ছাউনির মধ্যে, বেঁকিতে বসে ধাঁকাতে লাগলেন। মাঠের হাওয়ায় একটু হুহু হলেন।
তিনি দেখতে পেলেন নির্জন স্টেশনটিতে একজন ভদ্রলোক দিবি রান-টান সেরে আহারাঙ্গি করে
শতরঞ্জি বিছিয়ে মাথার কাছে পোটলা-পুঁটলী রেখে বিশ্রাম করছেন। আরাম করে পান চিবুচ্ছেন।
জনপ্রাণী নেই। ছ'জন মাত্র বাতী গাড়ীর আশায় বসে। চারপাঁচ ঘণ্টা পরে ট্রেন আসবে।
তাই আগন্তুক ভদ্রলোকটি বিশ্রামরত ভদ্রলোকটির সঙ্গে আলাপ জুড়ে মিলেন।—

মশায়ের নাম?

ভদ্রলোকটি আশায় ক'রে বসে জবাব দিলেন—আজ্ঞে আশায় নাম ওঠলাল।

আগন্তুক ভদ্রলোকটি হেসে তাঁর দিকে চেয়ে বললেন—মশায়ের নিবাস?

ওঠলাল—আজ্ঞে, নিখোঁজ-ভাঙা।

আগন্তুক আরো একটু হেসে বিজ্ঞাসা করলেন—কোথায় বাবেন?

ওঠলাল—আজবগর।

আগন্তুক হেসে উঠলেন, বললেন—বেশ, মশায়ের সঙ্গে আলাপ করে সুখী হলাম; তা, গ্রাম
থেকে কিসে এলেন?

ওঠলাল—আজ্ঞে, এসেছি খুব আশায়ে। এসেছি চরণমাকির মৌকায়।

আগন্তুক হোঃ হোঃ করে হেসে বললেন—আপনি বেশ রসিক লোক। এই মাঠের মধ্যে তো
কুরো পুতুর নেই। স্নান করলেন কোথায়?

গুটলাল—স্নান করেছি ঘটি-গন্ধায় ।

আগন্তুক—আবার হেসে বললেন—বেশ, বেশ । কিন্তু ট্রেনের তো অনেক ঘেরি, স্নানটিও সেবে নিয়েছেন, আহা হারিও সেবেছেন । স্নানের কী করা হয় ?

গুটলাল—চাকরি করি বললস্বী মিলে ।

আগন্তুক ভ্রমলোকটি পঞ্চম তুলে বেশ খানিক হেসে নিলেন ।

এইবারে গুটলাল আলাপ জমিয়ে নিলেন । জিজ্ঞাসা করলেন—স্নাই-এর নাম ?

আগন্তুক—আজ্ঞে আবার নাম অধরকালি ।

গুটলাল রসিক মাহুষ তিনি হো হো করে হেসে বললেন—বেশ নামটি তো আপনায় । আসছেন কোথা থেকে ?

অধরকালি—আসছি নরচর থেকে ।

গুটলাল—একটু ভেবে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, এ্যাতটা পথ আপনি এলেন কিসে ?

অধরকালি—এসেছি পম্বাতিক সিং-এর গাড়িতে ।

গুটলাল—বেশ, বেশ । নামকরা গাড়োয়ানের গাড়িতেই এসেছেন । তা আহা হারি কি হয়েছে ?

অধরকালি—হ্যাঁ, পেট ভরে বাতাসা খেয়েছি । আর কি থাকে ?

গুটলাল—স্নানের বাওয়া হবে কোথায় ?

অধরকালি—আরাকে যেতে হবে অসীমবহে ।

গুটলাল হো হো করে হেসে বললেন—বেশ, বেশ, স্নানের কী করা হয় ?

অধরকালি জবাব দিলেন—আমি ভারতনারায়ণ মিলে চাকরি করি ।

গুটলাল আবার হো হো করে হেসে উঠলেন । আলাপ পরিচয় আরো জমে উঠলো । দুই রসিকে বেশ গল্প জমিয়ে নিলেন ।

এই ভ্রম ভ্রমলোকের আলাপের অর্থটা কী, তা ভোমরা বুঝতে পেরেছ নিশ্চয়ই । না পেরে থাকো তো শোনো । দেকালে সাধারণ অল্পশিক্ষিত মানুষের মধ্যে এই রকম সরল আলাপ চলতো । পাচালী ও কবিগানও এইরকম বুদ্ধির লড়াই চলতো—এইটেই ছিল সেকালের সামাজিক অবস্থা । উচ্চশিক্ষার অভাবেও এসের মন নিজেদের অল্প পরিসরের মধ্যে সৃষ্টির আনন্দে সরল হয়ে থাকতো ; সরল সরল কোতুক আবার সেকালের সামাজিক পরিবেশ আনন্দময় করে রাখতো ।

পান খেয়ে চোঁটা লাল করে ঠুর নাম হল গুটলাল, আর বাড়ি কিনা নিখোজ-ভাড়া । বুদ্ধি-দীপ্ত সরল রসিকতা নয় কি ?

বাওয়া হবে আত্মবগল, অর্থীং আজিমগল । এলেন কিসে ? চরণমাকির নৌকায়—কী অম্বর

অৰ্ধপূর্ণ রসিকতা। মান হল ঘটি-গলায়, চাকরি করেন বঙ্গলক্ষী মিলে! একেই বলে হালক্যানের 'টিড বিটন' (Tid-bit)।

বিতীয় ভ্রমলোকটি কিং প্রথম জনকেও টেকা মেরেছেন। রোস্ত্রে হেঁটে শাস্ত্রাস্ত হয়ে যুগ তকিয়ে গেছে তাই তিনি 'অধরকালী'—'ওঠলালের' নামের সঙ্গে পান্না বেওয়া হল। তাঁর বাড়ী 'নরচর' অর্থাৎ নবদ্বীপ। এলেন কিসে? 'গহাতিক সিং-এর পাড়িতে।' 'চরণ মাঝির' নৌকার প্রত্যাশায় চমৎকার অৰ্ধপূর্ণ হইল। এদের কাছে কোথায় লাগে ইলেকট্রিক ট্রেন। ইনি খেয়েছেন 'বাতাসা' অর্থাৎ বায়ুভক্ষণের নারাস্তর। যাবেন কোথায়? 'অসীমদেহে'। খুঁজে বার করো দেখি সেই শহরটাকে। চাকরি করেন ওঠলাল 'বঙ্গলক্ষী-মিলে'। অধরকালীও টেকা দিলে—তার চাকরি 'ভারত নারায়ণ মিলে'—'বঙ্গলক্ষী' চেয়েও বড় মিল নিশ্চয়। এদের দু'ঘনের বুদ্ধি রসিকতা ইহুল-কলেজের শিক্ষায় বিকশিত হয় নি। বাংলাদেশের নরম মাটির রস থেকেই এদের মন ও বুদ্ধি সরস হয়েছে। এরই নাম সেয়ানে সেয়ানে কোলাহুলি!

তখনকার পাঁচালীর ছড়া ধারা বাথতেন তাঁরা বি-এ, এম-এ পাস বুঝতেন না; কবিরস বিস্তারিত উপাধিও পান নি। তাঁদের পাঁচালী রচনার মনুনা দুই একটা শোনাচ্ছি—'ওরে রে লক্ষণ একী অলক্ষণ, বিপদ ঘটেছে বিলক্ষণ—' রামায়ণের গানে এই গান সবাইকে কান্দাতো। আরার ভাবে 'শ্রীকান্ত নরকাস্তকারীকে নিভাস্ত-কৃতাস্ত-স্তাস্ত-হবে ভবে।' বাংলা ভাষার উপর কতখানি দখল থাকলে এই রকম পদ রচনা করা যায়! এর সঙ্গে মিলিয়ে মাও রবীন্দ্রনাথের অপূর্ব ছন্দকতার 'শক্তি চিত্ত কল্পিত অতি অক্ষণ ওড়ে চকল।' এর সঙ্গে কোন সেকেন্দ্র শাস্তার মশায়ের একই শব্দের বিভিন্ন অৰ্ধপূর্ণ-পদটির মানে বল দেখি—

'হরির উপরে হরি, হরি শোভা পায়,
হরিরে দেখিছা হরি, হরিতে লুকায়।'

দেকালের 'সমস্তাপূরণ' খুব মজার খেলা ছিল নানারকম সামাজিক আগরে। উদ্ভট কবিতাও সে সময় রচিত হত প্রচুর। কবির লড়াই-এর অহংকরণে এগুলি রচিত হত। যেমন একজন একটা অদ্ভুত কবিতার লাইন বলে উত্তর চাইলেন—যেমন অসম্ভব তেমন অদ্ভুত কথা—'গাভীতে স্তম্ভন করে সিংহের শরীর।'।

সমস্তা বটে, অসম্ভব কাণ্ড, গুলিখুরী প্রায়। কী চমৎকার জবাব দিলেন রসলাগর কবি কৃষ্ণচন্দ্র ভাট্টা শোনো—

'মহারাজ, রাজধানী নগর বাহির

বারোইয়ারী-মা কেটে হলেন চৌচির

ক্রমে ক্রমে খড় দড়ি হইল বাহির

গাভীতে ভ্রমণ করে সিংহের শরীর ।'

প্রাচীন কবি ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে 'অন্নদার আশ্বকাহিনী'—'কোনো গুণ নাহি তার কপালে আগুন' কবিতাটি অপূর্ব ও অদ্বৃত। তিনি ছিলেন একজন ব্যাতিমান শ্রেষ্ঠ কবি, তাঁর ছিল ক্ষুধার বৃদ্ধির দীপ্তি আর অপূর্ব কবিত্ব। কালিদাসদাসের মহাভারতের পরাবরেও এই শ্রেণীর হৃদয় কবিতা দেখা যায়। এ্যাট্টর্নী ক্লিরিকী প্রভৃতি বিখ্যাত কবিদ্বন্দ্বের কলম দিয়ে যে সব গান জন্ম নিতো তার মধ্যে অলিঙ্গিত কবিত্বের কাব্যপ্রতিভা ছিল বঞ্চেই। একজন প্রতিভাধর প্রাচীন সাহিত্যিক এই কলকাতা শহরের কালিদাসদাস ঘোষের একটি সরস্বতীর ঘোরে 'শ্বেত' শব্দের কত হৃদয় রক্তমারী ব্যবহার দেখা যাচ্ছে লক্ষ্য কর—

'শ্বেত শতদলোপরে শ্বেতাশ্বর কলসবরে

শ্বেতমালা গলে পরে বিরাজে শ্বেতবরণী ।'

কালিদাসদাস (১৮০২-১৮৭৩) ইংরাজীতেও সুপণ্ডিত ছিলেন। সহজ সরল সেকেন্ডারীর কবিতা তাঁর ছিল অনেক। সুবিখ্যাত পণ্ডিত রিচার্ডসন সাহেব তাঁর একটি কবিতা 'The Boatmans' song to Ganga' নামে ইংরাজীতে অহবাস করেছিলেন।

সহজ সরল সেকালের বাঙালীর মনের মধ্যে মধুচক্রের মত রস টুটু করতো! কবিতা আর গান ছিল অনেকের প্রকৃতি-দত্ত অধিকার। প্রাচীন পল্লীগীতির অক্ষরন্ত ভাণ্ডার বাংলার ছন্দে। তাঁর সঙ্গে মিশেছিল সহজ জ্ঞান ও বুদ্ধি। মহাকবি কালিদাস কাব্য-নাটকাদি লিখে গেছেন সংস্কৃতে। কিন্তু সেকলে গেরো কবির কল্পনা দিয়ে কালিদাসকেও বাঙালী করে গড়ে নিয়ে তাঁর রচনা বলে নিজেদের অনেক পদ অথবা ছড়া চালিয়ে আমাদের মুগ্ধ করেছেন। যেমন কালিদাস একটা ল্যাজ কাটা কুহুর দেখে দুঃখ ক'রে পদ্মরচনা করে ফেললেন—

'নাই তাই খাল, থাকলে কোথায় পেতে ?

কহেন কবি কালিদাস পাথে বেতে বেতে ।'

ল্যাজকাটা কুহুরের কাটা ঘায়ে মাছেরা বসেছে বেবে কবি মাছদের উদ্দেশে বলছেন—
কুহুরের লেজ নেই তাই বসে ওর ঘা খাচ্ছে ; কিন্তু বাপু, ও বেচারার ল্যাজটা থাকলে তো আর তা পেতে না। ল্যাজ নেড়ে তোমাদের ভাড়াতে। কী চমৎকার হাসির ব্যাপার।

এই রকম আরো সরল সরল কৌতুকপূর্ণ রচনার কাহিনী বলতে পারি, যদি তোমরা এদিকে কিছুটা কৌতুহল দেখাও। কবি ঈশ্বরগুপ্ত তাই বলে গেছেন—

'এত ভুল বদম্বেশ তবু রক্তমায়া ।'

তুলসী খাত

ডাঃ শচীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

তুলসীর বিষয়ে তোমাদের কিছু বলব। তুলসী কাকর নাম নয়—একপ্রকার গাছ। আমাদের বাংলাদেশে, শুধু বাংলা দেশ কেন, সমগ্র ভারতবর্ষে এই গাছ দেখতে পাবে। তুলসী গাছ তোমরা নিশ্চয় দেখেছ—এ খুব বড় হয় না। ছোট ছোট চারাগাছের মতন। এমনকি কচি কচি ছেলে-মেয়েরাও টুক টুক করে তুলসী পাতা ছিঁড়ে নিতে পারে। তুলসীগাছ বেখানে-বেখানে জন্মায়। এদের বীজ হতেই গাছ জন্মায়। আমরা—মানে হিন্দুরা, তুলসীগাছকে নারায়ণ বলে মনে করি। পূজা-পার্বণে তুলসী প্রয়োজন। আমাদের দেশের বৈষ্ণবগণের নিকটও তুলসী খুব পবিত্র। তাঁদের বিশ্বাস একটি তুলসী পাতা নারায়ণের মাথায় দিলে তিনি তাতেই থুসী। তুলসী-মাছাখ্যা সম্বন্ধে অনেক হস্তর হস্তর গল্প আছে। বিজুপুরাণে এর অনেক উপাখ্যান পাওয়া যায়। তোমরা বড় হয়ে দেখ-সব পড়বে।

তুলসী সম্বন্ধে অনেক প্রবাদ শোনা আছে। আমাদের দেশের মুনিরাজ বলে থাকেন,—তুলসীর গন্ধ বালু বতদূর বহন করে নিয়ে যায়, ততদূর প্রাণীসকল পবিত্র হয়। তুলসীর গুণ অনেক। নারায়ণ পূজার চরণানুত্ত পান (মানে নারায়ণের চরণানুত্তে তুলসী থাকে—সে মন্ত্রই উহা খুব পবিত্র) ও তুলসীতলার মাটি গায়ে ধারা মট্ঠন, তাঁরা অনেক কঠিন রোগ হ'তে মুক্ত হতে পারেন—যদিও ইচ্ছা আমার শোনা কথা, তথাপি আমার বিশ্বাস এর মধ্যে যথেষ্ট সত্য নিহিত রয়েছে।

তুলসীর সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ হ'ল,—গমন নিবারণ করে, দুর্গন্ধ নষ্ট করে। সেজন্য রোগের জীবাণু ধ্বংস করবার শক্তি তুলসীর খুব আছে। পানীয় জলে তুলসীপাতা দিলে, জলের দুর্গন্ধ জীবাণু নষ্ট করে জলকে পবিত্র করে দেয়। তুলসী-ভিজান জল পান করলে কলেরাও হয় না। আমাদের দেশে একটি ভাল প্রথা আছে—কেউ মারা গেলে, তাঁর শবদেহ বহন করে নিয়ে যাবার সময় সঙ্গে করে তুলসী-বৃক্ষ নিয়ে যায়। গ্রামের মশানে গেলে এতদূর দূষ্টাঙ্ক অনেক পাবে। মশানের চারিধারে অনেক তুলসীগাছ পাবে, কারণ তারা তুলসীবৃক্ষ সঙ্গে করে নিয়ে যায়, তারাই এই বৃক্ষকে মাটিতে পুঁতে আসে। ইহার বথেষ্ট কারণ আছে। তুলসীগাছের হাওয়া মশানে যে দুট জীবাণু থাকে তা ধ্বংস করে, এবং শববহনকারীরা এই জীবাণুর হাত হ'তে রক্ষাও পায়।

আবার দেখা যায়—কারুক বোলতা, ভীমকুল, এমনকি বৃচ্চিকে যদি কারুড়ার এবং সে স্থানে যদি তুলসী পাতার রস লাগান হয়, তাহলে তৎক্ষণাৎ সেই ধংশনের জালা-বয়না দূর হয়ে চলে যায়। কানের ব্যথাতে কেউ যদি অস্থির হয়ে ওঠে, তাকেও যদি তুলসীর পাতার রস কানে দেওয়া

যায় তার কানের ব্যাথাও সঙ্গে সঙ্গে চলে যাবে। অনেক মতে সর্প-সংশয়ের রোগীকে তুলসী শাভার রস খাওয়ালে সাপের বিষও নষ্ট হ'তে পারে।

যেখানে ম্যালেরিয়া রয়েছে, সে সব স্থানের বাড়ীর চতুর্দিকে যদি তুলসীবৃক্ষ লাগান যায়, তা হ'লে সেখানে ম্যালেরিয়ার বিষ প্রবেশ করতে পারে না। মর্জীর কথা হ'ল—তোমরাও পরীক্ষা করে দেখতে পার। ম্যালেরিয়ার জীবাণুবাহী মশক—যেখানে তুলসী গাছ আছে সেখানে থাকে না। তার কারণ তাঁরা তুলসীর হাওয়া সহ্য করতে পারে না। আবার যদি তুলসী পাতার রস গায়ে মেখে নেও, দেখবে মশা তোমার গায়ে বসবে না। যেখানে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ খুব বেশি, সেখানকার লোকেরা যদি প্রতিদিন নিয়মিত ভাবে, সকালে খালি পেটে সাতটা করে তুলসীর পাতা খায়, তাকে কখন ম্যালেরিয়া স্পর্শ করবে না। এমন কি তুলসী শাভার রসে পুরাতন ম্যালেরিয়াও চলে যায়।

অনেকের ধারণা যে-বাড়ীতে তুলসী গাছ আছে, সে-বাড়ীতে কখনও বজ্রপাত হয় না। তুলসী গাছের ছালের রসে শরীরে বল ও কান্তি হয়। ঐ মূল যদি পানের সঙ্গে খাওয়া যায়, মাথা ঠাণ্ডা থাকে, ঘুম ভাল হয়।

যে সব লোক অত্যধিক চা পান করেন। তাঁরা যদি কতকগুলি তুলসী পাতা ছায়ায় শুকিয়ে নিয়ে রেখে দেন, এবং পরে ঐ শুকনো পাতা চায়ের রতন দুধ তিনি দিয়ে পান করেন, দেখতে পাবে—চায়ের দ্রবণ যে ক্ষতি হচ্ছে—তা আর হবে না। চায়ের বেশাও চলে যাবে—হৃদয়ও ভাল হবে। শ্রমেতে দেখতে দেহের কান্তি হ্রাস হবে। বারা নিয়মিতভাবে তুলসী সেবন করেন—তাঁদের কখন কানীতে কষ্ট পেতে হয় না। তুলসী সফল্লে আরো অনেক বিষয় আছে যা বড় হ'লে তোমরা পড়বে। আজ এ পর্যন্ত।

প্রশ্ন

শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

পিতার শ্রান্ধে বাবুর বাড়িতে

মহা ধুমধাম চলে :

অগুণতি তার বন্ধুরা এসে

খেয়ে যায় দলে-দলে।

ছায়ায় যে এক অনাহারী কাদে

কে-ই বা দেখে তা চেয়ে ?

বিশ্বপিতার তৃপ্তি কি হয়

হেন অপমান পেয়ে ?

খেলোয়াড়দের খবর

মেরুড়ে

অ্যাসেসজ জরী অস্ট্রেলিয়া

ইংলও বনাম অস্ট্রেলিয়ার চতুর্থ টেস্ট ক্রিকেট ম্যাচের ষষ্ঠ ও শেষ দিনে অস্ট্রেলিয়া দল দশ উইকেটে ইংলণ্ডকে হারিয়ে দিয়ে 'অ্যাসেসজ পুনরুদ্ধার' করেছে। চতুর্থ টেস্ট ম্যাচে জয়লাভের ফলে অস্ট্রেলিয়া বর্তমান পর্যায়ের খেলায় ৩-০ ম্যাচে রাবার লাভ করেছে। ১৯৪৩ সালে ইংলও অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে দিয়ে 'অ্যাসেসজ' দখল করেছিল এবং এতোদিন তা তাগেরই ঘরে ছিল। ১৯৪৩ সালের আগে অস্ট্রেলিয়া একসঙ্গে উনিশ বছর অ্যাসেসজের অধিকারী ছিল।

পঞ্চম ক্রিকেট টেস্ট ম্যাচ

নরাদিল্লীতে ভারত বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজের পঞ্চম ও সবশেষ টেস্ট ম্যাচ অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়। ভারত দ্বিতীয় ইনিংসে নয় উইকেটের বিনিময়ে ২৭৪ রান করলে ঐ অবস্থাতেই খেলাটির ওপর ছেপ পড়ে, কারণ আহত উমরিগড় আর ব্যাট করতে নাহতে পারেন নি এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজের দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করার আর সময় ছিল না। প্রথম ইনিংসে লেফুর্দী করার পর দ্বিতীয় ইনিংসে ২৬ রান করে চানু বোরসে দিনের শেষ সভারে আউট হন।

টেষ্ট খেলার ইতিহাসে বোরসের নাম ভারতের 'আপকর্ভা' হিসেবে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

এর আগে মাত্র একজন ভারতীয় ব্যাটসম্যান বিজয় হাজারে টেষ্ট ম্যাচে দু' ইনিংসে লেফুর্দী করেছেন। হাজারে ১৯৪৮-৪৯ সালে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে টেষ্ট পর্যায়ের খেলায় এডেলভেডে চতুর্থ টেস্ট ম্যাচে ১১৬ ও ১৪৭ রান করেছিলেন। বর্তমান পর্যায়ের টেষ্ট খেলায় একমাত্র বোরসেই আগন্তুকদের বিপক্ষে শতাধিক রান করেছেন। ওয়েস্ট ইন্ডিজের ছ-জন ব্যাটসম্যান ভারতের বিপক্ষে মোট নটি লেফুর্দী করেছেন। গারকিন্ড সেবার্স ৩টি, বেলিন বুচার ২টি এবং কানহাই, জন হোন্ট, কোমি শিথ ও জো দলোমন এঁরা প্রত্যেকে একটি করে লেফুর্দী করেছেন।

কানহাইকে 'বাঘের মাথা' উপহার

গত ৯ ফেব্রুয়ারী রাষ্ট্রপতি তখনে রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট দল এবং ভারতীয় ক্রিকেট দলের খেলোয়াড়দের চায়ের আসরে নিমন্ত্রণ জানান। ভারতের বিপক্ষে টেষ্ট খেলায় ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ সংখ্যক রান করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি রোহন কানহাইকে 'বাঘের মাথা' উপহার দেন। কলকাতায় তৃতীয় টেস্ট ম্যাচে রোহন কানহাই ২৪৬ রান করেছিলেন। বিজয়-নগরের মহারাজকুমার রাষ্ট্রপতির হাতে এই 'বাঘের মাথা'টি দিয়েছিলেন।

জন-সম্বন্ধিত চান্দু বোরদে

ওয়ার্ল্ড ইণ্ডিগের সঙ্গে দিল্লীতে পঞ্চম টেস্ট ম্যাচে অসামান্য ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রকাশ করার চান্দু বোরদেকে বরোদার জন-সম্বন্ধী জানান হয়। সম্বন্ধী সভায় তাঁকে চার হাজার টাকার একটি তোড়া উপহার দেওয়া হয়। এই সভায় ইংলওগামী ভারতীয় দলের অধিনায়ক দাতাজীরাও গায়কোয়াড় ও দলে নির্বাচিত বরোদার অপর খেলোয়াড় জে. এম. ঘোরপাড়েকেও সম্বন্ধী জানান হয়।

—

ইংলওগামী সতেরোজন খেলোয়াড়

ইংলওগামী ভারতীয় ক্রিকেট দলের খেলোয়াড় নির্বাচন শেষ হয়েছে। এই দলে আছেন দাতাজীরাও গায়কোয়াড় (অধিনায়ক), পঞ্চজ রায় (মহ-অধিনায়ক), নরি কণ্ট-স্ট্রি, পি. জি. বোশী (উইকেট রক্ষক), জে. এম. ঘোরপাড়ে, কপাল সিং, আর. জি. নাদকারনি, জয়সিয়া, অরবিন্দ আপ্তে, গোলাম আহমদ, পলি উমরিগড়, ভামানে (উইকেট রক্ষক), মঞ্জেরকার, হরেন্দ্রনাথ, হুভাব গুপ্তে, রামকান্ত দেশাই ও সি. জি. বোরদে।

ইংলও ভারত বনাম ইংলওর পাঁচটি টেস্ট খেলার তারিখ:

৪—২ জুন ট্রেন্টব্রিজে ১ম টেস্ট। ১৮—২৩ জুন লর্ডসে ২য় টেস্ট। ২—৭ জুলাই লীডসে ৩য় টেস্ট।

২৩—২৮ জুলাই ওল্ড ট্যাওয়ার্ডে ৪র্থ টেস্ট।

২০—২৫ আগস্ট ওভালে ৫ম টেস্ট।

—

লিওওয়ার্ডেলের কৃতিত্ব

টেস্ট পর্যায়ের খেলায় এ পর্যন্ত যাত্র তিন-জন বোলার দুশোর ওপর উইকেট লাভের কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। তাঁদের ভেতর ইংলওর আলেক বেডনার সবচেয়ে বেশি (২৩৬টি) উইকেট লাভ করেছেন। এটাই বর্তমানের বিশ্ব রেকর্ড। অস্ট্রেলিয়ার বোলারদের ভেতর ক্যারি গ্রিমেট এভোমিন পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি সংখ্যক (২২৬টি) উইকেট লাভের রেকর্ডের অধিকারী ছিলেন। বর্তমান পর্যায়ের টেস্ট খেলায় অস্ট্রেলিয়ার যে লিওওয়ার্ডেল চতুর্থ ও পঞ্চম টেস্ট ম্যাচে ৭টি উইকেট লাভ করে ক্যারি গ্রিমেটের অস্ট্রেলীয় রেকর্ড অতিক্রম করেছেন এবং ২১৯ উইকেটের নতুন রেকর্ড স্থাপন করেছেন। তিনদলের ভেতর লিওওয়ার্ডেলের গড় হিসেবই শ্রেষ্ঠ। নিচে তিনজন বোলারের রেকর্ডের একটা হিসেব দেওয়া হল:

টেস্ট রাণ উইকেট গড়

আলেক বেডনার	৪১	৪৮৭৬	২৩৬	২৪.৮২
রে লিওওয়ার্ডেল	৪৭	৪২১৩	২১৯	২২.৪৩
ক্যারি গ্রিমেট	৩৭	৪২৩১	২১৬	২৪.২১

—

দঃ কলঃ স্কুল ভলিবল লীগ

২২ কেকদ্বাৰী কালীঘাট পাৰ্কে আই. এম. এম. এ দক্ষিণ কলকাতা পৰিচালিত আন্তঃ স্কুল ভলিবল লীগেৰ চ্যাম্পিয়ানশিপ ফলাৰ হাৰবপুৰ আদৰ্শ শিক্ষায়তন ১৪।০, ১৩।১৫, ১৬.১৪ এবং ১৪।১২ পয়েণ্টে চক্ৰবেড়িয়া হাই স্কুলকে হাৰিয়ে দিয়ে পৰপৰ হ'বাব চ্যাম্পিয়ানশিপ লাভ কৰেছে।

ইংলিশ চ্যানেল সম্বন্ধে প্ৰস্তুতি

ইংলিশ চ্যানেল অতিক্ৰম কৰাৰ প্ৰস্তুতি হিচাবে সিটি কলেজৰ ছাত্ৰী আৰতি সাহা ১ মাৰ্চ মেশবন্ধু পাৰ্কস্থ গুফৰিগীতে অবিৰাম সাঁতাৰেৰ এক মহড়া দেন। হাটখোলা ক্লাবেৰ সদস্যা এবং বিশ্ব অলিম্পিক প্ৰভাগত সাঁতাক আৰতি সাহাৰ সাঁতাৰ মেখাৰ জন্তে সেমিন সাধাৰণেৰ বিশেষ আগ্ৰহেৰ ভাব দেখা গিয়েছিল। আৰতি সাহা সকাল সোৱা ন'টাৰ মেশবন্ধু পাৰ্কৰ ৬৫ মিটাৰ হাইৰিং পুলে নেমে বেল। সোৱা পাঁচটা পৰ্যন্ত ১৬০ বাৰ পাৰাপাৰ হৈ ৮ ঘণ্টাৰ ১৬,২০০ মিটাৰ (৮৭ মাইলেৰ কিছু কম) অতিক্ৰম কৰেন।

আন্তঃ স্কুল এ্যাথলেটিক

গত ৬ মাৰ্চ ইতিহাস স্কুল স্পোর্টস এসো-সিয়েশন কলকাতা পৰিচালিত উনবিংশ বাৰ্ষিক আন্তঃ স্কুল এ্যাথলেটিক স্পোর্টস ৰাজধানী মাৰ্চে

বিপুল উৎসাহ ও উদীপনাৰ ভেতৰ শেষ হয়। কলকাতাৰ বিভিন্ন ইন্সুলেৰ প্ৰায় দেড়শ ছাত্ৰ এই প্ৰতিযোগিতাৰ অংশ গ্ৰহণ কৰে। সিটি কলেজিয়েট স্কুলেৰ ছাত্ৰেৰা স্কুল চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ কৰে বিশেষ কৃতিত্বৰ পৰিচয় দেয়।

হাইজাম্পে বিশ্বৰ ৰেকৰ্ড ভঙ্গ

বোষ্টনেৰ সতেৰো বছৰেৰ নিগ্ৰো ছাত্ৰ টমাস এ্যাথলেটিক. ইউনিয়নেৰ ইনডোৰ প্ৰতিযোগিতাৰ ৭ফু. ১১ ইঞ্চি লাফিয়ে হাইজাম্পে বিশ্বৰ অসমোহিত ৰেকৰ্ড ভেঙে দিয়েছেন। হাইজাম্পে অসমোহিত বিশ্ব-ৰেকৰ্ড আছে ৰাশিয়াৰ ইউৰি স্টেপানভেৰ ৭ফু. ১ইঞ্চি। তিনবাৰেৰ চেষ্টাৰ টমাস ৭ফু. ১১ ইঞ্চি অতিক্ৰমে সমর্থ হন।

জাতীয় এ্যাথলেটিক প্ৰতিযোগিতা

ত্ৰিবাছৰে অহুষ্টিত জাতীয় এ্যাথলেটিক প্ৰতিযোগিতাৰ পশ্চিম বাঙালীৰ শ্ৰীমান সমর সরকার ১২ ফু. ৭১ ইঞ্চি ব্ৰডজাম্প কৰে কিশোৰ বিভাগে তাঁৰ নিজেৰ ৰেকৰ্ড স্পৰ্শ কৰেন। শ্ৰীমান সরকার হাইজাম্প ফাইনালেও বিশেষ কৃতিত্বৰ পৰিচয় দেন। সমর সরকার ৫ ফু. ৭১ ইঞ্চি লাফিয়ে তাঁৰ নিজেৰ ভাৰতীয় ৰেকৰ্ড (৫ ফু. ৬ ইঞ্চি) মান কৰে দেয়।



প্রাচীন গ্রামিকদের লেখা

বিজ্ঞানসাগর

বিজ্ঞান সাগর তুমি অল্পময় গুণী,
তোমার গুণের কথা সর্বমুখে শুনি।
তও লোকে করে শুধু মুখের বড়াই,
কাজের মাহুত তুমি, মিথ্যা নস্ত নাই।
দৃঢ় করে অন্তরের বৃকে হান শূল,
দুঃখীর বেদনা হেরি কামিয়া আকুল।
কাঁধে করে তুলে নিলে পথের আতুর—
সৈবা-ঘরে অভাগার বাখা হল দূর।
তুমি আজ স্বর্ণধামে, আছে তব বাণী—
জন্মেছি তোমার দেশে, তাই ধন্য আমি।

শ্রীময় বসু

আমাদের ইকুল

(প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার তৃতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত)

স্কুল অনেক রকম আছে—ছোট, বড়, গভর্ণ-
মেন্ট, মিশনারী ও পাবলিক স্কুল। আমাদের
স্কুল হচ্ছে ভারতবর্ষের মধ্যে একটি নামকরা।
পাবলিক স্কুল। এর নাম—“রাজকুমার
কলেজ।” নাম দেখে যদিও মনে হয় যে এটি কলেজ

এবং খালি রাজকুমারদের জন্য, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে
তাই নয়।

কলিকাতা থেকে রৈলে নাগপুর যাবার পথে
প্রায় ৫১৫ মাইল দূরে রায়পুর বলে একটি শহর
আছে। এই শহরটি মধ্যপ্রদেশের এলাকাভুক্ত।
এইখানেই আমাদের স্কুল, যদিও এটির নাম
কলেজ। স্কুলের মধ্যে ঢুকলেই দেখা যায় বিরাট
মাঠ, লাল রক্তার দু’ পাশে ফুটবল, হকি ও
ক্রিকেট খেলার মাঠ। রাস্তার দু’পাশে স্কুল
গাছে ভরা। দূরে দূরে দেখা যায় মাঠের
মশায়দের কোয়ার্টার। একটু এগিয়ে গেলে
সামনেই ছোট একটি বাগান, তাকে ঘুরে গোলই
একটি প্রকাণ্ড বাড়ী পাওয়া যাবে। এইটাই
হচ্ছে আমাদের স্কুল। স্কুলের উপরে একটি ঘড়ী
আছে। এই ঘড়ীটি ট্রেনে যাবার সময়ও দেখতে
পাওয়া যায়। শোনা যায় যে, যখন এই ঘড়ীটি
আগে বাজতো, তখন সারা শহরে তার আওয়াজ
শোনা যেত। কিন্তু এর আওয়াজে পড়াশুনার
অনুবিধার জন্য এই ঘড়ীটির বাজা এখন বন্ধ করে
দেওয়া হয়েছে। এই ঘড়ীটি এখনও চলে, কিন্তু
বাজে না।

স্কুলের ভিতরে ঢুকলেই প্রথমে দেখা যায়
একটি বিরাট হল। এটি হচ্ছে গ্রন্থাগার। এখানে

বিভিন্ন বিষয়ের নানা রকম বই আছে। এটি রায়পুর শহরের মধ্যে একটি বিখ্যাত গ্রন্থাগার। এর পরেই হচ্ছে থিয়েটার হল। এই হলটির নাম “স্টো” ভবন। স্থলের সূতপূর্ব সর্বজনপ্রিয় প্রিন্সিপালের নামে এই হলের নামকরণ হয়েছে। এখানে রাজিবেলা আমরা একসঙ্গে পড়াশুনা করি এবং যেদিন সিনেমা ও থিয়েটার থাকে, সেদিন এই ঘরেই সে-সব দেখান হয়।

বাড়ীটির মাঝখানে হচ্ছে আমাদের ক্লাবরুম এবং তার দু’পাশেই হোস্টেল। স্থলের পিছন দিকে বাবার ঘর, সেখানে প্রায় দুশো জন ছাত্র একসঙ্গে বসে বেতে পারে। স্থলের প্রকাণ্ড এই বাড়ীর কাছে আর একটি ছোট বাড়ী আছে। এটি হচ্ছে আর্ট-রুম। এখানে ছবি আঁকা ও রঙ করা ইত্যাদি দেখানো হয়। ঘরের দেওয়ালটি ছবিতে ভরে গেছে। আমাদের স্থল থেকে ছাত্ররা ছবি আঁকা প্রতিযোগিতায় বোগদান করে এবং অনেক স্থলর স্থলর ছবি একে এখানে পাঠায়। এই ঘরের পাশেই হচ্ছে গান-বাজনার ঘর। এখানে বিভিন্ন রকম গান ও বাজনা দেখানো হয়। এর পাশেই হচ্ছে একটি ছোট বাহুঘর। আর্ট-রুম থেকে কিছু দূরে হচ্ছে স্থলের মন্দির। এখানে রোজ সকালে ও বিকেলে ছেলেরা প্রার্থনা করতে যায়।

রেসিডেন্সিয়াল স্থলের মত আমাদেরও ভোর বেলা সূর্যোদয়ের পূর্বে উঠতে হয়। সন্ধ্যা স্থলের মত এখানেও রুটিন করে খেলা ও পড়া দুই হয়। এ ছাড়া স্থলে আরও অনেক রকম কাজ

দেখান হয়। যেমন—কাঠের কাজ, প্রায়িকের কাজ, ছবি প্রিন্ট করা, তেল, সাবান ইত্যাদি তৈরী করা।

স্থলে অনেক রকমের খেলা আছে—ফুটবল, হকি ও ক্রিকেট ছাড়া টেনিস, সাতার, বাসকেট বল, সাইকেল, পোলো, বন্দুক ছোড় ইত্যাদি। আগে ঘোড়ার চড়াও দেখান হতো। স্থলের সঙ্গে বাইরের টিমের খেলা ছাড়া নিজস্বের হলের মধ্যেও খেলা হয়।

স্থলের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে, আমাদের বার্ষিক উৎসব। এই সময় কোন গণ্যমান্ন লোককে প্রধান অতিথি হিসেবে নিমন্ত্রণ করা হয়। তিনিই আমাদের সব উৎসবে সভাপতিত্ব করেন। এই উৎসবটি তিন দিন ধরে চলে। এই সময়ে স্থলের পুরনো ছাত্ররা, রাজা-মহাবাজরা এবং বড় বড় অফিসাররা আসেন। তাঁরা এনে আমাদের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া ও খেলাধুলা করেন। তাঁদের মনরঞ্জনের জন্য থিয়েটার, নাচ, গান ইত্যাদি দেখান হয়ে থাকে।

এই পাবলিক স্থলের মত স্থিতি সন্ধ্যা স্থলে পাওয়া যায় না। এখানে খেলা, খাওয়া ও পড়ার অনেক স্থিতি আছে। তাছাড়া এখানে ছাত্র ও বাইরের মণ্ডলীর একসঙ্গে বেলামেশ খুবই আনন্দদায়ক।

শ্রীগৌতম কজ

কবি

বসেছিলেন খাত। কলম নিয়ে

ইচ্ছে মনে,—“লিখতে কিছু হবেই ;

কাজ রয়েছে ? থাকে থাকুক গিয়ে ;

রইলে বেঁচে, কাজ তো কিছু হবেই !

ভ্রমতে পেলেন, বিপজনার বন্ধধনি মাঝে,
মহাকালের চিরশ্মি চরণধনি বাজে ।

সেই ধনির-ই অস্তহার! তেপান্তরের মাঝখানে
ব্যর্থ আমি বেড়াই খুঁজে

হারিয়ে যাওয়া মৌর গানে ।

শ্রীহরত রায়

তা'র তাড়াতে রাখি ঘনি

কাগজ কলম তুলে,

বেলালুম যে লিখতে যাব তুলে ।

মৃত কবি হওয়ার আশা মনে,—

লিখবো বসে একলা ঘরের কোণে,—

বিপ-জনাথ বলবে প'ড়ে —“সাবাস !

ছন্দে-বাণী তিন ভুবনের আশাস ।”

জানবে নাকো তারা,

লিখতে বসে কবি, ভেবেই সারা !

শূঁচ চোখে মেখে—

অাকাশ জুড়ে রঙিন মেঘের নেশা,

সামনে পথের ভিড়ে

কালো-সাদায়, নীল-হলুদে মেখা ;

মেঘের গায়ে ঘুঁড়ি,—

পথের ধারে হাঁকছে কেরিঅলা,—

ভিষাট্রিঙ্গীর কোলে

শীর্ণ শিশু অড়ের মাঝের গলা ।

সন্ধ্যারাগে রাতের সাথে

ঘিনের হোলি খেলা,

বিধায় মেবার বেলা ;



সদ্য

শিল্পী : শ্রীশ্যাম চক্রবর্তী



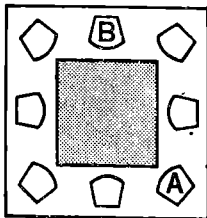
প্রাথমিক পাঠ্য

বুদ্ধির খেলা

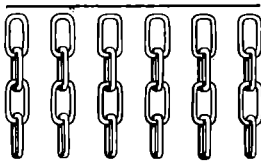
তিননীগোপাল চক্রবর্তী

লোক বসানো

(১) একটি টেবিল ও তার চারধারে আটখানা চেয়ার আছে। A আর B দুই ব্যক্তি ছ'খানা চেয়ারে বসেছে। এখনও C, D, E, F, G, H ছ'জন বসতে থাকি। D আর C কিন্তু A কে পছন্দ করে না, আবার E এবং H B কে পছন্দ করে না। এদিকে আবার F আর G কিন্তু A, B কাউকেই পছন্দ করে না। দ্বারা যাকে পছন্দ করে না তারা তার কাছেই বা বসবে কি করে? ওরা তাহ'লে কিভাবে বসবে বলত?



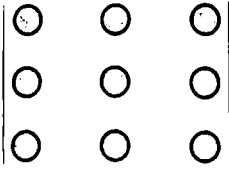
[উত্তরটা পাবে পরের পৃষ্ঠায়]



শেকল জোড়া

(২) ছ'গাছা শেকলের টুকরো আছে। ওগুলি দিয়ে একটা মাত্র শেকল করতে হবে। চারটার বেশি আংটা খুলতে পারবে না কিন্তু। কি ভাবে মাত্র চারটা আংটা দিয়ে ওগুলিকে একটা শেকল করা যায় বলত?

[উত্তর পরের পৃষ্ঠায় দেব]



বৃত্ত-সংযোগ

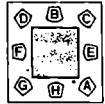
(৩) ন'টা বৃত্ত আছে লাইন ক'রে সাজানো। চারটি মাত্র সরলরেখা টেনে এই বৃত্তগুলিকে সংযুক্ত করে দিতে হবে। সরলরেখা টানবার সময় কিন্তু কলমটি তুলতে পারবে না। কিভাবে তা সম্ভব বলত ?

(নীচের উত্তরগুলি আগে বেখে নিও না।)

• উত্তর •

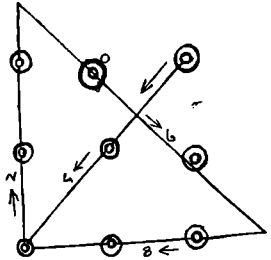
(১) ছবির অঙ্করূপ C, D, E, F, G এবং Hকে বদান্তে হবে। পাশের ছবি দেখ।

(২) চারটে আংটার সাহায্যে পাঁচটা আংকে জোড়া দেওয়া যেতে পারে। এইমত একটা শেকলের চারটে আংটা খুলে নিলে বাকী পাঁচটি খণ্ডকে একটা শেকল করা সম্ভব হবে।



গোটা একটা শেকল না নিয়ে চারটে শেকলের প্রত্যেকটা থেকে একটা করে আংটা নিলে ছ'টা খণ্ডকেই জোড়া দিতে হবে; চারটা আংটার সাহায্যে তা সম্ভব নয়। এইমত এই ছ'গাছা শেকলের টুকরো থেকে গোটা একগাছা থেকে চারটে আংটা খুলে নিতে হবে।

(৩) ছবির অঙ্করূপ সংযোজক সরলরেখা টানতে হবে। তীরচিহ্ন দিয়ে সরলরেখাটি কলম না তুলে কিভাবে বাবে তা' দেখান হয়েছে পাশের ছবিতে।





নতুন বই



(সমালোচনার অন্তর্ভুক্তি বই পাঠ্যবস্তু)

আমার মা—ঐশ্বর্যস্বামী মুগোপাধ্যায়।
এসোসিয়েটেড পাবলিশার্স, এন্ড কলেজ স্ট্রিট
মার্কেট, কলিকাতা ১২। মূল্য ১০০

মা, ভাগনে ও মার বাণীর নিয়ে হৃদয়ের
লেখা ছোটদের উপভাস। মা, বড় লোক ;
সেই মারার বাড়িতে বিহু তার মাকে নিয়ে গিয়ে
ওঠে অবস্থাপত্যকে। তারপর সেখানে মামিমার
সঙ্গে তাদের অসন্তোষ ঘটি হয়, কিন্তু মামিমার
আগ্রহে ও ভালবাসার তারা থেকে যায় ঐ মামিমার
বাড়িতে, এবং মামিমা বাণের বাড়ি চলে যায়।
বিহুর মার এতে খুশি হয় না, তিনি ছেলের
পরই দোষারোপ করতে থাকেন এবং শেষে
একটি কান্না চলে যান। শেষে মামিমার মৃত্যু
হলে মামিমার সঙ্গে মামলা-মকদ্দমার পর সমস্ত
সম্পত্তি ও ঐশ্বর্য আসে বিহুর হাতে। মামলায়
জিতে টাকা হাতে পেয়ে বিহু কান্না থেকে মাকে
বন্ধন আসতে যায় তখন মা তার মাঝা গেছেন।
পরলার প্রতি লোভ সম্বন্ধে মৃত্যুর পূর্বে মা বিহুকে
একখানি হৃদয়ের চিঠি লিখে যান। কাহিনীটি
ভারী হৃদয়। বইখানির ছাশা, বাঁধাই ও কাগজ
হৃদয়। মলাটটিও আকর্ষণীয়।

বাহাদুর—ঐশ্বর্যস্বামী মুগোপাধ্যায়। রিহা
পাবলিশার্স, ১৬১৭, বীরেন রায় রোড ইষ্ট,
কলিকাতা-৮। মূল্য ২০

বিকাশ, মহারাম, প্রভৃতির নিয়ে সোনা
তৈরীর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বা বিকাশবাবু বার
করেছিলেন, তার বাটলন নামক একজন সাহেব
চুরি করে সোনে নেবার চেষ্টা করে, সেই চেষ্টার
উপরই এই উপন্যাসের ভিত্তি। ডিটেকটিভ
আছে এর মধ্যে, কাজেই ডিটেকটিভ উপন্যাসও
বলা যায় বইখানিকে। 'বাহাদুর'-এর মধ্যে দুটি
খণ্ড আছে। প্রথম খণ্ড উপরের কাহিনী নিয়ে।
দ্বিতীয় খণ্ডের বস্তু-তত্ত্ব। এটি কিন্তু সত্যিকারের
রোম্যান্সের কাহিনী এবং প্রথমটির চেয়েও বেশী
আকর্ষণীয়। ভিতরে কয়েকখানি ছবি আছে।

নোটন নোটন—বিশ্বনাথ দত্ত। প্রকাশনী,
৬২ আবহাট স্ট্রিট, কলিকাতা ২। মূল্য ১০

কিওয়ার্ডসন নার্সারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে
পড়ার উপযোগী বুদ্ধিসম্পন্ন ছবি ও ছড়া বই।
নোটন নোটন শব্দ দুটি নিয়ে শেষে একটি ছড়া
আছে। বাকী ছোট ছোট ছড়াগুলির অধিকাংশই
ছোটদের ভাল লাগবে এবং তার ছবি দেখে ও
ছড়াগুলি পড়ে প্রভুত আনন্দ পাবে।

নতুন বই ৩ :

সাত ভাই চম্পা—সমর চট্টোপাধ্যায়। শিশু রঙমহল প্রকাশনী থেকে শ্রীমতী সুর কর্তৃক ২, তিলক রোড, কলিকাতা ২৭ হইতে প্রকাশিত। মূল্য ২'৫০

সাত ভাই চম্পা জাগো বে, কেন বোন পারুল ভাঙো রে' রূপকথার রাজ্যে একটি অতি পুরাতন অথচ চির-নবীন কাহিনী। এই কাহিনী ছোটবেলায় জন্মে অভিনয় করার মত নাটকে রূপান্তরিত হয়েছে। ইতিপূর্বে শিশু-রঙমহলে এটি কৃত্তিবীর সঙ্গে অভিনীত হয়ে ছোট-বড় সকল স্পর্শকর্মেরই খুশি করে। এর মধ্যে চরিত্র হিসাবে সাত ভাই চম্পা, পারুল বোন, মা বগী ও মাসীরা আছে। এছাড়া আরও আছে রাজা, মন্ত্রী এবং হুয়োরানী ও চোরানী। কথা দিয়ে, ছড়া, গান ও গানের স্বরলিপি দিয়ে এবং ভার ও উপর পাতায় পাতায় অল্প ছ'বড়ের ছবি দিয়ে বইখানিকে ছোটদের কাছে খুবই আকর্ষণীয় করে তুলেছেন গ্রন্থকার। —

নিজে কর—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত ও শ্রীপ্রভোত দত্ত। শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লি: ৩২এ আশার দাক্তুলার রোড, কলিকাতা ২ হইতে প্রকাশিত। মূল্য ৫০

লোয়ার ইমফেক্ট ও কে. জি. ওয়ানের উপযোগী সংখ্যা শেখার বই যে এমন হৃদয় করে বাংলার করা যায় তা না হেলে বোকান বাবে না। ছড়া দিয়ে আর প্রতি পাতায় শিল্পী নরেন্দ্রনাথ দত্তর হৃদয় আঁকা ছবিগুলি দিয়ে এক থেকে দশ পর্যন্ত সংখ্যা এবং তার যোগ-বিয়োগ শেখান হয়েছে। তারপর নামভাণ্ড কিছু অংশ আছে। বইখানি আগাগোড়া মেধবার মত। ছোটরা সহজেই সংখ্যাগুলি শিখে যাবে।

আমাদের কথা

আবার একটি বছর শেষ হয়ে গেল এই সংখ্যার সঙ্গে। মোচাক আগামী বৈশাখ ১৩৬৬ সালে ৪০ বছর পড়বে। ৪০ বছর একটানা চলে আসা একটি শিশু-মাসিকপত্রিকার জীবনে কম গৌরবের কথা নয়!

আগামী বছর থেকে মোচাকের বার্ষিক মূল্য ৫/- ও বৎসাসিক মূল্য ২৫/- করতে হয়েছে। প্রধানতঃ ছাপা ও কাগজের অতিরিক্ত দাম বাড়ার জন্যেই এই ব্যবস্থা করতে হয়েছে। তবে এর জন্যে নতুন বছর থেকে মোচাককে নানান্তরে ভাল করারও আমরা চেষ্টা করছি। কাজেই আমরা আশা করব, এই সামান্য দাম বাড়ার জন্যে মোচাকের সঙ্গে তোমাংদের বীর্ঘদিনের যে সম্পর্ক বন্ধাব আছে, তা কোন অংশেই ক্ষুণ্ণ হবে না।

এই সংখ্যার সঙ্গে বাবের বার্ষিক বা বৎসাসিক চাঁদা শেষ হ'ল, তারা সম্মত হলে যত তাড়াতাড়ি পারো আগামী বছরের চাঁদা বিনি-অর্ডার বোণে পাঠিয়ে দিয়ে। এতে অনেকটা খরচ বাঁচবে। আর বাবা তা পারবে না, তাদের আমরা বৈশাখ সংখ্যা ভি: পি: ডাকযোগে পাঠিয়ে দেব। তবে তা দেয়ত দিয়ে আমাদের ক্ষতিগ্রস্ত করার চেয়ে বরং বাবের গ্রাহক গ্রাহিকা থাকার অসুবিধা আছে, তারা একখানি পোস্টকার্ডের সাহায্যে আমাদের জানিয়ে দেবে। —

শ্রীমতীচন্দ্র সরকার কর্তৃক ১৪ বক্স চাট্‌মো স্ট্রিট, কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত

ও ডক্টর প্রমুদ প্রেস, ৩০ কর্নওয়ালিস স্ট্রিট, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

মূল্য : চল্লিশ নয়া পয়সা